



চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড

মূল:

হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসীর (রঃ)

অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

# তাফসীর ইবনে কাসীর

## চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড

সূরাঃ আলে-ইমরান, নিসা ও মায়িদাহ

অনুবাদঃ

হাফেজ আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসীর (রহঃ)

অনুবাদঃ

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি

আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

**প্রকাশক :**

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি  
 (পক্ষে ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান)  
 বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮  
 গুলশান, ঢাকা ১২১২  
[www.drmujib.com](http://www.drmujib.com)

**© সর্বস্বত্ত্ব প্রকাশকের**

**প্রথম প্রকাশ :**  
 রামায়ান, ১৪০৬ হিজরী  
 মে, ১৯৮৬ ইংরেজী

**নবম সংস্করণ :**

জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩০ হিজরী  
 মে ২০০৯ ঈসায়ী

**পরিবেশক :**

হ্সাইন আল মাদানী প্রকাশনী  
 ৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা  
 ফোন : ৯১১৪২৩৮  
 মোবাইল : ০১৯১-৫৭০৬৩২৩

বিনিময় মূল্য : ট ৪৫০.০০ মাত্র।

**তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ**

- ১। ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান  
 বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮  
 গুলশান, ঢাকা ১২১২
- ২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ  
 বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮  
 গুলশান, ঢাকা-১২১২  
 টেলিফোন : ৮৮২৪০৮০
- ৩। ইউসুফ ইয়াসীন  
 ২৪ কদমতলা  
 বাসাবো, ঢাকা ১২১৪  
 মোবাইল : ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫
- ৪। মোঃ ওবাইদুর রহমান  
 বিলোদপুর বাজার  
 রাজশাহী

## উৎসর্গ

আমার শুন্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনীর কাছেই  
আমি সর্বপ্রথম পাই তাফসীরের মহতী শিক্ষা এবং তাফসীর ইবনে কাসীর  
তরজমার পথিকৃত আমার মরহুম শ্বশুর মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ীর কাছে পাই  
এটি অনুবাদের প্রথম প্রেরণা। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে একে  
উদ্দূতে ভাষাত্তরিত করেন। আমার জন্যে এরা উভয়েই ছিলেন এ গ্রন্থের  
উৎসাহদাতা, শিক্ষাগুরু এবং প্রাণপ্রবাহ। তাই এঁদের ঋহের মাগফিরাত  
কামনায় এটি নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত।

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

## প্রকাশকের আরয

আল-হামদুলিল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা সেই জাতে পাক-পরওয়ারদিগারে আলম মহান রাবুল আ'লামীনের, যিনি আমাদিগকে একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেছেন। অনন্ত অবিশ্রান্ত ধারায় দর্কন্দ ও সালাম বর্ষিত হতে থাক সারওয়ারে কায়েনাত নবীপাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবৃল করুন। -আমীন!

চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এবং প্রাপ প্রিয় দ্বীনদার ভই-বোনদের অনুরোধে আমরা আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ভৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর দরবারে শুকরানা জানাই।

তাফসীর ইবনে কাসীরের এই খণ্ডগুলি প্রকাশ করতে গিয়ে যারা আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা মোঃ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেবের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি কম্পিউটার কম্পোজ থেকে স্ক্রু করে আরবী হস্তলিপি এবং অন্যান্য সম্পাদনার কাজে যথাযথভাবে সাহায্য করেছেন। মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন আবদুল্লাহ এন্টারপ্রাইজ এর মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ। তাদেরকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

## অনুবাদকের আরয

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নবী আকরামের (সঃ) এই পুতু়বাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বৃদ্ধ করেছে পাক কুরআনের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইবনে কাসীরের ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দ্দতে পূর্ণসভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দ্দ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অল্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদ্বন্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মদ সাহেব জুনাগড়ী স্বীয় ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এটি পাক ভারতের উর্দ্দ ভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে অতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পঠিত হয়ে আসছে। এভাবে এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

আমি তাফসীর ইবনে কাসীরের মূল প্রগেতা আল্লামা হাফেজ ইমাদুদ্দীনের প্রামাণ্য জীবনী লিখে যেমন প্রকাশ করেছি, তেমনি তার উর্দ্দ অনুবাদক মওলানা জুনাগড়ীরও তথ্যভিত্তিক জীবন কথা লিখে প্রকাশ করেছি। কারণ একজন প্রগেতা, লেখক ও অনুবাদককে বিলক্ষণভাবে না জানতে পারলে তাঁর সংকলিত বা অনুদিত গ্রন্থের শুণাশুণ সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ আদৌ সম্ভবপর নয়। ইংরেজী ভাষার প্রবচন অনুযায়ী লেখককে তার ভাষা শৈলী, সাহিত্যরীতি ও লেখনীর মাধ্যমেই জানতে হয়।

এই উর্দ্দ এবং অন্যান্য ভাষায় ইবনে কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষাতেও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কারণ এ বিশ্ব জাহানের বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিম জনগণের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাংলা ভাষী মুসলমানের সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক। কিন্তু এ সম্বন্ধেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল। ব্যাপারটা সত্যিই অতি মর্মপীড়িদায়ক। তাই একান্ত ন্যায়সংগতভাবেই প্রত্যাশা করা যায় যে, একমাত্র হাদীস ভিত্তিক এই বিরাট তাফসীর ইবনে কাসীরের বাংলা তরজমার মহোত্তম পরিকল্পনা যেদিন বাস্তবে রূপ লাভ করে ক্রমশঃ খণ্ডকারে ও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হবে, সেদিন এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা নতুন দিগন্তই উন্মোচিত হবে না, বরং নিঃসন্দেহে এক বিরাট দৈন্য এবং প্রকট অভাবও পূরণ হবে। এই মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আমার “বাংলা ভাষায় কুরআন চৰ্চা” শীর্ষক

প্রায় ৫৬৪ পৃষ্ঠা বইটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। আরো হয়েছে, ‘কুরআনের চিরস্তন মুজিয়া’, ‘কুরআন কণিকা’, “ইজাযুল কুরআন ইত্যাদি। শেষোভূতি উর্দ্ধ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বেনারসের (ভারত) এক প্রকাশনী সংস্থা থেকে।

আমার পরম শুদ্ধাভাজন আবৰা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি। সাহিত্য জীবনেও আমার রচিত অন্যান্য গ্রন্থমালা যে প্রধানতঃ হাদীস ও তাফসীর বিষয়েই সীমাবদ্ধ এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত জানিয়েছি।

এইসব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি আজ বহুদিন ধরে তাফসীর ইবনে কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুষ্ঠ আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধে আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কর্মে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকার্কীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

এ ব্যাপারে আমার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় তাফসীর সাহিত্যের অভাব পূরণ এবং ভাষাভাষীদের জন্যে আমার গুরুত্বায়িত পালন।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের বাকী খণ্ডগুলোর সুষ্ঠ প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি গঠন করেন। এই সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু’জন হচ্ছেন জনাব নূরুল্লাহ আলম ও গ্রন্থ ক্যাপ্টন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব। এভাবে আল্লাহ পাক অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমাবিত মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারিমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তবস্তুতি তাঁরই। এই কমিটি কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে তাফসীর প্রকাশনার কাজটি হাতে নেয়। এই জন্য আল্লাহর দরবারে কমিটির সবাইর জন্যে এবং তাঁদের সহকর্মীবৃন্দ, বন্ধু-বাঙ্কা, ও পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মোনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাবুল আলামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের মরহুম আবৰা আম্বার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র

রহমত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোয় হাশরের অনন্ত সওয়াব রিসানী এবং বরকতের পীযুষধারায় স্নাতসিঙ্গ করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নসীর করেন। সুন্মা আমীন!

এই খণ্ডলির দ্বিতীয় সংক্রণ থেকে প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিন্যাসের একটু ব্যতিক্রম ঘটলো। প্রথম সংক্রণে সব খণ্ডলো হয়েছে পারা ভিত্তিক কিন্তু এবার হলো সূরা ভিত্তিক। কারণ প্রতি পারায় সমাপ্তির সাথে সাথে খণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটলে সূরার একটা চলমান বিষয়বস্তু হঠাতে করে স্তুত হয়ে যায়। এতে করে পাঠকের মনের কোণে একটা অক্ষুট অত্প্রতি ও অব্যক্ত অস্পষ্টি বিরাজ করে। এই অত্প্রতির নিরসন কল্পনাই সূরা ভিত্তিক প্রকাশনার অবতারণা। তাই চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডলিকে পুনঃবিন্যাস করে সূরা আলে ইমরান, নিসা ও মায়দাহ এক খণ্ডে প্রকাশ করা হল।

ইয়া রাবুল আলামীন! এই তাফসীর তরজমার সকল ক্রটি বিচ্ছুরিত ও ভ্রমপ্রমাদ আমার একান্তই নিজস্ব এবং এর যা কিছু শুভ কল্যাণপ্রদ ও ভালো দিক রয়েছে সেগুলো সবই তোমার নিজস্ব। তাই মেহেরুবানী করে তুমিই আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান করো। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা করুন করো। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্ব পরিকল্পনার সুষ্ঠু পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা ও সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদতম আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের অসীলা করে দাও। আমীন! সুন্মা আমীন!!

এই তাফসীর খণ্ডকে দিনের আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচিত করতে গিয়ে কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি ও সুষ্ঠু মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মণ্ডলান মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেবে এবং আবদুল্লাহ এন্টারপ্রাইজ এর মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ যে কর্তব্য পরায়ণতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা সকল যুগেই দৃষ্টান্তমূলক প্রশংসার দাবিদার। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও সাফিয়া রহমান প্রমুখ আমার সন্তান সন্তুতি আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা কোন ক্রমেই কম নয়। তাই এঁদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রতিনিয়ত দোয়া করছি যেন মহান আল্লাহ এঁদেরকেও কুরআন খিদমতের নেকীতে শামিল করে নেন। আমীন!

### বিন্যাসন্ত

**বর্তমানে**  
তত্ত্বাদ ও সান্তুল হক সেন্টার ইনঃ  
১২৪-০৭, জামাইকা এভিনিউ,  
রিচমিও হিল, নিউইয়র্ক-১১৪১৮  
যুক্তরাষ্ট্র

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান  
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান  
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ  
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

## সূচীপত্রঃ

সূরাঃ আলে ইমরান ৩	(ত্রিয় পারা)	০০৯-১১৫
সূরাঃ আলে ইমরান ৩	(চতুর্থ পারা)	১১৬-২৭২
সূরাঃ নিসা ৪	(চতুর্থ পারা)	২৭৩-৩৪২
সূরাঃ নিসা ৪	(পঞ্চম পারা)	৩৪৩-৬০৭
সূরাঃ নিসা ৪	(ষষ্ঠ পারা)	৬০৮-৬৮০
সূরাঃ মাযিদাহ ৫	(ষষ্ঠ পারা)	৬৮১-৮৯২
সূরাঃ মাযিদাহ ৫	(সপ্তম পারা)	৮৯৩-৯৬০

## سُورَةُ آلِ عِمْرَنَ مَدْنِيَّةٌ (آياتها: ۲۰۰، رُكُوعُها: ۲۰) (আয়াত: ২০০, রুকু: ২০)

এ সূরাটি মদ্নীয় অবতীর্ণ হয়েছিল। এর প্রাথমিক তিরাশিটি আয়াত নাজরানের শ্রীষ্টানদের দৃত সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, যে দৃত হিজরী নবম সনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়। এর বিষ্ণুরিত বিবরণ 'মুবাহালা'র আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ অতিসত্ত্বরই আসছে। এ সূরার ফয়েলত সম্বন্ধে যে হাদীসসমূহ এসেছে ঐগুলো সূরা-ই-বাকারার তাফসীরের প্রারম্ভে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম কর্মণামূল অতি দয়ালু আল্লাহর নামে আরুণ করাই।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১। আলিফ, লাম, মীম।

۱- الْمَلِكُ

২। আল্লাহ ছাড়া কোনই ইলাহ নেই,  
তিনি চিরজীব ও সদা বিরাজমান।

۲- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ  
الْقَيْوَمُ

৩। তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি গ্রহ  
অবতীর্ণ করেছেন, যা পূর্ববর্তী  
বিষয়ের সত্যতা প্রতিপাদনকারী।  
এবং তিনি তাওরাত ও ইঞ্জিল  
অবতীর্ণ করেছিলেন-

۳- نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ  
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ وَأَنْزَلَ  
الْتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

৪। ইতেপূর্বে মানবমন্দীর জন্য  
সংগ্রহ প্রদর্শনের জন্য। আর  
তিনিই ফুরুকান অবতীর্ণ করেছেন।  
যারা আল্লাহর নির্দর্শনাবলীর প্রতি  
অবিশ্঵াস করে নিষ্ঠারই তাদের জন্য  
যায়েছে কঠোর শাস্তি এবং আল্লাহ  
মহাপ্রাত্মক, প্রতিশেধগ্রহণকারী।

۴- مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ  
الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاِيمَانِ  
اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ دُو اِنْتَقامٌ

পূর্বেই আয়াতুল কুরসীর তাফসীরের বর্ণনায় এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, ইস্ম-ই-আয়ম এ আয়াতের মধ্যে ও আয়াতুল কুরসীর মধ্যে রয়েছে। <sup>الْمَ</sup>-এর তাফসীর সূরা-ই-বাকারার প্রারম্ভে লিখা হয়েছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। <sup>وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيْمُونُ</sup>-এর তাফসীরও আয়াতুল কুরসীর তাফসীরে লিখা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘হে মুহাম্মদ (সঃ)! আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর সত্ত্বের সঙ্গে কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। বরং নিশ্চয়ই ওটা আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে এসেছে, যা তিনি স্বীয় জ্ঞানের সাথে অবতীর্ণ করেছেন। ফেরেশতাগণ এর উপর সাক্ষী রয়েছেন এবং আল্লাহর সাক্ষাত যথেষ্ট। কুরআন মাজীদ তার পূর্বের সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা স্বীকারকারী এবং ঐ কিতাবগুলো এ কুরআন কারীমের সত্যতার উপর দলীল স্বরূপ। কেননা, ঐগুলোর মধ্যে নবী (সঃ)-এর আগমন এবং এ কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার যে সংবাদ ছিল তা সত্যরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। তিনিই হ্যরত মূসা ইবনে ইমরান (আঃ)-এর উপর তাওরাত এবং হ্যরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-এর উপর ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছিলেন। এ দু'টোও সে যুগীয় লোকদের জন্যে পথ-প্রদর্শক ছিল।

তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যা সত্য ও মিথ্যা, সুপথ ও ভ্রান্ত পথের মধ্যে পার্থক্য আনয়নকারী। ওর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীলগুলো প্রত্যেকের জন্যে যথেষ্ট হয়ে থাকে। হ্যরত কাতাদাহ (রঃ) এবং হ্যরত রাবী’ ইবনে আনাস (রঃ) বর্ণনা করেন যে, এখানে ফুরকানের ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন। যদিও এটা <sup>مَصْدَرْ</sup>, কিন্তু এর পূর্বে কুরআনের বর্ণনা হয়েছে বলে এখানে <sup>فِرْقَانٌ</sup> বলেছেন। হ্যরত আবু সালিহ (রঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, ফুরকানের ভাবার্থ হচ্ছে ‘তাওরাত’, কিন্তু এটা দুর্বল। কেননা, তাওরাতের বর্ণনা এর পূর্বে হয়েছে। কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসকারী এবং বাতিলপন্থীদের কঠিন শাস্তি হবে। আল্লাহ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী ও বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী। যারা মহা সম্মানিত নবী ও রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহর আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ণভাবে তাদের প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৫। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট  
ভূমঙ্গল ও নতোমঙ্গলের কোন  
বিষয়ই লুকায়িত নেই।

৫- إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفِي عَلَيْهِ شَيْءٌ  
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ  
٦- هُوَ الَّذِي يَصْوِرُ كُمْ فِي  
الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا  
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

৬। তিনিই স্থীয় ইচ্ছান্বয়ায়ী জরায়ুর  
মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন  
করেছেন। তিনি ব্যতীত  
ব্যতীত কোনই উপাস্য নেই,  
তিনি পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর কোন বস্তুই তাঁর  
নিকট লুকায়িত নেই, বরং সব কিছুরই তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি  
বলেন-‘আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের জরায়ুর মধ্যে আকৃতি  
বিশিষ্ট করেছেন। তিনি যেভাবেই আকৃতি গঠনের ইচ্ছে করেছেন তাই  
করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই। তিনি মহা  
পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। একমাত্র তিনিই যখন তোমাদের আকৃতি গঠন  
করতঃ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তখন তোমরা একমাত্র তাঁর ইবাদত ছাড়া  
অন্যের ইবাদত করবে কেন? তিনি অবিনষ্ট সম্মান ও ধৰ্মসহীন জ্ঞানের  
অধিকারী।’ এতে ইঙ্গিত রয়েছে এমন কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, হ্যরত  
ঈসাও (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি এবং তাঁরই পদপ্রাপ্তে মস্তক অবনতকারী।  
সমস্ত মানুষের ন্যায় তিনিও একজন মানুষ। তাঁর আকৃতিও আল্লাহ তা'আলা  
তাঁর মায়ের জরায়ুর মধ্যে গঠন করেছিলেন এবং তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমেই সৃষ্টি  
হয়েছেন। সুতরাং তিনি কিরূপে আল্লাহ হয়ে গেলেন, যেমন অভিশঙ্গ শ্রীষ্টানেরা  
মনে করে নিয়েছে? অথচ তিনিইতো তোমাদেরকে তোমাদের এক অবস্থা হতে  
অন্য অবস্থার দিকে ফিরিয়ে থাকেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে-

بَلْ قَمْكِمْ فِي بَطْوَنِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقَ أَمْنَ بَعْدَ خَلْقِ فِي ظُلْمِتِ ثَلَثٍ

অর্থাৎ ‘তিনিই তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেটে তিন তিনটি  
অঙ্ককারের মধ্যে এক সৃষ্টির পর অন্য সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টি করে থাকেন।’  
(৩৯ঃ ৬)

৭। তিনিই তোমার প্রতি গ্রহ  
অবতীর্ণ করেছেন, যাতে  
সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ রয়েছে-  
ওগুলো থেকের জননী স্বরূপ  
এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ  
অস্পষ্ট; অতএব যাদের অন্তরে  
বক্তা রয়েছে, ফলতঃ তারাই  
অশাস্তি উৎপাদন ও ব্যাখ্যা  
বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে অস্পষ্টের  
অনুসরণ করে এবং আল্লাহ  
ব্যক্তিত ওর অর্থ কেউই  
অবগত নয়; আর যারা জানে  
সুপ্রতিষ্ঠিত তারা বলে- আমরা  
ওতে বিশ্বাস করি, সমস্তই  
আমাদের প্রতিপালকের নিকট  
হতে সমাগত এবং জ্ঞানবান  
ব্যক্তিত কেউই উপদেশ গ্রহণ  
করে না।

৮। হে আমাদের প্রতিপালক!  
আমাদের পথ-প্রদর্শনের পর  
আমাদের অন্তরসমূহ বক্ত  
করবেন না এবং আমাদেরকে  
আপনার নিকট হতে করুণা  
প্রদান করুন, নিশ্চয়ই আপনি  
সুপ্রচুর প্রদানকারী।

৯। হে আমাদের প্রতিপালক!  
নিশ্চয়ই আপনি সকল  
মানুষকে সমবেতকারী-ঐ দিন  
যাতে একটুও সন্দেহ নেই,  
নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিজ্ঞা  
ভঙ্গকারী নন।

- ৭ -  
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ  
مِنْهُ أَيْتُ مُّحَكَّمٌ هُنَّ أَمْ  
الْكِتَبُ وَآخَرُ مُتَشَبِّهٌ فَامَّا  
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَغَّ  
فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ  
أَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَأَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ  
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهِ إِلَّا اللَّهُ  
وَالرَّسُولُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ  
إِنَّمَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رِبِّنَا وَمَا  
يَذْكُرُ إِلَّا أَوْلُوا الْأَلْبَابُ

- ৮ -  
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اذْ  
هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ  
رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ

- ৯ -  
رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ  
لَا رَبَّ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ  
الْمِيعَادَ

এখানে বর্ণিত হচ্ছে যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে এমন আয়াতও রয়েছে যেগুলোর বর্ণনা খুবই স্পষ্ট ও অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সরল ও সহজ। প্রত্যেকেই গুলোর ভাবার্থ অনুধাবন করতে পারে। আবার কতগুলো আয়াত একুশে রয়েছে যেগুলোর ভাবার্থ সাধারণতঃ বোধগম্য হয় না। এখন যারা দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতগুলোকে প্রথম প্রকারের আয়াত সমূহের দিকে ফিরিয়ে থাকে, অর্থাৎ যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের স্পষ্টতা যে আয়াতের মধ্যে প্রাণ হয় তাই গ্রহণ করে থাকে, তারাই সঠিক পথের উপর রয়েছে। আর যারা স্পষ্ট আয়াতগুলোকে ছেড়ে এমন আয়াতগুলোকে দলীলরূপে গ্রহণ করে থাকে, যেগুলো তাদের জ্ঞানের উর্ধ্বে এবং গুলোর মধ্যেই জড়িত হয়ে পড়ে, তারা ওরাই যারা মুখের ভরে পতিত হয়েছে। **أَم الْكِتَبُ** অর্থাৎ মূল ও ভিত্তি। ঐগুলো আল্লাহর কিতাবের পরিষ্কার ও স্পষ্ট আয়াতসমূহ।

‘তোমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়ো না, বরং স্পষ্ট আয়াতসমূহের প্রতিই আমল কর, ঐগুলোকেই মীমাংসাকারী হিসেবে গ্রহণ কর।’ ‘কৃতগুলো আয়াত এমনও রয়েছে যে, ঐগুলোর একটি অর্থ তো স্পষ্ট আয়াত সমূহের মতই কিন্তু এই অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। একুশে অস্পষ্ট আয়াত সমূহের পিছনে পড়ো না।’ পূর্ববর্তী মনীষীগণ হতে **مُتَشَابِهٌ** ও **مُحْكَمٌ** শব্দসম্মত বহু অর্থ নকল করা হয়েছে। হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন যে, **مُحْكَمَاتٍ** হচ্ছে রহিতকারী আয়াতগুলো, যেগুলোর মধ্যে হালাল, হারাম, আদেশ, নিষেধ এবং আমল সমূহের বর্ণনা থাকে। হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, **قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمْنَا عَلَيْكُمْ لَا تَسْرِكُوا بِهِ شَيْئًا** (৬: ১৫১) এবং এর পরবর্তী হুকুমের আয়াতগুলো হচ্ছে মুহকামাত এবং **وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا مِنِّي** (১৭: ২৩) ও এর পরবর্তী তিনটি আয়াত মুহকামাত। হ্যরত আবু ফাকতাহ (রঃ) বলেন যে, এগুলো সূরাসমূহের সূচনা। হ্যরত ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার (রঃ) বলেন যে, এগুলো হচ্ছে ফরয়সমূহ, নির্দেশাবলী, বাধা-নিষেধ এবং হালাল ও হারামের আয়াতসমূহ। হ্যরত সান্দ ইবনে যুবাইর (রঃ) বলেন, ‘এ আয়াতগুলোকে কিতাবের মূল বলার কারণ এই যে, এগুলো সমগ্র কিতাবের মধ্যে রয়েছে।’ হ্যরত মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, সমস্ত মায়হাবের লোক এগুলোকে স্বীকার করে বলে এগুলোকে কিতাবের মূল বলা হয়। **مُتَشَبِّهَاتٍ** এই আয়াতগুলোকে বলা হয় যেগুলো রহিত হয়ে গেছে। যেগুলোর পূর্বের ও পরের, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে দৃষ্টান্তসমূহ এবং যেগুলো দ্বারা শপথ করা হয়েছে।

ঐগুলোর উপর শুধুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। আমল করার জন্যে ঐগুলো আহকাম নয়। হ্যরত ইবনে আব্বাসেরও (রাঃ) উকি এটাই। হ্যরত মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, ঐগুলো হচ্ছে সূরাসমূহের প্রথমে লিখিত <sup>৭</sup> حُرُوف مَقْطَعَاتٍ। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন, <sup>৮</sup> مُتَشَبِّهَاتٍ আয়াতগুলো একে অপরের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে (কিবা مُتَشَابِهًا مَثَانِيًّا) (৩৯: ২৩) এবং এটাও উল্লিখিত হয়েছে যে, এটা এমন এক বাক্য যা একই রচনা রীতির অধীনস্থ হয়। আর <sup>৯</sup> ওকেই বলা হয় যেখানে দু'টি বিপরীতমুখী জিনিসের উল্লেখ থাকে। যেমন জান্নাত ও জাহান্নামের বিশেষণ বর্ণনা এবং পাপ-পুণ্যের অবস্থা বর্ণনা ইত্যাদি। এ আয়তে <sup>১০</sup> مُتَشَابِهٌ শব্দটি <sup>১১</sup> مُحْكَمٌ শব্দের বিপরীত শব্দকূপে এসেছে। এ জন্যেই আমরা যে ভাবার্থ বর্ণনা করেছি ওটাই সঠিক। এটাই হ্যরত মুহাম্মদ ইবনে ইয়াসারেরও (রঃ) উকি। তিনি বলেন যে, ঐগুলো হচ্ছে প্রভুর দলীল স্বরূপ। ঐগুলোর মধ্যে বান্দাদের রক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং বিবাদ ও বাতিলের মীমাংসা রয়েছে। ঐগুলোর প্রকৃত ভাবার্থ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। <sup>১২</sup> আয়াতগুলোর সত্যতার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া উচিত নয়। এ আয়াতগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন, যেমন পরীক্ষা করে থাকেন হালাল ও হারাম দ্বারা। আয়াতগুলোকে সত্য হতে ফিরিয়ে দিয়ে অসত্যের দিকে নিয়ে যাওয়া মোটেই উচিত নয়।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, অর্থাৎ যারা সত্য পথ ছেড়ে দিয়ে ভ্রান্তির পথে গমন করে তারাই এ অস্পষ্ট আয়াতগুলোর মাধ্যমে স্বীয় জগন্য উদ্দেশ্যাবলী পুরো করতে চায় এবং শান্তিক অনৈক্য হতে অবৈধ উপকার গ্রহণ করতঃ নিজের দিকে ফিরিয়ে নেয়। স্পষ্ট আয়াত সমূহ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য পুরো হয় না। কেননা, ঐগুলোর শব্দসমূহ সম্পূর্ণ স্পষ্ট এবং একেবারে খোলাখুলি। তারা ঐগুলো সরাতেও পারে না এবং ওগুলোর মধ্যে নিজেদের অনুকূলে কোন দলীলও প্রাপ্ত হয় না। এ জন্যেই ঘোষণা হচ্ছে যে, এর দ্বারা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে অশান্তি উৎপাদন, যেন তারা স্বীয় অধীনস্থ লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। তারা নিজেদের বিদআতের দলীল কুরআন পাক থেকেই নিতে চায়, অথচ কুরআন মাজীদতো বিদআতকে খণ্ড করে থাকে। যেমন শ্রীষ্টানেরা হ্যরত ইসা (আঃ)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র (নাউজুবিল্লাহ) সাব্যস্ত করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের رُوح اللّٰهِ<sup>১৩</sup> শব্দকে দলীল

রূপে গ্রহণ করেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, তারা এ অস্পষ্ট আয়াতটিকে গ্রহণ করতঃ নিম্নলিখিত স্পষ্ট আয়াতগুলোকে পরিত্যাগ করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বলেনঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

অর্থাৎ ‘সে ঈসা (আঃ) একজন দাস ছাড়া কিছুই নয়, তাকে আমি পুরস্কৃত করেছি।’ (৪৩: ৫৯) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمُثَلِّ ادْمَ حَلْقَةً مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ -

অর্থাৎ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসা (আঃ) এর দৃষ্টান্ত আদম (আঃ)-এর মতই, তাকে (আদম আঃ) তিনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে বলেছেন- ‘হও’ তেমনই হয়ে গেছে।’ (৩: ৫৯) এ প্রকারের আরও বহু স্পষ্ট আয়াত রয়েছে। কিন্তু এসবকে ছেড়ে দিয়ে অভিশঙ্গ খ্রিস্টানেরা অস্পষ্ট আয়াত দ্বারা হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাকের পুত্র হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছে। অথচ তিনি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি, তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর বলা হচ্ছে- ‘অস্পষ্ট আয়াতগুলোর পিছনে পড়ার তাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, অর্থ পরিবর্তন করা এবং ঐগুলোকে স্বীয় স্থান হতে সরিয়ে দেয়া।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ ‘যখন তোমরা ঐ লোকদেরকে দেখ যারা অস্পষ্ট আয়াতগুলো নিয়ে ঝগড়া করে তখন তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ কর। এ আয়াতে ঐগুলোকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।’ এ হাদীসটি বিভিন্ন পন্থায় বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। ছইহ বুখারী শরীফেও এ হাদীসটি ‘কিতাবুল কাদরে’র মধ্যে এ আয়াতেরই তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, এগুলো খারেজী ছিল। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) এ হাদীসটিকে ‘মাওকুফ’ মনে করা হলেও এর বিষয়বস্তু বিশুদ্ধ। কেননা, প্রথম বিদআত তারাই ছড়িয়েছিল। এ দলটি শুধুমাত্র ইহলোকিক দুঃখের কারণে মুসলমানগণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন হনাইন যুদ্ধের যুদ্ধলক্ষ দ্রব্য বন্টন করেন তখন ঐ লোকগুলো ঐ বন্টনকে অন্যায় মনে করেছিল। তাদের মধ্য হতে যুল খুয়াইসির নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে এসে পরিকারভাবে বলেই দেয়ঃ ‘ন্যায়নীতি অবলম্বন করুন। এ বন্টনে আপনি সুবিচার প্রদর্শন করেননি।’ তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘আল্লাহ তো আমাকে বিশ্বস্ত রূপে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমিই যদি সুবিচার না করি তবে তো তুমি ধৰ্স ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’ সে ফিরে গেলে হ্যরত উমার (রাঃ) আবেদন করেনঃ ‘হে

আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তাকে হত্যা করে ফেলি, আপনি আমাকে এ অনুমতি প্রদান করুন।'

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'ছেড়ে দাও, তার বংশ হতে এমন এক সম্প্রদায় বের হবে যে, তোমরা তোমাদের নামাযকে তাদের নামাযের তুলনায় এবং তোমাদের কুরআন পাঠকে তাদের কুরআন পাঠের তুলনায় নিকৃষ্ট মনে করবে। প্রকৃতপক্ষে তারা ধর্ম হতে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার হতে বেরিয়ে যায়। তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে। যারা তাদেরকে হত্যা করবে তাদের জন্যে বড় পুণ্য রয়েছে'। হ্যরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে তাদের আবির্ভাব ঘটে। তিনি তাদেরকে নাহরাওয়ানে হত্যা করেন। অতঃপর তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদী দলের সৃষ্টি হয়। ধর্মের মধ্যে তারা নতুন বিদআত চালু করে এবং আল্লাহর পথ হতে বহু দূরে সরে পড়ে। তাদের পরে কাদরিয়্যাহ দলের আবির্ভাব হয়। তার পরে বের হয় মুতাফিলা সম্প্রদায়। তার পরে জাহমিয়্যাহ ইত্যাদি দলের উত্তর হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্ন বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। তিনি বলেনঃ 'আমার উম্মতের মধ্যে অতিসত্ত্বরই তেহাত্তরটি দলের আবির্ভাব ঘটবে। একটি দল ছাড়া সবই জাহানামী হবে।' সাহাবীগণ (রাঃ) জিজেস করেন, প্রটি কোনু দলঃ তিনি বলেনঃ 'তারা ওরাই যারা এমন জিনিসের উপর রয়েছে যার উপর আমি রয়েছি এবং আমার সাহাবীগণ (রাঃ) রয়েছে।' (মুসতাদরিক-ই-হাকিম) আবু ই'য়ালার হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা কুরআন মাজীদ তো পাঠ করবে, কিন্তু ওটা এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলবে যেমন কেউ খেজুরের আঁচি ছুঁড়ে ফেলে। ওর ভুল অর্থ বর্ণনা করবে।'

اللَّهُ أَكْبَرُ

অতঃপর বলা হচ্ছে- 'ওর প্রকৃত ভাবার্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন'। শব্দের উপর বিরতি আছে কি নেই, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস (রাঃ) বলেনঃ 'চার প্রকারের তাফসীর রয়েছে। (১) প্রথম হচ্ছে ঐ তাফসীর যা সবাই বুঝতে পারে। (২) দ্বিতীয় ঐ তাফসীর যা আরববাসী নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে অনুধাবন করে থাকে। (৩) তৃতীয় ঐ তাফসীর যা শুধুমাত্র বড় বড় পণ্ডিগণই বুঝে থাকেন। (৪) চতুর্থ ঐ তাফসীর যা শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন, অন্য কেউ জানে না। এটা পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে।

হয়রত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখেরও এটাই উক্তি। মু'জাম-ই-কাবীর গ্রন্থে হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের উপর আমার শুধু তিনটি, জিনিসের ভয় রয়েছে। (১) প্রথম ভয় মালের আধিক্যে। কেননা, এরই কারণে হিংসা বিদ্রোহের সৃষ্টি হবে এবং পরম্পরের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়ে যাবে। (২) দ্বিতীয় ভয় এই যে, তারা আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যার পিছনে লেগে পড়বে, অথচ ওর প্রকৃত ভাবার্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন। আর যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী তারা বলে ওর উপর আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। (৩) তৃতীয় ভয় এই যে, তারা বিদ্যা অর্জন করে তা নষ্ট করে দেবে এবং কোনই গ্রাহ্য করবে না।' এ হাদীসটি সম্পূর্ণ গারীব। অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'কুরআন কারীম এ জন্যে অবতীর্ণ হয়নি যে, একটি আয়াত অন্য আয়াতের বিপরীত হবে। যা তোমরা বুঝতে পার তার উপর আমল কর এবং যা অস্পষ্ট তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।' (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই) হযরত ইবনে আবুবাস (রাঃ), হযরত উমার ইবনে আবদুল আয়ীয় (রঃ) এবং হযরত মালিক ইবনে আনাস (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে যে, গভীর জ্ঞানের অধিকারী লোকেরাও এর প্রকৃত অর্থ অবগত হন না। তবে তাঁরা ওর উপর বিশ্বাস রাখেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এর জটিল ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরা ঐ কথাই বলেন যে, ওগুলোর উপর তাঁদের ঈমান রয়েছে। হযরত উবাই ইবনে কা'বও (রাঃ) একথাই বলেন। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটাই পছন্দ করেন। এ উক্তিগুলো হচ্ছে ঐ দলের যাঁরা (اللّٰهُ لَّهُ) শব্দের উপর বিরতি আনয়ন করতঃ পরবর্তী বাক্যকে এর থেকে পৃথক করে থাকেন। অন্য একটি দল (اللّٰهُ لَّهُ) শব্দের উপর বিরতি না এনে (فِي الْعِلْمِ) শব্দের উপর বিরতি এনে থাকেন (ওয়াক্ফ করে থাকেন)।

অধিকাংশ ব্যাখ্যাতা ও শাস্ত্রের মূলনীতির উপর পাণ্ডিত্য অর্জনকারী ব্যক্তিগণও একথাই বলেন। তাঁদের বড় দলীল এই যে, যে কথা বোধগম্য নয় তা বলা ঠিক নয়। হযরত ইবনে আবুবাস (রাঃ) বলতেনঃ 'জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি একজন।' হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন, পরিপক্ষ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিগণও অস্পষ্ট আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা জানেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে যুবাইর (রঃ) বলেনঃ 'প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং ভাবার্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন এবং যাঁরা জ্ঞানে পরিপক্ষ তাঁরা বলেনঃ 'আমরা ঐগুলোর উপর ঈমান এনেছি'। অতঃপর তাঁরা স্পষ্ট আয়াতের দ্বারা অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা করে থাকেন। ফলে কারও মুখ খোলার প্রশ্নই উঠে না। অথচ

কুরআন কারীমের বিষয়বস্তু ও যথার্থ হয়ে যায়, দলীল চালু হয়, অন্যায় পরিত্যক্ত হয় এবং কুফর বিদূরতি হয়।' হাদীস শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর জন্যে প্রার্থনা করেছিলেনঃ 'হে আল্লাহ! তাকে আপনি ধর্মের বোধ এবং তাফসীরের জ্ঞান দান করুন।' কতক আলেম এখানে বিশ্লেষণ করে বলেন যে, 'تَأْوِيلٌ' শব্দটি কুরআন মাজীদের মধ্যে দু'টি অর্থে এসেছে। একটি অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসের মূলতত্ত্ব ও যথার্থতা। যেমন কুরআন কারীমের মধ্যে রয়েছেঃ 'يَابْتَ هَذَا تَأْوِيلُ رِءَبَّىٰيَ' অর্থাৎ 'হে পিতঃ! এটাই আমার স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা'। (১২ঃ ১০০) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'هُلْ تَأْوِيلٌ لِّيَنْظَرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَاتِي تَأْوِيلُهُ' শব্দের ভাবার্থ এটাই নেয়া হয় তবে অপেক্ষা করছে, যেদিন ওর যথার্থতা এসে যাবে'। (৭ঃ ৫৩) সুতরাং এ দু' জায়গায় 'تَأْوِيلٌ' শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে মূলতত্ত্ব বা যথার্থতা। যদি এ পবিত্র আয়াতের 'تَأْوِيلٌ' শব্দের ভাবার্থ এটাই নেয়া হয় তবে  $\text{اللّٰهُ أَكَلٰهُ}$ , শব্দের উপর ওয়াক্ফ করা জরুরী। কেননা, কোন কার্যের মূলতত্ত্ব ও যথার্থতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। 'يَقُولُونَ امْنًا رَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ' উদ্দেশ্য হবে এবং বিধেয় হবে আর এ বাক্যটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক হবে। 'تَأْوِيلٌ' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এবং একটি জিনিস দ্বারা অন্য জিনিসের ব্যাখ্যা করা। যেমন কুরআন মাজীদে রয়েছে- 'أَنْبَتَنَا بِتَأْوِيلِهِ' অর্থাৎ, 'আমাদেরকে ওর ব্যাখ্যা বলুন।' (১২ঃ ৩৬) যদি উপরোক্ত আয়াতে 'تَأْوِيلٌ' শব্দের এ অর্থ নেয়া হয় তবে অপেক্ষা শব্দের উপর ওয়াক্ফ করা উচিত। কেননা, জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ জানেন ও বুঝেন। আর সম্বোধনও তাঁদেরকেই করা হয়েছে, যদিও মূলতত্ত্বের জ্ঞান তাঁদের নেই। এক্ষণ হলে 'أَمْنًا بِهِ' শব্দটি হাল হবে। আবার 'مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ' হাড়াই হতে পারে, যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে 'مَعْطُوفٌ عَلَى الْفَقَرَاءِ الْمَهَاجِرِينَ' অর্থাৎ 'যে স্থানে রয়েছে পর্যন্ত অন্য স্থানে রয়েছে এবং আগুনে পুনৰ্বিনাশ হতে পারে'। (৫৯ঃ ৮-১০) পর্যন্ত অন্য স্থানে রয়েছেঃ 'يَقُولُونَ رِبَّنَا أَغْفِرْنَا وَجَاءَ رَبَّكُمْ' (৫৯ঃ ২২) অর্থাৎ এ রকম ছিল। জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের পক্ষ হতে এ সংবাদ প্রদান-'আমরা ওর উপর ঈমান এনেছি' এর অর্থ এই যে, তাঁরা অস্পষ্ট আয়াত সমূহের উপর ঈমান এনেছেন। অতঃপর তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, এ সবগুলোই অর্থাৎ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট আয়াতসমূহ সবগুলোই সত্য এবং একে অপরের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। আর তাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, সমস্ত আয়াতই আল্লাহ

তা'আলার নিকট হতে এসেছে। ঐগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য কিছুই নেই। যেমন এক জায়গায় রয়েছে:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِدُوا  
فِيهِ اخْلَاقًا كَيْرًا

অর্থাৎ 'তারা কি কুরআন সম্বন্ধে গবেষণা করে না? যদি এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে হতো তবে অবশ্যই তারা এর মধ্যে বহু মতভেদ পেতো।' (৪: ৮২) এ জন্যেই এখানেও বলেছেন- 'এটা শুধুমাত্র জ্ঞানীরাই অনুধাবন করে থাকে, যারা এ সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে, যাদের জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যারা স্থির মন্তিষ্ঠ সম্পন্ন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজেস করা হয়েছিলঃ 'পরিপক্ষ জ্ঞানের অধিকারী কে?' তিনি উত্তরে বলেনঃ 'যার শপথ সত্য, যে স্থির মন্তিষ্ঠ বিশিষ্ট, যার কথা সত্য, যার অন্তর পরিশুম্বন্দ, যার পেট হারাম থেকে রক্ষিত এবং যার লজ্জাস্থান ব্যক্তিচার হতে মুক্ত সেই পরিপক্ষ জ্ঞানের অধিকারী।' (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কতক লোককে দেখেন যে, তারা কুরআন মাজীদ সম্বন্ধে ঝাগড়ায় লিঙ্গ রয়েছে। তিনি তাদেরকে বলেনঃ 'জেনে রেখো যে, তোমাদের পূর্ববর্তী জ্ঞানের এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা আল্লাহর কিতাবের আয়াত সমূহকে পরম্পর বিব্রংধি রলতো। অথচ তাঁর কিতাবের প্রতিটি আয়াত অন্য আয়াতের সত্যতা প্রতিপন্ন করে। তোমরা আল্লাহ তা'আলার কিতাবের ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি করে একটিকে অন্যটির বিপরীত বলো না। যা জান তা বল এবং যা জান না তা জ্ঞানীদের উপর সমর্পণ কর।' (মুসনাদ-ই-আহমাদ) অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'কুরআন সাত অক্ষরে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনের ব্যাপারে ঝাগড়া করা কুফর। (এ কথা তিনবার বলেন) যা জান তার উপর আমল কর এবং যা জান না তা জ্ঞানীদের উপর সমর্পণ কর।' (অবু ইয়া'লা) হযরত নাফে' ইবনে ইয়ায়ীদ (রঃ) বলেন, 'জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁরাই যাঁরা বিনয়ী, যাঁরা নম্মতা প্রকাশ করেন, প্রভুর সন্তুষ্টি কামনা করেন, বড়দেরকে বশীভৃত করেন না এবং ছোটদেরকে ঘৃণা করেন না।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রভু! সুপথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে ওসব লোকের অন্তরের ন্যায় করবেন না যারা অস্পষ্ট আয়াত সমূহের পিছনে পড়ে বিপথগামী

হয়ে থাকে। বরং আমাদেরকে সরল-সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, দৃঢ় ধর্মের উপর কায়েম রাখুন, আমাদের উপর আপনার করুণা বর্ষণ করুন, আমাদের অন্তর ঠিক রাখুন, আমাদের বিক্ষিপ্ততা দূর করুন এবং আমাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দিন। নিশ্চয়ই আপনি সুপ্রচুর প্রদানকারী।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রার্থনা করতেনঃ

يَا مُقْلِبَ الْقُلُوبِ ثِبْتْ قَلْبِيْ عَلَى دِينِكَ

অর্থাৎ 'হে অন্তরের পরিবর্তন আনয়নকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।' অতঃপর তিনি (رَسَّا لَا تُرْغِبُنَا)-এ আয়াতটি পাঠ করতেন। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রায়ই নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেনঃ

اللَّهُمَّ مُقْلِبَ الْقُلُوبِ ثِبْتْ قَلْبِيْ عَلَى دِينِكَ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! হে অন্তর সমূহের পরিবর্তন আনয়নকারী! আমার অন্তরকে আপনার ধর্মের উপর স্থির রাখুন।' হ্যরত আসমা (রাঃ) একদা তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'অন্তরের কি পরিবর্তন হয়ে থাকে?' তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ, প্রত্যেক মানুষের অন্তর আল্লাহ তা'আলার অঙ্গুলি সমূহের দুই অঙ্গুলির মধ্যে রয়েছে। তিনি ইচ্ছে করলে ঠিক রাখেন এবং ইচ্ছে করলে বক্র করে দেন। আমাদের প্রার্থনা এই যে, আমাদের অন্তরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আল্লাহ তা'আলা যেন তা বক্র না করেন এবং তিনি যেন আমাদের উপর করুণা বর্ষণ করেন। তিনি প্রচুর প্রদানকারী।' অন্য বর্ণনায় এও রয়েছে, আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যা আমি নিজের জন্যে করতে থাকবো। তিনি বলেনঃ 'এই প্রার্থনা করঃ

اللَّهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ  
وَأَجْرِنِيْ مِنْ مُضَلَّاتِ الْفِتْنِ -

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ, হে নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রভু! আমার পাপ মার্জনা করুন, আমার অন্তরের ক্রোধ, দুঃখ কাঠিন্য দূর করুন এবং আমাকে পথভ্রষ্টকারী ফিতনা হতে বাঁচিয়ে নিন।' হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকাও (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পাঠ মুক্তি দেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ উত্তরই দেন। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করে শুনান। এ হাদীসটি গারীব। কিন্তু সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এটা বর্ণিত হয়েছে, তবে কুরআন কারীমের এ

আয়াতটি পাঠ করার উদ্দেশ্য নেই। সুনান-ই-নাসাঈ ইত্যাদির মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন রাত্রে জাগরিত হতেন তখন তিনি নিম্নের দু'আটি পড়তেনঃ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَاسْأَلُكَ رَحْمَةً。 اللَّهُمَّ  
رَزْدِنِي عِلْمًا وَلَا تُرْزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لِدْنِكَ رَحْمَةً  
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট আমার পাপের ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার নিকট করুণা যাঞ্জলি করছি। হে আল্লাহ! আমার বিদ্যা বাড়িয়ে দিন এবং সুপথ প্রদর্শনের পর আমার অন্তরকে বক্র করবেন না ও আপনার নিকট হতে আমাকে রহমত দান করুন, আপনি সুপ্রচুর দানকারী'। হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) মাগরিবের নামায পড়ান। প্রথম দু'রাক'আতে আলহামদু শরীফের পর তিনি মুফাসসালের ছোট দু'টি সূরা পাঠ করেন এবং তৃতীয় রাক'আতে আলহামদু শরীফের পর এ আয়াতটি পাঠ করেন। হ্যরত আবু আবদুল্লাহ (রঃ) বলেন, 'আমি সে সময় তাঁর নিকটেই চলে গিয়েছিলাম, এমন কি আমার কাপড় তাঁর কাপড়ের সাথে লেগে গিয়েছিল এবং আমি স্বয়ং তাঁকে এ আয়াতটি পড়তে শুনেছি। (মুসনাদ-ই-আবদুর রাজ্জাক) হ্যরত উমার ইবনে আবদুল আয়ীয় (রঃ) এ হাদীসটি শুনার পূর্ব পর্যন্ত মাগরিবের তৃতীয় রাক'আতে (قُلْ هُوَ اللَّهُ ) পাঠ করতেন। কিন্তু এ হাদীসটি শ্রবণের পর তিনিও এ রাক'আতে এ আয়াতটি পড়তে আরম্ভ করেন এবং কথনও পরিত্যাগ করেননি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি কিয়ামতের দিন স্মরণ মানুষকে সমবেতকারী এবং তাদের মধ্যে হৃকুম ও ফায়সালাকারী। আপনিই সকলকে তাদের ভাল-মন্দ কার্যের বিনিময় প্রদানকারী। ঐদিনের আগমনে এবং আপনার অঙ্গীকারের সত্যতায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।'

১০। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস  
করেছে, তাদের ধন-সম্পদ ও  
তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর

۱۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي  
عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ

নিকট কোন বিষয়েই ফলপ্রদ  
হবে না এবং তারাই  
জাহানামের ইঙ্কান।

اللَّهُ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُوْدُ  
النَّارِ

১১। ফিরআউন সম্প্রদায় এবং  
তাদের পূর্ববর্তীদের প্রকৃতির  
ন্যায় তারা আমার আয়াত  
সমূহের প্রতি অসত্যারোপ  
করেছে, এই হেতু আল্লাহ  
তাদের অপরাধের জন্যে  
তাদেরকে ধূত করেছেন এবং  
আল্লাহ কঠোর শান্তিদাতা।

۱۱- كَدَابِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِاِيْتِنَا  
فَآخَذْهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, অস্তীকারকারীরা জাহানামের জ্বালানী কাষ্ট হবে।  
সেদিন ঐ অত্যাচারীদের ওয়র কৈফিয়ত কোন কাজে আসবে না। তাদের উপর  
আল্লাহর অভিসম্পাত এবং তাদের জন্যে জঘন্য বাসস্থান রয়েছে। সেদিন তাদের  
ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনই উপকার করতে পারবে না, তাদেরকে  
আল্লাহ তা'আলার শান্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না। যেমন অন্য জায়গায়  
বলেছেনঃ ‘তাদের ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততির উপর বিশ্বয়বোধ করো না,  
আল্লাহ ওর কারণে তাদেরকে দুনিয়ায় শান্তি দিতে চান, কুফরীর অবস্থাতেই  
তাদের প্রাণ বহিগত হবে।’

অন্য স্থানে রয়েছেঃ ‘তাদের শহরে ঘুরাফেরা যেন তোমাদের প্রতারিত না  
করে, এ পুঁজি অল্লাদিনের, অতঃপর তাদের বাসস্থান জাহানাম এবং ওটা  
জঘন্যতম স্থান।’ অনুরূপ এখানেও বলা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার কথা  
অস্তীকারকারী, তাঁর রাসূল (সঃ)-কে অমান্যকারী, তাঁর কিতাবের বিরোধী,  
অহীর অবাধ্য তারা যেন তাদের মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা কোন মঙ্গলের  
আশা না করে। তারা জাহানামের জ্বালানী কাষ্ট, তাদের দ্বারা জাহানাম  
প্রজ্ঞালিত করা হবে।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ ‘তোমরা ও তোমাদের  
উপাস্যেরা জাহানামের জ্বালানী কাষ্ট।’ মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে  
রয়েছে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মা হ্যরত উম্মে ফয়ল  
(রাঃ) বর্ণনা করেনঃ ‘মক্কা শরীফে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক রাত্রে দাঁড়িয়ে উচ্চস্থরে

বলেনঃ ‘হে জনমগুলী! আমি কি আল্লাহর কথা তোমাদের নিকট পৌছিয়ে দিয়েছি? হে জনগণ! আমি কি প্রচারকার্য চালিয়েছি? হে লোক সকল! আমি কি একত্র ও রিসালাত তোমাদের নিকট পৌছিয়ে দিয়েছি?’ হ্যরত উমার (রাঃ) তখন বলেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর দ্বীন আমাদের নিকট পৌছিয়ে দিয়েছেন।’

অতঃপর সকাল হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “জেনে রেখো! আল্লাহর শপথ! ইসলাম জয়যুক্ত হবে এবং বহুদূর ছড়িয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত কাফিরেরা তাদের জায়গায় আত্মগোপন করবে। মুসলমানেরা ইসলামকে নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেবে ও তার কার্য চালিয়ে যাবে। জেনে রেখো যে, এমন যুগও আসবে যখন মানুষ কুরআন মাজীদ শিক্ষা করবে ও পাঠ করবে। অতঃপর (অহংকার ও আমিত্ব প্রকাশ করতঃ) বলবেঃ ‘আমরা কুরআন কারীমের পাঠক, আমরা বিদ্বান। কে আমাদের চেয়ে বেড়ে যাবে?’ তাদের জন্য কোন মঙ্গল রয়েছে কি”? জনগণ জিজ্ঞেস করেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! গ্রন্থলো কে?’ তিনি বলেনঃ ‘তোমাদের মুসলমানদের মধ্য হতেই হবে কিন্তু মনে রাখ’বে যে, তারা জাহানামের জালানী কাষ্ট।’

ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ)-এর গ্রন্থেও এ হাদীসটি রয়েছে। ওতে এও রয়েছে যে, হ্যরত উমার (রাঃ) উভরে বলেনঃ ‘হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! আপনি অত্যন্ত আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে প্রচার কার্য চালিয়েছেন এবং আপনি যথেষ্ট চেষ্টা ও পরিশ্রম করেছেন। আপনি বিশেষভাবে আমাদের মঙ্গল কামনা করেছেন।’

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘যেমন অবস্থা ফিরআউন সম্প্রদায়ের ছিল, যেমন তাদের কৃতকর্ম ছিল। ’بِأَدْ شَبَّاتِ الرَّمَضَانِ هُمْ أَكْرَمُ مَنْ سَبَقَهُمْ وَإِلَيْهِمْ أَنْتَ بِأَدْ شَبَّاتِ الْمِنَافِعِ هُمْ أَكْرَمُ مَنْ سَبَقَهُمْ’ অক্ষরটি জ্যমের সঙ্গেও এসেছে এবং যবরের সঙ্গেও এসেছে। যেমন নাহরুন ও নাহার শব্দটি। ’بِأَدْ شَبَّاتِ الْجَنَاحِيَّةِ هُمْ أَكْرَمُ مَنْ سَبَقَهُمْ’ ইমরুল কায়েসের কবিতায়ও এ শব্দটি একপ অর্থে এসেছে। পবিত্র আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, আল্লাহর নিকট কাফিরদের মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবে না, যেমন ফিরআউন সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের ধন-মাল ও সন্তানাদি তাদের কোন কাজে আসেনি। আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন এবং তাঁর শাস্তি বড়ই বেদনাদায়ক। কেউ কোন ক্ষমতার বলে ঐ শাস্তি হতে রক্ষা পেতে পারে না এবং তা সরিয়ে দিতেও পারে না। আল্লাহ পাক যা চান তাই করে থাকেন। প্রত্যেক জিনিসই তাঁর বশীভূত। তিনি ব্যতীত কেউ মা'বৃদ নেই।

সূরাঃ আলে ইমরান ৩

১২। যারা অবিশ্বাস করেছে, তুমি  
তাদেরকে বল- অচিরেই  
তোমরা পরাভূত হবে এবং  
তোমরা জাহানামের দিকে  
একত্রিত হবে এবং ওটা  
নিকৃষ্টতর স্থান ।

১৩। নিচয়ই তোমাদের জন্যে  
দুটি দলের পরম্পর সম্মুখীন  
হওয়ার মধ্যে মহান নমুনা  
রয়েছে, তাদের একদল  
আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছিল  
এবং অপর দল অবিশ্বাসী  
ছিল, তারা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে  
মুসলমানদেরকে দিশ্বণ  
দেখছিল এবং আল্লাহ যাকে  
ইচ্ছে তদীয় সাহায্য দানে  
শক্তিশালী করেন, নিচয়ই এর  
মধ্যে চক্ষুঘানদের জন্যে  
উপদেশ রয়েছে ।

١٢ - قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سْتَغْلِبُونَ  
وَتُحَشِّرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَيُئْسَسُ  
الْمِهَادُ  
١٣ - قَدْ كَانَ لَكُمْ أَيَةً فِيْ فِئَتَيْنِ  
الْتَّقَتَا فِيْتَهَا تِقَاتِلُ فِيْ سَبِيلِ  
اللَّهِ وَآخْرِيْ كَافِرَةِ يَرُونَهُمْ  
مِّثْلِيْهِمْ رَأَيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ  
يُؤْيِدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنْ فِيْ  
ذَلِكَ لِعْبَرَةٌ لِّاَوْلَى الْأَبْصَارِ ۝

আল্লাহ তা'আলা হ্যরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে সম্মোধন করে বলেনঃ ‘হে নবী (সঃ)! তুমি অবিশ্বাসীদেরকে বলে দাও যে, তারা পৃথিবীতেও পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে এবং কিয়ামতের দিনও তাদেরকে জাহানামের দিকে সমবেত করা হবে, আর ওটা হচ্ছে জঘন্যতম স্থান। ‘সীরাত-ই-ইবনে ইসহাক’ গ্রন্থে রয়েছে, হ্যরত আমর ইবনে কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বদর যুদ্ধে বিজয় লাভের পর যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি বানু কাইনুকার বাজারে ইয়াতুন্দীদেরকে একত্রিত করেন এবং তাদেরকে সম্মোধন করে বলেনঃ ‘হে ইয়াতুন্দীর দল! কুরাইশদের লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হওয়ার ন্যায় তোমরাও লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হওয়ার পূর্বে ইসলাম ধর্ম প্রাহণ কর! ’ এ কথা শুনে ঐ উদ্বৃত্ত ও অবাধ্য দলটি উভর দেয়ঃ ‘যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ কয়েকজন কুরাইশকে পরাজিত করেই

বুঝি আপনি অহংকারে ফেটে পড়েছেন? আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ হলে জানতে পারবেন যুদ্ধ কাকে বলে! এখনও আমাদের সাথে আপনার যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।' তখন এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়। এতে বলা হয়- 'মক্কা বিজয়ই এটা প্রমাণ করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্য, উত্তম ও পচন্দনীয় দ্বিনকে ও ঐ দ্বিনধারীদেরকে সম্মান দানকারী। তিনি তাঁর রাসূলের ও তাঁর অনুসারীদের স্বয়ং সাহায্যকারী।'

দু'টি দল যুদ্ধে পরম্পর সম্মুখীন হয়। একটি সাহাবা-ই-কিরামের দল এবং অপরটি মুশরিক কুরাইশদের দল। এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। সেদিন মুশরিকদের উপর এমন প্রভাব পড়ে (মুসলমানদের) এবং মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে এমনভাবে সাহায্য করেন যে, যদিও মুসলমানেরা সংখ্যায় মুশরিকদের অপেক্ষা বহু কম ছিল, কিন্তু মুশরিকরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মুশরিকরা উমায়ের ইবনে সাদকে গোয়েন্দাগিরির জন্যে প্রেরণ করেছিল। সে এসে সংবাদ দেয় যে, মুসলমানদের সংখ্যা কিছু কম বেশী তিনশ জন। আসলেও তাই ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ দশ এবং আর কয়েকজন বেশী। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশিষ্ট ও নির্বাচিত এক হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। একটি অর্থ তো এই। দ্বিতীয় ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, কাফিরদের সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণ ছিল, এটা মুসলমানেরা জানতো এবং প্রত্যক্ষও করছিল। তথাপি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করতঃ কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করেন। হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, বদরী সাহাবীরা (রাঃ) ছিলেন তিনশ তরোজন এবং মুশরিকরা ছিল দু'শ ষোল জন। কিন্তু ইতিহাসের পুস্তকগুলোতে মুশরিকদের ন'শ হতে এক হাজার বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলে সম্ভবতঃ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) কুরআন শরীফের শব্দ দ্বারাই দলীল গ্রহণ করে থাকবেন। বানু হাজ্জাজ গোত্রের একটি কৃষ্ণ বর্ণের ক্রীতদাস যে ধৃত হয়ে এসেছিল, তাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশদের সংখ্যা জিজ্ঞেস করলে সে বলেঃ 'অনেক।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ 'তারা দৈনিক কতটি উট যবেহ করছে?' সে বলেঃ 'একদিন নয়টি এবং আর একদিন দশটি।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তাহলে মুশরিকদের সংখ্যা নয়শ এবং এক হাজারের মধ্যবর্তী।' সুতরাং জানা যাচ্ছে যে, মুশরিকরা মুসলমানদের তিনগুণ ছিল। কিন্তু এটা স্মরণ রাখবার বিষয় যে, আরববাসী বলে থাকে, 'আমার নিকট এক হাজার তো রয়েছে কিন্তু আমার আরও এর দ্বিগুণ প্রয়োজন এবং তার তিন হাজারের উদ্দেশ্য

হয়ে থাকে। তাহলে কোন অসুবিধা থাকলো না কিন্তু প্রশ্ন আরও একটি রয়েছে, তা এই যে, কুরআন কারীমের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছে:

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا تُقْبَلُتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقْلِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ  
اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا -

অর্থাৎ ‘যখন তোমরা মুখোমুখী হয়ে গেলে তখন আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের চোখে কম দেখালেন যেন আল্লাহ যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা হয়ে যায়।’ (৮: ৪৪) সুতরাং এ পরিব্রতি আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃত সংখ্যার চেয়েও অল্প পরিলক্ষিত হয়। আর উপরোক্ত আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, বেশী এমন কি দ্বিগুণ পরিলক্ষিত হয়। তাহলে আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কিরূপে হতে পারে? উভর এই যে, ঐ আয়াতে অবস্থা ছিল এক রকম এবং এ আয়াতে অবস্থা ছিল অন্য রকম। হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ ‘বদরের দিন মুশরিকদের সংখ্যা আমাদের চোখে মোটেই বৈশী দেখায়নি। আমরা আবার গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেও বুঝতে পারি যে, তাদের সংখ্যা আমাদের অপেক্ষা বেশী নয়।’ অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) বলেনঃ ‘মুশরিকদের সংখ্যা আমাদের নিকট এত অল্প মনে হলো যে, আমি আমার পাশ্ববর্তী একজনকে বললাম—এরা সন্তুরজন হবে। ঐ লোকটি তখন বললোঃ ‘না না, একশজন হবে।’ তাদের একজন লোক ধৃত হলে আমরা তাকে মুশরিকদের সংখ্যা জিজ্ঞেস করি। সে বলেঃ ‘এক হাজার।’ অতঃপর যখন উভয় পক্ষ সারিবদ্ধভাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায় তখন মুসলমাদের মনে হয় যে, মুশরিকরা তাদের দ্বিগুণ হবে। এটা এ জন্যই যে, যেন তারা নিজেদের দুর্বলতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতঃ মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, সমস্ত মনোযোগ তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দেয় এবং তাঁরই নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানায়। অনুরূপভাবে মুশরিকদের নিকটও মুসলমানদের সংখ্যা তাদের দ্বিগুণ অনুভূত হয়, যেন তাদের অন্তরে ভয় ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয় এবং তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। অতঃপর যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় তখন প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতে নিজেদের তুলনায় অন্য দলের সংখ্যা কম পরিলক্ষিত হয় যেন উভয় দলই উদ্যমের সাথে মুক্ত করে এবং আল্লাহ তা‘আলা সত্য ও মিথ্যার স্পষ্ট মীমাংসা করে দেন। যেন কুফর ও উদ্বিদ্যের উপর ঈমানের বিজয় লাভ ঘটে এবং যেন মুসলমানেরা সম্মানিত হয় এবং কাফিরেরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। যেমন অন্য জায়গায় ব্যক্ত হয়েছেঃ

وَلَقَدْ نَصَرْكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذْلَةٌ

অর্থাৎ ‘আল্লাহ বদরের দিন তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন, অথচ তোমরা সে সময় দুর্বল ছিলে।’ (৩: ১২৩) এ জন্যেই এখানেও বলেছেন- ‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন তদীয় সাহায্যদানে শক্তিশালী করে থাকেন।’ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘নিশ্চয়ই এর মধ্যে চক্ষুস্থানদের জন্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।’ অর্থাৎ যারা স্থির মস্তিষ্ক বিশিষ্ট তারা আল্লাহ তা‘আলার আদেশ পালনে উঠেপড়ে লেগে যাবে এবং বুঝে নেবে যে, আল্লাহ পাক তাঁর মনোনীত বান্দাদেরকে এ ইহলৌকিক জগতেও সাহায্য করবেন এবং কিয়ামতের দিনও তাদেরকে জাহানামের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।

#### ১৪। মানব মণ্ডলীকে রমণীগণের,

সন্তান-সন্ততির, পুঁজীকৃত স্বর্গ ও রৌপ্যভাণ্ডারের, সুশিক্ষিত অশ্বের ও পালিত পশুর এবং শস্য ক্ষেত্রের প্রেমাকর্ষণী দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে, এটা পার্থিব জীবনের সম্পদ এবং আল্লাহর নিকটেই শ্রেষ্ঠতম অবস্থান।

১৫। তুমি বল- আমি কি তোমাদেরকে এটা অপেক্ষাও উত্তম বিষয়ের সংবাদ দেব? যারা ধর্মভীরুৎ তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট জাহান রয়েছে- যার নিষ্ঠে প্রোত্থিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে এবং তথায় শুক্ষা সহধর্মণীগণও আল্লাহর প্রসন্নতা রয়েছে; এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী।

١٤- زِينَ لِلنَّاسِ وُحُشْ الشَّهُوتِ  
مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيَّنَ  
وَالقَنَاطِيرِ الْمُقْنَطَرَةِ مِنَ  
الْدَّهْبِ وَالْفِيْضَةِ وَالْخَيْلِ  
الْمُسُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرَثِ  
ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ ۝

١٥- قُلْ أَؤْنِسُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ  
ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوا عِنْدَ رَبِّهِمْ  
جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ  
مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, পার্থিব জীবনকে বিভিন্ন প্রকারের উপভোগ্য (বস্তু) দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে। এ সমুদয় জিনিসের মধ্যে সর্বপ্রথম নারীদের কথা বর্ণনা করেছেন, কেননা তাদের অনিষ্ট সবচেয়ে বড়। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আমি আমার পরে পুরুষদের উপর স্ত্রীদের চেয়ে বেশী ক্ষতিকর ও ফির্মা ছেড়ে গেলাম না। হ্যাঁ, তবে যখন বিবাহ দ্বারা কোন লোকের উদ্দেশ্য হবে ব্যভিচার হতে রক্ষা পাওয়া ও সন্তানাদির আধিক্য তখন নিঃসন্দেহে ওটা উত্তম কাজ হবে।’ শরীয়ত বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে এবং বিয়ে করা এমনকি বহু বিয়ে করার ফয়েলতের অনেক হাদীসও এসেছে এবং এ উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে অধিক স্ত্রীর অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘দুনিয়া একটি উপকারের বস্তু এবং ওর সর্বোত্তম উপকারী জিনিস হচ্ছে সতী সাধ্বী পত্নী। স্বামী যদি তার দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে সে তাকে সন্তুষ্ট করে, যদি নির্দেশ দেয় তবে পালন করে। আর যদি সে স্ত্রী হতে অনুপস্থিত থাকে তবে সে নিজের জীবনের ও স্বামীর ধন-মালের রক্ষণাবেক্ষণ করে।’ অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আমার নিকট নারী ও সুগন্ধি অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং আমার চক্ষুঁ ঠাণ্ডাকারী হচ্ছে নামায।’ হ্যাঁ রায়েশা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিল নারীগণ, তবে তিনি ঘোড়াও খুব পছন্দ করতেন। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তাঁর খুব চাহিদার জিনিস ঘোড়া ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। হ্যাঁ, তবে শুধুমাত্র নারীরা ছিল। সুতরাং বুরো যাচ্ছে যে, স্ত্রীদেরকে ভালবাসার মধ্যে মঙ্গলও রয়েছে এবং অমঙ্গলও রয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যদের উপর অহংকার প্রকাশ করার জন্যে যদি অধিক সন্তান লাভ কামনা করে তবে তা নিন্দনীয়। কিন্তু যদি এর দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ও হ্যাঁ মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতের মধ্যে একত্ববাদী মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য থাকে তবে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘ভালবাসা স্থাপনকারিণী ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণী নারীদেরকে তোমরা বিয়ে কর, কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের সংখ্যার আধিক্যের কারণে অন্যান্য উম্মতবর্গের উপর গর্ববোধ করবো।’ মাল-ধনের ব্যাপারেও একই কথা। যদি ওর প্রতি ভালবাসার উদ্দেশ্য হয় দুর্বলদের ঘৃণা করা ও দরিদ্রের উপর অহংকার প্রকাশ করা, তবে তা অতি জঘন্য। আর যদি মালের চাহিদার উদ্দেশ্য হয় নিকটের ও দূরের আত্মীয়দের উপর খরচ করা, সৎকার্যাবলী সম্পাদন করা এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করা তবে তা শরীয়ত সম্মত ও খুবই উত্তম।’ **قُطْرَار**-এর পরিমাণের

ব্যাপারে তাফসীর কারকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মোটকথা এই যে, অত্যধিক মালকে ‘قِنْطَار’ বলা হয়। যেমন হ্যরত যহুকের উক্তি রয়েছে। আরও বহু উক্তি রয়েছে, যেমন এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা, বারো হাজার, চল্লিশ হাজার, ষাট হাজার, সত্ত্বর হাজার, আশি হাজার ইত্যাদি। মুসনাদ-ই-আহমাদের একটি মারফু’ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘বারো হাজার আওকিয়া’য় এক কিনতার হয় এবং প্রত্যেক আওকিয়া’ পৃথিবী ও আকাশ হতে উত্তম।’ হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে এ রকমই একটি মাওকুফ হাদীসও বর্ণিত আছে এবং এটাই সর্বাপেক্ষা সঠিক। হ্যরত ইবনে জারীর (রঃ), হ্যরত মু’আয ইবনে জাবাল (রাঃ) এবং হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) হতেও এটা বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাতিম (রঃ)-এর গ্রন্থে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এবং হ্যরত আবু দ্বারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বারো আওকিয়া’য় এক কিনতার হয়। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) হ্যরত উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘বারোশ আওকিয়া’য় এক কিনতার হয়।’ কিন্তু এ হাদীসটি ‘মুনকার’। সম্ভবতঃ এটা হ্যরত উবাই ইবনে কা’বের উক্তি। যেমন অন্যান্য সাহাবীরও (রাঃ) এই উক্তি রয়েছে। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) হ্যরত আবু দ্বারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি একশ আয়াত পাঠ করবে তার নাম উদাসীনদের মধ্যে লেখা হবে না এবং যে ব্যক্তি এক হাজার পর্যন্ত পাঠ করবে তাকে এক কিনতার পুণ্য দেয়া হবে। আর কিনতার হচ্ছে বড় পাহাড়ের সমান।’ ‘মুসতাদরিক-ই-হাকিম’ গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ শব্দটির ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ ‘দু’হাজার আওকিয়া।’ ইমাম হাকিম (রঃ) হাদীসটিকে ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ)-এর শর্তের উপর সঠিক বলেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) হাদীসটি আনেননি। তাবরানী প্রভৃতি মনীষীর হাদীস গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে যে, কিনতার হচ্ছে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা। হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) হতে ‘মাওকুফ’ বা ‘মুরসাল’ রূপে বর্ণিত আছে যে, কিনতার হচ্ছে বারোশ স্বর্ণমুদ্রা। হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। হ্যরত যহুক (রঃ) বলেন যে, কোন কোন আরববাসী কিনতারকে বারোশ বলে থাকেন আবার কেউ কেউ বারো হাজার বলেন। হ্যরত আবু সান্দে খুদরী (রাঃ) বলেন যে, বলদের গাত্র-চর্ম পূর্ণ হয়ে যায় এই পরিমাণ স্বর্ণকে কিনতার বলা হয়। এটা মারফু’ রূপেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর মাওকুফ হওয়াই অধিকতর সঠিক।

অঙ্গের প্রতি প্রেম তিনি প্রকারের। প্রথম হচ্ছে ঐসব লোক যারা অঙ্গের উপর আরোহণ করে আল্লাহর্হ পথে জিহাদ করার জন্যে তা জালন-পালন করে। তাদের জন্য এ-যোড়া পুণ্য ও সওয়াবের কারণ। দ্বিতীয় হচ্ছে তারাই যারা গর্ব ও অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে অশ্র পালন করে থাকে। এদের জন্য শাস্তি রয়েছে। তৃতীয় হচ্ছে ওরাই যারা ভিক্ষাবৃত্তি হতে রক্ষা পাওয়া এবং ওর বৎশ রক্ষার উদ্দেশ্যে অশ্র পালন করে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য বিস্মরণ হয় না। এদের জন্যে পুণ্য বা শাস্তি কোনটাই নেই। এ বিষয়ের হাদীস **وَأَعْدِرَا لَهُمْ** (৮:৬০) -এ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে।

**مسروق** শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্নিত এবং কপালে ও চার পায়ে সাদা চিহ্নযুক্ত ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘প্রত্যেক আরবী অশ্র ফজরের সময় আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে দু’টি প্রার্থনা করে থাকে। সে বলেঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যার অধিকারে রেখেছেন তার অন্তরে আমার ভালবাসা তার মাল ও পরিবার অপেক্ষা বেশী করে দিন।’ **أَنَّمَا** শব্দের অর্থ হচ্ছে উট, ছাগল ও গরু। **حُرث** শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ ভূমি যা ফসলের বীজ বপন বা বৃক্ষরোপণের জন্যে তৈরী করা হয়। মুসলাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘মানুষের উন্নত মাল হচ্ছে অধিক বৎশ বিশিষ্ট যোড়া এবং অধিক ফলবান বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।’

অতঃপর বলা হচ্ছেঃ ‘এগুলো পার্থিব জীবনের লোভনীয় সম্পদ।’ অর্থাৎ এগুলো ইহলৌকিক জীবনের লোভনীয় বস্তু, এগুলো সবই ধ্রংস হয়ে যাবে এবং শ্রেষ্ঠতম অবস্থান স্থল ও উন্নত বিনিয়ম প্রাপ্তির জায়গা মহান আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। মুসলাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, যখন **زِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوتِ** এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি যখন আমাদের জন্যে এটাকে সুশোভিত করেছেন তাহলে এখন?’ তখন পরবর্তী আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এখানে হ্যরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে সুশোধন করে বলা হয়ঃ (হে নবী সঃ)! তুমি বলে দাও আমি তোমাদেরকে এসব অপেক্ষা উন্নত জিনিসের সংবাদ দিচ্ছি। এ পার্থিব জিনিসগুলো তো একদিন না একদিন ধ্রংস হবেই। কিন্তু আমি তোমাদেরকে যেসব জিনিসের কথা বলছি সেগুলো অস্থায়ী নয় বরং চিরস্থায়ী। জেনে রেখো যে, যারা আল্লাহকে ডয় করে তাদের জন্যে তাদের প্রভুর নিকট এমন সুখময় জান্মাত রয়েছে যার ধারে ধারে ও যার বৃক্ষাদির মধ্যস্থলে বিভিন্ন প্রকারের স্বোতন্ত্রনী সমূহ বয়ে যাচ্ছে। কোন স্থানে

রয়েছে মধুর নদী, কোন জায়গায় রয়েছে দুধের নদী, কোথাও বা রয়েছে সুরার  
স্নোতশ্বিনী এবং কোন স্থলে রয়েছে স্বচ্ছ পানির প্রস্তবণ। আরও এমন এমন  
সুখ-সম্পদ রয়েছে যা না শ্রবণ করেছে কোন কর্ণ, না দর্শন করেছে কোন চক্ষু,  
না ধারণা করেছে কোন অন্তর। এরূপ সুখময় ও আরামদায়ক স্থানে মুত্তাকী  
লোকেরা চিরকাল অবস্থান করবে। তথা হতে তাদেরকে বের করে দেয়া হবে  
না, তাদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতরাজী কমে যাবে না এবং ধৰ্মসও হবে না। অতঃপর  
তথায় এমন সহধর্মীণি পাওয়া যাবে যারা ময়লা মালিন্য, অপবিত্রতা, ঝুত-  
রক্ষকরণ ইত্যাদি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রকারের  
পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা বিরাজ করবে। সর্বোপরি খুশীর কারণ এই যে, মহান  
আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। এর পরেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোন ভয়  
থাকবে না। এজন্যেই সূরা-ই-বারাআতের নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে—  
**وَرُضِّوانٌ مِّنَ الْأَكْبَرِ** অর্থাৎ ‘এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিই খুব বড় জিনিস’। (২: ৭২) অর্থাৎ  
নিয়ামত সম্বৰ্হের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে প্রভুর সন্তুষ্টি লাভ। সমস্ত  
বান্দাই আল্লাহ তা‘আলার দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। কে তাঁর অনুগ্রহ লাভের যোগ্য  
এবং কে যোগ্য নয় তা তিনিই ভাল জানেন।

১৬। যারা বলে— হে আমাদের  
প্রতিপালক, নিশ্চয়ই আমরা  
বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অতএব  
আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন  
এবং জাহানামের আগন্তের  
শাস্তি হতে আমাদেরকে  
বাঁচিয়ে নিন।

১৭। যারা সহিষ্ণু, সত্যপরায়ণ,  
সেবানুগত, দানশীল এবং  
উষাকালে ক্ষমাপ্রার্থী।

১৬- **الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا إِنَّا  
أَمْنَىٰ فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا  
عَذَابَ النَّارِ**

১৭- **الصَّابِرِينَ وَالصِّدِّيقِينَ  
وَالقَنِيْتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ  
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ**

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সংযমী বান্দাদের শুণাবলী বর্ণনা করেছেন যে, তারা  
বলেঃ ‘হে আমাদের প্রভু! আমরা আপনার উপর, আপনার কিতাবের উপর ও  
রাস্তা (সঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। সুতরাং এ ঈমানের উপর ভিত্তি  
করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতঃ আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি মার্জনা করুন এবং

আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে নিন।' এ সংযমী লোকেরা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করতঃ তাঁর সমস্ত আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে এবং অবৈধ জিনিস হতে দূরে থাকে। তারা প্রতিটি কাজে-কর্মে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। তারা ঈমানের দাবীতেও সত্যবাদী।

জীবনের উপর কঠিন ও কষ্টকর হলেও তারা সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে। তারা বিনয় ও ন্যূনতা প্রকাশকারী। তারা নিজেদের ধন-মাল আল্লাহর পথে তাঁর নির্দেশ মত ব্যয় করে থাকে। তাঁরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, মানুষকে অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে এবং তাদের দুঃখে সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করে। তারা দরিদ্র ও অভাগগ্রস্তদেরকে সাহায্য দানে পরিতৃষ্ঠ করে এবং ভোর রাত্রে উঠে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এ সময় ক্ষমা প্রার্থনা করার গুরুত্ব অত্যধিক। এও বলা হয়েছে যে, হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্রদেরকে যে সময় বলেছিলেনঃ

سُوفَ أَسْتَغْفِرُ لِكُمْ رَبِّيْ

অর্থাৎ 'অতিসত্ত্বরই আমি আমার প্রভুর নিকট তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো।'(১২: ৯৮) ওটার ভাবার্থ উষাকালই বটে। অর্থাৎ হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর সন্তানদেরকে বলেনঃ 'প্রাতঃকালে তোমাদের জন্যে আমার প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো।' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রে এক তৃতীয়াংশ রাত্রি অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেনঃ 'কোন যাঞ্ঞাকারী আছে কি যাকে আমি দান করবো? কোন প্রার্থনাকারী আছে কি যার প্রার্থনা আমি কবূল করবো? কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি যাকে আমি ক্ষমা করবো?'?

হাফেজ আবুল হাসান দারেকুতনী (রাঃ) এ বিষয়ের উপর একটি পৃথক পুস্তক রচনা করেছেন এবং উক্ত পুস্তকের মধ্যে এ হাদীসটির সমস্ত সনদ এবং ওর প্রত্যেকটি শব্দ এনেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাতের প্রথমভাগে, মধ্যভাগে এবং শেষভাগে বেতেরের নামায পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বেতের পড়ার সর্বশেষ সময় ছিল উষার উদয় পর্যন্ত। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং স্বীয় গোলাম হ্যরত নাফে'কে

জিজ্ঞেস করতেনঃ ‘সকাল হয়েছে কি?’ যখন বলতো, ‘হ্যা, হয়েছে’, তখন তিনি সুবহে সাদিক হওয়া পর্যন্ত দু’আ ও ক্ষমা প্রার্থনায় লিঙ্গ থাকতেন। হয়রত হাতিব (রাঃ) বলেনঃ উষার সময় আমি শুনতে পাই কে যেন মসজিদের কোন এক প্রান্তে বলছেঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন আমি তা পালন করেছি। এটা উষাকাল, আমাকে ক্ষমা করুন।’ আমি দেখি যে, তিনি হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)। হয়রত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেনঃ ‘আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হতো যে, আমরা তাহাজ্জুদের নামায গড়লে যেন উষার শেষ সময়ে সজুরবার আল্লাহ তা’আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।’

### ১৮। আল্লাহ সাক্ষ প্রদান

করেন যে, নিচয়ই তিনি ব্যতীত কেউ মা’বুদ নেই এবং ফেরেশতাগণ, জ্ঞানবান- গণ ও সুবিচারে আস্তা স্থাপনকারীগণও সাক্ষ দেন যে, এই মহা পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় ব্যতীত আর কোনই মা’বুদ নেই।

### ১৯। নিচয়ই ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম এবং যাদেরকে এক প্রদত্ত হয়েছে তাদের জ্ঞান আসার পর তারা প্রস্তর বিদ্রোহ ব্যতীত বিরোধ করে না; এবং যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অঙ্গীকার করে, নিচয়ই আল্লাহ সত্ত্ব হিসাব ঘৃণকারী।

١٨- شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ  
قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

١٩- إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ  
قُتْلَ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ  
أُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مَنْ بَعْدَ  
مَا جَاءَهُمْ وَالْعِلْمُ بَعْدُهُمْ  
وَمَنْ يَكْفِرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ  
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

২০। অনন্তর যদি তারা তোমার  
সাথে কলহ করে তবে তুমি  
বল- আমি ও আমার  
অনুসারীগণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে  
স্বীয় আনন্দ সমর্পণ করেছি  
এবং যাদেরকে এছ অদ্ভুত  
হয়েছে ও যারা নিরক্ষর  
তাদেরকে বল- তোমরাও কি  
আজ্ঞসমর্পণ করেছো? অনন্তর  
যদি তারা আজ্ঞসমর্পণ করে,  
তবে নিশ্চরই তারা সুপথ  
পেরে যাবে, আর যদি ফিরে  
যাব, তবে তোমার উপর প্রচার  
মাত্র; এবং আল্লাহ বান্দাদের  
প্রতি লক্ষ্যকারী

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সাক্ষী দিজ্জেন, সুতরাং তাঁর সাক্ষাই যথেষ্ট। তিনি  
সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী সাক্ষী এবং তাঁরই কথা সবচেয়ে সত্য। তিনি বলেন যে,  
সমস্ত সৃষ্টিজীব তাঁর দাস এবং একমাত্র তাঁরই সৃষ্টি। সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী  
এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। মা'বুদ ও আল্লাহ হওয়ার ব্যাপারে তিনি  
একাই, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য  
নন। যেমনঃ কুরআন কাবীমে ঘোষিত হচ্ছেঃ 'কিন্তু আল্লাহ সজ্ঞানে তোমার  
প্রতি অবতীর্ণকৃত কিতাবের মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদান করছেন এবং ফেরেশতারাও  
সাক্ষ্য দিজ্জে, আর আল্লাহর সাক্ষাই যথেষ্ট।' অতঃপর আল্লাহ পাক স্বীয় সাক্ষ্যের  
সাথে ফেরেশতাদের ও আলেমদের সাক্ষ্যকেও মিলিয়ে নিজ্জেন। এখান হতে  
আলেমদের বড় মর্যাদা সাব্যস্ত হচ্ছে। কাউন্ট শব্দটি এখানে কাউল হয়েছে বলে তার  
উপর নিচে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সদা ও সর্বাবস্থায় এ রকমই। অতঃপর আরও  
বেশী গুরুত্ব দেয়ার জন্যে দ্বিতীয়বার ইরশাদ হচ্ছে যে, প্রকৃত মা'বুদ একমাত্র  
তিনিই। তিনি প্রবল পরাক্রম এবং কথা ও কাজে বিজ্ঞানময়।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরাফায় এ আয়াতটি  
পাঠ করেন এবং পর্যন্ত পড়ে বলেন এবং **الْحَكِيمُ** **وَإِنَّا عَلَى ذِلِّكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبَّ**

٢- فِيَنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ  
وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ  
لِلَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ وَالْأُمَمِ  
أَسْلَمْتُمْ فِيَنْ أَسْلَمْوَا فَقَدِ  
اَهْتَدَوْا وَإِنْ تَوْلُوا فَإِنَّمَا  
عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بِصَرِيرٍ  
بِالْعِبَادِ ۝

অর্থাৎ ‘হে আমার প্রভু! আমিও ওর উপর সাক্ষীগণের মধ্যে একজন।’ মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্নরূপ পাঠ করেনঃ **وَأَنَا أَشْهُدُ يَأْرِبَّ** অর্থাৎ ‘হে আমার প্রভু! আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।’ তাবরানীর হাদীসে রয়েছে, হ্যরত গালিব কার্তান (রঃ) বলেন, ‘আমি ব্যবসা উপলক্ষে কুফায় গমন করতঃ হ্যরত আমাশ (রঃ)-এর নিকট অবস্থান করি। রাত্রে হ্যরত আমাশ (রঃ) তাহাজুদ নামাযে দাঁড়িয়ে যান। পড়তে পড়তে যখন তিনি এ আয়াত পর্যন্ত পৌছেন এবং **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا سَلَامٌ** পাঠ করেন তখন বলেনঃ

**وَأَنَا أَشْهُدُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ بِهِ وَاسْتَوْدِعُ اللَّهَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَهِيَ لِيْ  
عِنْدَ اللَّهِ وَدِيعَةً۔**

অর্থাৎ “আমিও ওর সাক্ষ্য দিচ্ছি যার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন এবং এ সাক্ষ্য আমি আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি। আল্লাহ তা‘আলার নিকট এটা আমার আমানত।” অতঃপর তিনি কয়েকবার **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّা سَلَامٌ** পাঠ করেন। আমি মনে মনে ধারণা করি যে, সম্ভবতঃ এ সম্বন্ধে কোন হাদীস রয়েছে। অতি প্রত্যুষেই আমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয় করিঃ হে আবু মুহাম্মদ! আপনার বার বার এ আয়াতটি পড়ার কারণ কি? তিনি উত্তরে বলেনঃ “আপনার কি এ আয়াতের ফয়েলত জানা নেই?” আমি বলিঃ জনাব আমি তো এক মাস ধরে আপনার এখানে অবস্থান করছি, কিন্তু আপনি তো কোন হাদীসই বর্ণনা করেননি। তিনি বলেনঃ “আল্লাহর শপথ! আমি তো এক বছর পর্যন্ত বর্ণনা করবো না।” তখন আমি এ হাদীসটি শুনবার জন্যে এক বছর কাল তথায় অবস্থান করি এবং তাঁর দরজায় পড়ে থাকি। এক বছর পূর্ণ হলে আমি তাঁকে বলি, হে আবু মুহাম্মদ (রঃ)! এক বছর তো পূর্ণ হয়ে গেছে। তখন তিনি বলেনঃ “আচ্ছা শুনুন! আবু অয়েল (রঃ) আমার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি হ্যরত আবদুল্লাহ (রঃ)-এর নিকট শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘এর পাঠককে কিয়ামতের দিন আনয়ন করা হবে এবং মহা সশ্মানিত আল্লাহ বলবেন ‘এ বান্দা আমার নিকট অঙ্গীকার নিয়েছে এবং আমি সবচেয়ে উত্তম অঙ্গীকার পূর্ণকারী, আমার এ বান্দাকে বেহেশ্তে নিয়ে যাও’।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন—‘তিনি শুধুমাত্র ইসলামকেই গ্রহণ করে থাকেন।’ সর্বযুগীয় নবীদের (আঃ) অহীর অনুসরণ করার নাম ইসলাম। সর্বশেষ এবং সমস্ত নবী (আঃ)-এর সমাঞ্জকারী হচ্ছেন আমাদের নবী হ্যরত মুহাম্মদ

মুস্তফা (সঃ)। তাঁর নবুওয়াতের পর সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন যে কেউ তাঁর শরীয়ত ছাড়া অন্য কিছুর উপর আমল করবে সে মহান আল্লাহর নিকট ধার্মিক বলে গণ্য হবে না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে:

وَمَنْ يَبْتَعِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُفْلِمَ مِنْهُ

অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অনুসন্ধান করবে তা কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না।’ (৩: ৮৫) অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াতেও ধর্মকে ইসলামের উপর সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। হ্যারত ইবনে আবাস (রাঃ)-এর পঠনে<sup>১</sup> شَهِدَ اللَّهُ أَنَّ إِنَّ إِلَّا إِسْلَامَ وَأَنَّ هُوَ أَكْبَرُ<sup>১</sup> রয়েছে। তাহলে অর্থ দাঁড়াবেঃ ‘আল্লাহ সাক্ষ্য দেন ও তাঁর ফেরেশ্তামণ্ডলী এবং জ্ঞানবান লোকেরাও সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম শুধুমাত্র ‘ইসলাম’। জমহুরের পঠনে ‘ইন্না’ রয়েছে এবং অর্থ হিসেবে দু’টোই ঠিক আছে। কিন্তু জমহুরের উক্তিটিই বেশী স্পষ্ট।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে— ‘পূর্ববর্তী কিতাবধারীরা মহান আল্লাহর নবীদের (আঃ) আগমনের পর ও তাঁর কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার পর মতভেদ করেছিল এবং এরই কারণে তাদের পরম্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শক্রতা ছিল। একজন এক কথা বললে তা সত্য হলেও অন্যজন তার বিরোধিতা করতো।’ অতঃপর আল্লাহ তা’আলা বলেন—‘আল্লাহর নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ হওয়ার পরেও যারা ঐগুলো মিথ্যা প্রতিপন্থ করতঃ অমান্য করে, আল্লাহ তা’আলা সত্ত্বুরই তাদের হিসেব গ্রহণ করবেন এবং তাঁর কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন।

তারপর আল্লাহ তা’আলা বলেন—হে নবী (সঃ)! তারা যদি তোমার সাথে আল্লাহর একত্বের ব্যাপারে বিতর্কে লিঙ্গ হয় তবে তাদেরকে বলে দাও—‘আমি তো নির্ভেজালভাবে সেই আল্লাহরই ইবাদত করবো যাঁর কোন অংশীদার নেই, যিনি অতুলনীয়, যাঁর না আছে কোন সন্তান এবং না রয়েছে কোন পত্নী। আর যারা আমার অনুসারী, যারা আমার ধর্মের উপর রয়েছে তাদেরও এই একই কথা।’ যেমন অন্য স্থানে রয়েছে—

قُلْ هُذِهِ سَبِيلٌ ادْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

অর্থাৎ ‘তুমি বল— এটাই আমার পথ। আমি খুব চিন্তা-গবেষণা করেই তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি, আমিও এবং আমার অনুসারীগণও।’ (১২: ১০৮)

অতঃপর নির্দেশ হচ্ছে- ‘হে নবী (সঃ)! কিতাবধারী ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে এবং নিরক্ষর মুশরিকদেরকে বলে দাও-তোমাদের সবারই সুপথ প্রাপ্তি ইসলামের মধ্যেই রয়েছে। যদি তারা অমান্য করে তবে কোন কথা নেই। তোমার কর্তব্য শুধু প্রচার করা এবং তুমি তোমার এই কর্তব্য পালন করেছো। আল্লাহ তাদেরকে দেখে নেবেন। তাদের সবারই প্রত্যাবর্তন তাঁর কাছেই। তিনি যাকে চান সুপথ প্রদর্শন করেন এবং যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। স্বীয় নৈপুণ্য তাঁরই ভাল জানা আছে। তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে দেখতে রয়েছেন। কে সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য এবং কে ভাস্তুপথের পথিক তা তিনিই ভাল জানেন। তাঁর কার্যের হিসাব গ্রহণকারী কেউ নেই।’ এ আয়াতে এবং এরই মত বহু আয়াতে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সমস্ত সৃষ্টজীবের নিকট রাসূল হয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর ধর্মের নির্দেশাবলী এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিতাব ও সুন্নাহর মধ্যে এ বিষয়ের বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। কুরআন পাকের মধ্যে এক জায়গায় রয়েছেঃ

بِأَيْمَانِ النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَاءُوكُمْ مُّبَشِّرًا

অর্থাৎ “হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবারই জন্যে আল্লাহর রাসূল।” (৭৪: ১৫৮) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا.

অর্থাৎ “সেই আল্লাহ কল্যাণময় যিনি স্বীয় বান্দার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যেন সে সারা দুনিয়াবাসীর জন্যে ভয় প্রদর্শক হয়ে যায়”। (২৫: ১) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে কয়েকটি ঘটনা ধারাবাহিক রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) চতুর্পার্শ্বের সমস্ত বাদশাহর নিকট এবং অন্যান্য লোকদের নিকট পত্র পাঠিয়েছিলেন। ঐ পত্রগুলোর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছিলেন। তারা আরবই হোক বা আজমীই হোক, কিতাবধারীই হোক বা অন্য কোন ধর্মের লোক হোক না কেন। এভাবে তিনি প্রচারের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছিলেন। মুসনাদ-ই-আবদুর রাজ্জাকের মধ্যে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে আল্লাহর হাতে আমার জীবন রয়েছে তাঁর শপথ! এ উম্মতের মধ্যে ইয়াহুদই হোক বা খ্রীষ্টানই হোক যারই কানে আমার নবুওয়াতের সংবাদ পৌছবে এবং আমার আনীত জিনিসের উপর সে বিশ্বাস স্থাপন করবে না, আর ঐ অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করবে সে অবশ্যই জাহানামী হবে।” সহীহ

মুসলিম শরীফেও এ হাদীসটি রয়েছে এবং তাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্নের উক্তিও রয়েছেঃ “আমি প্রত্যেক লাল ও কৃষ্ণের নিকট নবীরপে প্রেরিত হয়েছি।” অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “প্রত্যেকে নবী (আঃ)-কে শুধুমাত্র তাঁর গোত্রের নিকট পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আমি সমস্ত মানুষের নিকট নবীরপে প্রেরিত হয়েছি।”

মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি ইয়াতুনীর ছেলে, যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অযুর পানি রাখতো এবং তাঁর জুতা এনে দিতো, সে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ছেলেটিকে বলেনঃ “হে অমুক! তুমি اللهُ أَكْبَرُ পাঠ কর।” সে তখন তার পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং পিতাকে নীরব থাকতে দেখে সেও নীরব হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিতীয়বার এ কথাই বলেন। সে পুনরায় তার পিতার দিকে তাকায়। তার পিতা বলেঃ “আবুল কাসিম رض-(সঃ)-এর কথা মেনে নাও।” ছেলেটি তখন বলেঃ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَشَدُّ دُنْعَاهُ “আশেদ অর্থাৎ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ মা’বুদ নেই এবং নিচয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বেরিয়ে যাবার সময় বলেনঃ “সেই আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমার কারণে তাকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করলেন।” এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর সহীহ বুখারীর মধ্যে এনেছেন। এগুলো ছাড়াও আরও বহু বিশুদ্ধ হাদীস এবং কুরআন কারীমের বহু আয়াত শ্রমস্তুতি রয়েছে।

২১। নিচয়ই যারা আল্লাহর  
নির্দশনসমূহ অবিশ্বাস করে ও  
অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা  
করে এবং যারা মানব মঙ্গলীর  
মধ্যে ন্যায়ের আদেশকারী  
তাদেরকে হত্যা করে; অতএব  
তাদেরকে যত্নণাদায়ক শাস্তির  
সুসংবাদ দিয়ে দাও।

২২। এদেরই কৃতকর্মসমূহ  
ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থ হবে  
এবং তাদের জন্যে কেউ  
সাহায্যকারী নেই।

٢١- إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاِيْتِ  
لَهُ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ  
وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ  
بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْ هُمْ  
بِعَذَابِ الْيَمِّ

٢٢- أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبَطُ  
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ  
وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرٍ ۝

এখানে কিতাবধারীদের জগন্য কাজের নিম্নে করা হচ্ছে। তারা পাপ ও অন্যায় কাজে লিঙ্গ থাকতো এবং মহান আল্লাহ স্বীয় নবীদের (আঃ) মাধ্যমে যেসব কথা পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন সেগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। শুধু তাই নয়, বরং তারা নবীদেরকে হত্যা করে ফেলতো। তাদের অবাধ্যতা এত চরমে পৌঁছেছিল যে, যেসব লোক তাদেরকে ন্যায়ের দিকে আহ্বান করতো তাদেরকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করতো। হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘সত্যকে অঙ্গীকার করা ও ন্যায় পন্থীদেরকে লাঞ্ছিত করাই হচ্ছে অহংকারের শেষ সীমা।’

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে রয়েছে যে, হ্যরত আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘হে আল্লাহ রাসূল! কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তির সবচেয়ে কঠিন শান্তি হবে?’ তিনি বলেনঃ ‘সেই ব্যক্তির যে কোন নবী (আঃ)-কে হত্যা করে কিংবা এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে যে ভাল কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ হতে বিরত “রাখে”। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেনঃ ‘হে আবু উবাইদাহ (রাঃ)! বানী ইসরাইল দিনের প্রথমভাগে এক ঘন্টার মধ্যে তেতালিশজন নবী (আঃ)-কে হত্যা করে। অতঃপর একশ সন্তুর জন ঈমানদার বানী ইসরাইলকে হত্যা করে যারা এ কাজে বাধা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতো ও মন্দ কাজে নিষেধ করতো। তাদের সকলকে তারা দিনের শেষ ভাগে হত্যা করে। এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ওদের কথাই বর্ণনা করেছেন।’ হ্যরত ইবনে জারীর (রঃ) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, বানী ইসরাইল তিনশ নবী (আঃ)-কে দিনের প্রথম অংশে হত্যা করে। অতঃপর দিনের শেষাংশে তারা বাজারে তাদের শাক সজী বিক্রীর কাজে লেগে যায়। সুতরাং তাদের এ অবাধ্যতা, অহংকার এবং দুষ্কার্যের কারণে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ইহজগতেও লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেন এবং পরকালেও তাদের জন্য অপমানজনক ও যন্ত্রণাদায়ক শান্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘তাদেরকে বেদনাদায়ক শান্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও। এদের সমস্ত কৃতকর্ম ইহকালেও ব্যর্থ হয়ে গেল এবং পরকালেও ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না’।

২৩। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের একাংশ অদ্বিতীয় হয়েছে? তাদেরকে গ্রন্থের দিকে আহবান করা হচ্ছে— যেন এটা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে; অবৎপর তাদের একদল প্রতিগমন করলো এবং তারা প্রতিগমনকারী।

২৪। এটা এ জন্যে যে তারা বলে— নির্দিষ্ট সংখ্যক দিবস ব্যতীত অগ্নি আমাদেরকে শ্পর্শ করবে না; এবং তারা যা স্থির করেছে, তাদের ধর্ম বিষয়ে ওটা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

২৫। অনন্তর যেদিন আমি তাদেরকে একত্রিত করবো— যাতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তাদের কি দশা হবে? এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা সম্যকরূপে প্রদত্ত হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানেরা তাদের এ দাবীতেও মিথ্যাবাদী যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলের উপর তাদের বিশ্বাস রয়েছে। কেননা, ঐ কিতাবগুলোর নির্দেশ অনুসারে যখন তাদেরকে শেষ নবী (সঃ)-এর-আনুগত্যের দিকে আহবান করা হয় তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। এর দ্বারা তাদের বড় রকমের অবাধ্যতা, অহংকার এবং বিরোধিতা প্রকাশ পাচ্ছে। সত্যের এ বিরোধিতা ও বৃথা অবাধ্যতার উপর এ বিশ্বাসই তাদের সাহস

— ۲۳ —  
الَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا  
نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَبِ يُدْعَوْنَ  
إِلَى كِتَبِ اللَّهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ  
ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ  
مُّعَرِّضُونَ

— ۲۴ —  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا لَنَا  
تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَامًا  
مَعْدُودَةٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ  
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

— ۲۵ —  
فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ  
لَا رِبَّ فِيهِ وَوَقِيتُ كُلُّ نَفْسٍ  
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

যুগিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে না থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের পক্ষ হতে বানিয়ে নিয়ে বলেঃ 'আমরা তো নির্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র জাহানামে অবস্থান করবো।' অর্থাৎ মাত্র সাত দিন। দুনিয়ার হিসেবে প্রতি হাজার বছর পরে একদিন। এর পুরো তাফসীর সূরা-ই-বাকারায় হয়ে গেছে। এ বাজে ও অলীক কল্পনা তাদেরকে এ বাতিল ধীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। অথচ এটা স্বয়ং তাদেরও জানা আছে যে, না আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেছেন, না তাদের নিকট কোন কিতাবী দলীল রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধর্মকের সুরে বলেনঃ 'কিয়ামতের দিন তাদের কি অবস্থা হবেঃ তারা আল্লাহ তা'আলার উপর যিথে অপবাদ দিয়েছে, নবীদেরকে ও হক পছ্চী আলেমদেরকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদেরকে তাদের প্রত্যেকটি কাজের হিসেব দিতে হবে এবং এক একটি পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে। ঐদিনের আগমন সমস্কে কোনই সন্দেহ নেই। ঐদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারও উপর কোন প্রকারের অত্যাচার করা হবে না'।

## ২৬। তুমি বল- হে রাজ্যাধিপতি

আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছে  
রাজত্ব দান করেন এবং যার  
নিকট হতে ইচ্ছে রাজত্ব  
ছিনিয়ে নেন, যাকে ইচ্ছে  
সম্মান দান করেন এবং যাকে  
ইচ্ছে লাখ্তি করেন;  
আপনরাই হতে কল্যাণ,  
নিশ্চয়ই আপনি সর্ব  
বিষয়োপরি ক্ষমতবান।

٤٦- قُلْ اللَّهُمَّ مِلِكَ الْمُلْكِ  
تُؤْتِي الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ  
الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعِزِّزُ مِنْ  
تَشَاءُ وَتُؤْتِي مِنْ تَشَاءُ وَتُحْرِكُ  
الْخَيْرَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ

## ২৭। আপনি রজনীকে দিবসে পরিবর্তিত করেন এবং দিবাকে নিশায় পরিণত করেন, এবং মৃত হতে জীবিতকে নিগত

٤٧- تُولِّي الْبَيْلَ فِي النَّهَارِ  
وَتُؤْلِّي النَّهَارَ فِي الْبَيْلِ  
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ

করেন এবং জীবিত হতে  
মৃতকে বহির্গত করেন এবং  
আপনি যাকে ইচ্ছে অপরিমিত  
জীবিকা দান করে থাকেন।

وَخْرُجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ  
وَتَرْزَقُ مِنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ  
حِسَابٍ

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'হে মুহাম্মদ (সঃ)! তুমি তোমার প্রভুর সম্মানার্থে  
এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে ও সমস্ত কাজ তাঁর নিকট সমর্পণের  
উদ্দেশ্যে তাঁর পবিত্র সন্তার উপর নির্ভর করতঃ উপরোক্ত শব্দগুলো দ্বারা তাঁর  
শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর।' অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি সাম্রাজ্যের অধিপতি। সমস্ত  
সাম্রাজ্য আপনারই অধিকারে রয়েছে। আপনি যাকে ইচ্ছে সাম্রাজ্য প্রদান করে  
থাকেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছে রাজ্য কেড়ে নেন। আপনিই প্রদানকারী।  
আপনি যা চান না তা হতে পারে না। এ আয়াতে এ কথার দিকেও ইঙ্গিত  
রয়েছে এবং ঐ নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও নির্দেশ.. রয়েছে যা  
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উম্মতকে দান করা হয়েছে। তা এই যে, বাণী ইসরাইল  
হতে নবুওয়াত ছিনিয়ে নিয়ে মক্কার নিরক্ষর, কুরায়েশী আরবী নবী হ্যরত  
মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-কে প্রদান করা হয়েছে। আর তাঁকে সাধারণভাবে  
নবীদের (আঃ) সমাঞ্জকারী এবং সমস্ত মানব ও দানবের রাসূল করে পাঠান  
হয়েছে। পূর্বের সমস্ত নবীর গুণাবলী তাঁর মধ্যে পুঁজীভূত করা হয়েছে এবং  
তাঁকে ঐসব ফয়েলত দান করা হয়েছে যা হতে অন্যান্য নবীগণ (আঃ) বাধিত  
ছিলেন। ঐ ফয়েলত আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সংস্কারেই হোক বা ঐ মহান প্রভুর  
শরীয়তের ব্যাপারেই হোক অথবা অতীত ও ভবিষ্যতের সংবাদ সম্পর্কেই হোক,  
আল্লাহ পাক তাঁর উপর পরকালের সমস্ত রহস্য খুলে দিয়েছেন, তাঁর উম্মতকে  
পূর্ব হতে পশ্চিমে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁর দ্বীন ও শরীয়তকে সমস্ত দ্বীন ও সমস্ত  
মায়হাবের উপর জয়যুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার দরুদ ও সালাম তাঁর  
প্রতি বর্ষিত হোক, আজ হতে কিয়ামত পর্যন্ত যতদিন দিবস-রজনীর আবর্তন  
চালু থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর যেন স্বীয় করুণা সদাসর্বদার জন্যে  
বর্ষণ করতে থাকেন। আমীন!

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-হে নবী (সঃ)! তুমি বল-“হে আল্লাহ!  
আপনিই স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে আবর্তন বিবর্তন এনে থাকেন। আপনি যা চান তাই  
করে থাকেন”। যারা বলেছিলঃ “দু’টি গ্রামের কোন একজন বড়লোকের উপর

কেন আল্লাহ তা'আলা এ কুরআন অবতীর্ণ করেননি”। তাদের এ কথা খণ্ডন করতঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكُمْ

অর্থাৎ ‘তারাই কি তোমার প্রভুর করুণা বন্টন করছে?’ (৪৩: ৩২) অর্থাৎ ‘আমি যখন তাদের আহার্যেরও মালিক, যাকে চাই কম দেই এবং যাকে চাই বেশী দেই, তখন এরা আমার উপর হৃকুম চালাবার কে যে, আমি অমুককে কেন নবী করলাম? নবুওয়াতও আমারই অধিকারের জিনিস। নবুওয়াত প্রাণ্তির যোগ্য কোন্ ব্যক্তি তা আমিই জানি।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

اللَّهُ أَعْلَمُ بِحِيثِ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

অর্থাৎ ‘যেখানেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রিসালাত অবতীর্ণ করেন তা তিনিই ভাল জানেন।’ (৬: ১২৪) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

অর্থাৎ ‘তুমি লক্ষ্য কর যে, কিরূপে তাদের পরস্পরের মধ্যে এককে অপরের উপর উৎকৃষ্টতা দান করেছি।’ (১৭: ২১)

অতঃপর বলা হচ্ছে- ‘আপনিই রাত্রির অতিরিক্ত অংশ দিনের কমতির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দিন-রাত্রি সমান করে থাকেন। আবার এদিকের অংশ ওদিকে দিয়ে ঐ দু'টোকেই ছোট বড় করেন এবং পুনরায় সমান সমান করে থাকেন। আকাশ ও পৃথিবীর উপর এবং স্র্য ও চন্দ্রের উপর পূর্ণ আধিপত্য আপনারই রয়েছে। অনুরূপভাবে গ্রীষ্মকে শীতের সাথে পরিবর্তন করারও পূর্ণ ক্ষমতা আপনারই আছে। বসন্তকাল ও শরৎকালের উপর আপনিই ক্ষমতাবান। আপনিই জীবিত হতে মৃতকে এবং মৃত হতে জীবিতকে বের করে থাকেন। ক্ষেত্র শস্য হতে এবং শস্য ক্ষেত্র হতে বের করারও ক্ষমতা আপনারই। খেজুর গাছ আঁটি হতে এবং আঁটি খেজুর হতে আপনিই সৃষ্টি করে থাকেন। মুমিনকে কফিরের ওরষে এবং কফিরকে মুমিনের ওরষে আপনিই জন্মাদান করে থাকেন এবং মুরগী ডিম হতে এবং ডিম মুরগী হতে সৃষ্টি করাও আপনারই কাজ। এ রকমই সমস্ত জিনিসই আপনার অধিকারে রয়েছে। আপনি যাকে ইচ্ছে করেন এত ধন-সম্পদ প্রদান করেন যা গণনা করে ও পরিমাপ করে শেষ করা যায় না। আবার যাকে ইচ্ছে করেন ক্ষুধা নিবারণের আহার্য পর্যন্ত প্রদান করেন না। আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনার এ সমস্ত কাজ নিপুণতায় পরিপূর্ণ এবং

সবকিছুই আপনারই ইচ্ছানুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে'। তাবরানীর হাদীসে রয়েছে যে, قُلِ اللَّهُمَّ ملِكُ الْمُلْكِ - এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার 'ইসম-ই-আয়ম' রয়েছে। এ নামের মাধ্যমে তাঁর নিকট প্রার্থনা জানালে তিনি তা কবুল করে থাকেন।

২৮। মুমিনগণ যেন মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বঙ্গুরপে গ্রহণ না করে; এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এক্লপ করে সে আল্লাহর নিকট কিছুই নয়; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন কাফিরদের সাথে বঙ্গুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন না করে এবং তাদের পরম্পরের মধ্যে প্রণয় ও ভালবাসা থাকা উচিত। অতঃপর তিনি সতর্ক করে বলছেন যে, এক্লপ যে ব্যক্তি করবে অর্থাৎ অবিশ্঵াসীদের সাথে মিত্রতা করবে তার প্রতি তিনি রাগাভিত হয়ে যাবেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে:

يَا يَهُآ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْجِعُوا عَدُوِّيْ وَعَدُوكُمْ اُولِيَّاءَ

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা আমার শক্র ও তোমাদের শক্রদের সাথে বঙ্গুত্ব স্থাপন করো না'। (৬০: ১) অন্য স্থানে রয়েছে: 'হে মুমিনগণ! এই ইয়াহুন্দী এবং খ্রীষ্টানেরা পরম্পর বঙ্গু, তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের সাথে বঙ্গুত্ব স্থাপন করবে সে তাদেরই অস্তর্ভুক্ত।' অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা মুহাজির, আনসার ও অন্যান্য মুসলমানদের ভাতৃত্বের উল্লেখ করে বলেনঃ 'অবিশ্বাসকারীরা পরম্পর বঙ্গু, তোমরা যদি এক্লপ না কর তবে পৃথিবীর পৃষ্ঠে গওগোলের সৃষ্টি হবে এবং ভীষণ হাঙ্গামা সংঘটিত হবে।'

- ২৮ -  
لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ  
الْكُفَّارِينَ أُولِيَّاءَ مِنْ دُونِ  
الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا  
أَنْ تَتَقَوَّلُهُمْ تَقْبَةً وَيَحْذِرُكُمْ  
اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

অতঃপর আল্লাহ পাক ঐ লোকদেরকে অনুমতি দেন যারা কোন শহরে কোন সময় অবিশ্বাসীদের অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে মৌখিক তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখে কিন্তু তাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখে না। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে হ্যরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ ‘কোন কোন গোত্রের সাথে আমরা প্রশংস্ত বদনে মিলিত হই, কিন্তু আমাদের অন্তর তাদের প্রতি অভিশাপ দেয়।’ হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) বলেনঃ ‘শুধু মুখে বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে হবে কিন্তু কাজে-কর্মে এরূপ অবস্থাতেও কখনও তাদের সহযোগিতা করতে হবে না।’ এ উক্তিটিই অন্যান্য ব্যাখ্যাকারী হতেও বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের ঘোষণাটিতেও এ উক্তিরই সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেনঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أُكْرِهَ وَقُلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ -

অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি ঈমান আনয়নের পর আল্লাহর সাথে কুফরী করে কিন্তু যার প্রতি জবরদস্তি করা হয়েছে এবং তার অন্তর ঈমানের সাথে শান্তি প্রাপ্ত (অসমাঞ্ছ আয়াত)।’ (১৬ঃ ১০৬)

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হ্যরত হাসান (রাঃ) বলেনঃ ‘কিয়ামত পর্যন্তই এ নির্দেশ।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় অস্তিত্বের ভয়প্রদর্শন করছেন।’ অর্থাৎ তিনি ঐ লোকদেরকে স্বীয় শান্তির ভয় প্রদর্শন করছেন যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করতঃ তাঁর শক্রদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে এবং তাঁর বন্ধুদের সাথে শক্রতা পোষণ করছে।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে।’ প্রত্যেকেই তাঁর কাছে স্বীয় কার্যের প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। ‘মুসনাদ ইবনে আবি হাতিম’ গ্রন্থে রয়েছে, হ্যরত মাইমুন ইবনে মাহরান বলেন, হ্যরত মু‘আয (রাঃ) দাঁড়িয়ে আমাদেরকে বলেনঃ ‘হে বানী আওদ! আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দৃতক্রমে তোমাদের নিকট আগমন করেছি। জেনে রেখো যে, আল্লাহর নিকট সকলকে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর অবস্থান স্থল হবে জান্নাত অথবা জাহানাম।’

২৯। তুমি বল- তোমাদের

অন্তরসমূহে যা রয়েছে তা যদি  
তোমরা গোপন কর অথবা  
প্রকাশ কর, আল্লাহ তা  
অবগত আছেন এবং

-২৯- قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي

صُدُورِكُمْ أَوْ تَبْدُوهُ يَعْلَمُ اللّٰهُ  
وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا

নভোমগুলে ও ভূমগুলে যা  
কিছু রয়েছে আল্লাহ তা  
পরিজ্ঞাত আছেন; এবং  
আল্লাহ সর্ব-বিশ্বাপনি  
শক্তিমান।

৩০। যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি  
সৎকর্ম হতে যা করেছে ও  
দুষ্কর্ম হতে যা করেছে তা  
মওজুদ পাবে; তখন সে ইচ্ছে  
করবে যে, যদি তার মধ্যেও  
ঐ দুষ্কর্মের মধ্যে সুদূর  
ব্যবধান হতো এবং আল্লাহ  
তা'আলা তোমাদেরকে সীয়া  
পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন  
করছেন এবং আল্লাহ সীয়া  
বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল।

فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ

۳۰۔ یوْمَ تَجْدُدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا  
عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضِّرًا وَمَا  
عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تُودِلُ وَانْ  
بَيْتُهَا وَيَنْهَا أَمَدًا بَعِيدًا  
وَيَحْتَرِكُمُ اللَّهُ نَفْسُهُ وَاللَّهُ  
رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

(৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কথাই ভালই  
জানেন। কোন ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রমত কথাও তাঁর নিকট লুকায়িত থাকে না। তাঁর  
জ্ঞান সমস্ত জিনিসকে প্রতি মুহূর্তে বেষ্টন করে রয়েছে। পৃথিবী প্রান্তে, পর্বতে,  
সমুদ্রে, আকাশে, বাতাসে, ছিদ্রে মোটকথা যেখানে যা কিছু আছে সবই তাঁর  
গোচরে রয়েছে। সব কিছুর উপরেই তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা বিদ্যমান। তিনি যেভাবেই  
চান রাখেন, যাকে ইচ্ছে করেন শাস্তি দেন। সুতরাং এত ব্যাপক জ্ঞানের  
অধিকারী ও এতবড় ক্ষমতাবান হতে সকলেরই সদা ভীত-সন্ত্রিপ্ত থাকা,  
সদা-সর্বদা তাঁর আদেশ পালনে নিয়োজিত থাকা এবং অবাধ্যতা হতে বিরত  
থাকা উচিত। তিনি সবজান্তাও বটে এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারীও বটে।  
সম্ভবতঃ তিনি কাউকে ঢিল দিয়ে রাখবেন, কিন্তু যখন ধরবেন তখন এমন  
কঠিনভাবে ধরবেন যে, পালিয়ে যাবার কোন উপায় থাকবে না। এমন একদিন  
আসবে যেদিন সমস্ত ভাল-মন্দ কাজের হিসেব সামনে রেখে দেয়া হবে। পুণ্যের  
কাজ দেখে আনন্দ লাভ হবে এবং মন্দ কাজ দেখে দাঁত কামড়াতে থাকবে ও  
হা-হতাশ করবে। সেদিন তারা ইচ্ছে পোষণ করবে যে, যদি তার মধ্যে ও এই

মন্দ কার্যের মধ্যে বহু দূরের ব্যবধান থাকতো তবে কতই না চমৎকার হতো! কুরআন কারীমের আর এক স্থানে ঘোষিত হয়েছে:

يَنْبَئُوا إِلَّا إِنْسَانٌ يُومَئِذٍ مَا قَدِمَ وَأَخْرَى

অর্থাৎ ‘সেদিন মানুষকে তার পূর্বের ও পরের কৃৎকর্মের সংবাদ দেয়া হবে।’ (৭৫: ১৩) দুনিয়ায় যে শয়তান তার সঙ্গে থাকতো এবং তাকে অন্যায় কার্যে উভেজিত করতো সেদিন তার উপরও সে অসম্ভুষ্টি প্রকাশ করবে এবং বলবেং

يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمُشْرِقَيْنِ فَيَئِسَ الْقَرِينُ

অর্থাৎ ‘হে শয়তান, যদি তোমার ও আমার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান হতো তবে কতই না ভাল হতো! তুমি মন্দ সাথী।’ (৪৩: ৩৮)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন—‘আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় অস্তিত্ব হতে অর্থাৎ স্বীয় শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করছেন।’ অতঃপর তিনি স্বীয় সৎ বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁর দয়া ও স্নেহ হতেও নিরাশ না হয়। কেননা, তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহশীল। ইমাম হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ ‘এটা ও তাঁর সরাসরি দয়া ও ভালবাসা যে, তিনি স্বীয় অস্তিত্ব হতে বান্দাদেরকে ভয় দেখিয়েছেন।’ এও ভাবার্থ হতে পারে যে, আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। সুতরাং বান্দাদেরও উচিত যে, তারা যেন সরল-সঠিক পথ হতে সরে না পড়ে, পবিত্র ধর্মকে পরিত্যাগ না করে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে না নেয়।

### ৩১। তুমি বল- যদি তোমরা

আল্লাহকে ভালবাস তবে  
আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ  
তোমাদেরকে ভালবাসবেন ও  
তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা  
করবেন; এবং আল্লাহ  
ক্ষমাশীল, করুণাময়।

### ৩২। তুমি বল- তোমরা আল্লাহ

ও রাসূলের অনুসরণ কর;  
কিন্তু যদি তারা কিরে যায়,  
তবে নিচয়ই আল্লাহ  
অবিশ্বাসীদেরকে ভালবাসেন  
না।

- ৩১ -  
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ

وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

- ২৩ -  
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْكُفَّارِ

এ পবিত্র আয়াতটি মীমাংসা করে দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসার দাবী করে, কিন্তু তার আমল ও বিশ্বাস যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশের অনুরূপ না হয় এবং সে তাঁর সুন্নাতের অনুসারী না হয়, তবে সে তার এ দাবীতে মিথ্যাবাদী। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি কোন এমন কাজ করে যার উপর আমার নির্দেশ নেই তা অগ্রাহ্য।’ এ জন্যেই এখানেও ইরশাদ হচ্ছে-‘যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে ভালবাসা রাখার দাবীতে সত্যবাদী হও তবে আমার সুন্নাতের উপর আমল কর। সে সময় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের চাহিদা অপেক্ষা বেশী দান করবেন অর্থাৎ স্বয়ং তিনিই তোমাদেরকে চাইবেন’। যেমন বিজ্ঞ আলেমগণ বলেছেনঃ ‘তোমার চাওয়া কোন জিনিসই নয়, মজা ও স্বাদ তো ওর মধ্যেই রয়েছে যে, স্বয়ং আল্লাহ তোমাকে চাইতে থাকেন।’ মোটকথা আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা রাখার পরিচয় এই যে, প্রতিটি কাজে সুন্নাতের প্রতি আনুগত্যই হবে একমাত্র লক্ষ্যবস্তু।

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘তীন হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্যে ভালবাসা ও তাঁরই জন্যে শক্তির নাম।’ অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। কিন্তু সনদ হিসেবে হাদীসটি ‘মুনকার’। অতঃপর বলা হচ্ছে-‘হাদীসের উপর চলার কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত পাপ মার্জনা করে দেবেন।’ এরপর সর্বসাধারণের উপর নির্দেশ হচ্ছে যে, তারা যেন সবাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করে। যারা এরপর থেকে ফিরে যাবে অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য হতে সরে পড়বে তারা কাফির এবং আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে ভালবাসেন না। যদিও তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-কে ভালবাসার দাবী করে কিন্তু যে পর্যন্ত তারা আল্লাহ তা'আলার সত্যবাদী, নিরক্ষর, রাসূলগণের (আঃ) সমান্তি আনয়নকারী এবং দানব ও মানবের নবী (সঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ না করবে সেই পর্যন্ত তারা তাদের এ দাবীতে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এমনই রাসূল যে, যদি আজ নবীগণ (আঃ) এমনকি স্থির প্রতিজ্ঞ রাসূলগণও (আঃ) জীবিত থাকতেন তবে তাঁদেরও এ রাসূল (সঃ)-কে ও তাঁর শরীয়তকে মান্য করা ছাড়া উপায় ছিল না। এর বিস্তারিত বিবরণ (৩: ৮১) -এ আয়াতের তাফসীরে ইনশা আল্লাহ আসবে।

সূরাঃ আলে ইমরান ৩

৩৩। নিক্ষয়ই আল্লাহ আদমকে ও  
নৃহকে এবং ইবরাহীমের  
সন্তানগণকে ও ইমরানের  
সন্তানগণকে বিশ্ব জগতের  
উপর মনোনীত করেছেন ।

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ادْمَ وَنُوحًا  
وَالْأَبْرَاهِيمَ وَالْعَمَرَنَ عَلَى  
الْعَلَمِينَ ۝

৩৪। তারা একে অপরের সন্তান  
এবং আল্লাহ শ্রবণকারী  
মহাজ্ঞানী ।

ذِرِيهٍ بعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۝  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

অর্থাৎ এ মহামানবগণকে আল্লাহ তা'আলা সারা বিশ্বের উপর মনোনীত করেছেন । হ্যরত আদম (আঃ)-কে তিনি স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মধ্যে স্বীয় রূহ প্রবেশ করিয়েছেন, তাঁকে সমস্ত জিনিসের নাম বলে দিয়েছেন, তাঁকে জান্নাতে বাস করিয়েছেন এবং স্বীয় নৈপুণ্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে অঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেন । যখন সারা জগত প্রতিমা পূজায় ছেয়ে যায় তখন হ্যরত নৃহ (আঃ)-কে প্রথম রাসূল রূপে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন । অতঃপর যখন তাঁর গোত্র তাঁর অবাধ্য হয়ে যায় এবং তাঁর হিদায়াতের উপর আমল করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তখন তিনি রাতদিন প্রকাশ্য ও গোপনে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করতে থাকেন, কিন্তু তারা কোনমতেই তাঁর কথায় কর্ণপাত করে না । তখন আল্লাহ তা'আলা হ্যরত নৃহ (আঃ)-এর অনুসারীগণ ছাড়া অন্য সকলকে স্বীয় পানির শাস্তি অর্থাৎ বিখ্যাত 'নৃহের তুফানে' ডুবিয়ে দেন । হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশকে আল্লাহ তা'আলা মনোনয়ন দান করেন । তাঁর বংশেই মানব জাতির নেতা এবং নবীদের (আঃ) সমান্তরালী হ্যরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) জন্মগ্রহণ করেন । ইমরান (আঃ)-এর বংশকেও তিনি মনোনীত করেন । ইমরান হ্যরত ইস্রাইল (আঃ)-এর জননী হ্যরত মারহিয়াম (আঃ)-এর পিতার নাম । মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রঃ)-এর উক্তি অনুসারে তাঁর বংশলতা নিম্নরূপঃ ইমরান ইবনে হাশিম ইবনে মীশা ইবনে হিশকিয়া ইবনে ইবরাহীম ইবনে গারহিয়া ইবনে নাওশ ইবনে আয়র ইবনে বাহওয়া ইবনে মুকাসিত ইবনে আয়শা ইবনে আইয়াম ইবনে সুলায়মান (আঃ) ইবনে দাউদ (আঃ) । সুতরাং হ্যরত ইস্রাইল (আঃ) হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর । এর বিজ্ঞারিত বর্ণনা ইনশাআল্লাহ সূরা-ই-আনআমের তাফসীরে আসবে ।

সূরাঃ আলে ইমরান ত

৩৫। যখন ইমরান পঞ্জী নিবেদন

করলো, হে আমার  
প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার  
গর্ভে যা রয়েছে, তা আমি মুক্ত  
করে আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ  
করলাম, সুতরাং আপনি আমা  
হতে তা প্রহণ করুন, নিশ্চয়ই  
আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

৩৬। অনন্তর যখন সে তা প্রসব

করলো তখন বললো-হে  
আমার প্রতিপালক! আমি তো  
কন্যা প্রসব করেছি; এবং সে  
যা প্রসব করেছে তা আল্লাহ  
সম্যক অবগত আছেন এবং  
ঐ পুত্র এ কন্যার সমকক্ষ নয়;  
আর আমি কন্যার নাম  
রাখলাম, ‘মারইয়াম’ এবং  
আমি তাকে ও তার  
সন্তানগণকে বিতাড়িত  
শয়তান হতে আপনার আশ্রয়ে  
সমর্পণ করলাম।

হ্যরত ইমরানের যে পঞ্জী হ্যরত মারইয়াম (আঃ)-এর মা ছিলেন তাঁর নাম  
ছিল হিন্না বিনতে ফাকুয়। হ্যরত মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেনঃ ‘তাঁর  
ছেলে মেয়ে হতো না। একদা তিনি একটি পাখীকে দেখেন যে, সে তার  
বাচ্চাগুলোকে আদর করছে। এতে তাঁর অন্তরে সন্তানের বাসনা জেগে উঠে। ঐ  
সময়েই তিনি আল্লাহ তা‘আলার নিকট আন্তরিকতার সাথে সন্তানের জন্য  
প্রার্থনা করেন। আল্লাহ পাকও তাঁর প্রার্থনা কবূল করেন; ঐ রাত্রেই তিনি  
গর্ভবতী হন।’

গর্ভ ধারণের পূর্ণ বিশ্বাস হলে তিনি আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন  
(ন্যর মানেন) যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে সন্তান দান করলে তিনি তাঁকে

৩৫- إِذْ قَالَتِ امْرَأٌ عُمْرَنَ رَبِّهِ  
إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي  
مُحَرَّرًا فَتَقْبَلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ  
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

৩৬- فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبُّهَا  
إِنِّي وَضَعْتُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَعْلَمُ  
بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكْرُ  
كَالانْشَى وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرِيمَ  
وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنْ  
الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝

বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে আযাদ করে দেবেন। অতঃপর পুনরায় তিনি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেনঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার এই নিষ্কলুষ ন্যয় কবুল করুন। আপনি আমার প্রার্থনা শুনতে রয়েছেন এবং আমার নিয়তের কথাও আপনি খুব অবগত আছেন’। তখন পুত্র সন্তান হবে কি কন্যা সন্তান হবে তাতো আর জানা ছিল না। কাজেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে দেখা যায়, তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। আর বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবা কার্য পরিচালনার যোগ্যতা কন্যা সন্তানের থাকতে পারে না। ওর জন্যে তো পুত্র সন্তানের প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে স্বীয় দুর্বলতার কথা আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রকাশ করতঃ বলেনঃ ‘হে আল্লাহ! আমি তো তাকে আপনার নামে আযাদ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু এ যে কন্যা হয়ে গেল’। *وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ* এরপও পড়া হয়েছে। অর্থাৎ এ উক্তিটি হ্যরত হিন্নারই ছিল। তাহলে অর্থ হবে ‘আমি যে কন্যা সন্তান প্রসব করেছি তা আল্লাহ তা‘আলা খুব ভাল জানেন।’ আবার ‘অ্যাআত’ও পড়া হয়েছে। তখন অর্থ হবে সে যে কি সন্তান প্রসব করেছে তা আল্লাহ তা‘আলা খুব ভাল জানেন।’ হ্যরত হিন্না বলেনঃ ‘নর ও নারী সমান নয়। আমি তার ‘নাম মারইয়াম রাখলাম।’ এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জন্মের দিনও শিশুর নাম রাখা বৈধ। কেননা, পূর্ববর্তীদের শরীয়তও আমাদের শরীয়ত। আর এখানে এটা বর্ণনা করা হয়েছে এবং খণ্ড করা হয়নি। বরং ওটাকে ঠিকই রাখা হয়েছে। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আজ রাত্রে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার নাম আমি আমার পিতা হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নামানুসারে ইবরাহীম রেখেছি’। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

হ্যরত আনাস (রাঃ)-এর একটি ভাই জন্মগ্রহণ করলে তিনি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বহস্তে তার মুখে খাবার পুরে দেন এবং তার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। এ হাদীসটি ও সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেনঃ ‘হে আল্লাহ রাসূল! রাত্রে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। তার নাম কি রাখবো?’ তিনি বলেনঃ “আবদুর রাহমান রাখ”-সহীহ বুখারী। আর একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, হ্যরত আবু উসায়েদ (রাঃ)-এর একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাকে নিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হন, যেন

তিনি স্বীয় পবিত্র হস্তে তার মুখে খাবার পুরে দেন। তিনি অন্য দিকে মনোযোগ দেন এবং শিশুটির কথা বিশ্বরণ হন। হ্যরত উসায়েদ (রাঃ) শিশুটিকে বাড়ী পাঠিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) অবকাশ প্রাপ্ত হয়ে শিশুটির কথা খেয়াল করেন এবং তাকে দেখতে না পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতঃ অবস্থা জানতে পেরে বলেনঃ “তার নাম রাখ মুন্যির (অর্থাৎ ভয় প্রদর্শক)।” মুসনাদ-ই-আহ্মাদ ও সুনানের মধ্যে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যাকে ইমাম তিরমিয়ী বিশুদ্ধ বলেছেন, তা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “প্রত্যেক শিশু স্বীয় ‘আকীকায় বন্ধক থাকে। সগুম দিনে আকীকাহ দিতে হবে অর্থাৎ জন্ম ঘটবে করতে হবে, শিশুর নাম রাখতে হবে এবং মন্তক মুণ্ডন করতে হবে।” অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রক্তপাত করতে হবে। এ বর্ণনাটিই বেশী সঠিক রূপে প্রমাণিত। কিন্তু যুবাইর ইবনে বাকারের বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় পুত্র হ্যরত ইবরাহীম (রাঃ)-এর ‘আকীকাহ’ করেছিলেন এবং নাম রেখেছিলেন ইবরাহীম (রাঃ)। এ হাদীসটি সনদ দ্বারা সাব্যস্ত নয় এবং এর বিপরীত বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। সামঞ্জস্য এভাবে হতে পারে যে, ঐদিনে ঐ নামটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। হ্যরত মারইয়াম (আঃ)-এর মাতাও স্বীয় শিশু কন্যাকে ও তার ভবিষ্যৎ সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহ তা‘আলার আশ্রয়ে সমর্পণ করেন। মহান আল্লাহ তাঁর এ প্রার্থনাটি কবৃল করেন। ‘মুসনাদ-ই-আবদুর রাজ্জাকের’ মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘শয়তান প্রত্যেক শিশুকেই তার জন্মের সময় আঘাত করে, ওরই কারণে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠে। কিন্তু হ্যরত মারইয়াম (আঃ) ও হ্যরত ঈসা (আঃ) এটা হতে রক্ষা পেয়েছিলেন।’ এ হাদীসটি বর্ণনা করে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ ‘তোমরা ইচ্ছে করলে কَإِنِّي أَعِذُّهُمْ بِكَ-এ আয়াতটি পড়ে নাও।’ এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে। এটা আরও বহু কিতাবে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে। কোন একটিতে রয়েছে যে, এক ঘা বা দু’ ঘা দেয়। একটি হাদীসে শুধুমাত্র হ্যরত ঈসারই (আঃ) উল্লেখ আছে যে, শয়তান তাঁকেও ঘা দিতে চেয়েছিল কিন্তু তাঁকে লাগেনি, পর্দায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

৩৭। অনন্তর তাঁর প্রভু তাঁকে  
উত্তমরূপে গ্রহণ করলেন এবং  
তাঁকে উত্তম ধরনে বর্ধিত

৩৭ - فَتَقْبَلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسِينٍ  
وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا

করলেন এবং যাকারিয়াকে  
তার ভারাপর্ণ করলেন; যখনই  
যাকারিয়া তার নিকট উক্ত  
প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতো, তখন  
তার নিকট খাদ্যসম্ভার প্রাপ্ত  
হতো; সে বলতো, হে  
মারইয়াম! এটা কোথা হতে  
প্রাপ্ত হলে? সে বলতো, এটা  
আল্লাহর নিকট হতে; নিচয়ই  
আল্লাহ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত  
জীবিকা দান করেন।

رِزْقًا مَّنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
يُرْزِقُ مَنْ يُشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ  
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
رِزْقًا قَالَ يَمْرِيمُ أَنِّي لَكِ هَذَا  
رِزْقٌ مَّا كُلْمَاءَ دَخَلَ عَلَيْهَا

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, হ্যরত হিন্নার ‘নয়র’ তিনি সন্তুষ্টচিত্তে  
গ্রহণ করেন এবং তাঁকে উত্তমরূপে বর্ধিত করেন। তাঁকে তিনি বাহ্যিক ও  
আধ্যাত্মিক উভয় সৌন্দর্যই দান করেন এবং সৎ বান্দাদের মধ্যে তাঁর  
লালন-পালনের ব্যবস্থা করেন যেন তিনি চরিত্রবান লোকদের সংস্পর্শে থেকে  
তাঁদের নিকট ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। হ্যরত যাকারিয়া (আঃ)-কে  
তিনি হ্যরত মারইয়াম (আঃ)-এর দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ইবনে ইসহাক  
(রঃ) বলেনঃ হ্যরত মারইয়াম (আঃ) পিতৃহীনা হয়েছিলেন বলে হ্যরত  
যাকারিয়া (আঃ)-কে তাঁর লালন-পালনের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। কিন্তু  
অন্যান্য মনীষীগণ বলেন যে, সে সময় দেশে দুর্ভিক্ষ পড়েছিল বলে হ্যরত  
যাকারিয়া (আঃ) তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। হয়তো দু'টি কারণই ছিল।  
হ্যরত ইবনে ইসহাক (রঃ) প্রত্তি মনীষীর বর্ণনানুযায়ী জানা যায় যে, হ্যরত  
যাকারিয়া (আঃ) হ্যরত মারইয়াম (আঃ)-এর খালু ছিলেন। আবার কেউ কেউ  
বলেন যে, তিনি তাঁর ভগ্নিপতি ছিলেন। যেমন মিরাজ সম্বলিত বিশুদ্ধ হাদীসে  
বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত ইয়াহইয়া ও হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর  
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যাঁরা পরম্পর খালোতো ভাই ছিলেন। হ্যরত ইবনে ইসহাক  
(রঃ)-এর উক্তি অনুসারে এ হাদীসটি বিশুদ্ধ। কেননা, আরবের পরিভাষায়  
মায়ের খালার ছেলেকেও খালাতো ভাই বলা হয়ে থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হলো  
যে, হ্যরত মারইয়াম (আঃ) স্বীয় খালার নিকট লালিতা-পালিতা হন। বিশুদ্ধ  
হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত হাময়া (রাঃ) -এর পিতৃহীনা কন্যা

উমরা (রাঃ)-কে তাঁর খালা হ্যরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ)-এর স্ত্রীর নিকট সমর্পণ করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ ‘খালা হচ্ছেন মায়ের স্ত্রীভিষিক্ত।’

এখন আল্লাহ তা'আলা হ্যরত মারইয়াম (আঃ)-এর মাহাত্ম্য ও অলৌকিকতা বর্ণনা করছেন যে, হ্যরত যাকারিয়া (আঃ) যখনই হ্যরত মারইয়াম (আঃ)-এর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতেন তখনই তাঁর নিকট অসময়ের ফল দেখতে পেতেন। যেমন শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফল এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফল। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ), হ্যরত ইকরামা (রাঃ), হ্যরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ), হ্যরত আবুশ শা'শা' (রঃ), হ্যরত ইবরাহীম নাখঙ্গি (রঃ), হ্যরত যহহাক (রঃ), হ্যরত কাতাদা (রঃ), হ্যরত রাবী' ইবনে আনাস (রঃ), হ্যরত আতিয়া আওফী (রঃ) এবং হ্যরত সুন্দী (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে একথাই বলেন। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, এখানে রিয়্ক -এর ভাবার্থ হচ্ছে জ্ঞান ও ঐ পুস্তিকা যার মধ্যে জ্ঞানপূর্ণ কথা লিপিবদ্ধ থাকতো। কিন্তু প্রথম উক্তিটি অধিকতর সঠিক। এ আয়াত আল্লাহর অলীদের ‘কারামতের’ দলীল। এটা সাব্যস্ত করণে বহু হাদীসও এসেছে। ”

হ্যরত যাকারিয়া (আঃ) একদিন জিজ্ঞেস করেনঃ “হে মারইয়াম! তোমার নিকট এ আহার্যগুলো কোথা হতে আসে?” তিনি উন্নরে বলেনঃ ‘এগুলো আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে এসে থাকে। তিনি যাকে ইচ্ছে অপরিমিত জীবিকা দান করে থাকেন।’ মুসনাদ-ই-হাফিয আবু ইয়ালা’র মধ্যে হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কয়েকদিন কিছু না খেয়েই কেটে যায়। ক্ষুধায় তাঁর কষ্ট হতে থাকে। তিনি তাঁর সমস্ত সহধর্মীর বাড়ীতে গমন করেন। কিন্তু সব জায়গা থেকেই তাঁকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়। অবশেষে তিনি হ্যরত ফাতিমা (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন এবং বলেনঃ ‘হে কল্যাণ আমার! তোমার নিকট আমার খাওয়ার মত কিছু আছে কি? আমি ক্ষুধার্ত।’ তিনি বলেনঃ ‘আমার বাপ-মা আপনার উপর কুরবান হোন, আল্লাহর শপথ! আমার নিকট কিছুই নেই।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর নিকট থেকে বের হয়েছেন এমন সময় হ্যরত ফাতিমা (রাঃ)-এর দাসী তাঁর নিকট দু'টি ঝুঁটি ও এক টুকরা গোশ্ত পাঠিয়ে দেন। হ্যরত ফাতিমা (রাঃ) এগুলো একটি বাসনে রেখে বলেনঃ ‘আমি, আমার স্বামী ও সন্তানাদি সবাই ক্ষুধার্ত রয়েছি। কিন্তু আমরা সবাই ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই কাটিয়ে দেবো এবং আল্লাহর শপথ! আজ এগুলো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কেই দিয়ে দেবো।’ অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ডেকে আনার জন্যে হ্যরত হাসান (রাঃ) ও হ্যরত হুসাইন (রাঃ)-কে তাঁর খিদমতে পাঠিয়ে দেন। তিনি পথেই ছিলেন, সুতরাং ফিরে আসলেন।

হ্যরত ফাতিমা (রাঃ) বলেনঃ ‘আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোন, আল্লাহ পাক কিছু পাঠিয়ে দিয়েছেন যা আমি আপনার জন্যে লুকিয়ে রেখেছি’। তিনি বলেনঃ ‘হে আমার প্রিয় মেয়ে! নিয়ে এসো’। হ্যরত ফাতিমা (রাঃ) পাত্র খুলেই দেখেন যে, তা ঝুঁটি ও গোশ্তে পরিপূর্ণ রয়েছে। এ দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিতা হয়ে পড়েন। কিন্তু সাথে সাথেই তিনি বুঝে নেন যে, মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এতে বরকত দান করা হয়েছে। অতএব তিনি আল্লাহ তা‘আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও নবী (সঃ)-এর উপর দরুদ পাঠ করতঃ ঐগুলো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে এনে হাফির করেন। তিনিও ঐগুলো দেখে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করেন এবং জিজ্ঞেস করেনঃ ‘হে আমার প্রিয় মেয়ে! এগুলো কোথা হতে এলো?’ তিনি বলেনঃ ‘হে পিতঃ! এগুলো আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে এসেছে। তিনি যাকে ইচ্ছে অপরিমিত জীবিকা দান করেন’। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ হে আমার প্রিয় কন্যা! আল্লাহ তা‘আলার সমুদয় প্রশংসা যে, তিনি তোমাকে বানী ইসরাইলের সমস্ত নারীর নেতৃত্ব মত করেছেন। যখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে কোন কিছু দান করতেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো তখন তিনি একথাই বলতেনঃ ‘এটা আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে এসেছে। তিনি যাকে ইচ্ছে অপরিমিত জীবিকা দান করে থাকেন’। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আলী (রাঃ)-কে ডেকে নেন এবং তিনি, হ্যরত আলী (রাঃ), হ্যরত ফাতিমা (রাঃ), হ্যরত হাসান (রাঃ), হ্যরত হসাইন (রাঃ) এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমস্ত সহধর্মীণী (রাঃ) ও আহলে বায়েত (রাঃ) পরিত্পুর হয়ে আহার করেন। তবুও আরও ততোটা বেঁচে গেলো যতটা পূর্বে ছিল। সেগুলো আশে-পাশের প্রতিবেশীদের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হলো। এই ছিলো আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে চরম বরকত ও দান।

### ৩৮। ঐ স্থানে যাকারিয়া তার

প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা  
করেছিল; সে বলেছিল— হে  
আমার প্রতিপালক! আমাকে  
আপনার নিকট হতে পবিত্র  
সন্তান প্রদান করুন; নিচয়ই  
আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

— ৩৮ —  
هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ  
قَالَ رَبِّيْ هَبْ لِيْ مِنْ لِدُنْكَ  
ذُرِيَّةً طَيْبَةً إِنَّكَ سَمِيعٌ  
الدُّعَاءُ ○

৩৯। অতঃপর যখন সে ‘মেহরাবের’ মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিল, তখন ফেরেশতাগণ তাঁকে সংশোধন করে বলেছিল, নিচয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্মক্ষে সুসংবাদ দিচ্ছেন- তার অবস্থা এই হবে যে, সে আল্লাহর একটি বাক্যের সত্যতা প্রকাশকারী হবে, নেতা হবে, স্বীয় প্রবৃত্তিকে খুব দমনকারী হবে। এবং সৎকর্মশালীগণের মধ্যে নবী হবে।

৪০। সে বলেছিল- হে আমার প্রতিপালক, কিরূপে আমার পুত্র হবে? এবং নিচয়ই আমার বার্ধক্য উপস্থিত হয়েছে ও আমার স্ত্রী বস্ত্র্যা; তিনি বললেন, এরূপে আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই করে থাকেন।

৪১। সে বলেছিল- হে আমার প্রভু! আমার জন্যে কোন নির্দর্শন নির্দিষ্ট করুন; তিনি বললেন, তোমার নির্দর্শন এই যে, তুমি তিন দিবস ইঙ্গিত ব্যতীত লোকের সাথে কথা বলতে পারবে না; আর স্বীয় প্রভুকে বিশেষভাবে স্মরণ কর এবং সঞ্চয় ও প্রভাতে তাঁর মহিমা বর্ণনা কর।

٣٩- فَنَادَهُ الْمَلِكُ وَهُوَ قَالِمٌ يَصْلِي فِي الْمِحْرَابِ  
أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ  
مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ  
وَسَيِّدًا وَحْصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ  
الصَّالِحِينَ ۝

٤- قَالَ رَبِّي أَنِّي يَكُونُ لِيْ  
غُلْمَانٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ  
وَأُمَرَاتِيْ عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ  
اللَّهُ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ ۝

٤١- قَالَ رَبِّيْ اجْعَلْ لِيْ آيَةً  
قَالَ اتَّيْتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ  
ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا وَإِذْكُرْ  
رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيْ  
وَإِلَبَكَارٍ ۝

হ্যরত যাকারিয়া (আঃ) দেখেন যে, আল্লাহ তা'আলা হ্যরত মারইয়াম (আঃ)-কে অসময়ের ফল দান করছেন। শীতকালে গ্রীষ্মকালের ফল এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালের ফল তাঁর নিকট বিদ্যমান থাকছে। সুতরাং তিনিও স্বীয় বার্ধক্য ও স্বীয় সহধর্মীণীর বন্ধ্যাতু জানা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার নিকট অসময়ে ফল অর্থাৎ সুসন্তান লাভের প্রার্থনা জানাতে থাকেন। আর যেহেতু এটা বাহ্যতঃ অসম্ভব জিনিস ছিল, তাই তিনি অতি সন্তর্পণে এ প্রার্থনা জানান। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ ‘নেদায়ান খাফীয়া’ অর্থাৎ ‘গোপন প্রার্থনা।’ তিনি তাঁর ইবাদতখানাতেই ছিলেন, এমন সময় ফেরেশতাগণ তাঁকে ডাক দিয়ে বলেনঃ ‘আপনার একটি পুত্র সন্তান জন্মাবস্থণ করবে যার নাম ইয়াহইয়া রাখতে হবে।’ সাথে সাথে তাঁরা একথাও বলে দেনঃ ‘এ সুসংবাদ আমাদের পক্ষ থেকে নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে।’ ইয়াহইয়া নাম রাখার কারণ এই যে, তাঁর জীবন হবে ঈমানের সাথে। তিনি আল্লাহর কালেমা অর্থাৎ হ্যরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-এর সত্যতা প্রকাশ করবেন। হ্যরত রাবী’ ইবনে আনাস (রাঃ) বলেনঃ ‘হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়াতের প্রথম স্বীকারকারীও হচ্ছেন হ্যরত ইয়াহইয়া (আঃ)।’ হ্যরত কাতাদা (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, হ্যরত ইয়াহইয়া (আঃ) ঠিক হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর পথের উপর ছিলেন। হ্যরত ইবনে আকবাস (রাঃ) বলেন যে, এ দু’জন পরম্পর খালাতো ভাই ছিলেন। হ্যরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর মা প্রায়ই হ্যরত মারইয়াম (আঃ)-কে বলতেনঃ ‘আমি আমার গর্ভের জিনিসকে দেখতে পাচ্ছি যে, সে তোমার গর্ভের জিনিসকে সিজদা করছে।’ এটা ছিল হ্যরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর সত্যতা প্রকাশ তাঁর দুনিয়ায় আগমনের পূর্বেই। সর্বপ্রথম তিনিই হ্যরত ঈসা (আঃ) -এর সত্যতা অবগত হয়েছিলেন। তিনি বয়সে হ্যরত ঈসা (আঃ) অপেক্ষা বড় ছিলেন। **سَيِّد** শব্দের অর্থ হচ্ছে ধৈর্যশীল, বিদ্যা ও ইবাদতে অগ্রবর্তী, মুক্তাকী, ধর্ম শাস্ত্রবিদ্দ, চরিত্রে ও ধর্মে সর্বাপেক্ষা উত্তম, ক্রোধকে দমনকারী এবং ভদ্র। **حُصُور** শব্দের অর্থ হচ্ছে যে স্ত্রীলোকদের নিকট আসতে পারে না, যার সন্তানাদি হয় না এবং যার মধ্যে কোন কামভাব থাকে না। এ অর্থের একটি মারফু’ হাদীসও মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে রয়েছে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ শব্দটি পাঠ করতঃ ভূমি হতে কিছু উঠিয়ে নিয়ে বলেন, ‘তাঁর অঙ্গ ছিল একুপ।’ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, ‘সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে শুধুমাত্র ইয়াহইয়া (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সাথে নিষ্পাপকরণে সাক্ষাত করবেন। অতঃপর তিনি মাটি হতে কিছু উঠিয়ে নিয়ে বলেন, ‘যার অঙ্গ একুপ

হয় তাকে حُصُورٌ বলে।' হ্যরত ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল কাতান (রঃ) অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করেন। উপরে বর্ণিত মারফু' বর্ণনা অপেক্ষা এ মাওকুফ বর্ণনাটি সনদ হিসেবে অধিকতর সঠিক। মারফু' বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাপড়ের ঝালরের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'এরূপ ছিল।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি মাটি হতে একটা খড়কুটা উঠিয়ে নিয়ে ওর দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, 'তাঁর অঙ্গ ছিল এই খড়কুটার মত।'

এরপর হ্যরত যাকারিয়া (আঃ)-কে দ্বিতীয় শুভ সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, তাঁর পুত্র নবী হবেন। এ সুসংবাদ পূর্বের সুসংবাদ হতেও অঞ্গগণ্য। এ সুসংবাদ প্রাপ্তির পর হ্যরত যাকারিয়া (আঃ)-এর ধারণা হয় যে, এর বাহ্যিক কারণগুলো তো অসম্ভব, তাই তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয় করেন, 'হে আমার প্রভু! আমি তো বার্ধক্যে পদার্পণ করেছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, কাজেই আমার সন্তান লাভ করুণে সম্ভব?' ফেরেশতাগণ তৎক্ষণাতে উত্তর দেন, 'আল্লাহর নির্দেশই সব চেয়ে বড়। তাঁর নিকট কোনকিছু অসম্ভবও নয় এবং কঠিনও নয়। তিনি কোন কাজে অসমর্থ নন। তিনি যেভাবেই ইচ্ছে করেন সৃষ্টি করে থাকেন।' তখন হ্যরত যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দর্শন যাঞ্চা করলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়ঃ 'নির্দর্শন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত লোকের সাথে কথা বলতে পারবে না। তুমি সুস্থ সবল থাকবে বটে কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের হবে না। শুধুমাত্র ইশারা-ইঙ্গিতে কাজ চালাতে হবে।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে— 'অর্থাৎ 'সুস্থতার সাথে তিন রাত'। (১৯: ১০) এরপর বলা হচ্ছে— 'এ অবস্থায় খুব বেশী আল্লাহ তা'আলার যিকির করা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনা করা তোমার উচিত। সকাল-সন্ধ্যায় ঐ কাজেই লেগে থাকবে।' এর দ্বিতীয় অংশ এবং পূর্ণ বর্ণনা সূরা-ই-মারইয়ামের মধ্যে বিস্তারিতভাবে আসবে ইনশাআল্লাহ।

৪২। এবং যখন ফেরেশতাগণ  
বলেছিল, ও মারইয়াম!  
নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে  
মনোনীত করেছেন ও  
তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং  
বিশ্ব জগতের নারীগণের উপর  
তোমাকে মনোনীত করেছেন।

وَإِذْ قَاتَلَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرِيمُ  
إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَكِ وَطَهَرَكِ  
وَأَصْطَفَكِ عَلَى نِسَاءٍ  
الْعَلَمِينَ ۝

৪৩। হে মারইয়াম! তোমার প্রভুর ইবাদত কর এবং সিজদা কর ও রূক্ত'কারীগণের সাথে রূক্ত' কর।

৪৪। এটা সেই অদৃশ্য বিষয়ক সংবাদ যা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করছি; এবং যখন তারা স্বীয় লেখনীসমূহ নিক্ষেপ করছিল যে, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের প্রতিপালন করবে, তখন তুমি তাদের নিকটে ছিলে না; এবং যখন তারা কলহ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না।

٤٣ - يَمْرِيمُ أَقْنَتِي لَرِبِّي  
وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ  
الرَّكِعَيْنَ ○

٤٤ - ذِلِّكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّغَبِ  
نُوْحِيَهُ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ  
إِذْ يُلْقَوْنَ أَقْلَامَهُمْ أَيْمَنِي بِكَفِلِ  
مَرِيمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ  
يَخْتَصِمُونَ ○

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে ফেরেশতাগণ হ্যরত মারইয়াম (আঃ)-কে তাঁর অত্যাধিক ইবাদত, দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য ভাব, ভদ্রতা এবং শয়তানী কুধারণা হতে দূরে থাকার কারণে স্বীয় নৈকট্য লাভের যে মর্যদা দান করেছেন এবং সারা জগতের নারীদের উপর যে মনোনীত করেছেন তারই সুসংবাদ দিচ্ছেন। সহীহ মুসলিম শরীফে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যতগুলো নারী উষ্ট্রে আরোহণ করেছে তাদের মধ্যে উত্তম হচ্ছে কুরাইশদের ঐ স্ত্রীলোকগুলো যারা নিজেদের শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ প্রদর্শন করে এবং স্বামীদের দ্রব্যাদির পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। হ্যরত মারইয়াম বিনতে ইমরান (আঃ) কখনও উষ্ট্রে আরোহণ করেননি।’ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘স্ত্রীলোকদের মধ্যে উত্তম হচ্ছে হ্যরত মারইয়াম বিনতে ইমরান এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে উত্তম হচ্ছে হ্যরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ)।’ জামেউত তিরমিয়ীর বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘সারা জগতের নারীদের মধ্যে মারইয়াম বিনতে ইমরান (আঃ), খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ), ফাতিমা (রাঃ) বিনতে মুহাম্মাদ (সঃ) এবং

ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া (রাঃ) তোমার জন্য যথেষ্ট।' অন্য হাদীসে রয়েছে যে, এ চারজন নারী সারা বিশ্বের নারীদের মধ্যে উত্তম। আর একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'পুরুষদের মধ্যে বহু পূর্ণাঙ্গ পুরুষ রয়েছে, কিন্তু নারীদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী নারী মাত্র তিনজন। তাঁরা হচ্ছেন- হযরত ইমরানের কন্যা হযরত মারইয়াম (আঃ), ফিরআউনের স্ত্রী হযরত আসিয়া (আঃ) এবং খুয়াইলিদের কন্যা হযরত খাদীজা (রাঃ)। আর হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ফর্মালত নারীদের উপর একুপ যেরূপ সারীদের (গোশতের বোলে ভিজান কুটির) ফর্মালত সমস্ত আহার্যের উপর।' এ হাদীসটি সুনান-ই-আবু দাউদ ছাড়া অন্যান্য সব হাদীসেই রয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফের এ হাদীসে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর উল্লেখ নেই। আমি এ হাদীসের সমস্ত সনদ এবং প্রত্যেক সনদের শব্দগুলো স্বীয় 'কিতাবুল বিদায়াহ ওয়াল্লিহায়াহ'-এর মধ্যে হযরত সৈসা (আঃ)-এর বর্ণনায় জমা করেছি।

ফেরেশতাগণ বলেন, 'হে মারইয়াম! আপনি আপনার সময় বিনয় প্রকাশ এবং ঝুকু' ও সিজদায় কঠিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় ক্ষমতার এক বিরাট নির্দশন বানাতে চান। সুতরাং মহান আল্লাহর দিকে আপনার পূর্ণ মনঃসংযোগ করা উচিত।' <sup>فَنُوتْ</sup> শব্দের অর্থ হচ্ছে আস্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে আনুগত্য প্রকাশ করা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে-

وَلَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قِنْتَوْنَ -

অর্থাৎ 'আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তু তাঁরই অধিকারে রয়েছে এবং প্রত্যেকেই তাঁর অনুগত।' (৩০: ২৬) মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের একটি 'মারফু' হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'কুরআন কারীমের মধ্যে যেখানেই <sup>فَنُوتْ</sup> শব্দটি রয়েছে তারই ভাবার্থ হচ্ছে আনুগত্য স্বীকার।' ইবনে জারারও (রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু ওর সনদে দুর্বলতা রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন, 'হযরত মারইয়াম (আঃ) নামাযে এত অধিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর জানুন্দয় ফোলে যেতো।' <sup>فَنُوتْ</sup> শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে নামাযে এভাবেই লম্বা লম্বা ঝুকু' করা।' হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে- 'তোমার প্রভুর ইবাদতে লিপ্ত থাক এবং যারা ঝুকু' ও সিজদা করে তাদের অস্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।' হযরত আওয়ায়ী (রঃ) বলেন, 'হযরত মারইয়াম (আঃ) স্বীয় ইবাদত কক্ষে এত বেশী পরিমাণে ও এত বিনয়ের সাথে সুর্দীঘ সময় ধরে নামায পড়তেন যে, তাঁর পদদ্বয়ে হলদে পানি নেতে আসতো।'

এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বর্ণনা করতঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘হে নবী (সঃ)! এসব ঘটনা তুমি জানতে না। আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম। আমি তোমাকে না জানালে তুমি জনগণের নিকট এসব ঘটনা কি করে পৌছাতে? কারণ, যখন এসব ঘটনা সংঘটিত হয় তখন তুমি তো তথায় উপস্থিত ছিলে না। কিন্তু আমি ঐগুলো তোমাকে এমনভাবে জানিয়ে দিলাম যে, যেন তুমি স্বয়ং তথায় ছিলে’। যখন হ্যরত মারইয়ামের লালন-পালনের ব্যাপার নিয়ে একে অপরের উপর অগ্রাধিকার লাভের চেষ্টা করছিল, সবাই ঐ পুণ্য লাভের আকাংখী ছিল, সে সময় তাঁর মা তাঁকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে হ্যরত সুলাইমান (আঃ)-এর মসজিদে উপস্থিত হন। সে সময় তথাকার সেবক ছিলেন হ্যরত মূসা (আঃ)-এর ভাই হ্যরত হারনের (আঃ) বংশের লোকগণ। হ্যরত মারইয়াম (আঃ)-এর মা তাঁদেরকে বলেনঃ ‘আমি আমার প্রতিজ্ঞানুসারে আমার এ কন্যাকে আল্লাহ তা'আলার নামে আযাদ করে দিয়েছি। সুতরাং আপনারা তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করুন। এটা তো স্পষ্ট যে, সে একটি মেয়ে এবং খুব বৰ্তী মেয়েদের মসজিদে প্রবেশ যে নিষিদ্ধ এটাও কারও অজানা নেই। সুতরাং এর যা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তা আপনারাই করুন।’ আমি কিন্তু একে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি না।’ হ্যরত ইমরান (আঃ) তথাকার নামায়ের ইমাম ও কুরবানীর পরিচালক ছিলেন। আর হ্যরত মারইয়াম (আঃ) ছিলেন তাঁরই কন্যা। কাজেই সবাই তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণের জন্যে আগ্রহী ছিলেন। এ দিকে হ্যরত যাকারিয়া (আঃ) তাঁর অগ্রাধিকার প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন—‘এর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, আমি তার খালু। সুতরাং মেয়েটিকে আমারই পাওয়া উচিত’। কিন্তু অন্যেরা তাতে সম্মত না হওয়ায় অবশ্যে নির্বাচনের গুটিকা নিষ্কেপ করা হয় এবং তাতে তাঁরা ঐসব লেখনী নিষ্কেপ করেন যেগুলো দিয়ে তাওরাত লিখিতেন। এতে হ্যরত যাকারিয়ারই (আঃ) নাম উঠে। কাজেই তিনি ঐ সৌভাগ্যের অধিকারী হন। অন্য বিস্তারিত বর্ণনায় এও রয়েছে যে, তাঁরা জর্দান নদীতে গিয়ে তাঁদের কলমগুলো পানিতে নিষ্কেপ করেন। কথা হয় যে, স্রোতের মুখে যাদের কলম চলতে থাকবে তারা নয় বরং যার কলম স্থির থাকবে সেই তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। অতঃপর তাঁরা কলমগুলো পানিতে নিষ্কেপ করলে সবারই কলম চলতে থাকে, শুধুমাত্র হ্যরত যাকারিয়া (আঃ)-এর কলম স্থির থাকে। বরং ওটা স্রোতের বিপরীত দিকে চলতে থাকে। কাজেই একে তো গুটিকায় তাঁর নাম উঠেছিল, দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁর আত্মীয় ছিলেন। তাছাড়া তিনি সবারই নেতা,

ইমাম, আলেম এবং সর্বোপরি নবী ছিলেন। অতএব তাঁরই উপরে হ্যরত মারইয়াম (আঃ)-এর দায়িত্বার অর্পণ করা হয়।

৪৫। যখন ফেরেশতারা  
বলেছিল- হে মারইয়াম!  
নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নিকট  
হতে একটি বাক্য দ্বারা  
তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন,  
তার নাম মারইয়াম নন্দন ইসা  
মাসীহ- সে ইহলোক ও  
পরলোকে সম্মানিত এবং  
সামাজিক প্রাণ্ডগণের অন্তর্গত।

৪৬। আর সে দোলনা হতে ও  
পরিণত বয়সে লোকের সাথে  
কথা বলবে এবং সে  
পুণ্যবানগণের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪৭। সে বলেছিল-হে আমার  
থভু! কিরূপে আমার পুত্র  
হবে? কোন মানুষ তো  
আমাকে স্পর্শ করেনি; তিনি  
বললেন- এরূপে আল্লাহ যা  
ইচ্ছে করেন, সৃষ্টি করে  
থাকেন, যখন তিনি কোন  
কার্যের মনস্ত করেন, তখন  
তিনি ওকে ‘হও’ বলেন,  
ফলতঃ তাতেই হয়ে যায়।

٤٥- إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرِيمُ  
إِنَّ اللَّهَ يَبْشِرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ  
اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ  
مَرِيمَ وَجِئْهَا فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقْرِبِينَ ۝

٤٦- وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ  
وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّلِحِينَ ۝

٤٧- قَالَتْ رَبِّي أَنِّي يَكُونُ لِي  
وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسِسْنِي بَشَرٌ قَالَ  
كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ  
إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ  
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

ফেরেশতাগণ হ্যরত মারইয়াম (আঃ)-কে এ সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তাঁর  
একটি বড় খ্যাতিসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি শুধু আল্লাহ তা'আলার  
অর্থাৎ ‘হও’ শব্দ দ্বারা সৃষ্টি হবেন এবং **مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ** (৩৪: ৩৯)-এর  
তাফসীর এটাই, যেমন জমতুর বর্ণনা করেছেন, যার বর্ণনা ইতিপূর্বে হয়ে গেছে।

তাঁর নাম হবে মারইয়াম নন্দন ঈসা মাসীহ (আঃ)। প্রত্যেক মুমিন তাঁকে এ নামেই চিনবে। তাঁর নাম মাসীহ হওয়ার কারণ এই যে, তিনি খুব বেশী পৃথিবীতে ভ্রমণ করবেন। মায়ের দিকে সম্বন্ধ করার কারণ এই যে, তাঁর কোন পিতা ছিল না। ইহকালে ও পরকালে তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট মহা সম্মানিত ও তাঁর সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলার শরীয়ত ও কিতাব অবতীর্ণ হবে। দুনিয়ায় তাঁর উপর বড় বড় অনুগ্রহ বর্ষিত হবে এবং পরকালেও তিনি স্থির প্রতিজ্ঞ নবীদের মত আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে ও তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সুপারিশ করবেন এবং সেই সুপারিশও গৃহীত হবে।

‘তিনি স্বীয় দোলনায় ও প্রৌঢ় বয়সে লোকদের সাথে কথা বলবেন।’ অর্থাৎ তিনি শৈশবকালেই লোকদেরকে একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করবেন যা তাঁর একটি অলৌকিক ঘটনাকৃপে গণ্য হবে। আর পরিণত বয়সেও যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট অবী করবেন তখন তিনি স্বীয় কথায় ও কাজে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হবেন এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদনকারী হবেন। একটি হাদীসে রয়েছে যে, শৈশবাবস্থায় কথা বলেছিলেন শুধুমাত্র হ্যরত ঈসা (আঃ) এবং হ্যরত জুরায়েজের সঙ্গী। অন্য একটি হাদীসে অন্য একটি শিশুর কথা বলাও বর্ণিত আছে। তাহলে মাত্র এ তিনজন মানব শৈশবাবস্থায় কথা বলেছিলেন। হ্যরত মারইয়াম (আঃ) এ সুসংবাদ শুনে স্বীয় প্রার্থনার মধ্যেই বলেন, ‘হে আমার প্রভু! আমার সন্তান কিরূপে হতে পারে? আমি তো বিয়ে করিনি এবং আমার বিয়ে করার ইচ্ছেও নেই। তাছাড়া আমি দুর্চরিতা মেয়েও নই।’ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফেরেশতাগণ উত্তর দেন যে, আল্লাহ পাকের নির্দেশই খুব বড় জিনিস। কোন কাজেই তিনি অসমর্থ নন। তিনি যেভাবেই চান সৃষ্টি করে থাকেন। এ সূক্ষ্মতার বিষয় চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, হ্যরত যাকারিয়া (আঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে ‘يَفْعُلُ’ শব্দ ছিল, আর এখানে بِخَلْقٍ শব্দ রয়েছে, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি করেন। এর কারণ হচ্ছে এই যে, যেন বাতিলপন্থীদের কোন সন্দেহ করার সুযোগ না থাকে এবং পরিষ্কার ভাষায় বুঝা যায় যে, হ্যরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। অতঃপর ওর উপর আরও গুরুত্ব আরোপ করতঃ বলেন, ‘তিনি যে কোন কাজ যখনই করার ইচ্ছে করেন তখন শুধুমাত্র বলেন, ‘হও’ আর তেমনই হয়ে যায়। তাঁর নির্দেশের পর কার্য সংঘটিত হতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় না।’ যেমন অন্য স্থানে রয়েছে—

وَمَا أَمْرَنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلِمَحٍ بِالبَصَرِ

অর্থাৎ ‘আমার একবার নির্দেশমাত্রই অবিলম্বে চোখের পলকে ঐ কাজ হয়ে যায়, আমার দ্বিতীয়বার বলার প্রয়োজন হয় না।’ (৫৪: ৫০)

৪৮। তিনি তাকে প্রস্তু, বিজ্ঞান  
এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা  
দেবেন।

৪৯। আর তাকে ইসরাইল  
বংশীয়গণের জন্যে রাসূল  
করবেন; নিচয়ই আমি  
তোমাদের প্রতিপালকের নিকট  
হতে নির্দশনসহ তোমাদের  
নিকট আগমন করেছি;  
নিচয়ই আমি তোমাদের  
জন্যে মাটি হতে পক্ষীর  
আকার গঠন করবো, তৎপরে  
ওর মধ্য ফুর্তকার দেব, অনন্তর  
আল্লাহর আদেশে ওটা পক্ষী  
হয়ে যাবে এবং জন্মাঙ্ককে ও  
কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করি  
এবং আল্লাহর আদেশে মৃতকে  
জীবিত করি এবং তোমরা যা  
ভক্ষণ কর ও তোমরা যা স্বীয়  
গৃহের মধ্যে সংগ্রহ করে রাখ—  
তদ্বিষয়ে সংবাদ দিছি; যদি  
তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে  
নিচয়ই এতে তোমাদের জন্যে  
নির্দশন রয়েছে।

৫০। আর আমার পূর্বে তাওরাত  
হতে যা আছে এটা তার  
সত্যতা প্রতিপাদনকারী এবং  
তোমাদের জন্যে যা অবৈধ

— ৪৮ —  
وَيُعِلِّمُهُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ  
وَالْتَّوْرِيهَ وَالْإِنْجِيلَ

— ৪৯ —  
وَرَسُولٌ مُّوَلَّا إِلَىٰ بَنِيٍّ  
إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُكُمْ بِآيَةٍ  
مِّنْ رِبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ  
مِّنَ الطِّينِ كَهْيَاتَ الطَّيْرِ  
فَانْفَخْ فِيهِ فَيُكُونُ طَيْرًا  
يَا ذِنْ اللَّهِ وَابْرَئِ الْأَكْمَةَ  
وَالْأَبْرَصَ وَاحْبِي الْمَوْتَىٰ  
يَا ذِنْ اللَّهِ وَانْبِئْكُمْ بِمَا  
تَاكِلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي  
وُوتِكُمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَةٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

— ৫০ —  
وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَ  
مِنَ التَّوْرِيهِ وَلَا حِلٌّ لَكُمْ

হয়েছে- তার কতিপয়  
তোমাদের জন্যে বৈধ করবো  
ও আমি তোমাদের প্রভুর  
নিকট হতে তোমাদের জন্য  
নির্দশন এনেছি; অতএব  
আল্লাহকে ভয় কর ও আমার  
অনুগত হও ।

৫১। নিচয়ই আল্লাহ আমার প্রভু  
ও তোমাদের প্রভু; অতএব  
তাঁর ইবাদত কর- এটাই  
সরল পথ ।

ফেরেশতারা হ্যরত মারইয়াম (আঃ)-কে বলেনঃ ‘আপনার ছেলেকে অর্থাৎ হ্যরত ইসা (আঃ)-কে আল্লাহ গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেবেন’। শব্দের তাফসীর সূরা-ই-বাকারায় হয়ে গেছে। আর আল্লাহ পাক তাঁকে তাওরাত শিক্ষা দেবেন যা হ্যরত মুসা ইবনে ইমরান (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাঁকে ইঞ্জীল শিক্ষা দেবেন যা তাঁর নিজের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এ দু'টো কিতাব হ্যরত ইসা (আঃ)-এর মুখস্থ ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বানী ইসরাইলের নিকট নবী করে পাঠাবেন, যেন তিনি তাদেরকে স্বীয় অলৌকিক ঘটনা দেখাতে পারেন যে, তিনি মাটি দিয়ে পাখীর আকৃতি গঠন করেন। অতঃপর ওর মধ্যে ফুৎকার দেন, আর তেমনই ওটা বাস্তব পাখী হয়ে তাদের সামনে উড়তে থাকে। এটা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমেই হয়েছিল। হ্যরত ইসা (আঃ)-এর নিজস্ব কোন ক্ষমতা ছিল না। বরং এটা তাঁর জন্যে একটা মু'জিয়া ছিল। এই অঙ্ককে বলা হয় যে দিনে দেখতে পায় কিন্তু রাত্রে দেখতে পায় না। কেউ কেউ বলেন যে, এই টেরো চক্র বিশিষ্ট লোককে বলা হয়। কারো কারো উক্তি এও রয়েছে যে, এই অঙ্ককে বলা হয় যে মায়ের গর্ভ হতেই অঙ্ক হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এখানে এ অনুবাদই যথোপযুক্ত হবে। কেননা, এর দ্বারাই অলৌকিকতার পূর্ণতা প্রকাশ পায় এবং বিরুদ্ধবাদীকে অসমর্থ করার জন্যে এটাই উত্তম পদ্ধা। শ্বেত কুষ্ঠকে বলা হয়। মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে হ্যরত ইসা (আঃ) এ রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকেও নিরাময় করে দিতেন। আল্লাহ পাকের হৃকুমে তিনি মৃতকেও জীবিত করতেন। অধিকাংশ আলেমের

بَعْضَ الَّذِي حُرِمَ عَلَيْكُمْ  
فَقُلْ  
وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رِّبِّكُمْ  
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ  
۝ ۵۱- إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ  
فَاعْبُدُوهُ هَذَا صَرَاطٌ  
مُّسْتَقِيمٌ

উক্তি এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগের নবীকে যুগোপযোগী বিশেষ বিশেষ মু'জিয়া দিয়ে প্রেরণ করেছেন। হ্যরত মুসা (আঃ)-এর যুগে যাদুর খুব প্রচলন ছিল এবং যাদুকরদেরকে অত্যন্ত সম্মান করা হতো। তাই আল্লাহ তা'আলা হ্যরত মুসা (আঃ)-কে এমন মু'জিয়া দান করেন যে, যাদুকরগণ বিশ্বয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং তাদের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, এটা কখনও যাদু হতে পারে না, বরং এটা মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর একটা বড় দান। অতএব তারা অবনত মস্তকে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অবশ্যে তারা আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয়। হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর যুগটা ছিল চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকদের যুগ। তথায় তখন বড় বড় বৈজ্ঞানিক এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিদ্যমান ছিল। সুতরাং মহান আল্লাহ হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে এমন মু'জিয়া দান করেন যার সামনে ঐ বড় বড় চিকিৎসকগণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। জন্মান্তকে চক্ষু দান করা, শ্বেতকৃষ্ণ রোগীকে নিরাময় করা ও নির্জীব পদার্থের মধ্যে প্রাণ দেয়া এবং সমাধিস্থ ব্যক্তিকে জীবিত করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তির রয়েছে? একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মু'জিয়া ঝরপে তাঁর দ্বারা এ সমুদয় কার্য সাধিত হয়। অনুরূপভাবে যে যুগে আমাদের প্রিয় নবী হ্যরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর আবির্ভাব ঘটে সেটা ছিল সাহিত্য, কবিতা ও বাকপটুতার যুগ। এসব বিষয়ে খ্যাতনামা কবিগণ এমন পূর্ণতা অর্জন করেছিল যে, সারা দুনিয়া তাদের সামনে মাথা হেঁট করেছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এমন এক গ্রস্ত দান করলেন যার উজ্জ্বল্যের সামনে তাদের সমস্ত দীপ্তি ম্লান হয়ে যায় এবং তাদের বিশ্বাস জন্মে যে, এটা মানুষের কথা নয়। সারা বিশ্বের সামনে জোরে শোরে বারবার ঘোষণা করা হয়—এক্রপ কথা বলতে পারে এমন কেউ আছে কি? একা একা নয় বরং তোমরা সবাই মিলিত হয়ে যাও, শুধু মানব নয় বরং দানবদেরকেও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও, অতঃপর পুরো কুরআনের সমান নয়, শুধুমাত্র ওর মত দশটি সূরা আনয়ন কর। আচ্ছা এও যদি সম্ভব না হয় তবে ওর মত একটি সূরাই নিয়ে এসো। কিন্তু তাদের কোমর ভেঙ্গে পড়ে, সাহস হারিয়ে যায়, কঠরোধ হয়ে যায়, বাকশক্তি লোপ পায় এবং আজ পর্যন্ত সারা বিশ্ব এ কাজে অসমর্থই রয়েছে, আর কিয়ামত পর্যন্ত অসমর্থ থেকেও যাবে। কোথায় আল্লাহ পাকের কালাম এবং কোথায় মানব ও দানবের কথা? সুতরাং এ যুগ হিসেবে এ মু'জিয়া ক্রিয়াশীল হয় এবং বিরুদ্ধবাদীদেরকে অন্ত সংবরণ করতেই হয়। তারা দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

অতঃপর হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর আরও মু'জিয়ার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা তিনি বলেছিলেন এবং করেও দেখিয়েছিলেন। তিনি তোমাদেরকে বলেছিলেন, ‘তোমাদের মধ্যে যে কেউ বাড়ীতে যা কিছু খেয়ে এসেছে এবং আগামীকালের জন্যে সে যা কিছু জমা করে রেখেছে, আল্লাহর হৃকুমে আমি তা বলে দিতে পারবো। এতে আমার সত্যবাদীতার দলীল রয়েছে, আমি তোমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছি তা চরম সত্য। তবে তোমাদের মধ্যে যদি ঈমানই না থাকে তবে আর কি হবে? আমি আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে স্বীকার করছি। এবং দুনিয়ায় ওর সত্যতার কথা ঘোষণা করছি। আমি তোমাদের জন্য এমন কতগুলো জিনিস বৈধ করতে এসেছি যেগুলো আমার পূর্বে তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল।’ এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, হ্যরত ঈসা (আঃ) তাওরাতের কতগুলো বিধান রহিত করেছেন। কয়েকজন তাফসীরকারের ধারণা এর বিপরীত হলেও এটাই সঠিক কথা। কোন কোন মনীষী বলেন যে, হ্যরত ঈসা (আঃ) তাওরাতের কোন বিধান রহিত করেননি। তবে এটা অবশ্যই সত্য যে, কতগুলো বৈধ জিনিসে যে মতভেদ ছিল এবং তা বৃক্ষ পেতে পেতে অবৈধতার পর্যায়ে ‘পৌছে গিয়েছিল, হ্যরত ঈসা (আঃ) ঐগুলোর যথার্থতা বর্ণনা করতঃ ঐগুলোর বৈধতার উপর শীল (মোহর) মেরে দেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে-

وَلَا يُبْنِ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ

অর্থাৎ ‘তোমরা যে ব্যাপারে পরম্পর মতভেদ করছো আমি তোমাদের জন্যে তার মীমাংসা করে দেবো।’(৪৩: ৬৩)

অতঃপর তিনি বলেনঃ ‘আমার নিকট আমার সত্যবাদীতার উপর আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, আমার কথা মান্য কর এবং জেনে রেখো যে, নিচয়ই আল্লাহ আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু, সুতরাং তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর। আর এটাই হচ্ছে সরল সঠিক পথ।’

৫২। অনন্তর যখন ঈসা তাদের  
মধ্যে প্রত্যাখ্যান প্রত্যক্ষ  
করলো তখন সে বললো—  
আল্লাহর উদ্দেশ্যে কে আমার  
সাহায্যকারী হবে?  
হাওয়ারিগণ বললো, আমরাই

- ৫২ -  
فَلَمَّا أَحْسَنَ عِيسَى مِنْهُمْ

الْكُفَّارُ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى  
اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ

আল্লাহর সাহায্যকারী; আমরা  
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন  
করেছি; এবং সাক্ষী থাক যে,  
আমরা আজ্ঞাসমর্পণকারী।

أَنْصَارُ اللَّهِ أَمْنَا بِاللَّهِ  
وَاشْهَدُ بِإِنَّا مُسْلِمُونَ

৫৩। হে আমাদের প্রভু! আপনি  
যা অবতীর্ণ করেছেন—আমরা  
তা বিশ্বাস করি এবং আমরা  
রাসূলের অনুসরণ করছি;  
অতএব সাক্ষীগণের সাথে  
আমাদেরকে লিপিবদ্ধ করুন।

رَبَّنَا أَمْنَا بِمَا أَنْزَلْتَ  
وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعَ  
الشَّهِيدِينَ

৫৪। আর তারা ষড়যন্ত্র করেছিল  
ও আল্লাহ কৌশল করলেন  
এবং আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম  
কৌশলী।

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ  
خَيْرُ السِّكِّيرِينَ

অর্থাৎ যখন হ্যরত ইস্মাইল (আঃ) তাদের একগুঁয়েমী ও বিবাদ প্রত্যক্ষ করলেন  
এবং বুৰুতে পারলেন যে, তারা হঠকারিতা হতে ফিরে আসবে না তখন তিনি  
বললেন, ‘আল্লাহর উপর আমার আনুগত্য স্বীকারকারী কেউ আছে কি?’ আবার  
ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে, ‘এমন কেউ আছে কি যে আল্লাহর সাথে আমার  
সাহায্যকারী হতে পারে?’ কিন্তু প্রথম উক্তিটি বেশী যুক্তিযুক্ত। বাহ্যতঃ এটা  
জানা যাচ্ছে যে, তিনি বলেছিলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলার দিকে মানুষকে আহ্বানের  
কাজে কেউ আমার হাত শক্তকারী আছে কি?’ যেমন আল্লাহর নবী হ্যরত  
মুহাম্মদ (সঃ) মঙ্গা হতে মদীনায় হিজরত করার পূর্বে হজ্জের মৌসুমে  
বলেছিলেন, ‘কুরাইশরা তো আমাকে আল্লাহর কালাম প্রচারের কার্যে বাধা  
দিচ্ছে, এমতাবস্থায় এ কার্যের জন্যে আমাকে জায়গা দিতে পারে এমন কেউ  
আছে কি?’ মদীনাবাসী আনসারগণ এ সেবার কার্যে এগিয়ে আসেন এবং  
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জায়গা দান করেন। তাঁরা তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন  
এবং যখন তিনি তাঁদের নিকট গমন করেন তখন তাঁরা পুরোপুরি তাঁর  
সহযোগিতা করেন এবং তাঁর প্রতি তুলনাবিহীন সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।  
দুনিয়ার সাথে মোকাবিলায় তাঁরা নিজেদের বক্ষকে নবী (সঃ)-এর জন্য ঢাল  
করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হিফায়তে, মঙ্গল কামনায় ও তাঁর উদ্দেশ্য  
সফল হওয়ার কাজে তাঁদের আপাদমস্তক নিমগ্ন থাকে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের

প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করুন। অনুরূপভাবে হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর এ আহ্বানেও কতক বানী ইসরাইল সাড়া দেয়, তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁকে পূর্ণভাবে সাহায্য করে। আর তারা ঐ আলোকের অনুসরণ করে যা আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন, অর্থাৎ ইঞ্জিল। এ লোকগুলো ধোপা ছিল এবং তাদের সাদা কাপড়ের কারণেই তাদেরকে 'হাওয়ারী' বলা হতো। কেউ কেউ বলেন যে, তারা শিকারী ছিল। তবে সঠিক কথা এই যে, সাহায্যকারীকে 'হাওয়ারী' বলা হয়। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ 'আমার জন্যে স্বীয় বক্ষকে ঢাল করতে পারে এরপ কেউ আছে কি?' এ শব্দ শুনামাত্রই হ্যরত যুবায়ের (রাঃ) প্রস্তুত হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিতীয় বার একথাই বলেন, এবারেও হ্যরত যুবায়ের (রাঃ) অঞ্চসর হন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'প্রত্যেক নবীরই 'হাওয়ারী' (সাহায্যকারী) থাকে এবং আমার 'হাওয়ারী' হচ্ছে হ্যরত যুবায়ের (রাঃ)'।

এ লোকগুলো তাদের প্রার্থনায় বলে, 'হে আমাদের প্রভু! সাক্ষীগণের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নিন।' হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ)-এর মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মতের মধ্যে নাম লিখে নেয়া। এ তাফসীরের বর্ণনা সন্দ হিসেবে খুবই উৎকৃষ্ট। অতঃপর বানী ইসরাইলের ঐ অপবিত্র দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর প্রাণের শক্ত ছিল। তারা তাঁকে হত্যা করার ও শূলে ঢ়াবার ইচ্ছে করেছিল। সেই যুগের বাদশাহৰ কাছে তারা তাঁর দুর্নাম করতো। তারা বাদশাহকে বলতো, 'এ লোকটি জনগণকে পথভ্রষ্ট করছে, দেশের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করছে, মানুষকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করছে।' বরং তারা তাঁকে দুর্ঘরিত, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, প্রতারক প্রভৃতি বলে অপবাদ দিয়েছিল এমনকি তাঁকে ব্যভিচারণীর পুত্র বলতেও তারা দ্বিধাবোধ করেনি। অবশেষে বাদশাহও তাঁর জীবনের শক্ত হয়ে যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে বলে, 'তাকে ধরে এনে ভীষণ শাস্তি প্রদান করতঃ ফাঁসি দিয়ে দাও।'

অতঃপর তিনি যে বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন সৈন্যগণ তাঁকে বন্দী করার উদ্দেশ্যে সে বাড়ী পরিবেষ্টন করে তার ঘরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাদের হাত হতে বাঁচিয়ে নেন এবং তাঁকে ঐ ঘরের ছিদ্র দিয়ে আকাশে উঠিয়ে নেন। আর তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য বিশিষ্ট একটি লোককে তথায় নিষ্কেপ করেন, যে সে ঘরেই অবস্থান করেছিল। এ লোকগুলো রাত্রির অন্ধকারে তাকেই হ্যরত ঈসা (আঃ) মনে করে ধরে নিয়ে যায়। তাকে তারা কঠিন শাস্তি দেয়

এবং তার মন্তকোপরি কাঁটার টুপি রেখে দিয়ে শূলে চড়িয়ে দেয়। এটাই ছিল তাদের সাথে মহান আল্লাহর কৌশল যে, তাদের ধারণায় তারা আল্লাহ তা'আলার নবী (আঃ)-কে ফাঁসি দিয়েছে, অথচ আল্লাহ পাক স্বীয় নবীকে মুক্তি দিয়েছেন। ঐ দুষ্কার্যের ফল তারা এই প্রাণ হয়েছিল যে, চিরদিনের মত তাদের অন্তর কঠিন হয়ে যায়। তারা মিথ্যা ও অন্যায়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। দুনিয়াতেও তারা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয় এবং পরকালেও তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। ওরই বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে যে, তারা ষড়যন্ত্র করলে হবে কি? আল্লাহ তা'আলার কৌশলের কাছে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যাবে। তিনিই সবচেয়ে বড় কৌশলী।

#### ৫৫। যখন আল্লাহ বললেন- হে

ইসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে প্রতিগ্রহণ করবো ও তোমাকে উন্নেলন করবো এবং অবিশ্বাসকারীগণ হতে তোমাকে পবিত্র করবো, আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের উপর তোমার অনুসারীগণকে উধান দিবস পর্যন্ত সমুদ্ধিত করবো; অন্তর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ ছিল তার মীমাংসা করবো।

#### ৫৬। অন্তর যারা অবিশ্বাসী হয়েছে, বস্তুতঃ তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করবো, এবং তাদের জন্যে কেউ সাহায্যকারী নেই।

— ৫৫ —  
إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى إِنِّي  
مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى  
وَمُطْهَرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
وَجَاءُكُمْ الَّذِينَ أَتَبَعُوكَ فَوْقَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ  
وَمُمْلِئُ الْأَرْضَ  
بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ  
تَخْتِلِفُونَ ০

— ৫৬ —  
فَمَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاعْذِبْهُم  
عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا  
وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرٍ ০

৫৭। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন  
করেছে ও সৎকার্যাবলী  
সম্পাদন করেছে ফলতঃ তিনি  
তাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান  
করবেন এবং আল্লাহ  
অত্যাচারীগণকে ভালবাসেন  
না।

৫৮। আমি তোমার প্রতি  
বিজ্ঞানময় বর্ণনা ও  
নির্দেশনাবলী হতে এটা  
আবৃত্তি করছি।

হ্যরত কাতাদাহ (রঃ) প্রভৃতি ব্যাখ্যা দানকারীগণের মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে- ‘আমি তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নেবো, অতঃপর তোমাকে মৃত্যুদান করবো। হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে- ‘আমি তোমাকে মৃত্যুদানকারী’। হ্যরত অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে উঠাবার সময় দিনের প্রথমভাগে তিনি ঘন্টা পর্যন্ত মৃত্যু দান করেছিলেন। হ্যরত ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, শ্রীষ্টানদের ধারণায় আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে সাত ঘন্টা পর্যন্ত মৃত্যুর অবস্থায় রেখেছিলেন। পরে তাঁকে জীবিত করে উঠিয়ে নেন। হ্যরত অহাব (রঃ) বলেন যে, তিনি দিন পর্যন্ত তিনি মৃত ছিলেন। পরে আল্লাহ পাক তাঁকে জীবন দান করে উঠিয়ে নেন।

হ্যরত মাতরুল ওয়ারাক (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে- ‘আমি তোমাকে দুনিয়া হতে উত্তোলনকারী।’ এখানে **وَفَاتُ** শব্দের ভাবার্থ মৃত্যু নয়।’ অনুরূপভাবে ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এখানে **تَوْفِي** শব্দের অর্থ হচ্ছে উঠিয়ে নেয়া। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে এখানে **وَفَاتُ** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে নিদ্রা। যেমন কুরআন হাকীমের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

**هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ بِاللَّيلِ**

অর্থাৎ ‘তিনি সেই আল্লাহ যিনি রাত্রে তোমাদেরকে নিদ্রা দিয়ে থাকেন’।  
(৬৯৬০) আর এক স্থানে রয়েছেঃ

৫৭- **وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ فَإِنَّ رِوْسَاهُمْ أَجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيمِينَ**

৫৮- **ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَتِ وَالدِّرْكِ الْحَكِيمِ**

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا .

অর্থাৎ 'আল্লাহ প্রাণকে তার মৃত্যুর সময় উঠিয়ে নেন এবং যে প্রাণ মরে যায় না তাকে তার নিদ্রার সময় (উঠিয়ে নেন)।' (৩৯: ৪২) রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিদ্রা হতে জাগরিত হয়ে বলতেনঃ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا

অর্থাৎ 'সেই আল্লাহর সমুদয় প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদান করার পর পুনরায় জীবিত করলেন'। আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় বলেনঃ 'তাদের অবিশ্বাসের কারণে এবং হ্যরত মারইয়াম (আঃ)-এর উপর বড় অপবাদ দেয়ার ফলে এবং এই কারণে যে, তারা বলে- আমরা মারইয়াম নন্দন ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি, অথচ তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং শূলীও দেয়নি বরং তাদের জন্যে তার প্রতিরূপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারা নিশ্চিতরূপে তাকে হত্যা করেনি' এ পর্যন্ত। বরং আল্লাহ তাকে তাঁর নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন । এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়। আহলে কিতাবের প্রত্যেকেই তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং সে কিয়ামতের দিন তাদের উপর সাক্ষী হবে।

‘<sup>مَوْتٌ</sup>’ শব্দের ‘<sup>ه</sup>’ সর্বনামটি হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ যখন হ্যরত ঈসা (আঃ) কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন কিতাবী সবাই তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ অতিসত্ত্বরই আসছে। সে সময় সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করবে। কেননা, না তিনি জিজিয়া কর গ্রহণ করবেন, না ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু সমর্থন করবেন। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) হতে <sup>إِنِّي مُتَوَفِّيٌّ كُلُّ</sup>-এর তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর উপর ঘুম চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং সে অবস্থাতেই তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আমি তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নিয়ে কাফিরদের হাত হতে পবিত্র করবো এবং কিয়ামত পর্যন্ত তোমার অনুসারীদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করবো।' বাস্তবে হয়েছিলও তাই। যখন আল্লাহ পাক হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেন তখন তাঁর পরে তাঁর সঙ্গী সাথীদের কয়েকটি দল হয়ে যায়। একটি দল হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়াতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বলে স্বীকার করে, আর তারা একথাও স্বীকার করে যে,

তিনি মহান আল্লাহর এক দাসীর পুত্র। তাদের মধ্যে আর একটি দল সীমা অতিক্রম করে বসে এবং তারা বলে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ পুত্র। (নাউজুবিল্লাহ) অন্য একটি দল স্বয়ং তাঁকেই আল্লাহ বলে। আবার একদল তিনি আল্লাহর মধ্যে তাঁকে এক আল্লাহ বলে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ বিশ্বাসের কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তা খণ্ডনও করেছেন। তিনশ বছর পর্যন্ত এ অবস্থায়ই থাকে। তারপর গ্রীক রাজাদের মধ্যে কুসতুনতান নামক একজন রাজা, যে একজন দার্শনিক ছিল, বলা হয় যে, শুধুমাত্র হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বীনকে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যেই এক কৌশল অবলম্বন করতঃ কপটতার আশ্রয় নিয়ে এ ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে। মোটকথা সে সময় ঈসা (আঃ)-এর ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। সে ওর ভেতর হ্রাস বৃদ্ধিও আনয়ন করেছিল। সে বহু আইন কানুন আবিষ্কার করেছিল। 'আমান-ই-কুরবা'ও তারই আবিষ্কার, যা প্রকৃতপক্ষে জঘন্যতম বিশ্বাস ভঙ্গত। সে তার যুগে শূকরকে বৈধ করে নিয়েছিল। তারই আদেশে খ্রীষ্টানগণ পূর্বমুখী হয়ে নামায পড়তে থাকে। সে-ই গীর্জা, উপাসনালয় প্রভৃতির মধ্যে ছবি বানিয়ে নেয় এবং নিজের এক পাপের কারণে রোগার মধ্যে দশটি রোগ বেশী করে। মোটকথা তার যুগে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ধর্ম ঈসায়ী ধর্মরূপে অবশিষ্ট ছিল না বরং ওটা 'দ্বীন-ই-কুসতুনতানে' পরিণত হয়েছিল। সে বাহ্যিক যথেষ্টে জাঁকজমক এনেছিল, যেমন সে বারো হাজারেরও বেশী উপাসনালয় নির্মাণ করেছিল এবং নিজের নামে একটি শহর বসিয়েছিল। মালেকিয়াহ দলটি তার সমস্ত কথা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এসব জঘন্য কার্য সত্ত্বেও তারা ইয়াহুদীদের উপর বিজয় লাভ করেছিল। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তারা সবাই কাফির হলেও তুলানামূলকভাবে ঐ খ্রীষ্টানরাই সত্য ও ন্যায়ের বেশী নিকটবর্তী ছিল। তাদের সবারই উপর আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে তাঁর মনোনীত রাসূল করে দুনিয়ায় পাঠালেন তখন জনগণ তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। তাদের ঈমান ছিল আল্লাহর সত্ত্বার উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, কিতাব সমূহের উপর এবং তাঁর সমস্ত রাসূলের উপর। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে নবীগণের (আঃ) সত্যানুসারী এরাই ছিল অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদী (সঃ)। কেননা, এরা নিরক্ষর, আরবী, সর্বশেষ নবী (সঃ)-এর উপর ঈমান এনেছিল যিনি ছিলেন বানী আদমের নেতা। আর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শিক্ষা ছিল সমস্ত সত্যকে স্বীকার করে নেয়ার শিক্ষা এবং প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক নবীর সত্যানুসারীদেরকে 'আমার উম্মত' বলার দাবীদার ছিলেন তিনিই।

কারণ, যারা নিজেদেরকে হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর উম্মত বলে দাবী করতো তারা ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দিয়েছিল। তা ছাড়া শেষ নবী (সঃ)-এর ধর্মও ছিল পূর্বের সমস্ত শরীয়তকে রহিতকারী। এ ধর্ম কিয়ামত পর্যন্ত রাক্ষিত থাকবে এবং একটি ক্ষুদ্র অংশও পরিবর্তিত হবে না। এ জন্যই এ আয়াতের অঙ্গীকার অনুসারে মহান আল্লাহ এ উম্মতকে কাফিরদের উপর বিজয়ী করেন এবং এরা পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

এ ‘উম্মতে মুহাম্মদী’ই বহু দেশ পদদলিত করে, বড় বড় অত্যাচারী ও শক্তিশালী কাফিরদের মস্তক ছিন্ন করে। অর্থ-সম্পদ তাদের পদতলে গড়িয়ে পড়ে। বিজয় ও গানিমত তাদের পদ-চুম্বন করে। বহু যুগের পুরাতন সাম্রাজ্যের সিংহাসনগুলো এরা পরিবর্তন করে দেয়। পারস্য সম্রাট কিসরার ঝাঁকজমক পূর্ণ সাম্রাজ্য এবং তার সুন্দর সুন্দর উপাসনাগারগুলো এদের হাতে বিন্দুস্ত হয়ে যায়। রোমান সম্রাট কায়সারের মুকুট ও সিংহাসন এ মুসলিমবাহিনীর আক্রমণে ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে। এরাই ঐ খ্রীষ্টানদেরকে মাসীহ পূজার স্বাদ প্রহণ করিয়ে দেয়। তাদের ধন-ভাণ্ডার মুসলমানেরা ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সত্য নবী (সঃ)-এর ধর্মের প্রসার কার্যে প্রাণ খুলে খরচ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অঙ্গীকার মানুষ উদীয়মান সূর্য ও পূর্ণিমার চন্দ্রের উজ্জ্বল্যের ন্যয় সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করে। হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর দুর্নামকারীরা এবং তাঁর নামে শয়তানের পূজারীরা বাধ্য হয়ে সিরিয়ার শ্যামল উদ্যানসমূহ এবং কোলাহলময় শরহগুলো এক আল্লাহর বন্দেগীকারীদের হাতে সমর্পণ করতঃ অসহায় অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে রোমক সাম্রাজ্য বসতি স্থাপন করে। কিন্তু পরে তথা হতে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে বের করে দেয়া হয় এবং অবশেষে তারা স্বীয় বাদশাহর বিশেষ শহর কনষ্টান্টিনোপলে পৌঁছে। অতঃপর সেখান হতেও তাদেরকে অপদস্থ করে তাড়িয়ে দেয়া হয় এবং ইনশাআল্লাহ মুসলমানেরা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর বিজয়ীই থাকবে। সমস্ত সত্যবাদীর নেতা যাঁর সত্যবাদিতার উপর মহান আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ) সংবাদ দিয়েই দিয়েছেন যা চিরদিন অটল থাকবে, তিনি বলেন যে, তাঁর উম্মত কনষ্টান্টিনোপল জয় করবে এবং তথাকার সমস্ত ধন-ভাণ্ডার তাদের অধিকারে এসে যাবে। রোমকদের সঙ্গেও তাদের এমন ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে যার তুলনা দুনিয়ায় নেই। আমি এগুলো একটি পৃথক পুস্তকে সন্নিবেশিত করেছি।

আল্লাহ তা'আলার পরবর্তী উক্তির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যেসব ইয়াহুন্দী হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে অবিশ্বাস করেছিল এবং যেসব খ্রীষ্টান তাঁর সম্পর্কে অশোভনীয় কথা বলেছিল, দুনিয়ায় তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করা হয়েছে এবং তাদের ধন-মাল ও সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এভাবে তাদের উপর পার্থিব শাস্তি নেমে এসেছে। আর পরকালে তাদের জন্যে যেসব শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো সম্বন্ধেও তাদের চিন্তা করা উচিত। যেখানে তাদেরকে না কেউ রক্ষা করতে পারবে, না কেউ কোন সাহায্য করতে পারবে। পক্ষান্তরে মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। দুনিয়াতেও তাদেরকে বিজয়, সাহায্য ও সম্মান দান করবেন এবং পরকালেও তারা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীদেরকে ভালবাসে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘হে নবী (সঃ)! হ্যরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর জন্মের প্রাথমিক অবস্থার প্রকৃত রহস্য এটাই ছিল যা আল্লাহ তা'আলা লওহে মাহফুয় হতে অহীর মাধ্যমে তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে কোন সংশয় ও সন্দেহ নেই। যেমন সূরা-ই-মারহিয়ামে বলেছেনঃ ‘এটাই ঈসা ইবনে মারহিয়াম, এটাই প্রকৃত রহস্য যে ব্যাপারে তুমি সন্দেহ পোষণ করছিলে, তাঁর (আল্লাহর) সন্তান হওয়া মোটেই শোভনীয় নয়। তিনি এটা হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছে করেন তখন শুধু বলেন, ‘হও’ আর তেমনই হয়ে যায়’।

এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

৫৯। নিচয়ই আল্লাহর নিকট

ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের  
অনুরূপ; তিনি তাকে মৃত্তিকা  
ঘারা সৃষ্টি করলেন, তৎপর  
বললেন, হও, ফলতঃ তাতেই  
হয়ে গেল।

৬০। এ বাস্তব ঘটনা তোমার  
প্রতিপালকের পক্ষ হতে;  
সুতরাং তুমি সংশয়ীদের  
অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

۵۹- إِنَّ مِثْلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ

كَمِثْلِ ادْمَ خَلْقَهُ مِنْ تُرَابٍ

وَمَّا قَالَ لَهُ كَنْ فَيَكُونُ ۝

۶۰- الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ

مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

৬১। অনন্তর তোমার নিকট যে  
জ্ঞান এসেছে- তার পরে  
তদ্বিষয়ে যে তোমার সাথে  
কলহ করে, তুমি বল- এসো  
আমরা আমাদের সন্তানগণ ও  
তোমাদের সন্তানগণকে,  
আমাদের নারীগণ ও  
তোমাদের নারীগণকে এবং  
স্বয়ং আমাদেরকে ও স্বয়ং  
তোমাদেরকে আহ্বান করি-  
তৎপরে প্রার্থনা করি যে,  
অসত্যাবাদীদের উপর  
আল্লাহর অভিসম্পাত হোক।

৬২। নিশ্চয়ই এটাই সত্য বিবরণ  
এবং আল্লাহ ব্যতীত মা'বুদ  
নেই, নিশ্চয়ই সেই আল্লাহ  
পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

৬৩। অতঃপর যদি তারা যুখ  
ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চয়ই  
আল্লাহ দুষ্কার্যকারীদের  
ব্যাপারে পরিজ্ঞাত আছেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন-  
'হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে আমি বিনা বাপে সৃষ্টি করেছি বলেই তোমরা খুব  
বিশ্঵বোধ করছো? তার পূর্বে তো আমি হ্যরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছি,  
অথচ তার বাপও ছিল না, মাও ছিল না। বরং তাঁকে আমি মাটি দ্বারা সৃষ্টি  
করেছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম- 'হে আদম! তুমি 'হও', আর তেমনি সে  
হয়ে গিয়েছিল। তাহলে আমি যখন বিনা বাপ-মায়ে সৃষ্টি করতে পেরেছি তখন  
শুধু মায়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করা আমার কাছে কি কোন কঠিন কাজ? সুতরাং শুধু  
বাপ না হওয়ার কারণে যদি হ্যরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র হওয়ার যোগ্যতা  
রাখতে পারে, তবে তো হ্যরত আদম আদম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার পুত্র

٦١- فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ  
مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ  
تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ  
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَانفُسَنَا  
وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ  
لَعْنَ اللَّهِ عَلَى الْكُلُّبِينَ ۝

٦٢- إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ  
وَمَا مِنِ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ  
لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

٦٣- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
بِالْمُفْسِدِينَ ۝

হওয়ার আরও বেশী দাবীদার। (নাউজুবিল্লাহে) কিন্তু স্বয়ং তোমরাও তো তা স্বীকার কর না। কাজেই হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে এ মর্যাদা হতে সরিয়ে ফেলা আরও উভয়। কেননা, পুত্রত্বের দাবীর অসারতা ওখানের চাইতে এখানেই বেশী স্পষ্ট। কারণ এখানে তো মা আছে কিন্তু ওখানে মা ও বাপ কেউ ছিল না। এগুলো প্রবল প্রকার আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি আদম (আঃ)-কে নারী পুরুষ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, হ্যরত হাওয়া (আঃ)-কে শুধু পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এবং হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে শুধু নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন'। যেমন 'সূরা-ই-মারইয়ামের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ﴿أَرْبَعَةٌ أَمْ لِنَجْعَلَهُ أَيْةً لِّلنَّاسِ﴾ অর্থাৎ 'আমি তাকে (ঈসা আঃ-কে) মানুষের জন্যে আমার ক্ষমতার নির্দর্শন বানিয়েছি।' (১৯: ২১) আর এখানে বলেন যে, হ্যরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার সত্য মীমাংসা এটাই। এটা ছাড়া কম বেশীর কোন স্থানই নেই। কেননা, সত্যের পরে পথভ্রষ্টতারই স্থান। সুতরাং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সন্দেহ পোষণ করা মোটেই উচিত নয়।

অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর নবী (সঃ)-কে বলেনঃ 'এরূপ স্পষ্ট বর্ণনার পরেও যদি কোন লোক হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে তুমি তাদেরকে 'মুবাহালার' (পরম্পর বদ দু'আ করার) জন্যে আহবান করতঃ বল- 'এসো আমরা উভয় দল আমাদের পুত্রদেরকে এবং স্ত্রীদেরকে নিয়ে মুবাহালার জন্যে বেরিয়ে যাই এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি যে, হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে দল মিথ্যাবাদী তার উপর আপনি আপনার অভিসম্পাত বর্ণ করুন'।

'মুবাহালা'য় অবতীর্ণ হওয়া এবং প্রথম হতে এ পর্যন্ত এ সমুদয় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিল নাজরানের শ্রীষ্টান প্রতিনিধিগণ। ঐলোকগণ এখানে এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হ্যরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, হ্যরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার অংশীদার এবং তাঁর পুত্র। (নাউজুবিল্লাহ) কাজেই তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডন ও তাদের কথার উভয়ে এসব আয়াত অবতীর্ণ হয়। হ্যরত ইবনে ইসহাক স্বীয় প্রসিদ্ধ কিতাব 'সীরাতে' লিখেছেন এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও নিজ নিজ পুস্তকসমূহে বর্ণনা করেছেন যে, নাজরানের শ্রীষ্টানগণ প্রতিনিধি হিসেবে ষাটজন লোককে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে প্রেরণ করে, যাদের মধ্যে চৌদজন তাদের নেতৃস্থানীয় লোক ছিল। তাদের নাম নিম্নে দেয়া হলঃ (১) আকিব, যার

নাম ছিল আবদুল মাসীহ, (২) সায়েদ, যার নাম ছিল আইহাম, (৩) আবৃহারিসা ইবনে আলকামা, যে ছিল বাকর ইবনে অয়েলের ভাই, (৪) ওয়ারিস ইবনে হারিস, (৫) যায়েদ, (৬) কায়েস, (৭) ইয়ায়ীদ, (৮) ও (৯) তার দুটি পুত্র (১০) খুয়াইলিদ, (১১) আমর, (১২) খালিদ, (১৩) আবদুল্লাহ এবং (১৪) মুহসীন।

এ চৌদজন ছিল তাদের নেতা এবং এদের মধ্যে আবার তিনজন বড় নেতা ছিল। তারা হচ্ছেঃ (১) আকিব, এ লোকটি ছিল কওমের আমীর এবং তাকে জ্ঞানী ও পরামর্শদাতা হিসেবে গণ্য করা হতো, আর তার অভিমতের উপরেই জনগণ নিশ্চিত থাকতো। (২) সায়েদ, এ লোকটি ছিল তাদের একজন বড় পাদরী ও উঁচু দরের শিক্ষক। সে বানু বাকর ইবনে ওয়েলের আরব গোত্রভুক্ত ছিল। কিন্তু সে খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছিল। রোমকদের নিকট তার খুব সম্মান ছিল। তারা তার জন্যে বড় বড় গীর্জা নির্মাণ করেছিল। তার ধর্মের প্রতি দৃঢ়তা দেখে তারা অত্যন্ত খাতির সম্মান করতো। সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গুণাবলী সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ছিল। কারণ, সে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে তাঁর বিশেষণ সম্বন্ধে পড়েছিল। অন্তরে সে তাঁর নবুওয়াতকে স্বীকার করতো। কিন্তু খ্রীষ্টানদের নিকট তাঁর যে খাতির-সম্মান ছিল তা লোপ পেয়ে যাওয়ার ভয়ে সে সুপথের দিকে আসতো না এবং (৩) হারিসা ইবনে আলকামা। মোটকথা এ প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে মসজিদে নববীতে উপস্থিত হয় এবং সে সময় তিনি আসরের নামায সমাধা করে মসজিদে বসেছিলেন। এ লোকগুলো মূল্যবান পোষাক পরিহিত ছিল এবং তাদের গায়ে ছিল সুন্দর ও নরম চাদরসমূহ। তাদেরকে দেখে বানু হারিস ইবনে কাবৈর বংশের লোক বলে মনে হচ্ছিল। সাহাবীগণ (রাঃ) মন্তব্য করেন যে, ওদের পরে ঐরকম জাঁকজমকপূর্ণ আর কোন প্রতিনিধি কখনও আসেনি। তাদের নামাযের সময় হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুমতিক্রমে তারা মসজিদে নববীতেই পূর্ব দিকে মুখ করে তাদের নিয়মানুযায়ী নামায আদায় করে নেয়। নামায শেষে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তাদের আলোচনা শুরু হয়।

মুখপাত্র হিসেবে নিম্নের তিনজনই কথা বলছিলঃ (১) হারেসা ইবনে আলকামা, (২) আকিব অর্থাৎ আবদুল মাসীহ এবং (৩) সায়েদ অর্থাৎ আইহাম। এরা শাহী মাযহাবের লোক ছিল বটে কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে মতভেদ রাখতো। হ্যরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে তাদের তিনটি ধারণা ছিল। অর্থাৎ তিনি

নিজেই আল্লাহ, আল্লাহর পুত্র এবং তিন আল্লাহর মধ্যে এক আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ অপবিত্র কথা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রায় সমস্ত শ্রীষ্টানেরই এ বিশ্বাস। হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর আল্লাহ হওয়ার দলীল তাদের নিকট এই ছিল যে, তিনি মৃতকে জীবিত করতেন, অঙ্গদেরকে চক্ষু দান করতেন, শ্঵েতকুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করতেন, ভবিষ্যতের সংবাদ দিতেন এবং মাটি দিয়ে পাখী তৈরী করতঃ ওর মধ্যে ফুঁদিয়ে উড়িয়ে দিতেন। এর উত্তর এই যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হৃকুমেই এ সমস্ত কাজ তাঁর দ্বারা প্রকাশ পেতো। কারণ এই যে, যেন তাঁর কথা সত্য হওয়ার উপর এবং হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়াতের উপর তাঁর নির্দর্শনাবলী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যাঁরা তাঁকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলতো তাদের দলীল এই যে, তাঁর পিতা ছিল না এবং তিনি দোলনা হতে কথা বলেছেন, যা তাঁর পূর্বে কখনও ঘটেনি। আর তিন আল্লাহর তৃতীয় আল্লাহ বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালাম পাকে বলেছেনঃ “আমরা করেছি, আমাদের নির্দেশ, আমাদের সৃষ্টি, আমরা মীমাংসা করেছি ইত্যাদি।” সুতরাং যদি আল্লাহ একজনই হতেন তবে এরূপ না বলে বরং বলতেনঃ ‘আমি করেছি, আমার নির্দেশ, আমার সৃষ্টি, আমি মীমাংসা করেছি। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, আল্লাহ তিনজন। একজন স্বয়ং আল্লাহ, দ্বিতীয় জন হ্যরত মারইয়াম এবং তৃতীয় জন হ্যরত ঈসা (আঃ)। আল্লাহ তা'আলা ঐ অত্যাচারী ও কাফিরদের কথা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তাদের এসব কথার অসারতা প্রকাশক আয়াত কুরআন মাজীদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এ তিনজন পাদরীর সাথে আলোচনা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেনঃ ‘তোমরা মুসলমান হয়ে যাও।’ তখন তারা বলেঃ ‘আমরা তো স্বীকারকারী রয়েছিই।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘না, না, তোমাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলছি।’ তারা বলে, ‘আমরা তো আপনার পূর্বেকার মুসলমান।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘না, তোমাদের এ ইসলাম গ্রহণীয় নয়। কেননা, তোমরা আল্লাহ তা'আলার সন্তান সাব্যস্ত করে থাক, ক্রুশের পূজো কর এবং শূকর খেয়ে থাক।’ তারা বলে, ‘আচ্ছা, তাহলে বলুন তো হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর পিতা কে ছিলেন?’ এতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নীরব থাকেন এবং প্রথম হতে আশ্চর্যে বেশী আয়াত তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে অবতীর্ণ হয়। হ্যরত ইবনে ইসহাক (রঃ) এগুলোর সংক্ষিপ্ত তাফসীর বর্ণনা করার পর লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এ আয়াতগুলো পাঠ করে তাদেরকে বুঝিয়ে দেন। মুবাহলার আয়াতটি পাঠ করতঃ তাদেরকে বলেনঃ ‘তোমরা যদি স্বীকার না কর তবে এসো আমরা ‘মুবাহলা’য় বের হই। এ কথা শুনে তারা

বলে, ‘হে আবুল কাসিম (সঃ)! আমাদেরকে কিছুদিন সময় দেন। আমরা পরম্পর পরামর্শ করে আপনাকে এর উত্তর দেবো।’ তখন তারা নির্জনে বসে আ’কবের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করে যাকে তাদের মধ্যে বড় শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মনে করা হতো। সে তার শেষ সিদ্ধান্তের কথা নিম্ন লিখিত ভাষায় স্বীয় সঙ্গীদেরকে শুনিয়ে দেয়, “হে খীষ্টানের দল! তোমরা নিশ্চিতরূপে এটা জেনে নিয়েছো যে, হ্যরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ তা’আলার সত্য রাসূল। তোমরা এটাও জান যে, হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর মূলতত্ত্ব তাই যা তোমরা মুহাম্মদ (সঃ)-এর মুখে শুনেছো। আর তোমরা এটাও খুব ভাল জান যে, যে সম্প্রদায় নবীর সাথে পরম্পর অভিসম্পাত দেয়ার কাজে অংশ নেয় সে সম্প্রদায়ের ছোট বড় কেউ বাকি থাকে না বরং সবাই সমূলে ধ্রংস হয়ে যায়। যদি তোমরা ‘মুবাহালা’র জন্যে অগ্রসর হও তবে তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। সুতরাং তোমরা ইসলাম ধর্মকেই গ্রহণ করে নাও। আর যদি তোমরা কোনক্রমেই এ ধর্ম গ্রহণ করতে স্বীকৃত না হও এবং ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তোমাদের যে ধারণা রয়েছে ওর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাও তবে মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে সক্ষি করতঃ স্বদেশে ফিরে যাও।” অতএব তারা এ পরামর্শ করতঃ নবী (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেঃ ‘হে আবুল কাসিম (সঃ)! আমরা আপনার সাথে ‘মুবাহালা’ করতে প্রস্তুত নই। আপনি আপনার ধর্মের উপর থাকুন এবং আমরা আমাদের ধারণার উপর রয়েছি। কিন্তু আপনি আমাদের সাথে আপনার সহচরদের মধ্যে হতে এমন একজনকে প্রেরণ করুন যাঁর উপর আপনি সন্তুষ্ট রয়েছেন। তিনি আমাদের আর্থিক বিবাদের মীমাংসা করে দেবেন। আপনারা আমাদের দৃষ্টিতে খুবই পছন্দনীয়।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেনঃ ‘আচ্ছা, তোমরা দুপুরে আবার এসো। আমি একজন খুব বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তোমাদের সাথে পাঠিয়ে দেবো।’ হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ ‘আমি এদিন ছাড়া অন্য কোন দিন নেতা হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করিনি শুধুমাত্র এ আশায় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে শুণের প্রশংসা করেছেন, আল্লাহ তা’আলার নিকট আমিই যেন ঐ গুলোর অধিকারী হতে পারি। এ উদ্দেশ্যে আমি সেদিন খুব সকাল সকাল যোহরের নামাযের জন্যে বেরিয়ে পড়ি।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে আগমন করতঃ যোহরের নামায পড়িয়ে দেন। অতঃপর তিনি ডানে বামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। আমি বারবার আমার জায়গায় উঁচু হতে থাকি যে, যেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দৃষ্টি আমার প্রতি নিপত্তি হয়। তিনি মনযোগের সাথে দেখতেই থাকেন। অবশ্যে তার দৃষ্টি হ্যরত আবু উবাইদাই ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-এর

প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। তাঁকে তিনি ডেকে বলেনঃ ‘এদের সাথে গমন কর এবং সত্যের সাথে তাদের মতবিরোধের মীমাংসা করে দাও।’ সুতরাং তিনি তাদের সাথে গমন করেন। ‘ইবনে মীরদুওয়াই (রাঃ)-এর গ্রন্থের মধ্যেও এ ঘটনাটি এভাবেই নকল করা হয়েছে, কিন্তু তথায় নেতৃবর্গের সংখ্যা রয়েছে বারজন এবং এ ঘটনার মধ্যে কিছু দীর্ঘতাও রয়েছে, তাছাড়া কিছু বেশী কথাও আছে।

সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে হয়রত হ্যাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাজরানের দু’জন নেতা আ’কিব ও সায়েদ ‘মুবাহালা’র জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। কিন্তু একজন অপরজনকে বলেঃ ‘এ কাজ করো না। আল্লাহর শপথ! যদি ইনি নবী হন আর আমরা তাঁর সাথে ‘মুবাহালা’ করি তবে আমরা আমাদের সন্তানাদিসহ ধ্বংস হয়ে যাব।’ সুতরাং তারা একমত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেঃ ‘জনাব! আপনি আমাদের নিকট যা চাইবেন আমরা তা প্রদান করবো। আপনি আমাদের সাথে একজন বিশ্বস্ত লোককে প্রেরণ করুন এবং অবশ্যই বিশ্বস্ত লোককেই পাঠাতে হবে।’ তিনি বলেনঃ ‘তোমাদের সাথে আমি পূর্ণ বিশ্বস্ত লোককেই প্রেরণ করবো।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাকে নির্বাচন করেন এটা দেখার জন্যে তাঁর সহচরবর্গ এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করেন। তিনি বলেনঃ ‘হে আবু উবাইদাহ! তুমি দাঁড়িয়ে যাও।’ তিনি দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘এ লোকটিই এ উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি।’

সহীহ বুখারী শরীফের অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘প্রত্যেক উম্মতের বিশ্বস্ত লোক থাকে এবং এ উম্মতের বিশ্বস্ত লোক হচ্ছে হয়রত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)।’ মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হয়রত ইবনে আবুবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অভিশপ্ত আবু জেহেল বলেছিলঃ ‘যদি আমি মুহাম্মদ (সঃ)-কে কাবায় নামায পড়তে দেখতাম তবে তার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।’ বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘যদি সে এরূপ করতো তবে সবাই দেখতে পেত যে, ফেরেশতাগণ তারই গর্দান উড়িয়ে দিয়েছেন এবং যদি ইয়াহুদীরা মৃত্যুর আখাঙ্কা করতো তবে অবশ্যই তাদের মৃত্যু এসে যেতো, আর তারা তাদের স্থান জাহান্নামের আগুনের মধ্যে দেখে নিতো। যেসব প্রীষ্টানকে মুবাহালার জন্যে আহবান করা হয়েছিল, যদি তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মুবাহালার জন্যে বের হতো তবে তারা ফিরে গিয়ে নিজেদের ধন-সম্পদ ও ছেলে মেয়েকে পেতো না।

সহীহ বুখারী, জামেউত তিরমিয়ী এবং সুনানে নাসাইর মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে। ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। ইমাম বায়হাকীও (রঃ) স্বীয় গ্রন্থ ‘দালাইলুন্নবুওয়াহ’-এর মধ্যে নাজরান হতে আগত শ্রীষ্টান প্রতিনিধিদের ঘটনাটি সুদীর্ঘভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা এখানে ওটা নকল করছি। কেননা, এতে বহু উপকার রয়েছে। তবে এতে দুর্বলতাও আছে। কিন্তু এ স্থানের সাথে এর যথেষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে। সালমা ইবনে আবদ্দ ইয়াসু’ স্বীয় দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি পূর্বে শ্রীষ্টান ছিলেন এবং পরে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, অবর্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নাজরান বাসীর নিকট একখানা পত্র লিখেন যার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপঃ

بِاسْمِ اللَّهِ ابْرَاهِيمَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى  
أَسْفَ نَجَرَانَ وَأَهْلِ نَجَرَانَ أَسْلِمْ أَنْتُمْ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمْ اللَّهَ ابْرَاهِيمَ وَاسْحَاقَ  
وَيَعْقُوبَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَادْعُوكُمْ  
إِلَى وَلَايَةِ اللَّهِ مِنْ وَلَايَةِ الْعِبَادِ فَإِنْ أَبِيتُمْ فَالْجِزَيْةُ فَإِنْ أَبِيتُمْ فَأَذْنُكُمْ  
بِالْحَرْبِ وَالسَّلَامُ

অর্থাৎ ‘এ পত্রটি আমি হ্যরত ইবরাহীম (আঃ), হ্যরত ইসহাক (আঃ) এবং হ্যরত ইয়াকুব (আঃ)-এর মা’বুদের নামে আরম্ভ করছি। এটা আল্লাহর নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর পক্ষ হতে নাজরানের বাদশাহ ও ওর অধিবাসীর নিকট। তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। আমি তোমাদের সামনে হ্যরত ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রভুর প্রশংসা করছি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বান্দার উপাসনা ছেড়ে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করছি এবং আমি তোমাদেরকে বান্দার নৈকট্য ছেড়ে আল্লাহর নৈকট্যের দিকে ডাকছি। যদি এটা অস্বীকার কর, তবে অধীনতা স্বীকার করতঃ জিয়িয়া কর প্রদান কর। আর যদি এটাও মানতে সম্মত না হও তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি, ওয়াস্সালাম।’ এ পত্র প্রাপ্তির পর বাদশাহ তা পাঠ করেন এবং অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত ও কম্পিত হয়ে পড়েন। তৎক্ষণাতঃ তিনি শুরাহবীল ইবনে অদাআহকে ডেকে পাঠান। সে ছিল হামদান গোত্রের লোক। সে সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় পরামর্শদাতা ছিল। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে পড়লে সর্বপ্রথম অর্থাৎ আইহাম, সায়েদ এবং আকেবের পূর্বেও তার নিকট পরামর্শ নেয়া হতো। সে উপস্থিত হলে নেতা তাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পত্রটি

প্রদান করেন। তার পড়া হলে বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘বল, তোমার অভিমত কি?’ সে বলে, ‘বাদশাহর খুব ভাল জানা আছে যে, আল্লাহ তা’আলা স্থীয় কিতাবে হয়রত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর হতে একজন নবী পাঠাবার অঙ্গীকার করেছেন। ইনিই হয়তো সেই নবী, এতে বিশ্বয়ের কি আছে? নবুওয়াতের বিষয়ে আমি কি অভিমত পেশ করতে পারি? তবে রাজ্যের ব্যাপারে কোন কিছু হলে অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করে বের করতাম।’ বাদশাহ তাকে পৃথক জায়গায় বসিয়ে দেন। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে শুরাহবীলকে আহ্বান করেন। এ লোকটিও রাজ্যের একজন পরামর্শদাতা ছিল। সে ছিল হুমায়ের গোত্রের লোক। বাদশাহ তাকে পত্রটি দিয়ে পাঠ করিয়ে নেন এবং মতামত জিজ্ঞেস করেন। সে ঠিক প্রথম পরামর্শদাতার মতই কথা বলে। একেও বাদশাহ দূরে পৃথক জায়গায় বসিয়ে রাখেন। অতঃপর জাববার ইবনে ফায়েয়কে ডাক দেন। এ লোকটি ছিল বানু হারিস গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এও পূর্বের দু’জনের মতই মন্তব্য করেন। বাদশাহ যখন দেখেন যে, ঐ তিনি জনের অভিমত একই হয়ে গেছে তখন তিনি নির্দেশ দেন যে, যেন শঙ্খ বাজান হয়, অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয় এবং গীর্জায় পতাকা উত্তোলন করা হয়। তথায় এ প্রথা ছিল যে, যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে পড়তো এবং জনগণকে রাত্রে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতো তখন তারা একুপই করতো। আর দিনের বেলায় লোকদেরকে জমা করার প্রয়োজন হলে তারা গীর্জায় আগুন জ্বালিয়ে দিতো এবং জোরে জোরে শঙ্খ বাজাতো। এ নির্দেশ হওয়া মাত্রই চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং শঙ্খের শব্দ সকলকে সতর্ক করে দেয়। পতাকা উত্তোলিত দেখে আশে-পাশের উপত্যকার সমস্ত লোক জমা হয়ে যায়। ঐ উপত্যকার দৈর্ঘ্য এতো বেশী ছিল যে, একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে ওর শেষ প্রান্তে পৌছতে পারতো। ওর মধ্যে তিহাত্তরটি গ্রাম ছিল এবং এক লক্ষ বিশ হাজার তরবারী চালক তথায় বাস করতো।

এসব লোক এসে গেলে বাদশাহ তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পত্র পাঠ করে শুনিয়ে দেন এবং তাদের মতামত জিজ্ঞেস করেন তখন সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি একবাক্যে বলে যে, শুরাহবীল ইবনে অদাইআহ্ হামদানী, আবদুল্লাহ ইবনে শুরাহবীল আসবাহী এবং জাববার ইবনে ফায়েয় হারেসীকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠান হোক। তারা তথা হতে পূর্ণ সংবাদ নিয়ে আসবে। তখন এখানকার প্রতিনিধি দল এ তিনজনের নেতৃত্বে রওয়ানা হয়। মদীনায় পৌছে এ লোকগুলো

তাদের ভ্রমণের পোষাক খুলে ফেলে এবং লম্বা লম্বা রেশমী চাদর ও লুঙ্গী পরিধান করে। তারা স্বর্ণ নির্মিত আংটি অঙ্গুলিতে পরে নেয়। অতঃপর তারা স্বীয় চাদরের প্রান্ত ধরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয় এবং সালাম জানায়। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। এরা বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতে থাকে যে, তিনি কিছু আলাপ আলোচনা করবেন। কিন্তু ঐ রেশমী চাদর, লুঙ্গী এবং সোনার আংটির কারণে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের সাথে কোন কথাও বললেন না। তখন এ লোকগুলো হ্যরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) এবং হ্যরত আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রাঃ)-এর খোঁজে বের হয়। এ দু'জন মনীষীর সাথেই ছিল তাদের প্রথম সাক্ষাৎ। তারা মুহাজির ও আনসারের এক সভাস্থলে তাদের দু'জনকে পেয়ে যায়। তাদের নিকট তারা ঘটনাটি বর্ণনা করে বলে, ‘আপনাদের নবী (সঃ) আমাদেরকে পত্র লিখেছিলেন। আমরা তাঁর উত্তর দেবার জন্যে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছি। আমরা তাঁর নিকট গিয়ে সালাম করি কিন্তু তিনি সালামের উত্তর দেননি। অতঃপর আমরা তাঁর সাথে কিছু আলোচনা করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করি কিন্তু তিনি আমাদের সাথে কোন কথাই বলেননি। অবশ্যে আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে এসেছি। এখন আপনারা বলুন, আমরা কি এমনিই চলে যাবো?’ ঐ দু'জন হ্যরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)-কে বলেনঃ ‘আপনিই তাদেরকে উত্তর দিন।’ হ্যরত আলী (রাঃ) তখন বলেন, ‘আমার ধারণায় এ লোকদের এ চাদর, লুঙ্গীগুলো ও আংটিসমূহ খুলে ফেলে দিয়ে ভ্রমণের ঐ সাধারণ পোষাকগুলো পরেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে পুনরায় উপস্থিত হওয়া উচিত।’ লোকগুলো তাই করে। তারা ঐ সাধারণ পোষাকেই তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়। তারা তাঁকে সালাম করে এবং তিনি উত্তর দেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ ‘যে আল্লাহ আমাকে সত্যের সাথে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! এ লোকগুলো যখন আমার নিকট প্রথমবার এসেছিল তখন তাদের সাথে ইবলীস ছিল।’ তখন প্রশ্ন-উত্তর এবং আলাপ-আলোচনা শুরু হয়।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রশ্ন করছিলেন এবং উত্তরও দিছিলেন। অনুরূপভাবে ঐ প্রতিনিধি দলও প্রশ্ন করছিল এবং উত্তর দিছিল। অবশ্যে তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করে, ‘আপনি হ্যরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে কি বলেন?’ তখন তিনি বলেনঃ ‘আজ আমার নিকট এর উত্তর নেই। তোমরা অপেক্ষা কর, আমার প্রভু এ বিষয়ের যে উত্তর দেবেন আমি তোমাদেরকে তা শুনিয়ে দেবো।’ পরের দিন তারা পুনরায় আসে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখনই অবতারিত কুর্দিব্বিন-এ আয়াতটি পর্যন্ত পাঠ করে শুনিয়ে দেন। তারা এ কথা মেনে নিতে অঙ্গীকার করে। পরের

দিন সকাল হওয়া মাত্রাই পরম্পর লাভন্ত দেয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত হাসান (রাঃ) ও হ্যরত হুসাইন (রাঃ)-কে স্বীয় চাদরে জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে যান, পিছনে পিছনে হ্যরত ফাতিমা (রাঃ) আসছিলেন। সে সময় তাঁর কয়েকজন সহধর্মীণী ছিলেন। শুরাহবীল এ দৃশ্য দেখামাত্র স্বীয় সঙ্গীদ্বয়কে বলেঃ ‘তোমরা জান যে, নাজরানের সারা উপত্যকা আমার কথা মত চলে এবং আমার মতানুসারেই তারা কাজ করে থাকে। জেনে রেখো যে, এটা খুব জটিল বিষয়। যদি এ লোকটি সত্য সত্যাই নবীরূপে প্রেরিত হয়ে থাকেন তবে তাঁর দৃষ্টিতে সর্বপ্রথম আমরাই অভিশঙ্গ হবো এবং তাঁর নবুওয়াতকে সর্বপ্রথম দূরে নিষ্কেপকারীরূপে সাব্যস্ত আমরাই হবো। এ কথাটি তাঁর ও তাঁর সহচরদের অন্তর হতে মুছে যাবে না এবং আমাদের উপর কোন না কোন বিপদ আপত্তি হবে। সারা আরবে তাঁর সবচেয়ে নিকটতম আমিই। আর জেনে রেখো যে, যদি তিনি সত্যাই আল্লাহর নবী হন তবে মুবাহলা করা মাত্রাই পৃথিবীর পৃষ্ঠে আমাদের একটি চুল বা নখ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না।’ তখন তাঁর সঙ্গীদ্বয় বলে, ‘হে আবু মারইয়াম! আপনার অভিমত কি?’ সে বলে, ‘আমার মত এই যে, তাঁকে আমরা নির্দেশ দাতা বানিয়ে দেই। তিনি যা নির্দেশ দেবেন আমরা তা মেনে নেবো। তিনি কখনও অন্যায় নির্দেশ দেবেন না।’ তারা দু’জন শুরাহবীলের কথা সমর্থন করে। তখন শুরাহবীল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলে, ‘জনাব, আমি ‘মুবাহলা’ অপেক্ষা উত্তম জিনিস আপনার সামনে পেশ করছি।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘সেটা কি?’ সে বলে, ‘আজকের দিন, আগামী রাত্রি এবং কাল সকাল পর্যন্ত আপনি আমাদের সম্বন্ধে যা নির্দেশ দেবেন আমরা তা মেনে নেবো।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাদেরকে বলেনঃ ‘সম্ভবতঃ অন্যান্য লোক তোমাদের এ সিদ্ধান্ত মেনে নেবে না।’

শুরাহবীল বলেঃ ‘আপনি আমার এ সঙ্গীদ্বয়কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে নিন।’ তিনি ঐ দু’জনকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেঃ ‘সারা উপত্যকার লোক তাঁরই মতের উপর চলে থাকে। তথায় এমন কেউ নেই যে তাঁর সিদ্ধান্ত অমান্য করতে পারে।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের এ প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং ‘মুবাহলা’ হতে বিরত হন, তারা তখনকার মত ফিরে যায়। পরের দিন সকালেই তারা নবী (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি চুক্তিপত্র তাদের হাতে দেন। ‘বিসমিল্লাহ’-এর পরে ঐ চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু নিম্নরূপঃ

‘এ চুক্তিপত্রটি আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর পক্ষ হতে নাজরান বাসীদের জন্য লিখিত হলো। তাদের প্রত্যেক হলদে, সাদা, কৃষ্ণ এবং গোলামের উপর

আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর হকুম জারী ছিল। কিন্তু তিনি সবই তাদের হাতে ছেড়ে দিলেন। প্রতি বছর তারা শুধু দু'হাজার হল্লা (লুঙ্গী ও চাদর) প্রদান করবে। এক হাজার দেবে রজব মাসে ও এক হাজার সফর মাসে ইত্যাদি।’ পূর্ণ চুক্তিপত্র তাদেরকে দেয়া হয়। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, তাদের প্রতিনিধি দল হিজরী নবম সনে এসেছিল। কেননা, হ্যরত যুহরী (রঃ) বলেন যে, সর্বপ্রথম ঐ নাজরানবাসীরাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিয়িয়া কর প্রদান করে। আর জিয়িয়ার আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পরে অবতীর্ণ হয়। আয়াতটি হচ্ছে :

(১৯: ২৯) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ

শেষ পর্যন্ত। এ আয়াতে কিতাবীদের নিকট হতে জিয়িয়া গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। ইবনে মিরদুওয়াই স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, আকিব ও তায়েব রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। তিনি তাদেরকে ‘মুবাহলা’র জন্যে আহ্বান করেন এবং তিনি হ্যরত হাসান (রাঃ) ও হ্যরত হুসাইন (রাঃ)-কে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তাদেরকে বলে পাঠালে তারা অঙ্গীকৃতি জানায় এবং জিয়িয়া প্রদানে স্বীকৃত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সেই আল্লাহর শপথ! যদি এরা দু'জন ‘না’ বলতো তবে এ উপত্যকাই তাদের উপর অগ্নি বর্ষণ করতো।’ হ্যরত জাবির (রাঃ) বলেন যে, نَدْعُ أَبْنَاءَنَا نَسَاءَنَا আয়াতটি তাদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়। শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ), ও হ্যরত আলী (রাঃ)। أَبْنَاءَنَا শব্দের দ্বারা হ্যরত হাসান (রাঃ) ও হ্যরত হুসাইন (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে এবং نَسَاءَنَا শব্দ দ্বারা হ্যরত ফাতিমা যুহরা (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। মুসতাদরিক-ই-হাকিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থেও এ অর্থের হাদীস বর্ণিত আছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘সো (আঃ) সম্বন্ধে আমি যা কিছু বর্ণনা করেছি তা চরম সত্য। এতে চুল পরিমাণও বেশী কর নেই। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ইবাদতের যোগ্য, অন্য কেউ নয়। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও মহান বিজ্ঞানময়। কিন্তু এখনও যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অন্য কিছু মানতে থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা বাতিলপন্থী ও বিবাদীদেরকে ভাল করেই জানেন। তিনি তাদেরকে জঘন্য শাস্তি প্রদান করবেন এবং এর উপরে তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। কেউ না পারবে তার নিকট হতে পালাতে না পারবে তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। তিনি পবিত্র ও প্রশংসন্মান যোগ্য। আমরা তাঁর শাস্তি হতে তাঁরই নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

৬৪। তুমি বল- হে আহলে  
কিতাব! আমাদের মধ্যে ও  
তোমাদের মধ্যে যে বাক্য  
সৌসাদৃশ্য রয়েছে তার দিকে  
এসো যেন আমরা আল্লাহ  
ব্যতীত কারও ইবাদত না করি  
ও তাঁর সাথে কোন অংশী স্থির  
না করি এবং আল্লাহকে  
পরিত্যাগ করে আমরা পরম্পর  
কাউকে প্রভু রূপে গ্রহণ না  
করি, অতঃপর যদি তারা ফিরে  
যায় তবে বল- সাক্ষী থাক  
যে, আমরাই মুসলমান ।

ইয়াহুন্দী, খ্রীষ্টান এবং ঐ প্রকারের লোকদেরকে এখানে সংশোধন করা  
হয়েছে। এর উপর হয়ে থাকে। যেমন  
এখানে **কَلِمَةٌ** শব্দের প্রয়োগ **কَلِمَةٌ مُفْعِدَةٌ**।- এর জুম্লে শব্দের অর্থ হচ্ছে সমান। অর্থাৎ যাতে মুসলমান ও ইয়াহুন্দ-খ্রীষ্টান  
সবাই সমান। অতঃপর ওর তাফসীর করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘ওটা এই যে,  
মানুষ এক আল্লাহরই ইবাদত করবে, তাঁর সাথে না কোন প্রতিমার উপাসনা  
করবে, না ত্রুশের পূজো করবে, না পূজো করবে কোন ছবির। না আল্লাহ ছাড়া  
আগুনের পূজো করবে, না অন্য কোন জিনিসের উপাসনা করবে। বরং তারা এক  
এবং অদ্বিতীয় আল্লাহরই ইবাদত করবে। সমস্ত নবী (আঃ) মানুষকে এ  
আহ্বানই জানিয়েছিলেন। ঘোষিত হয়েছেঃ

**وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ**-

অর্থাৎ ‘তোমার পূর্বে আমি যত রাসূল পাঠিয়েছি সবাইই নিকট এই অহীই  
করেছি যে, আমি ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই, সুতরাং তোমরা আমারই  
ইবাদত কর।’ (২১: ২৫) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

**وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ**

অর্থাৎ ‘আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়ে এই বলিয়েছি যে,  
তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং দেবতাদের উপাসনা হতে বিরত থাক’।  
(১৬: ৩৬)

٦٤- **قُلْ يَا هَلَّ الْكِتَابُ تَعَالَى**  
**إِلَيْهِ كَلِمَةٌ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ**  
**أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكُ**  
**بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا**  
**بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ**  
**فَإِنْ تُولُوا فَقُولُوا أَشْهَدُوا**  
**بِإِنَّا مُسْلِمُونَ** ০

অতঃপর বলা হচ্ছে- ‘আল্লাহকে ছেড়ে পরম্পর আমরা একে অপরকে প্রভু বানিয়ে নেবো না।’ ইবনে জুরায়েজ (রঃ)-এর মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে- ‘আল্লাহর অবাধ্যতায় আমরা একে অপরের অনুসরণ করবো না।’ ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে-‘আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও সিজদা করবো না।’ অতঃপর তারা যদি এ ন্যায় ভিত্তিক আহ্বানেও সাড়া না দেয় তবে- ‘হে মুসলমানগণ, তোমরা যে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করছো এ লোকদেরকে তার সাক্ষী বানিয়ে নাও।’ আমি সহীহ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। ওর মধ্যে রয়েছে যে, আবু সুফিয়ান (রাঃ) যখন রোম সম্রাট কায়সারের দরবারে আহত হন এবং সম্রাট তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বংশের অবস্থা জিজ্ঞেস করেন, সে সময় তিনি অমুসলিম ও তাঁর চরম শক্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বংশের আভিজাত্যের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হন। অনুরূপভাবে তিনি প্রত্যেক প্রশ্নেরই স্পষ্ট ও সঠিক উত্তর দেন। এটি হোদায়বিয়ার সন্ধির পরের ও মক্কা বিজয়ের পূর্বের ঘটনা। এ কারণেই নবী (সঃ) সমস্কে কায়সারের ‘তিনি কি চুক্তি ভঙ্গ করেন?’ এ প্রশ্নের উত্তরে আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলেছিলেনঃ ‘তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন না, তবে এখন আমাদের ও তার মধ্যে একটি চুক্তি রয়েছে, না জানি তিনি এতে কি করেন।’ এখানে উদ্দেশ্য এটাই যে, এ সমস্ত কথা বার্তার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র চিঠি পেশ করা হয়, যাতে ‘বিসমিল্লাহ’-এর পরে রয়েছেঃ ‘এ পত্রটি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর পক্ষ হতে রোমের বাদশাহ কায়সারের নিকট। হিদায়াতের অনুসারীদের উপর শাস্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর ইসলাম গ্রহণ কর তবে শাস্তি লাভ করবে এবং আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ পুণ্য দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে সমস্ত প্রজাদের পাপ তোমার উপর বর্তিত হবে।’ অতঃপর এ আয়াতটিই লিখেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রঃ) প্রমুখ মনীষী লিখেছেন যে, এ সূরা অর্থাৎ সূরা-ই-আলে-ইমরানের প্রথম হতে নিয়ে কিছু কম বেশী আশি পর্যন্ত আয়াতগুলো নাজরানের প্রতিনিধিদের ব্যাপারে অবরীণ হয়। ইমাম যুহরী (রঃ) বলেন যে, সর্বপ্রথম এ লোকগুলোই জিয়িয়া কর প্রদান করে এবং এ বিষয়ে মোটেই মতবিরোধ নেই যে, জিয়িয়ার আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পরে অবরীণ হয়। এখন প্রশ্ন উঠে যে, আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পর অবরীণ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) কি করে এ আয়াতটি হিরাক্সিয়াসের পত্রে লিখেন? এর উত্তর কয়েক প্রকারের দেয়া যেতে পারে। প্রথম এই যে, সম্ভবতঃ এ আয়াতটি দু’বার অবরীণ হয়। অর্থাৎ একবার হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে এবং

দ্বিতীয়বার মক্কা বিজয়ের পর। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, হয়তো সূরার প্রথম হতে এ আয়াতের পূর্ব পর্যন্ত আয়াতগুলো নাজরানের প্রতিনিধিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় এবং এ আয়াতটি পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছিল। এ অবস্থায় ইবনে ইসহাক (রাঃ)-এর ‘আশির উপর আরও কিছু আয়াত’ -এ উক্তি রক্ষিত হয় না। কেননা, আবু সুফিইয়ান (রাঃ) বর্ণিত ঘটনাটি এর সম্পূর্ণ উল্লেখ। তৃতীয় উত্তর এই যে, সম্ভবতঃ নাজরানের প্রতিনিধিদল হৃদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে এসেছিল এবং তারা যা কিছু দিতে সম্মত হয়েছিল তা হয়তো মুবাহালা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সন্ধি হিসেবেই দিয়েছিল, জিয়িয়া হিসেবে নয়। আর এটাইতো সর্বসম্মত কথা যে, জিয়িয়ার আয়াত এ ঘটনার পরে অবতীর্ণ হয় যার মধ্যে ওর সাদৃশ্য এসে যায়। যেমন হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) বদরের পূর্বেকার যুদ্ধে যুদ্ধলক্ষ মালকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেন এবং এক পঞ্চমাংশ রেখে বাকীগুলো সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেন। অতঃপর গনীমতের মাল বন্টনের আয়াতগুলোও ওর অনুরূপই অবতীর্ণ হয় এবং এ নির্দেশই দেয়া হয়। চতুর্থ উত্তর এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে পত্র হিরাক্রিয়াসকে পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি এ কথাগুলো নিজের পক্ষ হতেই লিখেছিলেন, অতঃপর তাঁর ভাষাতেই অহী অবতীর্ণ হয়। যেমন হ্যরত উমার ইবনে খান্দাব (রাঃ)-এর পর্দার নির্দেশের ব্যাপারে ঐ রকমই আয়াত অবতীর্ণ হয়। বদরের যুদ্ধে যেসব কাফির বন্দী হয়েছিল তাদের ব্যাপারেও হ্যরত উমার (রাঃ)-এর মতের অনুরূপই আয়াত নায়িল হয়। মুনাফিকদের জানায়ার নামায না পড়ার ব্যাপারেও তাঁর মতের অনুরূপ নির্দেশ জারী করা হয়। মাকাম-ই-ইবরাহীম (আঃ)-কে নামাযের স্থান বানানোর ব্যাপারেও এরূপই অহী অবতীর্ণ হয় *عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَقْكُنْ* (৬৬: ৫) -এ আয়াতটিও তাঁর কথারই সাদৃশ্যে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং এ আয়াতটিও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘোষণার সাদৃশ্যে নায়িল হয়। এটাই খুব সম্ভব।

৬৫। হে আহলে কিতাব! তোমরা ইবরাহীম সম্বন্ধে কেন বিতর্ক করছো? অথচ তার পরে ব্যতীত তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়নি, তবুও কি তোমরা বুঝছো না।

٦٥- يَاهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تُحَاجِجُنَّ  
فِيْ ابْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزَلْتَ  
الْتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ  
بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

সূরাঃ আলে ইমরান ৩

৬৬। হ্যাঁ, তোমরা এমন যে, যে  
বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল,  
তা নিয়েও তোমরা কলহ  
করেছিলে, কিন্তু যদিষ্যয়ে  
তোমাদের কোনই জ্ঞান নেই,  
তা নিয়ে তোমরা কেন কলহ  
করছো? এবং আল্লাহ  
পরিজ্ঞাত আছেন ও তোমরা  
অবগত নও।

৬৭। ইবরাহীম ইয়াহুদী ছিল না  
এবং খ্রীষ্টানও ছিল না, বরং  
সে সুদৃঢ় মুসলমান ছিল এবং  
সে অংশীবাদীগণের অন্তর্গত  
ছিল না।

৬৮। নিচয়ই ঐ সব লোক  
ইবরাহীমের নিকটতম যারা  
তার অনুগামী হয়েছেন আর  
এই নবী এবং মুমিনগণ,  
এবং আল্লাহ তা'আলা  
বিশ্বাসীগণের অভিভাবক।

ইয়াহুদীরা বলতো যে, হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) ইয়াহুদী ছিলেন এবং  
খ্রীষ্টানরা বলতো যে, তিনি খ্রীষ্টান ছিলেন এবং একথা নিয়ে তারা পরম্পর  
তর্ক-বিতর্ক করতো। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতসমূহে তাদের এ দাবীকে খণ্ডন  
করেছেন। হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) বলেন যে, নাজরান হতে আগত  
খ্রীষ্টানদের নিকট ইয়াহুদী আলেমগণ আগমন করে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর  
সামনেই তারা কলহ আরঙ্গ করে দেয়। প্রত্যেক দলেরই এ দাবী ছিল যে, হ্যরত  
ইবরাহীম (আঃ) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত  
অবতীর্ণ করেন। এতে বলা হয়, ‘হে ইয়াহুদীর দল! তোমরা কি করে হ্যরত

٦٦- هَانْتُمْ هُؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ  
فِيْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَمْ  
تَحْاجِنُونَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ  
عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ ۝

٦٧- مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَ  
لَا نَصْرَانِيًّا وَلِكِنْ كَانَ  
حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ  
الْمُشْرِكِينَ ۝

٦٨- إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ  
لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ  
الْمُؤْمِنِينَ ۝

ইবরাহীম (আঃ)-কে তোমাদের অন্তর্ভুক্ত বলছো? অথচ তার যুগে তো হ্যরত মূসাও (আঃ) ছিলেন না এবং তাওরাতও ছিল না। মূসা (আঃ) এবং তাওরাত তো ইবরাহীম (আঃ)-এর পরে এসেছে।' অনুরূপভাবে- 'হে খ্রীষ্টানের দল! তোমরা ইবরাহীম (আঃ)-কে খ্রীষ্টান কিরণে বলছো? অথচ খ্রীষ্টান ধর্ম তো তাঁর বহু শতাব্দী পরে প্রকাশ পেয়েছে। এ মোটা কথাটা বুঝার মতও কি তোমাদের জ্ঞান নেই?' অতঃপর এ দু'টি দল যে কিছু না জেনেও বিতর্কে লিঙ্গ হয়েছে এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা ভর্তসনা করেছেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে যে জ্ঞান তাদের রয়েছে তা নিয়ে যদি তারা কলহ করতো তবে কিছুটা খাপ খেতো। কিন্তু তারা এমন বিষয় নিয়ে কলহে লিঙ্গ হয়েছে, যে বিষয়ে তাদের মোটেই জ্ঞান নেই। যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই সে বিষয়টি সর্বজ্ঞত আল্লাহকে সমর্পণ করাই তাদের উচিত, যিনি প্রত্যেক জিনিসের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত রয়েছেন। একমাত্র মহান আল্লাহর প্রত্যেক প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে। এ জন্যেই তিনি বলেন-'আল্লাহ তা'আলা পরিজ্ঞাত আছেন এবং তোমারা অবগত নও। প্রকৃতপক্ষে হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) ইয়াহুদীও ছিলেন না এবং খ্রীষ্টানও ছিলেন না। বরং তিনি অংশীবাদকে ঘৃণা করতেন এবং মুশরিকদের হতে বহু দূরে থাকতেন। তিনি ছিলেন খাঁটি ঈমানদার। তিনি কখনও মুশরিক ছিলেন না।' এ আয়াতটি সূরা-ই-বাকারার নিম্নের আয়াতটির মতঃ

وَقَالُوا كُونوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا

অর্থাৎ 'তারা বলেছিল, তোমরা ইয়াহুদী হয়ে যাও অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যাও তবে সুপথ প্রাপ্ত হবে।' (২: ১৩৫)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-'হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসরণের বেশী দাবীদার ঐ সব লোক যারা তাঁর যুগে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এখন এ নবী হ্যরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ) এবং তাঁর অনুসারী মুমিনদের দল, যারা হচ্ছে মুহাজির ও আনসার এবং তাদের পরেও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারী যত লোক আসবে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'প্রত্যেক নবী (আঃ)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু নবীদের (আঃ) মধ্য হতে হয়ে থাকে এবং আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হচ্ছেন নবীদের মধ্যে হতে আমার পিতা আল্লাহ তা'আলার বন্ধু হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)।' অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। (জামেউত্ তিরমিয়ী ইত্যাদি) তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যে কেউ আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন করবে তার অভিভাবক আল্লাহ।

সূরাঃ আলে ইমরান ৩

৬৯। এবং কিতাবীগণের মধ্যে  
এক দলের বাসনা যে,  
তোমাদেরকে পথভ্রান্ত করে;  
কিন্তু তারা নিজেকে ব্যতীত  
বিপথগামী করে না এবং তারা  
বুঝছে না।

৭০। হে আহলে কিতাব! তোমরা  
কেন আল্লাহর নির্দর্শন সমূহের  
প্রতি অবিশ্বাস করছো? এবং  
তোমরাই ওর সাক্ষী।

৭১। হে কিতাবীগণ! তোমরা  
কেন সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে  
মিলিয়ে নিছ? অথচ তোমরা  
তা অবগত আছ।

৭২। আর আহলে কিতাবের  
মধ্যে একদল এটাই বলে যে,  
বিশ্বাস স্থাপনকারীদের প্রতি  
যা অবতীর্ণ হয়েছে তৎপ্রতি  
পূর্বান্তে বিশ্বাস স্থাপন কর  
এবং অপরান্তে তা অঙ্গীকার  
কর- তাহলে তারা ফিরে  
যাবে।

৭৩। আর যারা তোমাদের ধর্মের  
অনুসরণ করে তারা ব্যতীত  
বিশ্বাস করো না; তুমি বল-  
আল্লাহর পথই সুপথ- যা  
তোমাদেরকে থদান করা  
হয়েছে, তদ্বাপ অন্যকেও

৬৯- وَدَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ  
الْكِتَبِ لَوْ يُضْلُنَّكُمْ وَمَا  
يُضْلُنَّ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا  
يَشْعُرُونَ ○

৭০- يَأْهُلُ الْكِتَبِ لَمْ تَكْفُرُونَ  
يَأْيَتِ اللَّهُ وَإِنْتُمْ تَشْهُدُونَ ○

৭১- يَأْهُلُ الْكِتَبِ لَمْ تَلْبِسُونَ  
الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ  
الْحَقَّ وَإِنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

৭২- وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ  
الْكِتَبِ أَمْنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ  
عَلَى الَّذِينَ أَمْنَوْا وَجَهَ النَّهَارَ  
وَأَكْفَرُوا أُخْرَهُ لِعْلَهُمْ يَرْجِعُونَ ○

৭৩- وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبْعَ  
دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى  
اللَّهِ أَنْ يُؤْتِي أَحَدًا مِثْلَ مَا

প্রদত্ত হতে পারে; অথবা যদি  
তোমার প্রভুর সম্বন্ধে তোমার  
সাথে কলহ করে তবে তুমি  
বল-গৌরব আল্লাহরই হচ্ছে;  
তিনি যাকে ইচ্ছে দান করেন  
এবং আল্লাহই প্রশংসন  
মহাজ্ঞানী।

أُوْتِيْسُمْ أَوْ يُحَاجِّوْكُمْ عِنْدَ  
رِبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ  
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ

٧٤ - يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

৭৪। তিনি যার প্রতি ইচ্ছে করেন  
স্মীয় করুণা নির্দিষ্ট করেন  
এবং আল্লাহ মহান  
গৌরবশালী।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘ঐ ইয়াতুন্দীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর যে,  
তারা কিভাবে মুসলমানদের প্রতি হিংসায় জুলে পুড়ে মরে যাচ্ছে। তাদেরকে  
পথভ্রষ্ট করার জন্য তারা কতইনা গোপন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে এবং  
তাদেরকে প্রতারিত করছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এসব অন্যায় কার্যের শাস্তি স্বয়ং  
তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কিন্তু তারা তা মোটেই বুঝছে না।’

অতঃপর তাদেরকে তাদের এ জঘন্য কার্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে  
যে, তারা সত্য জেনে শুনে আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করছে। তাদের  
বদ্ভ্যাস এও আছে যে, তারা পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সত্য ও মিথ্যাকে মিলিয়ে  
দিচ্ছে। তাদের কিতাবসমূহে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গুণাবলী বর্ণিত আছে, তারা  
তা গোপন করছে। মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করার যেসব পস্তা তারা বের  
করেছে তার মধ্যে একটি কথা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, তারা  
পরস্পর পরামর্শ করে- ‘তোমরা দিনের প্রথমাংশে ঈমান আনবে এবং  
মুসলমানদের সাথে নামায পড়বে এবং শেষাংশে কাফির হয়ে যাবে। তাহলে  
মূর্খদেরও এ ধারণা হবে যে, এরা এ ধর্মের ভেতর কিছু ক্রিতি বিচ্যুতি পেয়েছে  
বলেই এটা গ্রহণ করার পরেও তা হতে ফিরে গেল, কাজেই তারাও এ ধর্ম  
ত্যাগ করবে এতে বিশ্বয়ের কিছুই নেই।’ মোটকথা তাদের এটা একটা কৌশল  
ছিল যে, দুর্বল ঈমানের লোকেরা ইসলাম হতে ফিরে যাবে এই জেনে যে, এ  
বিদ্বান লোকগুলো যখন ইসলাম গ্রহণের পরেও তা হতে ফিরে গেলো তাহলে

অবশ্যই এ ধর্মের মধ্যে কিছু দোষক্রটি রয়েছে। এ লোকগুলো বলতো- ‘তোমরা নিজেদের লোক ছাড়া মুসলমানদেরকে বিশ্বাস করো না, তাদের নিকট নিজেদের গোপন তথ্য প্রকাশ করো না এবং নিজেদের গ্রন্থের কথা তাদেরকে বলো না, নচেৎ তারা ওর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ তা‘আলার নিকটও তাদের জন্যে ওটা আমাদের উপর দলীল হয়ে যাবে।’

তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, সুপথ প্রদর্শন তো আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে। তিনি মুমিনদের অন্তরকে এ প্রত্যেক জিনিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যে প্রস্তুত করে দেন যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন। এ দলীলগুলোর উপর তাদের পূর্ণ বিশ্বাস রাখার সৌভাগ্য লাভ হয়। যদিও তোমরা নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ)-এর গুণাবলী গোপন রাখছো তথাপি যারা ভাগ্যবান ব্যক্তি, তাঁরা তাঁর নবুওয়াতের বাহ্যিক নিদর্শন একবার দেখেই চিনে নেবে।’ অনুরূপভাবে তারা তাদের লোককে বলতো- ‘তোমাদের নিকট যে বিদ্যা রয়েছে তা তোমরা মুসলমানদের নিকট প্রকাশ করো না, নতুবা তারা তা শিখে নেবে, এমনকি তাদের ঈমানী শক্তির কারণে তোমাদের চেয়েও বেড়ে যাবে কিংবা আল্লাহ তা‘আলার নিকট তাদের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ স্বয়ং তোমাদের গ্রন্থের মাধ্যমেই তারা তোমাদের উপর দোষারোপ করবে এবং তোমাদেরই উপর তোমাদেরই দলীল প্রতিষ্ঠিত করে বসবে।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘তোমরা বলে দাও যে, অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে রয়েছে, তিনি যাকে ইচ্ছে করেন তাকেই দিয়ে থাকেন। সমস্ত কার্য তাঁরই অধিকারে রয়েছে। তিনিই প্রদানকারী। তিনি যাকে ইচ্ছে করেন ঈমান আমল এবং অনুগ্রহ রূপ সম্পদ পরিপূর্ণ রূপে দিয়ে থাকেন। আর যাকে ইচ্ছে করেন সত্যপথ হতে অঙ্ক, ইসলামের কালেমা হতে বধির এবং সঠিক বোধ হতে বঞ্চিত করেন। তাঁর সমস্ত কাজই নিপুণতাপূর্ণ এবং তিনি প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী। তিনি যাকে চান স্বীয় করুণার সাথে নির্দিষ্ট করে নেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল। হে মুসলমানগণ! আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর সীমাহীন অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তোমাদের নবী (সঃ)-কে সমস্ত নবী (আঃ)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ শরীয়ত তোমাদেরকে প্রদান করেছেন।’

৭৫। কিতাবীদের মধ্যে একুপ  
আছে যে, যদি তুমি তার  
নিকট পুঁজীভূত ধনরাশি ও  
গচ্ছিত রেখে দাও, তবুও সে  
তা তোমার নিকট প্রত্যর্পণ  
করবে এবং তাদের মধ্যে  
একুপও আছে যে, যদি তুমি  
তার নিকট একটি ‘দীনার’ ও  
গচ্ছিত রাখ, তবে সে তাও  
তোমাকে প্রত্যর্পণ করবে না:  
কিন্তু যে পর্যন্ত তুমি তার  
শিরোপরি দণ্ডয়মান থাক,  
কারণ তারা বলে যে,  
আমাদের উপর ঐ  
অশিক্ষিতদের কোন দায়-  
দায়িত্ব নেই এবং তারা  
আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ  
করে, অথচ তারাও জানে।

৭৬। হ্যাঁ-যারা স্বীয় অঙ্গীকার  
পূর্ণ করে ও সংযত হয়, তবে  
নিশ্চয়ই আল্লাহ ধর্মভীরুৎগণকে  
ভালবাসেন।

ইয়াহুদীরা যে গচ্ছিত দ্রব্য আস্তাসৎ করে থাকে এখানে সে সম্বন্ধে আল্লাহ  
তা’আলা মুমিনদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তারা যেন ইয়াহুদীদের প্রতারণায়  
না পড়ে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্যই বিশ্বস্ত রয়েছে, কিন্তু কেউ কেউ  
বড়ই আত্মসাংকারী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন বিশ্বস্ত যে, তার কাছে রাশি  
রাশি সম্পদ রাখলেও সে যেমনকার তেমনই প্রত্যর্পণ করবে। কিন্তু কেউ কেউ  
এত বড় আত্মসাংকারী যে, তার নিকট শুধুমাত্র একটি ‘দীনার’ গচ্ছিত রাখলেও  
সে তা ফিরিয়ে দেবে না। তবে যদি মাঝে মাঝে তাগাদা করা হয় তবে হয়তো  
ফিরিয়ে দেবে নচেৎ একেবারে হজম করে নেবে। সে যখন একটা দীনারেরও

৭৫- وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ مَنْ إِنْ  
تَامَنَهُ بِقِنْطَارٍ يُؤْدِهِ إِلَيْكَ  
وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَامَنَهُ بِدِينَارٍ لَا  
يُؤْدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ  
قَالِيمًا ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ  
عَلَيْنَا فِي الْأَمْرِ سَبِيلٌ  
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ  
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

৭৬- بَلِّيْ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ  
وَاتَّقِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَّقِينَ ۝

লোভ সামলাতে পারলো না তখন বেশী সম্পদ তার নিকট গচ্ছিত রাখলে যে অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। **قِنْطَارٌ** শব্দটির পূর্ণ তাফসীর সূরার প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে। আর দীনারের অর্থতো সর্বজন বিদিত। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হ্যরত মালিক ইবনে দীনারের উক্তি বর্ণিত আছেঃ ‘দীনারকে দীনার বলার কারণ এই যে, ওটা ‘দীন’ অর্থাৎ ঈমানও বটে এবং ‘নার’ অর্থাৎ আগুনও বটে।’ ভাবার্থ এই যে, সত্ত্বের সাথে গ্রহণ করলে দীন এবং অন্যায়ভাবে গ্রহণ করলে জাহানামের অগ্নি। এ স্থলে ঐ হাদীসটি বর্ণনা করাও যথোপযুক্ত বলে মনে করি যা সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে কয়েক জায়গায় এসেছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘বানী ইসরাইলের মধ্যে একটি লোক অন্য একটি লোকের নিকট এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা খণ্ড চায়। ঐ লোকটি বলেঃ ‘সাক্ষী নিয়ে এসো।’ সে বলেঃ ‘আল্লাহ তা‘আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট।’ সে বলেঃ ‘জামিন আন।’ সে বলেঃ ‘জামানত আল্লাহ তা‘আলাকেই দিছি।’ সে তাতে সম্মত হয়ে যায় এবং পরিশোধের মেয়াদ ঠিক করে তাকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে দেয়।’

অতঃপর ঝণী ব্যক্তি সামুদ্রিক সফরে বেরিয়ে পড়ে। কাজ-কাম শেষ করে সে সমুদ্রের ধারে এসে কোন জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে, উদ্দেশ্য এই যে, মহাজনের নিকট গিয়ে তার ঝণ পরিশোধ করবে। কিন্তু কোন জাহাজ পেলো না। তখন সে এক খণ্ড কাঠ নিয়ে ওর ভেতর ফাঁপা করলো এবং ওর মধ্যে এক হাজার দীনার রেখে দিল এবং মহাজনের নামে একটি চিঠিও দিল। অতঃপর ওর মুখ বন্ধ করে দিয়ে ওটা সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল। অতঃপর বললোঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি খুব ভাল করেই জানেন যে, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে এক হাজার দীনার কর্জ নিয়েছি। তাতে আমি আপনাকেই সাক্ষী ও জামিন রেখেছি। সেও তাতে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে ঝণ দিয়েছে। এখন আমি সময়মত তার ঝণ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে নৌকা খোঁজ করছি কিন্তু পাচ্ছি না। কাজেই আমি বাধ্য হয়ে আপনারই উপর ভরসা করতঃ তা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি। আপনি তাকে তা পৌছে দিন।’ এ প্রার্থনা জানিয়ে সে চলে আসে। কাঠটি পানিতে ডুবে যায়। সে কিন্তু নৌকার অনুসন্ধানেই থাকে যে, গিয়ে তার ঝণ পরিশোধ করবে। এদিকে ঐ মহাজন লোকটি এ আশায় নদীর ধারে আসে যে, হয়তো ঝণী ব্যক্তি নৌকায় তার প্রাপ্য নিয়ে আসছে। যখন দেখল যে, কোন নৌকা আসেনি তখন সে ফিরে যেতে উদ্যত হলো। এমতাবস্থায় একটি কাঠ

নদীর ধারে পড়ে থাকতে দেখে জুলানীর কাজ দেবে মনে করে তা উঠিয়ে নেয় এবং বাড়ি গিয়ে কাঠটি ফাঁড়লে এক হাজার দীনার ও একটি চিঠি বেরিয়ে পড়ে। অতঃপর ঝণ গ্রহীতা লোকটি এসে পড়ে এবং বলেঃ ‘আল্লাহ জানেন আমি সদা চেষ্টা করেছি যে, নৌকা পেলে তাতে উঠে আপনার নিকট আগমন করতঃ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই আপনার ঝণ পরিশোধ করবো। কিন্তু কোন নৌকা না পাওয়ায় বিলম্ব হয়ে গেল।’ সে তখন বলেঃ ‘আপনি যে মুদ্রা পাঠিয়েছিলেন আল্লাহ তা‘আলা আমার নিকট পৌছে দিয়েছেন। এখন আপনি আপনার মুদ্রা নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যান।’

আহলে কিতাবের ভুল ধারণা এই ছিল যে, ধর্মাঙ্ক ও অশিক্ষিতদের ধন-সম্পদ আস্ত্রসাং করলে কোন দোষ নেই। ওটা তাদের জন্য বৈধ। তাদের এ বদ ধারণা খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেন যে, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে। কেননা, ওটা যে তাদের জন্য বৈধ নয় তা তারাও জানে। কারণ তাদের গ্রন্থেও অন্যায় মালকে আল্লাহ তা‘আলা অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এ নির্বাধের দল নিজেদের মনগড়া কথাকে “শরীয়তের রঙ্গে রঞ্জিত করছে। হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ)-কে জনগণ ফতওয়া জিজেস করেনঃ ‘জিহাদের অবস্থায় কখনো কখনো আমরা জিন্ধী কাফিরদের মুরগী, ছাগল ইত্যাদি পেয়ে থাকি এবং মনে করি যে ঐগুলো গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই (এতে আপনার মত কি?)।’ তিনি বলেনঃ ‘কিতাবধারীরাও ঠিক এ কথাই বলতো যে, মূর্দের মাল গ্রহণে কোন দোষ নেই। জেনে রেখো যে, যখন তারা জিয়িয়া কর প্রদান করবে তখন তাদের কোন মাল তোমাদের জন্যে বৈধ হবে না। তবে যদি তারা খুশী মনে দেয় তা অন্য কথা।’ (মুসনাদ-ই-আবদুর রাজজাক) হ্যরত সাইদ ইবনে যুবাইর (রঃ) বলেন যে, যখন গ্রন্থধারীদের নিকট হতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) একথা শ্রবণ করেন তখন তিনি বলেনঃ ‘আল্লাহর শক্রো মিথ্যাবাদী। একমাত্র আমানত ছাড়া অজ্ঞতা যুগের সমস্ত কিছুই আমার পায়ের নীচে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেননা, আমানত কোন পাপী ও দুরাচারের হলেও ফিরিয়ে দিতে হবে।’

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে—‘কিন্তু যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গীকার পুরো করে এবং আল্লাহকে ভয় করে, আর আহলে কিতাব হয়েও স্বীয় ধর্মগ্রন্থের হিদায়াত অনুযায়ী হ্যরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপরও বিশ্বাস স্থাপন করে, যে অঙ্গীকার সমস্ত নবী (আঃ)-এর নিকট হতে নেয়া হয়েছিল এবং যে অঙ্গীকার প্রতিপালনের

দায়িত্ব তাঁদের উচ্চতগণের উপরও রয়েছে, অতঃপর আল্লাহ পাকের অবৈধকৃত জিনিস হতে দূরে থাকে, তাঁর শরীয়তের অনুসরণ করে এবং নবীগণের (আঃ) নেতা শেষ নবী হ্যরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে, সেই মুত্তাকী এবং মুত্তাকী ব্যক্তিরাই আল্লাহর বন্ধু।'

৭৭। নিচয়ই যারা আল্লাহর  
অঙ্গীকার ও স্বীয় শপথ  
সামান্য মূল্যে বিক্রি করে,  
পরকালে তাদের কোনই অংশ  
নেই এবং আল্লাহ তাদের  
সাথে কথা বলবেন না ও  
উত্থান দিবসে তাদের প্রতি  
দৃষ্টিপাত করবেন না এবং  
তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক  
শাস্তি রয়েছে।

অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানীদের মধ্যে যারা আল্লাহর অঙ্গীকারের কোন ধার ধারে না, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুসরণ করে না, তাঁর গুণাবলীর কথা জনগণের সামনে প্রকাশ করে না, তাঁর সম্পর্কে কিছুই বর্ণনা করে না এবং মিথ্যা শপথ করে থাকে আর এসব জঘন্য কার্যের বিনিময়ে এ নশ্বর জগতে কিছু উপকার লাভ করে, তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে কোন ভালবাসাপূর্ণ কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না। তাদেরকে তিনি পাপ হতে পবিত্রও করবেন না, রবং তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেবেন। তথায় তারা বেদনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। এ আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীসও রয়েছে। ঐগুলোর মধ্যে সামান্য কয়েকটি হাদীস এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে:

(১) মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘তিনি প্রকারের লোক রয়েছে যাদের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা না কথা বলবেন, না তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন।’ একথা শুনে হ্যরত আবু যার (রাঃ) বলেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ লোকগুলো কে? এরা তো বড় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তিনবার

۷۷-إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ  
اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثُمَّنَا قَلِيلًا  
أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي  
الْأُخْرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا  
يُنْظِرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا  
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

একথাই বলেন। অতঃপর তিনি উত্তর দেনঃ ১. যে ব্যক্তি পায়ের গিটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়, ২. মিথ্যা শপথ করে যে নিজের পণ্য বিক্রি করে এবং ৩. অনুগ্রহ করার পরে যে তা প্রকাশ করে।' সহীহ মুসলিম প্রভৃতির মধ্যে এ হাদীসটি রয়েছে।

(২) মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হযরত আবু আহমাস (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'আমি হযরত আবু যার (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতঃ তাঁকে বলি-আমি শুনেছি যে, আপনি নাকি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করে থাকেন?' তিনি বলেন, 'জেনে রাখুন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে যা শুনি সে ব্যাপারে আমি তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করতে পারি না। বলুন, এই হাদীসটি কি?' আমি বলি, (তা হচ্ছে) তিনি প্রকারের লোককে আল্লাহ তা'আলা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন এবং তিনি প্রকারের লোকের প্রতি শক্রতা পোষণ করেন। তখন তিনি বলেনঃ 'হ্যা, এ হাদীসটি আমি বর্ণনাও করেছি এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছিও বটে।' আমি জিজ্ঞেস করি, কোন্ কোন্ লোককে তিনি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন? তিনি বলেনঃ 'প্রথম ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলার শক্রদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বীরত্বের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর হয় সে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়ে দেয়, না হয় বিজয়ী বেশে ফিরে আসে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে কোন যাত্রী দলের সাথে সফররত হয়েছে। বহু রাত পর্যন্ত যাত্রী দল চলতে থাকে। যখন অত্যন্ত ঝুঁতু হয়ে পড়ে তখন এক জায়গায় অবতরণ করে। সবাই তো ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু ঐ লোকটি জেগে থাকে এবং নামাযে মশগুল হয়ে পড়ে। অতঃপর যাত্রার সময় সকলকে জাগিয়ে দেয়। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দেয় এবং সে ধৈর্যধারণ করে, যে পর্যন্ত না মৃত্যু অথবা সফর তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনয়ন করে।' আমি বলিঃ ঐ তিনি ব্যক্তি কারা যাদের উপর আল্লাহ অসম্ভুষ্ট? তিনি বলেনঃ ১. খুব বেশী শপথকারী ব্যবসায়ী, ২. অহংকারী দরিদ্র এবং ৩. অনুগ্রহ প্রকাশকারী কৃপণ।' এ হাদীসটি এ সনদে গারীব।

(৩) মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, কিন্দা গোত্রের ইমরান কায়েস নামক একটি লোকের সঙ্গে হাযরে মাউতের একটি লোকের জমিজমা নিয়ে বিবাদ ছিল। এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে পেশ করা হলে তিনি বলেনঃ 'হাযরামী ব্যক্তি প্রমাণ উপস্থিত করুক।' তার নিকট কোন প্রমাণ ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'কিন্দী ব্যক্তি শপথ গ্রহণ করুক।' তখন হাযরামী লোকটি বলেঃ 'আপনি যখন তার শপথের উপরেই ফায়সালা করলেন তখন

কা'বার প্রভুর শপথ করে আমি বলতে পারি যে, সে আমার জমি নিয়ে নেবে।' তিনি বলেনঃ 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খেয়ে কারও মাল নিজের করে নেবে সে যখন আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে তখন আল্লাহ পাক তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন ইমরাল কায়েস বলেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি কেউ তার দাবী ছেড়ে দেয় তবে সে তার কি প্রতিদান পাবে?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'জান্নাত।' সে বলেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি তাকে সমস্ত ভূমি ছেড়ে দিলাম।' এ হাদীসটি সুনান-ই-নাসাইর মধ্যেও রয়েছে।

(৪) 'যে ব্যক্তি কারও সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, সে যখন আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধাভিত হবেন।' হ্যরত আশ্বাস (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহর শপথ! এটা আমারই সম্মতে। আমারও একজন ইয়াহুদীর মধ্যে ভাগে এক খণ্ড ভূমি ছিল। সে আমার অংশ অঙ্গীকার করে বসে। আমি ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করি। তিনি আমাকে বলেনঃ 'তোমার নিকট কোন প্রমাণ আছে কি?' আমি বলিঃ না। তিনি ইয়াহুদীকে শপথ করতে বলেন। আমি বলিঃ হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি শপথ করে আমার মাল নিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যেও রয়েছে।

(৫) মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মাল অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে সে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ পাক তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন। এমন সময় তথায় হ্যরত আশ্বাস ইবনে কায়েস (রাঃ) আগমন করেন এবং বলেনঃ 'আবু আব্দির রহমান আপনার নিকট কি হাদীস বর্ণনা করেন?' আমি দ্বিতীয় বার বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেনঃ এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার ব্যাপারেই বর্ণনা করেছেন। আমার এবং আমার এক চাচাতো ভাইয়ের মধ্যে একটি কৃপ নিয়ে বিবাদ ছিল। কৃপটি তারই অধিকারে ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে আমরা এ মামলা নিয়ে গেলে তিনি আমাকে বলেনঃ 'তুমি প্রমাণ উপস্থিত কর যে, কৃপটি

তোমারই, নতুবা তার শপথের উপরেই ফায়সালা হবে।' আমি বলিঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার নিকট তো কোন প্রমাণ নেই, আর যদি তার শপথের উপরে নির্ভর করে মীমাংসা করা হয় তবে সে আমার কৃপ নিয়ে নেবে। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তো দুশ্চরিত্ব ব্যক্তি। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করতঃ এ আয়াতটি পাঠ করেন।

(৬) মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের মধ্যে কতক বান্দা এমনও রয়েছে যাদের সঙ্গে তিনি কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে দেখবেন না।' জিজ্ঞেস করা হয়ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তারা কে? তিনি বলেনঃ 'স্বীয় বাপ-মার প্রতি অসন্তোষ ও অনাগ্রহ প্রকাশকারী ছেলে, ছেলের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশকারী ও তার নিকট হতে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনকারী বাপ এবং ঐ ব্যক্তি যার উপর কোন গোত্রের অনুগ্রহ রয়েছে কিন্তু সে তা অঙ্গীকার করে এবং নিজেকে ওটা হতে মুক্ত মনে করতঃ তাদের দিক হতে চক্ষু ফিরিয়ে নেয়। ..

(৭) মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ 'একটি লোক স্বীয় পণ্য দ্রব্য বাজারে রেখে শপথ করে বলে যে, ঐ গুলোর এত এত দর দেয়া হতো।' কিন্তু আসলে তা দেয়া হতো না। উদ্দেশ্যে ছিল যেন মুসলমানেরা তার ফাঁদে পড়ে যায়। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সহীহ বুখারীর মধ্যেও এটা বর্ণিত আছে।

(৮) মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তিনি ব্যক্তির সঙ্গে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে দেখবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না', আর তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। প্রথম ঐ ব্যক্তি যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রয়েছে কিন্তু কোন মুসাফিরকে সে তা প্রদান করে না। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে আসরের পরে মিথ্যা কসম খেয়ে স্বীয় মাল বিক্রি করে। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যে মুসলমান বাদশাহের হাতে বায়আত গ্রহণ করে, অতঃপর যদি বাদশাহ তাকে মাল প্রদান করেন তবে সে বায়আত পুরো করে এবং মাল না দিলে তা পুরো করে না।' এ হাদীসটি সুনান-ই-আবি দাউদ এবং জামেউত্ তিরমিয়ীর মধ্যেও রয়েছে। ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

৭৮। আর তাদের মধ্যে নিচয়ই  
একন্ধ একদল আছে যারা  
কুণ্ঠিত ভাষায় গ্রহ আবৃত্তি  
করে-যেন তোমরা ওটাকে  
গ্রহের অংশ মনে কর, অথচ  
ওটা গ্রহের অংশ নয় এবং  
তারা বলে যে, এটা আল্লাহর  
নিকট হতে সমাগত, অথচ  
ওটা আল্লাহর নিকট হতে নয়  
এবং তারা আল্লাহ সম্বন্ধে  
মিথ্যা বলে ও তারা তা  
অবগত আছে।

৭৮- وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ  
السِّنْتَهُمْ بِالْكِتَبِ لِتَحْسِبُوهُ  
مِنَ الْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ  
الْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ  
اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ  
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

এখানেও ঐ অভিশপ্ত ইয়াহুন্দীদেরই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে  
একটি দল এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার কথাকে স্বীয় স্থান হতে  
সরিয়ে দেয়, তাঁর গ্রহের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করে এবং প্রকৃত অর্থ ও সঠিক  
ভাবার্থ বিকৃত করে দেয়। আর এর মাধ্যমে তারা মূর্খদেরকে এই চক্রে ফেলে  
দেয় যে, এটাই আল্লাহর কিতাব। আবার তারা ওটাকে আল্লাহর কিতাবের নাম  
দিয়ে পাঠ করতঃ তাদের বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করে। তারা জেনে শুনে এভাবে  
আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে। এখানে ভাষাকে বক্র বা কুণ্ঠিত করার অর্থ হচ্ছে  
পরিবর্তন করে দেয়। সহীহ বুখারীর মধ্যে হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে  
বর্ণিত আছে যে, ঐ লোকগুলো পরিবর্তন করে দিতো এবং সরিয়ে দিতো।  
সৃষ্টজীবের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আল্লাহ তা'আলার কিতাবের কোন শব্দ  
পরিবর্তন করতে পারে। তবে হ্যাঁ, ঐ লোকগুলো অর্থ পরিবর্তন করতো এবং  
বাজে ব্যাখ্যা করতো। হ্যরত অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রাঃ) বলেন যে, তাওরাত  
ও ইঞ্জিল ঐ রূপই রয়েছে। যেরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ওগুলো অবতীর্ণ  
করেছেন। ওগুলোর একটি অক্ষরও পরিবর্তিত হয়নি। কিন্তু ঐ লোকেরা অর্থের  
পরিবর্তন, মনগড়া ব্যাখ্যা করে জনগণকে পথভ্রষ্ট করতো। তারা নিজেদের পক্ষ  
হতে সে পুস্তকগুলো লিখতো এবং আল্লাহ তা'আলার কিতাব বলে প্রচার  
করতো, ওগুলো দ্বারাও লোকদেরকে বিপথে চালিত করতো, অথচ ওগুলো  
আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত কিতাবগুলো

রক্ষিতই রয়েছে, ঐগুলো কখনও পরিবর্তিত হয় না। (মুসনাদ-ই-ইবনে হাতিম) হযরত অহাব (রঃ)-এর এ ঘোষণার ভাবার্থ যদি এই হয় যে, তাদের নিকট এখন যে গ্রন্থসমূহ রয়েছে তবে তো আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, ওগুলো পরিবর্তিত হয়েছে এবং ওগুলো হ্রাস বৃদ্ধি হতে মোটেই পবিত্র নয়। অতঃপর আরবী ভাষায় অনুদিত হয়ে যেগুলো আমাদের হাতে রয়েছে ওগুলো তো বড়ই ক্রটিপূর্ণ এবং এগুলোর মধ্যে খুবই বাড়াবাড়ি আছে ও মূল হতে বহু ঘাটতিও রয়েছে। তাছাড়া ঐগুলোর মধ্যে স্পষ্ট সন্দেহ ও প্রকাশ্য ক্রটি বিদ্যমান। বরং প্রকৃত প্রস্তাবে ওকে অনুবাদ বলাই শোভনীয় নয়। ওটাতো তাফসীর, তাও আবার এমন তাফসীর যা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। ওগুলো নির্বাচনের লিখা তাফসীর। আর যদি হযরত অহাব (রঃ)-এর ঘোষণার ভাবার্থ হয় আল্লাহ তা'আলার কিতাব, অর্থাৎ যা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর কিতাব, তবে তা নিঃসন্দেহে রক্ষিত রয়েছে। ওর মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভবই নয়।

৭৯। এটা কোন মানুষের পক্ষে  
উপযোগী নয় যে, আল্লাহ  
যাকে গ্রন্থ, বিজ্ঞান ও  
নবুওয়াত দান করেন, তৎপরে  
সে মানবমণ্ডলীর মধ্যে বলে—  
তোমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ  
করে আমার উপাসক হও;  
বরং প্রভুরই ইবাদত কর—  
কারণ তোমরাই কুরআন শিক্ষা  
দান কর এবং ওটা পাঠ করে  
থাক।

৮০। আর তিনি আদেশ করেন না  
যে, তোমরা ফেরেশতাগণ ও  
নবীগণকে প্রতিপালকরূপে  
গ্রহণ কর; তোমরা আত্ম-  
সমর্পণকারী হ্বার পর তিনি  
কি তোমাদেরকে বিশ্বাসদ্বোধী-  
তার আদেশ করবেন?

— ৭৯ —  
مَا كَانَ لِيَشْرِئْ أَنْ يُؤْتِيَهُ  
اللَّهُ الْكِتَبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ  
ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا  
لِّيٌ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا  
رَبِّيْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلِمُونَ  
الْكِتَبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرِسُونَ ۝

— ৮০ —  
وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَخْذُلُوا  
الْمَلِكَةَ وَالنِّبِيْنَ أَرِبَابًا  
إِيْمَرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ  
مُسْلِمُونَ ۝

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট যখন ইয়াহুদী ও নাজরানের খ্রীষ্টানগণ একত্রিত হয় এবং তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানান তখন আবু রাফি' ফারায়ী বলেঃ 'আপনি চান যে, খ্রীষ্টানেরা যেমন হ্যরত উসা ইবনে মারহিয়াম (আঃ)-এর ইবাদত করে তদ্বপ্র আমরাও আপনার ইবাদত করিঃ?' তখন নাজরানী খ্রীষ্টানদের মধ্যে 'আঙ্সে' নামক এক ব্যক্তিও এ কথাই বলেঃ 'আপনি কি এটাই চান? এই কি আপনার দাওয়াত?' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি এটা হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। না নিজে আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করি, না অন্য কাউকে আল্লাহ ব্যক্তিত অন্য কারও ইবাদত করার শিক্ষা দেই। আমার প্রেরিতত্ত্বের উদ্দেশ্যও এটা নয় এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে এর নির্দেশও দেননি।' তখন এ আয়াতগুলো অবর্তীর্ণ হয় এবং বলা হয়-'কোন মানুষের জন্যে বাঞ্ছনীয় নয় যে, ধর্মীয় গ্রন্থ, নবুওয়াত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভের পর সে মানুষকে স্বীয় ইবাদতের জন্যে আহ্বান করে।' এত বড় বড় নবী যাদেরকে এত বেশী শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান দান করা হয়েছে। তাদেরকেই যখন মানুষের ইবাদত গ্রহণের মর্যাদা দেয়া হয়েন। তখন অন্য লোক কোন মুখে মানুষকে নিজের ইবাদতের জন্যে আহ্বান করতে পারে? ইমাম হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ একজন সাধারণ মুমিন দ্বারাও এটা হতে পারে না যে, সে মানুষকে স্বীয় ইবাদতের দিকে আহ্বান করে। এখানে এটা বলার কারণ এই যে, ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানেরা পরম্পরের মধ্যেই একে অপরের ইবাদত করতো। পবিত্র কুরআনই তার সাক্ষী। ইরশাদ হচ্ছেঃ

اِتَّخِذُو احْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ

অর্থাৎ 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের আলেমদেরকে ও দরবেশদেরকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। (৯: ৩১) মুসনাদ-ই-আহমাদ ও জামেউত্-তিরমিয়ীর এ হাদীসও আসছে যে, হ্যরত আ'দী ইবনে হাতিম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে আরয় করেন যে, তারা তো তাদের পূজো করতো না। তখন তিনি বলেনঃ 'কেন নয়? তারা তাদের উপর হারামকে হালাল করতো এবং হালালকে হারাম করতো এবং ওরা ওদের কথা মেনে চলতো। এটাই ছিল তাদের ইবাদত।' সুতরাং মূর্খ দরবেশ এবং নির্বোধ আলেমরা এ ধরকের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর অনুসারী আলেমগণ এটা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। কেননা, তাঁরা তো শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর কথাই প্রচার করে থাকেন এবং এসব কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখেন যেসব কাজ হতে নবীগণ (আঃ) বিরত রাখতেন। নবীগণতো হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টের মাঝে দৃত স্বরূপ। তাঁরা প্রেরিতত্ত্বের কার্যাবলী পালন

করেন এবং আল্লাহ তা'আলার আমানত অত্যন্ত সর্তকতার সাথে তাঁর বান্দাদের নিকট পৌছিয়ে থাকেন। রাসূলদের সুপথ প্রদর্শন তো হচ্ছে মানুষকে প্রভুর ইবাদতকারী বানিয়ে দেয়। ওর মাধ্যমে তারা জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, মুত্তাকী এবং পুণ্যবান হয়ে যায়।

হযরত যহুহাক (রঃ) বলেন, 'কুরআন কারীম শিক্ষাকারীদের উপর এ দাবী রয়েছে যে, তারা যেন বিবেচক হয়। তা'আলামুনা এবং তুআল্লেমুনা এ দু'টো পঠনই রয়েছে। প্রথমটির অর্থ হচ্ছে অনুধাবন করা এবং দ্বিতীয়টির অর্থ হচ্ছে শিক্ষা দান করা।' <sup>১৯০</sup> শব্দের অর্থ হচ্ছে শব্দসমূহ মুখস্থ করা।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছেঃ সে এই নির্দেশ দেয় না যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কর, সে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূলই হোক বা তাঁর নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাই হোক। এ কথা ঐ ব্যক্তিই বলতে পারে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের দিকে আহবান করে। আর যে ব্যক্তি এ কাজ করে সে কুফরী করে এবং কুফরী করা নবীদের (আঃ) কাজ নয়। তাদের কাজ তো হচ্ছে ঈমান, আর ঈমান হচ্ছে একক আল্লাহর ইবাদত করার নাম। নবীদের কষ্টে এ শব্দই উচ্চারিত হয়। যেমন স্বয়ং কুরআন মাজীদ ঘোষণা করেঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نَوْحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔

অর্থাৎ 'তোমার পূর্বেও আমি যত রাসূল পাঠিয়েছিলাম সবারই উপরেই এ অঙ্গী করেছিলাম যে, আমি ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই, সুতরাং তোমরা আমরাই ইবাদত কর।' (২১: ২৫) অন্য জায়গায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ  
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔

অর্থাৎ 'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত হতে বিরত থাক।' (১৬:৩৬), অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছেঃ 'তোমার পূর্বেকার সমস্ত নবী (আঃ)-কে জিজ্ঞেস কর যে, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মা'বুদ নির্ধারিত করেছি যাদের তারা ইবাদত করবে?' ফেরেশতাদের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেনঃ

وَمَنْ يَقُلُّ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذِلِكَ نَجْزِيهُ جَهَنَّمَ كَذِلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔

অর্থাৎ 'তাদের মধ্যে যে বলে- আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমিই পূজনীয় আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করাবো এবং এভাবেই আমি অত্যাচারীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।' (২১: ২৯)

৮১। এবং আল্লাহ যখন  
নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ  
করেছিলেন যে, আমি  
তোমাদেরকে গ্রহণ ও বিজ্ঞান  
হতে দান করবার পর  
তোমাদের সঙ্গে যা আছে-  
তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী  
একজন রাসূল আগমন করবে,  
তখন তোমারা অবশ্যই তার  
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে  
এবং তার সাহায্যকারী হবে;  
তিনি আরও বলেছিলেন-  
তোমারা কি এতে স্বীকৃত হলে  
এবং প্রতিশ্রূতি গ্রহণ করলে?  
তারা বলেছিল- আমরা  
স্বীকার করলাম, তিনি  
বললেন- তবে তোমরা সাক্ষী  
থাক এবং আমিও তোমাদের  
সাথে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত  
রইলাম।

৮২। অতঃপর এর পরে যারা  
ফিরে যাবে, তারাই  
দুষ্কার্যকারী।

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে- হ্যরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে হ্যরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত নবী (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ তা'আলা এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, কোন সময় যখন তাদের মধ্যে কাউকে আল্লাহ পাক গ্রহণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করবেন এবং তিনি উক্ত মর্যাদার অধিকারী হবেন, তখন যদি তাঁর যুগেই অন্য কোন নবী এসে যান তবে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁকে সাহায্য করা এ নবীর অবশ্য কর্তব্য। এই নয় যে, স্বীয় জ্ঞান ও নবুওয়াতের প্রতি লক্ষ্য করতঃ তিনি তাঁর পরবর্তী নবী (আঃ)-এর অনুসরণ ও সাহায্য হতে বিরত থাকবেন। অতঃপর তিনি নবীদেরকে বলেনঃ ‘তোমরা কি

وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ  
النِّبِيِّنَ لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ  
وَحِكْمَةٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ  
مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لِتَؤْمِنُنَّ  
بِهِ وَلِتُنَصِّرَنَّهُ قَالَ أَفَرَرْتُمْ  
وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي  
قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُو  
وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّهِيدِينَ ○

-৮২- فَمَنْ تَوْلَى بَعْدَ ذَلِكَ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ○

এটা স্বীকার করলে এবং আমার সাথে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করলে?’ তাঁরা তখন বললেনঃ ‘আমরা স্বীকার করলাম।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা বললেনঃ ‘তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও সাক্ষী থাকলাম। অতঃপর যে কেউ এই অঙ্গীকার হতে ফিরে যাবে সে নিশ্চিতরূপে দুষ্কার্যকারী।’

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক নবী (আঃ)-এর নিকট এই অঙ্গীকার নেন যে, যদি তিনি তাঁর যুগে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে প্রেরণ করেন তবে তাঁর অবশ্যকর্তব্য হবে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁকে সাহায্য করা, আর স্বীয় উম্মতকেও উপদেশ দেয়া যে, তারাও যেন তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতঃ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে থাকে। হযরত তাউস (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং হযরত কাতাদাহ (রঃ) বললেনঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা নবীদের (আঃ) নিকট অঙ্গীকার নেন যে, তাঁরা যেন একে অপরের সত্যতা প্রতিপাদন করেন।’ কেউ যেন এটা মনে না করেন যে, এ তাফসীর উপরের তাফসীরের বিপরীত বরং এটা ওরই পৃষ্ঠপোষক। এ জন্যেই হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত বর্ণনার মতই হযরত তাউস (রঃ) হতে তাঁর পূর্বের বর্ণনাও বর্ণিত আছে।

মুসনাদ-ই-আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত উমার ইবনে খান্তাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আমার এক কুরাইয়ী ইয়াহুদী বন্ধুকে বলেছিলাম যে, সে যেন আমাকে তাওরাতের সমন্ত কথা লিখে দেয়। আপনার অনুমতি হলে আমি ঐগুলো পেশ করি।’ একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা মুবারক পরিবর্তিত হয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাবিত (রাঃ) তখন হযরত উমার (রাঃ)-কে বলেনঃ ‘আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখ্যগুলের অবস্থা লক্ষ্য করছেন না?’ তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ ‘আল্লাহকে প্রভুরূপে, মুহাম্মাদ (সঃ)-কে রাসূলরূপে এবং ইসলামকে ধর্মরূপে আমি সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিছি।’ এর ফলে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ক্রোধ বিদূরিত হয় এবং তিনি বলেনঃ ‘যে আল্লাহর অধিকারে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি হযরত মূসা (আঃ) তোমাদের মধ্যে আগমন করেন এবং তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ কর তবে তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সমন্ত উম্মতের মধ্যে আমার অংশের উম্মত তোমরাই এবং সমন্ত নবী (আঃ)-এর মধ্যে তোমাদের অংশের নবী আমি।’

মুসনাদ-ই-আবু ইয়ালার মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘তোমরা কিতাব ধারীদেরকে কিছুই জিজ্ঞেস করো না। তারা নিজেরাই পথভৃষ্ট, সুতরাং তোমাদেরকে কিরণে তারা সুপথ প্রদর্শন করবে? বরং সম্ভবতঃ তোমরা কোন মিথ্যার সত্যতা প্রতিপাদন করবে এবং কোন সত্যকে মিথ্যা বলে দেবে। আল্লাহর শপথ! যদি হ্যরত মুসাও (আঃ) তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকতেন তবে তাঁর জন্যে আমার আনুগত্য ছাড়া অন্য কিছু বৈধ হতো না।’ কোন কোন হাদীসে রয়েছেঃ ‘যদি হ্যরত মুসা (আঃ) ও হ্যরত ঈসা (আঃ) জীবিত থাকতেন তবে তাঁদেরও আমার আনুগত্য ছাড়া কোন উপায় ছিল না।’ সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, আমাদের রাসূল হ্যরত মুহাম্মদ (সঃ) নবীদের (আঃ) সমাঞ্চকারী এবং সবচেয়ে বড় ইমাম। যে কোন যুগে তিনি নবী হয়ে আসলে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা সবারই জন্যে অবশ্য কর্তব্য হতো। আর সেই যুগের সমস্ত নবী (আঃ)-এর আনুগত্যের উপর তাঁর আনুগত্য অগ্রগণ্য হতো। এ কারণেই মিরাজের রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাসে তাঁকেই সমস্ত নবী (আঃ)-এর ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছি। অনুরূপভাবে হাশরের মাঠেও আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র সুপারিশকারী তিনিই হবেন। এটাই ঐ ‘মাকাম-ই-মাহমুদ’ যা তিনি ছাড়া আর কারও জন্যে উপযুক্ত নয়। সমস্ত নবী এবং প্রত্যেক রাসূল সেদিন এ কাজ হতে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। অবশেষে তিনিই বিশেষভাবে এ স্থানে দণ্ডযামান হবেন। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সদা-সর্বদার জন্যে তাঁর উপর দরদ ও সালাম বর্ষণ করুন। আমীন।

৮৩। তবে কি তারা আল্লাহর ধর্ম  
ব্যক্তিত অন্য কিছু কামনা  
করে? অথচ নভোমগুল ও  
ভূমগুলে যা কিছু আছে ইচ্ছা ও  
অনিষ্টাক্রমে সবাই তাঁর  
উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেছে  
এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত  
হবে।

৮৪। তুমি বল- আমরা আল্লাহর  
প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি  
অবর্তীর্ণ হয়েছে এবং যা

-৮৩ -  
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ  
وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ  
يُرْجَعُونَ

-৮৪ -  
قُلْ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ  
عَلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক,  
ইয়াকুব ও তাদের  
বংশধরগণের প্রতি অবর্তীর্ণ  
হয়েছে এবং যা মূসা, ইসা ও  
নবীগণকে তাদের প্রতিপালক  
কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে তৎপ্রতি  
বিশ্বাস স্থাপন করলাম, আমরা  
তাদের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য  
জ্ঞান করি না এবং আমরা  
তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।

৮৫। আর যে কেউ ইসলাম  
ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ  
করে তা কখনই তার নিকট  
হতে পরিগৃহীত হবে না এবং  
পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের  
অন্তর্ভুক্ত হবে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গন্ত ও রাসূলদের মাধ্যমে যে সত্য ধর্ম অবর্তীর্ণ  
করেছেন অর্থাৎ শুধুমাত্র এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহরই ইবাদত করা, এছাড়া যদি  
কোন ব্যক্তি অন্য ধর্ম অনুসন্ধান করে তবে তা কখনই গৃহীত হবে না। একথাই  
এখানে বলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর  
যাবতীয় বস্তু খুশী মনেই হোক বা অসন্তুষ্ট চিন্তেই হোক, তাঁর বাধ্য রয়েছে।  
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

(সেজদার আয়াত) **وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا**

অর্থাৎ 'আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত মখলুক আল্লাহর সামনে খুশী মনে বা বাধ্য  
হয়ে সিজদা করে থাকে।' (১৩: ১৫) অন্য জায়গায় রয়েছে- 'তারা কি দেখে  
না যে, সমস্ত সৃষ্টজীবের ছায়া ডানে ও বামে ঝুঁকে পড়ে আল্লাহকে সিজদা করে  
থাকে এবং আকাশসমূহের সমস্ত জিনিস ও পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী এবং সমস্ত  
ফেরেশতা আল্লাহরই জন্যে সিজদা করে থাকে, কেউ অহংকার করে না এবং  
তারা সবাই স্বীয় প্রভুকে ভয় করে থাকে ও তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তা

**وَاسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  
وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى  
وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رِبِّهِمْ  
لَا نَفِقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ  
لَهُ مُسْلِمُونَ**

**- ৮৫ -  
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ  
دِيْنًا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي  
الآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ**

তারা পালন করে।' সুতরাং মুমিনদের ভেতর ও বাহির দু'টোই আল্লাহ তা'আলার অনুগত ও বাধ্য হয়ে থাকে। আর কাফিরেরাও তাঁর মুষ্টির মধ্যে রয়েছে এবং বাধ্য হয়ে তাঁর সামনে নত হয়ে আছে। সর্বদিক দিয়েই তারা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধীনে রয়েছে। কোন কিছুই তাঁর প্রতাপ ও ক্ষমতার বাইরে নেই। এ আয়াতের তাফসীরে একটি গারীব হাদীসও এসেছে। হাদীসটি এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আকাশবাসী তো হচ্ছেন ফেরেশতাগণ। তাঁরা সন্তুষ্টিচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনে নিয়োজিত রয়েছেন। আর পৃথিবীবাসী ওরাই যারা ইসলামের উপর সৃষ্টি হয়েছে। এরা ও খুশী ঘনে আল্লাহর অনুগত। নিরানন্দ অধীন তারাই যারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুসলমান সৈনিকদের হাতে বন্দী হয় এবং শৃংখলিত অবস্থায় আনীত হয়। এ লোকদেরকেই জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার হয় কিন্তু তারা তা চায় না। একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছেঃ ‘তোমার প্রভু এ লোকদের জন্যে বিশ্ববোধ করেন যাদেরকে শৃংখল ও রশিতে বেঁধে জান্নাতের দিকে টেনে আনা হয়।’ এ হাদীসের আরও সনদ রয়েছে। কিন্তু এ আয়াতের অর্থ ওটাই বেশী দৃঢ় যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মতঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

অর্থাৎ 'যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আকাশসমূহ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে যে আল্লাহ।' (৩৯: ৩৮) হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা এই প্রথম দিন বুবানো হয়েছে যেদিন তাদের সবারই নিকট হতে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল।

‘সবাই তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে’ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সকলকেই আল্লাহ তা'আলা তাদের কার্যের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা বল, আমরা আল্লাহর উপর, কুরআন কারীমের উপর, ইবরাহীম (আঃ), ইসমাইল (আঃ), ইসহাক ও ইয়াকুব (আঃ)-এর উপর যে পুন্তিকাসমূহ ও অহী অবতীর্ণ হয়েছিল ঐগুলোর উপর, আর তাঁদের সন্তানদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি।’

شَبَّاً لَّا شَدِيرَ بَلْ يَسْبَأْ شবّاً لَّا شَدِيرَ بَلْ يَسْبَأْ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে বানী ইসরাইলের গোত্র যারা হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশোদ্ধৃত ছিল। এরা ছিল হযরত ইয়াকুবের বারোটি পুত্রের সন্তান। হযরত মূসা (আঃ)-কে দেয়া হয়েছিল তাওরাত এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে দেয়া হয়েছিল ইঞ্জীল। আরও যত নবী (আঃ) স্বীয় প্রভুর নিকট হতে যা কিছু এনেছেন ঐগুলোর উপরও আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আনয়ন করি না। অর্থাৎ কাউকে মানবো এবং কাউকে মানবো না, এ কাজ আমরা করি না, বরং সকলের উপরেই আমাদের ঈমান রয়েছে, আমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগত। সুতরাং এ উন্নতের মুমিনগণ সমস্ত নবী (আঃ) ও গ্রন্থ মেনে থাকে। তারা কোন নবীকে অঙ্গীকার করে না এবং তারা প্রত্যেক নবীর সত্যতা প্রতিপাদনকারী।

অতঃপর আল্লাহর পাক বলেনঃ ‘আল্লাহর দ্বীন-ই-ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের অনুসন্ধানে যে লেগে থাকে তা কখনও গৃহীত হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতির মধ্যে পতিত হবে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যা আমার নির্দেশের বহির্ভূত, তা প্রত্যাখ্যাত।’ মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘কিয়ামতের দিন কার্যাবলী আগমন করবে। নামায এসে বলবেঃ ‘হে আল্লাহ! আমি নামায।’ আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ ‘তুমি ভাল জিনিস।’ সাদকা এসে বলবে- ‘হে প্রভু! আমি সাদকা।’ উত্তর হবে- ‘তুমি মঙ্গলের উপর রয়েছো।’ রোয়া এসে বলবে- ‘আমি রোয়া।’ আল্লাহ তা'আলা বলবেন- ‘তুমি মঙ্গলের উপর আছ।’ তারপর আরও আমলসমূহ আসবে এবং সবকেই এ উত্তরেই দেয়া হবে। অতঃপর ইসলাম এসে বলবে-‘হে আল্লাহ! আপনি সালাম এবং আমি ইসলাম।’ আল্লাহ তা'আলা বলবেন- ‘তুমি মঙ্গলের উপর রয়েছো। আজ আমি তোমার কারণেই ধরবো এবং তোমার কারণেই পুরস্কৃত করবো।’ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে বলেনঃ

وَمَنْ يَتَعَمَّدْ غَيْرَ إِسْلَامِ دِينِنَا فَلَنْ يَقْبِلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ -

অর্থাৎ ‘যে কেউ ইসলাম ব্যক্তি অন্য ধর্ম অব্যবহণ করে তা কখনই তার নিকট হতে গৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’ এ হাদীসটি শুধুমাত্র মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে এবং বর্ণনাকারী হাসানের হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে এটা শুনা প্রমাণিত নয়।

৮৬। কিরপে আল্লাহ সেই  
সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন  
করবেন যারা বিশ্বাস স্থাপনের  
পর অবিশ্বাসী হয়েছে এবং  
তারা রাসূলের সত্যতা বিষয়ে  
সাক্ষ্য প্রদান করেছিল এবং  
তাদের নিকট থকাশ্য  
নির্দর্শনসমূহ এসেছিল, আর  
আল্লাহ অত্যচারী সম্প্রদায়কে  
পথ-প্রদর্শন করেন না ।

৮৭। ওরাই- যাদের প্রতিফল এই  
যে, নিচয়ই তাদের উপর  
আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতা-  
গণের ও সমস্ত মানবের  
অভিসম্পাত ।

৮৮। তারা তন্মধ্যে সদা অবস্থান  
করবে-তাদের উপর হতে  
শান্তি প্রশংসিত হবে না এবং  
তাদেরকে বিরাম দেয়া যাবে  
না ।

৮৯। কিন্তু যারা এরপর ক্ষমা  
প্রার্থনা করে ও সংশোধিত  
হয়, তবে নিচয়ই আল্লাহ  
ক্ষমাশীল, কর্মণাময় ।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস (রাঃ) বলেন যে, একজন আনসারী ধর্ম  
ত্যাগী হয়ে মুশরিকদের সাথে মিলিত হয় । অতঃপর যে অনুশোচনা করতঃ  
স্বগোত্রীয় লোকের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সঃ) -কে জিজেস করে যে, পুনরায়  
তার তাওবা গৃহীত হবে কি-না? তখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় । তার  
গোত্রের লোক তাকে বলে পাঠায় । তখন সে তাওবা করতঃ নতুনভাবে মুসলমান  
হয়ে হায়ির হয় । (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) ইমাম নাসাঈ (রঃ), ইমাম

৮৬- كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا  
كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهَدُوا  
أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءُهُمْ  
بِالْبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الظَّلَمِينَ ۝

৮৭- أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ  
لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلِكَةِ وَالنَّاسِ  
أَجْمَعِينَ ۝

৮৮- خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخْفَفُ  
عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝

৮৯- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ  
ذَلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

হাকিম (রঃ) এবং ইমাম ইবনে হিরবান (রঃ)-এর গ্রন্থেও এ বর্ণনাটি বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম হাকিম (রঃ) এ ইসনাদকে সহীহ বলেছেন। মুসনাদ-ই-আবদুর রাজ্ঞাকে রয়েছে যে, হ্যরত হারিস ইবনে সাভীদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করতঃ স্বগোত্রের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁর সম্বন্ধে এ আয়াতগুলো অবর্তীণ হয়। তাঁর সম্প্রদায়ের একজন লোক এ আয়াতগুলো তাঁকে পড়ে শোনান। তিনি লোকটিকে বলেনঃ ‘আল্লাহর শপথ! আমার ধারণায় আপনি একজন সত্যবাদী লোক, আর নবী (সঃ) তো আপনার চেয়ে বেশী সত্যবাদী এবং আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত সত্যবাদী অপেক্ষা খুব বেশী সত্যবাদী।’ অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খুব ভালভাবেই ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। <sup>بَنَاتُ</sup> শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতার উপর দলীল প্রমাণাদি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়া। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতা স্বীকার করেছে, দলীল প্রমাণাদি স্বচক্ষে দেখেছে, অতঃপর শিরকের অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে, তারা সুপথ প্রাণ্তির যোগ্য নয়। কেননা, চক্ষু থাকা সত্ত্বেও অন্ধত্বকে তারা পছন্দ করেছে। অবিবেচক লোকদেরকে ‘আল্লাহ তা‘আলা সুপথ প্রদর্শন করেন না। তাদের উপর আল্লাহও অভিশাপ দেন এবং তাঁর সৃষ্টজীবও তাদের প্রতি অভিশাপ দিয়ে থাকে। এ অভিশাপ হচ্ছে চিরস্থায়ী অভিশাপ। কোন সময়ের জন্য তাদের শাস্তি না হালকা করা হবে, না বক্ষ করা হবে। তারপর মহান আল্লাহ স্বীয় করণা ও ক্ষমার কথা বর্ণনা করেছেন যে, এ জগন্য পাপ কার্যের পরেও যদি কেউ আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং সংশোধিত হয়ে যায় তবে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

৯০। নিচয়ই যারা বিশ্বাস  
স্থাপনের পর অবিশ্বাসী  
হয়েছে, তৎপরে অবিশ্বাস  
পরিবর্ধিত করেছে তাদের  
ক্ষমা-প্রার্থনা কখনই  
পরিগৃহীত হবে না এবং  
তারাই পথব্রান্ত।

৯১। নিচয়ই যারা অবিশ্বাস  
করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায়  
মরেছে, ফলতঃ তাদের কারণও

۹۰۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ  
إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَّنْ  
تُقْبَلَ توبَتِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ ۝

۹۱۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوْ  
هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْ

নিকট হতে পৃথিবী পরিপূর্ণ  
স্বর্ণও নেয়া হবে না- যদিও  
সে স্বীয় মুক্তির বিনিময়ে তা  
প্রদান করে; ওদেরই জন্যে  
যজ্ঞণাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং  
ওদের জন্যে কোনই  
সাহায্যকারী নেই।

বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসকারী এবং ঐ অবিশ্বাসের অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ  
কারীদেরকে এখানে আল্লাহ তা'আলা তায় প্রদর্শন করেছেন। বলা হচ্ছে যে,  
মৃত্যুর সময় তাদের তাওবা গৃহীত হবে না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ

অর্থাৎ ‘জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাপ কার্যে লিঙ্গ ব্যক্তি মৃত্যু দেখে তাওবা  
করলে তা আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না।’ (৪: ১৮)

এখানেও ঐ কথাই বলা হয়েছে যে, তাদের তাওবা কখনই গৃহীত হবে না  
এবং এরাই তারা যারা সুপথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে ভ্রান্তপথে চালিত হয়েছে। হ্যরত  
ইবনে আবুস (রাঃ) বলেনঃ ‘কতক লোক মুসলমান হয়ে ধর্মত্যাগী হয়ে যায়।  
অতঃপর আবার ইসলাম গ্রহণ করে এবং পুনরায় ধর্মত্যাগী হয়ে পড়ে। তারপর  
তারা স্বীয় গোত্রের নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করে যে, এখন তাদের তাওবা  
গৃহীত হবে কি-না? তাদের গোত্রের লোক তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস  
করে। ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।’ (মুসনাদ-ই-বায়্যার) এর ইসনাদ খুবই  
উত্তম।

এরপর বলা হচ্ছেঃ ‘কুফরের উপর মৃত্যুবরণ কারীদের তাওবা কখনও গৃহীত  
হবে না, যদিও তারা পৃথিবী পরিমাণ সোনা আল্লাহর পথে খরচ করে।’ নবী  
(সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, ‘আবদুল্লাহ ইবনে জাদান একজন বড় অতিথি  
সেবক ও গোলাম আযাদকারী লোক ছিল। তার এ পুণ্য কোন কাজে আসবে  
কি?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘না, কেননা সে সারা জীবনে একবারও  
রَبِّ اغْفِرْلِيْ অর্থাৎ ‘হে আমার প্রভু! কিয়ামতের দিন আমাকে ক্ষমা করুন  
বলেনি।’ তার দান যেমন গৃহীত হবে না তেমনই তার বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে  
না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعةٌ

أَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ  
أَفْتَدِيهِ أَوْلِيَّكَ لَهُمْ عَذَابٌ  
الْأَيْمَنُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نِصْرٍ  
১৮

অর্থাৎ 'না তাদের বিনিময় গৃহীত হবে, না সুপারিশ কোন উপকার দেবে'। (২: ১২৩) আরেক জায়গায় বলেনঃ ﴿لَا يَبْعَثُ فِيهِ وَلَا خَلَقَ﴾ অর্থাৎ 'সেইদিন না থাকবে ক্রয়-বিক্রয় না থাকবে বস্তুত্ব ও ভালবাসা।' অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছেঃ 'পৃথিবী পরিমাণ জিনিস যদি কাফিরদের নিকট থাকে এবং আরও এ পরিমাণ জিনিস হয়, অতঃপর সে ঐ সমস্তই কিয়ামতের শাস্তির বিনিময়ে মুক্তিপণ্ডুলীপে প্রদান করে তবুও তা গ্রহণ করা হবে না, তাকে সেই কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিভোগ করতে হবে। ঐ বিষয়ই এখানেও বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ <sup>وَلَوْ</sup> <sup>فَتَدْرِي</sup> শব্দের -ও- টিকে অতিরিক্ত বলেছেন। কিন্তু <sup>وَأَوْ</sup>-ও- টিকে সংযোগের <sup>وَأَوْ</sup> স্বীকার করতঃ আমরা যে তাফসীর করেছি ঐ তাফসীর করা খুব উত্তম। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, কাফিরদেরকে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে কোন জিনিসই রক্ষা করতে পারবে না। যদিও সে অত্যন্ত সৎ ও খুবই দানশীল হয়। যদিও সে পৃথিবী পরিমাণ সোনা আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়, কিংবা পাহাড়, পর্বত, মাটি, বালু, মরুভূমি, শক্তভূমি এবং সিক্ত মাটি পরিমাণ সোনা শাস্তির বিনিময়ে খরচ করে দেয় তবুও তা তার কোন উপকারে আসবে না।

'মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'জাহান্নামবাসীকে কিয়ামতের দিন বলা হবে-'পৃথিবীতে যত কিছু রয়েছে সবই যদি তোমার হয়ে যায় তবে কি তুমি এ দিনের ভীষণ শাস্তির বিনিময়ে ঐ সমস্তই মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়ে দেবে?' সে বলবে- হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ 'আমি তোমার নিকট এর তুলনায় অনেক কম চেয়েছিলাম। যখন তুমি তোমার পিতা আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠে ছিলে তখন আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। তুমি আমার সাথে কাউকেও অংশীদার করবে না। কিন্তু তুমি শিরক ছাড়া থাকতে পারনি।' এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যেও অন্য সনদে রয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদের অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, হ্যরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'এক জান্নাতবাসীকে আনা হবে এবং তাকে আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ 'বল, তুমি কিরূপ জায়গা পেয়েছো।' সে উত্তরে বলবেঃ 'হে আল্লাহ! আমি খুব উত্তম জায়গা পেয়েছি।' আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেনঃ 'আচ্ছা, আরও চাইতে হলে চাও এবং মনের কিছু আকাঞ্চ্ছা থাকলে তা প্রকাশ কর।' সে বলবে, 'হে আমার প্রভু! আমার শুধুমাত্র বাসনা এটাই এবং এ একটি মাত্রই যাঞ্চা যে, আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হোক। আমি আপনার পথে জিহাদ করে পুনরায় শহীদ হবো, আবার জীবিত হবো এবং পুনরায় শহীদ হবো। দশবার যেন এ

রকমই হয়।' কেননা, শাহাদাতের প্রকৃত্যাত্তা এবং শহীদের পদ-মর্যাদা সে স্বচক্ষে অবলোকন করেছে। অনুরূপভাবে একজন জাহান্নামবাসীকে আহ্বান করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি তোমার স্থান কিরণে পেয়েছো?' সে বলবেঃ 'হে আল্লাহ! খুবই জঘন্য স্থান।' আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেনঃ 'পৃথিবী পরিমাণ সোনা দিয়ে এ শান্তি হতে মুক্তি পাওয়া তুমি পছন্দ কর কি?' সে বলবেঃ 'হে প্রভু! হ্যাঁ।' সেই সময় মহান প্রতাপাদ্বিত আল্লাহ বলবেনঃ 'তুমি মিথ্যাবাদী। আমি তো তোমার নিকট এর চেয়ে বহু কম ও অত্যন্ত সহজ জিনিস চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি ওটাও করনি।' অতএব, তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হবে। তাই, এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 'তাদের জন্যে বেদনাদায়ক শান্তি রয়েছে এবং এমন কোন জিনিস নেই যা তাদেরকে এ শান্তি হতে রক্ষা করতে পারে বা তাদেরকে কোন প্রকারে সাহায্য করতে পারে।

(তৃতীয় পারা সমাপ্ত)

৯২। তোমরা যা ভাস্তবাস, তা  
হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত  
তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ  
করতে পারবে না; এবং  
তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর,  
আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন।

٩٢- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ  
تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا  
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ

হযরত আমর ইবনে মাইমুন (রাঃ) বলেন যে, এখানে <sup>১</sup>শব্দের অবার্থ হচ্ছে জান্নাত। অর্থাৎ যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস হতে আল্লাহর পথে ব্যয় কর সে পর্যন্ত তোমরা কখনই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত আনসারের মধ্যে হযরত আবু তালহা (রাঃ) ছিলেন সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী। তিনি তাঁর সমস্ত ধন-সম্পত্তির মধ্যে <sup>২</sup>বৈরুহাম নামক বাগানটিকে সর্বাপেক্ষা বেশী পছন্দ করতেন। বাগানটি মসজিদই-ই-নববীর সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রায়ই ঐ বাগানে গমন করতেন এবং ওর কুপের নির্মল পানি পান করতেন। যখন উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন হযরত আবু তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয় করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তা'আলা এরূপ কথা বলেছেন এবং এ <sup>৩</sup>বৈরুহাম নামক

বাগানটিই) হচ্ছে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। এ জন্যে আমি ওটি আল্লাহর পথে সাদকা করছি এ আশায় যে, তার নিকট যে প্রতিদান রয়েছে তাই আমার জন্যে জমা থাকবে। সুতরাং আপনাকে অধিকার দিয়ে দিলাম যেভাবে ভাল মনে করেন ওটা বন্টন করে দিন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুশী হয়ে বলেনঃ ‘বাঃ বাঃ! এটা খুবই উপকারী সম্পদ। এর দ্বারা জনগণের বেশ উপকার সাধিত হবে। আমার মত এই যে, তুমি এ সম্পদ তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দাও।’ হ্যরত আবু তালহা (রাঃ) বলেন, ‘খুব ভাল।’ অতঃপর তিনি ওটা তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেন। (মুসনাদ-ই-আহমাদ, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে যে, একবার হ্যরত উমারও (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাফির হয়ে আরয় করেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার সবচেয়ে প্রিয় ও উত্তম মাল ওটাই যা খাইবারে আমার জমির একটি অংশ রয়েছে। (আমি ওটা আল্লাহর পথে সাদকা করতে চাই) বলুন, কি করিঃ?’ তিনি বলেনঃ ‘মূলকে (জমিকে) তোমার অধিকারে রাখ এবং ওর উৎপাদিত শস্য, ফল ইত্যাদি আল্লাহর পথে ওয়াক্ফ করে দাও।’ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ ‘পাঠের সময় যখন আমি উপরোক্ত আয়াতে পৌছি তখন আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ সম্বন্ধে চিন্তা করি। কিন্তু আমার রূমী দাসীটি অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন জিনিস আমার চোখে পড়লো না। কাজেই আমি ঐ দাসীটিকেই আল্লাহর পথে আয়াদ করে দিলাম। আমার অন্তরে ওর প্রতি এত বেশী ভালবাসা রয়েছে যে, যদি আমি আল্লাহর পথে প্রদত্ত কোন জিনিস ফিরিয়ে নিতে পারতাম তবে আমি অবশ্যই তাকে বিয়ে করে নিতাম।’ (মুসনাদ-ই-বায়ার)

৯৩। তাওরাত অবতারণের পূর্বে  
 ইসরাইল নিজের জন্যে যা  
 অবৈধ করেছিল তদ্যুতীত  
 সর্ববিধ খাদ্য ইসরাইল  
 বংশীয়গণের জন্যে বৈধ ছিল;  
 তুমি বল- যদি তোমরা  
 সত্যবাদী হও তবে তাওরাত  
 আনয়ন কর -তৎপরে ওটা  
 পাঠ কর।

— ৯৩ —  
 كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَّ لِبْنِي  
 إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَمَ إِسْرَائِيلُ  
 عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ  
 التَّوْرِيْةُ قَلْ فَاتَوْا بِالْتَّوْرِيْةِ  
 فَأَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ۝

৯৪। অনন্তর যদি কেউ এর পর  
আল্লাহর প্রতি অসত্যারোপ  
করে তবে তারাই অত্যাচারী।

৯৫। তুমি বল- আল্লাহ সত্য  
বলেছেন; অতএব তোমরা  
ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্মের  
অনুসরণ কর এবং তিনি  
অংশীবাদীগণের অন্তর্গত  
ছিলেন না।

٩٤- فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ  
الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

٩٥- قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا  
مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ  
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) হতে  
বর্ণনা করেন যে, একবার কয়েকজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট  
আগমন করতঃ বলেঃ ‘আমরা আপনাকে এমন কতগুলো কথা জিজ্ঞেস করছি  
যেগুলো নবী ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আপনি ঐগুলোর উত্তর দিন।’ তিনি  
বলেনঃ ‘যা ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস কর, কিন্তু আল্লাহ তা‘আলাকে সম্মুখে বিদ্যমান  
জেনে আমার নিকট ঐ অঙ্গীকার কর যে অঙ্গীকার হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর  
পুত্রদের (বানী ইসরাইল) নিকট নিয়েছিলেন। তা এই যে, আমি যদি ঐ  
কথাগুলো তোমাদেরকে ঠিক ঠিক বলে দেই তবে তোমরা ইসলাম গ্রহণ  
করতঃ আমার অনুগত হয়ে যাবে।’ তারা শপথ করে বললোঃ ‘আমরা একথা  
মেনে নিলাম। যদি আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারেন তবে আমরা ইসলাম  
গ্রহণ করতঃ আপনার অনুগত হয়ে যাবো।’

অতঃপর তারা বললোঃ ‘আমাদেরকে এ চারটি প্রশ্নে উত্তর দিনঃ (১) হ্যরত  
ইসরাইল (হ্যরত ইয়াকুব আঃ) নিজের উপর কোন খাদ্য হারাম করেছিলেন?  
(২) পুরুষের বীর্য ও স্ত্রীলোকের বীর্য কিরূপ হয়, কখনো পুত্র ও কখনো কন্যা  
হয় কেন? (৩) নিরক্ষর নবীর ঘূম কিরূপ হয়? এবং (৪) ফেরেশতাদের মধ্যে  
কোন ফেরেশতা তাঁর নিকট অঙ্গীকৃত আসেন?’ এরপর তিনি দ্বিতীয়বার  
তাদের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি উত্তরে বলেনঃ (১) হ্যরত  
ইসরাইল (আঃ) কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে,  
যদি আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে ঐ রোগ হতে আরোগ্য দান করেন তবে তিনি তাঁর  
সবচেয়ে প্রিয় জিনিস পরিত্যাগ করবেন। তারপরে তিনি আরোগ্য লাভ করলে  
উটের গোশ্চত খাওয়া ও দুধ পান পরিত্যাগ করেন। (২) পুরুষের বীর্যের রং

সাদা ও গাঢ় হয় এবং নারীর বীর্যের রং হলদে ও তরল হয়। এ দু-এর মধ্যে যা উপরে এসে যায় ওর উপরে সন্তান ছেলে বা মেয়ে হয়ে থাকে এবং আকার ও অনুরূপতাও ওর উপর নির্ভর করেই হয়। (৩) এ নিরক্ষর নবীর ঘূমের সময় চক্ষু ঘূমিয়ে থাকে বটে কিন্তু অন্তর জেগে থাকে এবং (৪) আমার নিকট ঐ ফেরেশতাই অঙ্গী নিয়ে আসেন যিনি সমস্ত নবীর নিকট অঙ্গী নিয়ে আসতেন। অর্থাৎ হ্যরত জিবরাইল (আঃ)।' একথা শুনেই তারা চীৎকার করে বলে উঠেঃ 'যদি অন্য কোন ফেরেশতা আপনার বক্স হতেন তবে আপনার নবুওয়াতকে মেনে নিতে আমাদের কোন আপত্তি থাকতো না।' প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে শপথ করাতেন ও প্রশ্ন করতেন এবং তারা স্বীকার করতো যে উত্তর সঠিক হয়েছে। তাদের ব্যাপারেই **كَانَ عَدْوًا لِّجَبْرِيلَ** (২৪: ৯৭)-এ আয়াতটি অবরীণ হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হ্যরত ইসরাইল (আঃ)-এর 'আরাকুন্ন নিসা' রোগ ছিল এবং ঐ বর্ণনায় ইয়াহুদীদের ৫ম প্রশ্ন ছিলঃ 'বজ্র কি জিনিস?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ 'মহাপ্রতাপার্বিত আল্লাহর ফেরেশতাদের মধ্যে একজন ফেরেশতা রয়েছেন যিনি মেঘের উপর নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁর হাতে একটি আগুনের চাবুক রয়েছে যার সাহায্যে তিনি মেঘকে ঐদিকে নিয়ে যান যেদিকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হয় এবং এ গর্জনের শব্দ হচ্ছে ওরই শব্দ।' হ্যরত জিবরাইল (আঃ)-এর নাম শুনে ঐ ইয়াহুদীরা বলেঃ 'তিনি তো হলেন শাস্তি ও যুদ্ধ-বিঘ্নের ফেরেশতা এবং তিনি আমাদের শক্তি। যদি উৎপাদন ও মেঘের ফেরেশতা হ্যরত মীকাইল (আঃ) আপনার বক্স হতেন তবে আমরা মেনে নিতাম।' হ্যরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সন্তানাদিও তাঁর নীতির উপরই ছিলেন এবং তাঁরাও উটের গোশ্ত খেতেন না। পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে এ আয়াতের সম্পর্ক এক তো এ রয়েছে যে, ইসরাইল (আঃ) যেমন তাঁর প্রিয় জিনিস আল্লাহ তা'আলার 'নয়র' করেছিলেন তদ্পত্তি তোমরাও কর। কিন্তু হ্যরত ইয়াকুব (আঃ)-এর শরীয়তে এর নিয়ম এই ছিল যে, তারা স্বীয় পছন্দনীয় জিনিস আল্লাহ পাকের নামে পরিত্যাগ করতেন। কিন্তু আমাদের শরীয়তে ঐ নিয়ম নেই। বরং আমাদেরকে এই বলা হয়েছে যে, আমরা যেন আমাদের প্রিয় জিনিস হতে আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করি। যেমন তিনি বলেছেনঃ

**وَاتَّى الْمَالَ عَلَىٰ حِبْهِ**

অর্থাৎ 'মালের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও সে তা প্রদান করে থাকে।' (২৪: ৭৭) অন্য জায়গায় বলেছেনঃ

**وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حِبْهِ مِسْكِينًا وَبِتِيمًا وَأَسِيرًا -**

অর্থাৎ ‘চাহিদা থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, পিতৃহীন এবং বন্দীকে ভোজন করিয়ে থাকে’। (৭৬: ৮) দ্বিতীয় সম্পর্ক এও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে খ্রীষ্টানদের রীতি-নীতির কথা বর্ণিত ছিল। কাজেই এখানে ইয়াহুদীদের রীতি-নীতির কথা বর্ণিত হচ্ছে যে, তাদের রীতিতে হ্যরত সিসা (আঃ)-এর সঠিক জন্মের ঘটনা বর্ণনা করতঃ তাদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হচ্ছে। এখানে তাদের ধর্ম রহিতকরণের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর তাদের বাজে বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে বিদ্যমান ছিল যে, হ্যরত নূহ (আঃ) যখন নৌকা হতে স্থলভাগে অবতরণ করেন তখন তাঁর জন্য সমস্ত জন্ম হালাল ছিল। অতঃপর হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) উটের গোশ্চত ও দুধ হারাম করে নেন এবং তাঁর সন্তানেরাও ও দু'টো জিনিস হারামই মনে করতে থাকে। অতএব তাওরাতেও ওর অবৈধতা অবর্তীর্ণ হয়। এতদ্ব্যতীত আরও বহু জিনিস হারাম করা হয়। এটা রহিত ছাড়া আর কি হতে পারে? প্রাথমিক যুগে হ্যরত আদম (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে পরস্পর সহোদর ভাই বোনের বিবাহও বৈধ ছিল। কিন্তু পরে তা হারাম করে দেয়া হয়। পরীদের উপর কৃতদাসীর বিয়ে ইবরাহীম (আঃ)-এর শারীয়তে বৈধ ছিল। স্বয়ং হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) সারার (রাঃ) উপর হাজেরাকে বিয়ে করেন। কিন্তু আবার তাওরাতে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একই সাথে দু' ভগ্নীকে বিয়ে করা ইয়াকুব (আঃ)-এর যুগে বৈধ ছিল। স্বয়ং হ্যরত ইয়াকুব (আঃ)-এর ঘরে একই সাথে দু' সহোদরা ভগ্নী পত্নীরূপে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু তাওরাতে এটাও হারাম করা হয়। এটাকেই রহিতকরণ বলে। এগুলো তারা দেখছে এবং স্বীয় গ্রন্থে পাঠ করছে। অথচ রহিতকরণকে অস্বীকার করতঃ ইঞ্জিল ও হ্যরত সিসা (আঃ)-কে অমান্য করছে। অতঃপর তারা শেষ নাবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাথেও এ ব্যবহারই করছে। তাই তাদেরকে বলা হচ্ছে, ‘ইসরাইল (আঃ) নিজের উপর যা হারাম করেছিলেন তাছাড়া তাওরাত অবর্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সমস্ত খাবারই হালাল ছিল। সুতরাং তোমরা তাওরাত আনয়ন করতঃ তা পাঠ কর। তাহলেই দেখতে পাবে যে, এ সব কিছুই ওর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। অতঃপর এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা‘আলার প্রতি তোমাদের এ অপবাদ প্রদান যে, তিনি তোমাদের জন্য শনিবার দিনকে চিরদিনের জন্য সাঙ্গাহিক খুশির দিন করেছেন, তোমাদের নিকট অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তোমরা সদা-সর্বদা তাওরাতের উপরেই আমল করবে এবং অন্য কোন নাবীকে মানবেনা, এটা কত বড় অত্যাচারমূলক কথা! এসব কথা সত্ত্বেও তোমাদের এ

ব্যবহার নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে অত্যাচারী সাব্যস্ত করছে। আল্লাহ তা'আলা সত্য সংবাদ প্রদান করেছেন। হয়রত ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্ম ওটাই যা পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে। তোমরা এ কিতাব ও এ নবী (সঃ)-এর অনুসরণ কর। তাঁর চেয়ে বড় কোন নবীও নেই এবং তাঁর শরীয়ত অপেক্ষা উভয় শরীয়তও আর নেই।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

قُلْ إِنَّمَا هَذِهِنِي رَبِّي إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

অর্থাৎ 'হে নবী (সঃ)! তুমি বল যে, নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমাকে সরল-সঠিক পথ-প্রদর্শন করেছেন।' (৬ঃ ১৬১) অন্য জায়গায় বলেছেনঃ 'আমি তোমার নিকট অঙ্গী করেছি যে, তুমি ইবরাহীমের সুন্দর ধর্মের অনুসরণ কর এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

৯৬। নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম গৃহ, যা  
মানবমণ্ডলীর জন্যে নির্দিষ্ট  
করা হয়েছে, তা ঐ ঘর, যা  
মক্কায় অবস্থিত; ওটা  
সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত  
বিশ্বাসীর জন্যে পথ-প্রদর্শক।

- ৯৬ -  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ  
لِلَّذِي بِبَكَةِ مَبْرَكًا وَهُدًى  
لِلْعَلَمِينَ ۝

৯৭। তার মধ্যে থকাশ্য  
নির্দর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে,  
মাকাম-ই-ইবরাহীম উক্ত  
নির্দর্শনসমূহের অন্যতম আর  
যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে  
শান্তি প্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহর  
উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্ব করা  
সেসব মানুষের কর্তব্য যারা  
তদিকে পথাতিক্রমে সমর্থ  
এবং যদি কেউ অস্বীকার করে  
তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র  
বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশাযুক্ত।

- ৯৭ -  
فِيهِ أَيْتَ بِنَتَ مَقَامٌ  
إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا  
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ  
الْعَلَمِينَ ۝

অর্থাৎ মানবমণ্ডলীর ইবাদত, কুরবানী, তাওয়াফ, নামায, ই'তিকাফ ইত্যাদির জন্য আল্লাহর ঘর, যার নির্মাতা হচ্ছেন হ্যরত ইবরাহীম (আঃ), যে ঘরের আনুগত্যের দাবী ইয়াহুদী, স্বীষ্টান, মুশারিক এবং মুসলমান সবাই করে থাকে ওটা ঐ ঘর যা সর্বপ্রথম মকায় নির্মিত হয়। আল্লাহ তা'আলার বন্ধু এ ইবরাহীম (আঃ)-ই ছিলেন হজ্জের ঘোষণাকারী। কিন্তু বড়ই বিশ্বয় ও দুঃখের কথা এই যে, তারা হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দাবী করে, অথচ এ ঘরের সম্মান করে না, এখানে হজ্জ করতে আসে না, বরং নিজের কিবলা ও কা'বা পৃথক পৃথক করে বেড়ায়। এ বায়তুল্লাহ শরীফের মধ্যেই হিদায়াত নিহিত রয়েছে এবং এটা সারা বিশ্ববাসীর জন্যেই পথ-প্রদর্শক। হ্যরত আবু যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মিত হয়েছে?’ তিনি বলেনঃ ‘মসজিদ-ই-হারাম।’ তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেনঃ ‘তারপরে কোনটি?’ তিনি বলেনঃ ‘মসজিদ-ই-বায়তুল মুকাদ্দাস।’ হ্যরত আবু যার (রাঃ) আবার প্রশ্ন করেনঃ ‘এ দু’টি মসজিদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘চাল্লিশ বছর।’ তারপরে হ্যরত আবু যার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ ‘এরপরে কোন মসজিদ?’ তিনি বলেনঃ ‘যেখানেই নামাযের সময় হয়ে যাবে সেখানেই নামায পড়ে নেবে, সমস্ত ভূমিই মসজিদ।’ (মুসনাদ-ই-আহমাদ এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) হ্যরত আলী (রাঃ) বলেনঃ ‘পূর্বে তো বহু ঘরই ছিল, কিন্তু বিশেষ করে আল্লাহর ইবাদতের ঘর সর্বপ্রথম এটাই।’ কোন লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘পৃথিবী পৃষ্ঠে কি সর্বপ্রথম এ ঘরটিই নির্মিত হয়েছে?’ তিনি উত্তরে বলেনঃ ‘না, তবে কল্যাণময়, মাকাম-ই-ইবরাহীম এবং নিরাপত্তার ঘর সর্বপ্রথম এটাই।’ বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণের পূর্ণ বর্ণনা সূরা-ই-বাকারা (১২৫)-এ আয়াতের তাফসীরে লিখিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। হ্যরত সুন্দী (রঃ) বলেনঃ ‘ভূ-পৃষ্ঠে সর্বপ্রথম এ ঘরটিই নির্মাণ করা হয়।’ কিন্তু হ্যরত আলী (রাঃ)-এর উক্তিটিই সঠিক। আর বায়হাকীর ঐ হাদীসটি, যার মধ্যে রয়েছে যে, হ্যরত আদম (আঃ) ও হ্যরত হাওয়া (আঃ) আল্লাহর নির্দেশক্রমে বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করেন, তাওয়াফ করেন এবং আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘ভূমি সর্বপ্রথম মানুষ এবং এটাই সর্বপ্রথম ঘর।’ এ হাদীসটি ইবনে লাহীআ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। সম্বতঃ এটা হ্যরত

আবদুল্লাহ ইবন উমার (রাঃ)-এর নিজস্ব উক্তি এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি যে কিতাবীদের পুস্তকের দুটি থলে পেয়েছিলেন ঐগুলোর মধ্যে এটাও লিখিত থাকবে। ‘বাক্স’ হচ্ছে মাক্কা শরীফের প্রসিদ্ধ নাম। বড় বড় স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির ক্ষেত্র এখানে ভেঙ্গে যেত এবং প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তির মন্তক এখানে নুয়ে পড়তো বলে একে মাক্কা বলা হয়েছে। একে মাক্কা বলার আর একটি কারণ এই যে, এখানে জনগণের ভীড় জমে থাকে। আরও একটি কারণ এই যে, এখানে মানুষ মিশ্রিত হয়ে পড়ে। এমনকি কখনো কখনো স্ত্রী লোকেরা সম্মুখে সালাত আদায় করতে থাকে এবং পুরুষ লোকেরা তাদের পিছনে হয়ে যায়, যা অন্য কোন জায়গায় হয়না। ইবন আবুস (রাঃ) বলেন : ‘ফাঞ্জ হতে তানঙ্গ পর্যন্ত হচ্ছে মাক্কা এবং বাইতুল্লাহ হতে বাতহা পর্যন্ত হচ্ছে বাক্স। বাযতুল্লাহ এবং মসজিদকে বাক্স বলা হয়েছে। বাযতুল্লাহ এবং ওর আশে-পাশের জায়গাকে বাক্স, আর অবশিষ্ট শহরকে মক্কাও বলা হয়েছে। এর আরও বহু নাম রয়েছে। যেমন বাযতুল আতীক, বাযতুল হারাম, বালাদুল আমীন, বালাদুল মামূন, উম্মে রহাম, উম্মুল কুরা, সিলাহ, আরশ, কাদিস, মুকাদ্দাস, নাসেবাহ, নাগেসাহ, হাতেমাহ, রাস কাউসা, আল বালাদাহ, আল বায়েনাহ এবং আল কাবা।’ এর মধ্যে প্রকাশ্য নির্দেশনাবলী রয়েছে যা এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহামর্যাদার প্রমাণ বহন করে। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ পাকের ঘর এটাই। এখানে মাকাম-ই-ইবরাহীমও (আঃ) রয়েছে যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি হ্যরত ইসমাইল (আঃ)-এর নিকট হতে পাথর নিয়ে নিয়ে কাবাৰ দেয়াল উঁচু করতেন। এটা প্রথমে বাযতুল্লাহ শরীফের দেয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল। কিন্তু হ্যরত উমার (রাঃ) স্বীয় খিলাফতের আমলে এটাকে সামান্য সরিয়ে পূর্বমুখী করে দিয়েছিলেন, যেন তাওয়াফ পূর্ণভাবে হতে পারে এবং তাওয়াফের পরে যারা মাকাম-ই-ইবরাহীমের পিছনে নামায পড়তে চান তাদের যেন কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। ঐ দিকেই নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে এবং এ সম্পর্কীয় পূর্ণ তাফসীরও <sup>১১</sup> (২৪: ১২৫) -এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) বলেন যে, প্রকাশ্য নির্দেশনাবলীর মধ্যে একটি নির্দেশ হচ্ছে মাকাম-ই-ইবরাহীম। অবশিষ্টগুলো হচ্ছে অন্যান্য নির্দেশ। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেছেন, মাকাম-ই-ইবরাহীমের উপর হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর যে পদচিহ্ন রয়েছে ওটাও একটি নির্দেশ। সম্পূর্ণ হারাম শরীফকে,

সূরাঃ আলে ইমরান ৩

ହାତୀମକେ ଏବଂ ହଜ୍ରେର ସମୁଦୟ ଝଙ୍କନକେଓ ମୁଫାସସିରଗଣ ମାକାମ-ଇ-ଇବରାହିମେର ତାଫ୍ସିରେର ଅନ୍ତର୍ଭକ୍ତ କରେଛେ ।

যারা এ ঘরে প্রবেশ করে তারা নিরাপত্তা লাভ করে। অজ্ঞতার যুগেও মক্ষা নিরাপদ জায়গা হিসেবে গণ্য হতো। এখানে পিতৃহস্তাকে পেলেও তারা তাকে হত্যা করতো না। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ ‘বায়তুল্লাহ আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দিয়ে থাকে কিন্তু স্থান ও খানাপানি দেয় না।’ কুরআন কারীমের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

-اَوْلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اُمِنًا-

অর্থাৎ ‘তারা কি দেখে না যে, আমি হারামকে নিরাপত্তার জায়গা করেছি?’  
অন্য স্থানে রয়েছেং (২৯ঃ ৬৭)

وَأَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

অর্থাৎ ‘তিনি তাদেরকে ভয় হতে নিরাপত্তা দান করেছেন’। (১০৬: ৪) শুধু  
যে মানবের জন্যেই নিরাপত্তা রয়েছে তা নয়, বরং তথায় শিকার করা,  
শিকারকে তথা হতে তাড়িয়ে দেয়া, তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা, তাকে তার  
অবস্থান স্থল হতে বা বাসা হতে সরিয়ে দেয়া বা উড়িয়ে দেয়াও নিষিদ্ধ।  
তথাকার বৃক্ষ কেটে ফেলা এবং ঘাস উঠিয়ে ফেলাও বৈধ নয়। এ বিষয়ে আরও  
বহু হাদীস সূরা-ই-বাকারার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে ওর  
পুনরাবৃত্তি নিষ্পত্তি জন্মাই। মুসনাদ-ই-আহমাদ, জামেউত তিরমিয়ী ও সুনানে  
নাসাইর মধ্যে একটি হাদীস রয়েছে যেটাকে ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) হাসান  
সহীহ বলেছেন। তা এই যে, ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কার হারুরা বাজারে দাঁড়িয়ে  
বলেনঃ ‘হে মক্কা! তুমি আগ্নাহ তা‘আলার নিকট সমগ্র ভূমির মধ্যে উত্তম ও  
প্রিয় ভূমি। যদি আমাকে তোমার উপর হতে জোরপূর্বক বের করে দেয়া না  
হতো তবে আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।’ এ আয়াতের একটি  
অর্থ এও আছে যে, সে জাহানাম হতে পরিত্রাণ পেয়ে গেল। বায়হাকীর একটি  
মারফু’ হাদীসে রয়েছেঃ ‘যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করলো সে পুণ্যের  
মধ্যে এসে গেল ও পাপ হতে দূর হলো এবং তার পাপ ক্ষমা করে দেয়া  
হলো।’ কিন্তু এর একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনে নাওমাল, যিনি  
বর্ণনাকারী হিসেবে বলিষ্ঠ নন। আয়াতের শেষাংশ হচ্ছে হজ্ঞ ফরয হওয়ার  
দলীল। কেউ কেউ বলেন যে, <sup>وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالعُمْرَة لِللهِ</sup> এ আয়াতটিই হচ্ছে হজ্ঞ

ফরয হওয়ার দলীল। কিন্তু প্রথম উক্তিটি অধিকতর সঠিক। কয়েকটি হাদীসে এসেছে যে, হজু ইসলামের রূক্ননসমূহের মধ্যে একটি রূক্ন। এটা যে ফরয এর উপর মুসলমানদের ইজমা রয়েছে। আর একথাও সাব্যস্ত যে, সমর্থ ব্যক্তিদের উপর জীবনে একবার হজু করা ফরয। নবী (সঃ) স্বীয় ভাষণে বলেছিলেনঃ ‘হে মানবমগুলী! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হজু ফরয করেছেন, সুতরাং তোমরা হজু করবে।’ একটি লোক জিজ্ঞেস করেন- ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! প্রতি বছরই কি?’ তিনি তখন নীরব হয়ে যান। লোকটি তিনবার ঐ প্রশ্ন করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ ‘আমি যদি ‘হাঁ’ বলতাম তবে প্রতি বছরই হজু ফরয হয়ে যেতো। অতঃপর তোমরা পালন করতে পারতে না। আমি যা বলবো না তোমরা সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা অধিক প্রশ্ন করার ফলে এবং নবীদের (আঃ) উপর মতান্বেক্য সৃষ্টি করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমার নির্দেশ সাধ্যানুসারে পালন কর এবং যে জিনিস হতে আমি নিষেধ করি তা হতে বিরত থাক।’ (মুসনাদ-ই-আহমাদ) সহীহ মুসলিম শরীফের এ হাদীসে এতটুকু বেশী রয়েছে যে, এ প্রশ্নকারী ব্যক্তি ছিলেন হ্যরত আকরা’ ইবনে হাবিস (রাঃ) এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) উভয়ে এ কথাও বলেছিলেন যে, একবার ফরয ও পরে নফল। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘যদি আমি ‘হাঁ’ বলতাম ও প্রতি বছর হজু ফরয হয়ে যেতো তবে তোমরা পালন করতে পারতে না, ফলে শান্তি অবর্তীণ হতো।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, নবী (সঃ) বিদায় হজু স্বীয় সহধর্মীগণকে বলেছিলেনঃ ‘হজু হয়ে গেছে। এখন আর বাড়ী হতে বের হবে না।’ এখন বাকী থাকলো ক্ষমতা ও সামর্থ। ওটা কখনও কারও মাধ্যম ব্যতিরেকেই মানুষের হয়ে থাকে, আবার কখনও কারও মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন আহকামের পুস্তকগুলোর মধ্যে এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম তিরমিয়ী (রঃ)-এর হাদীসে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হাজী কে?’ তিনি বলেনঃ ‘বিক্ষিপ্ত চূল বিশিষ্ট এবং ময়লাযুক্ত কাপড় পরিহিত ব্যক্তি।’ অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন হজু উত্তম?’ তিনি

বলেনঃ ‘যে হজ্জে খুব বেশী কুরবানী করা হয় এবং ‘লাক্বায়েক’ শব্দ অধিক উচ্চারিত হয়।’ আর একটি লোক প্রশ্ন করেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সীপ্পিল! শব্দের ভাবার্থ কি?’ তিনি বলেনঃ ‘পাথেয়, পানাহারের উপযুক্ত খরচ এবং সোয়ারী।’ এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী দুর্বল হলেও এর পিছনে অন্য সনদও রয়েছে। বিভিন্ন সাহাবী হতে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) **مِنْ سَبِّيلِ** -**اسْتَطَاعَ الْيَهُ سَبِّيلًا** এর তাফসীরে পাথেয় এবং সোয়ারীর কথা বলেছেন। মুসনাদ-ই-আহমাদের অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘তোমরা ফরয হজ্জ তাড়াতাড়ি আদায় করে নাও, না জানি কি ঘটে যায়।’ সুনান-ই-আবু দাউদ প্রভৃতির মধ্যে রয়েছেঃ ‘হজ্জ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন শৈত্যই স্বীয় বাসনা পূর্ণ করে।’ হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যার নিকট তিনশ রৌপ্যমুদ্রা রয়েছে সে সক্ষম ব্যক্তি।’ হ্যরত ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, ‘ইসলাম ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য ধর্ম অনুসন্ধান করে তা কখনও গৃহীত হবে না।’ যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন ইয়াহুদীরা বলতে থাকেঃ ‘আমরাও মুসলমান।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাদেরকে বলেনঃ ‘মুসলানদের উপর তো হজ্জ ফরয, তাহলে তোমরাও হজ্জ কর।’ তখন তারা স্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করে বসে। ফলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, হজ্জের অঙ্গীকারকারী কাফির। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশা মুক্ত। হ্যরত আলী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি খাদ্য, পানীয় ও যানবাহনের উপর ক্ষমতা রাখে এ পরিমাণ মাল তার নিকট বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে না, সে ইয়াহুদী বা স্বীষ্টান ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করবে।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘আল্লাহর উদ্দেশ্যে বাযতুল্লাহর হজ্জ করা মানুষের কর্তব্য যারা তদিকে পথ অতিক্রমে সমর্থ, আর যদি কেউ অঙ্গীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশা মুক্ত।’ এ হাদীসের বর্ণনাকারীর উপরও সমালোচনা রয়েছে। হ্যরত উমার ফারক (রাঃ) বলেন, ‘ক্ষমতা থাকতেও যে ব্যক্তি হজ্জ করে না, সে ইয়াহুদী হয়ে বা স্বীষ্টান হয়ে মারা যাবে।’ এর সনদ সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ। (হাফিয আবু বাকর ইসমাইলী) মুসনাদ-ই- সাঁদ ইবনে মানসুরের মধ্যে রয়েছে যে, হ্যরত উমার ফারক (রাঃ) বলেছেনঃ ‘আমার ইচ্ছে রয়েছে যে, আমি বিভিন্ন শহরে লোক পাঠিয়ে দেবো এবং তারা ঐসব লোকের উপর জিয়িয়া কর বসিয়ে দেবে যারা ক্ষমতা থাকতেও হজ্জ করে না। কেননা তারা মুসলমান নয়।’

৯৮। তুমি বল-হে কিতাবধারীরা!

তোমরা কেন আল্লাহর  
নির্দেশনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস  
করছো? এবং তোমরা যা  
করছো আল্লাহ তদ্বিষয়ে  
সাক্ষী।

৯৯। হে গ্রন্থপ্রাণগণ! যে ব্যক্তি  
বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তার  
মধ্যে কুটিলতার কামনায়  
কেন তোমরা তাকে আল্লাহর  
পথে প্রতিরোধ করছো এবং  
তোমরাই সাক্ষী রয়েছো? আর  
তোমরা যা করছো তদ্বিষয়ে  
আল্লাহ অমনোযোগী নন।

٩٨- قُلْ يَا هَلَّ أَكِتَبْ لِمَ  
تَكْفُرُونَ بِاِيَّتِ اللَّهِ وَاللَّهُ  
شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۝

٩٩- قُلْ يَا هَلَّ أَكِتَبْ لِمَ  
تَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ  
أَمْنٍ تَبْغُونَهَا عِوْجًا وَانْتُمْ  
شُهَدَاءٌ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا  
تَعْمَلُونَ ۝

কিতাবীদের ঐ কাফিরদেরকে আল্লাহ ধর্মক দিচ্ছেন যারা সত্যের  
বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অঙ্গীকার করেছিল  
এবং জনগণকেও জোরপূর্বক ইসলাম হতে সরিয়ে রেখেছিল। অর্থচ রাসূলুল্লাহ  
(সঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে তাদের পূর্ণ অবগতি ছিল। পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের  
ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁদের শুভ সংবাদ তাদের নিকট বিদ্যমান ছিল। নিরক্ষর,  
হাশেমী, আরবী, মক্কা ও মদীনাবাসী, বানী আদমের নেতা ও নবীকুল শিরোমণি  
হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বর্ণনা তাদের গ্রন্থসমূহে মওজুদ ছিল। তথাপি তারা  
তাঁকে অবিশ্বাস করে। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেনঃ ‘আমি খুব  
ভাল করেই প্রত্যক্ষ করছি যে, তোমরা কিভাবে আমার নবীদেরকে অঙ্গীকার  
করছো, কি প্রকারে শেষ নবী (সঃ)-কে কষ্ট দিছ এবং কিরূপে আমার খাঁটি  
বান্দাদেরকে তাদের ইসলামের পথে বাধা প্রদান করছো। আমি তোমাদের  
কার্যাবলী সম্বন্ধে অমনোযোগী নই। তোমাদের প্রত্যেক অন্যায় কার্যের আমি  
পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবো। আমি তোমাদেরকে সেদিন ধরবো যেদিন তোমরা  
তোমাদের জন্যে কোন সুপারিশকারী ও সাহায্যকারী পাবে না।’

১০০। হে মুমিনগণ! যাদেরকে  
গ্রহ প্রদত্ত হয়েছে- যদি  
তোমরা তাদের এক দলের  
অনুসরণ কর, তবে তারা  
তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান  
আনয়নের পর কাফির বানিয়ে  
দেবে।

১০১। আর কিরণে তোমরা  
অবিশ্বাস করতে পার- যখন  
আল্লাহর নির্দেশনাবলী  
তোমাদের সামনে পঠিত হয়  
এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর  
রাসূল বিদ্যমান রয়েছে? আর  
যে কেউ আল্লাহকে দৃঢ়রূপে  
ধারণ করে, তবে নিশ্চয়ই  
তাকে সরল পথ-প্রদর্শিত  
হয়েছে।

মহান আল্লাহ স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে আহ্লে কিতাবের ঐ দলটির অনুসরণ  
করতে নিষেধ করছেন যাদের অন্তর কালিমাযুক্ত। কেননা, তারা হিংসুটে ও  
ঈমানের শক্র। আল্লাহ তা'আলা যে আরবে নবী পাঠিয়েছেন এটা তাদের নিকট  
অসহ্য হয়ে উঠেছে এবং তারা হিংসায় জুলে পুড়ে মরছে। যেমন অন্য জায়গায়  
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘আহ্লে কিতাবের অনেকে তোমাদের প্রতি হিংসা  
বশতঃ তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় তোমাদেরকে কাফির বানিয়ে দেয়া  
পছন্দ করে।’ এখানেও আল্লাহ তা'আলা এ কথাই বলেন- ‘হে মুমিনগণ!  
তোমরা যদি আহ্লে কিতাবের একটি দলের অনুসরণ কর তবে অবশ্যই তারা  
তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনয়নের পর পুনরায় কাফির বানিয়ে দেয়ার  
ব্যাপারে চেষ্টার ক্রটি মোটেই করবে না। আমি জানি যে, তোমরা কুফর হতে  
বহু দূরে রয়েছো, তথাপি আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি। তাদের  
প্রতারণায় তো তোমাদের পড়ার কথা নয়। কেননা, তোমরা রাত দিন আল্লাহ

۱۰۰- يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنْ  
تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ  
أُوتُوا الْكِتَبَ يَرْدُو كُمْ بَعْدَ  
إِيمَانِكُمْ كُفِرُّنَّ

۱۰۱- وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ  
تُتَلِّي عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ  
وَفِيهِمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ  
بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ  
مُّسْتَقِيمٍ

(৬)

তা'আলার নিদর্শনাবলী পাঠ করতে রয়েছো এবং স্বয়ং তাঁর রাসূল তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছেঃ 'তোমরা কেন বিশ্বাস স্থাপন করবে না? অথচ রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনয়নের জন্যে আহ্বান করতে রয়েছেন এবং তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকারও করা হয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হও।' হাদীস শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা তাঁর সহচরবৃন্দকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তোমাদের নিকট সবচেয়ে বড় ঈমানদার কে?' তাঁরা বলেনঃ 'ফেরেশতাগণ।' তিনি বলেনঃ 'তাঁরা ঈমান আনবেন না কেন? স্বয়ং তাদের উপর তো অহী অবতীর্ণ হচ্ছে।' সাহাবীগণ (রাঃ) বলেনঃ 'অতঃপর আমরা।' তিনি বলেনঃ 'তোমরা ঈমান আনবে না কেন? স্বয়ং আমি তো তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছি।' তখন তাঁরা বলেনঃ 'দয়া করে আপনিই বলুন।' তিনি বলেনঃ 'সবচেয়ে ঈমানদার তারাই যারা তোমাদের পরে আসবে। তারা গ্রন্থে লিখিত পাবে এবং ওর উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আল্লাহর দ্বীনকে দৃঢ়রূপে ধারণ করে থাকা বান্দাদের কর্তব্য এবং তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা করলেই তারা সরল সঠিক পথগ্রাণ্ড হবে এবং ভাস্ত পথ হতে দূরে থাকবে। এটাই হচ্ছে পুণ্য লাভ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। এর দ্বারাই সঠিক পথ লাভ করা যায় এবং উদ্দেশ্য সফল হয়।'

## ১০২। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ!

তোমরা প্রকৃত ভীতি সহকারে  
আল্লাহকে ভয় কর এবং  
তোমরা মুসলমান হওয়া  
ব্যক্তিত মরো না।

## ১০৩। আর তোমরা একযোগে

আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়রূপে  
ধারণ কর ও বিভক্ত হয়ে  
যেরো না; এবং তোমাদের  
প্রতি আল্লাহর যে দান রয়েছে  
তা স্মরণ কর, যখন তোমরা  
পরম্পর শক্ত ছিলে তখন  
তিনিই তোমাদের অন্তঃকরণে

۱۰۲ - يَا هَمَّا الَّذِينَ أَمْنَوْا  
أَتَقْوَ اللَّهَ حَقَّ تَقْتِيهِ وَلَا  
تُمْتَنِّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  
۱۰۳ - وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ  
جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا وَإِذْ كَرِوْرَا  
نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كَنْتُمْ  
أَعْدَاءً فَالْفَلَّبِينَ قَلْوِبُكُمْ

প্রীতি স্থাপন করেছিলেন, **فَاصْبُحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ أَخْوَانًا**  
 তৎপরে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে **وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنْ**  
 ভাত্তে আবদ্ধ হলে এবং **النَّارِ فَانْقَذَ كُمْ مِّنْهَا كَذِلِكَ**  
 তোমরা অনলকুণ্ডের ধারে **وَرِسْمَ اللَّهِ لَكُمْ أَيْتِهِ لِعْلَكُمْ**  
 ছিলে, অনস্তর তিনিই **تَهْتَدُونَ ○**  
 তোমাদেরকে ওটা হতে উদ্বার  
 করেছেন; এরপে আল্লাহ  
 তোমাদের জন্যে স্বীয়  
 নির্দর্শনাবলী ব্যক্ত করেন—  
 যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও।

আল্লাহ তা'আলাকে পূর্ণরূপে ভয় করার অর্থ এই যে, তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে হবে, অবাধ্য হওয়া যাবে না, তাঁকে সদা স্মরণ করতে হবে, কোন সময়েই তাঁকে ভুলে যাওয়া চলবে না। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, কৃতযু হতে পারবে না। কোন কোন বর্ণনায় এ তাফসীর মারুফ্য' রূপেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর মাত্রকুফ হওয়াই সঠিক কথা। অর্থাৎ এটা হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর উক্তি। হ্যরত আনাস (রাঃ)-এর ঘোষণা এই যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার দাবী পূরণ করতে পারে না যে পর্যন্ত না সে স্বীয় জিহ্বাকে সংযত করে। অধিকাংশ মুফাসিসের মতে এ আয়াতটি **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا إِسْتَطَعْتُمْ** (৬৪: ১৬)-এ আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। এ দ্বিতীয় আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ সাধ্যানুসারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাকবে। হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি রহিত হয়ে যায়নি। বরং ভাবার্থ এই যে, মানুষ যেন আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাঁর কার্যে যেন কোন ভর্তসনাকারীর ভর্তসনার প্রতি ঝঞ্চেপ না করে, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, এমনকি নিজের উপরেও যেন ন্যায়ের নির্দেশ জারী করে। নিজের পিতা-মাতা ও ছেলে-মেয়ের ব্যাপারেও যেন ইনসাফ কার্যেম করে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘তোমরা ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ কর’। অর্থাৎ সারা জীবন ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক, যাতে মৃত্যুও তার উপরেই হয়। এ মহান প্রভুর অভ্যাস এই যে, মানুষ স্বীয় জীবন যেভাবে চালিত করে ঐভাবেই তার মৃত্যু দিয়ে থাকেন। যার উপরে তার মৃত্যু সংঘটিত হবে ওর উপরেই কিয়ামতের দিন তাকে উথিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা এর

বিপরীত হতে আমাদেরকে আশ্রয় দান করুন, আমীন। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, মানুষ বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করছিলেন এবং হ্যরত ইবনে আবাসও (রাঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর হাতে একখানা কাষ্ঠখণ্ড ছিল। তিনি বর্ণনা করছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি পাঠ করতঃ বলেনঃ ‘যদি যাক্কুমের এক বিন্দুমাত্র দুনিয়ায় নিক্ষেপ করা হয় তবে দুনিয়াবাসীদের আহার্য নষ্ট হয়ে যাবে। তারা কোন জিনিস খেতে ও পান করতে পারবে না। তাহলে কল্পনা কর যে, ঐ জাহান্নামীদের অবস্থা কি হতে পারে যাদের আহার্য হবে এ যাক্কুম।’ অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি জাহান্নাম হতে পৃথক থাকতে ও জান্নাতে যেতে চায় তার উচিত যে, যেন সে আমরণ আল্লাহ তা‘আলার উপর এবং পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে ও লোকদের সাথে ঐ ব্যবহার করে যে ব্যবহার সে নিজের জন্য তাদের নিকট কামনা করে।’ (মুসনাদ-ই-আহমাদ) হ্যরত জাবের (রাঃ) বলেনঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে তাঁর মুখে শুনেছি: ‘দেখ, মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করবে।’ (সহীহ মুসলিম) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে, আমি তার ধারণার পার্শ্বেই রয়েছি। যদি আমার প্রতি তার ভাল ধারণা হয় তবে আমি তার মঙ্গল সাধন করবো। আর যদি আমার প্রতি তার মন্দ ধারণা হয় তবে তার নিকট ঐভাবেই হায়ির হবো।’ (মুসনাদ-ই-আহমাদ) এ হাদীসটির পূর্ব অংশ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। মুসনাদ-ই-বায়্যারে রয়েছে যে, এক কুণ্ড আনসারীকে দেখার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর নিকট গমন করেন। সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘অবস্থা কিরূপ?’ তিনি বলেনঃ ‘আলহামদুলিল্লাহ, ভালই আছি। প্রভুর করুণার আশা করছি এবং তাঁর শান্তির ভয় করছি।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ ‘জেনে রেখো, একে অবস্থায় যার অন্তরে ভয় ও আশা উভয়ই থাকে তাকে আল্লাহ তার আশার জিনিস প্রদান করেন এবং ভয়ের জিনিস হতে রক্ষা করেন।’ মুসনাদ-ই-আহমাদের অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, হ্যরত হাকীম ইবনে খারাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করতঃ বলেনঃ ‘আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পতিত হয়ে যাবো।’ ইমাম নাসাই (রঃ) সুনানে নাসাইর মধ্যে একথার ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে একটি অধ্যায় করেছেনঃ ‘সিজদায় কিভাবে যাওয়া উচিত তারই অধ্যায়।’ তথায় বলা হয়েছে যে, সিজদায় ঐভাবে যাওয়া উচিত। আবার

নিম্নের ভাবার্থও বর্ণনা করা হয়েছে- ‘আমি মুসলমান না হয়ে মরবো না।’ এ ছাড়া নিম্নের আর একটি ভাবার্থও বর্ণনা করা হয়েছে- ‘আমি জিহাদে শক্তির দিকে পিঠ করে মৃত্যুবরণ করবো না।’

তারপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে থাক, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ো না। (حَبْلُ اللّٰهِ) শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার অঙ্গীকার। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা পবিত্র কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। একটি মারফু’ হাদীসে রয়েছে যে, কুরআন কারীম আল্লাহ তা‘আলার একটি দৃঢ় রজ্জু এবং তাঁর সরল পথ। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে- ‘আল্লাহর কিতাব তাঁর আকাশ হতে পৃথিবীর দিকে লটকানো রজ্জু বিশেষ।’ আরও একটি মারফু’ হাদীসে রয়েছে- ‘এ কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা‘আলার শক্তি রজ্জু, এটা প্রকাশ্য দীন্তি। এটা সরাসরি আরোগ্য দানকারী এবং উপকারী। এর উপর আমলকারীর জন্যে এটা রক্ষাকবচ, এর অনুসারীদের জন্যে এটা মুক্তির উপায়।’ হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ ‘ঐ সব পথে তো শয়তানেরা চলে, তোমরা আল্লাহ তা‘আলার পথে এসে যাও। তোমরা আল্লাহ পাকের রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। ঐ রজ্জু হচ্ছে পবিত্র কুরআন। তোমরা মতভেদ সৃষ্টি করো না এবং পৃথক পৃথক হয়ে যেয়ো না।’ সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যে তিনটি কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তার একটি এই যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ই'বাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করবে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। তৃতীয় হচ্ছে এই যে, তোমরা মুসলমান বাদশাহদের সহায়তা করবে। আর যে তিনটি কাজ তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ তার একটি হচ্ছে বাজে ও অনর্থক কথা বলা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে অত্যধিক প্রশ়ং করা এবং তৃতীয়টি হচ্ছে সম্পদ ধ্বংস করা।’ বহু হাদীস এমন রয়েছে যেগুলোর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, একতার সময় মানুষ ভুল ও অন্যায় হতে রক্ষা পায়। আবার বহু হাদীসে মতানৈক্য হতে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে কিন্তু এতদসত্ত্বেও উচ্চতের মধ্যে মতভেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে ৭৩টি দল হয়ে গেছে, যাদের মধ্যে একটি দল মুক্তি পেয়ে জান্মাতে প্রবেশ লাভ করবে এবং জাহানামের আগনের শাস্তি হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। এরা ঐসব যারা এমন জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যার উপর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয়

বান্দাদেরকে তাঁর নিয়ামতের কথা শ্বরণ করিয়ে দিয়েছেন। অজ্ঞতার যুগে আউস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বড়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কঠিন শক্রতা ছিল। পরম্পরের মধ্যে যুদ্ধ প্রায় লেগেই থাকতো। অতঃপর যখন গোত্রদ্বয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় তখন মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তারা পূর্বের সব কিছু ভুলে গিয়ে সব এক হয়ে যায়। হিংসা বিদ্বেষ বিদায় নেয় এবং তারা পরম্পর ভাই ভাই হয়ে যায়। তারা পুণ্যের কাজে একে অপরের সহায়ক হয় এবং আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তারা পরম্পর একতা-বন্ধ হয়ে যায়। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে।

**هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرٍ وَبِالْمُؤْمِنِينَ \* وَالْفَلَّبِينَ قُلُوبِهِمْ**

অর্থাৎ ‘তিনিই সেই আল্লাহ যিনি স্বীয় সাহায্য দ্বারা এবং মুমিনদের সাহায্য দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন এবং তিনি তাদের অন্তরে প্রেম-প্রীতি স্থাপন করেছেন।’ (৮: ৬২-৬৩)

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় দ্বিতীয় অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন- ‘হে মুমিনগণ! তোমরা একেবারে জাহানামের অগ্নির ধারে পৌঁছে গিয়েছিলে এবং তোমাদের কুফরী তোমাদেরকে ওর ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিত। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক প্রদান করতঃ তোমাদেরকে ঐ আগুন থেকেও বাঁচিয়ে নিয়েছেন।’

হ্নায়েন যুদ্ধে বিজয় লাভের পর ধর্মীয় মঙ্গলের কথা চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন যুদ্ধক্লিন মাল বন্টন করতে গিয়ে কোন কোন লোককে কিছু বেশী প্রদান করেন তখন কোন একজন লোক কিছু কট্টি করে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আনসার দলকে একত্রিত করতঃ একটি ভাষণ দান করেন। ঐ ভাষণে তিনি একথাও বলেনঃ ‘হে আনসারের দল! তোমরা কি পথভৰ্ষ ছিলে না? অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে সুপথ-প্রদর্শন করেন? তোমরা কি দলে দলে বিভক্ত ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ আমারই কারণে তোমাদের অন্তরে প্রেম-প্রীতি স্থাপন করেন। তোমরা দরিদ্র ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ আমারই মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্পদশালী করেন?’ প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে এ পবিত্র দলটি আল্লাহর শপথ করে সমস্তের বলে উঠেনঃ ‘আদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অনুগ্রহ এর চেয়েও বেশী রয়েছে।’ হ্যরত মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, আউস ও খায়রাজের মধ্যে কয়েক শতাব্দী ধরে শক্রতা ছিল, অথচ তারাও পরম্পর ভাই ভাই হয়ে গেছে দেখে ইয়াহুদীরা চোখে আঁধার দেখতে থাকে। তারা লোক নিযুক্ত করে যে, তারা যেন আউস ও খায়রাজের সভাস্থলে গমন করে এবং তাদেরকে তাদের পুরাতন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শক্রতার কথা শ্বরণ করিয়ে দেয়। তাদের নিহত

ব্যক্তিদের কথা যেন নতুনভাবে তাদেরকে মনে করিয়ে দেয় এবং এভাবে যেন তাদেরকে উত্তেজিত করে তুলে। এ ওষধ একদা তাদের উপর পড়েও যায় এবং উভয় গোত্রের মধ্যে পুরাতন অগ্নি প্রজ্ঞালিত হয়ে উঠে। এমনকি তাদের মধ্যে তরবারী চালনারও উপক্রম হয়ে যায়। সেই অজ্ঞতার যুগের গঙ্গোল ও চীৎকার শুরু হয়ে যায় এবং একে অপরের রক্ত পিপাসু হয়ে পড়ে। স্থির হয় যে, তারা হুররার প্রান্তরে গিয়ে প্রাণ খুলে যুদ্ধ করবে এবং পিপাসার্ত ভূমিকে রক্ত পানে পরিতৃপ্ত করবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ সংবাদ জানতে পেরে তৎক্ষণাতঃ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং উভয় দলকে শান্ত করে দেন। অতঃপর তিনি তাদের উভয় দলকে বলেনঃ ‘পুনরায় তোমরা অজ্ঞতা যুগের ঝগড়া শুরু করে দিলে? আমার বিদ্যমানবস্ত্রায় তোমরা পরম্পরের মধ্যে তরবারী চালনা আরম্ভ করলে?’ তারপরে তিনি তাদেরকে এ আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। এতে সবাই লজ্জিত হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পূর্বের কার্যের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করতে থাকে। আবার তারা পরম্পরে কোলাকুলি করে এবং হাতে হাত মিলিয়ে নেয়। পুনরায় তারা ভাই ভাই হয়ে যায়। হ্যরত ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-কে যখন মুনাফিকরা অপবাদ দিয়েছিল এবং তাকে দোষমুক্ত করে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেছিলেন, তখন মুসলমানেরা একে অপরের বিরুদ্ধে লেগে পড়েছিল, সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল।

১০৪। এবং তোমাদের মধ্যে  
একুপ এক সম্প্রদায় হওয়া  
উচিত-যারা কল্যাণের দিকে  
আহ্বান করে এবং সমিষয়ে  
আদেশ করে ও অসমিষয়ে  
নিষেধ করে, আর তারাই  
সুফল প্রাপ্ত হবে।

১০৫। এবং তাদের সদৃশ্য হয়ে  
না, যাদের নিকট প্রকাশ্য  
থমাণ আসার পর তারা  
বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও বিরোধ  
করেছে এবং তাদের জন্যে  
রয়েছে কঠোর শান্তি।

٤- وَلْ تَكُنْ مِّنْكُمْ أَمَةً يَدْعُونَ  
إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَاونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

٥- وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ  
تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا  
جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

১০৬। সেই দিন কতকগুলো  
মুখমণ্ডল হবে শ্বেতবর্ণ এবং  
কতকগুলো মুখমণ্ডল হবে  
কৃষ্ণবর্ণ; অতঃপর যাদের  
মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হবে!  
(তাদেরকে বলা হবে) তবে  
কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের  
পর অবিশ্বাসী হয়েছ?  
অতএব, তোমরা শান্তির  
আহ্বান গ্রহণ কর, যেহেতু  
তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে।

১০৭। আর যাদের মুখমণ্ডল শুভ  
হবে, তারা আল্লাহর কর্মণার  
অন্তর্ভুক্ত; তারা তন্মধ্যে সদা  
অবস্থান করবে।

১০৮। আল্লাহর এ সকল  
নির্দশন- যা আমি তোমার  
প্রতি সত্যসহ আবৃত্তি করছি  
এবং আল্লাহ বিশ্বজগতের  
প্রতি অত্যাচারের ইচ্ছে করেন  
না।

১০৯। আর যা নতোমণ্ডলের  
মধ্যে আছে ও যা ভূমণ্ডলের  
মধ্যে রয়েছে তা আল্লাহর  
জন্যে; এবং আল্লাহর দিকে  
কৃতকর্মসমূহ প্রত্যাবর্তিত হয়।

১০৬- ۱. يَوْمَ تُبَيَّضُ وُجُوهٌ  
وَتَسْوِدُ وُجُوهٌ فَإِمَامًا الَّذِينَ  
أَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرُهُمْ بَعْدَ  
إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ  
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

১০৭- ۲. وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضُتْ  
وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ  
فِيهَا خَلِدُونَ ۝

১০৮- ۳. تِلْكَ آيَتُ اللَّهِ نَتْلُوها  
عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ  
ظُلْمًا لِلْعَلَمِينَ ۝

১০৯- ۴. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَيَّ اللَّهِ  
تُرْجَعُ الْأَمْوَالُ ۝

হ্যরত যাহ্হাক (রঃ) বলেন যে, ‘এই দল’ হতে ভাবার্থ হচ্ছে বিশিষ্ট সাহাবা ও বিশিষ্ট হাদীসের বর্ণনাকারী। অর্থাৎ মুজাহিদ এবং আলেমগণ। ইমাম আবু যাফর বাকের (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি পাঠ করেন, অতঃপর বলেনঃ ’**خَيْرٌ** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ। এটা অবশ্যই স্বরণ রাখার বিষয় যে, প্রত্যেকের উপরেই স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী সত্ত্বের প্রচার ফরয। কিন্তু তথাপিও একটি বিশেষ দল এ কার্যে লিঙ্গ থাকা প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘তোমাদের মধ্যে যে কেউ কাউকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেখে, সে যেন তাকে হাত দ্বারা বাধা দেয়, যদি এতে তার ক্ষমতা না থাকে তবে যেন জিহ্বা (কথা) দ্বারা বাধা প্রধান করে, যদি এটাও করতে না পারে তবে যেন অন্তর দ্বারা তাকে ঘৃণা করে এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।’ অন্য একটি বর্ণনায় এর পরে এও রয়েছে – ‘ওর পরে সরিষার বীজ পরিমাণও ঈমান নেই।’ (সহীহ মুসলিম) মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা সৎকার্যের আদেশ ও মন্দকার্য হতে নিষেধ করতে থাক, নতুনা সত্ত্বরই আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর স্বীয় শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। অতঃপর তোমরা প্রার্থনা করবে কিন্তু তা গৃহীত তবে না।’ এ বিষয়ের আরও হাদীস রয়েছে সেগুলো ইনশাআল্লাহ অন্য স্থলে বর্ণিত হবে।

অতঃপর বলা হচ্ছে- ‘তোমরা পূর্ববর্তী লোকদের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করো না। ভাল কার্যের আদেশ ও মন্দ কার্য হতে নিষেধ করা তোমরা পরিত্যাগ করো না।’ মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, হ্যরত মু‘আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) হজ্জের উদ্দেশ্যে মকায় আগমন করেন। যোহরের নামাযের পর তিনি দাঁড়িয়ে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন-‘কিতাব প্রাঞ্ছণ তাদের ধর্মের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি করে ৭২টি দল হয়ে গেছে। আর আমার এ উম্মতের ৭৩টি দল হয়ে যাবে। অর্থাৎ সবাই প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে পড়বে। কিন্তু আরও একটি দল রয়েছে এবং আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও হবে যাদের শিরায় শিরায় কুপ্রবৃত্তি এমনভাবে প্রবেশ করবে যেমন কুকুরে কাটা ব্যক্তির শিরায় শিরায় বিষক্রিয়া পৌছে যায়। হে আরববাসী! তোমরাই যদি তোমাদের নবী (সঃ) কর্তৃক আনয়নকৃত বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত না থাক, তবে অন্যান্য লোক তো আরও বহু দূরে সরে পড়বে।’ এ হাদীসটির বহু সনদ রয়েছে। এর পর আল্লাহ পাক বলেন- ‘সেদিন কতকগুলো লোকের

মুখ্যমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ধারণ করবে এবং কতকগুলো লোক কৃষ্ণ চেহারা বিশিষ্টও হবে।' হয়রত ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা 'আতের মুখ্যমণ্ডল শ্বেত বর্ণ ও আলোকোজ্জ্বল হবে এবং আহলে বিদ 'আতের মুখ্যমণ্ডল হবে কৃষ্ণ বর্ণের। হয়রত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এ কৃষ্ণ বর্ণ বিশিষ্ট লোকেরা মুনাফিকের দল। তাদেরকে বলা হবে- তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে অস্বীকার করেছিলে বলে আজকার স্বাদ গ্রহণ কর। আর শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট লোকগণ আল্লাহ তা'আলার করুণার মধ্যে সদা অবস্থান করবে। হয়রত আবু উমায়া (রাঃ) খারেজীদের মসজিদের মস্তকগুলো দামেশকের মসজিদের স্তম্ভে লটকানো দেখে বলেনঃ 'এরা নরকের কুকুর। এদের চেয়ে বেশী জঘন্য নিহত ব্যক্তি ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও নেই। এদেরকে হত্যাকারীগণ উত্তম মুজাহিদ।' অতঃপর <sup>‘’’’’</sup> বিপুল জন বিপুল দিনে এ আয়াতটি পাঠ করেন। আবু গালিব (রঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'আপনি কি এটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ হতে শুনেছেন?' তিনি বলেনঃ 'একবার দু'বার নয় বরং সাতবার শুনেছি। এরূপ না হলে আমি এ শব্দগুলো আমার মুখ দ্বারা বেরই করতাম না।' এখানে ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) হয়রত আবু যার (রাঃ)-এর বর্ণনায় একটি সুন্দীর্ঘ হাদীস নকল করেছেন, যা অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু সনদ হিসেবে এটা গারীব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী (সঃ)! ইহকাল ও পরকালে এ কথাগুলো আমি তোমার নিকট প্রকাশ করে দিছি। আল্লাহ ন্যায় বিচারক, তিনি মোটেই অত্যাচারী নন। প্রত্যেক জিনিসকেই তিনি খুব ভালই জানেন। প্রত্যেক জিনিসের উপর তিনি ক্ষমতাবানও বটে। সুতরাং তিনি যে কারও উপর অত্যাচার করবেন এটা মোটেই সম্ভব নয়। আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিস তাঁরই অধিকারে রয়েছে। সবই তাঁর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। সমুদয় কৃতকর্ম তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। ইহজগতের ও পরজগতের পূর্ণ ক্ষমতবান শাসক একমাত্র তিনিই।'

## ১১০। তোমরাই মানবমণ্ডলীর

জন্যে শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়করণে  
সমৃদ্ধি হয়েছে, তোমরা  
সম্বিষয়ে আদেশ কর ও  
অসম্বিষয়ে নিষেধ কর এবং  
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

১১. - كُنْتُمْ خَيْرًا مِّنْ أَخْرِجْتُ

لِلنَّاسِ تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَنَهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَؤْمِنُونَ

কর; আর যদি এছ প্রাণগণ  
বিশ্বাস স্থাপন করতো তবে  
অবশ্যই তাদের জন্যে মঙ্গল  
হতো; তাদের মধ্যে কেউ  
কেউ তো মুমিন এবং তাদের  
অধিকাংশই দুষ্কার্যকারী।

১১১। দুঃখ প্রদান ব্যতীত তারা  
তোমাদের কোন অনিষ্ট করতে  
পারবে না; আর যদি তারা  
তোমাদের সাথে সংগ্রাম করে,  
তবে তারা তোমাদেরকে পৃষ্ঠ  
প্রদর্শন করবে; অতঃপর  
তাদেরকে সাহায্য করা হবে  
না।

১১২। আল্লাহর নিকট আশ্রয়  
এহণ এবং মনুষ্যগণের নিকট  
আস্তসমর্পণ ব্যতীত তারা  
যেখানেই অবস্থান করুক না  
কেন, লাঞ্ছনায় আক্রান্ত  
হয়েছে- আল্লাহর কোপে  
নিপত্তি হয়েছে এবং দারিদ্র্য  
আক্রান্ত হয়েছে; এটা এ  
কারণে যে, তারা আল্লাহর  
নির্দশনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস  
করছিল এবং নবীগণকে  
অন্যায়ভাবে হত্যা করছিল;  
যেহেতু তারা বিরুদ্ধাচরণ  
করেছিল ও সীমা অতিক্রম  
করেছিল।

بِاللَّهِ وَلَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْكِتَابِ  
لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمْ  
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ

۱۱۱ - لَنْ يَضُرُوكُمْ إِلَّا أَذْيَ  
قَفْ وَإِنْ يَقَاوِلُوكُمْ يَوْلُوكُمْ الْأَدْبَارَ  
وَمَمْ لَا يَنْصُرُونَ

۱۱۲ - ضَرَبَ اللَّهُ أَيْنَ  
مَا ثَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ  
وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا  
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضَرَبَ  
عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
كَانُوا يَكْفُرُونَ بِإِيمَانِ اللَّهِ  
وَيَقْتَلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ  
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا  
يَعْتَدُونَ

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর উত্তর সমস্ত উত্তরের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ ‘তোমরা অন্যান্যদের তুলনায় সর্বোত্তম উত্তর। তোমরা মানুষের ঘাড় ধরে ধরে তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করছো’। অন্যান্য ব্যাখ্যাদাতাগণও এ কথাই বলেন। ভাবার্থ হচ্ছে-‘তোমরা সমস্ত উত্তরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তোমরাই সবচেয়ে বেশী মুসলমানদের উপকার সাধনকারী।’ আবু লাহাবের কন্যা হযরত দুর্রা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিস্ত্রের উপর ছিলেন এমন সময় একজন লোক তাঁকে জিজেস করেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার নিকট কোন্ ব্যক্তি উত্তম?’ তিনি বলেনঃ ‘মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী কুরআন কারীমের পাঠক, সবচেয়ে বেশী ধর্মভীরু, সবচেয়ে বেশী সৎকার্মের আদেশ দানকারী, সর্বাপেক্ষা অধিক মন্দকার্যে বাধাদানকারী এবং সর্বাপেক্ষা বেশী আত্মিয়তার বন্ধন সংযুক্তকারী।’ (মুসনাদ-ই-আহমাদ) হযরত ইবনে আবুআস (রাঃ) বলেন যে, ইনি ঐ সহচরিণী যিনি মুক্ত হতে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। সঠিক কথা এই যে, এ আয়াতের মধ্যে সমস্ত উত্তর জড়িত রয়েছে। তবে অবশ্যই নিম্নের হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘সর্বোত্তম যুগ হচ্ছে আমার যুগ, তারপরে তার নিকটবর্তী যুগ এবং তারপরে তার পরবর্তী যুগ’। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘তোমরা পূর্ববর্তী উত্তরদের সংখ্যা সম্মত পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছো। আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমরা তাদের অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।’ এটি একটি প্রসিদ্ধ হাদীস। ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ উত্তরের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে এ উত্তরের নবী (সঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি সমস্ত মাখলুকের নেতা, সমস্ত রাসূল অপেক্ষা অধিক সম্মানিত। তাঁর শরীয়ত এত পূর্ণ যে, এ রকম শরীয়ত আর কোন নবীর নেই। সুতরাং এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এসব শ্রেষ্ঠত্ব একত্রিকারী উত্তর ও সমস্ত উত্তর হতে শ্রেষ্ঠ হবে। এ শরীয়তের সামান্য আমলও অন্যান্য উত্তরের অধিক আমল অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আমি ঐ নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি যা আমার পূর্বে কাউকেও দেয়া হয়নি।’ জনগণ জিজেস করেনঃ ‘ঐ নিয়ামতগুলো কি?’ তিনি বলেনঃ (১) ‘আমাকে প্রতাব প্রদান দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমাকে পৃথিবীর চাবি প্রদান করা হয়েছে। (৩) আমার নাম আহমাদ (সঃ) রাখা হয়েছে। (৪) আমার জন্যে মাটিকে পৰিত্র করা হয়েছে।

(৫) আমার উচ্চতকে সমস্ত উচ্চত অপেক্ষা বেশী শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে'। মুসনাদ-ই-আহমাদ এ হাদীসটির ইসনাদ উত্তম। হ্যরত আবু দ্বারদা (রাঃ) বলেনঃ আমি আবুল কাসিম (সঃ) হতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা হ্যরত দুসা (আঃ)-কে বলেছিলেন, 'আমি তোমার পরে একটি উচ্চত প্রতিষ্ঠিত করবো যারা শান্তির সময় প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং বিপদে পুণ্য যাঞ্ছা করবে ও ধৈর্য ধারণ করবে, অথচ তাদের সহিষ্ণুতা ও জ্ঞান থাকবে না।' তিনি তখন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ 'সহিষ্ণুতা, দুরদর্শিতা এবং পূর্ণ জ্ঞান ছাড়া এটা কিরূপে সম্ভব?' বিশ্ব প্রভু তখন বলেনঃ 'আমি তাদেরকে সহনশীলতা ও জ্ঞান দান করবো।' আমি এখানে এমন কতগুলো হাদীস বর্ণনা করতে চাই যেগুলোর বর্ণনা এখানে যথোপযুক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমার উচ্চতের মধ্যে সন্তু হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখ্যমণ্ডল চৌক তারিখের চন্দ্রের ন্যায় দীক্ষিময় হবে। তারা হবে সবাই একই সন্তুর বিশিষ্ট। আমি আল্লাহ তা'আলা'র নিকট আবেদন করি- 'হে আমার প্রভু! এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করুন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'প্রত্যেকের সাথে আরও সন্তু হাজার।' হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলতেনঃ 'তাহলে তো এ সংখ্যার মধ্যে গ্রাম ও পল্লীবাসীও চলে আসবে।' (মুসনাদ-ই-আহমাদ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমার প্রভু আমাকে শুভ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আমার উচ্চতের মধ্যে সন্তু হাজার লোককে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' হ্যরত উমার (রাঃ) একথা শুনে বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও কিছু বেশী যাঞ্ছা করলে ভাল হতো।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি আমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানালে তিনি আমাকে সুসংবাদ দেন যে, প্রত্যেক হাজারের সঙ্গে আরও সন্তু হাজার করে হবে।' হ্যরত উমার ফারুক (রাঃ) পুনরায় বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল(সঃ)! আরও বৃদ্ধির জন্যে প্রার্থনা করলে ভাল হতো।' তিনি বলেনঃ 'আবার প্রার্থনা জানালে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সন্তু হাজারের অঙ্গীকার করেন।' হ্যরত উমার (রাঃ) পুনরায় আরয করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও কিছু চাইতেন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি চেয়েছি এবং আরও এত বেশী লাভ করেছি।' অতঃপর তিনি দু' হাত প্রসারিত করে বলেনঃ 'একুপ।' হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন যে, এভাবে যখন আল্লাহ তা'আলা একত্রিত করবেন তখন কত সংখ্যক মানুষ তাতে আসবে তা একমাত্র তিনিই জানেন। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) হ্যরত সাওবান (রাঃ) হিম্সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে কুরত্

ছিলেন তথাকার আমীর। তিনি হ্যরত সাওবান (রাঃ)-কে দেখতে যেতে পারেননি। কিলাঙ্গ গোত্রের একটি লোক তাঁকে দেখতে যান। হ্যরত সাওবান (রাঃ) লোকটিকে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘আপনি লেখা পড়া জানেন কি?’ লোকটি বলেনঃ ‘হ্যাঁ’। তখন হ্যরত সাওবান (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ ‘লিখুন, ‘এ পত্রটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সেবক সাওবানের পক্ষ হতে আমীর আবদুল্লাহ ইবনে কুর্তকে দেয়া হচ্ছে। হাম্দ ও দরুদের পর প্রকাশ থাকে যে, যদি হ্যরত ঈসা (আঃ) অথবা হ্যরত মূসা (আঃ)-এর কোন খাদেম এখানে অবস্থান করতেন এবং রোগাক্রান্ত হতেন তবে আপনি অবশ্যই তাঁকে দেখতে যেতেন।’ অতঃপর তিনি লোকটিকে বলেনঃ ‘এ পত্রটি নিয়ে গিয়ে আমীরের নিকট পৌছিয়ে দেবেন।’ পত্রটি হিম্সের আমীরের নিকট পৌছলে তিনি চিন্তাভিত হয়ে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ হ্যরত সাওবান (রাঃ)-এর নিকট আগমন করেন। দীর্ঘক্ষণ বসে তাঁকে দেখার পর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলে হ্যরত সাওবান (রাঃ) তাঁর চাদর টেনে ধরেন এবং বলেনঃ একটি হাদীস শুনুন! আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরিত্র মুখ হতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ ‘আমার উম্মতের মধ্যে হতে সন্তুষ্ট হাজার লোক বিনা হিসেবে ও বিনা শান্তি ভোগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রত্যেক হাজারের সাথে আরও সন্তুষ্ট হাজার করে হবে’। (মুসনাদ -ই-আহমাদ) এ হাদীসটিও বিশুদ্ধ। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ ‘একদা রাতে দীর্ঘক্ষণ ধরে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে আলাপ আলোচনা করি। অতঃপর প্রত্যুষে তাঁর খিদমতে হাফির হলে তিনি বলেনঃ ‘জেনে রেখো, আজ রাত্রে নবীগণ (আঃ)-এর নিজ নিজ উম্মতসহ আমাকে দেখানো হয়েছে। কোন কোন নবীর সাথে মাত্র তিনজন ছিলেন, কারও কারও সাথে ছিল ক্ষুদ্র একটি দল, কারও কারও সঙ্গে ছিল একটি জামা‘আত এবং কারও কারও সাথে আবার একজনও ছিল না। যখন হ্যরত মূসা (আঃ) আগমন করেন তখন তাঁর সাথে বহু লোক ছিল। এ দলটি আমার নিকট পচন্দনীয় হয়। আমি জিজ্ঞেস করিঃ ‘এটা কে?’ বলা হয়ঃ ‘ইনি আপনার ভাই হ্যরত মূসা (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা হচ্ছে বানী ইসরাইল।’ আমি বলিঃ আমার উম্মত কোথায়? উত্তর হয়ঃ ‘আপনার ডান দিকে লক্ষ্য করুন।’ অতঃপর আমি লক্ষ্য করে দেখি যে, অসংখ্য লোকের সমাগম হয়েছে, মনে হচ্ছে যেন পর্বতও ঢাকা পড়ে যাবে। আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ ‘আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কি?’ আমি বলি- হে আমার প্রভু! আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। অতঃপর আমাকে বলা হয় ‘এদের সাথে আরও সন্তুষ্ট হাজার করে রয়েছে যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে চলে

যাবে।' তখন নবী (সঃ) বলেনঃ 'যদি সম্ভব হয় তবে এ সন্তর হাজারের অন্তর্গত হয়ে যাও। তা যদি সম্ভব না হয় তবে ওদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও যারা পর্বতসমূহ দেকে ফেলেছিল। আর তাও যদি সম্ভব না হয় তবে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও যারা আকাশের প্রান্তে প্রান্তে অবস্থান করছিল।' হ্যরত উক্কাসা ইবনে মুহসিন (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার জন্যে প্রার্থনা করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ সন্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত করেন।' তিনি প্রার্থনা করলে অন্য একজন সাহাবীও (রাঃ) দাঁড়িয়ে এ আরয়ই করেন। তখন তিনি বলেনঃ 'তোমার পূর্বে উক্কাসা (রাঃ) অগ্রাধিকার লাভ করেছে।' তখন আমরা পরম্পর বলাবিল করি যে, সম্ভবতঃ এ সন্তর হাজার ঐলোকেরাই হবে যারা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করতঃ সারা জীবনে কখনও আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করেনি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের এ আলোচনা জানতে পেরে বলেনঃ 'এরা ঐসব লোক যারা ঝাড় ফুঁক করিয়ে নেয় না, আগুন দ্বারা দাগিয়ে নেয় না এবং আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা রাখে।' (মুসনাদ-ই-আহমাদ) অন্য এক সন্দে নিম্নের এটুকু বেশীও রয়েছে- 'যখন আমি আমার সম্মতি প্রকাশ করি তখন আমাকে বলা হয়- 'এখন আপনার বাম দিকে লক্ষ্য করুন। আমি তখন লক্ষ্য করে দেখি যে, অসংখ্য জনসমাবেশ রয়েছে যারা আকাশ প্রান্তকে ঘিরে ফেলেছে।' অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এটা হজ্ঞ মওসুমের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমার উম্মতের এ আধিক্য আমার খুব পছন্দ হয়। তাদের দ্বারা সমস্ত পাহাড় পর্বত ও মাঠ প্রান্তর ভরপুর ছিল।' (মুসনাদ-ই-আহমাদ) অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, হ্যরত উক্কাসা (রাঃ)-এর পরে যে ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি ছিলেন একজন আনসারী। (হাদীস তাবরানী) আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে ৭০ হাজার বা সাত লক্ষ লোক জান্নাতে চলে যাবে। যারা একে অপরের হাত ধরে থাকবে। তারা সবাই এক সাথে জান্নাতে যাবে। চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত তাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও তাবরানী) হ্যরত হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান (রঃ) বলেন, আমি হ্যরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ 'রাত্রে যে তারকাটি ভেঙ্গে পড়েছিল তা তোমরা কেউ দেখেছিলে কি?' আমি বলিঃ হ্যাঁ, জনাব! আমি দেখেছি। আমি তখন নামাযে ছিলাম না। বরং আমাকে বিছুতে কেটে ছিল। তখন হ্যরত সাঈদ (রঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তুমি তখন কি করেছিলে?' আমি বলিঃ ফুঁক দিয়েছিলাম। তিনি বলেনঃ কেন? আমি বলিঃ

হ্যরত শা'বী (রঃ) হ্যরত বুরাইদাহ ইবনে হাসীব (রঃ)-এর বর্ণনা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নয়রবন্দী ও বিষাক্ত জন্মের ব্যাপারে ঝাড়-ফুঁক করিয়ে নিতে হবে।' তিনি বলেনঃ আচ্ছা বেশ! যার নিকট যা পৌছবে তার উপরেই সে আমল করবে। আমাকে তো হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমার উপরে উম্মতদেরকে পেশ করা হয়েছিল। কোন নবীর সাথে ছিল একটি দল। কারও সাথে ছিল একটি, কারও সাথে ছিল দু'টি এবং কারও কারও সাথে একটিও ছিল না। অতঃপর একটি বড় দল আমার দৃষ্টিগোচর হয়। আমি তখন মনে করি যে, এদলটি আমারই উম্মত। পরে আমি জানতে পারি যে, ওটা হ্যরত মূসা (আঃ)-এর উম্মত। আমাকে বলা হয়-'আকাশ প্রান্তের দিকে দৃষ্টিপাত কর।' আমি তখন দেখি যে, তথায় অসংখ্য লোক রয়েছে। আমাকে বলা হয়-'এগুলো আপনারই উম্মত এবং ওদের সাথে আরও ৭০ হাজার রয়েছে যারা বিনা হিসেবে ও বিনা শান্তিভোগে জান্নাতে চলে যাবে।' এ হাদীসটি বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (সঃ), তো বাড়ী চলে যান, অপর সাহাবীগণ পরম্পর বলাবলি করেন যে, সম্বতৎ এরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীই হবেন। কোন একজন বলেন যে, না, এঁরা ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণকারী এবং ইসলামের উপরেই মৃত্যবরণকারী, ইত্যাদি ইত্যাদি। অতঃপর নবী (সঃ) আগমন করেন এবং জিজেস করেনঃ 'তোমরা কি সম্বন্ধে আলোচনা করছো?' আমরা বর্ণনা করি। তিনি বলেনঃ 'না, বরং এরা ঐসব লোক যারা ঝাড়-ফুঁক করে না ও করিয়ে নেয় না, দাগিয়ে নেয় না এবং ভাবী শুভাশুভের লক্ষণের উপর বিশ্বাস করে না, বরং স্বীয় প্রভুর উপর ভরসা করে।' হ্যরত উক্কাসা (রাঃ) দু'আর প্রার্থনা জানালে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর জন্যে প্রার্থনা জানিয়ে বলেনঃ 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।' অতঃপর অন্য এক ব্যক্তিও এ কথাই বললে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ 'উক্কাসা অঘগামী হয়েছে।' এ হাদীসটি সহীহ বুখারীর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তথায় ঝাড় ফুঁক করিয়ে নেয় না এ কথাটি নেই। মুসলিমের মধ্যে এ কথাটিও রয়েছে। অন্য একটি সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, প্রথম দলটি তো মুক্তি পেয়ে যাবে, তাদের মুখমণ্ডল পুর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে, তাদের নিকট হিসাবও গ্রহণ করা হবে না। অতঃপর তাদের পরবর্তীগণ সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল তারকার ন্যায় দীক্ষিময় মুখমণ্ডল বিশিষ্ট হবে। (সহীহ মুসলিম) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমার সঙ্গে আমার প্রভুর অঙ্গীকার রয়েছে যে, আমার উম্মতের মধ্যে সন্তুর হাজার লোক বিনা হিসেবে ও বিনা শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রত্যেক

হাজারের সঙ্গে আরও ৭০ হাজার হবে এবং আমার মহাসশ্বানিত প্রভুর লোপের (অঞ্জলি) তিন লোপ'। (হাফিজ আবু বকর ইবনে আসেমের কিতাবুস সুনান) এর ইসনাদ খুবই উত্তম। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে তাঁর উম্মতের ৭০ হাজারের সংখ্যা শুনে হ্যরত ইয়াযিদ ইবনে আগনাস (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার উম্মতের সংখ্যার তুলনায় তো এ সংখ্যা খুবই কম।’ তখন তিনি বলেনঃ ‘প্রত্যেক হাজারের সঙ্গে আরও এক হাজার করে রয়েছে এবং এর পরে আল্লাহ তা‘আলা তিন লোপ (করপুট) ভরে আরও দান করেন।’ এর ইসনাদও উত্তম। (কিতাবুস সুনান) অন্য একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘আমার মহা মহিমাবিত প্রভু আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্য হতে ৭০ হাজার বিনা হিসেবে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। অতঃপর এক এক হাজারের সুপারিশক্রমে আরও ৭০ হাজার করে মানুষ জান্নাতে চলে যবে। তারপর আমার প্রভু স্বীয় দু’ হাতের তিন লোপ ভরে আরও নিষ্কেপ করবেন।’ এটা শুনে হ্যরত উমার (রাঃ) খুশী হয়ে আল্লাহ আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করেন এবং বলেনঃ ‘তাঁদের সুপারিশ হবে স্বীয় বাপ-দাদা, পুত্র-কন্যা এবং বংশ ও গোত্রের পক্ষে। আল্লাহ করেন আমি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হই যাঁদেরকে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় লোপ ভরে শেষে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।’ (তাবরানী হাদীস) এ সনদের মধ্যেও কোন ক্রিটি নেই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাদীদ নামক স্থানে একটি হাদীস বর্ণনা করেন. যার মধ্যে তিনি এও বর্ণনা করেনঃ ‘এ ৭০ হাজার যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আমার ধারণায় তারা আসতে আসতে তো তোমরা তোমাদের জন্যে, তোমাদের ছেলে মেয়েদের জন্যে এবং তোমাদের স্ত্রীদের জন্যে জান্নাতে স্থান নির্ধারিত করেই ফেলবে।’ (মুসনাদ-ই আহমাদ) এর সনদও মুসলিম (রঃ)-এর শর্তের উপর রয়েছে। অন্য আর একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘আল্লাহ তা‘আলার অঙ্গীকার রয়েছে যে, আমার উম্মতের মধ্যে চার লক্ষ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ হ্যরত আবু বকর (রাঃ) তখন বলেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও কিছু বেশী করুন।’ একথা শুনে হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ ‘হে আবু বকর (রাঃ)! এটাই যথেষ্ট মনে করুন।’ তখন হ্যরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, ‘কেন জনাব? আমরা যদি সবাই জান্নাতে চলে যাই তবে আপনার ক্ষতি কি?’ হ্যরত উমার (রাঃ) তখন বলেনঃ ‘যদি আল্লাহ পাক চান তবে একই হাতে সমস্ত সৃষ্টজীবকে জান্নাতে নিষ্কেপ করবেন।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ ‘উমার (রাঃ) ঠিকই বলেছে।’ (মুসনাদ-ই-আবদুর

রায়খাক) এ হাদীসটি অন্য সনদেও বর্ণনা করা হয়েছে, ওতে সংখ্যা রয়েছে এক লাখ। (ইসবাহানী) আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন সাহাবীগণ ৭০ হাজার ও প্রত্যেকের সঙ্গে আরও ৭০ হাজার এবং আল্লাহ তা'আলার লোপ ভরে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়ার বর্ণনা শুনেন তখন তাঁরা বলতে থাকেনঃ ‘তাহলে এতদ্সত্ত্বেও যে জাহান্নামে যাবে তার মত হতভাগা আর কে আছে?’ (আবু ইয়ালা) উপরের হাদীসটি অন্য একটি সনদেও বর্ণিত আছে, তাতে সংখ্যা রয়েছে তিন লাখ। অতঃপর হ্যরত উমার (রাঃ)-এর উক্তি এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তাঁর উক্তির সত্যতা স্বীকারের বর্ণনা রয়েছে। (তাবরানী হাদীস গ্রন্থ) অন্য একটি বর্ণনায় জান্নাতে প্রবেশকারীদের বর্ণনা করতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ‘আমার উম্মতের সমস্ত মুহাজির তো এ সংখ্যার মধ্যে এসে যাবে এবং অবশিষ্টগুলো হবে পল্লীবাসীদের দ্বারা পূর্ণ’। (মুহাম্মদ ইবনে সাহল) হ্যরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে হিসেব করা হলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় চার কোটি নবাই হাজার। তাবরানীর হাদীসের মধ্যে আরও একটি হাসান হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যাঁর হাতে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে সেই সন্তার শপথ! তোমরা এক অঙ্ককার রাত্রির মত অসংখ্য লোক একই সাথে জান্নাতের দিকে অগ্রসর হবে, জমীন তোমাদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে। সমস্ত ফেরেশতা সশব্দে বলে উঠবেন যে, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সঙ্গে যে দল এসেছে তা সমস্ত নবীর দলসমূহ অপেক্ষা অনেক বেশী।’ হ্যরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি— শুধুমাত্র আমার অনুসারী উম্মত জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হবে।’ সাহাবীগণ খুশী হয়ে উচ্ছেষ্টব্রতে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। পুনরায় তিনি বলেন, ‘আমি তো আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতবাসীর এক তৃতীয়াংশ হয়ে যাবে।’ আমরা পুনরায় তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করি। আবার তিনি বলেন, ‘আমি আশা করছি যে, তোমরা অর্ধেক হয়ে যাবে’। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে বলেন, ‘তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ হবে এতে সন্তুষ্ট নওঃ’ তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ‘তোমরা জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হবে এতে কি তোমরা সন্তুষ্ট নওঃ’ তাঁরা পুনরায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করতঃ তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। তিনি তখন বলেন, ‘আমি তো আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হয়ে যাবে।’ (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) তাবরানীর হাদীসের মধ্যে এ বর্ণনাটি হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)

হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ‘তোমরা কি চাও যে, জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ তোমরা হবে এবং বাকী তিন চতুর্থাংশ অন্যান্য সমস্ত উম্মত হবে।’ সাহাবীগণ বলেন, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সঃ) সবচেয়ে ভাল জানেন।’ তিনি বলেন, ‘আচ্ছা, যদি তোমরা এক তৃতীয়াংশ হও তবে?’ তাঁরা বলেন, ‘এটা খুব বেশী।’ তিনি বলেন, ‘আচ্ছা যদি তোমরা অর্ধেক হও তবে?’ তাঁরা বলেন ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তা হলে তো এটা আরও অনেক বেশী।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেন, ‘জেনে রেখো, সমস্ত জান্নাতবাসীর মোট একশ বিশটি সারি হবে। তন্মধ্যে শুধুমাত্র আমার এ উম্মতেরই হবে আশিটি সারি।’ মুসনাদ-ই-আহমাদেও রয়েছে যে, জান্নাত বাসীদের একশ বিশটি সারি হবে, তন্মধ্যে আশিটি সারি এ উম্মতেরই হবে। এ হাদীসটি তাবরানী, জামেউত তিরিমিয়ী প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে। তাবরানীর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন <sup>عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَلَهُ الْأَوْلَى</sup> অর্থাৎ, ‘একটি বিরাট দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং একটি বিরাট দল হবে পরবর্তীদের মধ্যে হতে।’ (৫৬: ৩৯-৪০)-এ আয়াতটি অবর্তীণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ‘তোমরা জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ, আবার বলেন, ‘এক তৃতীয়াংশ, তার পরে বলেন, বরং অর্ধেক, সর্বশেষে বলেন, ‘দুই তৃতীয়াংশ।’ সহীহ বুখারী শরীফে ও সহীহ মুসলিম শরীফ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষে এসেছি এবং জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবো। তাদেরকে আল্লাহর কিতাব পূর্বে দেয়া হয়েছে, আর আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে পরে। যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছে সে বিষয়ে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক পছ্ন্য অবলম্বনের তাওফীক প্রদান করেছেন। জুম‘আর দিনও একুপই যে, ইয়াহুন্দীরা আমাদের পিছনে রয়েছে, অর্থাৎ শনিবার এবং শ্রীষ্টানেরা তাদেরও পিছনে রয়েছে অর্থাৎ রবিবার।’ দারেকুতনীর মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ‘আমি যে পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ না করবো সে পর্যন্ত অন্যান্য নবীদের জন্যে জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর যে পর্যন্ত আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করবে সে পর্যন্ত অন্যান্য উম্মতের জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ।’ এগুলোই ছিল ঐ সব হাদীস যেগুলোকে আমরা এখানে বর্ণনা করতে চেয়েছিলাম। উম্মতের উচিত যে, এখানে এ আয়াতের মধ্যে যতগুলো বিশেষণ রয়েছে সেগুলোর উপর যেন দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ দান, মন্দ কাজ হতে বাধা প্রদান এবং আল্লাহ তা‘আলার উপর ঈমান আনয়ন। হ্যবরত উমার ইবনে খাভাব (রাঃ) স্বীয় হজ্জে এ আয়াতটি পাঠ করতঃ বলেনঃ ‘যদি তোমরা এ

আয়াতের প্রশংসার মধ্যে আসতে চাও তবে এ সমুদয় গুণও নিজেদের ভেতর সৃষ্টি কর।' ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন, 'গ্রন্থ প্রাপ্তগণ ঐ সব কাজ পরিত্যাগ করেছিল বলেই আল্লাহ পাক স্বীয় কালামে তাদেরকে নিন্দে করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَعَلُوْهُ

অর্থাৎ ‘তারা মানুষকে অন্যায় কর্ম হতে বিরত রাখতো না।’ (৫:৭৯) যেহেতু উপরোক্ত আয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের প্রশংসা ও গুণবলী বর্ণনা করা হয়েছে, তাই পরে গ্রন্থধারীদের নিন্দে করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—‘এ লোকগুলোও যদি আমার শেষ নবী (সঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতো তবে তারাও এ মর্যাদা লাভ করতো। কিন্তু তাদের অধিকাংশ অবিশ্বাস, দুঃখার্থ ও অবাধ্যতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। তবে তাদের মধ্যে কতক লোক ঈমানদারও রয়েছে।’

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে শুভ সংবাদ দিচ্ছেন—‘তোমরা হতবুদ্ধি ও চিন্তিত হয়ে পড়ো না, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর জয়যুক্ত করবেন।’ যেমন আল্লাহ তা'আলা খায়বারের যুদ্ধে তাদেরকে পর্যুদ্ধ করেন এবং এর পূর্বে বানু কাইনুকা, বানু নাফীর এবং বানু কুরাইযাকেও লাঙ্ঘিত ও পরাভূত করেছিলেন। অনুরূপভাবে সিরিয়ার খ্রীষ্টানগণ সাহাবীদের আমলে পরাজিত হয়েছিল এবং সিরিয়া সম্পূর্ণরূপে তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায় ও চিরদিনের জন্যে মুসলমানদের অধিকারে এসে পড়ে। তথায় এক সত্যপন্থী দল হয়রত ইস্রাইল (আঃ)-এর আগমন পর্যন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। হয়রত ইস্রাইল (আঃ) এসে ইসলাম ধর্ম এবং হয়রত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর শরীয়ত অনুযায়ী নির্দেশ দান করবেন এবং ক্রুশ ছিন্ন করবেন, শূকরকে হত্যা করবেন, জিয়িয়া কর গ্রহণ করবেন না এবং শুধুমাত্র ইসলামই গ্রহণ করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—‘তাদের প্রতি লাঙ্ঘনা ও হীনতা নিষ্কিঞ্চ হয়েছে। কোন জায়গাতেই তাদের নিরাপত্তা ও সম্মান নেই, তবে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় দানের দ্বারা নিরাপত্তা পেতে পারে।’ অর্থাৎ যদি তারা জিয়িয়া প্রদান করে ও মুসলমান বাদশাহদের আনুগত্য স্বীকার করে তবে এক নিরাপত্তা পেতে পারে। কিংবা মুসলমানদের আশ্রয়দানের দ্বারা তারা নিরাপত্তা লাভ করতে পারে, অর্থাৎ যদি মুসলমানদের সাথে চুক্তি হয়ে যায় বা কোন মুসলমান যদি তাদেরকে আশ্রয় দান করে তবেও তারা নিরাপত্তা লাভ

সূরাঃ আলে ইমরান ৩

করতে পারে। যদি সে নিরাপত্তা কোন স্ত্রী লোক বা কোন ক্রীতদাসও দান করে। তবুও তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। আলেমদের একটি উক্তি এও রয়েছে। হ্যারত ইবনে আবুস (রাঃ)-এর মতে حبلُ شدَّهُর অর্থ হচ্ছে অঙ্গীকার। তারা আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে পতিত হয়েছে এবং দারিদ্র্য আক্রান্ত হয়েছে। এটাও তাদের কুফ্র, নবীদেরকে হত্যা, অহংকার, হিংসা এবং অবাধ্যতারই প্রতিফল। এ কারণেই তাদের উপর চিরদিনের জন্যে লাঞ্ছনা, হীনতা এবং দৈন্য নিষ্কেপ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে তাদের অবাধ্যতা এবং সত্যের সীমা অতিক্রমেরই প্রতিদান। আবু দাউদ এবং তায়ালেসীর মধ্যে রয়েছে যে, বানী ইসরাইল এক এক দিনে তিনশ জন করে নবী হত্যা করতো এবং দিনের শেষভাগে বাজারে নিজ নিজ কাজে লেগে যেতো।

### ୧୧୩ । ତାରା ସକଳେ ସମାନ ନୟ;

আহলে কিতাবের মধ্যে এক  
সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় রয়েছে  
যারা রজনী যোগে আল্লাহর  
আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং  
সিজদা করে থাকে।

୧୧୪ । ତାରା ଆଶ୍ରାମ ଓ ପରକାଳ  
ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ସଦିଷ୍ୱୟେ  
ଆଦେଶ ଓ ଅସଦିଷ୍ୱୟେ ନିଷେଧ  
କରେ ଏବଂ ସ୍ଵକାର୍ଯ୍ୟସମୁହେ  
ତ୍ର୍ୟଗର ଥାକେ, ଆର ତାରାଇ  
ସ୍ଵକର୍ମଶୀଳଗଣେର ଅନ୍ତର୍ଭକ୍ତ ।

୧୧୫ । ଆର ତାରା ଯେ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ  
କରିବେ, ଫଳତଃ ତା କଥନ ଓ  
ବ୍ୟର୍ଥ ହବେ ନା; ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ  
ଧର୍ମଭୀକୁଗଣକେ ପରିଜ୍ଞାତ  
ଆଛେ ।

١١٣- لَيْسُوا سَوَاءٌ مِّنْ أَهْلٍ

الكتاب أمة قائمة يتلون آيات

الله انا نا الليل وهم يسجدون

١١٤- يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ

الآخر ويامرون بالمعروف

**وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ**

مساء عدنف الخاتم

وَأَولِيكَ مِنَ الْمُلْحَنِ

١١٥ - وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ

كُفْرُهُ وَاللَّهُ عَلِيهِ بِالْمُتَقْبِنِ

۱۱۶۔ نیکھلے یا را اوریشاس کر رہے تا دے ر�ن را شی آٹھا ہر نیکٹ کی چو ماتھ فل پرد ہوئے نا اور تا را ہی اپنیں اوریشاسی، تناخے تا را چر کال اور ہن ان کر رہے ।

۱۱۷۔ تا را پاریش جیونے یا بھی کر رہے تا ر دھن اسٹھنے پور ڈھنگا بھیوں اور نکل پا یا را سبیل جیونے کے لئے اوریا چار کر رہے ۔ وٹا سے سکل سمسندا یوں کے شسی کھتے نی پتیت ہوئے اور تا بھنست کر رہے । اور آٹھا ہر تا دے ر�نی اوریا چار کر رہے نی بھر ۱۱۷ تا را ہی سبیل جیونے کے لئے اوریا چار کر رہے ।

ہر رات ایونے آکھا س (راہ) بولنے ہے، آہلے کیتاو اور معاشر (س)۔ اور ان ساری گن سماں نہیں । مسناند۔ اے۔ آہمادے رہے ہوئے ہے، راسوں ڈھنگا ہر (س)۔ اک دا ایسا ر نامائے آساتے بیلہ کر رہے । اور پر یا خن آگھن کر رہے نی تاہ بھی گن اپنے کھنے چلے । تینی تا دے رکے بولنے ہے ‘تومرا بھتیت انی کون دھرمی لے کے ایک ایک آٹھا تا ایلا ر یکی کر رہے نا ।’ تاہ بھیت آیا تھلے اورتی ہے । کی ڈھنگ اوریکا گن بھایا تا ر ماتے اور آیا تھلے آہلے کیتاوے ر آلمگنے ر بھایا ر اورتی ہے، یہ مان ہر رات آب دھنگا ہر ایونے سالام (راہ)، ہر رات آساد ایونے عواید (راہ)، ہر رات سا د ایونے شو بھا (راہ) پر بھتی ہے । اس بھلے کیتاوے ر آہلے کیتاوے ر اس بھلے کیتاوے ر نہ پورے یادے ر جانی کا جو ر نہیں کر رہے اور اس بھلے کیتاوے ر

۱۱۶- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ  
تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا  
أُولَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا  
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَلِدُونَ ۝

۱۱۷- مَثُلُّ مَا يُنِفِقُونَ فِي هَذِهِ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثُلِ رِيحٍ  
فِيهَا صَرَاصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ  
ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاهْلَكْتَهُ وَمَا  
ظَلَمُهُمُ اللَّهُ وَلِكُنَّ أَنفُسَهُمْ  
يَظْلِمُونَ ۝

লোকদের স্বক্ষেই আল্লাহ তা'আলা বলেন- 'তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর শরীয়তের তারা অনুসারী, তাদের মধ্যে ধৈর্য ও ঈমানের দৃঢ়তা রয়েছে। এ নির্মল নিষ্কলুষ লোকগুলো রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযেও আল্লাহ পাকের কালাম পাঠ করে থাকে এবং জনগণকেও তারা এসব কাজেই নির্দেশ দেয় এবং এরা বিপরীত কার্য হতে বিরত রাখে। ভাল কাজে তারা সদা অগ্রগামী থাকে।' এখন আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বক্ষে বলেন যে, তারা ভাল লোক। এ সূরার শেষেও বলেনঃ 'আহলে কিতাবের মধ্যে নিচ্ছয়ই এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর উপর, তোমাদের উপর অবতারিত গ্রন্থের উপর এবং তাদের উপর অবতারিত গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহকে ভয় করে থাকে।' এখানেও বলা হচ্ছে যে, তাদের সৎকার্যাবলী বিনষ্ট হবে না এবং তাদেরকে তাদের সমুদয় কার্যের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। সমস্ত আল্লাহ-ভীকু মানুষ আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতেই রয়েছে। তিনি কারও সৎকার্য বিনষ্ট করেন না। তবে ধর্মদ্রোহী লোকদের জন্যে তাদের ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন উপকারে আসবে না। তারা জাহানামের অধিবাসী। <sup>ص</sup> শব্দের অর্থ হচ্ছে ভীষণ ঠাণ্ডা যা শস্যসমূহ ধ্বংস করে থাকে। মোটকথা যেমন শস্য ক্ষেত্রে বরফ জমে যাওয়ার ফলে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়, এ কাফিরদের অবস্থাও ঠিক অনুপ। এরা যা কিছু খরচ করে তার পুণ্য লাভ তো দূরের কথা, বরং তাদের আরও শাস্তি হবে। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের প্রতি অত্যাচার নয়, বরং এটা তাদের মন্দ কার্যাবলীরই শাস্তি।

## ১১৮। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ!

তোমরা নিজেদের ব্যতীরেকে  
অন্য কাউকে মিত্ররূপে গ্রহণ  
করো না- তারা তোমাদেরকে  
ক্ষতিগ্রস্ত করতে সংকুচিত হবে  
না এবং তোমরা যাতে বিপন্ন  
হও, তারা তাই কামনা করে;  
বস্তুতঃ তাদের মুখ হতেই  
শক্রতা প্রকাশিত হয় এবং  
তাদের অন্তর যা গোপন করে

۱۱۸- يَا يُهَّـا أَلَّـيْـنِ أَمْنُـوـا لـا  
تَـخـذـلـوـا بـطـانـةـ مـنـ دـوـنـكـمـ  
لـاـ يـالـونـكـمـ خـبـالـاـ وـدـواـ مـاـ  
عـنـتـمـ قـدـ بـدـتـ الـبـفـضـاءـ مـنـ  
أـفـوـاهـهـمـ وـمـاـ تـحـفـيـ صـدـورـهـمـ

তা শুরুতর; নিচয়ই আমি  
তোমাদের জন্যে নির্দেশনাবলী  
ব্যক্ত করছি- যেন তোমরা  
বুঝতে পার।

১১৯। সাবধান হও- তোমরাই  
তাদেরকে ভালবাস, অথচ  
তারা তোমাদেরকে ভালবাসে  
না এবং তোমরা সমস্ত গ্রন্থই  
বিশ্বাস কর; আর তারা যখন  
তোমাদের সাথে মিলিত হয়  
তখন বলে- আমরা বিশ্বাস  
স্থাপন করেছি এবং যখন  
তোমাদের হতে পৃথক হয়ে  
যায় তখন তোমাদের প্রতি  
আক্রোশে অঙ্গুলিসমূহ দংশন  
করে; তুমি বল- তোমরা  
নিজেদের আক্রোশে মরে  
যাও! নিচয়ই আল্লাহ  
অন্তরের কথা পরিজ্ঞাত  
আছেন।

১২০। যদি তোমাদেরকে কল্যাণ  
স্পর্শ করে তবে তারা অসমৃষ্ট  
হয়; আর যদি অমঙ্গল  
উপস্থিত হয়, তারা আনন্দিত  
হয়ে থাকে এবং যদি তোমরা  
ধৈর্যধারণ কর ও সংযমী হও,  
তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের  
কোনই ক্ষতি করতে পারবে  
না; তারা যা করে-নিচয়ই  
আল্লাহ তার পরিবেষ্টনকারী।

أَكْبَرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَتِ إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝

۱۱۹- هَانَتْمَ أَوْلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ  
وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ  
بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُواْكُمْ  
قَالُواْ أَمْنَأْ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا  
عَلَيْكُمُ الْأَنَاءِ مِنَ الْغَيْظِ  
قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

۱۲۰- إِنْ تَمْسَكُمْ حَسَنَةً  
تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبُّكُمْ سَيِّئَةً  
يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِرُّوا  
وَتَتَقَوَّلَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ  
شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ  
مِحِيطٌ ۝

এখানে আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে কাফির ও মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন—‘এরা তো তোমাদের শক্র। সুতরাং তোমরা তাদের বাহ্যিক মিষ্ট কথায় ভুলে যেও না এবং তাদের প্রতারণার ফাঁদে পড়ো না। নতুবা তারা সুযোগ পেয়ে তোমাদেরকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং তদের ভেতরের শক্রতা তখন প্রকাশ পেয়ে যাবে। তোমরা তাদের নিকট তোমাদের গুণ কথা কখনও প্রকাশ করো না’। **بِطَانَةً** বলা হয় মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধুকে এবং **مِنْ دُونِكُمْ** দ্বারা ইসলাম ছাড়া অন্যান্য সমস্ত দলকে বুঝানো হয়েছে। সহীহ বুখারী প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা যে নবীকেই প্রেরণ করেছেন এবং যে প্রতিনিধিকেই নিযুক্ত করেছেন, তাঁর জন্যে তিনি দু’জন বন্ধু নির্ধারিত করেছেন। একজন তাঁকে ভাল কথা বুঝিয়ে থাকেন ও ভালকার্যে উৎসাহ দিয়ে থাকেন এবং অপরজন তাঁকে মন্দকার্যের পথ-প্রদর্শন করে ও সেই কার্যে উত্তেজিত করে। সুতরাং আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন সেই রক্ষা পেতে পারে।’ হ্যরত উমার ইবনে খান্দাব (রাঃ)-কে বলা হয়ঃ ‘এখানে ‘হীরার’ একজন লোক রয়েছে, খুব ভাল লিখতে পরে এবং তার স্মরণশক্তি খুব ভাল সুতরাং আপনি তাকে আপনার লিখক নিযুক্ত করুন।’ একথা শুনে হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ ‘তাহলে তো আমি একজন অমুসলিমকে আমার বন্ধু বানিয়ে নেবো যা আল্লাহ তা‘আলা নিষেধ করেছেন! এ ঘটনাটিও এ আয়াতটিকে সামনে রেখে চিন্তা করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে যে, যিন্মী কাফিরদেরকেও একপ কার্যে নিয়োগ করা উচিত নয়। কেননা, হতে পারে যে, তারা শক্রপক্ষকে মুসলমানদের গোপনীয় কথা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করবে এবং তাদেরকে সতর্ক করে দেবে। কারণ, মুসলমানদের পতনই তাদের কাম্য। হ্যরত আযহার ইবনে রাশেদ (রঃ) বলেন যে, মানুষ হ্যরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)-এর নিকট হাদীস শুনতেন। কোন হাদীসের ভাবার্থ বোধগম্য না হলে তাঁরা হ্যরত হাসান বসরী (রঃ)-এর নিকট তা বুঝে নিতেন। একদা হ্যরত আনাস (রাঃ) নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেনঃ ‘তোমরা অংশীবাদীদের অগ্নি হতে আলোক গ্রহণ করো না এবং স্বীয় আংটিতে আরবী অংকন করো না।’ তাঁরা এসে খাজা সাহেবকে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ দ্বিতীয় বাক্যটির ভাবার্থ হচ্ছে— ‘তোমরা আংটিতে মুহাম্মদ (সঃ)-এর নাম খোদাই করো না’ এবং প্রথম বাক্যটির ভাবার্থ হচ্ছেঃ ‘তোমরা নিজেদের কার্যের ব্যাপারে মুশারিকদের পরামর্শ

গ্রহণ করো না।’দেখুন, আল্লাহ তা‘আলা ও স্বীয় গ্রন্থে বলেনঃ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্যদের বিশ্বস্ত বস্তুরূপে গ্রহণ করো না।’ (আবু ইয়ালা) কিন্তু খাজা সাহেবের এ ব্যাখ্যাটি একটি বিবেচ্য বিষয়। সন্তুতঃ হাদীসটির সঠিক ভাবার্থ হবেঃ ‘<sup>لِمَنْ يُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ</sup>’ (৪৯: ২৯) আরবী অঙ্করে আংটির উপর খোদাই করো না।’ যেমন অন্য হাদীসে এর নিষিদ্ধতা পরিষ্কারভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এর কারণ এই যে, এর ফলে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মোহরের সঙ্গে সাদৃশ্য এসে যাবে। আর প্রথম বাক্যটির ভাবার্থ হবেঃ ‘তোমরা মুশরিকদের গ্রামের পার্শ্বে থেকো না, তাদের প্রতিবেশী হয়ো না এবং তাদের শহর হতে হিজরত কর।’ যেমন সুনান-ই-আবু দাউদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যকার যুদ্ধ কি তোমরা দেখ না?’ অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যারা মুশরিকদের সাথে মেলামেশা করে, তাদের সাথে বসবাস করে, তারা তাদের মতই।’

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘তাদের কথাতেও শক্রতা প্রকাশ পাচ্ছে। তাদের চেহারা দেখেই শুভাশুভ নিরূপকগণ তাদের ভেতরের দুষ্টামির কথা জানতে পারে। তাদের অন্তরে যে ধর্মসাম্প্রদায় মনোভাব রয়েছে তা তোমাদের জানা নেই। কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলাম। সুতরাং জ্ঞানীরা কখনও তাদের প্রতারণার ফাঁদে পড়বে না।’

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘দেখ, এটা কত বড় দুর্বলতার কথা যে, তোমরা তাদেরকে ভালবাসছো, অথচ তারা তোমাদেরকে চায় না। তোমরা সমস্ত গ্রন্থকে স্বীকার করে থাক বটে, কিন্তু তারা সন্দেহের মধ্যেই পড়ে রয়েছে। তোমরা তাদের গ্রন্থে বিশ্বাস কর বটে, কিন্তু তারা তোমাদের গ্রন্থে বিশ্বাস করে না। অতএব, উচিত তো ছিল যে, তোমরা তাদের দিকে কড়া দৃষ্টিতে দেখতে। পক্ষান্তরে তারা কিন্তু তোমাদের প্রতি শক্রতাই পোষণ করছে।’

তারা মুসলমানদের মুখোমুখি হলে নিজেদের ঈমানদারীর কাহিনী বলতে আরম্ভ করে। কিন্তু যখনই তাদের হতে পৃথক হয় তখনই হিংসা ও ক্রোধে নিজেদের অঙ্গুলি কামড়াতে থাকে। সুতরাং মুসলমানদের উচিত যে, তারা যেন মুনাফিকদের বাহ্যিক ভাব দেখেই তাদেরকে বন্ধু মনে না করে। এ মুনাফিকরা মুসলমানদের উন্নতি দেখে হিংসায় জুলে পুড়ে মরলেও আল্লাহ তা‘আলা ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি সাধন করতেই থাকবেন। মুসলমানরা সর্বদিক

দিয়ে বেড়েই চলবে, যদিও মুশরিক ও মুনাফিকরা হিংসা ও ক্রোধে জুলে পুড়ে মরে যায়। আল্লাহ পাক তাদের অন্তরের কথা খুব ভাল করেই জানেন। তাদের সমুদয় বড়বন্দের উপর মাটি পড়ে যাবে এবং তারা তাদের জঘন্য কার্যে কৃতকার্য হবে না। তারা মুসলমানদের উন্নতি চায় না তথাপি মুসলমানেরা দিন দিন উন্নতি লাভ করতেই থাকবে এবং পরকালেও তাদেরকে সুখময় জান্নাতে দেখতে পাবে। পক্ষান্তরে এ মুশরিক ও মুনাফিকরা ইহজগতেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং পরকালেও তারা জাহানামের জ্বালানিরপে ব্যবহৃত হবে। তারা যে তোমাদের চরমশক্তি তার বড় প্রমাণ এই যে, যখন তোমাদের কোন মঙ্গল সাধিত হয় তখন তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। আর যদি তোমাদের কোন ক্ষতি সাধিত হয় তখন তারা তাতে আনন্দ লাভ করে। অর্থাৎ যখন আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে সাহায্য করেন এবং তারা কাফিরদের উপর বিজয় লাভ করতঃ যুদ্ধলোক দ্রব্য প্রাপ্ত হয় তখন ঐ মুনাফিকরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। আর যখন মুমিনগণ পরাজয় বরণ করে তখন তারা কাফিরদের সাথে মিলিত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। এখন মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে সম্মোধন করে ‘বলেন—‘হে মুমিনগণ! যদি তোমরা তাদের দুষ্টামি হতে মুক্তি পেতে চাও তবে ধৈর্যধারণ কর, সংযমী হও এবং আমার উপর নির্ভর কর, আমি তোমাদের শক্তিদেরকে ঘিরে নেবো। কোন মঙ্গল লাভ করা এবং কোন অমঙ্গল হতে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। আল্লাহ তা‘আলা যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হতে পারে না। তোমরা যদি আল্লাহর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর তবে তিনিই তোমাদের জন্যে যথেষ্ট।’ এ সম্পর্কেই এখন উচ্চ যুদ্ধের বর্ণনা শুরু হচ্ছে, যার মধ্যে মুসলমানদের ধৈর্য ও সহনশীলতার বর্ণনা রয়েছে এবং যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা‘আলার পরীক্ষার পূর্ণচিত্র ও যদ্দ্বারা মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে প্রভেদ প্রকাশ পেয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

## ১২১। যখন তুমি বিশ্বাসীদেরকে

যুদ্ধার্থে যথাস্থানে সংস্থাপিত  
করবার জন্যে প্রভাতে স্বীয়  
পরিজন হতে বের হয়েছিলে;  
এবং আল্লাহ শ্রবণকারী  
মহাজ্ঞানী।

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ  
تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ  
لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

১২২। যখন তোমাদের দু' দল  
ভীরুতা প্রকাশের সংকল্প  
করেছিল এবং আল্লাহ সে  
দলধরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন;  
এবং মুমিনগণই আল্লাহর  
উপর নির্ভর করে থাকে ।

১২৩। আর নিচয়ই আল্লাহ  
তোমাদেরকে বদরে সাহায্য  
করেছিলেন এবং তোমরা  
দুর্বল ছিলে; অতএব তোমরা  
আল্লাহকে ভয় কর যেন  
তোমরা কৃতজ্ঞ হও ।

এখানে উহুদ যুদ্ধের ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। তবে কোন কোন মুফাস্সির  
এটাকে পরীক্ষার ঘটনাও বলেছেন। কিন্তু এটা উহুদ যুদ্ধের ঘটনা হওয়াই সঠিক  
কথা। উহুদের যুদ্ধ হিজরী ত্রৃতীয় সনের ১১ই শাওয়াল রোজ শনিবার সংঘটিত  
হয়। বদরের যুদ্ধে মুশরিকরা পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল। তাদের কয়েকজন  
নেতৃস্থানীয় লোক সেই যুদ্ধে মারা যায়। তখন ওর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে  
তারা ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে থাকে। ঐ ব্যবসায়ের মাল যা বদরের যুদ্ধের সময়  
অন্য পথে রক্ষা পেয়েছিল ঐ সবগুলোই তারা এ যুদ্ধের জন্যেই নির্দিষ্ট করে  
রেখেছিলো। চুতদীক থেকে লোক সংগ্রহ করে তারা তিন হাজার সৈন্যের এক  
বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করে পূর্ণ আসবাসপত্রসহ মদীনার উপর আক্রমণ  
করে। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জুম'আর নামায শেষে হ্যরত মালিক ইবনে  
আমর (রাঃ)-এর জানায়ার নামায পড়িয়ে দেন, তিনি ছিলেন বনী নাজার  
গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি জনগণকে পরামর্শ গ্রহণ উদ্দেশ্যে বলেনঃ “এ  
আক্রমণ প্রতিহত করার সর্বোত্তম পদ্ধা তোমাদের নিকট কি আছে?” তখন  
আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বলেনঃ “আমাদের মদীনার বাইরে যাওয়া উচিত নয়।  
যদি তারা এসে বাইরে অবস্থান করে তবে যেন জেলখানার মধ্যে পড়ে যাবে।  
আর যদি মদীনার ভেতরে প্রবেশ করে তবে একদিকে রয়েছে আমাদের বীর  
পুরুষদের তরবারীসমূহ এবং অপর দিকে রয়েছে আমাদের তীরন্দাজদের

১- ۱۲۲- اَذْهَمْتُ طَابِقَتِينَ  
مِنْكُمْ اَنْ تَفْشِلَ لَا وَاللهُ  
وَلِيُّوْدُ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ  
الْمُؤْمِنُونَ ۝

১- ۱۲۳- وَلَقَدْ نَصَرْتُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ  
وَانْتَمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ  
لِعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

লক্ষ্যভূষিত হীন তীরগুলো । আর যদি তারা এমনি ফিরে যায় তবে বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই ফিরে যাবে ।” কিন্তু তার মতের বিপরীত যত পেশ করেছিলন ঐ সাহাবীবৃন্দ যাঁরা বদর যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি । তাঁরা খুব জোর দিয়ে বলছিলেন যে, মদীনার বাইরে গিয়ে প্রাণ খুলে শক্রদের মোকাবেলা করতে হবে । রাসূলুল্লাহ (সঃ) বাড়ী গমন করেন এবং অন্তর্শংস্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসেন । তখন ঐ সাহাবীগণের ধারণা হয় যে, না জানি তাঁরা হয়তো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইচ্ছের বিপরীত মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্যে চাপ সৃষ্টি করেছেন । তাই তাঁরা বলেনঃ ‘হে আল্লাহ রাসূল (সঃ)! যদি এখানে থেকেই যুদ্ধ করা ভাল মনে করেন তবে তাই করুন, আমাদের পক্ষ হতে কোন হঠকারিতা নেই ।’ তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘নবী (সঃ)-এর জন্যে এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি অন্তর্শংস্রে সজ্জিত হওয়ার পর তা খুলে ফেলবেন । এখন আমি আর ফিরে যেতে পারি না । যে পর্যন্ত আল্লাহ পাক যা চান তাই সংঘটিত না হয় ।’ অতএব তিনি এক হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনার বাইরে বেরিয়ে পড়েন । ‘শাওত’ নামক স্থানে পৌছার পর ঐ মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিশ্বাসঘাতকতা করতঃ তার তিনশ লোক নিয়ে ফিরে আসে । তারা বলে যে, যুদ্ধ যে হবে না এটা জানা কথা কাজেই অযথা কষ্ট করে লাভ কি? রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের গ্রাহ্য না করে অবশিষ্ট সাতশ সাহাবীকে নিয়েই উভদ পর্বত অভিমুখে রওয়ানা হন । পর্বতকে পিছনে করতঃ পর্বত উপত্যকায় তিনি সেনাবাহিনীকে নামিয়ে দেন এবং তাঁদের নির্দেশ দেন, ‘আমি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ শুরু করবে না ।’ পঞ্চাশজন তীরন্দাজ সাহাবীকে পৃথক করতঃ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)-কে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করেন এবং তাঁদেরকে বলেনঃ ‘তোমরা পাহাড়ের উপর উঠে যাও এবং এটা লক্ষ্য রাখ যে, শক্ররা যেন পিছন দিক থেকে আসতে না পারে । জেনে রেখো, আমরা জয়যুক্ত হবো । (আল্লাহ না করেন) আমরা যদি পরাজিত হয়েই যাই তথাপিও তোমরা কখনও তোমাদের জায়গা থেকে সরবে না ।’ এসব সুব্যবস্থা করার পর স্বয়ং তিনিও প্রস্তুত হয়ে যান । তিনি দু'টি লৌহবর্ম পরিধান করেন । হ্যরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রাঃ)-কে পতাকা প্রদান করেন । এদিন কয়েক জন বালককেও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সেনাবাহিনীর মধ্যে দেখা যায় । এ ক্ষেত্রে সৈনিকেরাও আল্লাহর পথে প্রাণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল । অন্যান্য বালককে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সঙ্গে নেননি । পরিখার যুদ্ধে তাদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছিল । পরিখার যুদ্ধ উভদ যুদ্ধের দু'বছর পরে সংঘটিত হয়েছিল ।

কুরাইশ সেনাবাহিনী অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে মোকাবেলায় এগিয়ে আসে। তাদের সৈন্য সংখ্য ছিল তিনি হাজার। তাদের সঙ্গে দু'শটি সুসজ্জিত অশ্ব যেগুলো সময়ে কাজে আসতে পারে বলে সঙ্গে রাখা হয়েছিল। তাদের ডান অংশে ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং বাম অংশে ছিলেন ইকরামা ইবনে আবু জেহেল (এরা দু'জন পরে মুসলমান হয়েছিলেন)। তাদের পতাকা বাহক ছিল বানু আবদুদ্দার গোত্র। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনাবলী ঐ সম্পর্কীয় আয়াতগুলোর তাফসীরের সঙ্গে ইনশাআল্লাহ ক্রমাগত বর্ণিত হতে থাকবে। মোটকথা এ আয়াতে ওরই বর্ণনা হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনা হতে বের হয়ে সৈন্যগণকে যুদ্ধের যথাস্থানে নিযুক্ত করতে থাকেন। সৈন্যশ্রেণীর দক্ষিণ বাহু ও বাম বাহু নির্ধারণ করেন।

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কথা শুনে থাকেন এবং তিনি সকলের অন্তরের কথা জানেন।

বর্ণনাসমূহে রয়েছে যে, শুক্রবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুদ্ধের জন্যে মদীনা হতে বের হন। কুরআন কারীম ঘোষণা করছে— “হে নবী (সঃ)! বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধার্থ যথাস্থানে সংস্থাপিত করবার জন্যে তুমি প্রভাতেই পরিজন হতে বের হয়েছিলে।” তাহলে ভাবার্থ এই যে, শুক্রবারে বের হয়ে তিনি শিবির স্থাপন করেন এবং অন্যান্য কাজ-কর্ম শুরু হয় শনিবার দিন। হ্যরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ “আয়াতটি আমাদের সম্বন্ধে অর্থাৎ বানু হারেসা ও বানু সালমার গোত্রদ্বয়ের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। আমাদেরকে বলা হয়— “তোমরা দু'টি দল কাপুরুষতা প্রদর্শনের ইচ্ছে করেছিলে।” এতে আমাদের একটি দুর্বলতার বর্ণনা রয়েছে বটে, কিন্তু এ আয়াতটিকে আমাদের পক্ষে অতি উত্তম বলে মনে করি। কেননা, এ আয়াতে এও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ঐ দলদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘দেখ, আমি তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধেও বিজয়ী করেছি, অথচ তোমরা অতি অল্লসংখ্যক ছিলে এবং তোমাদের আসবাবপত্রও অতি নগণ্য ছিল।’ বদরের যুদ্ধ হিজরী দ্বিতীয় সনের ১৭ই রামাযানুল মুবারাক রোজ শুক্রবার সংঘটিত হয়। ঐদিনকেই ‘ইয়াওমুল ফুরকান’ বা পৃথককারী দিন বলা হয়। সেই দিন ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মান লাভ হয় এবং শিরক ধ্বংস হয়ে যায়, শিরকের স্থান বিধ্বস্ত হয়। অথচ সেই দিন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশ তেরজন। তাদের নিকট ছিল মাত্র দু'টি ঘোড়া, সন্তরটি উট এবং অবশিষ্ট সবাই পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করেছিলেন।

অন্তর্শন্ত্র এত অল্প ছিল যে, যেন ছিলই না। পক্ষান্তরে শক্রের সংখ্যা ছিল সে দিন মুসলমানদের তিনগুণ, এক হাজারের কিছু কম ছিল। তারা সবাই ছিল বর্ষ পরিহিত। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল অন্তর্শন্ত্র এবং যথেষ্ট সংখ্যক সুন্দর সুন্দর ঘোড়া ছিল। তারা এত বড় বড় ধনী ছিল যে, তাদের নিকট স্বর্ণের অলংকার ছিল। এ স্থলে মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সশান্ও ও বিজয় দান করেন। তিনি স্বীয় নবী (সঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের মুখ উজ্জ্বল করেন এবং শয়তান ও তার সঙ্গীদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে ও জান্নাতী সৈন্যদেরকে তাঁর অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন- “তোমাদের সংখ্যার স্বল্পতা ও বাহ্যিক আসবাবপত্রের অবিদ্যমানতা সত্ত্বেও তিনি তোমাদেরকে জয়যুক্ত করেছেন। যেন তোমরা জানতে পার যে, বিজয় লাভ বাহ্যিক আড়তের ও জাঁকজমকের উপর নির্ভর করে না।” এ জন্যেই দ্বিতীয় আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন-‘হ্লায়েনের যুদ্ধে তোমরা বাহ্যিক আসবাবপত্রের প্রতি লক্ষ্য করেছিলে এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে খুশী হয়েছিলে। কিন্তু ঐ সংখ্যাধিক্য ও আসবাবপত্রের বিদ্যমানতা তোমাদের কোন উপকারে আসেনি।’ হ্যরত আইয়ায় আশআরী (রঃ) বলেনঃ ‘ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমাদের পাঁচজন নেতা ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেনঃ (১) হ্যরত আবু উবাইদা (রাঃ), (২) হ্যরত ইয়ায়ীদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ), (৩) হ্যরত ইবনে হাসানা, (রাঃ) (৪) হ্যরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) এবং (৫) হ্যরত আইয়ায় (রাঃ)। আর মুসলমানদের খলীফা হ্যরত উমার (রাঃ)-এর নির্দেশ ছিল যে, যুদ্ধের সময় হ্যরত আবু উবাইদা (রাঃ) নেতৃত্ব দেবেন। এ যুদ্ধে চতুর্দিক হতেই আমাদের পরাজয়ের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। আমরা তখন হ্যরত উমার (রঃ)-কে পত্র লিখে জানাই- ‘মৃত্যু আমাদেরকে পরিবেষ্টন করেছে। সুতরাং সাহায্য প্রেরণ করুন।’ আমাদের এ আবেদনের উপরে খলীফা হ্যরত উমার (রাঃ) আমাদেরকে লিখেন- ‘তোমাদের সাহায্য প্রার্থনার পত্র পেয়েছি। আমি তোমাদেরকে এমন এক সন্তার কথা বলছি যিনি সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী এবং যাঁর হাতে শক্তিশালী সৈন্য রয়েছে। ঐ সন্তা হচ্ছেন স্বয়ং মহাপ্রতাপাবিত আল্লাহ। যিনি বদর যুদ্ধে স্বীয় বান্দা ও রাসূল হ্যরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে সাহায্য করেছিলেন। বদরী সৈন্য তো তোমাদের অপেক্ষা বহু কম ছিলেন। আমার এ পত্র পাঠ্মাত্রাই জিহাদ শুরু করে দাও এবং আমাকে কিছুই লিখবে না ও কিছুই জিজ্ঞেস করবে না।’ এ পত্র পাঠের পর আমাদের বীরত্ব

বৃদ্ধি পায়। আমরা দলবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ শুরু করি। মহান আল্লাহর দয়ায় শক্ররা পরাজিত হয় এবং পলায়ন করে। আমরা বার মাইল পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্বাবন করি। আমরা বহু যুদ্ধলক্ষ মাল প্রাপ্ত হই এবং পরম্পরে বন্টন কর নেই। অতঃপর হযরত আবু উবাইদা (রাঃ) বলেনঃ ‘আমার সাথে কে দৌড় প্রতিযোগিতা করবে?’ এক নব্য যুবক দাঁড়িয়ে বলেনঃ ‘আপনি অস্তুষ্ট না হলে আমি হাজির আছি।’ অতঃপর দৌড়ে যুবকটি অগ্রে হয়ে যান। আমি লক্ষ্য করি যে, ঐ দু’জনের চুলেরগুচ্ছ বাতাসে উড়ছিল। হযরত আবু উবাইদা (রাঃ) ঐ যুবকের পিছনে ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছিলেন।’ বদর ইবনে নারীণ নামক একটি ছিল। তার নামেই একটি কৃপের নামকরণ করা হয় এবং যে প্রান্তরে ঐ কৃপটি ছিল ওটাও বদর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বদরের যুদ্ধও ঐ নামেই খ্যাতি লাভ করে। মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে এ জায়গাটি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পার।’

১২৪। যখন মুমিনদেরকে  
বলছিলে— এটা কি তোমাদের  
পক্ষে যথেষ্ট নয় যে,  
তোমাদের প্রতিপালক  
তিনসহস্র ফেরেশতা প্রেরণ  
করে তোমাদেরকে সাহায্য  
করবেন?

১২৫। বরৎ যদি তোমরা  
ধৈর্যধারণ কর ও সংযমী হও  
এবং তারা যদি স্বেচ্ছায়  
তোমাদের উপর নিপত্তি হয়,  
তবে তোমাদের প্রতিপালক  
পাঁচ সহস্র বিশিষ্ট ফেরেশতা  
ঘারা তোমাদের সাহায্য  
করবেন।

١٢٤- إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ  
يَكْفِيْكُمْ أَنْ يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ  
بِثُلَثَةِ أَلْفٍ مِّنَ الْمَلِكَةِ  
وَمِنْ مُنْزَلِنَ

১২৫- بَلِّي إِنْ تَصِيرُوا وَتَتَقَوَّلُوا  
وَيَا تَوْكِيمِ فَرُورِهِمْ هَذَا  
يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ أَلْفٍ  
مِّنَ الْمَلِكَةِ مُسِوِّمِيْنَ

১২৬। আর আল্লাহ এ সাহায্য  
গুরু এ জন্যেই করেছেন যেন  
তোমাদের জন্যে সুসংবাদ হয়  
এবং যেন তোমাদের অন্তরে  
শান্তি আসে আর সাহায্য গুরু  
আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়ে  
থাকে, যিনি পরাক্রান্ত  
বিজ্ঞানময়।

১২৭। যারা অবিশ্বাসী  
হয়েছে—তিনি এরূপে তাদের  
একাংশকে কর্তৃত করেন  
অথবা তাদেরকে দুর্বল করেন,  
যাতে তারা অকৃতকার্যতা  
সহকারে কিরে যায়।

১২৮। এ কার্যে তোমার কোনই  
সম্ভব নেই যে, তিনি  
তাদেরকে ক্ষমা করেন অথবা  
শান্তি প্রদান করেন; পরম্পরা  
নিচয়েই তারা অত্যাচারী।

১২৯। আর নভোমগুলে যা  
হয়েছে ও ভূমগুলে যা আছে  
তা আল্লাহরই; তিনি থাকে  
ইছে ক্ষমা করেন এবং যাকে  
ইছে শান্তি প্রদান করেন এবং  
আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম  
করুণাময়।

মহান আল্লাহ এখানে হ্যুরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে সাম্মনা দিচ্ছেন। কেউ কেউ  
বলেন যে, এটা ছিল বদরের যুদ্ধের দিন। হ্যুরত হাসান বসরী (রঃ), আমির  
(রঃ), শা'বী (রঃ), রাবী' ইবনে আনাস (রাঃ) প্রত্তির এটাই উক্তি। ইমাম  
ইবনে জারীরও (রঃ) এটাই পছন্দ করেছেন। মুসলমানদের নিকট এ সংবাদ

۱۲۶- وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرِي  
لَكُمْ وَلَتَطْمِنُنَّ قُلُوبَكُمْ بِهِ وَمَا  
النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

۱۲۷- لِيُقْطَعَ طَرْفًا مِنَ الظَّبَابِ  
كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيُنَقْلِبُوا  
خَابِبِينَ ۝

۱۲۸- لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ  
أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْذِبُهُمْ  
فَإِنَّهُمْ ظَلَمُونَ ۝

۱۲۹- وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  
وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ  
يَشَاءُ وَيَعْذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

পৌছে যে, কার্য ইবনে জাবির মুশরিকদেরকে সাহায্য করবে, কেননা সে মুশরিকদের নিকট এটা অঙ্গীকার করেছিল। এটা মুসলমানদের নিকট খুব কঠিন ঠেকে। তখন আল্লাহ তা'আলা مُسِّيْمٌ هَتَّهُ لِكُفِّيْرِكُمْ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। কার্য ইবনে জাবির মুশরিকদের পরাজয়ের সংবাদ শুনে তাদের সাহায্যার্থে আসেনি এবং আল্লাহ তা'আলা ও পাঁচ হাজার ফেরেশতা পাঠাননি। হ্যরত রাবী' ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে প্রথমে এক হাজার ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন, তার পরে তিন হাজারে পৌছে যায় এবং শেষে পাঁচ হাজারে দাঁড়ায়। এখানে এ আয়াতে তিন হাজার ও পাঁচ হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য দানের অঙ্গীকার রয়েছে এবং বদরের যুদ্ধের সময় এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করার অঙ্গীকার ছিল। তথায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ مِدْكَمٍ بِالْفِ مِنَ الْمُلِنِكَةِ مُرْدِفِينَ -

অর্থাৎ ‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পিছনে আগমনকারী এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যকারী।’ (৮: ৯) আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সমতা এভাবেই হতে পারে। কেননা, তথায় مُرْدِفِينَ শব্দ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বুরা যাচ্ছে যে, প্রথমে পাঠান হয়েছিল এক হাজার অতঃপর তাঁদের পরে আর দু'হাজার পাঠিয়ে তাঁদের সংখ্যা তিন হাজার করা হয় এবং সর্বশেষে আরও দু'হাজার প্রেরণ করে তাঁদের সংখ্যা পাঁচ হাজারে পৌছিয়ে দেয়া হয়। বাহ্যতঃ এটাই জানা যাচ্ছে যে, এ অঙ্গীকার ছিল বদরের যুদ্ধের জন্যে, উভদের যুদ্ধের জন্যে নয়। কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে, এ অঙ্গীকার উভদের যুদ্ধের জন্যেই ছিল। মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), যহুক (রঃ), মূসা ইবনে উকবা (রঃ) প্রভৃতির এটাই উক্তি। কিন্তু তাঁরা বলেন যে, মুসলমানগণ যুদ্ধক্ষেত্র হতে সরে পড়েছিলেন বলে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয়নি। কেননা, সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলা অর্থাৎ ‘যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও-এ কথা বলেছেন। فَوَرَ شَبَدِهِ কয়েকটি অর্থ রয়েছেঃ (১) নিমিষে, (২) ক্রোধ ও (৩) ভ্রমণ। শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্ন বিশিষ্ট। হ্যরত আলী (রাঃ) বলেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন ফেরেশতাদের চিহ্নছিল সাদা পশম। আর তাদের ঘোড়ার চিহ্ন ছিল মন্তকের শুভতা, হ্যরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, তাঁদের লাল পশমের চিহ্ন ছিল। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ক্ষম্বের চুল ও লেজের চিহ্ন ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সেনাবাহিনীর এ চিহ্নই

সূরাঃ আলে ইমরান ত

ছিল। অর্থাৎ পশ্চমের চিহ্ন। মাকহুল (রাঃ) বলেন যে, ফেরেশতাদের চিহ্ন ছিল পশ্চমের শিরস্ত্রাণ এবং ঐ গুলোর রং ছিল কাল। হুনায়েনের যুদ্ধে যেসব ফেরেশতা এসেছিলেন তাঁদের চিহ্ন ছিল সাদা রঙের পাগড়ী। তাঁরা এসেছিলেন শুধুমাত্র সাহায্য করার জন্যে ও সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে। তাঁরা যুদ্ধ করেনি। এও বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধে হযরত যুবাইর (রাঃ)-এর মাথায় ছিল সাদা রঙের পাগড়ী এবং ফেরেশতাদের মন্তকোপরি হলদে রঙের পাগড়ী ছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘ফেরেশতাদেরকে অবতীর্ণ করা এবং তোমাদেরকে এর সুসংবাদ দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করা ও তোমাদের মনে শান্তি আনয়ন করা। নচেৎ আল্লাহ তা'আলা এত ব্যাপক ক্ষমতাবান যে, তিনি ফেরেশতা অবতীর্ণ না করেও এবং তোমাদের যুদ্ধ ছাড়াও তোমাদেরকে জয়যুক্ত করতে পারেন। সাহায্য শুধু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই এসে থাকে।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে—‘এবং যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তাদের দিক হতে প্রতিশোধ নিতেন, কিন্তু যেন তিনি তোমাদের একের দ্বারা অন্যের পরীক্ষা করেন; আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, আল্লাহ তা'আলা তাদের কার্যাবলী কখনও বিনষ্ট করবেন না। আল্লাহ তাদেরকে তাদের ইল্লিত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবেন এবং তাদের অবস্থা ঠিক রাখবেন। আর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন এবং তিনি তাদেরকে ওটা চিনিয়ে দেবেন।’

তিনি মহাসম্মানিত এবং প্রত্যেক কার্যে বড় বিজ্ঞানময়। এ জিহাদের নির্দেশও বিভিন্ন প্রকারের নিপুণতায় পরিপূর্ণ। এর ফলে কাফিরেরা ধ্বংস হবে বা লাঞ্ছিত হবে কিংবা তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যাবে।

এরপরে বলা হচ্ছে— ‘নভোমগুল ও ভূমগুলের সমস্ত কিছু আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে। হে নবী (সঃ)! কোন কার্যের অধিকার তোমার নেই।’ যেমন অন্য স্থানে রয়েছে—

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

অর্থাৎ ‘হে নবী ! তোমার দায়িত্ব শুধুমাত্র পৌঁছিয়ে দেয়া এবং হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার।’ (১৩: ৪০) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُّهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

অর্থাৎ ‘তাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তোমার নেই, বরং আল্লাহ যাকে চান সুপথ প্রদর্শন করে থাকেন।’ (২: ২৭২) আর এক জায়গায় রয়েছে—

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مِنْ أَحَبَّ بَتْ وَلِكُنَّ اللَّهَ يَهْدِي مِنْ يَشَاءُ

অর্থাৎ ‘তুমি যাকে ভালবাস তাকে সুপথ দেখাতে পার না, বরং আল্লাহ  
যাকে চান সুপথ দেখিয়ে থাকেন।’ (২৮: ৫৬) সুতরাং হে নবী! আমার  
বান্দাদের কার্যের সাথে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই। তোমার কাজ তো শুধু  
তাদের নিকট আমার নির্দেশ পৌছিয়ে দেয়। এও সম্ভবনা রয়েছে যে, আল্লাহ  
পাক তাদেরকে তাওবা করার তাওফীক প্রদান করবেন, ফলে তারা মন্দ কার্যের  
পর ভাল কার্য করতে থাকবে এবং তিনি তাদের তাওবা কবৃল করবেন। অথবা  
এরও সম্ভবনা রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে তাদের কুফ্র ও পাপ কার্যের কারণে  
শাস্তি প্রদান করবেন। তখন এটা কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে তাদের  
প্রতি অত্যাচার হবে না, বরং তারা তারই উপযুক্ত। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে  
যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামাযে যখন দ্বিতীয় রাক‘আতের রুক্ক’ হতে  
মস্তক উত্তোলন করতেন এবং ‘سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ’ ও ‘رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ’ বলে নিতেন  
তখন তিনি কাফিরদের উপর বদন্দুআ করতঃ বলতেনঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি  
অমুক অমুক ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত বর্ণণ করুন।’ সে সম্পর্কেই  
‘لَيْسَ لَكَ مِنْ إِلَهٍ إِلَّا أَنْتَ’-এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। যে কাফিরদের জন্যে তিনি বদন্দু‘আ  
করতেন, মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে ওদের নামও এসেছে। যেমন হারিস  
ইবনে হিশাম, সাহীল ইবনে উমার এবং সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া। ওর  
মধ্যেই রয়েছে যে, শেষে ঐ লোকগুলো হিদায়াত প্রাপ্ত হয় ও মুসলমান হয়ে  
যায়। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এ বদন্দু‘আ চার ব্যক্তির উপর ছিল, যা হতে  
তাঁকে বিরত রাখা হয়। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন  
কারও উপর বদন্দুআ বা ভাল দু‘আ করার ইচ্ছে করতেন তখন রুকুর পরে ‘سَمِعَ  
رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ’ বলার পর দুআ করতেন। কখনো বলতেনঃ ‘হে  
আল্লাহ! ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ, সালমা ইবনে হিশাম, আইয়াশ ইবনে আবু  
রাবী‘আ এবং দুর্বল মুমিনদেরকে কাফিরদের হাত হতে মুক্তি দান করুন। হে  
আল্লাহ! মুঘির গোত্রের উপর ধর পাকড় শাস্তি অবতীর্ণ করুন এবং তাদেরকে  
এমন দুর্ভিক্ষের মধ্যে পতিত করুন যেমন দুর্ভিক্ষ হ্যরত ইউসুফ (আঃ)-এর  
যুগে ছিল।’ এ প্রার্থনা তিনি উচ্চেঃস্থরে করতেন। আবার কোন সময় ফজরের  
নামায়ের কুন্তে এ কথাও বলতেনঃ ‘হে আল্লাহ! অমুক অমুকের উপর  
অভিসম্পাত বর্ণণ করুন’ এবং আরবের কতকগুলো গোত্রের নাম নিতেন। অন্য  
বর্ণনায় রয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধে যখন তাঁর পবিত্র দাঁত শহীদ হয়ে যায়,  
মুখমণ্ডল আহত হয় এবং রক্ত বহিতে থাকে তখন পবিত্র মুখ দিয়ে বের হয়ঃ  
‘ঐ সম্প্রদায় কিরূপে মুক্তি পেতে পারে যে স্বীয় নবীর সাথে একপ ব্যবহার

করলো? অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করছিলেন। তখন **لَيْسَ** আয়াত অবতীর্ণ হয়। তিনি ঐ যুদ্ধে একটি গর্তে পড়ে গিয়েছিলেন এবং অনেক রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল, কতক তো এ কারণে এবং একটি কারণ এও ছিল যে, তিনি দু'টি বর্ম পরিহিত ছিলেন, কাজেই উঠতে পারেননি। হযরত হৃষাইফা (রাঃ)-এর ক্রীতদাস হযরত সালিম (রাঃ) তথায় পৌছেন এবং তাঁর চেহারা মুবারক হতে রক্ত মুছে নেন। জ্ঞান ফিরলে তিনি এ কথা বলেন এবং ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তু তাঁরই। সবাই তাঁর দাস। তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছে শান্তি দেন। তিনি যা চান তাই নির্দেশ দেন। কেউ তাঁর কাঘের হিসেব নিতে পারে না। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

১৩০। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ!

তোমরা দ্বিগুণের উপর দ্বিগুণ  
সুন্দ ভক্ষণ করো না এবং  
আল্লাহকে ভয় কর যেন  
তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।

১৩১। আর তোমরা সেই  
জাহানামের ভয় কর, যা  
অবিশ্বাসীদের জন্য অস্তুত  
রাখা হয়েছে।

১৩২। আর আল্লাহ ও রাসূলের  
আনুগত্য স্বীকার কর যেন  
তোমার করুণা প্রাপ্ত হও।

১৩৩। তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের  
ক্ষমা ও জালাতের দিকে  
ধাবিত হও— যার প্রসারতা  
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সদৃশ,  
ওটা ধর্মভীরুদ্দের জন্যে  
নির্মিত হয়েছে।

١٣- **يَا يَهُهَا الَّذِينَ آمَنُوا**

**لَا تَأْكِلُوا الرِّبَوَاضُعًا فَإِنَّ**  
**مُضْعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعْلَكُمْ**

**تُفْلِحُونَ**

١٣١- **وَاتَّقُوا النَّارَ إِنَّ**

**أُدَدُ لِلْكُفَّارِ**

٣٢- **وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ**

**لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ**

١٣٣- **وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ**

**مِنْ رِبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا**

**السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعْدَتُ**

**لِلْمُتَّقِينَ**

সূরাঃ আলে ইমরান ৩

১৩৪। যারা স্বচ্ছতা ও অভাবের  
মধ্যে ব্যয় করে এবং  
ক্রোধ সংবরণ করে ও  
মানবদেরকে ক্ষমা করে; আর  
আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে  
ভালবাসেন।

১৩৫। এবং যখন কেউ অশীল  
কার্য করে কিংবা স্বীয়  
জীবনের প্রতি অত্যাচার করে,  
তৎপরে আল্লাহকে স্মরণ করে  
অপরাধসমূহের জন্যে ক্ষমা  
প্রার্থনা করে; আর আল্লাহ  
ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা  
করতে পারে? এবং তারা যা  
করেছে, সে ব্যাপারে জেনে  
গুনে হঠকারিতা করে না।

১৩৬। তাদের পুরক্ষার হবে  
তাদের প্রভুর নিকট হতে  
মার্জন। এবং এমন  
উদ্যানসমূহ যেগুলোর  
তলদেশ দিয়ে স্রোতস্থিনীসমূহ  
থ্রবাহিত থাকবে, তন্মধ্যে  
তারা সদা অবস্থান করবে;  
এবং কর্মীদের জন্যে কি সুন্দর  
প্রতিদান!

١٣٤ - الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي  
السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكُظُمِينَ  
الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ  
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

١٣٥ - وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا  
فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ  
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا  
لِذَنْوِيهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ  
إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصْرُرُوا عَلَىٰ  
مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

١٣٦ - أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ  
مِّنْ رِبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا  
وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝

এখনে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদের সুদ আদান প্রদান হতে এবং  
ভক্ষণ হতে নিষেধ করেছেন। অঙ্গতা যুগের লোকেরা সুদের উপর ঝণ প্রদান  
করতো। ঝণ পরিশোধের একটি সময় নির্ধারিত হতো। এই সময়ের মধ্যে ঝণ

পরিশোধ করতে না পারলে সময় বাড়িয়ে দিয়ে সুদের উপর সুদ বৃদ্ধি করা হতো। এভাবে চক্রকারে সুদ বৃদ্ধি পেতে পেতে মূলধন কয়েক গুণ হয়ে যেতো। মহান আল্লাহ স্বীয় ঈমানদার বান্দাদেরকে একুপ অন্যায়ভাবে জনগণের সম্পদ ধ্রংস করতে চরমভাবে নিষেধ করেছেন এবং তাদেরকে মুক্তাকী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করতঃ ওর উপর মুক্তিদানের অঙ্গীকার করেছেন। অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ তদীয় রাসূলের আনুগত্য স্বীকারের নির্দেশ দান করতঃ ওর উপর করুণা প্রদর্শনের ওয়াদা দিচ্ছেন। এরপর ইহজগত ও পরজগতের মঙ্গল লাভের জন্য তাদের সৎকার্যের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং জান্নাতের প্রশংসা করেছেন। এর প্রস্থ বর্ণনা করতঃ দৈর্ঘ্যের অনুমানের ভার শ্রোতাদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছেন। যেমন তিনি জান্নাতী বিছানার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ ‘**أَسْتَبِرُّقَ بَطَائِنُهَا مِنْ**’ অর্থাৎ ‘ওর ভেতর হবে নরম রেশমের।’ (৫৫ঃ ৫৪) ভাঁবার্থ এই যে, ভেতরই যখন একুপ তখন বাহির কিরণ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। অনুরূপভাবে এখানেও বলা হচ্ছে যে, ‘জান্নাতের প্রস্থই যখন সপ্ত আকাশ ও সপ্ত যমীনের সমান, তখন দৈর্ঘ্য কত বড় হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কেউ কেউ বলেন যে, জান্নাতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। কেননা, জান্নাত গম্বুজের মত আরশের নীচে রয়েছে এবং যে জিনিস গম্বুজ সদৃশ তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘তোমরা আল্লাহ তা‘আলার নিকট জান্নাত যাঞ্চা করলে ফিরদাউস যাঞ্চা করো। এটাই সবচেয়ে উঁচু ও সর্বোত্তম জান্নাত। এ জান্নাতের মধ্য দিয়েই সমস্ত নদী প্রবাহিত হয় এবং ওর ছাদই হচ্ছে পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর আরশ।’ মুসনাদ-ই আহমাদে রয়েছে যে, হিরাক্রিয়াস রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একটি প্রতিবাদমূলক পত্র লিখে পাঠায়। পত্রে লিখা ছিল- ‘আপনি আমাকে এমন জান্নাতের দিকে আহবান করছেন যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। তাহলে বলুন, জাহান্নাম কোথায় গেল? রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ ‘সুবহান্নাল্লাহ! যখন দিন আসে তখন রাত কোথায় যায়?’ যে দৃতি হিরাক্রিয়াসের পত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়েছিলো তার সাথে হিমস নামক স্থানে হ্যরত আবু ইয়ালার সাক্ষাৎ হয়েছিল। হ্যরত আবু ইয়ালা বলেন যে, ঐ সময় উক্ত দৃতি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সে বলেঃ ‘যখন আমি পত্রটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রদান করি তখন তিনি উক্ত পত্রটি তাঁর বাম দিকের একজন সাহাবীকে প্রদান করেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করিঃ ‘তাঁর নাম কি?’ জনগণ বলেনঃ ‘ইনি হচ্ছেন হ্যরত মুআবিয়া (রাঃ)। হ্যরত

উমারকেও (রাঃ) এ প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনিও বলেছিলেনঃ ‘রাতের সময় দিন কোথায় যায়?’ এ উত্তর শুনে ইয়াহুদী লজ্জিত হয়ে বলেঃ ‘এটা তাওরাত হতেই গ্রহণ করা হয়েছে।’ হয়রত ইবনে আববাস (রাঃ) হতেও এ উত্তর বর্ণিত আছে। একটি মারফু’ হাদীসে রয়েছে যে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ‘যখন প্রত্যেক জিনিসের উপর রাত এসে যায় তখন দিন কোথায় যায়?’ তখন সে বলেঃ ‘যেখানে আল্লাহ চান’। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘এ রকমই জাহানামও সেখানেই যায়। যেখানে আল্লাহ চান’। (বায়্যারা) এ বাক্যটির দু’টি অর্থ হতে পারে। একতো এই যে, রাত্রে যদিও আমরা দিনকে দেখতে পাই না, তথাপি দিন কোন জায়গায় থাকা অসম্ভব নয়। অনুরূপভাবে যদিও জান্নাতের বিস্তার এত বেশী তথাপি জাহানামের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করা যেতে পারে না। যেখানে আল্লাহ তা‘আলা চেয়েছেন সেখানে ওটাও রয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যখন দিন একদিকে চড়ে যায় তখন রাত অন্য দিকে থাকে। তদ্বপ জান্নাত সুর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে এবং জাহানাম সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে। কাজেই এ দুয়ের অবস্থানের কোন অসুবিধে নেই।

অতঃপর আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীদের বিশেষণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে এবং স্বচ্ছতায় ও অভাবে, মোটকথা সর্বাবস্থাতেই আল্লাহ তা‘আলার পথে ব্যয় করে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে-

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَرَّاً وَعَلَانِيَةً

অর্থাৎ ‘যারা দিনে-রাতে প্রকাশে ও গোপনে তাদের সম্পদ খরচ করে থাকে।’ (২: ১৭৪) কোন কিছু তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য হতে বিরত রাখতে পারে না। তারা তাঁর নির্দেশক্রমে তাঁর সৃষ্টজীবের উপর অনুগ্রহ করে থাকে। **ক্ষেত্রের অর্থ** শব্দের অর্থ গোপন করাও হয়ে থাকে। অর্থাৎ এমন কি তারা তাদের ক্রোধ প্রকাশ পর্যন্তও করে না। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘হে আদম সন্তান! তুমি যদি ক্রোধের সময় আমাকে স্মরণ কর অর্থাৎ আমার নির্দেশ মান্য করতঃ ক্রোধ সংবরণ করে নাও তবে আমিও আমার ক্রোধের সময় তোমাকে স্মরণ করবো অর্থাৎ তোমার ধ্বংসের সময় তোমাকে ধ্বংস হতে রক্ষা করবো’। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম) অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করে, আল্লাহ তার উপর হতে শান্তি সরিয়ে নেন। আর যে ব্যক্তি স্বীয় জিহ্বাকে

(শরীয়ত বিরোধী কথা হতে) সং্যত রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার গোপনতা রক্ষা করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট ওয়র পেশ করে, আল্লাহ তা'আলা তার ওয়র গ্রহণ করে থাকেন'। (মুসনাদ-ই-আবি ইয়ালা) এ হাদীসটি গারীব এবং এর সনদের ব্যাপারেও সমালোচনা রয়েছে। অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ঐ ব্যক্তি বীর পুরুষ নয় যে কাউকে মল্লযুদ্ধে প্রবাস্ত করে, বরং প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি বীর পুরুষ যে ক্রোধের সময় ক্রোধ দমন করতে পারে।' (মুসনাদ-ই-আহমাদ) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যার নিকট তার উত্তরাধিকারীর মাল নিজের মাল অপেক্ষা বেশী প্রিয় হয়?' জনগণ বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি তো দেখেছি যে, তোমরাই তোমাদের নিজস্ব মাল অপেক্ষা তোমাদের উত্তরাধিকারীদের মালকেই বেশী পছন্দ করছো! কেননা, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নিজস্ব মালতো ওটাই যা তোমরা, তোমাদের জীবদ্ধশায় আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করে থাক এবং যা তোমরা ছেড়ে যাও তা তো তোমাদের মাল নয়, বরং তোমাদের উত্তরাধিকারীদের মাল। তাহলে তোমাদের আল্লাহ পাকের পথে খরচ কর করা এবং জমা বেশী রাখা ওরই প্রমাণ যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের মাল অপেক্ষা উত্তরাধিকারীদের মালকেই বেশী ভালবাস।' অতঃপর তিনি বলেনঃ 'তোমরা কোন্ লোককে বীর পুরুষ মনে কর?' জনগণ বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ ব্যক্তিকে (আমরা বীর পুরুষ মনে করি) যাকে কেউ মল্লযুদ্ধে নীচে ফেলতে পারে না।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'না, বরং প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী বীর পুরুষ ঐ ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সামলিয়ে নিতে পারে।' তারপরে তিনি বলেনঃ 'তোমরা নিঃসন্তান কাকে বল?' জনগণ বলেনঃ 'যাদের কোন সন্তান-সন্ততি নেই।' তিনি বলেনঃ 'না, বরং নিঃসন্তান ঐ ব্যক্তি যার সামনে তার কোন সন্তান মারা যায়নি।' (সহীহ মুসলিম), একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ 'দরিদ্র কে তোমরা জান কি?' সাহাবীগণ বলেনঃ 'যার কোন ধন-সম্পদ নেই।' তিনি বলেনঃ 'না, বরং ঐ ব্যক্তি দরিদ্র যে নিজের জীবদ্ধশায় ঝীঘ মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করে না।' (মুসনাদ-ই-আহমাদ) হ্যরত হারেসা ইবনে কুদ্দামা সাদী (রাঃ) নবী (সঃ)-এর খিমতে হায়ির হ্যে আরয করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে কোন উপকারী কথা বলুন। তা যেন সংক্ষিপ্ত হয়, তাহলে আমি মনেও রাখতে পারবো।'

রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ ‘রাগ করো না।’ তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ উত্তরই দেন। কয়েকবার একই প্রশ্ন ও উত্তর হয়। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে কিছু উপদেশ দিন।’ তিনি বলেনঃ ‘রাগ করো না।’ তিনি বলেনঃ ‘আমি চিন্তা করে বুঝলাম যে, ক্রোধই হচ্ছে সমস্ত খারাপ ও অন্যায়ের মূল।’ (মুসনাদ-ই-আহমাদ) একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবু যর (রাঃ) একবার ক্রোধাভিত হয়ে বসে পড়েন এবং তার পরে শয়ে যান। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনেছি, তিনি বলেছেন ‘যার ক্রোধ হয় সে দাঁড়িয়ে থাকলে যেন বসে পড়ে তাতেও যদি ক্রোধ প্রশংসিত না হয় তবে যেন শয়ে পড়ে।’ (মুসনাদ-ই-আহমাদ) মুসনাদ-ই-আহমাদের আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, হযরত উরওয়া ইবনে মুহাম্মাদ (রঃ) একবার ক্রোধাভিত হন। তিনি অযু করতে বসে পড়েন এবং বলেনঃ আমি আমার শিক্ষকগণ হতে এ হাদীসটি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘ক্রোধ শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে এবং শয়তান অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, আর আগুনকে নির্বাপণকারী হচ্ছে পানি। সুতরাং তোমাদের ক্রোধ হলে অযু করতে বসে পড়।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এটাও ইরশাদ আছে যে, ‘যে ব্যক্তি কোন দরিদ্রকে অবকাশ দেয় কিংবা তার খণ ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করে থাকেন। হে জনমণ্ডলী! জেনে রেখো যে, জান্নাতের কাজ খুব কঠিন এবং জাহান্নামের কাজ সহজ। সৎ ঐ ব্যক্তি যে গঙ্গোল হতে বেঁচে যায়। কোন চুমুককে পান করে নেয়া অল্লাহ তা‘আলার ততো পছন্দনীয় নয় যতো পছন্দনীয় ক্রোধের চুমুককে পান করে নেয়া। এরপ ব্যক্তির অন্তরে স্টমান দৃঢ়ভাবে বসে যায়।’ (মুসনাদ-ই-আহমাদ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘যে ব্যক্তি ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা দমন করে রাখে আল্লাহ তা‘আলা তার অন্তরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা পূর্ণ করে দেন। যে ব্যক্তি জাঁকজমক পূর্ণ পোষাক পরিধানে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও বিনয় প্রকাশার্থে তা পরিত্যাগ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তাকে সম্মানের হল্লা (লুঙ্গী ও চাদর) পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি কারও রহস্য গোপন রাখবে, আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তাকে বাদশাহী মুকুট পরাবেন।’ (সুনানে আবি দাউদ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘যে ব্যক্তি ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা দমন করে, তাকে আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত মাখলুকের সামনে ডেকে অধিকার প্রদান করবেন যে, সে কোন হুরকে ইচ্ছে মত পছন্দ করতে পারে।’

(মুসনাদ-ই-আহমাদ) এ বিষয়ের আরও বহু হাদীস রয়েছে। সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ হলো এই যে, তাদের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় না এবং তাদের পক্ষ হতে লোকের প্রতি কোন অন্যায় হয় না। বরং তারা উভেজনাকে দমিয়ে রাখে। আর তারা আল্লাহকে ভয় করতঃ পুণ্যের আশায় সমস্ত কাজ আল্লাহ তা'আলার উপর সমর্পণ করে। তারা মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। আত্যাচারীদের অত্যাচারের প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করে না। একেই বলে অনুগ্রহ এবং এরপ অনুগ্রহশীল বান্দাকেই আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘তিনটি কথার উপর আমি শপথ গ্রহণ করছিঃ (১) সাদকা দ্বারা মাল হ্রাস পায় না, (২) মানুষের অপরাধ ক্ষমা করার মাধ্যমে মানুষের সম্মান বেড়ে যায় এবং (৩) আল্লাহ তা'আলা বিনয় প্রকাশকারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।’ মুসতাদরিক-ই-হাকীমে হাদীস রয়েছে, ‘যে ব্যক্তি চায় যে, তার ভিত্তি উঁচু হোক এবং মর্যাদা বেড়ে যাক তার জন্যে উচিত হবে যে, সে যেন অত্যাচারীদেরকে ক্ষমা করে দেয়, যারা দেয় না তাদেরকে প্রদান করে এবং আজীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের সাথে আজীয়তার বন্ধন যুক্ত করে।’ অন্য হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন এক আহবানকারী ডাক দিয়ে বলবেনঃ ‘হে জনগণকে ক্ষমাকারীগণ! তোমাদের প্রভুর নিকট এসো এবং স্বীয় প্রতিদান গ্রহণ কর। ক্ষমাকারী প্রত্যেক মুসলমানের জাল্লাতে যাওয়ার অধিকার রয়েছে।’ এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা পাপ কার্য করার পর তৎক্ষণাত আল্লাহ তা'আলাকে ক্ষরণ করে এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যখন কোন ব্যক্তি কোন পাপ কার্য করে, অতঃপর আল্লাহ পাকের সামনে হায়ির হয়ে বলেঃ ‘হে আমার প্রভু! আমার দ্বারা পাপকার্য সাধিত হয়েছে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।’ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘আমার বান্দা যদিও পাপকার্য করেছে, কিন্তু তার বিশ্বাস রয়েছে যে, তার প্রভু তাকে পাপের কারণে ধরতেও পারেন, আবার ক্ষমা করতেনও পারেন, আমি আমার ঐ বান্দার পাপ ক্ষমা করে দিলাম।’ সে আবার পাপ করে ও তাওবা করে, আল্লাহ তা'আলা এবারেও ক্ষমা করেন। সে তৃতীয়বার পাপ করে ও তাওবা করে, আল্লাহ পাক তৃতীয়বারও ক্ষমা করেন। সে চতুর্থবার পাপ করে ও তাওবা করে তখন আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করতঃ বলেনঃ ‘আমার বান্দা এখন যা ইচ্ছে আমল করুক।’ (মুসনাদ-ই-আহমাদ) এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমেও রয়েছে। হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ ‘আমরা একদা রাসূলুল্লাহ

(সঃ)-এর নিকট আরয করিঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যখন আমরা আপনাকে দর্শন করি তখন আমাদের অন্তরে ভাবাবেগের সৃষ্টি হয় এবং আমরা মুক্তাকী হয়ে যাই। কিন্তু যখন আপনার নিকট হতে চলে যাই তখন ঐ অবস্থা আর থাকে না, ছেলে মেয়েদের ফাঁদে পড়ে যাই এবং পারিবারিক কাজ কর্মে লেগে পড়ি।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ ‘জেনে রেখো, আমার নিকট অবস্থান কালে তোমাদের মনের অবস্থা যেমন থাকে, যদি সর্বদা একপ থাকতো তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের করমদ্রন করতেন এবং তোমাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য তোমাদের বাড়ীতেই আগমন করতেন। মনে রেখো, তোমরা যদি পাপ কর্ম না কর তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে নেবেন এবং অন্য এক সম্প্রদায়কে এখানে বসিয়ে দেবেন যারা পাপকার্য করবে, অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন।’ আমরা বলিঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! জান্নাতের ভিত্তি কিসের তৈরী তা আমাদেরকে বলুন।’ তিনি বলেনঃ ‘একটি সোনার ইট ও একটি চাঁদির ইট এবং ওর গারা (দেয়াল ইত্যাদি বাঁধবার জন্যে চুন, বালি ও মাটি পানিতে মিশিয়ে যে কাদা তৈরী করা হয়) খাঁটি মৃগনাভির। ওর পাথর মনি মুক্তার এবং মাটি হচ্ছে যাফরানের। জান্নাতের নিয়ামতরাজি কখনও শেষ হবে না। তথায় হবে চিরস্থায়ী জীবন। তথাকার অধিবাসীদের কাপড় কখনও পুরাতন হবে না। তাদের যৌবন ক্ষয় হবে না।’ তিনি ব্যক্তির প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় নাঃ (১) ন্যায় বিচারক বাদশাহ, (২) রোষাদার ব্যক্তি এবং (৩) অত্যাচারিত ব্যক্তি। তাদের প্রার্থনা মেঘে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং ওর জন্যে আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং মহান আল্লাহ ঘোষণা করেনঃ ‘আমার মর্যাদার শপথ! কিছু সময় পরে হলেও আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবো’। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) হ্যরত আবু বকর সিন্দীক (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘যে ব্যক্তি কোন পাপকার্য করার পর অযু করতঃ দুই রাকা‘আত নামায আদায় করে এবং পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, মহাসম্মানিত আল্লাহ তার পাপ মার্জনা করে দেন’। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আমীরুল্ল মুমিনীন হ্যরত উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে অযু করতঃ

اَشْهُدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهُدُ اَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

অর্থাৎ ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল’ পাঠ করে, তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হয়, সে যেটা দিয়ে ইচ্ছে ভেতরে প্রবেশ করবে।’ আমীরুল্ল মুমিনীন হ্যরত উসমান (রাঃ) সুন্নাত অনুযায়ী অযু করেন অতঃপর বলেনঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি আমার মত অযু করে, অতঃপর খাঁটি অঙ্গে দু’রাকা‘আত নামায আদায় করে, আল্লাহ তা‘আলা তার পাপ মার্জনা করে দেন’। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এটাই সেই কল্যাণময় আয়াত যা অবতীর্ণ হওয়ার সময় ইবলীস কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। (মুসনাদ-ই-আবদুর রায়্যাক) মুসনাদ-ই-আবু ইয়া’লার মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ﷺ ল্লাএ, প্রাপ্তি খুব বেশী করে পাঠ কর এবং সদা-সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক। ইবলীস পাপের মাধ্যমে মানুষকে ধ্বংস করতে চায় এবং তার নিজের ধ্বংস রয়েছে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ পাঠে ও ক্ষমা প্রার্থনায়। এ অবস্থা দেখে ইবলীস মানুষকে প্রবৃত্তির উপাসনায় নিষ্কেপ করেছে। সুতরাং মানুষ নিজেকে সঠিক পথের পথিক বলে মনে করে, অথচ সে ধ্বংসের পথে রয়েছে। কিন্তু এ হাদীসটির দু’জন বর্ণনাকারী দুর্বল। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ইবলীস বলেছিল, ‘হে আমার প্রভু! আপনার মার্যাদার শপথ! আমি আদম সন্তানকে তাদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করতে থাকবো।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেছিলেনঃ ‘আমার মাহাত্ম্য ও মর্যাদার শপথ! যে পর্যন্ত তারা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে সে পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষমা করতেই থাকবো।’ মুসনাদ-ই-বায়্যারে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি পাপকার্য করেছি।’ তিনি বলেনঃ ‘তাওবা কর।’ সে বলেঃ ‘আমি তাওবা করেছি, পরে আবার পাপকার্যে লিঙ্গ হয়ে পড়েছি।’ তিনি বলেনঃ ‘পুনরায় তাওবা কর।’ সে বলেঃ ‘আমার দ্বারা পুনরায় পাপকার্য সাধিত হয়েছে।’ তিনি বলেনঃ ‘পুনরায় তাওবা কর।’ সে বলেঃ ‘আমি আবার পাপকার্যে লিঙ্গ হয়ে পড়েছি।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ‘তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করতেই থাক, শেষ পর্যন্ত শয়তান পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে।’ এর পর বলা হচ্ছে- ‘পাপ মার্জনা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই রয়েছে।’ মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, একজন বন্দী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করতঃ বলেঃ ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হচ্ছি, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হচ্ছি না।’ রাসূলুল্লাহ

(সঃ) তখন বলেনঃ ‘সে প্রকৃত অধিকারীকেই অধিকার প্রদান করেছে।’ হঠকারিতা না করার ভাবার্থ এই যে, তাওবা না করেই সে পাপকার্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে না। কয়েকবার পাপকার্যে লিঙ্গ হয়ে পড়লে কয়েকবার ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। মুসনাদ-ই-আবু ইয়া’লার মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘ঐ ব্যক্তি হঠকারী নয় যে ক্ষমা প্রার্থনা করতেই থাকে যদিও তার দ্বারা দিনে সত্তরবারও পাপকার্য সাধিত হয়।’ এরপরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তারা জানে।’ অর্থাৎ তারা জানে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাওবা কবুলকারী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে-

الْمَعْلُومُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنِ الْبَادِئِينَ

অর্থাৎ ‘তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করে থাকেন?’ (১০৪: ১০৪) অন্য স্থানে রয়েছে- ‘যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ করে কিংবা নিজের জীবনের উপর অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল দয়ালু পাবে।’ মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিস্বরের উপর বর্ণনা করেনঃ হে জনমঙ্গলী! তোমরা অন্যদের উপর দয়া প্রদর্শন কর, আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। হে লোকসকল! তোমরা অন্যদের অপরাধ ক্ষমা কর, আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন। যারা কথা বানিয়ে বলে তাদের দুর্ভাগ্য এবং যারা পাপকার্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে তাদেরও দুর্ভাগ্য। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘তাদের ঐ সব সৎকার্যের পুরক্ষার হবে তাদের প্রভুর পক্ষ হতে মার্জনা, এমন উদ্যানসমূহ যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্নোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে; এবং কর্মীদের জন্যে কি সুন্দর প্রতিদান।’

### ১৩৭। নিচেই তোমাদের পূর্বে

আদর্শসমূহ অতিক্রান্ত হয়েছে;  
অতএব পৃথিবীতে বিচরণ কর,  
তৎপরে লক্ষ্য কর যে,  
অবিশ্বাসীদের পরিণাম ক্রিপ  
হয়েছে।

### ১৩৮। এটা মানবমঙ্গলীর জন্যে বিবরণ এবং ধর্মভীকুণ্ঠগণের জন্যে পথ-প্রদর্শক ও উপদেশ।

- ১৩৭  
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ  
وَرَبِّكُمْ  
سُنْنَ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ  
فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَايِقَةً  
الْمُكَذِّبِينَ ○

- ১৩৮  
هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى  
وَرُحْمَةٌ لِلْمُتَقِّينَ ○

১৩৯। আর তোমরা শৈথিল্য  
করো না ও বিষণ্ণ হয়ো না  
এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী  
হও, তবে তোমরাই সমুরত  
হবে।

১৪০। যদি তোমাদের আঘাত  
লেগে থাকে, তবে নিচয়ই  
সেই সম্প্রদায়ের তদ্বাপ  
আঘাত লেগেছে; এবং এ  
দিবসসমূহকে আমি  
মানবগণের মধ্যে পরিক্রমণ  
করাই; এবং যারা বিশ্বাস  
স্থাপন করেছে, তাদেরকে  
আল্লাহ এরূপে প্রকাশ করেন;  
এবং তোমাদের মধ্য হতে  
কতকগুলোকে শহীদরূপে  
গ্রহণ করবেন আর আল্লাহ  
অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন  
না।

১৪১। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন  
করেছে- তাদেরকে আল্লাহ  
এরূপে নির্মল করেন এবং  
অবিশ্বাসীদেরকে নিপাত  
করেন।

১৪২। তোমরা কি ধারণা করছো  
যে, তোমরাই জানাতে প্রবেশ  
করবে? অথচ যারা ধর্মযুদ্ধ  
করে ও যারা ধৈর্যশীল-  
আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে  
তাদেরকে এখনও প্রকাশ  
করেননি।

۱۴۹- وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزِنُوا  
وَانْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ  
مُّؤْمِنِينَ ۝

۱۴- إِنْ يَمْسِكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ  
مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ  
الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ  
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا  
وَيَتَخَذَ مِنْكُمْ شَهِادَةً وَاللَّهُ لَا  
يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝

۱۴۱- وَلِيُّمْحَصَ اللَّهُ الَّذِينَ  
أَمْنَوْا وَيَمْحَقَ الْكُفَّارِينَ ۝

۱۴۲- أَمْ حِسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا  
الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ  
الَّذِينَ جَهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ  
الصَّابِرِينَ ۝

১৪৩। এবং নিচয়ই তোমরা  
মৃত্যুর পূর্বেই ওর সাক্ষাৎ  
কামনা করছিলে, অনন্তর  
নিচয়ই তোমরা তা প্রত্যক্ষ  
করেছো এবং তোমরা  
অবলোকন করছো।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ  
الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ  
فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَإِنْ تَنْظُرُونَ  
১৪৩

যেহেতু উভদের যুদ্ধে সন্তুরজন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন, তাই আল্লাহ  
পাক মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়ে বলছেনঃ ‘তোমাদের পূর্ববর্তী  
ধর্মভীরু লোকদেরকেও জান ও মালের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু শেষ  
পর্যন্ত বিজয় লাভ তাদেরই হয়েছে। তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর  
প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করলেই তোমাদের উপর এ রহস্য উৎঘাটিত হয়ে যাবে।  
এ পবিত্র কুরআনের মধ্যে তোমাদের শিক্ষার জন্যে তোমাদের পূর্ববর্তী  
উত্থানের বর্ণনাও রয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের অন্তরের হিদায়াতের জন্যে এবং  
তোমাদেরকে ভাল-মন্দ সম্বন্ধে সজাগকারী এ কুরআন পাকই বটে।’  
মুসলমানদেরকে ঐ ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে আরও বেশী  
সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলছেন— ‘তোমরা এ যুদ্ধের ফলাফল দেখে মন খারাপ  
করো না এবং চিন্তিত হয়ে বসে পড়ো না। এ যুদ্ধে যদি তোমরা আহত হয়ে  
থাক এবং তোমাদের লোক শহীদ হয়ে থাকে তাতে কি হয়েছে; কেননা, এর  
পূর্বে তো তোমাদের শক্রোও আহত ও নিহত হয়েছিল। এরূপ উত্থান-পতন  
তো পৃথিবীতে চলেই আসছে। হ্যাঁ, তবে প্রকৃত কৃতকার্য ওরাই যারা পরিণামে  
বিজয়ী হয়, আর আমি তো তোমাদের জন্যে এ বিজয় নির্দিষ্ট করেই রেখেছি।  
তোমাদের কোন কোন বারে পরাজয় এবং বিশেষ করে এ উভদ যুদ্ধের  
পরাজয়ের কারণ ছিল তোমাদের মধ্যকার দৈর্ঘ্যশীল ও অদৈর্ঘ্যশীলদেরকে পরীক্ষা  
করা। আর যারা বহুদিন হতে শাহাদাত লাভের আকাংখা ছিল তাদের আকাংখা  
পূর্ণ করাও ছিল একটি কারণ। তারা যেন স্বীয় জান ও মাল আমার পথে ব্যয়  
করার সুযোগ লাভ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন  
না। এর আরও কারণ এই যে, ঈমানদারদের পাপ থাকলে তা মোচন হয়ে  
যাবে, আর পাপ না থাকলে তাদের মর্যাদা বেড়ে যাবে এবং এর দ্বারা  
কাফিরদেরকে ধ্বংস করারও উদ্দেশ্য রয়েছে। কেননা, তারা বিজয়ী হয়ে গর্বিত  
হয়ে যাবে এবং তাদের অবাধ্যতা ও অহংকার আরও বৃদ্ধি পাবে। আর এটাই  
তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং শেষে তারা সমূলে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।  
এসব কঠিন বিপদ-আপদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কেউ জান্নাত লাভ করতে  
পারে না।’ যেমন সূরা-ই-বাকারায় রয়েছে— ‘তোমরা কি এটা জান যে,

তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে যেভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল সেভাবে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না এবং তোমরা জান্নাতে চলে যাবে? এটা হতে পারে না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে-

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمْنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔

অর্থাৎ 'মানুষ' কি মনে করেছে যে, তারা-'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না'? (২৯: ২) এখানেও ঐ কথাই বলা হচ্ছে যে, যে পর্যন্ত ধৈর্যশীলদেরকে জানা না যায়, অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে প্রকাশিত না হয় সে পর্যন্ত তারা জান্নাত লাভ করতে পারে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তোমরা এর পূর্বে তো এরূপ সুযোগেরই আকাঙ্খা করছিলে যে, নিজেদের ধৈর্য ও দৃঢ়তা মহান আল্লাহকে প্রদর্শন করবে এবং তাঁর পথে শাহাদাত বরণ করবে। কাজেই এস, আমি তোমাদেরকে ঐ সুযোগ প্রদান করলাম, তোমরা এখন তোমাদের দুঃসাহস ও দৃঢ়তা প্রদর্শন কর।' হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমরা শক্রদের সম্মুখীন হওয়ার আকাঙ্খা করো না, আল্লাহ তা'আলা'র নিকট নিরাপত্তার জন্যে প্রার্থনা কর এবং যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হও তখন লৌহস্তম্ভের মত অটল ও স্থির থাক এবং জেনে রেখো যে, জান্নাত তরবারীর ছায়ার মীচে রয়েছে।' এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'তোমরা স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখেছ যে, তরবারী কচ্চক শব্দ করছে, বর্ণ তীব্র বেগে বের হচ্ছে, তীর বর্ষিত হচ্ছে, ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে এবং এদিকে-ওদিকে মৃতদেহ পড়তে রয়েছে।'

১৪৪। এবং মুহাম্মাদ রাসূল  
ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই  
তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত  
হয়েছে, অনন্তর যদি তার  
মৃত্যু হয় অথবা সে নিহত  
হয়, তবে কি তোমরা  
পশ্চাদপদে ফিরে যাবে? এবং  
যে কেউ পশ্চাদপদে ফিরে  
যায়, তাতে সে আল্লাহর  
কোনই অনিষ্ট করবে না এবং  
আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার  
প্রদান করেন।

١٤٤ - وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ  
إِفَاءً إِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ  
عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ  
عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يُضْرِبَ اللَّهُ  
شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ  
الشَّكِيرِينَ ۝

১৪৫। আর আল্লাহর আদেশে  
লিপিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত  
কেউই মৃত্যুমুখে পতিত হয়  
না; এবং যে কেউ দুনিয়ার  
প্রতিদান কামনা করে, আমি  
তাকে তা হতেই প্রদান করি  
এবং যে কেউ পরকালের  
প্রতিদান কামনা করে, আমি  
তাকে তা হতেই প্রদান করে  
থাকি; এবং আমি কৃতজ্ঞগণকে  
অচিরেই পুরস্কার প্রদান  
করবো ।

১৪৬। আর এমন নবীগণ ছিল-  
যাদের সহযোগে থভুভক্ত  
লোকেরা যুদ্ধ করেছিল; পরন্তু  
আল্লাহর পথে যা সংঘটিত  
হয়েছিল তাতে তারা  
নিরুৎসাহ হয়নি ও শক্তিহীন  
হয়নি এবং বিচলিত হয়নি;  
এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলগণকে  
ভালবাসেন ।

১৪৭। আর এতদ্ব্যতীত তাদের  
কথা ছিল না যে, তারা  
বলতো- হে আমাদের  
প্রতিপালক! আমাদের জন্যে  
আমাদের অপরাধ ও  
আমাদের অপচয়সমূহ ক্ষমা  
করুন ও আমাদের চরণসমূহ  
সুদৃঢ় করুন এবং  
অবিশ্বাসীদের উপর  
আমাদেরকে সাহায্য করুন ।

١٤٥- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ  
تُمْوَتِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَبًا  
مُؤْجَلاً وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا  
نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ  
الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجِزِي  
الشَّكِّرِينَ ۝

١٤٦- وَكَانَ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ  
مَعَهُ رِسُولُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهْنَوْا  
لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا  
وَاللَّهُ يَحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝

١٤٧- وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ  
قَالُوا رَبَّنَا أَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا  
وَاسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ  
أَقْدَامَنَا وَانْصَرَنَا عَلَى الْقَوْمِ  
الْكَفِرِينَ ۝

১৪৮। অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে  
পার্থিব পুরস্কার প্রদান করলেন  
এবং পরকালের পুরস্কার  
শ্রেষ্ঠতর; এবং আল্লাহ  
সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।

১৪৮ - فَاتِّهِمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدِّنِيَا  
وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ  
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٤٨  
১৫  
১৫

উভদ প্রান্তরে মুসলমানগণ পরাজিতও হয়েছিলেন এবং তাঁদের কিছু সংখ্যক লোক শহীদও হয়েছিলেন। সেদিন শয়তান এও প্রচার করেছিল যে, মুহাম্মাদও (সঃ) শহীদ হয়েছেন। আর এদিকে ইবনে কামিআ' নামক একজন কাফির মুশরিকদের মধ্যে প্রচার করে-'আমি মুহাম্মাদ (সঃ)-কে হত্যা করে আসছি।' প্রকৃতপক্ষে শয়তানের কথা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুজব এবং এ উক্তিও মিথ্যা ছিল। সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আক্রমণ করেছিল বটে কিন্তু তাতে শুধুমাত্র তাঁর চেহারা মুবারক কিছুটা আহত হয়েছিল, তাছাড়া আর কিছুই নয়। এ মিথ্যা সংবাদে মুসলমানদের মন ভেঙ্গে যায়, তাঁদের পা টলে যায় এবং তাঁরা হতবুদ্ধি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে হতে পলায়নে উদ্যত হন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয় যে, পূর্বের নবীদের মত মুহাম্মাদও (সঃ) একজন নবী। হতে পারে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হবেন কিন্তু আল্লাহ পাকের দ্বীন দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করবে না। একটি বর্ণনায় রয়েছে, একজন মুহাজির একজন আনসারীকে উহুদের যুদ্ধে দেখেন যে, তিনি আহত হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছেন এবং রক্ত ও মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। তিনি উক্ত আনসারী (রাঃ)-কে বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে শহীদ হয়েছেন তা কি আপনি জানেন?' তিনি উত্তরে বলেনঃ 'যদি এ সংবাদ সত্য হয় তবে তিনি তাঁর কাজ করে গেছেন। এখন আপনারা সবাই তাঁর ধর্মের উপর নিজেদের জীবন কুরবান করুন।' এ সমক্ষেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শাহাদাত বা মৃত্যু এমন কিছু নয় যে, তোমরা আল্লাহ পাকের ধর্ম হতে পশ্চাদপদে ফিরে যাবে এবং যে এভাবে ফিরে যাবে সে মহান আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদেরকেই উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন যারা তাঁর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তাঁর ধর্মের সাহায্যের কার্যে লেগে পড়ে ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অনুসরণে সুদৃঢ় থাকে-রাসূলুল্লাহ (সঃ) জীবিত থাকুন আর নাই থাকুন।' সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর

ইন্তেকালের সংবাদ শুনে হ্যরত আবু বকর (রাঃ) ঘোড়ায় চড়ে আগমন করেন এবং মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করতঃ জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। অতঃপর কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করেন। এখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হিবরার চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল। তিনি পবিত্র মুখমণ্ডল হতে চাদর সরিয়ে স্বতঃকৃতভাবে চুম্বন দান করেন এবং কান্না বিজড়িত কষ্টে বলেনঃ ‘আমার পিতা-মাতা তাঁর প্রতি উৎসর্গ হোক। আল্লাহ তা‘আলার শপথ! তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর দু’বার মৃত্যু দিতে পারেন না। যে মৃত্যু তাঁর জন্যে নির্ধারিত ছিল তাঁর উপর এসে গেছে।’ এরপর তিনি পুনরায় মসজিদে আগমন করেন এবং দেখেন যে, হ্যরত উমার (রাঃ) ভাষণ দিচ্ছেন। তিনি তাঁকে বলেনঃ ‘নীরবতা অলস্বন করুন।’ তাঁকে নীরব করে দিয়ে তিনি জনগণকে সঙ্গে সঙ্গে সম্মোহন করে বলেনঃ ‘যে ব্যক্তি হ্যরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপাসনা করতা সে যেন জেনে নেয় যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করতো সে যেন সন্তুষ্ট থাকে যে, আল্লাহ পাক জীবিত আছেন। মৃত্যু তাঁর উপর পতিত হয় না।’ অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। জনগণের অনুভূতি এই হয় যে, আয়াতটি যেন তখনই অবরীণ হলো। তখন তো প্রত্যেকের মুখেই আয়াতটি উচ্চারিত হলো এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সঃ) আর এ জগতে নেই। হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর মুখে এ আয়াতটির পাঠ শ্রবণ করে হ্যরত উমার (রাঃ)-এর চরণযুগল যেন ভেঙ্গে পড়লো। তাঁরও পূর্ণ বিশ্বাস হলো যে, প্রিয় নবী হ্যরত মুহাম্মদ (সঃ) এ নশ্বর জগত হতে বিদায় গ্রহণ করেছেন। হ্যরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবন্দশাতেই বলতেনঃ ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ) মৃত্যুবরণ করলে বা শহীদ হলে আমরা ধর্মত্যাগী হবো না। আল্লাহর শপথ! যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিহত হন তবুও আমরা তাঁর ধর্মের উপরেই আমরণ প্রতিষ্ঠিত থাকবো। আল্লাহর কসম! আমি তো তাঁর বক্তু ও চাচাতো ভাই এবং তাঁর উত্তরাধিকারী, তাঁর আমার চেয়ে বড় হকদার আর কে হবে?’

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক তার উপর নির্ধারিত সময় পূর্ণ করার পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে থাকে।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে- ‘কারও বয়স বৃদ্ধি করা হয় না বা কারও বয়স হ্রাস করা হয় না, বরং সব কিছুই আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে।’ অন্য স্থানে রয়েছে- ‘তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে মৃত্যিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি সময় পূর্ণ করেছেন এবং মৃত্যু নির্ধারিত করেছেন।’ উপরোক্ত আয়াতে কাপুরুষ লোকদেরকে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, বীরত্ব

প্রকাশের কারণে বয়স হ্রাস পায় না, আর কাপুরুষতা প্রদর্শন করতঃ জিহাদ হতে সরে থাকার ফলে বয়স বৃদ্ধি প্রাপ্তও হয় না। মৃত্যু তো নির্ধারিত সময়ে আসবে, মানুষ হয় বীরত্বের সাথে জিহাদে যোগদান করুক বা ভীরুতা প্রদর্শন করে জিহাদ হতে সরেই থাকুক। হ্যরত হাজার ইবনে উদ্দী (রাঃ) ধর্মীয় শক্রদের সম্মুখীন হতে গিয়ে টাইগ্রীস নদীর তীরে উপস্থিত হন। সেনাবাহিনী হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে যান। সে সময় তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ ‘নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কেউই মারা যায় না। এসো, এ টাইগ্রীস নদীতেই ঘোড়া নিষ্কেপ কর।’ একথা বলেই তিনি টাইগ্রীস নদীর মধ্যে ঘোড়া নিষ্কেপ করেন। তাঁর দেখাদেখি অন্যেরাও নিজ নিজ ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দেন। এ দৃশ্য দেখে ভয়ে শক্রদের রক্ত শুকিয়ে যায় এবং তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। তারা পরম্পর বলাবলি করে— এরা তো পাগল। এরা সমুদ্রের তরঙ্কেও ভয় করে না। কাজেই চল আমরা পলায়ন করি। অতএব তারা সবাই পালিয়ে যায়।

এর পরে ইরশাদ হচ্ছে—‘যার কার্য শুধুমাত্র দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যেই সাধিত হয়ে থাকে সে তার ভাগ্যের নির্ধারিত অংশ পেয়ে যায় বটে, কিন্তু পরকালে সে একেবারে শূন্য হস্ত হয়ে যায়। আর পরকাল লাভের যার উদ্দেশ্য থাকে সে পরকাল তো পায়ই, এমনকি দুনিয়াতেও সে তার ভাগ্যের নির্ধারিত অংশ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।’ যেমন অন্য স্থানে রয়েছে—‘পরকালের ক্ষেত্র যাঞ্চাকারীকে আমি আরও বেশী দিয়ে থাকি। আর ইহকালের ক্ষেত্র যাঞ্চাকারীকে আমি তা প্রদান করি বটে, কিন্তু পরকালে তার জন্যে কোনই অংশ নেই।’ আর এক জায়গায় রয়েছে—‘যে ব্যক্তি শুধুমাত্র দুনিয়াই চায়, আমি তাদের মধ্যে যাকে চাই এবং যে পরিমাণ চাই দুনিয়া প্রদান করি; অতঃপর সে জাহান্নামী হয়ে যায় এবং লাঙ্গলা ও অপমানের সঙ্গে তথায় গমন করে; আর যে পরকাল চায় এবং দ্বিমানদার হয়, তাদের চেষ্টা আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রশংসনীয় হবে।’ এজন্যেই এখানেও আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘আমি কৃতজ্ঞদেরকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকি।’ এরপর আল্লাহ তা‘আলা উভদ যুদ্ধের মুজাহিদগণকে সম্মোধন করে বলেন—‘ইতিপূর্বেও বহু নবী তাঁদের দলবল নিয়ে ধর্মদ্বারাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তোমাদের মতই তাদেরকেও বহু বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু তথাপি তাঁরা দৃঢ়চিত্ত, ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞই রয়েছিলেন। তাঁরা অলস ও দুর্বল হননি এবং ঐ ধৈর্যের বিনিময়ে তাঁরা আল্লাহ পাকের ভালবাসা ক্রয় করে নিয়েছিলেন।’ একটি অর্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে, ‘হে উহুদের যোদ্ধাগণ! মুহাম্মাদ (সঃ) শহীদ হয়েছেন, এ সংবাদ শুনে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলছ

কেন? অথচ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীগণের (আঃ) শাহাদাত লক্ষ্য করেও সাহস হারাও হয়নি বা পিছনে সরেও যায়নি, বরং তারা আরও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে। এত বড় বিপদেও তাদের পা টলমলিয়ে যায়নি এবং তারা দুঃখের ভারে ভেঙ্গেও পড়েনি। অতএব রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে তোমাদের এত মুষড়ে পড়া মোটেই উচিত হয়নি।’ (رَسِّيْنَ) শব্দটির বহু অর্থ এসেছে—যেমন জ্ঞানবান, সৎ ধর্মভীকু, সাধক, নির্দেশ পালনকারী ইত্যাদি। কুরআন কারীম সেই বিপদের সময় তাদের প্রার্থনা নকল করেছেন। এরপর আল্লাহ পাক বলেছেন যে, তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং এর সাথে সাথে তাদের জন্যে পারলৌকিক পুরস্কারও বিদ্যমান রয়েছে, আর পরকালের পুরস্কার দুনিয়ার পুরস্কার অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয়। এ সৎ কর্মশীল লোকেরা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা।

### ১৪৯। হে মুমিনগণ! যারা

অবিশ্বাস করেছে—যদি তোমরা তাদের আজ্ঞাবহ হও, তবে তারা তোমাদেরকে পশ্চাদপদে ফিরিয়ে নেবে, তাতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থত্যাবর্তিত হবে।

### ১৫০। বরং আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম সাহায্যকারী।

১৫১। যারা অবিশ্বাস করেছে, আমি সত্ত্ব তাদের অন্তরে তীক্ষ্ণ সংঘার করবো, যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে সেই বিষয়ের অংশী স্থাপন করেছে যদিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ অবতারণ করেননি এবং জাহানাম তাদের অবস্থান স্থল এবং উটা অত্যাচারীদের জন্যে নিকৃষ্ট বাসস্থান।

— ১৪৯ —  
يَا يَهُهَا إِلَّذِينَ أَمْنَوْا إِنْ

تُطِيعُونَا إِلَّذِينَ كَفَرُوا يَرْدُوكُمْ  
عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقِلُبُوا

خَسِّيْنَ ০

— ১৫০ —  
لَمْ يَلِدْ اللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ

خَيْرُ النَّصَرِيْنَ ০

— ১৫১ —  
سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ

كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ  
مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَنًا وَمَا وَهُمْ

النَّارَ وَيَئْسَ مَثْوَى الظَّلَمِيْنَ ০

১৫২। আর নিচয়ই আল্লাহ  
তোমাদের জন্যে স্বীয়  
অঙ্গীকার সত্য করেছেন—  
যখন তাঁর আদেশে তোমরা  
তগ্নোদয়ম না হওয়া পর্যন্ত  
কলহ করছিলে এবং অবাধ্য  
হয়েছিলে; তৎপর তোমরা যা  
ভালবেসেছিলে, তা তিনি  
তোমাদেরকে প্রদর্শন করলেন;  
তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ  
পৃথিবী কামনা করছিলে;  
তৎপর তিনি তোমাদেরকে  
পরীক্ষার জন্যে বিরত করলেন  
এবং নিচয়ই তোমাদেরকে  
ক্ষমা করলে; এবং  
আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি  
অনুগ্রহশীল।

১৫৩। আর যখন তোমরা  
আরোহণ করে যাচ্ছিলে এবং  
কানও দিকে ফিরেও দেখছিলে  
না ও রাসূল তোমাদেরকে  
পশ্চাদ হতে আহবান করছিল;  
অনন্তর তিনি তোমাদেরকে  
দুঃখের উপর দুঃখ প্রদান  
করলেন, কিন্তু যা অতিক্রান্ত  
হয়েছে এবং তোমাদের উপর  
যা উপনীত হয়নি তোমরা  
তজ্জন্যে দুঃখ করো না; এবং  
তোমরা যা করছো— আল্লাহ  
তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।

— ১৫২ —  
وَلَقَدْ صَدَقْتُمُ اللَّهَ وَعِدَتُمْ  
إِذْ تَحْسُنُونَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ  
إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي  
الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا  
أَرِكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مِّنْ  
شَيْءٍ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مِّنْ يُرِيدُ  
الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفْتُمْ عَنْهُمْ  
لِبَتْلِيْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ  
وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَىٰ  
الْمُؤْمِنِينَ ۝

— ১৫৩ —  
إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ  
عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ  
فِي أَخْرِيْكُمْ فَاثَابُكُمْ غَمَّاً  
يُغَمِّ لِكِيلًا تَحْزِنُوا عَلَىٰ مَا  
فَاتَّكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ  
خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে কাফির ও মুনাফিকদের কথা মান্য করতে নিষেধ করছেন এবং বলছেন, 'যদি তোমরা তাদের কথামত চল তবে তোমরা ইহকালে ও পরকালে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। তাদের চাহিদা তো এই যে, তারা তোমাদেরকে দ্বীন ইসলাম হতে ফিরিয়ে দেয়'। অতঃপর তিনি বলেন, আমাকেই তোমরা তোমাদের প্রভু ও সাহায্যকারী রূপে মেনে নাও, আমার সাথেই ভালবাসা স্থাপন কর, আমার উপরেই নির্ভর কর এবং একমাত্র আমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর।'

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'ঐ দুষ্টদের দুষ্টামির কারণে আমি তাদের অন্তরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে দেবো।' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হ্যরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমাকে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্ববর্তী কোন নবী (আঃ)-কে দেয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত ভক্তিযুক্ত ভয় দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্যে ভূমিকে মসজিদ ও অযুর জন্যে পবিত্র করা হয়েছে। (৩) আমার জন্যে যুদ্ধলক্ষ মাল হালাল করা হয়েছে। (৪) আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নবীকে বিশেষ করে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু আমার নবুওয়াতকে সারা জগতের জন্যে সাধারণ করা হয়েছে।' মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে সমস্ত নবী (আঃ)-এর এবং কোন কোন বর্ণনায় আছে, সমস্ত উশ্মতের উপর চারটি মর্যাদা দান করেছেন- (১) আমাকে সারা জগতের নবী করে প্রেরণ করা হয়েছে। (২) আমার উশ্মতের জন্যে সমস্ত ভূমিকে মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে। যেখানেই নামাযের সময় হয়ে যাবে সেই জায়গাটাই তাদের জন্যে মসজিদ ও অযুর স্থান। (৩) আমার শক্ত আমা হতে এক মাসের পথের ব্যবধানে থাকলেও আল্লাহ পাক তার অন্তর আমার ভয়ে কাঁপিয়ে তুলবেন। (৪) আমার জন্যে যুদ্ধলক্ষ মাল বৈধ করা হয়েছে।' অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'প্রত্যেক শক্তর অন্তরে ভীতি উৎপাদন দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।' মুসনাদ-ই-আহমাদের অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমাকে পাঁচটি জিনিস প্রদান করা হয়েছেঃ (১) আমি প্রত্যেক লাল ও সাদার নিকট প্রেরিত হয়েছি। (২) আমার জন্যে সমস্ত যমীনকে মসজিদ ও অযুর জন্যে পবিত্র করা হয়েছে। (৩) আমার জন্যে যুদ্ধলক্ষ মালকে বৈধ করা হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীর জন্যে বৈধ করা হয়নি। (৪) এক মাসের রাস্তা

পর্যন্ত (শক্রের অন্তরে) ভীতি উৎপাদন দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (৫) আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সমস্ত নবী সুপারিশ চেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমি আমার উম্মতের ঐ সব লোকের জন্যে সুপারিশ গোপন রেখেছি যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করেনি। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ ‘আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ভীতি উৎপাদন করেছেন, সুতরাং তিনি যুদ্ধ হতে ফিরে গেলেন।’ এরপরে ইরশাদ হচ্ছে— ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্যে স্বীয় অঙ্গীকার সত্য করেছেন।’ এর দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, এ অঙ্গীকার ছিল উভদের যুদ্ধে। শক্রদের সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার, তথাপি তাদের চরণসমূহ টলে যায় এবং মুসলমানেরা বিজয় লাভ করে। কিন্তু আবার তীরন্দাজদের অবাধ্যতার কারণে এবং কয়েকজনের কাপুরুষতা প্রদর্শনের ফলে শর্তের উপর যে অঙ্গীকার ছিল তা উঠিয়ে নেয়া হয়। তাই আল্লাহ পাক বলেন, ‘তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে। প্রথম দিনেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করেন। কিন্তু তোমরা তীরতা প্রদর্শন করলে এবং নবী (সঃ)-এর অবাধ্য হয়ে গেলে ও তাঁর নির্দেশিত স্থান হতে সরে পড়লে, আর পরম্পর মতভেদ সৃষ্টি করলে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস প্রদর্শন করেছিলেন। অর্থাৎ তোমরা স্পষ্টভাবে বিজয়ী হয়েছিলে। গন্নিমতের মাল তোমাদের চক্ষের সামনে বিদ্যমান ছিল। শক্ররা পৃষ্ঠ প্রদর্শনের উপক্রম করেছিল। কাফিরদের পরাজয় দেখে নবী (সঃ)-এর নির্দেশ ভুলে গিয়ে তোমাদের কেউ কেউ দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে গন্নিমতের মালের প্রতি ঝাপিয়ে পড়ে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সৎ নিয়াতের অধিকারী এবং পরকালের আকাঞ্চী থাকলেও কতগুলো লোকের অবাধ্যতার কারণে কাফিরদের সুযোগ এসে পড়ে এবং তোমাদের পূর্ণ পরীক্ষা হয়ে যায় যে, তোমরা বিজয় লাভের পরেও পরাজিত হয়ে যাও। কিন্তু এর পরেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কেননা, তিনি জানেন যে, স্পষ্টতঃই তোমরা সংখ্যা ও আসবাবপত্রে খুবই নগণ্য ছিলে।’ ভুল মার্জনা হওয়াও **عَفَا عَنْكُمْ**-এর অন্তর্ভুক্ত। আর ভাবার্থ এও হতে পারে যে, এভাবে কিছু মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে শাহাদাত দানের পর তিনি স্বীয় পরীক্ষা উঠিয়ে নেন এবং অবশিষ্টকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসী লোকদের প্রতিই অনুগ্রহ ও করুণা বর্ণণ করে থাকেন। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে উভদের যুদ্ধে যত সাহায্য করা হয়েছিল তত সাহায্য

অন্য কোন যুদ্ধে করা হয়নি। এই সম্বন্ধেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘আল্লাহ স্বীয় অঙ্গীকার তোমাদের জন্যে সত্য করেছেন, কিন্তু তোমাদের কর্মদোষের কারণেই ফল উল্টো হয়ে যায়।’ কোন কোন লোক দুনিয়ালোভী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অবাধ্য হয়ে যায়, অর্থাৎ কয়েকজন তীরন্দাজ, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পর্বত ঘাঁটিতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন—‘এখান হতে তোমরা শক্রদের গতিবিধি লক্ষ্য কর যে, তারা যেন আমাদের পিছনের দিক দিয়ে আসতে না পারে, যদি তোমরা দেখ যে, আমরা পরাজিত হয়ে চলেছি তবুও তোমরা স্বীয় স্থান হতে সরে যেয়ো না। আর যদি তোমরা দেখতে পাও যে, সবদিক দিয়েই আমরা জয়যুক্ত হয়েছি, তবুও তোমরা গনীমত লুটের উদ্দেশ্যে স্বীয় জায়গা পরিত্যাগ করো না।’ যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিজয় লাভ করেন তখন তীরন্দাজগণ তাঁর নির্দেশ পরিবর্তন করে এবং তারা তাদের স্থান ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হয় ও গনীমতের মাল জমা করতে আরম্ভ করে। পর্বত ঘাঁটি শূন্য পেয়ে মুশরিকরা পলায়ন বক্ষ করে এবং ভাবনা চিন্তা করে এ জায়গায় আক্রমণ চালিয়ে দেয়। যে কয়েকজন মুসলমান তখনও তথায় স্থির ছিলেন তাঁরা শহীদ হয়ে যান। তখন তারা পিছন দিক থেকে মুসলমানদেরকে তাদের অঙ্গাতে এমন ভীষণভাবে আক্রমণ করে যে, মুসলমানদের চরণসমূহ টলটলায়মান হয়ে যায় এবং প্রথম দিনের বিজয় লাভ পরাজয়ে পরিবর্তিত হয়। অতঃপর এ গুজব ছাড়িয়ে পড়ে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) শহীদ হয়েছেন এবং যুদ্ধের পরিস্থিতি মুসলমানদের মনে এর বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়। অল্পক্ষণ পরেই মুসলমানদের দৃষ্টি তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে পতিত হয় তখন তাঁরা সমস্ত বিপদ ভুলে যান এবং আনন্দের আতিশয্যে তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ দিকে আসছিলেন এবং বলছিলেনঃ ‘এই লোকদের উপর আল্লাহর কঠিন ক্রোধ বর্ষিত হোক যারা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর চেহারা রক্ষাকৃত করে দিয়েছে। তাদের কোনই অধিকার ছিল না যে, এভাবে তারা আমাদের উপর জয়যুক্ত হতে পারে।’ বর্ণনাকারী বলেনঃ অল্পক্ষণ পরেই আমরা শনি যে, আবু সুফিয়ান পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে বলছেন, ‘হে হোবল! আপনার মস্তক উন্নত হোক, হে হোবল! আপনার মস্তক উন্নত হোক। আবু বকর কোথায়? উমার কোথায়?’ হ্যরত উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘আমাকে অনুমতি হলে আমি তাকে উত্তর দেই।’ তিনি অনুমতি দেন। হ্যরত উমার (রাঃ) তখন উত্তরে বলেনঃ **‘أَعْلَى اللَّهُ أَعْلَى’** অর্থাৎ ‘আল্লাহই সর্বোচ্চ ও মহাসম্মানিত,

আল্লাহই সর্বোচ্চ ও মহাসম্মানিত’। আবু সুফইয়ান জিজ্ঞেস করেনঃ ‘বল মুহাম্মদ (সঃ) কোথায়? আবু বকর কোথায়? উমার (রাঃ) কোথায়?’ তিনি বলেন, ‘এই তো এখানেই রাসূলুল্লাহ (সঃ), ইনিই হচ্ছেন হযরত আবু বকর (রাঃ), আর আমিই হচ্ছি উমার।’ আবু সুফইয়ান তখন বলেনঃ ‘এটা বদরের যুদ্ধেরই প্রতিশোধ। এভাবেই রৌদ্র ও ছায়া পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যুদ্ধের দৃষ্টান্ত তো কৃপের বালতির ন্যায়।’ হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ ‘এটা সমান কথনই নয়। তোমাদের নিহত ব্যক্তিরা জাহানামে গিয়েছে এবং আমাদের শহীদগণ জান্নাতে গিয়েছেন।’ আবু সুফইয়ান তখন বলেনঃ ‘যদি এটাই হয় তবে তো অবশ্যই আমরা ক্ষতির মধ্যে রয়েছি। জেনে রেখো, তোমাদের নিহত ব্যক্তিদের কতগুলোকে তোমরা নাক কান কর্তিতও পাবে। আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের এটা অভিমত ছিল না বটে, তবে এটা আমাদের নিকট মন্দ বলেও মনে হয়নি।’ এ হাদীসটি গারীব এবং এ গল্পটিও বিশ্বয়কর। এটা হযরত ইবনে আবুবাস (রাঃ) হতে মুরসালাজুপে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনিও তাঁর পিতা কেউই উহুদের যুদ্ধে বিদ্যমান ছিলেন না। মুসতাদিরিক-ই-হাকিমের মধ্যেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম এবং বায়হাকী (রাঃ)-এর মধ্যেও এটা বর্ণিত আছে। তাছাড়া বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে এর কতক অংশের সত্যতার সাক্ষ্য বিদ্যমান। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ ‘উহুদের যুদ্ধের দিন স্ত্রীলোকেরা মুসলমান সৈনিকদের পিছনে অবস্থান করছিলেন এবং আহতদের দেখাশুনা করছিলেন। আমার তো পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, সেদিন আমাদের কেউই দুনিয়া লিঙ্গু ছিলেন না। বরং সেদিন যদি আমাকে ঐ কথার উপর শপথ করানো হতো তবে আমি শপথ করতাম।’ কিন্তু কুরআন কারীমে ‘<sup>أَنْكُمْ مِنْ بَرِيدِ الدُّنْيَا</sup>’ অর্থাৎ ‘তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ দুনিয়া লিঙ্গুও ছিল’ এ আয়াতটি অবর্তীণ হয়। যখন সাহাবীগণ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশের বিপরীত কার্য সাধিত হয় এবং তাঁর অবাধ্যতা প্রকাশ পায় তখন তাঁদের পদসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে টলায়মান হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে শুধুমাত্র সাতজন আনসারী এবং দু’জন মুহাজির অবশিষ্ট থাকেন। যখন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে চতুর্দিক থেকে ঘিরে নেয় তখন তিনি বলেনঃ ‘আল্লাহ তা’আলা ঐ ব্যক্তির উপর করুণা বর্ষণ করবেন যে তাদেরকে সরিয়ে দেবে।’ এ কথা শুনে একজন আনসারী দাঁড়িয়ে যান এবং একাকী অত্যন্ত বীরত্বের সাথে শক্তর মোকাবিলা করেন। কিন্তু শেষে তিনি শহীদ হয়ে যান। আবার কাফিরেরা

আক্রমণ করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় ঐ কথাই বলেন। এবারেও আর একজন আনসারী প্রস্তুত হয়ে যান এবং এমন ভীষণ বেগে শক্রদের উপর ঝাপিয়ে পড়েন যে, তারা সম্মুখে অগ্রসর হতে অসমর্থ হয়। কিন্তু অবশ্যে তিনিও শহীদ হয়ে যান। এভাবে সাতজন সাহাবীই (রাঃ) মহান আল্লাহর নিকট পৌছে যান। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুজাহিরগণকে বলেনঃ ‘বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা আমাদের সঙ্গীদের সাথে পক্ষপাতহীন ব্যবহার করলাম না।’ তখন আবু সুফিয়ান সশব্দে বলেনঃ ‘<sup>أَعْلَمُ</sup> অর্থাৎ ‘হে হোবল! আপনার শির উন্নত হোক!’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণকে বলেনঃ ‘তোমরা বল-<sup>أَللَّهُ أَعْلَى وَاجْلُ</sup> অর্থাৎ, আল্লাহ উচ্চ ও মহা সম্মানিত।’ আবু সুফিয়ান বলেনঃ ‘<sup>لَنَاعِزُّ لَكُمْ</sup> অর্থাৎ ‘আমাদের জন্য উয্যাম রয়েছেন, তোমাদের জন্যে কোন উয্যাম নেই।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘তোমরা বল-<sup>أَللَّهُ مُولَانَا وَالْكُفَّارُ لَا مُوْلَاهُمْ</sup> অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের প্রভু এবং কাফিরদের কোনই প্রভু নেই।’ আবু সুফিয়ান বলেনঃ ‘আজকের দিন হচ্ছে বদরের দিনের প্রতিশোধ। কোনদিন আমাদের এবং কোনদিন তোমাদের। এটা তো হাতে হাতের সওদা। একের পরিবর্তে একটি।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘সমান কখনই নয়। আমাদের শহীদগণ জীবিত আছেন এবং তাদেরকে আহার্য দেয়া হচ্ছে, আর তোমাদের নিহত ব্যক্তিদের জাহানামে শান্তির মধ্যে নিষ্কেপ করা হয়েছে।’ পুনরায় আবু সুফিয়ান বলেনঃ ‘তোমরা তোমাদের নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে কতগুলোকে দেখতে পাবে যে, তাদের নাক, কান ইত্যাদি কেটে নেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি এটা করিনি, করতে নিষেধও করিনি, আমি এটা পছন্দও করিনি, অপছন্দ ও করিনি, এটা আমাদের নিকট না ভাল বলে অনুভূত হয়েছে, না মন্দ বলে।’ তখন শহীদগণের খৌজ নিয়ে দেখা যায় যে, হ্যরত হাময়া (রাঃ)-এর পেট ফেঁড়ে দেয়া হয়েছে এবং হিন্দ কলিজা বের করে চিবিয়েছে, কিন্তু গলাধঃকরণ করতে না পেরে উগরিয়ে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘হ্যরত হাময়া (রাঃ)-এর সামান্য গোশ্ত হিন্দার পেটে যাওয়া অসম্ভব ছিল। মহান আল্লাহ চান না যে, হ্যরত হাময়া (রাঃ)-এর শরীরের কোন অংশ জাহানামে নিষ্কিঞ্চ হোক।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত হাময়া (রাঃ)-এর জানায়া সামনে রেখে জানায়ার নামায আদায় করেন। তারপর একজন আনসারীর জানায়া হায়ির করা হয়। তাঁকে হ্যরত হাময়া (রাঃ)-এর পার্শ্ব দেশে রাখা হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় জানায়ার নামায পড়িয়ে দেন। আনসারীর জানায়া উঠিয়ে নেয়া হয় কিন্তু হ্যরত হাময়া (রাঃ)-এর

জানায়া সেখানেই থেকে যায়। এভাবে সন্তুষ্ট শহীদকে আনা হয় এবং সন্তুষ্ট হয়ে রাখা (রাঃ)-এর জানায়ার নামায পড়া হয়। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে হয়ে রাখা' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'মুশারিকদের সাথে আমাদের উভদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তীরন্দাজদের একটি দলকে একটি পৃথক স্থানে নিযুক্ত করেন এবং হয়ে রাখা আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-কে তাঁদের নেতৃত্ব ভার অর্পণ করেন। তাঁদেরকে নির্দেশ প্রদান পূর্বক বলেনঃ 'যদি তোমরা আমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত দেখতে পাও তবুও এখান হতে সরে যেয়ো না। আর তারা আমাদের উপর বিজয়ী হলেও তোমরা এ স্থান পরিত্যাগ করো না।' যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রাই আল্লাহর ফযলে মুশারিকদের চরণগুলো পিছনে সরে পড়ে। এমনকি নারীগণও লুঙ্গী উঁচু করতঃ পর্বতের উপর এদিক ওদিক দৌড়াতে আরম্ভ করে। তখন তীরন্দাজ দলটি 'গনীমত' 'গনীমত' বলতে বলতে নীচে নেমে আসে। তাদের নেতা তাদেরকে বার বার নিমেধ করা সন্ত্রেণ তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করে না। এ সুযোগে মুশারিকরা মুসলমানদেরকে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে। ফলে সন্তুষ্ট মুসলমান শহীদ হন। আবু সুফিয়ান একটি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে বলেনঃ 'মুহাম্মাদ (সঃ) আছে কি? আবু বকর কি বিদ্যমান আছে? উমার জীবিত আছে কি?' কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশক্রমে সবাই নীরব থাকেন। তখন তিনি আত্মহারা হয়ে বলতে থাকেনঃ 'এরা সবাই আমাদের তরবারীর ঘাটে অবতরণ করেছে। এরা জীবিত থাকলে অবশ্যই উন্নত দিত।' তখন হয়ে রাখে বলে উঠেনঃ 'হে আল্লাহর শক্র! তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহর ফযলে আমরা সবাই বিদ্যমান রয়েছি এবং তোমাকে ধৰ্সকারী আল্লাহ আমাদেরকে জীবিত রেখেছেন।' তারপরে ঐ সব কথাবার্তা হয় যেগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফে হয়ে রাখা আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উভদের যুদ্ধে মুশারিকদের পরাজয় ঘটে এবং ইবলীস উচ্চেঁস্বরে ডাক দিয়ে বলেঃ 'হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা পিছনের সংবাদ লও। আগের দল পিছনের উপর পতিত হয়েছে।' হয়ে রাখা হ্যায়ফা (রাঃ) দেখেন যে, মুসলমানদের তরবারী তাঁর পিতা হয়ে রাখা ইয়ামান (রাঃ)-এর উপর বর্ষিত হচ্ছে। বার বার তিনি বলেনঃ 'হে আল্লাহর বান্দারা। ইনি আমার পিতা হয়ে রাখা ইয়ামান (রাঃ)।' কিন্তু কে শুনে কার কথা। তিনি এভাবেই শহীদ হয়ে যান। কিন্তু হয়ে রাখা হ্যায়ফা (রাঃ) কিছুই না বলে শুধুমাত্র বললেনঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন।' হয়ে রাখা হ্যায়ফা

(রাঃ)-এর এ সৌজন্য তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সীরাতে ইবনে ইসহাকের মধ্যে রয়েছে, হ্যরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) বলেনঃ ‘আমি স্বয়ং দেখেছি যে, মুশরিকরা মুসলমানদের প্রথম আক্রমণেই পালাতে আরম্ভ করে, এমনকি তাদের নারীরা যেমন হিন্দা প্রভৃতি লুঙ্গী উঁচু করে দ্রুত দৌড়াতে থাকে। কিন্তু এরপরে যখন তীরন্দাজগণ কেন্দ্রস্থল পরিত্যাগ করে এবং কাফিরেরা একত্রিত হয়ে পিছন দিক হতে আমাদেরকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে ও একজন সশন্দে ঘোষণা করে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) শহীদ হয়েছেন। তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে যায়। নচেৎ আমরা তাদের পতাকা বাহক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং তার হাত হতে পতাকা নীচে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ‘উমরা’ বিনতে আলকামা হারেসিয়া’ নাম্বী একজন স্ত্রীলোক ওটা উঠিয়ে নিয়েছিল এবং কুরায়েশরা পুনরায় একত্রিত হয়েছিল। হ্যরত আনাস ইবনে মালিকের চাচা হ্যরত আনাস ইবনে নাফ্র (রাঃ) এ পরিস্থিতি দেখে হ্যরত উমার (রাঃ), হ্যরত তালহা (রাঃ) প্রভৃতির নিকট আগমন করতঃ বলেনঃ ‘আপনারা সাহস হারিয়েছেন কেন?’ তাঁরা বলেনঃ ‘রাসূলুল্লাহ তো শহীদ হয়েছেন।’ হ্যরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ ‘তাহলে আপনারা জীবিত থেকে কি করবেন?’ একথা বলে তিনি শক্রদের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়েন। অতঃপর বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে শাহাদাত বরণ করেন। ইনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। তাই তিনি অঙ্গীকার করে বলেছিলেনঃ ‘আগামী কোন দিনে সুযোগ আসলে দেখা যাবে।’ এ যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। যখন মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় তখন তিনি বলেনঃ ‘হে আল্লাহ! আমি মুসলমানদের এ কার্য হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।’ অতঃপর তিনি তরবারী নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন। পথে হ্যরত সা’দ ইবনে মু’আয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁকে বলেন, কোথায় যাচ্ছেন? আমি তো উহুদ পাহাড় হতে জান্নাতের স্ত্রাণ পাচ্ছি।’ এ কথা বলেই মুশরিকদের মধ্যে চুকে পড়েন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে অবশেষে শাহাদাত লাভ করেন। তাঁর শরীরে তীর ও তরবারীর আশিচ্চিরও বেশী যখন ছিল। তাকে চিনবার কোন উপায় ছিল না। অঙ্গুলির প্রান্তি দেখে চেনা গিয়েছিল। সহীহ বুখারীর মধ্যে রয়েছে যে, একজন হাজী বায়তুল্লাহ শরীফে একটি জনসমাবেশ দেখে জিজ্ঞেস করেন, ‘এ লোকগুলো কে?’ উত্তরে বলা হয়ঃ ‘কুরায়েশী’। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, ‘তাঁদের শায়েখ কে?’ বলা হয়, ‘হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)।’ তখন

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) আগমন করলে উক্ত হাজী সাহেব তাঁকে বলেন, ‘আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করেত চাই।’ তিনি বলেন, ‘জিজ্ঞেস করুন।’ তিনি বলেন, ‘আপনাকে এ বায়তুল্লাহ শরীফের কসম দিয়ে বলছি, আপনি কি জানেন যে, হ্যরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) উভদের যুদ্ধে পলায়ন করেছিলেন।’ তিনি উভরে বললেন, হ্যাঁ। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, এ সংবাদ কি আপনার জানা আছে যে, তিনি বদরের যুদ্ধেও যোগদান করেননি? তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ।’ লোকটি আবার প্রশ্ন করেন, ‘এ খবর কি আপনি অবগত আছেন যে, তিনি বায়‘আতুর রিয়ওয়ানেও অংশগ্রহণ করেননি?’ তিনি বলেন, ‘এটাও সঠিক কথা।’ এবারে লোকটি খুশী হয়ে তাকবীর পাঠ করেন।

হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তখন বলেন ‘এদিকে আসুন। এখন আমি আপনার নিকট বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করছি। উভদের যুদ্ধ হতে পলায়ন তো আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। বদরের যুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ ছিল এই যে, তাঁর বাড়িতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কন্যা ছিলেন এবং সে সময় তিনি কঠিন রোগে ভুগছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বলেছিলেন, তুমি মদ্দীনাতেই অবস্থান কর। আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পুণ্য দান করবেন এবং যুদ্ধলক্ষ মালেও তোমার অংশ থাকবে। বায়‘আতুর রিয়ওয়ানের ঘটনা এই যে, তাঁকে তিনি মক্কাবাসীদের নিকট স্বীয় পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। কেননা, মক্কাবাসীদের নিকট তাঁর যেমন সশ্রান্ত ছিল অন্য কারও ছিল না। তাঁর মক্কা গমনের পর এ বায়‘আত গ্রহণ করা হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় দক্ষিণ হস্ত উঠিয়ে বললেন, ‘এটা উসমানের হাত।’ অতঃপর তিনি ঐ হাতখনা তাঁর অন্য হাতের উপর রাখেন (যেন তিনি, বায়‘আত গ্রহণ করলেন।)’ তারপর তিনি লোকটিকে বললেন, ‘এখন প্রস্থান করুন এবং এ ঘটনাটি সঙ্গে নিন।’

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘যখন তোমরা শক্রগণ হতে পলায়ন করে পর্বতের উপরে আরোহণ করছিলে এবং ভয়ের কারণে কারও দিকে ফিরেও দেখছিলে না, আর রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে পশ্চাত হতে আহ্বান করছিলেন এবং তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলছিলেন, তোমরা পলায়ন করো না, বরং ফিরে এসো।’ হ্যরত সুন্দী (রঃ) বলেন যে, মুশরিকদের এ আকস্মিক প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে মুসলমানদের পদসমূহ টলটলায়মান হয়ে যায়। তাঁরা মদ্দীনার পথে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কেউ কেউ পর্বতের শিকরে আরোহণ করেন। আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাঁদেরকে পিছন হতে ডাক দিয়ে বলছিলেনঃ ‘হে আল্লাহর

বান্দাগণ! তোমরা আমার দিকে এসো।’ এ ঘটনারই বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সে সময় মাত্র বারজন সাহাবীর সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। মুসনাদ-ই-আহমাদের একটি দুর্দীর্ঘ হাদীসেও এসব ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। ‘দালায়েলুন নবুওয়াহ’-এর মধ্যেও রয়েছে যে, যখন মুসলমানদের পরাজয় ঘটে তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে মাত্র এগুরজন লোক ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হ্যরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ (সঃ) পাহাড়ের উপর আরোহণ করছিলেন এমন সময় মুশরিকরা তাঁকে ঘিরে নেয়। তিনি তাঁর সঙ্গীরদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ ‘তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে এমন কেউ আছে কি?’ হ্যরত তালহা (রাঃ) তৎক্ষণাতঃ তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দেন এবং যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ ‘তুমি এখন থেমে যাও।’ তখন একজন আনসারী প্রস্তুত হয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিঙ্গ হয়ে পড়েন এবং অবশেষে শহীদ হয়ে যান। এভাবে সবাই একের পর এক শাহাদাত বরণ করেন। তখন শুধুমাত্র হ্যরত তালহা (রাঃ) রয়ে যান। এ মহান ব্যক্তি বার বার যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন কিন্তু বারবারই রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বাধা দিছিলেন। অবশেষে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন এবং এমন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন যে, শক্ররা সবাই এক দিকে এবং তিনি একাই এক দিকে। এ যুদ্ধে তাঁর অঙ্গুলিগুলো কেটে পড়ে। ফলে তাঁর মুখ দিয়ে ‘ইস’ শব্দ বের হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ ‘তুমি যদি বিসমিল্লাহ বলতে বা আল্লাহ তা’আলার নাম নিতে তবে তোমাকে ফেরেশ্তাগণ আকাশে উঠিয়ে নিতেন এবং লোকেরা দেখতে থাকত।’ ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের সমাবেশে পৌছে গেছেন। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, হ্যরত কায়েস ইবনে হায়েম (রাঃ) বলেনঃ ‘হ্যরত তালহা (রাঃ) তাঁর যে হাতখানা ভালুকপে ব্যবহার করছিলেন তা অচল হয়ে গিয়েছিল।’ হ্যরত সা’দ ইবন আবি ওয়াক্সাস (রাঃ) বলেনঃ ‘উভদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় তৃণ হতে সমস্ত তীর আমার নিকট ছড়িয়ে দেন এবং বলেনঃ ‘তোমার উপর আমার বাপ মা উৎসর্গ হোন। লও, মুশরিকদেরকে মারতে থাকো।’ তিনি আমাকে উঠিয়ে দিছিলেন এবং আমি লক্ষ্য করে করে মুশরিকদেরকে মেরে চলছিলাম। সেদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ডানে-বামে এমন দু’জন লোককে দেখেছিলাম যাঁরা প্রাণপণে যুদ্ধ করছিলেন এবং যাঁদেরকে আমি ওর পূর্বেও কখনও দেখিনি এবং পরেও দেখিনি।’ এ দু’জন ছিলেন হ্যরত জিবরান্সিল (আঃ) ও হ্যরত মিকান্সিল (আঃ)। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে,

‘সকলের পলায়নের পর যে কয়েজন মহান ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে অবস্থান করছিলেন এবং এক এক করে শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদেরকে তিনি বলে চলছিলেনঃ ‘তাদেরকে বাধা প্রদান করতঃ জান্নাতে চলে যাবে ও জান্নাতে আমার বস্তু হবে এমন কেউ আছ কি?’ মঙ্গায় উবাই ইবনে খালফ শপথ করে বলেছিল, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হত্যা করবো।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি বলেন, ‘সে তো নয় বরং ইনশাআল্লাহ আমিই তাকে হত্যা করবো।’ উভদের যুক্তে সেই দুরাচার আপাদমস্তক লৌহ বর্ম পরিহিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দিকে অগ্রসর হয় এবং বলতে বলতে আসেঃ ‘যদি মুহাম্মাদ বেঁচে যান তবে আমি নিজেকেই ধ্রংস করে দেবো’। এদিকে হ্যরত মুসাবাব ইবনে উমায়ের (রাঃ) ঐ দুরাচারের দিকে অগ্রসর হন। তার সারা দেহ লৌহবর্মে আবৃত ছিল। শুধুমাত্র কপালের সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছিল। তিনি ঐ স্থান লক্ষ্য করে স্বীয় বর্ণ দ্বারা সামান্য আঘাত করেন। তা ঠিক লক্ষ্যস্থলেই লেগে যায়। এর ফলে সে কাঁপতে কাঁপতে ঘোড়া হতে পড়ে যায়। আঘাত প্রাণ স্থান হতে রক্তও বের হয়নি, অথচ তার অবস্থা এই ছিল যে, সে উচ্চসিত হয়ে পড়েছিল। তার লোকেরা তাকে উঠিয়ে সেনাবাহিনীর নিকট নিয়ে যায় এবং সাঞ্চনা দিতে থাকে যে, বেশী আঘাত তো লাগেনি, তুমি এত কাপুরুষতা প্রদর্শন করছো কেন? অবশ্যে সে তাদের বিদ্রূপে বাধ্য হয়ে বলে, ‘আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আমি উবাইকে হত্যা করবো।’ তোমরা এটা নিশ্চিতরূপে জেনে রেখো যে, আমি বাঁচতে পারি না। এটা তোমরা মনে করো না যে, এ সামান্য আঘাত লাগতো তবে সবাই ধ্রংস হয়ে যেতো।’ এরকম অস্ত্রিভাবে ছটফট করতে করতে সেই পাপিষ্ঠের প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যায়। ‘মাগায়ী-ই-মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকে’ রয়েছে যে, যখন এ লোকটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সম্মুখীন হয় তখন সাহাবীগণ তাঁর মোকাবিলা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন কিন্তু তিনি তাদেরকে বাধা দেন এবং বলেনঃ ‘তাকে আসতে দাও।’ যখন সে নিকটবর্তী হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত হারিস ইবনে সাম্মার (রাঃ) হাত হতে বর্ণ নিয়ে তার উপর আক্রমণ করেন। তাঁর হাতে বর্ণ দেখেই সে কেঁপে উঠে। সাহাবীগণ (রাঃ) তখনই বুঝে নেন যে, তার মঙ্গল নেই।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার ক্ষক্ষে আঘাত করেন, এর ফলেই সে কাঁপতে কাঁপতে ঘোড়া হতে পড়ে যায়। হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর বর্ণনা রয়েছে যে, ‘বাতনে রাবেগ’ নামক স্থানে ঐ কাফিরের মৃত্যু ঘটে। তিনি বলেনঃ একবার শেষরাত্রে এখান দিয়ে গমনের সময় এক জায়গায় এক ভীতিপ্রদ অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত দেখি এবং দেখতে পাই যে, একটি লোককে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ঐ আগুনে ছেঁড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর সে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা বলে চিৎকার করছে। অন্য এক ব্যক্তি বলছেঃ ‘তাকে পানি দিও না। সে আল্লাহর নবী (সঃ)-এর হস্তে নিহত ব্যক্তি। সে হচ্ছে উবাই ইবনে খালফ’। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনের যে চারটি দাঁত মুশরিকরা উহুদের যুদ্ধে শহীদ করে দিয়েছিল ঐদিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলছিলেনঃ ‘ঐ লোকদের উপর আল্লাহ তা‘আলার কঠিন অভিশাপ রয়েছে যারা তাদের নবীর সাথে এ ব্যবহার করেছে এবং তার উপরও আল্লাহ পাকের ভীষণ অভিশাপ যাকে তাঁর রাসূল (সঃ) তাঁর পথে হত্যা করেন।’ অন্য বর্ণনায় নিম্নরূপ রয়েছেঃ ‘যারা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করেছে তাদের উপর আল্লাহ তা‘আলার ভীষণ অভিশাপ রয়েছে।’ উৎবা ইবনে আবু ওয়াকাসের হাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখমণ্ডলে এ আঘাত লেগেছিল। তাঁর সম্মুখের চারটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। গওদেশও আহত হয়েছিল এবং ওষ্ঠেও আঘাত লেগেছিল। হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াকাস (রাঃ) বলতেনঃ ‘ঐ লোকটিকে হত্যা করার যেমন লোভ আমার ছিল অন্য কাউকে হত্যা করার তেমন ছিল না। ঐ লোকটি অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ছিল এবং সারা গোত্রই তার শক্র ছিল। তার দুশ্চরিত্রতা ও জগন্য আচরণের প্রমাণ হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্নের উক্তিটিই যথেষ্ট। নবী (সঃ)-কে আহতকারীর উপর আল্লাহ তা‘আলা অত্যন্ত রাগান্বিত। মুসনাদ-ই-আবদুর রায়্যাকে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার জন্যে বদনুআ করে বলতেনঃ ‘হে আল্লাহ! সারা বছরের মধ্যে সে যেন ধৰ্মস হয়ে যায় এবং কুফরীর অবস্থায় যেন তার মৃত্যু ঘটে।’ বস্তুতঃ হলোও তাই। সেই দুরাচার কাফির হয়েই মারা গেল এবং জাহানামের অধিবাসী হলো। একজন মুহাজির বর্ণনা করেনঃ ‘উহুদের যুদ্ধের দিন চতুর্দিক হতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর তীর বর্ষিত হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহর কুদরতে সমস্তই ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল।’ আবদুল্লাহ ইবনে শিহাব যুহরী সেদিন শপথ করে বলেছিলঃ ‘মুহাম্মাদ (সঃ)-কে দেখিয়ে দাও, সে আজ আমার হাত হতে রক্ষা পেতে পারে না। সে যদি মুক্তি পেয়ে যায় তবে আমার

মুক্তি নেই।' সে তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে একেবারে তাঁর পার্শ্বেই এসে পড়ে। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট কেউই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার চক্ষুর উপর পর্দা নিক্ষেপ করেন। সুতরাং সে তাঁকে দেখতেই পায় না। যখন সে বিফল হয়ে ফিরে যায় তখন শাফুওয়ান তাকে বিন্দুপ করে। সে তখন বলেঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি মুহাম্মাদ (সঃ)-কে দেখতেই পাইনি। আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করবেন। আমরা তাঁকে মারতে পারব না। জেনে রেখো, আমরা চার জন লোক তাঁকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করি এবং পরম্পর প্রতিজ্ঞাও করে বসি। কিন্তু শেষে অকৃতকার্য হয়ে পড়ি।' ওয়াকেদী (রঃ) বলেনঃ 'কিন্তু প্রমাণজনক কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কপালে আঘাতকারী ছিল ইবনে কামইয়্যাহ এবং তাঁর ওষ্ঠে ও দাঁতে যে আঘাত করেছিল সে ছিল উৎবা ইবনে আবি ওয়াক্স।' উম্মুল মুমেনীন হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 'আমার পিতা হ্যরত আবু বকর (রাঃ) যখন উহুদের ঘটনা বর্ণনা করতেন তখন তিনি পরিষ্কারভাবে বলতেনঃ "সে দিনের সমস্ত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন হ্যরত তালহা (রাঃ)। আমি ফিরে এসে দেখি যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবন রক্ষার্থে প্রাণপণ যুদ্ধ করছে। আমি বলিঃ 'আল্লাহ করেন ইনি তালহা হন!' তখন আমি নিকটে গিয়ে দেখি যে, তিনি তালহাই (রাঃ) বটে। আমি তখন আল্লাহ পাকের প্রশংসা করতঃ বলি—'ইনি আমারই গোত্রের একজন লোক।' আমার এবং মুশরিকদের মধ্যস্থলে একজন লোক দণ্ডয়মান ছিলেন এবং তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণ মুশরিকদের সাহস হারিয়ে দিয়েছিল। আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখি যে, তিনি ছিলেন হ্যরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)। তারপরে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পাই যে, তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেছে এবং চেহারা মুবারক ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে এবং কপালে লৌহ বর্মের দু'টি কড়া চুকে গেছে। আমি তখন দ্রুত বেগে তাঁর দিকে ধাবিত হই। কিন্তু তিনি বলেনঃ "আবু তালহা (রাঃ)-এর সংবাদ লও।" আমি চাচ্ছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল হতে কড়া দু'টি বের করে ফেলি। কিন্তু হ্যরত আবু উবাইদাহ (রাঃ) আল্লাহর কসম দিয়ে আমাকে নিষেধ করেন এবং নিজেই নিকটে এসে হাত দিয়ে বের করতে খুবই কষ্ট অনুভব করেন। কাজেই দাঁত দিয়ে ধরে একটি বের করেন। কিন্তু এতে তাঁর দাঁত ভেঙ্গে যায়। তখন আমি পুনরায় চাইলাম যে, দ্বিতীয়টি আমি বের করবো। কিন্তু আবার তিনি আমাকে

আল্লাহর কসম দিয়ে বিরত রাখলেন। সুতরাং আমি বিরত থাকলাম। তিনি দ্বিতীয় কড়াটিও বের করলেন। এবারেও তাঁর দাঁত ভেঙ্গে গেল। এ কার্য সাধনের পর আমি হ্যরত তালহা (রাঃ)-এর প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করি এবং দেখি যে, তাঁর দেহে সন্তরটি যথম হয়েছে। তাঁর অঙ্গুলগুলোও কেটে পড়েছে। আমি পুনরায় তাঁর সংবাদ নেই। হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যথমের রক্ত চুষে নেন, যেন রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর তাঁকে বলা হয়ঃ ‘কুলকুচা করে ফেল’। কিন্তু তিনি বলেনঃ ‘আল্লাহর শপথ! আমি কুলকুচা করবো না।’ তারপরে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘যদি কেউ জান্নাতী লোককে দেখতে ইচ্ছে করে তবে যেন এ লোকটিকে দেখে।’ এরপে তিনি ঐ যুদ্ধক্ষেত্রেই শহীদ হন।” সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল আহত হয়, সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং মস্তকের শিরস্ত্রাণ পড়ে যায়। হ্যরত ফাতিমা (রাঃ) রক্ত ধোত করছিলেন এবং হ্যরত আলী (রাঃ) ঢালে করে পানি এনে ক্ষতস্থানে নিষ্কেপ করছিলেন। যখন দেখেন যে, রক্ত কোন কোনক্রমেই বন্ধ হচ্ছে না তখন হ্যরত ফাতিমা (রাঃ) মাদুর পুড়িয়ে ওর ভস্ম ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেন। ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘আল্লাহ তোমাদেরকে দুঃখের পর দুঃখ প্রদান করলেন।’ *فِي جُذُوعِ النَّخْلِ شَدِّه بِأَكْثَرِ عَلَىٰ أَرْثَهِ بَعْضِهِ* (২০: ৭১)-এর মধ্যে *فِي* অক্ষরটি *أَكْثَرِ* অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন *فِي جُذُوعِ النَّخْلِ* শব্দে *بِ* অক্ষর *أَكْثَرِ* অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক দুঃখ তো পরাজয়ের দুঃখ, যখন এটা প্রচারিত হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ না করুন রাসূলুল্লাহ (সঃ) শহীদ হয়েছেন। দ্বিতীয় দুঃখ হচ্ছে বিজয়ী বেশে মুশরিকদের পর্বতের উপর আরোহণ, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলছিলেনঃ ‘তাদের জন্যে এ উচ্চতা বাঞ্ছনীয় ছিল না।’ হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বলেনঃ ‘প্রথম দুঃখ হচ্ছে পরাজয়ের দুঃখ এবং দ্বিতীয় দুঃখ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ। এ দুঃখ প্রথম দুঃখ অপেক্ষা অধিক ছিল।’ অনুরূপভাবে এক দুঃখ গনীমত হাতে এসেও হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার দুঃখ এবং দ্বিতীয় দুঃখ পরাজয়ের দুঃখ। এরপভাবে এক দুঃখ স্বীয় ভাইদের শহীদ হওয়ার দুঃখ এবং দ্বিতীয় দুঃখ রাসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে জঘন্য সংবাদের দুঃখ।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘যে গনীমত ও বিজয় তোমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল তার জন্যে দুঃখ করো না। প্রবল প্রতাপাদ্বিত ও মহা সম্মানিত আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্যক অবগত আছেন।’

১৫৪। অন্তর তিনি দুঃখের পরে  
 তোমাদের উপর শাস্তি  
 অবতারণ করলেন, তা ছিল  
 তন্দ্রা যা তোমাদের এক দলকে  
 আচ্ছন্ন করেছিল, আর একদল  
 নিজের জীবনের জন্যে চিন্তা  
 করছিল; তারা আল্লাহ সম্বন্ধে  
 সত্যের বিনিময়ে অজ্ঞতার  
 অনুরূপ ধারণা পোষণ  
 করছিল, এ বিষয়ে কি  
 আমাদের কোন অধিকার  
 নেই? তুমি বল-সকল বিষয়ে  
 আল্লাহর অধিকার; তারা  
 নিজেদের অন্তরে যা গোপন  
 রাখে, তা তোমার নিকট  
 প্রকাশ করে না; তারা  
 বলে-যদি এ বিষয়ে আমাদের  
 কোন অধিকার থাকতো, তবে  
 এখানে আমরা নিহত হতাম  
 না; তুমি বল-যদি তোমরা  
 তোমাদের গৃহের মধ্যেও  
 থাকতে, তবুও যাদের প্রতি  
 হ্ত্যা বিধিবদ্ধ হয়েছে, তারা  
 নিক্ষয়ই স্বীয় বধ্যস্থানে এসে  
 উপস্থিত হতো; এবং এটা এ  
 জন্যে যে, তোমাদের অন্তরের  
 মধ্যে যা আছে, আল্লাহ তা  
 পরীক্ষা করেন এবং এরপে  
 তিনি তোমাদের হৃদয়ের কথা  
 পরীক্ষা করে থাকেন; এবং  
 আল্লাহ অন্তর্নিহিত ভাব  
 পরিজ্ঞাত আছেন।

١٥٤ - ثُمَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ  
 الْغَمِّ أَمْنَةً نَعَسًا يَغْشِي  
 طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةً قَدْ  
 أَهْمَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظْنُونَ بِاللَّهِ  
 غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ  
 يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنْ الْأَمْرِ مِنْ  
 شَيْءٍ قَلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ  
 يُخْفِونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا  
 يُبَدِّلُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا  
 مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنَّا  
 قَلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بِيُوتِكُمْ لَبِرْزٌ  
 الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ القَتْلُ  
 إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ  
 مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْصِّنَ  
 مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ  
 بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

১৫৫। নিচয়ই তোমাদের মধ্যে  
যারা দু'দলের সম্মুখীন হওয়ার  
দিন পশ্চাদাবর্তিত হয়েছিল,  
তারা যা অর্জন করেছিল, তার  
কোন কোন বিষয় হতে  
শয়তান তাদেরকে প্রতারিত  
করেছিল; এবং অবশ্যই  
আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা  
করেছেন; নিচয়ই আল্লাহ  
ক্ষমাশীল সহিষ্ণু।

মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপর সেই দুঃখ ও চিন্তার সময় যে অনুগ্রহ  
করেছিলেন এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি তাদেরকে তন্ত্রাভিভূত  
করেছিলেন। অন্ত-শক্ত হাতে রয়েছে এবং শক্ত সম্মুখে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু  
অন্তরে এত শান্তি রয়েছে যে, চক্ষু তন্ত্রায় ঢলে পড়েছে যা শান্তি ও নিরাপত্তার  
লক্ষণ। যেমন সূরা-ই-আনফালের মধ্যে বদরের ঘটনায় রয়েছে-

إِذْ يَغْشِيكُمُ النَّعَاسُ أَمْنًا مِنْهُ

অর্থাৎ 'তাঁর পক্ষ হতে শান্তিরূপে যখন তন্ত্রা তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে।  
(৮৪ ১১) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ 'যুদ্ধের সময় যে তন্ত্রা  
আসে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসে থাকে এবং নামাযের সময় যে  
তন্ত্রা আসে তা শয়তানের পক্ষ হতে আসে।' হ্যরত আবু তালহা (রাঃ) বলেনঃ  
'উহদের যুদ্ধের দিন আমার চক্ষে এত বেশী তন্ত্রা এসেছিল যে, আমার হাত  
হতে তরবারী বারবার ছুটে গিয়েছিল।' তিনি আরও বলেনঃ 'আমি চক্ষু উঠিয়ে  
দেখি যে, প্রায় সবারই একুপ অবস্থাই ছিল। তবে অবশ্যই একটি দল একুপও  
ছিল যাদের অন্তর ছিল কপটতায় পরিপূর্ণ এবং তারা ছিল সদা ভীত-সন্ত্রস্ত।  
তাদের কুধারণা শেষ সীমায় পৌছে গিয়েছিল। অতএব বিশ্বস্ত আল্লাহর উপর  
নির্ভরশীল এবং সত্যপঞ্চী লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ পাক অবশ্যই  
তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তারা অবশ্যই সফলকাম হবে। কিন্তু কপট  
সন্দেহ পোষণকারী এবং টলমলে ঈমানের লোকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত  
বিস্ময়কর। তাদের প্রাণ শান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। তারা সদা হায় হায়  
করছিল এবং তাদের অন্তরে বিভিন্ন প্রকারের কুমন্ত্রণা চুকে পড়েছিল। তাদের  
দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তারা মরতে চলেছে। তাদের অন্তরে বিশ্বাসও বন্ধমূল

١٥٥ - إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُوا مِنْكُمْ  
يَوْمَ التَّقْرِيبَةِ الْجَمِيعُ إِنَّمَا  
أَسْتَرْلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِيَعْصِي  
مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ  
عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং মুমিনগণ আর দুনিয়ায় থাকবে না। কাজেই বাঁচার কোন উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকদের অবস্থা এই হয় যে, যেখানেই তারা সামান্য নিম্নভূমি দেখে, তাদের নৈরাশ্যের ঘনঘটা তাদেরকে ঘিরে নেয়। পক্ষান্তরে ঝিমানদারগণ মন্দ হতে মন্দতম অবস্থাতেও আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভাল ধারণাই রাখেন। মুনাফিকদের মনের ধারণা ছিল এই যে, যদি তাদের কোন অধিকার থাকতো তবে তারা সেদিনের মৃত্যু হতে রক্ষা পেয়ে যেতো এবং তারা গোপনে ওটা বলতোও বটে। হ্যরত যুবায়ের (রাঃ) বলেনঃ ‘ঐ কঠিন ভয়ের সময়েও আমাদেরকে এত ঘুম পেয়ে বসে যে, আমাদের চিরুকগুলো বক্ষের সাথে লেগে যায়। আমি আমার সে অবস্থাতেই মু’তাব ইবনে কুশায়েরের নিম্নের উক্তি শুনতে পাইঃ ‘যদি আমার সামান্য কিছু অধিকার থাকতো তবে এখানে নিহত হতাম না।’ আল্লাহ তা’আলা তাদেরকেই বলছেনঃ ‘মৃত্যু তো আল্লাহ কর্তৃক ভাগ্যে লিখিত রয়েছে। মৃত্যুর সময় পরিবর্তিত হতে পারে না। তোমরা যদি বাড়ীতেও অবস্থান করতে, তথাপি এখানে যার ভাগ্যে মৃত্যু লিখা রয়েছে সে অবশ্যই বাড়ী ছেড়ে এখানে চলে আসতো। ফলে আল্লাহ কর্তৃক ভাগ্য লিখন পূর্ণ হয়ে যেতো। এ সময়টি এ জন্যেই ছিল যে, যেন আল্লাহ তোমাদের অন্তরের গোপন কথা প্রকাশ করে দেন। এ পরীক্ষা দ্বারা ভাল-মন্দ, সৎ ও অসতের মধ্যে প্রভেদ হয়ে গেল। যে আল্লাহ তা’আলা অন্তরের গোপন কথা অবগত আছেন তিনি এ সামান্য ঘটনা দ্বারা মুনাফিকদেরকে প্রকাশ করে দিলেন এবং মুসলমানদেরও স্পষ্ট পরীক্ষা হয়ে গেল।’ এখন আল্লাহ পাক খাঁটি মুসলমানদের পদস্থলনের বর্ণনা দিচ্ছেন যা মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাদের দ্বারা সাধিত হয়েছিল। শয়তানই তাদের এ পদস্থলন ঘটিয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তাদের কর্মেরই ফল। তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অবাধ্যও হতো না এবং তাদের পদগুলো টলমলও করতো না। আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে ক্ষমার যোগ্য মনে করতঃ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের কাজই হচ্ছে ক্ষমা করে দেয়া। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, হ্যরত উসমান (রাঃ) প্রভৃতির ঐ অপরাধকে আল্লাহ তা’আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, হ্যরত ওলীদ ইবনে উকবা (রাঃ) একদা হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-কে বলেনঃ ‘শেষ পর্যন্ত আপনি আমীরগুল মুমিনীন হ্যরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ)-এর উপর এত চটে রয়েছেন কেন?’ তিনি তাকে বললেনঃ ‘হ্যরত উসমান (রাঃ)-কে তুমি বল- আপনি কি উহুদের যুদ্ধের সময় পলায়ন করেননি? বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকেননি এবং হ্যরত উমার (রাঃ)-এর পত্না পরিত্যাগ করেননি?’

হ্যরত ওলীদ (রাঃ) গিয়ে হ্যরত উসমান (রাঃ)-এর নিকট এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন হ্যরত উসমান (রাঃ) এর উত্তরে বলেন **وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ** অর্থাৎ (উহুদ যুদ্ধের অপরাধের) জন্যে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং সে জন্যে আর দোষারোপ কেন? বদরের যুদ্ধের সময় আমার সহধর্মী এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কন্যা হ্যরত রুক্মাইয়াহ রোগাক্রান্ত হওয়ায় তার রোগ দেখাশুনার কাজে ব্যস্ত থাকি। সে ঐ রোগেই মারা যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে গনীমতের মালের পূর্ণ অংশ দিয়েছিলেন। এটা স্পষ্ট কথা যে, একমাত্র সে ব্যক্তিই যুদ্ধলক্ষ মাল পেয়ে থাকে যে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং বদরের যুদ্ধে আমার উপস্থিত থাকাই সাব্যস্ত হয়েছে। এখন বাকী থাকলো হ্যরত উমার (রাঃ)-এর পত্নী, ওটার ক্ষমতা আমারও নেই এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফেরও (রাঃ) নেই। যাও তার নিকট এ সংবাদ পৌছিয়ে দাও।

১৫৬। হে মুমিনগণ! যারা  
অবিশ্বাস করেছে— তোমরা  
তাদের মত হয়ে না এবং  
যখন তাদের ভাতৃগণ  
পৃথিবীতে বিচরণ করে অথবা  
যুদ্ধে নিহত হয় তখন তারা  
বলে— যদি ওরা আমাদের  
নিকট থাকতো তবে মৃত্যুমুখে  
পতিত হতো না। অথবা  
নিহত হতো না; আল্লাহ  
এরূপে তাদের অন্তরে দুঃখ  
সঞ্চার করেন, এবং আল্লাহই  
জীবন দান ও মৃত্যু দান  
করেন, এবং তোমরা যা  
করছো, তৎপ্রতি আল্লাহ  
লক্ষ্যকারী।

— ১৫৬ —  
يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا  
لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا  
وَقَالُوا لِأَخْرَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا<sup>١</sup>  
فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ الَّذِينَ<sup>٢</sup>  
كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا  
قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً<sup>٣</sup>  
فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحِبُّ<sup>٤</sup>  
وَيُمِيّتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ<sup>٥</sup>  
بِصَرِيرٍ<sup>٦</sup>

১৫৭। আর যদি তোমরা আল্লাহর  
পথে নিহত অথবা মৃত্যুমুখে  
পতিত হও, তবে আল্লাহর  
নিকট হতেই ক্ষমা রয়েছে  
এবং তারা যা সঞ্চয় করেছে  
তদপেক্ষা তাঁর করণ  
শ্রেষ্ঠতর।

১৫৮। আর যদি তোমরা  
মৃত্যুবরণ কর বা নিহত হও  
তবে তোমাদেরকে অবশ্যই  
আল্লাহর দিকে একত্রিত করা  
হবে।

۱۵۷- وَلِئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلٍ  
اللَّهِ او مِنْ لِمْغِفَرَةٍ مِنَ اللَّهِ  
وَرَحْمَةٍ خَيْرٍ مِمَّا يَجْمِعُونَ ۝

۱۵۸- وَلَئِنْ مُتُّمْ او قُتِلْتُمْ  
لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ۝

এখানে আল্লাহ পাক স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে কাফিরদের ন্যায় অসৎ ও  
জঘন্য বিশ্বাস রাখতে নিষেধ করছেন। এ কাফিরেরা মনে করতো যে, তাদের  
বন্ধু-বান্ধব যদি পৃথিবী পৃষ্ঠে ভ্রমণ না করতো বা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হতো  
তবে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হতো না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘এ বাজে  
ও ভিত্তিহীন ধারণা তাদের দুঃখ ও অনুশোচনা আরও বৃদ্ধি করে থাকে।  
প্রকৃতপক্ষে জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর হাতেই রয়েছে। তাঁর ইচ্ছানুসারেই মানুষ  
মরে থাকে এবং তাঁর চাহিদা হিসেবেই তারা জীবন লাভ করে। তাহলে তাঁর  
ইচ্ছাক্রমে সমস্ত কাজ চালু করা তাঁরই অধিকার। তিনি ভাগ্যে যা লিখে  
দিয়েছেন টলবার নয়। তাঁর জ্ঞান হতে ও দৃষ্টি হতে কোন কিছু বাইরে নেই।  
সমস্ত সৃষ্টিজীবের প্রত্যেক কাজ তিনি খুব ভাল করেই জানেন।’ দ্বিতীয় আয়াতে  
বলা হচ্ছে- ‘আল্লাহর পথে নিহত হওয়া বা মরে যাওয়া তাঁর ক্ষমা ও করুণা  
লাভেরই মাধ্যম এবং এটা নিশ্চিতরূপে দুনিয়া ও ওর সমুদয় জিনিস হতে  
উত্তম। কেননা, এটা ক্ষণস্থায়ী এবং ওটা চিরস্থায়ী।’ এরপরে বলা হচ্ছে যে,  
মানুষ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করুক বা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদই হোক,  
যেভাবেই ইহজগত হতে বিদায় গ্রহণ করুক না কেন আল্লাহর নিকটই সকলে  
একত্রিত হবে। অতঃপর তারা তথায় তাদের কৃতকর্মের ফল স্বচক্ষে দর্শন  
করবে-কাজ ভালই হোক আর মন্দই হোক।

১৫৯। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ  
এই যে, তুমি তাদের প্রতি  
কোমল চিন্তা; এবং তুমি যদি  
কর্কশ ভাষী, কঠোর হৃদয়  
হতে, তবে নিশ্চয়ই তারা  
তোমার সংসর্গ হতে অন্তর্হিত  
হতো, অতএব তুমি তাদেরকে  
ক্ষমা কর ও তাদের জন্যে  
ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কার্য  
সম্বন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ  
কর; অনন্তর যখন তুমি সংকল্প  
করেছ তখন আল্লাহর প্রতি  
নির্ভর কর; এবং নিশ্চয়ই  
আল্লাহ নির্ভরশীলগণকে  
ভালবাসেন।

১৬০। যদি আল্লাহ তোমাদেরকে  
সাহায্য করেন তবে কেউই  
তোমাদের উপর জয়যুক্ত হবে  
না; এবং যদি তিনি  
তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন,  
তবে তাঁর পরে কে আছে যে,  
তোমাদেরকে সাহায্য করে?  
এবং বিশ্বাসীগণ আল্লাহর  
উপরেই নির্ভর করে থাকে।

১৬১। আর কোন নবীর পক্ষে  
আস্ত্রসাত করণ শোভনীয় নয়  
এবং যে কেউ আস্ত্রসাত  
করেছে তবে যা সে আস্ত্রসাত  
করেছে তা উধান দিবসে  
আনয়ন করা হবে; অনন্তর  
প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন  
করেছে তা পূর্ণরূপে প্রদত্ত হবে  
এবং তারা নির্যাতিত হবে না।

১৫৯- فِيْمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَّ  
لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظًا  
الْقَلِبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَارِهِمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا  
عَزَمْتَ فَتَوَكِّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

১৬০- إِنْ يَنْصُرْ كُمْ اللَّهُ فَلَا  
غَالِبٌ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمِنْ  
ذَا الَّذِي يَنْصُرْ كُمْ مِنْ بَعْدِهِ  
وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَّوَكِّلْ  
الْمُؤْمِنُونَ ۝

১৬১- وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلِبَ  
مَنْ يَغْلِبْ يَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ  
الْقِيمَةِ ثُمَّ تَوْفَى كُلَّ نَفْسٍ مَا  
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

১৬২। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে, সে কি তার মত হতে পারে- যে আল্লাহর আক্রোশে পতিত হয়েছে? এবং তার বাসস্থান জাহানাম- আর ওটা নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।

১৬৩। আল্লাহর নিকট তাদের পদমর্যাদাসমূহ আছে; এবং তোমরা যা করছো তদ্বিষয়ে আল্লাহ লক্ষ্যকারী।

১৬৪। নিচয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন- যখন তিনি তাদের নিজেরদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদের নিকট তাঁর নির্দশনাবলী পাঠ করে ও তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে গ্রহ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দান করে, এবং নিচয়ই তারা এর পূর্বে প্রকাশ্য ভাস্তির মধ্যে ছিল।

۱۶۲- أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ  
كَمْنَ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ  
وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ  
۱۶۳- هُمْ دَرَجَتُ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

۱۶۴- لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ  
رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوَّ  
عَلَيْهِمْ آيَتِهِ وَيَزْكِرُهُمْ وَيَعْلَمُهُمْ  
الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا  
مِنْ قَبْلِ لَفْتِيْ ضَلِيلٍ مُّبِينٍ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর উপর ও মুসলমানদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন তা তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, নবী (সঃ)-কে মান্যকারী ও তাঁর অবাধ্যতা হতে বহু দূরে অবস্থানকারীদের জন্য তিনি স্বীয় নবী (সঃ)-এর অন্তরকে কোমল করে দিয়েছেন। তাঁর অনুকূল্পা না হলে তাঁর নবীর হৃদয় এত কোমল হতো না। হ্যরত কাতাদা (রাঃ) বলেন যে, মা' শব্দটি যাকে আরববাসী কথনও বা -এর সঙ্গে মিলিয়ে থাকে। যেমন- ফিমা- এর সঙ্গে মিলিয়ে থাকে। যেমন- صَلَةً- এর মধ্যে। আবার কথনও বা -নَكِرَةً-এর সঙ্গেও মিলিয়ে থাকে। যেমন- نَقْضِهِمْ- এর মধ্যে। এখানে ঐরূপই হয়েছে। অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! তুমি আল্লাহর করুণার ফলেই কোমল অন্তর বিশিষ্ট হয়েছ। হ্যরত হাসান বসরী

(ৰঃ) বলেনঃ এটাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চরিত্র যার উপর তিনি প্রেরিত হয়েছেন। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে একজন রাসূল এসেছেন, যাঁর উপর তোমদের কষ্ট কঠিন ঠেকে, যিনি তোমাদের উপর লোভী এবং যিনি মুমিনদের উপর মেহশীল, দয়ালু’। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ)-এর হাত ধরে বলেন, ‘হে আবু উমামা! কতগুলো মুমিন এমন আছে যাদের জন্যে আমার হৃদয় স্পন্দিত হয়’। **فَمَنْ فِي قُلُوبِهِ مِنْ أَهْلِ إِيمَانٍ** শব্দের অর্থ হচ্ছে কর্কশ ভাষা। কেননা, এর পরে **عَلَيْهِ الْقُلُوبُ** শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ কঠিন হৃদয়। ইরশাদ হচ্ছে-যদি তুমি কর্কশ ভাষী ও কঠোর হৃদয় বিশিষ্ট হতে তবে মানুষ তোমার চতুর্পার্শ্ব হতে বিক্ষিণ্ণ ও বিছিন্ন হয়ে পড়তো এবং তোমাকে পরিত্যাগ করতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে তোমার প্রতি ভালবাসা স্থাপন করেছেন। আর এজন্যে তাদের দিক হতে তোমাকেও প্রেম এবং ন্যূনতা দান করেছেন। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, আমি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গুণাবলী দেখেছি যে, তিনি কর্কশভাষী, কঠিন হৃদয়, বাজারে গোলমালকারী এবং ন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায় দ্বারা গ্রহণকারী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন মার্জনাকারী ও ক্ষমাকারী। জামেউত্ তিরমিয়ীর মধ্যে একটি গারীব হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘মানুষকে অভিবাদন জানাতে, তাদের মঙ্গল কামনা করতে, তাদের অপরাধ এড়িয়ে চলতে আমাকে আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে ঐ ঝুঁপই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেকুপভাবে অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে’। অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াতেও তাঁকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে-হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও আল্লাহ পাকের নিকট তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকল কার্যে তাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ কর। এ কারণেই সাহাবীগণকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সকল কার্যে তাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং ওটা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। যেমন বদরের যুদ্ধের দিন শক্রবাহিনীর দিকে অগ্সর হওয়ার জন্যে তিনি তাঁদের নিকট পরামর্শ নেন। তখনি তাঁর সহচরবৃন্দ বলেছিলেন, যদি আপনি আমাদেরকে সমন্বেদের তীরে দাঁড় করতঃ পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়ারও নির্দেশ প্রদান করেন তবুও সে নির্দেশ পালনে আমরা মোটেই কৃষ্ণিত হবো না। আর যদি আপনি আমাদেরকে ‘বারকুল গামাদ’ পর্যন্ত নিয়ে যেতে ইচ্ছে করেন তাহলেও

আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে আপনার সাথে গমন করবো। আমরা হ্যরত মুসা (আঃ)-এর সহচরদের ন্যায় ‘তুমি ও তোমার প্রভু যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকছি’ এরূপ কথা কখনও মুখে আনব না। বরং আমরা আপনার ডানে, বামে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শক্রদের মোকাবিলা করবো। এরূপভাবে অবতরণস্থল কোথায় হবে তিনি তারও পরামর্শ গ্রহণ করেন। হ্যরত মুনফির ইবনে আমর (রাঃ) পরামর্শ দেন যে, আগে বেড়ে তাদের সম্মুখে হতে হবে। অনুরূপভাবে উভদের যুদ্ধেও তিনি পরামর্শ নেন যে, মদীনার ভেতরে থেকেই যুদ্ধ করতে হবে, না বাইরে গিয়ে মুশরিকদের মোকাবিলা করতে হবে? অধিকাংশ লোক মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করারই মত প্রকাশ করেন। অতএব তিনি তাই করেন। পরিখার যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সহচরবুন্দের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করেন যে, মদীনার উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়াংশ প্রদানের অঙ্গীকারে বিরুদ্ধ দলের সাথে সংক্ষি করা হবে কি? হ্যরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ) এবং সা'দ ইবনে মুআজ (রাঃ) এটা অঙ্গীকার করেন এবং তিনিও এ পরামর্শ গ্রহণ করেন ও সংক্ষি করা থেকে বিরত থাকেন। অনুরূপভাবে হৃদায়বিয়াতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ পরামর্শ নেন যে, মুশরিকদেরকে আক্রমণ করা হবে কি? তখন হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেনঃ ‘আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। উমরাব্রত পালন করাই আমাদের উদ্দেশ্য’। আল্লাহর রাসূল (সঃ) এটাও স্বীকার করে নেন। এ রকমই যখন মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহধর্মীণী হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর উপর অপবাদ দেয় তখন তিনি বলেন, ‘হে মুসলমান ভাই সব! যেসব লোক আমার গৃহিণীর দুর্নাম করছে তাদের ব্যাপারে আমি কি করতে পারি, তোমরা আমাকে এ পরামর্শ দান কর। আল্লাহর শপথ! আমার জানামতে তো আমার গৃহিণীর কোন দোষ নেই। আর যে লোকাটির সাথে অপবাদ দিচ্ছে, আল্লাহর কসম। সেও তো আমার মতে ভাল লোকই বটে।’ হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-কে পৃথক করণের ব্যাপারে তিনি হ্যরত আলী ও হ্যরত উসামা (রাঃ)-এর পরামর্শ গ্রহণ করেন। মোটকথা যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কার্যে এবং অন্যান্য কার্যেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এ পরামর্শ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর ওয়াজিব ছিল, না সাহাবীগণের মনস্তুষ্টির জন্যে তাঁর ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল ছিল সে সম্বন্ধে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ আয়াতে হ্যরত আবু বকর ও হ্যরত উমার (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ রয়েছে। (হাকিম) এ দু'জন সহচরই ছিলেন তাঁর

সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতা। আর ঐ দু'জনই ছিলেন মুসলমানদের পিতৃতুল্য। (কালবী) মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ দু'জন সাহাবী (রাঃ) কে বলেছিলেনঃ ‘কোন কার্যে যদি তোমারা দু'জন একমত হয়ে যাও তবে আমি কখনও তোমাদের বিপরীত মত পোষণ করবো না।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ ”عَزْمٌ“ শব্দের অর্থ কি? তিনি বলেনঃ ‘জ্ঞানীদের পরামর্শক্রমে যখন কোন কার্যের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাবে তখন তা মেনে নেয়া।’ (ইবনে মিরদুওয়াই) সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্নের ঘোষণাও বর্ণিত আছেঃ ‘যার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করা যায় সে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি।’ সুনান-ই-আবি দাউদ, জামেউত তিরমিয়ী এবং সুনান-ই-নাসাইর মধ্যেও বর্ণনাটি রয়েছে। ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ ‘যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার ভাই-এর নিকট কোন পরামর্শ গ্রহণ করে তখন সে যেন তাকে ভাল পরামর্শ দান করে।’ (ইবনে মিরদুওয়াই)

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘যখন তোমরা কোন কার্যের পরামর্শ গ্রহণের পর ওটা সাধনের দৃঢ় সংকল্প করে ফেল তখন মহান আল্লাহর উপর নির্ভর কর, আল্লাহ তা‘আলা নির্ভরশীলদেরকে ভাল বাসেন।’ অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতের ঘোষণা ঠিক এ ক্রমই যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে—**وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ رَبِّكُمْ** অর্থাৎ ‘সাহায্য শুধু অল্লাহর পক্ষ থেকেই যিনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।’ তার পরে বলা হচ্ছে যে, মুমিনদের শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘আলার উপর নির্ভর করা উচিত। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন—‘আত্মসাত করা নবীর জন্য মোটেই শোভনীয় নয়।’ হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন যে, বদর যুদ্ধে যে গনীমতের মাল পাওয়া গিয়েছিল, তনুধ্য হতে একটি লাল রং-এর চাদর হারিয়ে যায়। তখন লোকেরা বলাবলি করে যে, সম্ভবতঃ এটা রাসূলুল্লাহ-ই (সঃ) নিয়েছেন। তখনই এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়। (জামেউত তিরমিয়ী) অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কোন জিনিসের অপবাদ দিয়েছিল যার ফলে এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়। সূতরাং সাব্যস্ত হচ্ছে যে, রাসূলগণের নেতা হ্যরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ) যে কোন প্রকারের বিশ্বাসঘাকতা ও আত্মসাত করণ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। সেটা মাল বন্টনই হোক বা আমানত আদায় করার ব্যাপারেই হোক। হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছেঃ ‘নবী (সঃ) আত্মসাত করতে পারেন না

বা তিনি পক্ষপাতিত্বও করেন না যে, সৈন্যদের মধ্যে কাউকে যুদ্ধলোক মালের অংশ দেবেন এবং কাউকে বঞ্চিত রাখবেন’। এ আয়াতের তাফসীর নিম্নরূপও করা হয়েছে: ‘এটা হতে পারে না যে, নবী (সঃ) আল্লাহর নায়িলকৃত কোন কিছু গোপন করবেন এবং স্বীয় উম্মতের নিকট পৌছিয়ে দেবেন না।’ **يَغْلُلُ شَرْدِهِ**’-কে পেশ দিয়েও পড়া হয়েছে। তখন অর্থ হবেঃ ‘নবী (সঃ)-এর ব্যক্তিত্ব একুপ নয় যে, তাঁর নিকটতম সহচরগণ তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা করবেন।’ যেহেতু হয়রত কাতাদাহ (রাঃ) এবং হয়রত রাবী’ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধে প্রাণ গন্মতের মাল হতে কিছু মাল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কয়েকজন সহচর বন্টনের পূর্বেই গ্রহণ করেছিল। সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) অতঃপর আত্মসাতকারী লোকদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং ভীষণ শাস্তির সংবাদ দেয়া হচ্ছে। হাদীসসমূহে এ সম্পর্কে অনেক কিছু ভীতির কথা রয়েছে। যেমন মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন-‘সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে তার প্রতিবেশীর ক্ষেত্রের ভূমি বা ঘরের মাটি দাবিয়ে নেয়। যদি এক হাত মাটি ও অন্যায়ভাবে নিজের দিকে চেপে নেয় তবে সাতটি যমীনের গলাবন্ধ তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে।’ মুসনাদ-ই-আহমাদের অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যাকে আমি শাসনকর্তা নিযুক্ত করি, তার বাড়ী না থাকলে বাড়ী করতে পারে, স্ত্রী না থাকলে স্ত্রী করতে পারে; খাদেম না থাকলে তা রাখতে পারে, সোয়ারী না থাকলে ওটাও সংগ্রহ করতে পারে এবং এগুলো ছাড়া যদি অন্য কিছু গ্রহণ করে তবে আত্মসাতকারী হিসেবে গণ্য হবে।’ এ হাদীসটি সুনান-ই-আবি দাউদের মধ্যেও অন্য শব্দে বর্ণিত আছে। ইবনে জারীরের মধ্যে হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘আমি ঐ লোকটিকে চিনি যে কিয়ামতের দিন এমন ছাগল নিয়ে আগমন করবে যে ভ্যাং চীৎকার করবে, লোকটি আমার নাম নিয়ে ডাক দেবে। আমি বলবো-আজ আমি আল্লাহর নিকট তোমার কোন কাজে আসবো না, আমি তো তোমার নিকট আল্লাহর বাণী পৌছিয়ে দিয়েছিলাম। আমি ঐ লোকটিকেও চিনি যে শব্দকারী উট নিয়ে আগমন করবে। সে বলবেঃ ‘হে মুহাম্মাদ (সঃ), হে মুহাম্মদ (সঃ)! ‘আমি বলবো-আমি তোমার জন্যে আল্লাহর নিকট কোন কিছুরই অধিকারী নই। আমি তো তাবলীগ করেছিলাম। ঐ লোকটিকেও আমি চিনে নেবো যে চিংহি চিংহি শব্দকারী ঘোড়া নিয়ে উঠবে। সেও আমাকে ডাক দেবে।

আমি তাকেও বলবো- আমি তো (আল্লাহর বাণী) পৌছিয়ে দিয়েছিলাম। আজ আমি কোন কাজে আসবো না। আমি ঐ লোকটিকেও চিনি যে চামড়া নিয়ে উপস্থিত হবে এবং বলতে থাকবে- ‘হে মুহাম্মদ (সঃ)! হে মুহাম্মদ (সঃ)! আমি বলবো-আমি আল্লাহর নিকট তোমার জন্যে কোন উপকারের অধিকারী নই। আমি তো তোমার নিকট (আল্লাহর বাণী) পৌছিয়েই দিয়েছিলাম। এ হাদীসটি ছয়খানা বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে নেই। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইয়দ গোত্রের একজন লোককে শাসনকর্তা করে পাঠান। লোকটিকে ইবনুল লাবতিয়্যাহ বলা হতো। সে যাকাত আদায় করে এসে বলে-‘এগুলো আপনারদের এবং এটা আমার যা তারা আমাকে উপচোকন স্বরূপ দিয়েছে।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন মিস্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে বলেন-‘ঐ লোকদের কি হয়েছে যে, যখন আমি তাদেরকে কোন কাজে প্রেরণ করি তখন এসে বলে- ‘এটা আপনাদের এবং এটা আমার উপচোকন?’ এরা বাড়িতেই এসে বসে থাকলে দেখা যেতো, কেউ তাদেরকে উপচোকন পাঠায় কি-না। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ রয়েছে। সেই সত্ত্বার শপথ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ ওর মধ্য হতে কোন কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন সে ওটা ক্ষেত্রে বহন করে আগমন করবে। উট হলে চীৎকার করবে, গরু হলে হাস্তা রব করবে এবং ছাগল হলে ভ্যাং ভ্যাং শব্দ করবে।’ অতঃপর তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় এত উঁচু করেন যে, তাঁর বগলের সাদা অংশ চোখে পড়ে যায় এবং তিনবার বলেন, ‘হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি?’ মুসনাদ- ই-আহমাদের একটি দুর্বল হাদীসে রয়েছে যে, এসব আদায়কারী ও শাসনকর্তা যেসব উপচোকন প্রাপ্ত হয় তা আস্তসাতের মধ্যেই গণ্য। এ বর্ণনাটি শুধুমাত্র মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যেই রয়েছে এবং এটা দুর্বল। মনে হচ্ছে যেন এটা পূর্ববর্তী দীর্ঘ বর্ণনাগুলোরই সারাংশ। জামেউত তিরমিয়ীর মধ্যে রয়েছে, হ্যরত মুআয় ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ইয়ামেনে প্রেরণ করেন। আমি তথায় গমন করলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর নিকট ফিরে আসলে তিনি আমাকে বলেনঃ ‘আমি শুধুমাত্র কথা বলার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি। তা হচ্ছে এই যে, আমার অনুমতি ছাড়া যেটা গ্রহণ করবে তা আস্তসাত এবং প্রত্যেক আস্তসাতকারী তার আস্তসাতকৃত জিনিস নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। এ টুকুই আমার বলার ছিল। যাও, নিজ কার্যে লেগে পড়।’ মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা সাহাবীগণের সামনে দাঁড়িয়ে

বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসাত করণের বর্ণনা দেন এবং ওর বড় বড় পাপ ও শাস্তির কথা বর্ণনা করে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। অতঃপর মানুষের কিয়ামতের দিন জন্মসমূহ নিয়ে উপস্থিত হওয়া ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সাহায্যের জন্যে আবেদন করা এবং তাঁর অঙ্গীকৃতি জ্ঞাপন করারও উল্লেখ আছে, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাতে সোনা-চাঁদিরও উল্লেখ রয়েছে। এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘হে লোক সকল! আমি যাকে আদায়কারী নিযুক্ত করি সে যদি একটি সূচ বা তার চেয়েও হালকা জিনিস ছুরি করে তবে তা আত্মসাত ক্লপেই গণ্য হবে এবং তা নিয়ে সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে।’ এ কথা শুনে হ্যরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ) নামক শ্যাম বর্ণের একজন আনসারী দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তাহলে আদায়কারী নিযুক্ত হতে অঙ্গীকৃতি জ্ঞাপন করছি।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেন, ‘কেন?’ তিনি বলেন, আপনার এ উক্তির কারণে।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেন, হ্যাঁ, আরও জেনে রেখো যে, যার উপর আমি কোন কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করি তার উচিত হবে কম বেশী সব কিছুই নিয়ে আসা। যা তাকে দেয়া হবে তা সে গ্রহণ করবে এবং যা হতে বিরত রাখা হবে তা হতে বিরত থাকবে।’ এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও সুনান-ই-আবি দাউদেও রয়েছে। হ্যরত আবু রাফে’ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আসর নামাযের পরে প্রায়ই বানূ আব্দুল আসহালের ওখানে গমন করতেন এবং প্রায়ই মাগরিব পর্যন্ত তথায় জনসমাবেশ থাকতো। একদা মাগরিবের সময় তিনি তথা হতে ফিরে আসছিলেন। সময় সংকীর্ণ ছিল বলে তিনি দ্রুত পদে চলছিলেন। ‘বাকীতে’ (জান্নাতুল বাকী নামক গোরস্থান) পৌছে তিনি বলেনঃ ‘তোমার প্রতি অভিশাপ! তোমার প্রতি অভিশাপ!’ আমি মনে করি যে, তিনি আমাকেই বলছেন। তাই আমি আমার কাপড় ঠিকঠাক করতে গিয়ে তাঁর পিছনে পড়ে যাই। তিনি আমাকে বললেনঃ ‘ব্যাপার কি?’ আমি বলি- ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার এ উক্তির কারণে আমি পিছনে থেমে গিয়েছিলাম।’ তিনি বলেন, ‘আমি তোমাকে বলিনি, বরং এটি অমুক ব্যক্তির সমাধি। আমি তাকে অমুক গোত্রের আদায়কারী করে পাঠিয়েছিলাম। সে একটি চাদর লুকিয়ে নিয়েছিল। ঐ চাদরটি এখন আগুন হয়ে তার উপর জুলতে রয়েছে।’ (মুসনাদ-ই-আহমাদ) হ্যরত উবাদা ইবনে সাবিদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) গনীমতের

মালের উষ্ট্রপৃষ্ঠের কিছু লোম গ্রহণ করতেন, অতঃপর বলতেনঃ ‘এতে আমার ঐ অধিকারই রয়েছে যে অধিকার তোমাদের কোন একজনের রয়েছে। তোমরা আত্মসাত হতে দূরে থাক। কিয়ামতের দিন আত্মসাতকারী লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। সুচ ও সূতাও পৌছিয়ে দাও এবং তদপেক্ষা নগণ্য জিনিসও (পৌছিয়ে দাও)। আল্লাহর পথে নিকটবর্তীদের সাথে এবং দূরবর্তীদের সাথে যুদ্ধ কর। যুদ্ধ স্বদেশেও কর এবং বিদেশেও কর। জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা। জিহাদের কারণে আল্লাহ তা'আলা কাঠিন্য হতে এবং দুঃখ ও চিন্তা হতে মুক্তি দিয়ে থাকেন। আল্লাহর শান্তি নিকটবর্তীদের উপর ও দূরবর্তীদের উপর জারী কর। আল্লাহর কাজ হতে কোন তিরক্ষারকারীর তিরক্ষার যেন তোমাদেরকে বিরত না রাখে’। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) এ হাদীসের কিছু অংশ সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যেও বর্ণিত আছে। হ্যরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে আদায়কারী করে পাঠাবার ইচ্ছে করে বলেনঃ ‘হে আবু মাসউদ! যাও আমি তোমাকে যেন কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় না পাই যে, তোমার পৃষ্ঠোপরি শব্দকারী উট থাকে যা তুমি আত্মসাত করে নিয়েছো।’ আমি বলি-হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তাহলে যেতে চাই না। তখন তিনি বলেনঃ ‘আচ্ছ ঠিক আছে, আমি তোমাকে জোরপূর্বক পাঠাতেও চাইনে।’ (সুনান-ই-আবি দাউদ) ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ)-এর ঘন্টে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যদি কোন পাথর জাহান্নামে নিষ্কেপ করা হয় অতঃপর ওটা সত্ত্ব বছর পর্যন্ত চলতে থাকে তথাপি জাহান্নামের তলদেশে পৌছতে পারবে না। আত্মসাতকৃত জিনিসকে ঐঝপভাবে জাহান্নামে নিষ্কেপ করা হবে এবং আত্মসাতকারীকে বলা হবে—‘যাও ওটা নিয়ে এসো।’ আল্লাহ পাকের *وَمِن يُغْلِبْ بَاتٍ بِسَاعَةٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ*—এ উক্তির ভাবার্থ এটাই। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, খাইবারের যুদ্ধের দিন সাহাবা-ই-কিরাম আসেন ও বলেন, অমুক শহীদ, অমুক শহীদ। একটি লোক সম্বন্ধে এ কথা বলা হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ‘কখনই নয়, আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি। কেননা, সে গনীমতের মাল হতে একটি চাদর আত্মসাত করেছিল।’ অতঃপর তিনি বলেন, ‘হে উমার ইবনে খান্তাব! তুমি যাও এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, শুধুমাত্র ঈমানদারগণই জান্নাতে যাবে।’ হ্যরত উমার (রাঃ) বলেন, ‘আমি গিয়ে এটা ঘোষণা করে দেই।’ এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও জামেউত্ তিরমিয়ীর মধ্যেও রয়েছে। ইমাম

তিরিমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, একদা হ্যরত উমার (রাঃ) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উনায়েস (রাঃ)-এর সঙ্গে সাদকা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্নের ঘোষণা শুনেননি? তিনি সাদকার মধ্যে বিশ্বাসবাতকতাকারীর সম্বন্ধে বলেছেন, ‘ওর মধ্য হতে যে ব্যক্তি উট অথবা ছাগল নিয়ে নেবে, তাকে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে উঠতে হবে।’ হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তখন বলেন, ‘হ্যাঁ।’ এ বর্ণনাটি সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যেও রয়েছে। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে হ্যরত সা’দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে সাদকা আদায়কারী হিসেবে পাঠাবার ইচ্ছে করে বলেন, ‘হে সা’দ! এরূপ যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন তুমি উচ্চ শব্দকারী উট বহন করে আগমন কর।’ তখন হ্যরত সা’দ (রাঃ) বলেন, ‘আমি এ পদ গ্রহণও করব না, সুতরাং এরূপ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না।’ অতএব রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে এ কার্য হতে নিষ্ক্রিয় দান করেন। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, কুম যুদ্ধে হ্যরত মুসলিম ইবনে আবদুল মালিকের সঙ্গে হ্যরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহও ছিলেন। এক ব্যক্তির মালপত্রের মধ্যে কিছু আস্তাতের মালও পাওয়া যায়। সেনাপতি হ্যরত সালিমকে ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে ফতওয়া জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং তাঁর পিতা হ্যরত উমার ইবনে খান্তাব (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘কারও মালপত্রের মধ্যে তোমরা চুরির মাল পেলে তা পুড়িয়ে ফেলবে।’ বর্ণনাকারী বলেন, ‘আমার ধারণা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথাও বলেনঃ ‘এবং তাঁকে শাস্তি প্রদান করবে।’ ঐ লোকটির মাল বাজারের মধ্যে বের করা হলে ওর মধ্যে একখানা কুরআন মাজীদও পাওয়া যায়। হ্যরত সালিমকে পুনরায় ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘ওটা বিক্রি করে মূল্য সাদকা করে দিন।’ এ হাদীসটি সুনান-ই-আবি দাউদ এবং জামেউত তিরিমিয়ীর মধ্যেও রয়েছে। ইমাম আলী ইবনে মাদীনী (রঃ) এবং ইমাম বুখারী (রঃ) প্রভৃতি বলেন যে, এ হাদীসটি মুনকার। ইমাম দারেকুতনী (রঃ) বলেন, ‘সঠিক কথা এই যে, এটা হ্যরত সালিম (রঃ)-এর ফতওয়া।’ হ্যরত ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং তাঁর সঙ্গীগণেরও এটাই উক্তি। হ্যরত হাসান বসরীও (রঃ) এ কথাই বলেন। হ্যরত আলী (রাঃ) বলেন যে, তার মালপত্র জ্বালিয়ে দেয়া হবে, তাকে দাসের

‘হুন্দ’ অপেক্ষা কম প্রহার করা হবে এবং তাকে গনীমতের কোন অংশ দেয়া হবে না। ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ) এবং জমছুরের মাযহাব এর বিপরীত। তাঁরা বলেন যে, তার আসবাবপত্র জুলিয়ে দিতে হবে না, বরং ওর তুল্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আত্মসাতকারীর জানায়ার নামায পড়তে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তার আসবাবপত্র জুলিয়ে দেননি। মুসলাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, যখন কুরআন কারীমের পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয় তখন হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) জনগণকে বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে কেউ পারলে যেন ওটা গোপন করে রাখে। কেননা, যে ব্যক্তি যে জিনিস গোপন করে রাখবে ঐ জিনিস নিয়েই সে কিয়ামতের দিন আগমন করবে।’ অতঃপর তিনি বলেন ‘আমি সন্তুষ্ট বার রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ভাষায় পাঠ করেছি। তবে কি আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পড়িয়ে দেয়া আয়াতকে পরিত্যাগ করবো?’ ইমাম অকী’ও স্বীয় তাফসীরে এটা এনেছেন। সুনান-ই-আবি দাউদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, যখন গনীমতের মাল আসতো তখন তিনি হ্যরত বেলাল (রাঃ)-কে দিয়ে ঘোষণা করে দিতেনঃ ‘যার কাছে যা আছে তা যেন সে নিয়ে আসে।’ অতঃপর তিনি তা হতে এক পঞ্চমাংশ বের করে নিতেন এবং অবশিষ্ট বন্টন করে দিতেন। একবার এক ব্যক্তি এর পরে একগুচ্ছ চুল নিয়ে হাফির হয় এবং বলে, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা আমার নিকট রয়ে গিয়েছিল।’ তিনি বলেনঃ ‘হ্যরত বেলাল (রাঃ) যে তিনবার ঘোষণা করেছেন তা কি শুনতে পাওনি?’ সে বলেঃ ‘হাঁ, পেয়েছিলাম।’ তিনি বলেনঃ ‘তখন আননি কেন?’ সে ওয়র পেশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘আমি এটা আর কখনও নেব না। তুমি এটা কিয়ামতের দিন নিয়ে যেয়ো।’ এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যারা আল্লাহর শরীয়তের উপর চলে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করে, তাঁর পুণ্যের অধিকারী হয় এবং তাঁর শাস্তি হতে পরিত্রাণ পায় আর যারা তাঁর ক্রোধে পতিত হয় এবং মৃত্যুর পর জাহানামে নিষ্ক্রিয় হয় এ দু’দল কি কখনও সমান হতে পারেঃ কুরআন কারীমের মধ্যে অন্য জায়গা রয়েছেঃ ‘যারা আল্লাহর কথাকে সত্য বলে স্বীকার করেছে এবং যারা ওটা হতে অস্বীকার করে তারা সমান নয়।’ অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছে— ‘যাদের সঙ্গে আল্লাহর উপর ওয়াদা হয়ে গেছে এবং যা তারা প্রাপ্ত হবে, তারা এবং দুনিয়ার উপকার লাভকারীরা সমান নয়।’ এরপর আল্লাহ পাক বলেন—‘ভাল ও মন্দের অধিকারীরা ভিন্ন সোপানের উপর রয়েছে; ওরা রয়েছে জান্নাতের সোপানে এবং এরা রয়েছে

জাহান্নামের সোপানে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে—**وَلِكُلِّ دَرْجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا** অর্থাৎ ‘প্রত্যেকের জন্যে তাদের কার্য অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ রয়েছে’। তারপরে আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা কার্যাবলী দেখতে রয়েছেন এবং অতিসত্ত্বেই তিনি সকলকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন; না পুণ্য মারা যাবে, না পাপ বৃদ্ধি পাবে বরং আমল অনুযায়ী প্রতিদান ও শান্তি দেয়া হবে।’ এরপর আল্লাহপাক বলেনঃ ‘মুমিনদের উপর আল্লাহর বড় অনুগ্রহ রয়েছে যে তিনি তাদের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্য হতেই একজন নবী পাঠিয়েছেন যেন তারা তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতে পারে, জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে, তাঁর পার্শ্বে উঠতে বসতে পারে এবং পূর্ণভাবে উপকার গ্রহণ করতে পারে।’ যেমন অন্য স্থানে রয়েছেঃ

**قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَّا هُوَ وَاحِدٌ**

অর্থাৎ ‘হে নবী (সঃ)! তুমি বল নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই মানুষ, আমার নিকট এই প্রত্যাদেশ হয়েছে যে নিশ্চয়ই তোমাদের মা’বুদ একজনই বটে।’ (১৮: ১১০) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

**وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكِلُونَ الطَّعَامَ وَمَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ**

অর্থাৎ ‘হে নবী! তোমার পূর্বেও আমি যত নবী পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই খাদ্য ভক্ষণ করতো এবং বাজারসমূহে চলাফেরা করতো।’ (২৫: ২০) অন্য স্থানে রয়েছেঃ

**وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أهْلِ الْقُرْبَى**

অর্থাৎ ‘তোমার পূর্বেও আমি পুরুষ লোকদের নিকটই অহী করেছিলাম যারা পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী ছিল।’ (১২: ১০৯) আর এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

**يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّمَا يَأْكِلُ رُسُلُّنَا مِنْكُمْ**

অর্থাৎ ‘হে দানব ও মানবগণ! তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতেই রাসূলগণ আসেনি?’ মোটকথা এটা পূর্ণ অনুগ্রহ যে সৃষ্টিজীবের নিকট তাদেরই মধ্য হতে রাসূল পাঠান হয়েছে যেন তারা তাঁদের সঙ্গে উঠা বসা করে বার বার প্রশ্নাওত্তর করতঃ ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারে। তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, রাসূল (সঃ) জনগণের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে থাকেন

অর্থাৎ কুরআন কারীম পাঠ করে তাদেরকে শুনিয়ে থাকেন, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে থাকেন। এভাবে তিনি তাদের মধ্যে হতে শ্রিক ও অজ্ঞতার অপবিত্রতা দূর করতঃ তাদেরকে নির্মল ও পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এ রাসূল (সঃ)-এর আগমনের পূর্বে মানুষ স্পষ্ট ভান্তির মধ্যে ছিল। তাদের মধ্যে প্রকাশ অন্যায় ও পূর্ণ অজ্ঞতা বিরাজমান ছিল।

১৬৫। হ্যাঁ, যখন তোমাদের উপর

বিপদ উপস্থিত হলো বস্তুতঃ  
তোমরাও তাদের প্রতি  
তদনুরূপ দু'বার বিপদ  
উপস্থিত করেছিলে, যখন  
তোমরা বলছিলে— এটা কোথা  
হতে হলো? তুমি বল— ওটা  
তোমাদের নিজেদেরই নিকট  
হতে; নিচয়ই আল্লাহ সর্ব  
বিষয়রোপণি শক্তিমান।

১৬৬। এ দু' দলের সম্মুখীন  
হওয়ার দিবস তোমাদের  
উপর যা উপনীত হয়েছিল,  
তা আল্লাহরই ইচ্ছাক্রমে;  
এবং তদ্বারা আল্লাহ  
বিশ্বাসীদেরকে বিজ্ঞপিত  
করেন।

১৬৭। আর তদ্বারা তিনি  
কপটদেরকে পরিচিত করেন;  
এবং তাদেরকে বলা  
হয়েছিল— এসো, আল্লাহর  
পথে সংগ্রাম কর অথবা  
তাদেরকে বিনাশ কর; তারা  
বলেছিল— যদি আমরা যুদ্ধ

১৬৫- أَوْلَمَّا أَصَابَتُكُمْ  
مُّصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِّثْلِهَا  
قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا قَلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ  
أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

১৬৬- وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقْرِيْ  
الْجَمْعُونَ فِي سِادِنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمُ  
الْمُؤْمِنِينَ ○

১৬৭- وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا  
وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتَلُوا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لَدُفَعُوا قَاتَلُوا لَوْ  
نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْغُونَكُمْ هُمْ

করতে জানতাম, তবে কি  
আমরা তোমাদের অনুগমন  
করতাম না? তারা সেদিন  
বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসের  
নিকটবর্তী ছিল; তাদের  
অন্তরে যা নেই তাই তারা  
যুক্ত বলে থাকে এবং তারা যে  
বিষয় গোপন করে, আল্লাহ  
তা পরিজ্ঞাত আছেন।

১৬৮। যারা গৃহে বসে স্বীয়  
ভাত্তগণের সমন্বে বলেছিল,  
যদি তারা আমাদের কথা  
মান্য করতো তবে নিহত  
হতো না; তুমি বল— যদি  
তোমরা সত্যবাদী হও তবে  
নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা  
কর।

এখানে যে বিপদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে উহুদ যুদ্ধের বিপদ। এ  
যুদ্ধে সন্তরজন সাহাবী শহীদ হন। কিন্তু মুসলমানগণ এর দ্বিতীয় বিপদ  
কাফিরদেরকে পৌছিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে সন্তরজন কাফির নিহত  
হয়েছিল এবং সন্তরজন বন্দী হয়েছিল। মুসলমানগণ পরম্পর বলাবলি করেন যে,  
এ বিপদ কি করে আসলো? আল্লাহ তাআলা উহুরে বলেন—‘এ বিপদ তোমাদের  
নিজেদের পক্ষ হতেই এসেছে।’ হ্যরত উমার ইবনে খাতাব (রাঃ) বর্ণনা  
করেন, “বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণ মুক্তিপণ নিয়ে যেসব কাফিরকে মুক্তি  
দিয়েছিলেন তারই শাস্তি স্বরূপ উহুদের যুদ্ধে সন্তরজন সাহাবীকে শহীদ করা  
হয়, তাঁদের মধ্যে পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সম্মুখের  
চারটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। তাঁর মাথার পাগড়ি পড়ে যায় এবং চেহারা মুবারক  
রক্তাঙ্গ হয়ে যায়। উক্ত আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি  
হাতিম ও মুসনাদ-ই-আহমাদ) হ্যরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে,  
হ্যরত জিবরাইল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং

لِّلْكُفَّرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ  
لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِآفْوَاهِهِمْ  
مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ  
أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ  
— ۱۶۸ —  
وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا  
فَلَمْ يَأْتُوكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ  
الْمَوْتُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

বলেনঃ ‘হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনার গোত্রের লোক যে কাফিরদেরকে বন্দী করেছে এটা আল্লাহ পাকের নিকট পছন্দীয় নয়। এখন দু’টি সিদ্ধান্তের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের নির্দেশ দিন। হয় তারা বন্দীদেরকে হত্যা করে ফেলবে না হয় মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেবে। কিন্তু পরে এ সংখ্যক মুসলমানও শহীদ হয়ে যাবে।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদেরকে একত্রিত করে এ দু’টি সিদ্ধান্তই পেশ করেন। তাঁরা বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এরা আমাদের গোত্রীয় লোক এবং আমাদের আজ্ঞায়-স্বজন। সুতরাং মুক্তিপণ আদায় করে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক। আর এ অর্থ দ্বারা আমরা শক্তি অর্জন করতঃ অন্যান্য শক্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো এবং আমাদের মধ্য হতে যে এতজন লোক শহীদ হবেন তাতে আমাদের ক্ষতি কি?’ এরপে ক্ষতিপূরণ আদায় করে সন্তরজন বন্দীকে ছেড়ে দেয়া হয়। উভদ যুদ্ধে ঠিক সন্তরজন মুসলমানই শহীদ হন। (জামেউত তিরমিয়ী ও সুনান-ই-নাসাই) সুতরাং এক ভাবার্থতো এই হলো যে, এটা স্বয়ং মুসলমানদের পক্ষ হতেই হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা এই শর্তে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছিলেন যে, তাঁদের মধ্য হতেও এ সংখ্যক মুসলমান শহীদ হবেন এবং ঘটেছিলও তাই। দ্বিতীয় ভাবার্থ হচ্ছে—‘তোমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অবাধ্য হয়েছিলে বলেই তোমাদেরকে এ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।’ তীরন্দাজগণকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের স্থান হতে সরতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু ঐ নিষেধ সত্ত্বেও তাঁরা উক্ত স্থান হতে সরে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা’আলা প্রত্যেক জিনিসের উপর সক্ষম। তিনি যা চান তাই করেন, যা ইচ্ছে করেন তাই নির্দেশ দেন। কেউ তাঁর নির্দেশের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পরে না। দু’টি দলের মুখোমুখী হওয়ার দিন (হে মুমিনগণ!) তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছিল, যেমন তোমরা শক্রদের মোকাবিলা করতে গিয়ে পলায়ন করেছিলে, তোমাদের কতক লোক শহীদ হয়েছিল এবং কিছু আহতও হয়েছিল, এ সবকিছু আল্লাহ তা’আলার ইচ্ছাক্রমেই হয়েছিল। এর একটি কারণ ছিল এই যে, এর মাধ্যমে অটল ও দৃঢ় ঈমানের লোক এবং মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করা হয়। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এবং তার সঙ্গীয়া যারা রাস্তা হতে ফিরে এসেছিল। একজন মুসলমান তাদেরকে বুবিয়ে বলেছিলেন, ‘এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর কিংবা কমপক্ষে ঐ আক্রমণকারীদেরকে পিছনে সরিয়ে দাও।’ কিন্তু তারা কৌশল করে বলে, ‘আমরা যুদ্ধবিদ্যায় মোটেই পারদর্শী নই। আমরা যুদ্ধবিদ্যা জানলে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম।’ ওরা যদি কমপক্ষে মুসলমানদের সঙ্গেও থাকতো তাহলেও কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করা যেতো। কেননা এর ফলে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী দেখানো হতো বা তারা দু’আ করতো, কিংবা প্রস্তুতি

গ্রহণ করতো । তাদের উপরের কথার ভাবার্থ নিম্নরূপও বর্ণনা করা হয়েছেঃ ‘আমরা যদি জানতে পারতাম যে, সত্য সত্যই তোমারা শক্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের সহযোগিতা করতাম । কিন্তু আমরা জানি যে, যুদ্ধ হবেই না । সীরাত-ই-মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকে রয়েছে যে, ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক হাজার লোক নিয়ে উহুদের প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হন । পথে গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বিদ্রোহী হয়ে যায় এবং বলে, ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ) অন্যদের কথা শুনে মদীনার বাইরে চলে আসলেন এবং আমার কথা শুনলেন না । আল্লাহর শপথ! কোন্ উপকারকে লক্ষ্য করে যে আমরা প্রাণ বিসর্জন দেবো তা আমাদের মোটেই জানা নেই । হে লোক সকল! কেন তোমরা জীবন হারাতে যাচ্ছ কপট ও সন্দেহ পোষণকারী যত লোক সবাই তার কথা মেনে নেয় এবং এক তৃতীয়াৎ্শ সৈন্য নিয়ে সে দুষ্ট ফিরে আসে । বানু সালমার ভাই হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রাঃ) তাদেরকে বুঝিয়ে বলেন, ‘হে আমার গোত্র! স্বীয় নবী (সঃ)-কে ও স্বীয় সম্প্রদায়কে অপদস্থ করো না । তাঁদেরকে শক্রের সম্মুকে নিষ্কেপ করে তোমরা পলায়ন করো না ।’ কিন্তু তারা কৌশল অবলম্বন করে বলে, ‘আমরা জানি যে যুদ্ধ হবেই না ।’ মুসলমানগণ তাদেরকে বুঝাতে অসমর্থ হয়ে অবশেষে বলেন, ‘হে আল্লাহর শক্রের দল! যাও আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করুন! তোমাদের কোনই প্রয়োজন নেই । আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সঃ)-এর সাহায্যকারী ।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে ছেড়ে সম্মুখে অগ্রসর হন । ইরশাদ হচ্ছে—‘সে দিন তারা বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসের বেশী নিকটবর্তী ছিল ।’ এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মানুষের অবস্থা বিভিন্ন প্রকারের । কখনও সে কুফরীর নিকটবর্তী হয় এবং কখনও ঈমানের নিকটবর্তী । এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘তাদের অন্তরে যা নেই তা তারা মুখে বলে থাকে ।’ যেমন তারা বলে থাকে—‘আমরা যদি যুদ্ধ হওয়ার কথা জানতাম তবে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থাকতাম ।’ অথচ তারা নিশ্চিতরূপে জানতো যে, মুশরিকরা মুসলমানদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে দুনিয়ার বুক হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । কেননা, ইতিপূর্বে বদরের যুদ্ধে তাদের বড় বড় নেতারা নিহত হয়েছিল । কাজেই তারা এখন দুর্বল মুমিনদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালিয়েছে । সুতরাং এক তয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে । তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘তাদের অন্তরের গোপনীয় কথা আমি খুব ভালভাবেই জানি ।’ এ লোকগুলো ওরাই যারা তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলেছিল, ‘যদি এরা আমাদের পরামর্শ মত কাজ করতো এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতো তবে কখনও নিহত হতো না’ ।

এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'যদি তোমাদের এ কথা সঠিক হয় যে, মানুষ যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত না হলে মৃত্যু হতে রক্ষা পেয়ে যাবে তবে তো তোমাদের না মরাই উচিত, কেননা তোমরা তো বাড়ীতেই বসে রয়েছো। কিন্তু এটা স্পষ্ট কথা যে, একদিন তোমরাও মৃত্যুবরণ করবে, যদিও সুদৃঢ় ও সুউচ্চ অট্টালিকায় আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি তোমাদেরকে তখনই সত্যবাদী মনে করতে পারি যখন তোমরা নিজেরেদকে মৃত্যু হতে রক্ষা করতে পারবে।' হ্যরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'এ আয়াতটি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এবং তার সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।'

### ১৬৯। যারা আল্লাহর পথে নিহত

হয়েছে, তাদেরকে মৃত ধারণা করো না; বরং তারা জীবিত, তারা তাদের প্রতিপালক হতে জীবিকা প্রাণ হয়েছে।

### ১৭০। আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে যা দান করেছেন, তাতেই তারা পরিতৃষ্ট; এবং যারা পশ্চাতে থেকে তাদের সাথে সম্বিলিত হয়নি, তাদের এ অবস্থার প্রতিও তারা সন্তুষ্ট হয় যে, তাদের কোন ভয় নেই, এবং তারা দুঃখিত হবে না।

### ১৭১। তারা আল্লাহর নিকট হতে অনুগ্রহ ও নিয়ামত লাভ করার কারণে আনন্দিত হয়, আর এ জন্যে যে, নিচয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

وَلَا تَحْسِبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ  
أَحْيَاهُ اللَّهُ وَرَبُّهُمْ يَرْزُقُونَ ۝

فَرِحِينٌ بِمَا أُتْهُمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ  
بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ  
خَلْفِهِمُ الْأَخْوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا  
هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ  
وَفَضْلِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ  
أَجَرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১৭২। যারা আঘাত পাওয়ার  
পরেও আল্লাহ ও রাসূলকে  
স্বীকার করেছিল- তাদের  
মধ্যে যারা সৎকার্য করেছে ও  
সংযত হয়েছে, তাদের জন্যে  
মহান প্রতিদান ।

১৭৩। যাদেরকে লোকেরা  
বলেছিল, নিশ্চয়ই তোমাদের  
বিরুদ্ধে সেসব লোক সমবেত  
হয়েছে- অতএব তোমরা  
তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এতে  
তাদের বিশ্বাস পরিবর্ধিত  
হয়েছিল, আল্লাহই তাদের  
পক্ষে যথেষ্ট এবং মঙ্গলময়  
কর্মবিধায়ক ।

১৭৪। অনন্তর তারা আল্লাহর  
অনুগ্রহ সম্পদসহ প্রত্যাবর্তিত  
হয়েছিল, তাদেরকে অঙ্গসূ  
শ্পর্শ করেনি এবং তারা  
আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ  
করেছিল; আর আল্লাহ মহান  
গৌরবশালী ।

১৭৫। নিশ্চয়ই শয়তান শুধুমাত্র  
তার বক্রগণ হতে  
তোমাদেরকে ভয় থদর্শন  
করে; কিন্তু যদি তোমরা  
বিশ্বাসী হও তবে তাদেরকে  
ভয় করো না এবং আমাকেই  
ভয় কর ।

১৭২- **الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ  
وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ  
الْقَرْحَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ  
وَاتَّقُوا أَجْرًا عَظِيمًا**

১৭৩- **الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ  
إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعْتُمْ  
فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادُهُمْ إِيمَانًا  
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ  
الْوَكِيلُ**

১৭৪- **فَانْتَقَلُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ  
وَفَضْلٍ لِمَ يَمْسِسُهُمْ سُوءٌ  
وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ**

**ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ**  
১৭৫- **إِنَّمَا ذِلِّكُمُ الشَّيْطَانُ  
يُخَوِّفُ أُولِيَّاً هُ فَلَا تَخَافُوهُمْ  
وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ**

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন-'আল্লাহর পথে শহীদ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলেও আখেরাতে তাদের আত্মা জীবিত থাকে এবং আহার্য প্রাপ্ত হয়। এ আয়াতটির শান-ই-নযুল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 'চল্লিশ অথবা সত্তরজন সাহাবীকে 'বীরে মুআওনাহ' -এর দিকে পাঠিয়েছিলেন। এ দলটি যখন ঐ কৃপের উপরে অবস্থিত গুহা পর্যন্ত পৌছেন তখন তাঁরা তথায় শিবির স্থাপন করেন। তাঁরা পরম্পর বলাবলি করেন, 'এমন কে আছে যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আল্লাহর রাসূলে (সঃ)-এর কালেমাকে ঐ পর্যন্ত পৌছাতে পারে?' একজন সাহাবী ঐ জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং ঐসব লোকের বাড়ীর নিকটে এসে উচ্চেঃস্বরে বলেন, 'হে বীরে মুআওনার অধিবাসীবৃন্দ! জেনে রেখো যে, আমি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর একজন দৃত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র মা'বুদ এবং মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।' এ কথা শুনামাত্রই এক কাফির তীর নিয়ে বাড়ী হতে বেরিয়ে আসে এবং এমনভাবে লক্ষ্য করে চালিয়ে দেয় যে, তাঁর পঞ্জরের এক দিক দিয়ে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঐ সাহাবীর মুখ দিয়ে স্বতঃকৃতভাবে 'বেরিয়ে যায়ঃ فَرِّجْ وَ بُرْبُرْ لِكَعْبَةِ أَرْثَاءِ' কাঁবার প্রভুর শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি। তখন কাফিরেরা পদচিহ্ন ধরে ঐ গুহা পর্যন্ত পৌছে যায় এবং তাদের নেতা আ'মের ইবনে তোফায়েল ঐ সব মুসলমানকে শহীদ করে দেয়। হ্যরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'তাদের সমক্ষে কুরআন কারীমের আয়াত অবতীর্ণ হয়। তাঁদের উক্তি যেন নিম্নরূপ, 'আমাদের পক্ষ হতে আমাদের সম্প্রদায়কে এ সংবাদ জানিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।' আমরা বরাবর এ আয়াতগুলো পড়তে থাকি। অতঃপর কিছুদিন পর ঐগুলো রাহিত করে দিয়ে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং لَخَسِنَ -এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মুহাম্মাদ ইবনে জারীর) সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে, হ্যরত মাসরুক (রঃ) বলেন, 'আমরা হ্যরত আব্দুল্লাহ (রাঃ)-কে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেনঃ 'তাদের আত্মাসমূহ সবুজ রং-এর পাখীর দেহের মধ্যে রয়েছে। তাদের জন্যে আরশে লটকান প্রদীপসমূহ রয়েছে। সারা জান্নাতের মধ্যে তারা যে কোন জায়গায় বিচরণ করে এবং ঐ প্রদীপসমূহে আরাম লাভ করে থাকে। তাদের প্রভু তাদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বলেন-'তোমরা কিছু চাও কি?' তারা বলেঃ 'হে আল্লাহ! আমরা আর কি চাবো? জান্নাতের সর্বত্র আমরা

ইচ্ছেমত চলে ফিরে বেড়াছি। এরপরে আমরা আর কি চাইতে পারিঃ' আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পুনরায় এটাই জিজ্ঞেস করেন এবং তারা ঐ এক উত্তরই দেয়। তৃতীয় বার আল্লাহ পাক ঐ প্রশ্নই করেন। তারা যখন দেখে যে, কিছু চাওয়া ছাড়া উপায় নেই তখন বলে, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা চাই যে, আমাদের আজ্ঞাগুলো আপনি আমাদের দেহে ফিরিয়ে দিন। আমরা আবার দুনিয়ায় গিয়ে আপনার পথে যুদ্ধ করবো এবং শহীদ হবো'। তখন জানা হয়ে যায় যে, তাদের আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। সুতরাং 'তোমরা আর কি চাও?' এ প্রশ্ন করা হতে আল্লাহ তা'আলা বিরত থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যারা মারা যায় এবং আল্লাহর নিকট উত্তম স্থান লাভ করে তারা কখনও দুনিয়ায় ফিরে আসা পছন্দ করে না। কিন্তু শহীদগণ এ আকাংখা করে যে, তাদেরকে যেন পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তারা দ্বিতীয় বার আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ হতে পারে। কেননা, তারা স্বচক্ষে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) সহীহ মুসলিম শুরীফে এ হাদীসটি রয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ)-কে বলেনঃ 'হে জাবির! তুমিও জান যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার পিতাকে জীবিত করেছেন এবং তাকে বলেছেন-'হে আমার বান্দা! কি চাবে চাও?' তখন সে বলেছে, 'হে আল্লাহ! পৃথিবীতে আবার আমাকে পাঠিয়ে দিন, যেন আমি দ্বিতীয়বার আপনার পথে যুদ্ধ করে শহীদ হতে পারি।' আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন-'এটা তো আমি ফায়সালা করেই ফেলেছি যে, এখান হতে কেউ দ্বিতীয়বার ফিরে যাবে না।' তাঁর নাম ছিল হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম আনসারী (রাঃ)। সহীহ বুখারী শুরীফে রয়েছে, হ্যরত জাবির (রাঃ) বলেন, 'আমার পিতার শাহাদাত লাভের পর আমি কাঁদতে আরঞ্জ করি এবং তাঁর মুখ্যগুল হতে কাপড় সরিয়ে সরিয়ে বার বার তাঁর চেহারা দেখতে থাকি। সাহাবীগণ আমাকে নিষেধ করছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) নীরব ছিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলেনঃ 'হে জাবির! ক্রন্দন করো না। যে পর্যন্ত তোমার পিতাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া না হবে সে পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাঁদের ডানা দিয়ে তাঁকে ছায়া করে থাকবেন।' মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমাদের ভাইদেরকে যখন উভদের যুদ্ধে শহীদ করা হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের আজ্ঞাগুলোকে সবুজ পক্ষীসমূহের দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করেন যারা জান্নাতের বৃক্ষরাজির ফল ভক্ষণ করে, জান্নাতী নদীর পানি পান করে এবং আরশের

ছায়ার নীচে লটকানো প্রদীপের মধ্যে আরাম ও শান্তি লাভ করে। যখন পানাহারের একপ উত্তম জিনিস তারা প্রাপ্ত হয় তখন বলতে থাকে, ‘আমাদের জগতবাসী ভাইয়েরা যদি আমাদের উত্তম সুখভোগের সংবাদ পেতো, তাহলে তারা জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিতো না এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তো না। আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘তোমরা নিষ্ঠিত থাক। আমি জগতবাসীকে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দেবো।’ তাই আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতগুলো হ্যরত হামযা (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (মুসতাদরিক-ই-হাকিম) তাফসীর কারকগণ এ কথাও বলেছেন যে, উল্লেখের শহীদগণের ব্যাপারেই এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। আবু বকর ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) হ্যরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হ্যরত জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে দেখে বলেনঃ ‘হে জাবির (রাঃ)! তোমার কি হয়েছে যে, আমি তোমাকে চিন্তিত দেখছি?’ আমি বলি, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার পিতা শহীদ হয়েছেন এবং তাঁর উপর অনেক ঝগের বোৰা রয়েছে। তা ছাড়া আমার বহু ছেট ভাই বোনও রয়েছে। তিনি বলেনঃ ‘জেনে রেখো, আল্লাহ তা‘আলা যার সঙ্গে কথা বলেছেন পর্দার আড়াল থেকেই বলেছেন। কিন্তু তোমার পিতার সঙ্গে তিনি মুখোমুখী হয়ে কথা বলেছেন। তিনি তাকে বলেছেনঃ ‘তুমি আমার নিকট চাও। যা চাইবে তাই আমি তোমাকে দেবো।’ তোমার আবু বলেছে, ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই চাচ্ছি যে, আপনি আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যেন আমি আপনার পথে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে আসতে পারি।’ মহা সশ্রান্তি আল্লাহ তখন বলেছেন, ‘এ কথা তো আমি পূর্ব হতেই নির্ধারিত করে রেখেছি যে, কেউই এখান হতে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে যাবে না।’ তখন তোমার পিতা বলেন, ‘হে আমার প্রভু! আমার পরবর্তীদেরকে তাহলে আপনি এ মর্যাদার সংবাদ পৌঁছিয়ে দিন।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। বায়হাকীর মধ্যে এটুকু আরও বেশী আছে যে, হ্যরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তো আপনার ইবাদতের হকও আদায় করতে পারিনি।’ মুসলাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, শহীদগণ জান্নাতের দরজার উপর নদীর ধারে সরুজ গম্বুজের উপর রয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় তাদের নিকট জান্নাতী দান পৌঁছে যায়। হাদীস দু’টির মধ্যে অনুরূপতা এই যে, কতগুলো শহীদ এমন রয়েছেন যাঁদের আত্মাগুলো পাখীর দেহের অভ্যন্তরে রয়েছে, আবার

কতগুলো এমন রয়েছেন যাদের অবস্থান স্তুল হচ্ছে এ গম্বুজ। আর এও হতে পারে যে, তাঁরা জান্নাতের মধ্যে ঘুরাফেরা করার পর এখানে একত্রিত হন এবং এখানেই তাঁদেরকে আহার করান হয়। এখানে এ হাদীসগুলো আনয়ন করাও খুবই উপযোগী হবে যেগুলোর মধ্যে প্রত্যেক মুমিনের জন্যে এ সুসংবাদই রয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘মুমিনের আত্মা হচ্ছে একটি পাখী যে জান্নাতের বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে বেড়ায়। শেষে কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা‘আলা সকলকে দাঁড় করাবেন তখন ঐ আত্মাকে তার দেহে ফিরিয়ে দেবেন।’ এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণের মধ্যে তিনজন মর্যাদাসম্পন্ন ইমাম রয়েছেন, যাঁরা এমন চারজন ইমামেরই অন্তর্ভুক্ত যাদের মাযহাব মান্য করা হয়। প্রথম হচ্ছেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ)। তিনি এ হাদীসটি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফিউদ্দিন (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর শিক্ষক হচ্ছেন ইমাম মালিক ইবনে আনাস আসবাহী (রঃ)। সুতরাং ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ) এবং ইমাম মালিক (রঃ) এ তিনজন খ্যাতনামা ইমাম হচ্ছেন এ হাদীসের বর্ণনাকারী। অতএব, এ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈমানদারের আত্মা জান্নাতী পাখীর আকারে জান্নাতে অবস্থান করে এবং শহীদগণের আত্মা পূর্ব বর্ণনা হিসেবে সবুজ রং-এর পাখীর দেহে অবস্থান করে। এ আত্মাগুলো তারকারাজির ন্যায়। সাধারণ মুমিনদের আত্মা এই মর্যাদা লাভ করবে না। ওরা নিজে নিজেই উড়ে বেড়ায়। পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে, স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণার মাধ্যমে ঈমান ও ইসলামের উপর আমাদের মৃত্যু দান করেন, আমীন!

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন— ‘এ শহীদগণ যেসব সুখ ও শাস্তির মধ্যে রয়েছে তাতে তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং তাদের নিকট এটা ও খুশীর বিষয় যে, তাদের বন্ধু যারা তাদের পরে আল্লাহর পথে শহীদ হবে ও তাদের নিকট আগমন করবে, আগামীর জন্যে তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা যা দুনিয়ায় ছেড়ে এসেছে তজ্জন্যে তাদের কোন দুঃখ হবে না।’ আল্লাহ পাক আমাদেরকেও জান্নাত দান করুন! হ্যরত মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেনঃ ‘এর ভাবার্থ এই যে, তারা সন্তুষ্ট, কেননা তাদের ভাই বন্ধুদের মধ্যে যারা জিহাদে লিঙ্গ রয়েছে তারাও শহীদ হয়ে তাদের সুখের অংশীদার হবে এবং আল্লাহ তা‘আলার প্রতিদানে উপকৃত হবে।’ হ্যরত সুন্দী (রঃ) বলেনঃ ‘শহীদকে

একখানা পত্র দেয়া হয় যে, অমুক দিন তোমার নিকট অমুকের আগমন ঘটবে এবং অমুক দিন অমুক আসবে। সুতরাং যেমন দুনিয়াবাসী কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির আগমন সংবাদে খুশী হয়ে থাকে, তদুপ এ শহীদগণ ঐ শহীদদের আগমন সংবাদে সন্তুষ্ট হবে।' হ্যরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রঃ) বলেন, 'ভাবার্থ এই যে, যখন শহীদগণ জাল্লাতে গমন করেন এবং তথায় স্বীয় স্থান, করুণা ও সুখ-শান্তি দর্শন করেন তখন বলেন, 'যদি এ অবগতি আমাদের ঐ ভাইদের থাকতো যারা এখন পর্যন্ত দুনিয়াতেই রয়েছে, তবে তারা বীরত্বের সাথে প্রাণপণে যুদ্ধ করতো এবং এমন জায়গায় প্রবেশ করতো যেখান হতে জীবিত ফিরে আসার আশা থাকতো না, তাহলে তারাও আমাদের এ সুখ ভোগের অংশীদার হতো।' সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণকে তাঁদের এ সংশ্লেষণের কথা জানিয়ে দেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেন- 'আমি তোমাদের সংবাদ তোমাদের নবীর নিকট পৌছিয়ে দিয়েছি।' ফলে তাঁরা অত্যন্ত খুশী হন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বীরে মুআও'নার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা ছিলেন সন্তুরজন সাহাবী। তারা সবাই একই দিনে সকালে কাফিরদের তরবারীর আঘাতে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। তাঁদের হত্যাকারীদের জন্যে একমাস পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযে 'কুনুতে' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বদন্দু'আ করেন এবং তাদেরকে অভিশাপ দেন। তাদের ব্যাপারেই কুরআন কারীমের নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল- 'আমাদের সম্প্রদায়কে আমাদের সংবাদ পৌছিয়ে দিন যে, আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।' আল্লাহ পাক বলেন- 'তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করার দরুণ আনন্দিত হয়, আর এ জন্যেও আনন্দিত হয় যে, আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।'

হ্যরত আব্দুর রহমান (রঃ) বলেন যে, **يَسْتَبْشِرُونَ**-এ আয়াতটি সমস্ত মুমিনের ব্যাপারে প্রযোজ্য, শহীদ হোক আর নাই হোক। এরপে খুব কম স্থানই রয়েছে যেখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীদের মর্যাদার কথা বর্ণনা করার পর মুমিনদের প্রতিদানের বর্ণনা না করেন। অতঃপর ঐ খাঁটি মুমিনদের প্রশংসামূলক বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা 'হামরা-ই-আসাদের' যুদ্ধে আহত ও ক্ষত বিক্ষত হওয়া সন্দেশ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশক্রমে জিহাদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান। মুশরিকরা মুসলমানদেরকে বিপদ পৌছিয়ে ছিল, অতঃপর তারা বাড়ীর দিকে প্রস্থান করেছিল। কিন্তু পরে তাদের ধারণা হয় যে, সুযোগ খুব ভাল ছিল। মুসলমানেরা পরাজিত হয়েছিল এবং আহতও হয়েছিল, আর তাদের

বড় বড় বীর পুরুষেরা শহীদও হয়েছিল। কাজেই তাদের মতে তারা একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ করলে কাজই ফায়সালা হয়ে যেতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের এ মনোভাবের কথা জানতে পেরে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করতঃ বলেনঃ ‘তোমরা আমার সাথে চল। আমরা মুশরিকদের পিছনে ধাওয়া করবো যেন তাদের মধ্যে আস সৃষ্টি হয় এবং তারা যেন জেনে নেয় যে, মুসলমানেরাও শক্তিহীন হয়নি। তিনি শুধু তাঁদেরকেই সাথে নিয়েছিলেন যাঁরা উভদের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ছাড়া তিনি শুধু হ্যরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়েছিলেন। ক্ষত-বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আহ্বানে তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেন। হ্যরত ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, যখন মুশরিকরা উভদ হতে প্রত্যাবর্তন করে তখন পথে তারা চিন্তা করতঃ পরম্পর বলাবলি করে, ‘না তোমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করলে, না মুসলমানদের স্ত্রীদেরকে ধরে ফেললে। দুঃখের বিষয় তোমরা কিছুই করনি। চল, ফিরে যাই।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। তাঁরা সব প্রস্তুত হয়ে যান এবং মুশরিকদের পক্ষাদ্বাবন করেন। অবশেষে তারা হামরাউল আসাদ বা ‘বী’রে আবি উয়াইনা’ পর্যন্ত পৌছেন। মুশরিকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ‘আচ্ছা, আগামী বছর দেখা যাবে’ -এ কথা বলে তারা মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-ও মদীনায় ফিরে আসেন। এটাকেও একটি পৃথক যুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। এ পবিত্র আয়াতে ওরই বর্ণনা রয়েছে। উভদের যুদ্ধ ১৫ই শাওয়াল রোজ শনিবার সংঘটিত হয়েছিল। ১৬ই শাওয়াল রোজ রবিবার রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলেন, ‘হে জনগণ! শক্রদের অনুসন্ধানে চলুন এবং শুধুমাত্র তাঁরাই যাবেন যাঁরা গতকল্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। এ আহ্বান শুনে হ্যরত জাবির (রাঃ) উপস্থিত হয়ে আরয করেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! গতকালের যুদ্ধে আমি উপস্থিত ছিলাম না। কেননা, আমার পিতা হ্যরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) আমাকে বলেছিলে, ‘বৎস! তোমার সাথে তোমার এ ছোট ছোট বোনেরা রয়েছে। তুমি বা আমি কেউই এদেরকে একাকী এখানে ছেড়ে দু’জনই যাওয়া পছন্দ করি না। একজন যাবে এবং একজন এখানে থাকবে। আমার দ্বারা এটা হতে পারে না যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তুমি যাবে আর আমি এখানে বসে থাকবো। এ জন্যেই আমার আনন্দ এই যে, তুমি তোমার বোনদের নিকট অবস্থান কর এবং আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে গমন করি।’ এ কারণেই আমি ওখানেই ছিলাম

এবং আমার পিতা আপনার সাথে এসেছিলেন। এখন আমার আকাঞ্চ্ছা এই যে, আজ আপনি আমাকে আপনার সাথে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, শক্র যেন ভীত হয়ে পড়ে এবং তাদের পিছনে আসতে দেখে বুঝে নেয় যে, মুসলমানদেরও শক্তি কম নেই এবং তাদের সাথে মোকাবিলা করতে তারা অসমর্থ নয়। বানু আব্দুশ্শ শাহল গোত্রের একজন সাহাবী বর্ণনা করেন, 'উহুদের যুদ্ধে আমরা দু' ভাই উপস্থিত ছিলাম। ভীষণভাবে আহত হয়ে আমরা ফিরে আসছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আহ্বানকারী যখন শক্রদের পশ্চাদ্বাবনের জন্যে ডাক দেন তখন আমরা দু' ভাই পরম্পর বলাবলি করিঃ 'বড়ই দুঃখের বিষয় যে, না আমাদের নিকট কোন সোয়ারী আছে যে ওর উপর সোয়ার হয়ে আল্লাহর নবী (সঃ)-এর সঙ্গে গমন করি, না জখমের কারণে শরীরে এতটুকু শক্তি আছে যে, তাঁর সাথে পদব্রজে চলি।

সুতরাং বড়ই আফসোস যে, এ যুদ্ধ আমাদের হাত থেকে ছুটে যাবে। আমাদের অসংখ্য গভীর জখম আজ আমাদেরকে গমন হতে বিরত রাখবে।' কিন্তু আবার আমরা সাহসে বুক বেঁধে নেই। আমার ভাইয়ের তুলনায় আমার জখম কিছু হালকা ছিল। যখন আমার ভাই সম্পূর্ণরূপে অপারগ হয়ে যেতো এবং তার পা উঠতো না তখন কোনও রকমে আমি তাকে উঠিয়ে নিতাম। যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তাম তখন নামিয়ে দিতাম। এভাবে অতি কষ্টে আমরা সৈন্যদের নিকট পৌছেই গেলাম'। (সীরাত-ই-ইবনে ইসহাক) সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হ্যরত উরওয়া (রঃ)-কে বলেন, 'হে ভাগ্নে! তোমার দু' পিতা ঐ লোকদেরই অস্তর্ভুক্ত যাদের সম্মতে আল্লাহ' আল্লাহ' এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ হ্যরত যুবায়ের (রাঃ) ও হ্যরত সিদ্দিক (রাঃ)। উহুদের যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং মুশরিকরা সামনে অগ্রসর হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ধারণা হয় যে, না জানি এরা পুনরায় ফিরে আসে। তাই, তিনি বলেনঃ 'তাদের পশ্চাদ্বাবন করতে পারে একেবারে কেউ আছে কি?' এ কথা শুনা মাত্রই সন্তুষ্য সাহাবী প্রস্তুত হয়ে যান যাদের মধ্যে একজন ছিলেন হ্যরত আবু বকর (রাঃ) এবং একজন ছিলেন হ্যরত যুবায়ের (রাঃ)। এ বর্ণনাটি আরও অনেক সনদে বহু কিতাবে রয়েছে। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ)-এর গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আয়েশা

(রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘তোমার দু’জন পিতা ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত।’ কিন্তু এটা মারফু’ রূপে বর্ণনা করা ভুল ছাড়া কিছুই নয়। কেননা, এর ইসনাদগুলো বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের উল্টো। তাঁরা এ বর্ণনাটিকে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে মাওকুফরূপে এনেছেন। তাছাড়া এ জন্যেও যে, অর্থের দিক দিয়ে এর বিপরীত সাব্যস্ত আছে। হ্যরত যুবায়ের (রাঃ) হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-এর বাপ-দাদা কেউই হতেন না। সঠিক কথা এই যে, এ বর্ণনাটি হ্যরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর ভাগ্নে হ্যরত আসমা বিনতে আবৃ বকর (রাঃ)-এর ছেলে হ্যরত উরওয়া (রাঃ)-কে বলেছিলেন। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা’আলা আবৃ সুফইয়ানের অন্তরে সন্ত্বাস সৃষ্টি করেছিলেন এবং যদিও তিনি উহুদের যুদ্ধে কিছুটা সফলকাম হয়েছিলেন, তথাপি মকার দিকে গমন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণকে বলেনঃ ‘আবৃ সুফইয়ান তোমাদের ক্ষতি করে চলে গিয়েছেন। আল্লাহ তা’আলা তার অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করেছেন।’ উহুদের যুদ্ধ শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল এবং ব্যবসায়ীগণ যীকা’দা মাসে মদীনায় এসেছিলো। প্রতি বছর তারা বদর-ই-সুগরায় তাদের শিবির স্থাপন করতো। এবারও তারা এ ঘটনার পরে এখানে আগমন করেন। মুসলমানগণ যুদ্ধে আহত হওয়ায় ক্ষত-বিক্ষত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট তাঁরা নিজেদের কষ্টের কথা বর্ণনা করছিলেন এবং তাঁরা ভীষণ বিপদের মধ্যে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণকে এ কথার উপর উত্তেজিত করেন যে, তাঁরা যেন তাঁর সাথে গমন করেন। এ লোকগুলো এখন চলে যাবে এবং আবার হজ্রের সময় আসবে। সুতরাং আগামী বছর পর্যন্ত তাদের উপর এ ক্ষমতা চলবে না। কিন্তু শয়তান মুসলমানদেরকে ধর্মক দিতে এবং পথভ্রষ্ট করতে আরম্ভ করে। সে তাঁদেরকে বলে, ‘তোমাদেরকে ধ্রংস করার জন্যে মুশরিকরা সৈন্য প্রস্তুত করে ফেলেছে।’ এতে মুসলমানদের মন দমে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁদেরকে বলেনঃ ‘তোমাদের একজনও না গেলেও আমি একাই যাবো।’ অতঃপর উৎসাহ প্রদানের ফলে হ্যরত আবৃ বকর (রাঃ), হ্যরত উমার (রাঃ), হ্যরত উসমান (রাঃ), হ্যরত আলী (রাঃ), হ্যরত যুবায়ের (রাঃ), হ্যরত সা’দ (রাঃ), হ্যরত তালহা (রাঃ), হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), হ্যরত হ্যাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ), হ্যরত আবৃ উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ) প্রভৃতি সত্তর জন সাহাবী তাঁর সাথে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান। এ পরিত্র সেনাদল আবৃ সুফইয়ানের

অনুসন্ধানে বদর-ই-সুগরা পর্যন্ত পৌছে যান। তাঁদেরই মর্যাদা ও বীরত্বের বর্ণনা এ মুবারক আয়াতে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ সফরে মদীনা হতে আট মাইল দূরে ‘হামরা-ই-আসাদ’ নামক স্থান পর্যন্ত পৌছে যান। মদীনায় তিনি হ্যরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)-কে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। তথায় তিনি সোম, মঙ্গল ও বুধ এ তিনি দিন অবস্থান করেন এবং তৎপর মদীনায় ফিরে আসেন। তথায় অবস্থানকালীন সময়ে ‘খুয়াআ’ গোত্রের নেতা মা’বাদ খুয়ায়ী সেখান দিয়ে গমন করে। লোকটি নিজে মুশরিক ছিল। কিন্তু ঐ পুরো গোত্রের সাথে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গি হয়েছিল। ঐ গোত্রের মুশরিক ও মুমিন নির্বিশেষে তাঁর মঙ্গলাকাঞ্চী ছিল। সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলে, ‘আপনার সঙ্গীদেরকে কষ্ট পৌছেছে বলে আমরা খুব দুঃখিত। আল্লাহ তা’আলা আপনাকে ও আপনার সহচরগণকে নিরাপদে রাখুন।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হামরা-ই-আসাদে পৌছার পূর্বেই আবু সুফিয়ান প্রস্থান করেছিলেন। যদিও তার ও তার সঙ্গীদের ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল যে, মুসল্মানদেরকে হত্যা করে এবং আহত করে তাদের উপর বিজয় লাভের পরেও তাদের অবশিষ্টদেরকে হত্যা না করা ভুল হয়েছে। কাজেই ফিরে গিয়ে তাদের সকলকেই হত্যা করা উচিত। একথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, মা’বাদ খুয়ায়ীর তথায় আগমন ঘটেছিল। আবু সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘বল, সংবাদ কি?’ সে বলে, ‘রাসূলুল্লাহ স্বীয় সাহাবীবর্গসহ তোমাদের পিছনে আসছেন। তাঁরা অত্যন্ত রাগাভিত হয়েছেন। যাঁরা পূর্ব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি তাঁরাও আসছেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে গেছে এবং তাঁরা পূর্ণ শক্তির সাথে আক্রমণে উদ্যত হয়েছেন। আমি এরূপ সেনাবাহিনী পূর্বে কখনও দেখিনি।’ একথা শুনে আবু সুফিয়ানের আকেল গুড়ুম হয়ে যায়। তিনি মা’বাদ খুয়ায়ীকে বলেন, ‘তোমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া ভালই হলো। নতুন আমরা তো স্বয়ং তাদের দিকে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম।’ মা’বাদ বলে, ‘কখনও এরূপ ইচ্ছে করো না। আমার কথা কি? তোমরা এ স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই হয়তো স্বয়ং ইসলামী সেনাবাহিনীর অশ্বসমূহ দেখতে পাবে। আমি তাঁদের সেনাবাহিনী, তাঁদের বীরত্ব, ক্রোধ, প্রস্তুতি এবং দৃঢ় সংকল্পের কথা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম। আমি তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলছি যে, তোমরা অতি তাড়াতাড়ি পলায়ন কর ও নিজেদের প্রাণ রক্ষা কর। আমি তাদের ভয়াবহ প্রস্তুতির কথা পূর্ণভাবে বর্ণনা করতে পারছি না। সংক্ষেপ কথা এই যে, প্রাণ বাঁচাতে হলে শীঘ্ৰই এখান হতে প্রস্থান কর।’ আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা হতবুদ্ধি হয়ে মক্কার পথ ধরে।

আবদুল কায়েস গোত্রের লোক, যারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদীনা যাচ্ছিল, তাদেরকে আবু সুফিইয়ান বলেন, ‘তোমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমাদের সম্বন্ধে এ সংবাদ দেবে যে, আমরা তাদেরকে হত্যা করার জন্যে সৈন্য সংগ্রহ করছি এবং আমরা তাদের দিকে প্রত্যাবর্তনের সংকল্প করে ফেলেছি। যদি তোমরা তাঁর নিকট এ সংবাদ পৌছিয়ে দাও তবে আমরা তোমাদেরকে উকায়ের বাজারে অনেক কিসমিস প্রদান করবো।’ অতএব তারা হামরা-ই-আসাদে এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ ভয়াবহ সংবাদ শুনিয়ে দেয়। কিন্তু সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) অত্যন্ত ধৈর্য ও বীরত্বের সাথে উত্তর দেন, ‘আমাদের জন্যে আল্লাহ পার্কই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কার্যসম্পাদনকারী।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘আমি তাদের জন্যে একটি পাথরের চিহ্ন ঠিক করে রেখেছি। যদি তারা ফিরে আসে তবে তথায় পৌছে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে যেমন গতকালকের দিনটি ছিল।’ কতগুলো লোক এও বলেছেন যে, এ আয়াত বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, এটা হামরা-ই-আসাদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়। ভাবার্থ এই যে, আল্লাহর শক্ররা মুসলমানদেরকে হতোদ্যম করার জন্যে শক্রদের সাজ-সরঞ্জাম ও সংখ্যাধিক্যের ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু তাঁরা ধৈর্যের পর্বতরূপে সাব্যস্ত হয়েছেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। বরং তাঁদের আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তাঁরা আল্লাহ তা‘আলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। সহীহ বুখারী শরীফে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) আগুনে নিষ্কিপ্ত হওয়ার সময় *حُسْبَنَا اللَّهُ وَنَعُمُ الْوَكِيلُ*- এ কালেমাটি পাঠ করেছিলেন এবং হ্যরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ) এ কালেমাটি ঐ সময় পাঠ করেছিলেন যখন মানুষ তাঁকে কাফিরদের ভীরু ও কাপুরুষ সৈন্যদের হতে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। বড়ই বিস্ময়কর কথা এই যে, ইমাম হাকিম (রঃ) এ বর্ণনাটি আনয়নের পর বলেন, ‘এ বর্ণনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে নেই।’

সহীহ বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, আগুনে নিষ্কিপ্ত হওয়ার সময় হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মুখ দিয়ে যে শেষ কালেমাটি বের হয়েছিল তা ছিল এ কালেমাটিই। হ্যরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উহুদের যুদ্ধের সময় যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কাফিরদের সৈন্যদের সংবাদ দেয়া হয় তখন তিনি এ কালেমাটি পাঠ করেছিলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে,

হ্যরত আলী (রাঃ)-এর নেতৃত্বে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি ছোট সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং পথে খুয়াআ গোত্রের একজন লোক এ সংবাদ পরিবেশন করে তখন তিনি এ কালেমাটি পাঠ করেছিলেন। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ)-এর হাদীস গ্রন্থে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যখন তোমাদের উপর কোন কাজ এসে পড়ে তখন তোমরা’<sup>حَسْبُنَا اللَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ</sup> শেষ পর্যন্ত পাঠ করে নাও।’ মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) দু’ ব্যক্তির মধ্যে ফায়সালা করেন। তখন যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফায়সালা হয় সে এ কালেমাটিই পাঠ করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ডাকিয়ে নিয়ে বলেনঃ ‘অপারগতা ও অলসতার উপর আল্লাহ তা‘আলার তিরক্ষার প্রযোজ্য হয়ে থাকে। বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দান কর। যখন কোন কঠিন কাজে পড়ে যাও তখন এটা পড়ে নাও।’ মুসনাদ-ই-আহমাদের অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ‘কিরণে আমি নিশ্চিত ও শান্তিতে থাকতে পারিঃ অথচ শিঙাধারণকারী মুখে শিঙা ধরে রয়েছেন এবং কপাল নীচু করে আল্লাহর নির্দেশের জন্যে অপেক্ষক্ষমান রয়েছেন যে, কখন আল্লাহর’ নির্দেশ হবে ও শিঙায় ফুঁ দেবেন।’ সাহাবীগণ তখন বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা কি পড়বো?’ তিনি বলেনঃ ‘তোমরা’<sup>حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا</sup> পাঠ করবে।’ উম্মুল মুমিনীন হ্যরত যয়নাব (রাঃ) এবং উম্মুল মুমিনীন হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত যয়নাব (রাঃ) গর্ব করে বলেন, আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ পাক দিয়েছেন এবং তোমার বিয়ে দিয়েছেন তোমার অভিভাবক ও উত্তরাধিকারীগণ।’ হ্যরত আয়েশা (রাঃ) তখন বলেন, আল্লাহ তা‘আলা আমার দোষইন্তা ও পবিত্রতার আয়াতগুলো আকাশ হতে স্বীয় পাক কালামে অবর্তীর্ণ করেন।’ হ্যরত যয়নাব (রাঃ) ওটা স্বীকার করে নেন এবং জিজ্ঞেস করেন, ‘আচ্ছা বলতো, তুমি হ্যরত সাফওয়ান ইবনে মুআত্তালের সোয়ারীর উপর আরোহণের সময় কি পড়েছিলেন?’ হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘তুমি ঈমানদারদের কালেমাই পড়েছিলে।’ একথা শুনে হ্যরত যয়নাব (রাঃ) বলেন, ‘তুমি ঈমানদারদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্ম বিধায়ক। যারা অন্যায়ের ইচ্ছে পোষণ করতো তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে ধ্বংস করেছেন। মুসলমানেরা আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই স্বীয় শহরের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং

কাফিরেরা স্বীয় ষড়যন্ত্রে অকৃতকার্য হয়। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়েছেন। কেননা, তাঁরা সন্তুষ্টির কার্যই করেছে। আল্লাহ তা'আলা বড়ই গৌরবময়। হয়রত ইবনে আববাস (রাঃ)-এর মতে নিয়ামত ছিল এই যে, তারা নিরাপদে ছিল এবং ফয়ল ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বণিকদের এক যাত্রীদলের নিকট মাল ক্রয় করেন যাতে বহু লাভ হয় এবং ঐ লভ্যাংশ তিনি স্বীয় সঙ্গীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। হয়রত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিলেন, ‘এখন অঙ্গীকারের স্থান হচ্ছে বদর।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ‘সম্ভবতঃ তাই।’ অতএব রাসূলুল্লাহ (সঃ) তথায় পৌছেন। এ কাপুরুষের তথায় আগমন ঘটেনি। তথায় তখন বাজারের দিন ছিল। তিনি মাল ক্রয় করেন এবং লাভে বিক্রি করেন। ওরই নাম হচ্ছে বদর-ই-সুগরার যুদ্ধ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে ছিল শয়তান যে তার বন্ধুদের মাধ্যমে তোমাদেরকে হৃষকি দিয়েছিল, তাদেরকে ভয় না করাই তোমাদের কর্তব্য। বরং একমাত্র আমার ভয়ই অন্তরে জাগিয়ে রাখ। কেননা, ঈমানদারীর শর্ত এই যে, যখন কেউ ভয় প্রদর্শন করবে বা ধরক দেবে এবং ধর্মীয় কার্যে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করবে তখন মুসলমান আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করবে, তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, তিনিই যথেষ্ট এবং তিনিই সাহায্যকারী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে-

الْبَسْ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَخَوْفِونَكَ بِالذِّينِ مِنْ دُونِهِ

অর্থাৎ ‘আল্লাহ কি তাঁর বান্দাদের জন্যে যথেষ্ট নন? এবং তারা তোমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের হতে ভয় দেখাচ্ছে’। (৩৯: ৩৬) শেষে বলেন-

قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

অর্থাৎ ‘তুমি বল- আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তাঁর উপরই নির্ভরকারীগণ নির্ভর করে থাকে।’ (৩৯: ৩৮) অন্যস্থান রয়েছে-

فَقَاتِلُوا أُولِيَاءَ الشَّيْطَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا .

অর্থাৎ ‘তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে যুদ্ধ কর নিশ্যাই শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল।’ (৪: ৭৬) আর এক জায়গায় আল্লাহপাক বলেন-

أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَنِ إِلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَنِ هُمُ الْخَسِرُونَ .

অর্থাৎ ‘তারা শয়তানের সৈন্য, জেনে রেখো যে, শয়তানের সৈন্যরাই ক্ষতিগ্রস্ত।’ (৫৮: ১৯) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

كَتَبَ اللَّهُ لَغْلِبَنَا وَرُسِّلَيْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ .

সূরাঃ আলে ইমরান ৩

অর্থাৎ ‘আল্লাহ তা‘আলা লিখে দিয়েছেন- অবশ্যই আমি ও আমার রাসূলগণই বিজয় লাভ করবো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা শক্তিশালী, মহাপ্রতাপান্বিত।’ (৫৮: ২১) অন্য স্থানে রয়েছে-

وَلَيْسُ صُرَّنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ

অর্থাৎ ‘যে আল্লাহকে সাহায্য করবে তিনি অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন।’ (২২: ৪০) আর এক স্থানে বলেন-

أَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ

অর্থাৎ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।’ (৪৭: ৭) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন-

إِنَّا لِلنَّصْرِ رَسِلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْاَشْهَادِ -  
لَا يَنْفَعُ الظَّلَمِيْنَ مَعْذِرَتَهُمْ وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سَوْدَارٌ -

অর্থাৎ ‘নিশ্চয়ই আমি রাসূলগণকে ও মুমিনগণকে ইহজগতেও সাহায্য করবো এবং সেদিনও সাহায্য করবো যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডয়মান হবে। যেদিন অত্যাচারীদের ওয়র কোন উপকার দেবে না, তাদের জন্য অভিশাপ এবং তাদের জন্যে রয়েছে জঘন্য ঘর।’ (৪০: ৫১-৫২)

১৭৬। আর যারা অবিশ্বাস করে

তৎপর তুমি তাদের জন্যে  
বিষগ্ন হয়ো না, বস্তুতঃ তারা  
আল্লাহর কোন অনিষ্ট করতে  
পারবে না; আল্লাহ তাদের  
জন্যে পরকালের কোন অংশ  
ইচ্ছে করেন না এবং তাদেরই  
জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে।

১৭৭। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাসের  
পরিবর্তে অবিশ্বাস ত্রয়  
করেছে, তারা আল্লাহর কোনই  
অনিষ্ট করতে পারবে না, এবং  
তাদের জন্যে রয়েছে  
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

- ১৭৬ - وَلَا يَحْزُنْكُ الَّذِينَ

بُسَارِعُونَ فِي الْكُفَّرِ إِنَّهُمْ لَنَ

يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا بِرِيدَ اللَّهِ

الَا بَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي

الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

- ১৭৭ - إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْكُفَّرَ

بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهِ

شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

১৭৮। যারা অবিশ্বাস করেছে  
তারা যেন এটা ধারণা না করে  
যে, আমি তাদেরকে যে  
সুযোগ দিয়েছি, তা তাদের  
জীবনের জন্যে কল্যাণকর;  
তারা স্বীয় পাপ বর্ধিত করবে  
তদ্ব্যতীত আমি তাদেরকে  
অবসর প্রদান করিনি; এবং  
তাদের জন্যে অপমানকর  
শাস্তি রয়েছে।

১৭৯। আল্লাহ একুপ নন যে,  
তিনি পবিত্রতা হতে  
অপবিত্রতা পৃথক না করা  
পর্যন্ত তারা যার উপরে আছে,  
তদবস্থায় বিশ্বাসীদেরকে  
পরিত্যাগ করবেন; এবং  
আল্লাহ একুপ নন যে,  
তোমাদেরকে অদৃশ্য বিষয়  
বিজ্ঞপ্তি করবেন এবং  
আল্লাহ তদীয় রাসূলগণের  
মধ্যে যাকে ইচ্ছে মনোনীত  
করে থাকেন; অতএব আল্লাহ  
ও তদীয় রাসূলের প্রতি  
বিশ্বাস স্থাপন কর; এবং যদি  
তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর ও  
সংযর্মী হও, তবে তোমাদের  
জন্যে মহান প্রতিদান রয়েছে।

১৮০। আর আল্লাহ যাদেরকে  
স্বীয় প্রতিদান হতে কিছু দান  
করেছেন তদ্বিষয়ে যারা  
কার্পণ্য করে, তারা যেন একুপ  
ধারণা না করে যে, ওটা

১৭৮- **وَلَا يَحْسِنُونَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ  
لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ  
لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ  
عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝**

১৭৯- **مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ  
الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ  
عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَيْثَ  
مِنَ الطَّيْبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ  
لِيُطْلِعُكُمْ عَلَىٰ الغَيْبِ وَلِكَنْ  
اللَّهُ يَجْتِبِي مِنْ رَسُولِهِ مِنْ  
شَاءَ فَإِنَّمَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقَوَّلُوكُمْ  
أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝**

১৮০- **وَلَا يَحْسِنُونَ الَّذِينَ  
يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ**

তাদের জন্যে কল্যাণকর; বরং  
ওটা তাদের জন্যে ক্ষতিকর;  
তারা যে বিষয়ে কৃপণতা  
করেছে, উত্থানদিবসে ওটাই  
তাদের কর্তৃনিগড় হবে; এবং  
আল্লাহহ নভোমগুলের ও  
ভূমগুলের স্বত্ত্বাধিকারী, এবং  
যা তোমরা করছো আল্লাহহ  
তদ্বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।

رَبُّهُمْ وَوَالرَّوْحَمَةُ مَا بَخْلُوا  
شَرٌ لَهُمْ سِيِطُوقُونَ مَا بَخْلُوا  
بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثٌ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۝ ۴۶

রাসূলুল্লাহ (সঃ) মানুষের উপর অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন বলে কাফিরদের পথব্রহ্মতা তাঁর নিকট খুবই কঠিন ঠেকছিল। যেমন তারা কুফরীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তেমন তিনি চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। এজন্যই মহান আল্লাহহ তাঁকে এটা হতে বিরত রাখছেন এবং বলছেন-‘এরই মধ্যে আল্লাহহ পাকের নিপুণতা রয়েছে। হে নবী (সঃ)! তাদের কুফরী তোমার বা আল্লাহহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এসব লোক তাদের পরকালের অংশ ধ্বংস করতে রয়েছে এবং নিজেদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তাদের বিরুদ্ধাচরণ হতে আল্লাহহ তোমাকে নিরাপদে রাখবেন। সুতরাং তুমি তাদের জন্য দুঃখ করো না।’ অতঃপর আল্লাহহ তা‘আলা বলেন-‘আমার নিকট এও নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে যে, যারা ঈমানকে কুফরীর দ্বারা পরিবর্তিত করে সেও আমার কোন ক্ষতি করতে পারে না বরং তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। অতঃপর আল্লাহহ তা‘আলা যে কাফিরদেরকে অবকাশ ও সুযোগ দিচ্ছেন এ জন্য তাদের অহংকারের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে-‘আমি যে কাফিরদের মাল-ধন ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দিয়েছি এটা আমার পক্ষ হতে তাদের জন্য মঙ্গলের নির্দর্শন এই কি তারা ধারণা করেছেন না, বরং তারা নির্বোধ ও অবুঝ।’ অন্য জায়গায় রয়েছে-‘আমাকে ও এ কথার অবিশ্বাসীদেরকে ছেড়ে দাও, আমি তাদেরকে এমন আস্তে আস্তে ধরবো যে, তারা জানতেই পারবে না।’ আর এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে-‘তাদের মাল ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে প্রতারিত না করে, আমি ওরই কারণে তাদেরকে দুনিয়াতেও শাস্তি দিতে চাই এবং তাদের মৃত্যু কুফরীর উপরেই হবে’।

অতঃপর আল্লাহহ তা‘আলা বলেন-‘এটা মীমাংসিত ব্যাপার যে, কতগুলো পরীক্ষা দ্বারা আল্লাহহ তা‘আলা তাঁর বন্ধু ও শক্রকে যাচাই, বাছাই ও প্রকাশ

করে দিতে চান। ধৈর্যশীল মুমিন ও পাপী মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য পরিস্কৃত হয়ে উঠবে। এর দ্বারা উভদের যুদ্ধকেই বুঝানো হয়েছে। ঐদিন একদিকে মুমিনদের ধৈর্য, স্থিরতা, দৃঢ়তা, নির্ভরশীলতা ও আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে এবং অপরদিকে মুনাফিকদের অসিষ্ট্যুতা, বিরুদ্ধাচরণ, অবিশ্বাস করণ এবং আত্মসাংকরণ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মোটকথা জিহাদের হৃকুম, হিজরতের হৃকুম প্রত্তি যেন এক একটা পরীক্ষা ছিল যা ভাল ও মন্দের মধ্যে প্রভেদ আনয়ন করেছে। হ্যরত সুন্দী (রঃ) বলেন যে, জনগণ বলেছিল, ‘যদি মুহাম্মদ (সঃ) সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে আমাদের মধ্যে কে সত্য মুমিন এবং কে মুমিন নয় তা বলে দিন তোঁ তখন **كَانَ اللَّهُ مَعَهُ** -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে-‘তোমরা আল্লাহর অদৃশ্যকে জানতে পার না। তবে, তিনি এমন কারণ সৃষ্টি করে থাকেন যার ফলে মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে প্রভেদ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূলগণের মধ্যে যাকে চান এ জন্যে মনোনীত করে থাকেন’। যেমন এক জায়গায় রয়েছে-‘আল্লাহ অদৃশ্য জানেন, অতঃপর তিনি কাউকেও সে অদৃশ্য সন্দেশে জান দান করেন না, কিন্তু রাসূলগণের মধ্যে যাকে পছন্দ করেন (জান দান করে থাকেন) তার সম্মুখে ও পিছনে রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতা চালিত করেন।’

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন- ‘তোমরা আল্লাহর উপর ও তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অর্থাৎ তাঁদের আনুগত্য স্বীকার কর, শরীয়তের অনুসারী হও এবং জেনে রেখো যে, ঈমান ও খোদাতীরুতার ব্যাপারে তোমাদের জন্যে বড় প্রতিদান রয়েছে।’ এরপরে ইরশাদ হচ্ছে-‘কৃপণ ব্যক্তি যেন তার ধন-সম্পদকে তার জন্যে মঙ্গল মনে না করে, বরং ওটা তার জন্য চরম ক্ষতিকর। ধর্মের ব্যাপারে তো ক্ষতিকর বটেই, এমন কি কোন কোন সময় দুনিয়াতেও ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। এর পরিণাম এই হয় যে, ঐ কৃপণের মাল কিয়ামতের দিন তার গলায় জড়িয়ে দেয়া হবে।’ সহীহ বুখারীর মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেন এবং সে ঐ মালের যাকাত আদায় করে না, তার মাল কিয়ামতের দিন টেকো মাথা বিশিষ্ট এবং চোখের উপর দুটি চিহ্ন যুক্ত সর্প হয়ে গলাবন্ধের ন্যায় তার গলায় জড়িয়ে যাবে। অতঃপর তাকে দংশন করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, ‘আমি তোমার মাল, আমি তোমার ধন ভাঙ্গার।’ এরপর তিনি **وَلَا يَحْسِنُ الَّذِينَ بِبَخْلُونَ**-এ আয়াতটি পাঠ করেন। মুসনাদ-ই-আহমাদের একটি হাদীসে এও রয়েছে যে, লোকটি পালাতে থাকবে এবং সর্পটি তার পিছনে পিছনে দৌড়াতে থাকবে। অতঃপর তাকে ধরে নিয়ে গলাবন্ধের মত তার গলায় জড়িয়ে যাবে

এবং তাকে দংশন করবে। মুসনাদ-ই-আবু ইয়ালার মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি তার পিছনে ধন ভাণ্ডার ছেড়ে মারা যাবে, সেই ধন ভাণ্ডার একটি কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত সর্পের আকারে— যার চক্ষু দ্বয়ের উপর দু’টি চিঙ্গ থাকবে, তার পিছনে দৌড়াতে থাকবে। লোকটি পালাতে থাকবে এবং বলবে, ‘তুমি কে?’ সর্পটি বলবে, ‘আমি তোমার সেই ধন ভাণ্ডার যা পিছনে ছেড়ে তুমি মারা গিয়েছিলে।’ শেষ পর্যন্ত সাপটি তাকে ধরে নেবে এবং তার হাত চিবাতে থাকবে, অতঃপর অবশিষ্ট শরীরও চিবাতে থাকবে।’ তাবরানীর হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি তার মনিবের নিকট নিজের অভাবের কথা বলে এবং উদ্ভুত মাল থাকা সত্ত্বেও মনিব তাকে কিছুই দেয় না, তার জন্যে কিয়ামতের দিন ক্রোধে ফোঁস ফোঁসকারী বিষাক্ত সাপকে ডেকে আনা হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, যে অভাবী আত্মীয় তার ধনী আত্মীয়ের নিকট কিছু যাঞ্ছা করে এবং সে কিছুই প্রদান করে না তারই এ শাস্তি হবে; ঐ সাপটি তার গলায় হার হয়ে যাবে।’ (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতে ঐ আহলে কিতাবের শাস্তির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা তাদের গ্রন্থের কথা পৌছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করতো কিন্তু প্রথমটিই সঠিক কথা।

অতঃপর বলা হচ্ছে— ‘আল্লাহই হচ্ছেন নভোমঙ্গল ও ভূমঙ্গলের স্বত্ত্বধিকারী। তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তা হতে তাঁর নামে কিছু খরচ কর। সমস্ত কিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমরা দান করতে থাক, যেন কিয়ামতের দিন তা কাজে লাগে এবং জেনে রেখো যে, তোমাদের কথা এবং সমস্ত কাজের আল্লাহ তা’আলা পূর্ণ খবর রাখেন।’

১৮১। অবশ্যই আল্লাহ তাদের কথা শ্রবণ করেছেন— যারা বলে থাকে যে, আল্লাহ দরিদ্র ও আমরা ধনবান; তারা যা বলেছে এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করা আমি লিপিবদ্ধ করবো; এবং তাদেরকে বলবো— তোমরা প্রদাহ কারী শাস্তির আস্তাদ গ্রহণ কর।

— ۱۸۱ —

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلُ  
الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ  
وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكِّبُ مَا  
قَالُوا وَقَتَلْهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ  
حِلٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ  
الْحَرِيقِ ○

সূরাঃ আলে ইমরান ৩

১৮২। এটা তাই- যা তোমাদের  
হন্তসমূহ পূর্বে প্রেরণ করেছে  
এবং নিচয়ই আল্লাহ  
সেবকগণের প্রতি অত্যাচারী  
নন ।

১৮৩। যারা বলে থাকে, অবশ্য  
আল্লাহ আমাদের জন্যে  
অঙ্গীকার করেছেন যে, অগ্নি যা  
গ্রাস করে, আমাদের জন্যে  
এমন উৎসর্গ আনয়ন না করা  
পর্যন্ত আমরা যেন কোন নবীর  
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি;  
তুমি বল- নিচয়ই আমার  
পূর্বে সমুজ্জ্বল নির্দর্শনাবলী  
এবং তোমরা যা বল তৎসহ  
রাসূলগণ আগমন করেছিল;  
যদি তোমরা সত্যবাদী হও,  
তবে কেন তোমরা তাদেরকে  
হত্যা করেছিলে?

১৮৪। অতঃপর যদি তারা  
তোমার প্রতি অসত্যারোপ  
করে, তবে তোমার পূর্বেও  
রাসূলগণকে অবিশ্বাস করা  
হয়েছিল- যারা থকাশ্য  
নির্দর্শনাবলী ও ক্ষুদ্র পুষ্টিকা  
এবং উজ্জ্বল গ্রন্থসহ আগমন  
করেছিল ।

১৮২- ۠ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُ  
أَيْدِيكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ  
۝لِلْعَبِيدِ

১৮৩- ۠الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ  
عِهْدُهُ الَّتِي نَأَى بِنَا إِلَيْهِ  
حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكِلُهُ  
۝فَقُطُونَ ۝قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ  
مِّنْ قَبْلِيٍّ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي  
۝قَلْتُمْ فِيمَا قُتْلُتُمْ وَهُمْ إِنَّ  
۝كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

১৮৪- ۠فَإِنْ كَذَبُوكُمْ فَقَدْ كَذَبُ  
رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ جَآءُو  
۝بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَبِ  
۝الْمُنَّيِّرِ ۝

হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন যে, যখন- ‘আল্লাহকে উত্তম কর্জ দিতে পারে এমন কে আছে? এবং তিনি তাকে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ করে প্রদান করবেন’। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন ইয়াহুদীরা বলতে আরম্ভ করে, ‘হে নবী (সঃ)! আপনার প্রভু দরিদ্র হয়ে পড়েছেন এবং এ জন্যেই তিনি স্থীয় বান্দাদের নিকট কর্জ যাঞ্চা করছেন।’ তখন উপরের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, হ্যরত আবু বকর সিন্ধীক (রাঃ) একদা ইয়াহুদীদের বিদ্যালয়ে গমন করেন। ফানহাস নামক এখানকার একজন বড় শিক্ষক ছিল এবং তার অধীনে আশী’ নামক একজন বড় আলেম ছিল। তথায় জন-সমাবেশ ছিল। তিনি তাদের ধর্মীয় আলোচনা শুনছিলেন। তিনি ফানহাসকে সম্মোধন করে বলেন, ‘হে ফানহাস! আল্লাহকে ভয় করতঃ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমার খুব ভাল করেই জানা আছে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর সত্য রাসূল। তিনি আল্লাহ পাকের নিকট হতে সত্য আনয়ন করেছেন। তাঁর গুণাবলী তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে বর্ণিত আছে যা “তোমাদের হাতেই বিদ্যমান রয়েছে।” ফানহাস তখন উত্তরে বলে, ‘হে আবু বকর (রাঃ) শুনুন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আমাদের মুখাপেক্ষী, আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী নই। আমরা তাঁর নিকট ঐরূপ কারুতি মিনতি করি না যেমন তিনি আমাদের নিকট কারুতি মিনতি করে থাকেন। বরং আমরা তো তাঁর নিকট মোটেই মুখাপেক্ষী নই। কারণ, আমরা ধনবান। তিনি যদি ধনী হতেন তবে আমাদের নিকট ঝণ চাইতেন না। যেমন আপনাদের নবী বলছেন। আল্লাহ তো আমাদেরকে সুদ হতে বিরত রাখতে চাচ্ছেন, অথচ নিজেই সুদ দিতে চাচ্ছেন। তিনি যদি ধনী হতেন তবে আমাদেরকে সুদ দিতে চাইবেন কেন?’ এ কথা শুনে হ্যরত আবু বকর (রাঃ) ক্রোধাপ্তি হয়ে ফানহাসের মুখে সজোরে চপেটাঘাত করেন এবং বলেন, ‘যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি তোমাদের ইয়াহুদীদের সাথে আমাদের মুক্তি না থাকতো তবে আমি অবশ্যই তোমার মত আল্লাহদ্বাহীর মন্তক কেটে নিতাম।’ ফানহাস সরাসরি হ্যরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে। তিনি হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘তাকে মেরেছো কেন?’ হ্যরত আবু বকর (রাঃ) তখন ঘটনাটি বর্ণনা করেন। ফানহাস চালাকি করে বলে, ‘আমি তো ঐরূপ কথা মোটেই বলিনি।’ সে সম্বন্ধে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় শাস্তির সংবাদ দিচ্ছেন, তাদের এরূপ উক্তি এবং সাথে সাথে তাদের ঐরূপই বড় পাপ অর্থাৎ নবীদেরকে হত্যাকরণ আমি তাদের আমলনামায় লিখে নিয়েছি। এক দিকে তাদের মহা প্রতাপাদ্ধিত আল্লাহর শানে বেয়াদবী এবং অপর দিকে নবীগণকে হত্যা করার কারণে তাদেরকে ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আমি তাদেরকে বলবো—‘এটা তোমাদের পূর্বের কৃতকর্মেরই প্রতিফল।’ এ কথা বলে তাদেরকে শাস্তির উপর শাস্তি প্রদান করা হবে। এটা সরাসরি সুবিচারই বটে এবং এটাও স্পষ্ট কথা যে, মনিব কখনও স্বীয় দাসের উপর অত্যাচার করেন না। এরপর আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবের ঐ ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্থ করছেন যে, তারা বলতো, ‘যেসব আসমানী কিতাব আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন ঐগুলোতে তিনি আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন,—আমরা যেন কোন রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করি যে পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে এ অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন না করবেন যে, তিনি তাঁর উচ্চতের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন কিছু কুরবানী করবে, তার সেই কুরবানী খেয়ে নেয়ার জন্যে আকাশ হতে আল্লাহ-প্রেরিত আগুন এসে তা খেয়ে নেবে।’ তাদের এই কথার উভয়ে ইরশাদ হচ্ছে—‘তোমাদের চাহিদা মত অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনকারী নবীগণ নির্দর্শন ও প্রমাণাদি নিয়ে তো তোমাদের নিকট আগমন করেছিলেন, তথাপি তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে কেন? তাঁদেরকে তো আল্লাহ পাক ঐ মু'জিয়াও দিয়ে রেখেছিলেন যে, প্রত্যেক গৃহীত কুরবানীকে আসমানী আগুন এসে খেয়ে নিত। কিন্তু তোমরা তাদেরকেও তো সত্যবাদী বলে স্বীকার করে নাওনি। তোমরা তাঁদেরও বিরুদ্ধাচরণ ও শক্রতা করেছিলে, এমনকি তাদেরকে হত্যা করেও ফেলেছিলে। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের কথারও কোন মর্যাদা দাও না। তোমরা সত্যের সাথীও নও এবং নবীকে সত্য বলে স্বীকার করতেও সম্মত নও। নিশ্চয়ই তোমরা চরম মিথ্যাবাদী।’।

এরপর আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন—‘হে নবী (সঃ)! তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে বলে তোমার মন ছোট করার ও দুঃখিত হওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। পূর্ববর্তী দৃঢ়চিত্ত নবীদের ঘটনাবলীকে সান্ত্বনাদায়ক হিসেবে ধ্রুণ কর। তারাও স্পষ্ট দলীলসমূহ এনেছিল এবং ভালভাবে নিজেদের সত্যতা প্রকাশ করেছিল। তথাপি জনগণ তাদেরকে অবিশ্বাস করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করেনি।’। <sup>১২</sup> শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে ঐসব আসমানী গ্রন্থ যেগুলো ক্ষুদ্র পুস্তিকালপে নবীদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। <sup>১৩</sup> মুন্বির শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রকাশ্য, স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান।

১৮৫। সমস্ত জীবই মৃত্যুর আশ্বাদ প্রহণকারী; এবং নিশ্চয়ই উথান দিবসে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে; অতএব যে কেউ অগ্নি হতে বিমুক্ত হয়েছে ও জাগ্রাতে প্রবিষ্ট হয়েছে, ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম; আর পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৮৬। অবশ্যই তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবন সমূহের দ্বারা পরিস্কিত হবে; এবং যাদেরকে তোমাদের পূর্বে প্রস্তুত হয়েছে ও যারা অংশী স্থাপন করেছে, তাদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক বাক্য শুনতে হবে; এবং যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও সংযমী হও, তবে অবশ্যই এটা সুদৃঢ় কার্যাবলীর অন্তর্গত।

সাধারণভাবে সমস্ত সৃষ্টিজীবকে জানানো হচ্ছে যে, প্রত্যেক জীবই মরণশীল।  
যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে-

١٨٥ - كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ  
وَإِنَّمَا تُوفَّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمًا  
الْقِيمَةُ مِنْ زُحْرَ حَنْدِ النَّارِ  
وَادْخُلُ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا  
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ  
الْغَرْوِ ○

١٨٦ - لَتُبْلِوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ  
قُلْ  
وَانْفِسِكُمْ وَلَتُسْمِعَنَ مِنْ  
الَّذِينَ أَوْتَوْا الْكِتَبَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا  
أَذِى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا  
وَتَتَقَوَّلُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ  
الْأَمْوَرِ ○

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ - وَبَقَى وَجْهُ رِبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -

অর্থাৎ ‘এ পৃথিবীর যত কিছু রয়েছে সবই ধ্রংসশীল। শুধু তোমার প্রভুর মুখমণ্ডলই চির বিদ্যমান থাকবে যিনি মহা সম্মানিত ও মহান দাতা।’ (৫৫:২৬-২৭) সুতরাং একমাত্র সেই এক আল্লাহই চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী। তিনি কখনও ধ্রংস হবেন না। দানব ও মানব প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী। অনুরূপভাবে ফেরেশতামণ্ডলী ও আরশ বহনকারীগণও মরণশীল। শুধুমাত্র এক অদ্বিতীয় আল্লাহই চিরকাল বাকী থাকবেন। তাঁর কোন লয় ও ক্ষয় নেই। প্রথমেও তিনিই এবং শেষেও তিনিই থাকবেন। যখন সবাই মরে যাবে, দীর্ঘ মেয়াদী সময় শেষ হয়ে যাবে, হ্যরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠ হতে যত সন্তান হবার ছিল হয়ে যাবে, অতঃপর সকলেই মৃত্যুর ঘাটে অবতরণ করবে এবং সমস্ত সৃষ্টজীব ধ্রংস হয়ে যাবে, সে সময় আল্লাহ তা‘আলার হৃকুমে কিয়ামত সংঘটিত হবে। সেদিন তিনি সকলকেই তাদের ছোট বড় সমস্ত কার্যের প্রতিদান প্রদান করবেন। কারও উপর অণুপরিমাণও অত্যাচার করা হবে না। এ কথাই পরবর্তী বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। হ্যরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর আমাদের নিকট একপ অনুভূত হয় যে, যেন কেউ আসছেন। পায়ের শব্দ শুনা যাচ্ছে, কিন্তু কোন লোককে দেখা যায় না। তিনি এসে বলেনঃ ‘হে নবী পরিবারের লোকগণ! আপনাদের উপর শান্তি এবং আল্লাহর করুণা ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক! প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর আশ্বাদ গ্রহণকারী। কিয়ামতের পর আপনাদের সকলকেই সমস্ত কার্যের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। বিপদে যারা ধৈর্য ধারণ করেছে তাদের পুরস্কার মহান আল্লাহর নিকট রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলার উপরই ভরসা করুন এবং তাঁরই নিকট মঙ্গলের আশা রাখুন। জেনে রাখুন যে, প্রকৃতপক্ষে বিপদগ্রস্ত ঐ ব্যক্তি যে পুণ্য লাভ হতে বর্ষিত হয়ে যায়। আপনাদের উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে শান্তি, করুণা ও বরকত নায়িল হোক।’ (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম) হ্যরত আলী (রাঃ)-এর ধারণা মতে তিনি ছিলেন হ্যরত খিয়ির (আঃ)। সারকথা এই যে, সফলকাম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ করতঃ জান্নাতে প্রবেশ লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘জান্নাতের মধ্যে একটি চাবুক বরাবর জায়গা পেয়ে যাওয়া দুনিয়া ও তনুধ্যকার সমস্ত জিনিস হতে উত্তম। তোমাদের ইচ্ছে পাঠ কর-

فَمَنْ زُحِّزَ عَنِ النَّارِ وَادْخُلْ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

অর্থাৎ ‘যে কেউ অগ্নি হতে বিমুক্ত হয়েছ ও জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়েছে, ফলতঃ সেই সফলকাম হয়েছে’। এ পরবর্তী বেশীটুকু ছাড়া এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও

সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। আর বেশীটুকু সহ মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম ও ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যেও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘জাহান্নামের অগ্নি হতে মুক্তি পাওয়ার ও জান্নাতে প্রবেশ করার যার ইচ্ছে রয়েছে সে যেন মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর উপর ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস রাখে এবং জনগণের সাথে সেই ব্যবহার করে, যে ব্যবহার সে নিজের জন্যে পছন্দ করে।’ এ হাদীসটি (৩৮: ১০২) আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদে এবং আকী ইবনে জাররাহের তাফসীরেও এই হাদীসটি রয়েছে। এরপর দুনিয়ার নিকৃষ্টতা ও তুচ্ছতার কথা বর্ণিত হচ্ছে যে, দুনিয়া অত্যন্ত নিকৃষ্ট, ধৰ্মশীল ও ক্ষণস্থায়ী জিনিস। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে-

**بَلْ تُؤثِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى**

অর্থাৎ ‘তোমরা ইহলৌকিক জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ অথচ পারলৌকিক জীবন উত্তম ও স্থায়ী।’ (৭৮: ১৬ - ১৭) অন্য জায়গায় রয়েছে-‘তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তো শুধুমাত্র ইহলৌকিক জীবনের উপকারের বস্তু ও সৌন্দর্য; উত্তম ও স্থায়ী তো ওটাই যা আল্লাহর নিকট রয়েছে।’ হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আল্লাহর শপথ! কোন লোক সমুদ্রে অঙ্গুলী ডুবালে তার অঙ্গুলীর অঞ্চলাগে যে পানি উঠে সেই পানির সঙ্গে সমুদ্রের পানির যে তুলনা পরকালের তুলনায় দুনিয়া ঠিক তদ্রূপ।’ হ্যরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন, ‘দুনিয়া প্রতারণার একটা বেড়া ছাড়া আর কি? যাকে ছেড়ে তোমাদেরকে বিদায় হতে হবে। যে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই তাঁর শপথ! এ তো অতিসত্ত্বরই তোমাদের হতে পৃথক হয়ে যাবে ও ধৰ্ম হয়ে যাবে। সুতরাং এখানে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করতঃ আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লেগে পড় এবং সাধ্যনুসারে পুণ্য অর্জন কর। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া কোন কাজ সাধিত হয় না।’ অতঃপর মানুষের পরীক্ষার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। যেমন এক জায়গায় রয়েছে-

**وَلَبَلَوْنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَرُوفِ وَالْجُرُعِ**

অর্থাৎ ‘আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষা করবো।’ (২: ১৫৫) ভাবার্থ এই যে, মুমিনের পরীক্ষা অবশ্যই হয়ে থাকে। কখনো জীবনের উপর, কখনো অর্থের উপর, কখনো পরিবারের উপর এবং কখনো অন্য কিছুর উপর, মুক্তকীর তারতম্য অনুযায়ী পরীক্ষা হয়ে থাকে। যে

খুব বেশী ধর্মভীকু তার পরীক্ষা বেশী কঠিন হয়। আর যার ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে তার পরীক্ষা হালকা হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা সাহাৰা-ই-কিৰাম (রাঃ)-কে সংবাদ দিচ্ছেন-'বদরের যুদ্ধের পূর্বে গ্রহণ্যারী ও অংশীবাদীদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক কথা শুনতে হবে।' তারপর তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন-'সে সময় তোমাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে ও সংযোগ হতে হবে এবং মুক্তাকী হওয়ার উপর এটা খুব কঠিন কাজই বটে।' হ্যরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীবর্গ মুশরিক ও আহলে কিতাবের অপরাধ প্রায়ই ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের কষ্টদায়ক কথার উপর ধৈর্যধারণ করতেন ও আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশের উপর আমল করতেন। অবশ্যে জিহাদের আয়াত অবতীর্ণ হয়। সহীহ বুখারী শরীফে এ আয়াতের তাফসীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় গাধার উপর আরোহণ করতঃ হ্যরত উসামা (রাঃ)-কে পিছনে বসিয়ে নিয়ে রোগাক্রান্ত হ্যরত সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ)-কে দেখবার জন্যে বানূ হারিস খায়রাজের গোত্রের মধ্যে গমন করেন। এটা বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। পথে একটি জনসমাবেশ দেখা যায়, যেখানে মুসলমান, ইয়াহূদী ও মুশরিক সবাই উপস্থিত ছিল। ওর মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলও ছিল। তখন পর্যন্ত সে প্রকাশ্যভাবে কুফরীর রঙেই রঞ্জিত ছিল। মুসলমানদের মধ্যে হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সোয়ারী হতে ধূলোবালি উড়তে থাকলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই নাকে কাপড় দিয়ে বলেঃ 'ধূলা উড়াবেন না।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিকটে পৌছেই গিয়েছিলেন। সোয়ারী হতে নেমে তিনি সালাম করেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তাদেরকে তিনি কুরআন কারীমের কয়েকটি আয়াতও শুনিয়ে দেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বলে, 'শুনুন জনাব, আপনার এ পস্তা আমাদের নিকট মোটেই পছন্দনীয় নয়। আপনার কথা সত্যই বা হলো, কিন্তু তাই বলে এটা উচিত নয় যে, আপনি আপনার সমাবেশে এসে আমাদেরকে কষ্ট দেবেন। আপনার বাড়ীতে যে যাবে তাকেই আপনি শুনাবেন।' এ কথা শুনে হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! অবশ্যই আপনি আমাদের সভায় আগমন করবেন। আপনার কথা শুনবার তো আমাদের চাহিদা আছেই।' তাদের মধ্যে তখন হটগোলের সৃষ্টি হয়ে যায়। একে অপরকে ভাল-মন্দ বলতে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাবারও উপক্রম হয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বুৰানোর ফলে অবশ্যে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

এবং সবাই নীরব হয়ে যায়। তিনি স্বীয় সোয়ারীর উপর আরোহণ করে হ্যরত সা'দ (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন এবং তথায় গিয়ে হ্যরত সা'দ (রাঃ)-কে বলেনঃ ‘হে আবু হাবার! আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তো আজকে এরূপ এরূপ করেছে।’ হ্যরত সা'দ (রাঃ) বলেন, ‘এরূপ হতে দিন! ক্ষমা করুন! যে আল্লাহ আপনার প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তাঁর শপথ! আপনার সঙ্গে তো তার চরম শক্রতা রয়েছে এবং এটা হওয়া স্বাভাবিক। কেননা, এখানকার মানুষ তাকে তাদের নেতা নির্বাচন করতে চেয়েছিল এবং তার জন্যে নেতৃত্বের পাগড়ী তৈরীরও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় নবী করে পাঠিয়ে দেন। জনগণ আপনাকে নবী বলে স্বীকার করে নেয়। সুতরাং তার নেতৃত্ব চলে যায়। ফলে সে চরম দুঃখিত হয়। এ জন্যেই সে ক্রোধে ও হিংসায় জুলে পুড়ে মরছে। যা সে বলেছে বলেছেই। আপনি তার কথার উপর গুরুত্ব দেবেন না।’ অতএব রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ক্ষমা করে দেন এবং এটা তাঁর অভ্যাসই ছিল। তার সাহাবীগণও ইয়াতুনী ও মুশরিকদের অপরাধ ক্ষমা করে দিতেন এবং উপরোক্ত আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশের উপর আমল করতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিহাদের অনুমতি দেয়া হয় এবং প্রথম বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যে যুদ্ধে কাফিরদের নেতৃবৃন্দ নিহত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইসলামের এই অগ্রগতি দেখে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে পড়ে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ ও নিজেদেরকে বাহ্যতঃ মুসলমানরূপে পরিচিত করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকে না। সুতরাং এটা স্বরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক পন্থী যারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে থাকে তাদের উপর অবশ্যই বিপদ-আপদ এসে থাকে। কাজেই আল্লাহর পথে এসব বিপদ-আপদ সহ্য করা, তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা মুমিনদের একান্ত কর্তব্য।

১৮৭। আর যখন আল্লাহ,  
যাদেরকে গুরুত্ব প্রদত্ত হয়েছে  
তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ  
করেছিলেন যে, তোমরা  
নিশ্চয়ই এটা লোকদের মধ্যে  
ব্যক্ত করবে এবং তা গোপন  
করবে না; কিন্তু তারা ওটা

১৮৭- وَإِذَا خَذَ اللَّهَ مِبْشَاقَ  
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَتَبَيَّنَهُ  
لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَبِذَوْهُ  
وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَسْتَرُوا بِهِ

তাদের পক্ষাতে নিষ্কেপ  
করলো এবং ওটা অল্প মূল্যে  
বিক্রি করলো, অতএব তারা  
যা ক্রয় করেছিলো তা  
নিকৃষ্টতর।

ثُمَّنَا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا  
يَشْتَرُونَ ۝

١٨٨- لَا تَحْسِنُ إِلَّا بَنَّ الذِّينَ  
يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيَجْبُونَ أَنَّ  
يَحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعُلُوا فَلَا  
تَحْسِنَ بَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ  
الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

١٨٩- وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ ۝

১৮৯। আল্লাহরই জন্যে  
নভোমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের  
আধিপত্য; এবং আল্লাহ সর্ব  
বিশ্বাপরি শক্তিমান।

এখানে আল্লাহ তা'আলা গ্রহস্থারীদেরকে ধমক দিচ্ছেন যে, নবীদের মাধ্যমে  
আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তাদের যে অঙ্গীকার হয়েছিল তা হচ্ছে তারা শেষ নবী  
(সঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাঁর বর্ণনা ও আগমন সংবাদ জনগণের  
মধ্যে প্রচার করবে, তাদেরকে তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে উত্তেজিত করবে।  
অতঃপর যখন তিনি আগমন করবেন তখন তারা খাঁটি অস্তরের সাথে তাঁর  
অনুসারী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা ঐ অঙ্গীকারকে গোপন করছে এবং এটা প্রকাশ  
করলে দুনিয়া ও আখেরাতের যে মঙ্গলের ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়েছিল ওর  
বিনিময়ে সামান্য পুঁজির উপর জড়িয়ে পড়েছিলো। তাদের এ ক্রয়-বিক্রয় জঘন্য  
হতে জঘন্যতর। এতে আলেমদের জন্যও সতর্কবাণী রয়েছে যে, তারা যেন  
ওদের মত না হন এবং সত্য জিনিস গোপন না করেন। নচেৎ তাদেরকেও ঐ  
শাস্তি ভোগ করতে হবে যে শাস্তি ঐ কিতাবীদেরকে ভোগ করতে হয়েছিল এবং  
তাঁদেরকেও আল্লাহর অস্তুষ্টির মধ্যে পড়তে হবে যেমন ঐ কিতাবীদেরকে

পড়তে হয়েছিল। সুতরাং উলামা-ই-কিরামের উপর এটা অবশ্য কর্তব্য যে, যে উপকারী ধর্মীয় শিক্ষা তাঁদের মধ্যে রয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ সৎকার্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে তা যেন তাঁরা ছড়িয়ে দেন এবং কোন কথা গোপন না করেন। হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তিকে কোন জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।’ দ্বিতীয় আয়াতে রিয়াকারদেরকে নিন্দে করা হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি মিথ্যা দাবী করে অধিক যাঞ্চগা করে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে আরও কম দেবেন।’ সহীহ বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যাকে প্রদান করা হয়নি তার সাথে পরিত্তির সংবাদদাতা দু'জন মিথ্যা কাপড় পরিধানকারীর ন্যায়।’ মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, একদা মারওয়ান স্বীয় দারোয়ান রাফে’কে বলেন, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গমন কর এবং তাঁকে বল, ‘স্বীয় কৃতকর্মের প্রতি আনন্দিত ব্যক্তিকে এবং না করা কার্যের উপর প্রশংসা প্রার্থীকে যদি আল্লাহ পাক শান্তি প্রদান করেন তবে আমাদের মধ্যে কেউ মুক্তি পেতে পারে না।’ হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ওর উত্তরে বলেন, ‘এ আয়াতের সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক? এটা তো কিতাবীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।’ অতঃপর তিনি لَمْ يُؤْتِ إِذْنَ اللَّهِ হতে এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন এবং বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে কোন জিনিস সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। তখন তারা ওর একটি ভুল উত্তর দিয়েছিল এবং বাইরে এসে ধারণা করে যে, তারা নবী (সঃ)-এর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। আর সাথে সাথে তাদের এ বাসনাও হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের প্রশংসা করবেন এবং তারা যে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর গোপন রেখেছিল এতেও তারা সন্তুষ্ট ছিল। উল্লিখিত আয়াতে এর-ই বর্ণনা রয়েছে। এ হাদীসটি সহীহ বুখারী প্রভৃতির মধ্যেও রয়েছে। সহীহ বুখারীর মধ্যে এও রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করতেন তখন মুনাফিকরা বাড়ীতে বসে থাকতো, সঙ্গে যেতো না। অতঃপর তারা যুদ্ধ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার কারণে আনন্দ উপভোগ করতো। তারপর যখন আল্লাহর রাসূল (সঃ) যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে আসতেন তখন তারা সত্য-মিথ্যা ওয়র পেশ করতো এবং শপথ করে করে নবী (সঃ)-এর নিকট তাদের ওয়রের সত্যতা প্রমাণ করতে চাইতো। আর তারা এ বাসনা রাখতো যে, তারা যে কাজ করেনি তার জন্যেও যেন তাদের প্রশংসা করা হয়। ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, মারওয়ান হ্যরত আবু সাঈদ (রাঃ) -কে এ আয়াত সম্বন্ধে ঐ রকমই প্রশ্ন করেছিলেন যেমন প্রশ্ন তিনি হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে করেছিলেন। তখন হ্যরত আবু সাঈদ (রাঃ) আয়াতটির শানাই-ন্যূল ঐ মুনাফিকদেরকেই সাব্যস্ত করে ছিলেন যারা যুদ্ধের সময় বাড়ীতে বসে থাকতো অতঃপর মুসলমানগণ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তারা আনন্দ অনুভব করতো। আর তারা জয়যুক্ত হলে ঐ কপটেরা মিথ্যা ওয়র পেশ করতো এবং মুসলমানদের বিজয় লাভের জন্যে বাহ্যতঃ উল্লাস প্রকাশ করতো। তখন মারওয়ান বলেন, ‘কোথায় এ ঘটনা আর কোথায় এ আয়াত?’ আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, “হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবিতও (রাঃ) এটা অবগত আছেন।” মারওয়ান হ্যরত যায়েদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনিও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। তরপর হ্যরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, ‘এটা হ্যরত রাফে’ ইবনে খুদায়েজও (রাঃ) জানেন, তিনি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি ভয় করেন যে, যদি তিনি তা প্রকাশ করেন তবে আপনি তার সাদকার উটগুলো ছিনিয়ে নেবেন। বাইরে এসে হ্যরত যায়েদ (রাঃ) হ্যরত আবু সাঈদ (রাঃ)-কে বলেনঃ “আমার সাক্ষ্য দানের উপর আপনি আমার প্রশংসা করলেন না কেন?” হ্যরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, “সত্য সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।” হ্যরত যায়েদ (রাঃ) তখন বলেনঃ “সত্য সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে তো আমি প্রশংসার দাবীদার।” ঐ যুগে এ মারওয়ান মদীনার আমীর ছিলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, মারওয়ান সর্বপ্রথম হ্যরত রাফে’ ইবনে খুদায়েজকেই (রাঃ) এ প্রশ্ন করেছিলেন। এর পূর্ববর্তী বর্ণনায় এটা বর্ণিত হয়েছে যে, মারওয়ান এ আয়াত সম্বন্ধে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তাহলে স্বরণ রাখতে হবে এ দুয়ের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নেই। এ আয়াতটি সাধারণ। এর মধ্যে ওটা ও এটা দু’টোই জড়িত রয়েছে। হ্যরত সাবিত ইবনে কায়েস আনসারী (রাঃ) নবী (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয় করেন, “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! স্বীয় বংশের উপর আমার বড় আশংকা রয়েছে।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “কেন?” তিনি উত্তরে বলেন, “একটি কারণ তো এই যে, আল্লাহ তা’আলা না করা কার্যের উপর প্রশংসাপ্রার্থী হতে নিষেধ করেছেন। অথচ আমার অবস্থা এই যে, আমি ঐ রূপ কার্যের উপর প্রশংসা পছন্দ করি। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আল্লাহ তা’আলা অহংকার করতে নিষেধ করেছেন। অথচ আমি আমার সৌন্দর্যকে পছন্দ করি। তৃতীয় কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্বরের উপর স্বর উঁচু করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ আমার স্বর খুব উচ্চ।” তখন

রাসূলুল্লাহ বলেনঃ “তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার জীবন উত্তম ও মঙ্গলময় হোক, তোমার মৃত্যু শাহাদাতের মৃত্যু হোক এবং তুমি জান্নাতবাসী হয়ে যাও?” তিনি খুশী হয়ে বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! খুশী হবো না কেন? এটা তো খুব ভাল কথা।” শেষে তাই হয়েছিল। তিনি প্রশংসাময় জীবন লাভ করেছিলেন। আর তিনি পেয়েছিলেন শহীদের মৃত্যু। মুসাইলামা কায়্যাবের সঙ্গে মুসলমানদের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাতে তিনি শহীদ হয়েছিলেন। <sup>وَهُنَّ مُحْسِنُهُمْ</sup> শব্দটিকে <sup>يَحْسِنُونَ</sup> ও পড়া হয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন-(হে নবী সঃ!) তাদেরকে তুমি শাস্তি হতে বিমুক্ত মনে করো না। তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে এবং সে শাস্তি ও হবে যত্নগাদায়ক শাস্তি। এরপরে ইরশাদ হচ্ছে-তিনি প্রত্যেক জিনিসেরই অধিপতি এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপরই ক্ষমতাবান। কোন কাজেই তিনি অক্ষম নন। সুতরাং তোমরা তাঁকে ভয় করতে থাক এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করো না। তাঁর ক্রোধ হতে বাঁচবার চেষ্টা কর। তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ কর। তাঁর চেয়ে বড় কেউই নেই এবং তার চেয়ে বেশী ক্ষমতাও কারও নেই।

১৯০। নিচয়ই নভোমগুল ও  
ভূমগুল সৃজনে এবং দিবস ও  
যামিনীর পরিবর্তনে  
জ্ঞানবাদের জন্যে স্পষ্ট  
নির্দর্শনাবলী রয়েছে।

১৯১। যারা দণ্ডায়মান, উপবেশন  
ও এলায়িতভাবে আল্লাহকে  
স্মরণ করে এবং নভোমগুল ও  
ভূমগুলের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা  
করে যে, হে আমাদের  
প্রতিপালক! আপনি এটা বৃথা  
সৃষ্টি করেননি আপনিই  
পবিত্রতম অতএব আমাদেরকে  
জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন!

١٩٠- إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَآخْرِيَّ تِلَافِ الْبَلِ  
وَالنَّهُمَّ ارْلَأِيْتِ لَاوْلِيَ  
الْأَلَبَابِ ۝

١٩١- الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ  
قِيمًا وَعُوَدًا وَعَلَى جِنْوِيهِمْ  
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا  
بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ  
النَّارِ ۝

সূরাঃ আলে ইমরান ৩

১৯২। হে আমাদের প্রতিপালক!

অবশ্য আপনি যাকে  
জাহানামে প্রবিষ্ট করেন,  
ফলতঃ নিচয়ই তাকে লাঞ্ছিত  
করা হয়েছে; এবং  
অত্যাচারীদের জন্যে কেউই  
সাহায্যকারী নেই।

১৯৩। হে আমার প্রভু! নিচয়ই

আমরা এক আহ্বানকারীকে  
আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে,  
তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের  
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর,  
তাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন  
করছি; হে আমাদের প্রভু!  
অতএব আমাদের  
অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন ও  
আমাদের অমঙ্গলসমূহ আবৃত  
করুন এবং পুণ্যবানদের সাথে  
আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন।

১৯৪। হে আমাদের প্রভু! আপনি

স্বীয় রাসূলগণ যোগে  
আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার  
করেছিলেন তা দান করুন  
এবং উধান দিবসে  
আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন  
না; নিচয়ই আপনি  
অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করেন  
না।

১৯২- رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ  
فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ  
أَنصَارٍ ۝

১৯৩- رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا  
يُنَادِي لِلْإِيمَانَ أَنْ أَمْنَا  
بِرِّيكُمْ فَامْنَا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا  
ذُنُوبِنَا وَكَفِرْعَنَا سِّاتِنَا  
وَتَوْفِنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝

১৯৪- رَبَّنَا وَأَتَنَا مَا وَعَدْنَا  
عَلَى رَسِّلِكَ وَلَا تُخْرِنَا يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ  
الْمِيعَادَ ۝

তাবরানীর মধ্যে রয়েছে, হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন যে, কুরায়েশরা ইয়াতুনীদের নিকট গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, ‘হ্যরত মুসা (আঃ) তোমাদের নিকট কি কি মুজিয়া নিয়ে এসেছিলেন?’ তারা বলেন, সর্পে পরিণত

হয়ে যাওয়া লাঠি এবং দীপ্তিময় হন্ত। তার পরে তারা খ্রীষ্টানদের নিকট গমন করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, ‘হ্যরত ঈসা (আঃ) তোমাদের নিকট কি কি নির্দর্শন এনেছিলেন? তারা উত্তরে বলে, ‘জন্মান্তকে চক্ষুদান করা, শ্঵েত কুষ্ঠরোগীকে ভাল করে দেয়া এবং মৃতকে জীবিত করা।’ তখন কুরায়েশরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, ‘আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য ‘সাফা’ পাহাড়কে সোনা করে দেন।’ নবী (সঃ) তখন প্রার্থনা করেন। সে সময় **إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ**—‘এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আর্থাৎ যারা আল্লাহ তা‘আলার নির্দর্শনাবলী দেখতে চায় তাদের জন্যে এগুলোর মধ্যেই বড় বড় নির্দর্শন রয়েছে। তারা এগুলোর মধ্যে চিন্তা গবেষণা করলেই সেই ক্ষমতাবান আল্লাহর সামনে তাদের মন্তক নুয়ে পড়বে। কিন্তু এ বর্ণনায় জটিলতা এই রয়েছে যে, এ প্রশ্ন হয়েছিল মঙ্গা শরীফে, আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় মদীনা শরীফে। আয়াতের ভাবার্থ এই যে, আকাশের মত সুউচ্চ ও প্রশস্ত সৃষ্টিবস্তু, ভূমগুলের মত নিম্ন, শক্ত ও লম্বা চওড়া সৃষ্টিবস্তু, তারপরে আকাশের বড় বড় নির্দর্শনাবলী, যেমন গতিশীল ও একই জায়গায় স্থিতিশীল তারকারাজি, ভূপৃষ্ঠার বড় বড় সৃষ্টি যেমন পাহাড়, জঙ্গল, বৃক্ষ ঘাস, ক্ষেত্র, ফল এবং বিভিন্ন প্রকারের জীব-জন্ম, খনিজ দ্রব্য, পৃথক পৃথক স্বাদ ও গন্ধযুক্ত ফলসমূহ ইত্যাদি, মহান আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার এসব নির্দর্শন কি বিবেক সম্পন্ন মানুষকে তাঁর পরিচয় প্রদান করতঃ তাঁর পথে চালিত করতে পারে না? আরও নির্দর্শন অবলোকন করার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকবে কি? অতঃপর দিন-রাত্রির গমনাগমন এবং ঐ গুলোর হ্রাস-বৃদ্ধি তারপরে সমান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি এসব কিছু সেই মহান পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময় আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার জ্ঞানস্তুতি নির্দর্শন। এ জন্যেই এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে—‘এগুলোর মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্যে যথেষ্ট নির্দর্শনাবলী রয়েছে, যাদের আত্মা পবিত্র এবং যারা প্রত্যেক জিনিসের মূল তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করতে অভ্যন্ত। তারা নিরেটদের মত অঙ্গ ও বধির নয়’। যেমন অন্য জায়গায় ঐ নিরেটদের অবস্থার বর্ণনা হয়েছে—‘তারা আকাশ ও পৃথিবীর বহু নির্দর্শন পদদলিত করে চলে যায় এবং কোন চিন্তা গবেষণা করে না। তাদের মধ্যে অধিকাংশই আল্লাহকে মান্য করা সত্ত্বেও অংশীস্থাপন হতে বাঁচতে পারে না।’

এখন ঐ জ্ঞানবানদের গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা উঠতে, বসতে, শুইতে সর্বাবস্থাতেই আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত ইমরান ইবনে হসাইন (রাঃ)-কে

বলেনঃ ‘দাঁড়িয়ে নামায পড়। ক্ষমতা না হলে বসে পড়। এতেও অক্ষম হলে শুয়ে পড়।’ অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন থেকো না। অন্তরে ও মুখে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক। এ লোকগুলো আকাশ ও যমীনের উৎপাদনের প্রতি দৃষ্টি নিষ্কেপ করে এবং গ্রিগুলোর নিপুণতার বিষয়ে চিন্তা করে, যেগুলো সেই এক আল্লাহর শ্রেষ্ঠতু, ক্ষমতা, নিপুণতা, স্বেচ্ছারিতা ও করুণার পরিচয় দিয়ে থাকে। হ্যরত শায়েখ সুলাইমান দারানী বলেনঃ ‘বাড়ী হতে বেরিয়ে যে যে জিনিসের উপর আমার দৃষ্টি পতিত হয়, আমি দেখি যে, ওর মধ্যে আল্লাহর একটি নিয়ামত আমার জন্যে বিদ্যমান রয়েছে এবং আমার জন্যে ওতে শিক্ষা রয়েছে। হ্যরত হাসান বসরী (রঃ)-এর উক্তি এই যে, এক ঘন্টাকাল চিন্তা ও গবেষণা করা সারারাত্রি দাঁড়িয়ে ইবাদত করা হতে উত্তম। হ্যরত ফাযীল (রঃ) বলেন, হ্যরত হাসান বসরী (রঃ)-এর উক্তি এই যে, চিন্তা, গবেষণা ও ধ্যান এমন একটি দর্পণ যা তোমার সামনে তোমার ভালমন্দ পেশ করে দেবে। হ্যরত সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা (রঃ) বলেন, ‘চিন্তা ও গবেষণা এমন একটি আলোক যা তোমার অন্তরের উপর স্বীয় প্রতিবিষ্঵ নিষ্কেপ করবে।’ প্রায়ই তিনি নিম্নের পংক্তিটি পাঠ করতেন-

إِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ فَلِفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ بُرْزَةٌ

অর্থাৎ ‘যখন মানুষের চিন্তা ও ধ্যানের অভ্যাস হয়ে যায় তখন প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে তার জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় বিদ্যমান থাকে।’ হ্যরত ঈসা (আঃ) বলেনঃ ‘ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যার কথা বলার মধ্যে আল্লাহর যিক্রি ও উপদেশাবলী প্রকাশ পায়, নীরবতার মধ্যে চিন্তা ও ধ্যান প্রকাশিত হয় এবং দর্শনের মধ্যে শিক্ষা ও সতর্কতা বিরাজ করে।’ লোকমান হাকীমের জ্ঞানপূর্ণ উক্তিটিও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেনঃ ‘নির্জনবাস যার যত বেশী হয় তার চিন্তা, ধ্যান পরিণামদর্শিতাও তত বেশী হয়। যে পরিমাণ এটা বেশী হয় এই পরিমাণ সেই রাস্তা মানুষের উপর খুলে যায় যা তাকে জান্নাতে পৌছিয়ে দেয়।’ হ্যরত অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) বলেন, ‘আল্লাহর ধ্যান যত বেশী হবে, বোধশক্তি তত প্রথর হবে, আর বোধশক্তি যত প্রথর হবে, জ্ঞান লাভ তত বেশী হবে এবং জ্ঞান যত বেশী হবে সৎকার্যাবলীও তত বৃদ্ধি পাবে।’ হ্যরত উমার ইবনে আবদুল আয়ীয় (রঃ) বলেন, ‘মহান সম্মানিত আল্লাহর স্মরণে রসনা চালনা করা অতি উত্তম কাজ এবং তাঁর নিয়ামতের উপর চিন্তা ও গবেষণা করা উত্তম ইবাদত।’ হ্যরত মুগীস আসওয়াদ (রঃ) সভাস্থলে বসে বলতেন, ‘হে

জনমগ্নলী! প্রত্যহ গোরস্থানে গমন কর, তাহলে পরিণাম সম্বন্ধে তোমাদের একটা ধারণা পয়দা হবে। অতঃপর স্বীয় অন্তরে ঐ দৃশ্য হায়ির কর যে, তোমরা আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডয়মান রয়েছো। এরপর একটি লোককে জাহানামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং অপর একটি দল জাহানাতে প্রবেশ করছে স্বীয় অন্তরকে ঐ অবস্থায় টেনে আন এবং স্বীয় দেহকেও তথায় বিদ্যমান মনে কর। জাহানাতকে তোমাদের সামনে হায়ির দেখ। ওর হাতুড়ী এবং অগ্নির জেলখানাকে চক্ষুর সম্মুখে নিয়ে এসো! এ পর্যন্ত বলেই চীৎকার করে কেঁদে উঠেন এবং শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে যান। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাঃ) বলেন, একটি লোক একটি গোরস্থানে ও আবর্জনা ফেলার জায়গায় একজন দরবেশের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁকে বলে, ‘হে দরবেশ! আপনার সামনে এখন দু’টি ভাণ্ডার রয়েছে। একটি হচ্ছে লোকদের ভাণ্ডার অর্থাৎ গোরস্থান এবং অপরটি হচ্ছে ধন ভাণ্ডার অর্থাৎ আবর্জনা, পায়খানা ও প্রস্তাব নিষ্কেপ করার জায়গা।’ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) ধৰ্মসপ্রাপ্ত অট্টালিকার পার্শ্বে গমন করতেন এবং কোন ভাঙ্গাচুরা দরজায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আক্ষেপের সুরে বলতেন, ‘হে ধৰ্মসপ্রাপ্ত ঘর! তোমার অবিশ্বাসী কোথায় রয়েছে?’ অতঃপর নিজে নিজেই বলতেন- ‘সবাই মাটির নীচে চলে গেছে। সকলেই ধৰ্মের পেয়ালা পান করেছে। শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সত্য সন্তা চির-বিদ্যমান থাকবে।’ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবৰাস (রাঃ) বলেন, ‘আন্তরিকতার সাথে দু’ রাকআত নামায পড়া ঐ সমুদয় নামায হতে উন্নত যেগুলোতে সারা রাত্রি কাটিয়ে দেয়া হয়েছিল কিন্তু আন্তরিকতা ছিল না।’ খাজা হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, ‘হে আদম সন্তান! তোমার পেটের এক তৃতীয়াংশে ভোজন কর এক তৃতীয়াংশে পানি পান কর এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ ঐ শ্বাসের জন্যে রেখে দাও যার মধ্যে তুমি পরকালের কথার উপর, নিজ পরিণামের উপর এবং স্বীয় কার্যাবলীর উপর চিন্তা ও গবেষণা করতে পার। কোন বিজ্ঞ লোকের উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জিনিসসমূহের উপর শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াই দৃষ্টি নিষ্কেপ করে, ঐ উদাসীনতা অনুপাতে তার অন্তরের চক্ষু দুর্বল হয়ে পড়ে। হ্যরত বাশীর ইবনে হারিস হাস্রি (রাঃ) বলেন, ‘মানুষ যদি আল্লাহ তা‘আলার শ্রেষ্ঠত্বের চিন্তা করতো তবে কখনও তাদের দ্বারা অবাধ্যতা হতো না।’ হ্যরত আমির ইবনে আবদ কায়েস (রাঃ) বলেনঃ ‘আমি বহু সাহাবীর নিকট শুনেছি যে, ঈমানের কিরণ হচ্ছে চিন্তা, গবেষণা এবং আল্লাহর ধ্যান।’ হ্যরত ইসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) বলেনঃ

“হে আদম সত্তান! হে দুর্বল মানুষ! তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর, পৃথিবীতে বিনয় ও দারিদ্র্যের সাথে অবস্থান কর, মসজিদকে স্বীয় ঘর বানিয়ে নাও, নিজেদের চক্ষুগুলোকে ক্রন্দন শিখিয়ে দাও, দেহকে ধৈর্যধারণে অভ্যন্ত কর, হয়দকে চিন্তা ও গবেষণাকারী বানিয়ে দাও এবং আগামীকালের কুর্যান জন্যে আজকে চিন্তা করো না।”

আমীরুল মুমিনীন হ্যরত উমার ইবনে আবদুল আয়ীয় (রঃ) একদা সভাস্থলে বসে ক্রন্দন করছিলেন। জনগণ কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ‘আমি দুনিয়া ও ওর উপভোগ এবং প্রবৃত্তির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করেছি এবং তা হতে উপদেশ গ্রহণ করেছি। পরিণামে পৌছে আমার আশা ও আকাঞ্চ্ছা সব শেষ হয়ে গেছে।’ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই ওতে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। হ্যরত হাসান ইবনে আবদুর রহমানও (রঃ) স্বীয় কবিতায় এ বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ঐ বান্দাদের প্রশংসা করছেন যারা সৃষ্টি ও বিশ্বজগত হতে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে থাকে এবং তিনি ঐ লোকদেরকে নিন্দে করছেন যারা আল্লাহ পাকের নির্দশনাবলী সম্বন্ধে চিন্তা করে না। মুমিনদের প্রশংসার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা উঠতে বসতে এবং শুইতে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করে থাকে। তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করতঃ বলে, ‘হে আমাদের প্রভু! আপনি এগুলোকে বৃথা সৃষ্টি করেননি। বরং সত্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন, যেন পাপীদেরকে তাদের পাপের পূর্ণ প্রতিদান এবং পুণ্যবানদেরকে তাদের পুণ্যের পূর্ণ প্রতিদান দিতে পারেন। অতঃপর তারা আল্লাহ তা‘আলার পবিত্রতার বর্ণনা করতঃ বলে, ‘হে আল্লাহ! কোন কিছু বৃথা সৃষ্টি হতে আপনি পবিত্র। হে সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা এবং হে সারা বিশ্বের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী! হে দোষক্রিটি হতে মুক্ত সত্তা! আমাদেরকে স্বীয় ক্ষমতা বলে এমন কাজ করার তাওফীক প্রদান করুন যার ফলে আমরা আপনার কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি পেতে পারি এবং আমাদেরকে এমন দানে ভূষিত করুন যার ফলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ লাভ করতে পারি।’ তারা আরও বলে, ‘হে আমাদের প্রভু! যাকে আপনি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন তাকে তো আপনি ধ্বংস করে দেবেন, সে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। তাদেরকে না কেউ ছাড়িয়ে নিতে পারবে, না কেউ শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে, না আপনার ইচ্ছেকে টলাতে পারবে। হে আমাদের প্রভু! আমরা আহ্বানকারীর আহ্বান

শুনেছি যিনি ঈমানের দিকে ডেকেছেন।' এ আহ্বানকারী দ্বারা রাসূলল্লাহ (সঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। তিনি মানবমণ্ডলীকে বলেনঃ 'তোমরা তোমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।' তাঁর কথায় আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং অনুগত হয়েছি। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস স্থাপন ও আনুগত্যের কারণে আমাদের গোনাহসমূহ মার্জনা করে দিন এবং আমাদের অঙ্গসমূহ আবৃত করতঃ আমাদেরকে পুণ্যবানদের সাথে মৃত্যু দান করুন। আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা পূর্ণ করুন।' ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে, 'আপনি আপনার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তা আমরা পুরো করেছি। সুতরাং আমাদেরকে তার প্রতিদান দান করুন।' কিন্তু পূর্ব ভাবার্থটি বেশী স্পষ্ট। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আসকালান' হচ্ছে দুই 'আরসের' মধ্যে একটি। এখান হতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সন্তুর হাজার লোককে দাঁড় করাবেন যাদের হিসাব-নিকাশ কিছুই নেই। এখান হতেই পঞ্চাশ হাজার শহীদ উঠবেন এবং প্রতিনিধি হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট গমন করবেন। এখানে শহীদদের সারি হবে, যাদের কর্তিত মন্তক তাঁদের হাতে থাকবে।

তাঁদের কন্দের শিরা হতে রঞ্জ বইতে থাকবে। তাঁরা বলবেন, 'হে আমাদের প্রভু! আপনার রাসূলগণ যোগে আপনি আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা পূর্ণ করুন। কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লজ্জিত করবেন না। আপনি কখনও অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করেন না।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন- 'আমার বান্দাগণ সত্য বলছে। তাদেরকে 'নাহারে বায়য়ায়' গোসল করিয়ে দাও। তাঁরা তথায় গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে বের হবে। সমস্ত জান্নাতেই তাঁদের প্রবেশাধিকার থাকবে। যেখানে মনে করে সেখানেই তাঁরা যাতায়াত করতে পারবেন। যা চাইবেন তাই খাবেন।' এ হাদীসটি গারীব। কেউ কেউ তো একে মাওয়ু' বলেছেন। কিয়ামতের দিন সমস্ত মানবের সমাবেশে আমাদেরকে লজ্জিত ও অপমানিত করবেন না। আপনার অঙ্গীকার সত্য। আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে যে সংবাদ আমাদেরকে দিয়েছেন তা সবই অটল। কিয়ামতের দিন অবশ্যই আসবে। কাজেই হে আমাদের প্রভু! সেদিন আমাদেরকে লজ্জা ও অপমান হতে রক্ষা করুন। রাসূলল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'বান্দার উপর লজ্জা, অপমান-শাসন-গর্জন এতো বেশী বর্ষিত হবে এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড় করিয়ে তাদেরকে এমনভাবে অপদস্থ করা হবে যে, তারা কামনা করবে

‘যদি আমাদেরকে জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হতো!’ (আবু ইয়ালা) এ হাদীসটির সনদও গারীব। হাদীসসমূহ দ্বারা এও সাব্যস্ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাত্রে যখন তাহাজুদের নামাযের জন্যে গাত্রোথান করতেন তখন তিনি সূরাঃ আলে ইমরানের এ শেষ দশটি আয়াত পাঠ করতেন যেমন সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, ‘আমি একদা আমার খালা হ্যরত মাইমুনা (রাঃ)-এর ঘরে রাত্রি যাপন করি। হ্যরত মাইমুনা (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহধর্মীণী। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর ঘরে এসে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁর সাথে কথা-বার্তা বলেন। শেষ এক তৃতীয়াংশ রাত্রি অবশিষ্ট থাকতে তিনি উঠে পড়েন এবং আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে *إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ*<sup>১</sup> হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে মিসওয়াক করতঃ অযু করেন এবং এগারো রাকআত নামায আদায় করেন। হ্যরত বিলাল (রাঃ)-এর ফজরের আযান শুনে ফজরের দু’ রাকআত সুন্নত পড়েন। অতঃপর মসজিদে গমন করতঃ জনগণকে ফজরের নামায পড়িয়ে দেন।’ সহীহ বুখারীর মধ্যে এ বর্ণনাটি অন্য জায়গাতেও রয়েছে। তাঁতে রয়েছে যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বিছানার উপর আমি শয়ন করি এবং দৈর্ঘ্যের উপর শয়ন করেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর সহধর্মীণী হ্যরত মাইমুনা (রাঃ)। অর্ধেক রাত্রির কাছাকাছি, পূর্বে বা কিছু পরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জেগে উঠেন এবং স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা স্বীয় চক্ষু মলতে মলতে উল্লিখিত দশটি আয়াত পাঠ করেন। অতঃপর লটকানো মশক হতে পানি নিয়ে ভালভাবে পূর্ণ অযু করেন এবং নামাযে দাঁড়িয়ে যান। আমিও ঐরকমই সবকিছু করে তাঁর বাম দিকে তাঁর অনুসরণে দাঁড়িয়ে যাই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় দক্ষিণ হস্ত আমার মাথায় রেখে আমার কান ধরে ঘুরিয়ে তাঁর ডান দিকে করে নেন। অতঃপর দু’রাকআত করে করে ছয় বার অর্থাৎ বার রাকআত নামায পড়েন এবং তার পরে বেত্র পড়ে শুয়ে পড়েন। অতঃপর মুআয়ফিন এসে নামাযের জন্যে ডাক দেন। তিনি উঠে হালকা করে দু’রাকআত নামায পড়েন এবং বাইরে এসে ফজরের নামায পড়িয়ে দেন।’ ইবনে মিরবুওয়াই-এর হাদীসে রয়েছে, হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ‘আমাকে আমার পিতা হ্যরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘তুমি আজকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরিবারের মধ্যে রাত্রি যাপন কর এবং তাঁর রাত্রির নামাযের অবস্থা পরিদর্শন কর।’ রাত্রে যখন সমস্ত লোক ইশার নামায পড়ে চলে যায়, আমি তখন বসে থাকি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যাবার সময় আমাকে

দেখে বলেন, ‘কে, আবদুল্লাহ?’ আমি বলি জি, হ্যায়! তিনি বলেনঃ ‘এখানে রয়ে  
গেছে কেন?’ আমি বলি, আব্বার নির্দেশ যে আমি যেন আপনার ঘরে রাত্রি যাপন  
করি। তিনি বলেনঃ ‘বেশ ভাল কথা, এসো।’ ঘরে এসে তিনি বলেনঃ ‘বিছানা  
বিছিয়ে দাও।’ চট্টের বালিশ আছে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওর উপরে মাথা রেখে  
শুয়ে পড়েন। অবশ্যে আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাই। অতঃপর তিনি  
জেগে উঠেন এবং আকাশের দিকে চেয়ে তিনবার **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ** পাঠ  
করতঃ সূরাঃ আলে ইমরানের শেষের এ আয়াতগুলো পাঠ করেন।’ অন্য বর্ণনায়  
রয়েছে যে, এ আয়াতগুলো পাঠের পর তিনি নিম্নলিখিতে দু'আ পাঠ করেনঃ

اللَّهُمَّ أَجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي  
نُورًا وَعَنْ شَمَائِلِي نُورًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْ نُورًا وَمِنْ خَلْفِي نُورًا وَمِنْ فُوْقِي نُورًا  
وَمِنْ تَحْتِي نُورًا وَاعْظِمْ لِي نُورًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ -

অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার অঙ্গের আলোকিত করুন, আমার কর্ণে  
আলো সৃষ্টি করুন, আমার চক্ষে আলো পয়দা করুন, আমার দক্ষিণ দিক  
আলোকিত করুন, আমার বাম দিক আলোকিত করুন, আমার সামনের দিক  
আলোকিত করুন, আমার পিছনের দিক আলোকিত করুন, আমার উপরের দিক  
আলোকিত করুন, আমার নীচের দিক আলোকিত করুন এবং কিয়ামতের দিন  
আমার জন্যে আলোকরণ্তি বড় করে দিন।’ (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই) এ  
দু'আটি কতক সঠিক পস্থাতেও বর্ণিত আছে। এ আয়াতের তাফসীরের প্রারম্ভে  
তাবরানীর উদ্ধৃতি দিয়ে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে তো জানা যায় যে,  
এটি মাঝী আয়াত। কিন্তু প্রসিদ্ধি এর উল্টো। অর্থাৎ এটি মাদানী আয়াত।  
এর দলীলরূপে তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর নিম্নের হাদীসটি পেশ করা  
যেতে পারে: ‘হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর নিকট হ্যরত আতা’ (রঃ),  
হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) এবং হ্যরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রঃ) আগমন  
করেন। তাঁর ও তাঁদের মধ্যে পর্দা ছিল। হ্যরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন,  
‘উবায়েদ! তুমি আসনা কেন?’ হ্যরত উবায়েদ (রঃ) উত্তরে বলেন, ‘আম্মাজান!  
শুধুমাত্র কোন একজন কবির! অর্থাৎ ‘রংবা ত্বে হুবা’! সাক্ষাৎ কম কর তাহলে  
ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে’ এ উক্তির কারণে। হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন,  
‘এসব কথা ছেড়ে দিন। আম্মাজান! আপনার নিকট আমাদের আগমনের কারণ

এই যে, আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোন কাজটি আপনার নিকট বেশী বিশ্বয়কর মনে হয়েছিল?’ হ্যরত আয়েশা (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, ‘তাঁর সমস্ত কাজই অদ্ভুত ছিল। আচ্ছা, একটি ঘটনা শুন। একদা রাত্রে আমার পালায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট আগমন করেন এবং আমার সঙ্গে শয়ন করেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলেনঃ ‘হে আয়েশা! আমি আমার প্রভুর কিছু ইবাদত করতে চাই। সূতরাং আমাকে যেতে দাও’। আমি বলি, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর শপথ! আমি আপনার নৈকট্য কামনা করি এবং এও কামনা করি যে, আপনি যেন মহা সম্মানিত আল্লাহর ইবাদত করেন।’ তিনি উঠে পড়েন এবং একটি মশক হতে পানি নিয়ে হালকা অযু করেন। এরপর নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে যান। তারপরে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং এত কাঁদেন যে, তাঁর শুশ্রাু মুবারক সিঙ্ক হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সিজদায় পড়ে যান এবং এত ক্রন্দন করেন যে, মাটি ভিজে যায়। তার পরে তিনি কাত হয়ে শুয়ে পড়েন এবং কাঁদতেই থাকেন। অবশেষে হ্যরত বিলাল (রাঃ) এসে নামাযের জন্যে আহ্বান করেন এবং তাঁর নয়নে অশ্রু দেখে জিজ্ঞেস করেন, ‘হে আল্লাহর সত্য রাসূল (সঃ)! আপনি কাঁদছেন কেন?’ আল্লাহ পাক তো আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ মার্জনা করে দিয়েছেন।’ তিনি বলেনঃ ‘হে বিলাল! আমি কাঁদবো না কেন? আজ রাত্রে আমার উপর ইনْ فِيْ خَلْقٍ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।’ অতঃপর তিনি বলেনঃ ‘ঐ ব্যক্তির বড়ই দুর্ভাগ্য যে এটা পাঠ করে অথচ ঐ সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করে না।’ আবদ ইবনে হুমায়েদ (রঃ)-এর তাফসীরেও এ হাদীসটি রয়েছে। ওতে এও রয়েছে- ‘আমরা যখন হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গমন করি তখন আমরা তাঁকে সালাম জানাই। তিনি জিজ্ঞেস করেন, ‘তোমরা কে?’ আমরা আমাদের নাম বলি। শেষে এও রয়েছে-নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্থীয় ডান কঠে গওদেশের নীচে হাত রেখে শয়ন করেন এবং কাঁদতে থাকেন, এমনকি অশ্রুতে মাটি ভিজে যায়। হ্যরত বিলাল (রাঃ)-এর কথার উত্তরে তিনি এও বলেনঃ ‘আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?’ আয়াতগুলো নায়িল হওয়ার ব্যাপারে عَذَابَ النَّارِ পর্যন্ত তিনি পাঠ করেন। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর একটি দুর্বল সনদবিশিষ্ট হাদীসে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূরাঃ আলে ইমরানের শেষ দশটি আয়াত প্রত্যহ রাত্রে পাঠ করতেন। ঐ বর্ণনায় মুঝাহির ইবনে আসলাম নামক বর্ণনাকারী দুর্বল।

১৯৫। অনন্তর তাদের প্রতিপালক  
তাদের জন্যে ওটা স্বীকার  
করলেন যে, আমি তোমাদের  
পুরুষ অথবা নারীর মধ্য হতে  
কোন কর্মীর কৃতকার্য ব্যর্থ  
করবো না-তোমরা পরম্পর  
এক, অতএব যারা দেশ ত্যাগ  
করেছে ও স্বীয় গৃহসমূহ হতে  
বিতাড়িত হয়েছে ও আমার  
পথে নির্বাতিত হয়েছে এবং  
সংগ্রাম করেছে ও নিহত  
হয়েছে- নিচয়ই তাদের  
জন্যে আমি তাদের  
অঙ্গসমূহ আবৃত করবো  
এবং নিচয়ই আমি তাদেরকে  
জালাতে চুকাবো- যার নিম্নে  
স্ন্যোতস্বীনীসমূহ প্রবাহিতা;  
এটা আল্লাহর নিকট হতে  
প্রতিদান এবং আল্লাহর  
নিকটই উভয় প্রতিদান  
যয়েছে।

১৯৫- فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ  
إِنَّمَا لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ  
مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى  
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ  
هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ  
وَأُوذُوا فِي سَبِيلٍ وَقَاتَلُوا  
وَقُتِلُوا لَا كَفِيرٌ مِّنْهُمْ  
سَيَّاً تِهِمْ وَلَا دِخْلُنَهُمْ جَنَّتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ  
ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ  
وُحْدَةُ الشَّوَّابِ ۝

এখানে শব্দটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং আরবী ভাষায় এটা  
সমানভাবে প্রচলিত হয়েছে। হ্যরত উম্মে সালমা (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ  
(সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, ‘কুরআন শরীফের মধ্যে কোনও জায়গায় আল্লাহ  
তা‘আলা স্ত্রীলোকদের হিজরতের কথা বলেননি এর কারণ কি?’ তখন এ  
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আনসারগণ বলেন, ‘সর্বপ্রথম যে স্ত্রীলোকটি হাওদায়  
চড়ে আমাদের নিকট হিজরত করে এসেছিলেন তিনি হ্যরত উম্মে সালমাই  
(রাঃ) ছিলেন। হ্যরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, এ  
আয়াতটি সর্বশেষে অবতীর্ণ হয়। আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, জ্ঞানবান ও  
ঈমানদারগণ যখন পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের বর্ণিত প্রার্থনা আল্লাহ তা‘আলার

নিকট পেশ করেন তখন আল্লাহ তা'আলা ও তাদের প্রার্থিত জিনিস দান করেন। এজনে আয়াতটিকে ফ অক্ষর দ্বারা আরঙ্গ করা হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادٌ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ  
إِحْيِبُ دُعَوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  
فَلِيُسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَهُمْ يَرْشَدُونَ -

অর্থাৎ ‘(হে নবী সঃ!) আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে তখন (তাদেরকে বলে দাও) আমি নিকটেই আছি, যখন কোন আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান করে তখন অবশ্যই তার আহ্বানে আমি সাড়া দিয়ে থাকি; সুতরাং তাদেরও উচিত যে, তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহলে এতে বিশ্বয়ের কিছুই নেই যে, তারা সুপথপ্রাণ হবে।’ (২: ১৮৬) অতঃপর প্রার্থনা গৃহীত হওয়ার তাফসীর বর্ণিত হচ্ছে। আল্লাহ পাক সংবাদ দিচ্ছেন-‘আমি কোন কর্মীর কৃতকর্ম বিনষ্ট করি না। বরং সকলকেই পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে পুরুষই “হোক বা স্তুই হোক। পুণ্য ও কার্যের প্রতিদানের ব্যাপারে আমার নিকট সবাই সমান। সুতরাং যেসব লোক অংশীবাদের স্থান ত্যাগ করে ঈমানের স্থানে আগমন করে, কাফিরদের দেশ হতে হিজরত করে। আল্লাহর নামে ভাই, বন্ধু, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করে, মুশরিকদের প্রদণ কষ্ট সহ্য করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে দেশকে পরিত্যাগ করে এবং স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করে না; তারা জনগণের কোন ক্ষতি করেনি, যার ফলে তারা তাদেরকে ধর্মকাছে বরং তাদের দোষ শুধুমাত্র এই ছিল যে, তারা আমার পথের পথিক হয়েছে, আমার পথে চলার কারণেই তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দেয়া হয়েছে।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে-

يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ

অর্থাৎ ‘তারা রাসূল (সঃ)-কে এবং তোমাদেরকেও এ কারণেই দেশ হতে বের করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছো।’ (৬০: ১) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

অর্থাৎ ‘তারা তাদের সাথে শক্রতা শুধু এ কারণেই করেছে যে, তারা প্রবল প্রতাপান্বিত ও প্রশংসিত আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে।’ (৮৫: ৮)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—‘তারা জিহাদও করেছে এবং শহীদও হয়েছে। এটা অতি উচ্চ পদমর্যাদা যে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করছে, সোয়ারী কর্তিত হচ্ছে এবং মুখমণ্ডল মাটি ও রক্তের সাথে মিশে যাচ্ছে।’

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি বলে, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি যদি ধৈর্যের সাথে, সৎ নিয়তে বীরত্বের সাথে এবং পিছনে আল্লাহর পথে জিহাদ করি তবে কি আল্লাহ তা'আলা আমার গোনাহ মার্জনা করবেন? রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ ‘হ্যাঁ।’ দ্বিতীয়বার তিনি লোকটিকে জিজেস করেনঃ তুমি কি বলেছিলে আবার বলতো? লোকটি তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবার উত্তরে বললেনঃ ‘হ্যাঁ, কিন্তু ঝণ মার্জনা করা হবে না। এ কথাটি আমাকে জিবরাইল (আঃ) এখনই বলে গেলেন।’ তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলছেন—আমি উপরোক্ত গুণ বিশিষ্ট লোকদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবো এবং তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবো যার চতুর্দিকে স্বৰূপ স্বৰূপ সমূহ বয়ে যাচ্ছে। সেগুলোর কোনটিতে দুঃখ, কোনটিতে মধু, কোনটিতে সুরা এবং কোনটিতে নির্মল পানি রয়েছে। তাছাড়া ঐ সব নিয়ামতও রয়েছে যা কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি, কোন চক্ষু দর্শন করেনি এবং কোন হনুয় কল্পনাও করেনি। এগুলোই হচ্ছে আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে প্রতিদান। এটা স্পষ্ট কথা যে, সমস্ত সম্ভাটের যিনি সম্ভাট তাঁর নিকট হতে যে প্রতিদান পাওয়া যাবে তা কতইনা অমূল্য অসীম হবে! যেমন কোন কবি বলেন, ‘তিনি যদি শাস্তি দেন তবে সেই শাস্তি ও হবে ধৰ্মস ও নিশ্চিহ্নকারী, আর যদি তিনি পুরক্ষার দেন তবে সেটাও হবে বে-হিসাব ও ধারণার বাইরে। কেননা, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, তিনি কারও ধার ধারেন না। সৎ কর্মশীলদের উত্তম বিনিময় আল্লাহর নিকটই রয়েছে। হ্যরত শান্দাদ ইবনে আউস (রঃ) বলেন, ‘আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার উপর তোমরা চিন্তিত ও অধৈর্য হয়ে যেয়ো না। জেনে রেখো যে, মুমিনের উপর অত্যাচার করা হয় না। তোমাদের যদি খুশী ও শাস্তি লাভ হয় তবে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যদি তোমাদেরকে কষ্ট ও বিপদ পৌছে তবে ধৈর্য ধারণ কর ও তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং পুণ্য ও প্রতিদানের আকাঞ্চ্ছা পোষণ কর। আল্লাহ তা'আলার নিকটই উত্তম ও পবিত্র প্রতিদান রয়েছে।’

১৯৬। যারা অবিশ্঵াসী হয়েছে  
তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন  
যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না  
করে।

১৯৭। এটা মাত্র কয়েকদিনের  
সঙ্গেগ; অনন্তর তাদের  
অবস্থান জাহান্নাম এবং ওটা  
নিকৃষ্ট স্থান।

১৯৮। কিন্তু যারা স্বীয়  
প্রতিপালকের ভয় করে,  
তাদের জন্যে জান্নাত- যার  
নিম্নে স্নোতস্বিনীসমূহ  
প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা সদা  
অবস্থান করবে, এটা আল্লাহর  
সন্ধিধান হতে আতিথ্য; এবং  
যেসব বস্তু আল্লাহর নিকট  
রয়েছে, তা পুণ্যবানদের জন্যে  
বহুগুণে উত্তম।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেন-‘হে নবী (সঃ)! তুমি  
কাফিরদের মাতালতা, আনন্দ-বিহুলতা, সুখ সঙ্গেগ এবং জাঁকজমকের প্রতি  
দৃষ্টিপাত করো না। অতিসত্ত্বরই এসব কিছু বিনষ্ট ও বিলীন হয়ে যাবে এবং শুধু  
তাদের দুর্কার্যসমূহ শাস্তির আকারে তাদের উপর অবশিষ্ট থাকবে। তাদের এ সব  
সুখের সামগ্রী পরকালের তুলনায় অতি নগণ্য। এ বিষয়েরই বহু আয়াত কুরআন  
কারীমের মধ্যে রয়েছে। যেমন এক জায়গায় রয়েছে-

مَا يُجَادِلُ فِي أَيْتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرِبُكَ تَقْلِبُهُمْ فِي الْبِلَادِ

অর্থাৎ “আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের ব্যাপারে শুধুমাত্র কাফিরেরাই  
ঝগড়া করে থাকে, সুতরাং তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাকে  
প্রতারিত না করে।” (৪০: ৪) অন্য জায়গায় রয়েছে- “নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর  
উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারা মৃত্তি পায় না; তারা দুনিয়ায় কিছুদিন উপকৃত

١٩٦- لَا يَغْرِنَكَ تَقْلِبُهُمْ الَّذِينَ

كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ

١٩٧- مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا وَهُمْ

جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

١٩٨- لِكِنَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ

لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ

عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ

لِلْأَبْرَارِ

হবে, কিন্তু পরকালে তো তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট; আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর প্রতিশোধক্রমে কঠিন শাস্তি প্রদান করবো।” আর এক স্থানে রয়েছে—“আমি তাদেরকে অল্লাদিন উপকার পৌছাবো, অতঃপর তাদেরকে পুরুষ শাস্তির দিকে আকৃষ্ট করবো।” আর এক জায়গায় রয়েছে—“আমি কাফিরদেরকে কিছু অবকাশ দিয়ে থাকি।” অন্য জায়গায় রয়েছে—“যে ব্যক্তি আমার উত্তম অঙ্গীকার পেয়ে গেছে, আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আরাম উপভোগ করছে, কিন্তু কিয়ামতের দিন শাস্তির সম্মুখীন হবে তারা কি সমান হতে পারে?” যেহেতু কাফিরদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবস্থা বর্ণিত হলো, কাজেই সাথে সাথে মুমিনদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে—‘এ মুভাকী দলটি কিয়ামতের দিন এমন জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে যার পার্শ্ব দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে।’ তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তাদেরকে পুণ্যবান বলার কারণ এই যে, তারা পিতা-মাতার সাথে ও সন্তানাদির সাথে সৎ ব্যবহার করে থাকে। যেমন তোমার উপর তোমার পিতা-মাতার অধিকার রয়েছে, তদুপ তোমার উপর তোমার সন্তান-সন্ততির অধিকার রয়েছে।” এ বর্ণনাটিই হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে মাওকুফক্রমেও বর্ণিত আছে এবং এর মাওকুফ হওয়াই অধিকতর সঠিক পরিলক্ষিত হচ্ছে। হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন, ‘পুণ্যবান ঐ ব্যক্তি যে কাউকেও কষ্ট দেয় না।’ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রঃ) বলেনঃ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই মৃত্যু উত্তম। সে ব্যক্তি ভালই হোক আর মন্দই হোক। যদি সে সৎ হয় তবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট যা কিছু রয়েছে তা খুবই উত্তম। আর যদি সে অসৎ হয় তবে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি ও তার পাপরাশি যা তার ইহলৌকিক জীবনে বৃদ্ধি পাঞ্চল সেই বৃদ্ধি এখান হতেই শেষ হয়ে যাবে। প্রথমটির দলীল হচ্ছে—**مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْبَرَّ**—অর্থাৎ ‘আল্লাহ তা'আলার নিকট যা রয়েছে তা পুণ্যবানদের জন্যে উত্তম।’ দ্বিতীয়টির দলীল হচ্ছে—

**وَلَا يَحْسِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُعْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِّأَنَّفْسِهِمْ إِنَّمَا نُعْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنَّمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مَّهِينٌ**

অর্থাৎ “অবিশ্বাসকারীরা যেন ধারণা না করে যে, আমি যে তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি তা তাদের জন্যে উত্তম। আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি যেন তাদের পাপ বৃদ্ধিপ্রাণ হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।” (৩:১৭৮) হ্যরত আবুদ্বারদা (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

১৯৯। এবং নিচয়ই আহলে  
কিতাবের মধ্যে একে লোকও  
রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি  
এবং তোমাদের প্রতি যা  
অবতীর্ণ হয়েছে, তদিষয়ে  
আল্লাহর ভয়ে বিশ্বাস স্থাপন  
করে; যারা অল্প মূল্যে  
আল্লাহর নির্দর্শনাবলী বিক্রী  
করে না, তাদেরই জন্যে  
তাদের প্রতিপালকের নিকট  
প্রতিদান রয়েছে; নিচয়ই  
আল্লাহ সত্ত্ব হিসাব  
গ্রহণকারী।

২০০। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ!  
তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর  
এবং সহিষ্ণু ও সুপ্রতিষ্ঠিত  
হও; এবং আল্লাহকে ভয়  
কর- যেন তোমরা সুফলপ্রাপ্ত  
হও।

এখানে আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবের ঐ দলের প্রশংসা করছেন যারা  
পুরোপুরি ঈমান আনয়ন করেছিল। তারা কুরআন কারীমেও বিশ্বাস করে এবং  
নিজেদের কিতাবের উপরও বিশ্বাস রাখে। তারা অঙ্গে আল্লাহ তা'আলার ভয়  
রেখে তাঁর আদেশ পালনে সদা লিঙ্গ থাকে। প্রভুর সামনে তারা বিনয় প্রকাশ  
করতঃ ক্রন্দন করে থাকে। তাদের কিতাবে শেষ নবী (সঃ)-এর যেসব  
বিশেষণের বর্ণনা রয়েছে তা তারা গোপন করে না। বরং সকলকেই তা প্রদান  
করতঃ তাঁকে স্বীকার করে নিতে উৎসাহিত করে। একে দল আল্লাহ তা'আলার  
নিকট পুণ্য প্রাপ্ত হবে, তারা ইয়াহুদীই হোক বা খ্রিস্টানই হোক। সূরা-ই-  
কাসাসের মধ্যে এ বিষয়টি নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে-যাদেরকে আমি এর পূর্বে  
কিতাব দান করেছিলাম তারা ওর উপরেও ঈমান আনয়ন করে এবং এ কিতাব  
(কুরআন কারীম) তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তারা স্পষ্টভাবে বলে,

১৯৯- وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ  
لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ  
إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ  
خَشِيعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرِونَ بِأَيْمَانِ  
اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْ لِكَلْلَةِ  
أَجْرِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ  
الْحِسَابِ ۝

২০০- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

‘আমরা ওর উপর ঈমান এনেছি। এটা আমাদের প্রভুর নিকট হতে সত্য কিতাব। আমরা তো প্রথম হতেই এটা মান্য করতাম।’ ‘তাদেরকে তাদের ধৈর্যের দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়া হবে।’ অন্য জায়গায় রয়েছে—‘যাদেরকে আমি গ্রন্থ প্রদান করেছি এবং যারা ওটা সঠিকভাবে পাঠ করে, তারা তো তৎক্ষণাত্ম এ কুরআনের উপরও ঈমান এনে থাকে।’ আর এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে—

وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أَمَّةً بَهْدُونَ بِالْحِقِّ وَهُبَّ دُلُونَ -

অর্থাৎ ‘হ্যরত মূসা (আঃ)-এর কওমের মধ্যেও একটি দল সত্যের পথ প্রদর্শনকারী এবং সত্যের সঙ্গেই সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী।’ (৭: ১৫৯) অন্য স্থানে রয়েছে—‘আহলে কিতাব সবাই সমান নয়, তাদের মধ্যে একটি দল রাত্রেও আল্লাহর কিতাব পাঠ করে থাকে এবং সিজদায় পড়ে যায়।’ আর এক জায়গায় রয়েছে—‘হে নবী (সঃ)! তুমি বল হে মানবমণ্ডলী! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আর নাই কর, পূর্ব হতেই যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে যখন তাদের নিকট কুরআন কারীমের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা মুখের ভরে সিজদায় পড়ে যায় এবং বলে, আমাদের প্রভু পবিত্র, নিশ্চয়ই তাঁর ওয়াদা সত্য হয়েই থাকবে। এরা কাঁদতে কাঁদতে মুখের ভরে পড়ে যায় এবং তাদের বিনয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইয়াহুন্দীদের মধ্য এরূপ গুণসম্পন্ন লোক পাওয়া যায়, যদিও তাদের সংখ্যা ছিল খুব কম। যেমন হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) এবং তার মত আরও কয়েকজন ঈমানদার ইয়াহুন্দী আলেম। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা দশের বেশী হবে না। শ্রীষ্টানদের অধিকাংশই সুপথে এসে গিয়েছিল এবং সত্যের অনুগত হয়েছিল। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে—‘তুমি অবশ্যই ইয়াহুন্দ ও মুশরিকদেরকে মুমিনদের প্রতি ভীষণ শক্রতা পোষণকারী পাবে এবং তাদের প্রতি ভালবাসা স্থাপনকারী পাবে ঐ লোকদেরকে যারা বলে, ‘আমরা শ্রীষ্টান।’ এখন হতে তারা যা বলেছে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাত প্রদান করবেন যার নিম্নদেশ দিয়ে স্নোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হবে, তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে।’ এ পর্যন্ত। এখন বলা হচ্ছে যে, এসব লোক বিরাট প্রতিদানের অধিকারী। হাদীস শরীফে এও রয়েছে যে, যখন হ্যরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) নাজাসীর দরবারে বাদশাহ ও তাঁর সভাসদবর্গের সামনে সূরা-ই-মারইয়াম পাঠ করেন তখন তাঁর কান্না এসে যায়, ফলে বাদশাহ সহ উপস্থিত সমস্ত জনতাও কেঁদে ফেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের শাশ্বত সিক্ত হয়ে যায়। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণকে নাজাসীর মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করতঃ বলেন, ‘তোমাদের ভাই নাজাসী আবিসিনিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর জানায়ার নামায আদায় কর।’

অতঃপর তিনি মাঠে গিয়ে সাহাবীগণকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করতঃ তাঁর জানায়ার নামায আদায় করেন। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, যখন নাজাসী ইন্ডেকাল করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণকে বলেনঃ ‘তোমাদের ভাই-এর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর।’ এতে কতগুলো লোক বলে, ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে সেই খৃষ্টানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলছেন যে আবিসিনিয়ায় মারা গেছে।’ তখন এ আয়াত অবর্তীর্ণ হয়। কুরআন কারীমই যেন তাঁর মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করছে। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণকে নাজাসীর মৃত্যুর সংবাদ দিতে গিয়ে বলেনঃ ‘তোমাদের ভাই আসহামা মারা গিয়েছেন।’ অতঃপর তিনি বাইরে বেরিয়ে যান এবং যেভাবে তিনি জানায়ার নামায পড়াতেন ঐভাবেই চার তাকবীরে জানায়ার নামায আদায় করেন। এতে মুনাফিকরা ঐ প্রতিবাদ করে এবং এ আয়াত অবর্তীর্ণ হয়। সুনান-ই-আবি দাউদে রয়েছে, হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ ‘নাজাসীর ইন্ডেকালের পর আমরা এ শুনতে থাকি যে, তাঁর সমাধির উপর আলো দেখা যায়।’ মুসতাদরীক-ই-হাকীমে রয়েছে যে, নাজাসীর এক শক্ত তাঁরই সাম্রাজ্য হতে তাঁর উপর আক্রমণ চালায়। তখন মুহাজিরগণ বলেন, ‘আপনি তার মোকাবিলার জন্যে চলুন। আমরাও আপনার সাথে রয়েছি। আপনি আমাদের বীরত্ব দেখে নেবেন এবং যে উত্তম ব্যবহার আপনি আমাদের সাথে করেছেন তার প্রতিদানও হয়ে যাবে।’ কিন্তু নাজাসী তখন বলেন, ‘মানুষের সাহায্য নিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার চাইতে আল্লাহর সাহায্যের নিরাপত্তাই উত্তম।’ ঐ ব্যাপারেই এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আহলে কিতাবের মুসলমানকে বুঝানো হয়েছে। হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পূর্বে ছিল, তারা ইসলামকে বুঝতো এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুগত হওয়ারও তারা সৌভাগ্য লাভ করেছিল। কাজেই প্রতিদানও তাদেরকে দিশুণ দেয়া হবে। এক প্রতিদান রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পূর্বেকার ঈমানের এবং দ্বিতীয় প্রতিদান হচ্ছে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের প্রতিদান। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হ্যরত আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘তিনি প্রকারের লোক দিশুণ প্রতিদান প্রাণ হয়। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে আহলে কিতাবের ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় নবীর উপর ঈমান এনেছে এবং আমার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করেছে।’

এরপরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন-তারা অল্লামূল্যে আল্লাহর নির্দশনাবলী বিক্রী করে না। অর্থাৎ তাদের কাছে যে ধর্মীয় শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে তা তারা গোপন করে না, যেমন তাদের মধ্যকার এক ইতর শ্রেণীর লোকের ঐ অভ্যাস

ছিল। বরং ঐলোকগুলো তো ঐ শিক্ষাকে বেশী করে প্রচার করতো। তাদের প্রতিদান তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে। তারপর বলা হচ্ছে—‘নিচয়ই আল্লাহ সতুর হিসাব গ্রহণকারী।’ অর্থাৎ সতুর একত্রিতকারী, পরিবেষ্টনকারী এবং গণনাকারী। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন—‘আমার পছন্দনীয় ধর্ম ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। কঠিন অবস্থায়, সহজ অবস্থায়, বিপদের সময়, শাস্তির সময় মোটকথা কোন অবস্থাতেই ওটা পরিত্যাগ করো না। এমনকি প্রাণবায়ু নির্গত হলে যেন ওরই উপর নির্গত হয় এবং ঐ শক্রদের হতেও ধৈর্য ধারণ কর ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর যারা স্বীয় ধর্মকে গোপন করে থাকে।’ ইমাম হাসান বসরী (রঃ) প্রভৃতি পূর্ববর্তী আলেমগণও এ তাফসীরই করেছেন। ইবাদতের স্থানকে স্থায়ী করা এবং তথায় আটলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাকে **‘মৰাবুত্তে’** বলা হয়। আবার এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্যে অপেক্ষা করাকেও **‘মৰাবুত্তে’** বলে। এটাই হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ), হ্যরত সাহল ইবনে হানীফ (রঃ) এবং হ্যরত মুহাম্মাদ ইবনে কা’ব (রঃ)-এর উচ্চি। সহীহ মুসলিম ও সুনান-ই-নাসাইতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘এসো, আমি তোমাদেরকে এমন কাজ শিখিয়ে দেই যার ফলে আল্লাহ তা‘আলা পাপ মার্জনা করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। (১) কষ্টের সময় পূর্ণভাবে অযু করা, (২) মসজিদের দিকে গমন করা, (৩) এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা। ওটাই হচ্ছে **‘টার্পাবুত্তে’** এবং ওটাই হচ্ছে আল্লাহর পথের প্রস্তুতি গ্রহণ’। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, একদা হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হ্যরত আবু সালমা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, ‘হে আমার ভাতুশ্পুত্র! তুমি এ আয়াতটির শান-ই-নয়ল জান কি?’ হ্যরত আবু সালমা (রাঃ) বলেন, ‘আমার জানা নেই।’ তখন হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, ‘শুন, ঐ সময় কোন জিহাদ ছিল না। এ আয়াতটি ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা মসজিদকে আবাদ রাখতো এবং নামায ঠিক সময়ে আদায় করতো। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলার যিকির করতো। তাদেরকেই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে—‘তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, স্বীয় আস্তা ও প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখ, মসজিদের দিকে গমন করতে থাক এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, আর এ কার্যগুলোই হচ্ছে জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি প্রাপ্তির কারণ।’ তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলে দেবো না যার ফলে আল্লাহ তা‘আলা পাপসমূহ মার্জনা করেন ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেনঃ (১) অসুবিধার সময় পূর্ণভাবে অযু করা, (২) এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা। এসব কাজেই তোমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।’

অন্য হাদীসে ‘খুব বেশী মসজিদের দিকে গমন করা’ এ কথাও রয়েছে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, পাপ মোচনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ আমলসমূহের দ্বারা মর্যাদা ও বৃক্ষি পেতে থাকে। এটাই হচ্ছে এ আয়াতের ভাবার্থ। কিন্তু এ হাদীসটি একেবারেই গারীব। হ্যরত আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন—**রَابِطُرَا** শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা।’ কিন্তু উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা হচ্ছে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর উক্তি। এও বলা হয়েছে যে, **রَابِطُرَا** শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্রদের সাথে যুদ্ধ করা, ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমান্তের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং শক্রদেরকে ইসলামী শহরে প্রবেশ করতে না দেয়া। এর উৎসাহ দানের ব্যাপারেও বহু হাদীস রয়েছে এবং ওর জন্যে বড় বড় পুণ্য প্রদানের অঙ্গীকার রয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘এক দিনের এ প্রস্তুতি সারা দুনিয়া ও ওর সমুদয় বস্তু হতে উত্তম।’ সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “এক দিবস ও রজনীর জিহাদের প্রস্তুতি এক মাসের পূর্ণ রোগ্য এবং এক মাসের সারা রাত্রির জাগরণ হতে উত্তম। ঐ প্রস্তুতির অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে গেলে সে..যত ভাল ভাল কাজ করতো সব কিছুরই সে পুণ্য পেতে থাকবে এবং গওগোল হতে সে নিরাপত্তা লাভ করবে।” মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল শেষ হয়ে যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রস্তুতির কার্যে রয়েছে এবং ঐ অবস্থাতেই মারা গেছে তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বৃক্ষি পেতে থাকবে ও তাকে কবরের শাস্তি হতে মুক্তি দেয়া হবে।’ সুনান-ই-ইবনে মাজার বর্ণনায় এও রয়েছে যে, উথান দিবসের আতংক হতে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। মুসনাদ-ই-আহমাদের অন্য হাদীসে রয়েছে যে, সকাল সন্ধ্যায় জান্নাত হতে আহার্য প্রদান করা হবে। কিয়ামত পর্যন্ত সে সৎকার্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিদান পেতে থাকবে। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি মুসলমানদের সীমান্তের কোন প্রান্তে তিন দিন (জিহাদের) প্রহরায় নিযুক্ত থাকে তাকে সারা বছর ধরে প্রহরায় নিযুক্ত থাকার প্রতিদান দেয়া হবে।’ আমীরুল মুমিনীন হ্যরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) স্বীয় মিস্ত্রের উপর ভাষণ দান কালে একদা বলেন, ‘আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনা কথা শুনাচ্ছি। আমি বিশেষ এক খেয়ালে এ পর্যন্ত তোমাদেরকে তা শুনাইনি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আল্লাহর পথে এক ঘন্টা পাহারা দেয়া এক হাজার রাত্রির ইবাদত হতে উত্তম যে রাত্রিগুলো দাঁড়িয়ে এবং দিনগুলো রোয়ায় কাটিয়ে দেয়া হয়।’ এতদিন ধরে তাঁর এ হাদীসটি বর্ণনা না করার কারণ তিনি বর্ণনা করেন, ‘আমার ভয় ছিল যে, এ মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা সবাই হয়তো মদীনা ছেড়ে যুক্তক্ষেত্রে গমন করবে। এখন আমি

তোমাদেরকে শুনিয়ে দিছি। প্রত্যেক ব্যক্তিরই এ স্বাধীনতা রয়েছে যে, যে কাজ সে নিজের জন্যে পছন্দ করে তা যেন সে পালন করে।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি পরে বলেনঃ 'আমি কি তোমাদের নিকট পৌছিয়ে দিয়েছি?' জনগণ বলেঃ 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।' জামেউত তিরমিয়ীতে রয়েছে যে, হ্যরত শুব্রাহিম ইবনে সামত (রাঃ) সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন। বহুদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তিনি কিছু সংকীর্ণ মনা হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় হ্যরত সালমান ফারেসী (রাঃ) তাঁর নিকট পৌছেন এবং বলেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি হাদীস শুনাবো। তিনি বলেছেনঃ 'একদিন সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত থাকা এক মাসের রোয়া ও দাঁড়িয়ে ইবাদত হতে উত্তম। যে ব্যক্তি এই অবস্থাতেই মারা যায় সে কবরের শাস্তি হতে মুক্তি পায় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার কাজ চালু থাকে।' সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মুসলমানদেরকে নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্যে একরাত্রি আল্লাহর পথে পাহারা দেয়া একশ বছরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম, যদিও ঐ রাত্রি রম্যানের রাত্রি না হয়, যে একশ বছরের দিনগুলো রোয়া এবং রাত্রিগুলো তাহাজুদে কাটিয়ে দেয়া হয়। আর মুসলমানদেরকে নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্যে এবং পুণ্য লাভের নিয়তে রম্যান মাসের দিন ছাড়াও কোন একটি দিনে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হাজার বছরের রোয়া ও তাহাজুদ হতে উত্তম। এখন যদি এ গাযী সহীহ সালামতে স্বীয় পরিবারের নিকট আগমন করে তবে এক হাজার বছরের পাপ তার আমল নামায লিখা হয় না। কিন্তু পুণ্য লিখা হয় এবং সে কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকার পুণ্য পেতে থাকে।'" এ হাদীসটি গারীব এমনকি পরিত্যক্ত। এর একজন বর্ণনাকারী মিথ্যায় অভিযুক্ত। সুনান-ই-ইবনে মাজার একটি গারীব হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মুসলমান সৈন্যদের পিছনে এক রাত্রির পাহারা এক বছরের রাত্রি দাঁড়িয়ে ইবাদত করা হতে এবং দিনগুলোর রোয়া রাখা হতে উত্তম। প্রত্যেক বছরের মধ্যে তিনশ ষাট দিন রয়েছে এবং প্রত্যেক দিন বছরের মত।' এ হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী হচ্ছে সাইদ ইবনে খালিদ, হ্যরত আবু যারআ' (রঃ) প্রভৃতি ইমামগণ তাকে দুর্বল বলেছেন। বরং ইমাম হাকিম (রঃ) বলেন যে, তার বর্ণনাকৃত হাদীসসমূহের মধ্যে মাওয়ু' হাদীসও রয়েছে। একটি মুনকাতা' হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ইসলামের সৈন্যের প্রহরীর উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক।' (সুনান-ই-ইবনে মাজা) হ্যরত সাহল ইবনে হানযালা (রাঃ) বলেন, তনায়েনের যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে গমন করি। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করি এমন সময়

একজন অশ্বারোহী এসে বলে, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি অগ্নে বেড়ে গিয়েছিলাম এবং অমুক পাহাড়ের উপর আরোহণ করে আমি লক্ষ্য করি যে, হাওয়ায়েম গোত্রের লোক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে গেছে। তাদের সাথে উট, ছাগল, স্ত্রীলোক এবং শিশুরাও রয়েছে।’ একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটু মুচকি হেসে উঠে বলেনঃ ‘ইনশাআল্লাহ! এ সবগুলো মুসলমানদের যুদ্ধলক্ষ্মালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।’ অতঃপর তিনি বলেনঃ ‘আজকের রাত্রের পাহারা দেবে কে?’ হ্যরত আনাস ইবনে আবু মুরশিদ (রঃ) বলেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি প্রস্তুত আছি।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘যাও, সোয়ারী নিয়ে এসো।’ তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করে হায়ির হন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ ‘এ ঘাঁটিতে চলে যাও এবং ঐ পর্বতের চূড়ায় আরোহণ কর। সাবধান! সকাল পর্যন্ত তাদের সাথে যেন তোমাদের কোন প্রকার বিরক্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়।’ ফজর হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযের জায়গায় এসে দু’ রাকআত সুন্নত আদায় করেন এবং জনগণকে জিজেস করেনঃ “বল তো, তোমাদের অশ্বারোহী প্রহরীর কোন পদশব্দ শুনা যাবে কি?” জনগণ বলে, “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! না।” তখন নামাযের জন্য তাকবীর দেয়া হয় এবং তিনি নামায আরঞ্জ করেন। তাঁর খেয়াল ঘাঁটির দিকেই ছিল। নামাযের সালাম ফিরিয়েই তিনি বলেনঃ “তোমরা খুশী হও। তোমাদের অশ্বারোহী আসছে।” আমরাও বোপের মধ্য হতে উঁকি মেরে দেখি। অল্লাস্কণের মধ্যে আমরাও দেখতে পাই। সে এসেই রাসূল (সঃ)-কে বলে, “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি এ উপত্যকার উপরের অংশে পৌছে গিয়েছিলাম এবং আপনার নির্দেশক্রমে তথায়ই রাত্রি অতিবাহিত করি। সকালে আমি অন্য ঘাঁটি দেখে লই কিন্তু সেখানেও কেউ নেই।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে বলেন, রাত্রে তুমি ওখান হতে নীচেও নেমেছিলে কি? তিনি বলেনঃ ‘না, শুধু নামাযের জন্যে এবং প্রস্তাব পায়খানার জন্যে নীচে নেমেছিলাম।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে বলেনঃ “তুমি নিজের জন্যে জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছো। এরপর আর কোন আমল না করলেও কোন ক্ষতি নেই।” (সুনান-ই-আবি দাউদ ও নাসাই) মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হ্যরত আবু রায়হানা বলেন, “এক যুদ্ধে আমরা একটি উঁচু ভূমির উপর ছিলাম। অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়ছিল। শেষ পর্যন্ত লোক গর্ত খনন করে তাতে পড়ে রয়েছিল। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) ডাক দিয়ে বলেনঃ ‘আজ রাত্রে আমাদেরকে পাহারা দেবে এবং আমাদের নিকট হতে উত্তম দু’আ নেবে এমন কেউ আছে কি?’ একথা শুনে একজন আনসারী (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি প্রস্তুত আছি।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে তাঁর নাম জিজেস করতঃ তাঁর জন্যে বহু দু’আ

করেন। আমি এ দু'আ শুনে সশুখে অগ্রসর হয়ে বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমিও পাহারা দেবো। তিনি আমাকেও পার্শ্বে ডেকে নেন এবং নাম জিঞ্জেস করে আমার জন্যেও দু'আ করেন। কিন্তু ঐ আনসারী সাহাবীর তুলনায় কম ছিল। অতঃপর রাসূলল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “ঐ চক্ষুর উপর জাহানামের তাপ হারাম যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে এবং ঐ চক্ষুর উপরেও জাহানামের তাপ হারাম যে আল্লাহর পথে রাত্রি জাগরণ করে।” মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, বাদশাহর পক্ষ হতে বেতন ছাড়াই মুসলমানদের পিছন হতে তাদের উপর পাহারা দেয় সে স্বীয় চক্ষু দ্বারাও জাহানামের আগুন দর্শন করবে না, কিন্তু শুধুমাত্র কসম পুরো হওয়ার জন্যে (দর্শন করবে)।” যেমন নিম্নের আয়াতে রয়েছে-

وَانِ مِنْكُمْ إِلَّا وَارْدُهَا

অর্থাৎ “তোমাদের মধ্যে সবাই ওর উপর আগমন করবে।” (১৯ঃ ৭১) সহীহ বুখারীর মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “স্বর্ণ মুদ্রার দাস রৌপ্য মুদ্রার দাস এবং বস্ত্রের দাস ধ্বংস হয়েছে। যদি তাকে সম্পদ দেয়া হয় তবে সে খুশী হয় এবং না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়, সে ধ্বংস হয়েছে এবং বিনষ্ট হয়েছে। তার পায়ে কাঁটা চুকলে তা বের করার চেষ্টাও করা হয় না। সৌভাগ্যবান ও উন্নতশীল ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্যে স্বীয় অশ্বের বল্গা ধারণ করে থাকে, তার মাথার চুল বিক্ষিপ্ত, পদদ্বয় ময়লা যুক্ত। তাঁকে পাহারায় নিযুক্ত করলে পাহারা দিয়ে থাকে, সেনাবাহিনীর অগ্রে নিযুক্ত করলে তাতেও খুশী হয়। লোকের দৃষ্টিতে সে এত নিকৃষ্ট যে, সে যেতে চাইলে অনুমতি পায় না, কারও জন্যে সুপারিশ করলে তা গৃহীত হয় না।” আল্লাহ তা'আলারই সমস্ত প্রশংসা যে, এ আয়াত সম্পর্কীয় বিশেষ বিশেষ হাদীসসমূহ বর্ণিত হলো। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের উপর আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দুনিয়ায় থাকা পর্যন্ত তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হতে আমরা ক্ষান্ত হতে পারি না। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে রয়েছে যে, হ্যরত আবু উবাইদা ইবনুল জারারাহ (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্র হতে আমীরকুল মুমিনীন, খালীফাতুল মুসলিমীন হ্যরত উমার ইবনে খাতাব (রাঃ)-কে একটি পত্র লিখেন এবং সেই পত্রে রোমক সৈন্যদের আধিক্য, তাদের যুদ্ধাত্মক অবস্থা এবং তাদের প্রস্তুতির অবস্থা বর্ণনা করেন এবং লিখেন যে, ভীষণ বিপদের আশংকা রয়েছে। হ্যরত উমার (রাঃ) উত্তর পত্র প্রেরণ করেন যাতে আল্লাহর প্রশংসার পরে লিখিত ছিলঃ ‘মাঝে মাঝে মুমিন বান্দাদের উপরেও কঠিন বিপদ-আপদ নেমে আসে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সেই কঠিন বিপদের পর তাদের পথ সহজ করে দেন। জেনে রেখো যে, ছুটি সরলতার উপর একটি কাঠিন্য জয়যুক্ত হতে পারে না। দেখ আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন-অর্থাৎ “হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর এবং

সহিষ্ণু ও সুপ্রতিষ্ঠিত হও এবং আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা মুক্তি প্রাপ্ত হও।” হিজরী ১৭০ অথবা ১৭৭ সনে তারসুস শহরে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ) যখন জিহাদে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন তখন হ্যরত মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে সাকীনা (রঃ) তাঁকে বিদায় দেয়ার জন্যে এসেছিলেন। সে সময় হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ) নিম্নলিখিত কবিতা লিখে হ্যরত মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম (রঃ)-এর হাতে হ্যরত ফুয়াইল ইবনে আয়াস (রঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দেনঃ

يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ ابْصَرْتَنَا \* لَعِلْمَتْ أَنَّكَ فِي الْعِبَادَةِ تَلْعَبُ  
مَنْ كَانَ يَخْضَبُ خَدَهُ بِدَمْسُوعِهِ \* فَنَحْوُرَنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَبُ  
وَمَنْ كَانَ تَنْعَبُ خَيْلَهُ فِي بَاطِلٍ \* فَخَبِيَّوْ لَنَا يَوْمَ الصَّبِيْحَةِ تَنْعَبُ  
رِيحُ الْعَبِيرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيرُنَا \* رَهْجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْأَطَيْبُ  
وَلَقَدْ آتَانَا مِنْ مَقَالِنِنَا \* قَوْلُ صَحِيْحٍ صَادِقٌ لَا يُكَذَّبُ  
لَا يُسْتَوِي غُبَارُ خَيْلِ اللَّهِ فِي \* أَنْفُ امْرِئٍ وَدُخَانُ نَارٍ تَلْهَبُ  
هَذَا كِتَابُ اللَّهِ يُنْطَقُ بِنَنَا \* لَيْسَ الشَّهِيدُ بِمَيْتٍ لَا يُكَذَّبُ

অর্থাৎ “হে মুক্তা ও মদীনায় অবস্থান করে ইবাদতকারী! আপনি যদি আমাদের মুজাহিদগণকে দেখতেন তবে আপনি অবশ্যই জানতে পারতেন যে, আপনি ইবাদতে খেল-তামাশা করছেন মাত্র। এক ঐ ব্যক্তি যার নয়নাঙ্ক তার গওদেশ সিক্ত করে এবং এক আমরা যারা স্বীয় স্বীয় আল্লাহর পথে কাটিয়ে দিয়ে নিজেদের রক্তে নিজেরাই গোসল করে থাকি। এক ঐ ব্যক্তি যার ঘোড়া মিথ্যা ও বাজে কাজে ঝান্ট হয়ে পড়ে এবং আমাদের ঘোড়া আক্রমণ ও যুদ্ধের দিনেই শুধু ঝান্ট হয়। আগর বাতির সুগন্ধি হচ্ছে আপনাদের জন্যে, আর আমাদের জন্যে আগর বাতির সুগন্ধি হচ্ছে ঘোড়ার খুরের মাটি ও পবিত্র ধূলাবালি। নিশ্চিতরূপে জেনে রাখুন, আমাদের নিকট নবী (সঃ)-এর এ হাদীসটি পৌছেছে যা সম্পূর্ণ সত্য এবং মিথ্যা হতে পারে না, তা এই যে, যার নাসিকায় সেই আল্লাহর সৈন্যের ধূলাবালি ও পৌছেছে তার নাসিকায় অগ্নিশিখা যুক্ত জাহানামের আগনের ধুঁয়াও প্রবেশ করবে না। নিন, এ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব যা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বলছে ও সত্য বলছে যে, শহীদ মৃত নয়।

হ্যরত মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম বলেন, যখন আমি মসজিদে হারামে পৌছে হ্যরত ফুয়াইল ইবনে আয়াস (রঃ)-কে এ কবিতাগুলো প্রদর্শন করি তখন তিনি

কান্নায় ফেটে পড়েন এবং বলেন, “আবু আব্দির রহমানের উপর আল্লাহ দয়া করুন! তিনি সত্য কথাই বলেছেন এবং আমাকে উপদেশ দিয়েছেন ও আমার খুবই মঙ্গল কামনা করছেন।” অতঃপর আমাকে বলেন, “তুমি কি হাদীস লিখে থাক?” আমি বলি জি, হ্যাঁ। তিনি বলেন, “আচ্ছা, তুমি যখন এ উপদেশনামা আমার নিকট নিয়ে এসেছো তখন তার পরিবর্তে আমি তোমার দ্বারা একটি হাদীস লিখিয়ে নিছি।” হাদীসটি নিম্নরূপঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি আবেদন করেন- ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দিন যা পালন করলে আমি মুজাহিদের পুণ্য লাভ করতে পারি। তিনি তখন তাকে বলেনঃ ‘তোমার মধ্যে কি এ শক্তি আছে যে, তুমি নামায পড়তেই থাকবে, কখনও ঝান্ত হবে না এবং রোয়া রাখতেই থাকবে এবং কখনও বে-রোয়া থাকবে না?’ লোকটি বলে, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এর শক্তি কোথায়? আমি তো এ ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্বল।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন লোকটিকে বলেনঃ ‘যদি তোমার মধ্যে একুপ শক্তি থাকতো এবং তুমি একুপ করতেও থাকতে তথাপি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মর্যাদা লাভ করতে পারতে না। তুমিও তো এটা জান যে, যদি মুজাহিদদের ঘোড়ার দড়ি লম্বা হয়ে যায় এবং সে এদিক ওদিক চড়ে যায় তবে তজন্যেও মুজাহিদের পুণ্য লিখা হয়।’

এরপরে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন- “তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং এ ভয় সর্বাবস্থায়, সব সময়, সর্বকাজে থাকতে হবে।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত মুআ’য ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে যখন ইয়ামনে প্রেরণ করেন তখন তিনি তাঁকে বলেনঃ “হে মুআ’য! যেখানেই থাক না কেন অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখবে। যদি তোমার দ্বারা কোন পাপকার্য হয়ে যায় তবে তৎক্ষণাতে কোন পুণ্যের কাজও করবে, যেন সেই পাপ মোচন হয়ে যায়। আর জনগণের সাথে উন্নত ব্যবহার করবে।”

তারপরে আল্লাহ তা’আলা বলেন- ‘এ চারটি কাজ করলে তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে।’ হ্যরত মুহাম্মদ ইবনে কারায়ী (রঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে, ‘তোমরা আমার খেয়াল রাখ, আমার ভয়ে কাঁপতে থাক। আমার ও তোমাদের কার্যের ব্যাপার সংযোগ হও। যখন আমার উপর ভরসা করবে তখন তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত ও সফলকাম হবে।’



# سُورَةُ النِّسَاءِ مَدْنِيَّةٌ

(آياتها: ۱۷۶، رکوعاتها: ۲۴)

হ্যরত ইবনে আবৰাস (রাঃ) বলেন যে, এ সূরাটি মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবিতও (রাঃ) এটাই বলেন। হ্যরত ইবনে আবৰাস (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, যখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ বলেনঃ “এখন আর কৃকুরাখা নয়।” মুসতাদরিক-ই-হাকিমে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ “সূরা-ই-নিসার মধ্যে পাঁচটি এমন আয়াত আছে যে, যদি আমি সারা দুনিয়া পেয়ে যেতাম তথাপি আমি তত খুশী হতাম না যত খুশী এ আয়াতগুলোতে হয়েছি। একটি আয়াত হচ্ছেঃ ‘আল্লাহ তা’আলা কারও উপর অণুপরিমাণও অত্যাচার করেন না, যার যে পুণ্য থাকে তার প্রতিদান তিনি তাকে বেশী বেশী করে দেন এবং নিজের পক্ষ হতে পুরস্কার হিসেবে যে বড় প্রতিদান তা তো পৃথক।’” দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছেঃ ‘তোমরা যদি বড় বড় পাপসমূহ হতে বেঁচে থাক তবে ছোট ছোট পাপগুলো তিনি নিজেই ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক জানাতে প্রবিষ্ট করবেন।’ তৃতীয় আয়াত হচ্ছেঃ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেন না এবং অবশিষ্ট পাপীদের যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করে থাকেন।’ চতুর্থ আয়াত হচ্ছেঃ ‘ঐ লোকগুলো যদি নিজেদের জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট এসে যেতো এবং নিজেও স্বীয় পাপের জন্যে আল্লাহ তা’আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো ও রাসূল (সঃ) তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পেতো।’ ইমাম হাকিম (রঃ) বলেনঃ ‘এর ইসনাদ সহীহ বটে, কিন্তু এর আবদুর রহমান নামক একজন বর্ণনাকারীর তার পিতার নিকট হতে শুনার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আবদুর রায়্যাকের বর্ণনায় এই আয়াতটির পরিবর্তে নিম্নের আয়াতটি রয়েছেঃ ‘যে ব্যক্তির দ্বারা কোন পাপকার্য সংঘটিত হয় কিংবা সে নিজের জীবনের উপর অত্যাচার করে, অতঃপর সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে নিশ্চয় আল্লাহ তা’আলাকে ক্ষমাশীল, দয়ালু পাবে।’ হাদীসদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এই ভাবে হবে যে, প্রথম হাদীসে একটি আয়াতের বর্ণনা বাকী রয়ে গেছে এবং ওর বর্ণনা দ্বিতীয় হাদীসে হয়েছে। তাহলে পূর্ববর্তী হাদীসের চার আয়াত এবং পরবর্তী হাদীসের, এক আয়াত মিলে মোট পাঁচ আয়াত হয়ে গেল। কিংবা *إِنَّ اللَّهَ لَا يَبْلُغُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ*

(৪: ৪০) হতেই একটি আয়াত পূর্ণ হয়ে গেছে এবং **وَإِنْ تَكُونُ حَسَنَةً**—কে পৃথক আয়াত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, তবে দু'টি হাদীসেই পাঁচটি পাঁচটি করে আয়াত হয়ে গেল। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ সূরায় এমন ৮টা আয়াত রয়েছে যেগুলো এ উচ্চতের জন্যে প্রত্যেক ঐ জিনিস হতে উত্তম যার মধ্যে সূর্য উদিত ও অন্তমিত হয়। প্রথমটি হচ্ছে: ‘আল্লাহ সীয় আহকাম তোমাদের উপর পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে চান এবং তোমাদেরকে ঐ সৎ লোকদের পথ-প্রদর্শন করতে চান যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে ও তোমাদের তাওবা কবুল করতে চান, আল্লাহ মহাজ্ঞাতা, বিজ্ঞানময়।’ দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে: ‘আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করতে এবং তোমাদের তাওবা কবুল করতে চান, আর সীয় প্রবৃত্তির অনুসারীরা চায় যে, তোমরা সত্য পথ হতে বহু দূরে সরে পড়।’ তৃতীয় আয়াতটি হচ্ছে: ‘মানুষকে যেহেতু দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই আল্লাহ তোমাদের উপর হালকা করতে চান।’ বাকী আয়াত হচ্ছে ঐগুলো যেগুলো পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আবি মালকিয়াহ (রঃ) বলেনঃ ‘আমি হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) হতে সূরা-ই-নিসা সম্পর্কে শুনেছি। কুরআন কারীম পড়েছি, অথচ আমি ছোট শিশু ছিলাম।’ (মুসতাদরিক-ই-হাকিম)

পরম কর্তৃপাত্র ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে আরঞ্জ করাই।

১। হে মানবমণ্ডলী! তোমরা

তোমাদের প্রভুকে ভয় কর  
যিনি তোমাদেরকে একই  
ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও  
তা হতে তদীয় সহধর্মীণী সৃষ্টি  
করেছেন এবং তাদের উভয়  
হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে  
দিয়েছেন এবং সেই আল্লাহকে  
ভয় কর যাঁর নামের দোহাই  
দিয়ে তোমরা একে অপরকে  
তাগাদা কর এবং  
আজ্ঞায়তাকেও ভয় কর,  
নিশ্চয়ই আল্লাহই তোমাদের  
তত্ত্বাবধানকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱- يَا يَهُودُ مُسْلِمُو  
النَّاسِ اتَّقُوا رَبِّكُمْ

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا  
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
رَقِيبًا

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে এবং অন্তরে যেন তাঁরই ভয় রাখে। অতঃপর তিনি স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন-আল্লাহ তোমাদের সকলকে একই ব্যক্তি হতে অর্থাৎ হ্যরত আদম (আঃ) হতে সৃষ্টি করেছেন। এবং এই ব্যক্তি হতেই তিনি হ্যরত হাওয়া (আঃ)-কেও সৃষ্টি করেছেন। হ্যরত আদম (আঃ) ঘূর্মিয়ে ছিলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাম পাঁজরের পিছন দিক হতে হ্যরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। তিনি জাগ্রত হয়ে তাঁকে দেখতে পান এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর প্রতিও হ্যরত হাওয়া (আঃ)-এর ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

হ্যরত ইবনে আবুবাস (রাঃ) বলেন যে, স্ত্রীকে পুরুষ হতে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ জন্যে তাঁর প্রয়োজন ও কামভাব পুরুষের মধ্যেই রাখা হয়েছে। আর পুরুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দ্বারা এ জন্যেই তাঁর প্রয়োজন মাটিতেই দ্বারা হয়েছে। সুতরাং তোমরা স্বীয় স্ত্রীদেরকে রূপ্ত রাখ। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছেঃ ‘স্ত্রীলোককে পাঁজর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সবচেয়ে উঁচু পাঁজর হচ্ছে সবচেয়ে বেশী বক্র। সুতরাং তুমি যদি তাকে সম্পূর্ণ সোজা করার ইচ্ছে কর তবে তাকে ভেঙ্গে দেবে। আর যদি তার মধ্যে কিছু বক্রতা রেখে দিয়ে উপকার লাভ করতে চাও তবে অবশ্যই উপকার লাভ করতে পারবে।’

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন- ‘দু'জন হতে অর্থাৎ হ্যরত আদম (আঃ) ও হ্যরত হাওয়া (আঃ) হতে বহু নর ও নারী সৃষ্টি করতঃ দুনিয়ার চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, যাদের প্রকারে, বিশেষণে, রঞ্জে, আকারে এবং কথাবার্তায় বিভিন্নতা রয়েছে। এ সমস্ত যেমন পূর্বে আল্লাহ তা'আলারই অধিকারে ছিল, তিনি তাদেরকে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন ঠিক তেমনই এক সময়ে তিনি সকলকে একত্রিত করে পুনরায় নিজের দখলে নিয়ে নেবেন এবং একটি মাঠে জমা করবেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক, তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত করতে থাক। তোমরা সেই আল্লাহরই মাধ্যম দিয়ে তাঁর নামেরই দোহাই দিয়ে একে অপরের নিকট তাগাদা করে থাক।’ যেমন কেউ বলে- ‘আমি আল্লাহকে স্বরণ করিয়ে দিয়ে এবং আঞ্চলিকাকে মনে করিয়ে দিয়ে তোমাকে এ কথা বলছি।’ মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা

তাঁরই নামে শপথ করে থাক এবং অঙ্গীকার দৃঢ় করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় করতঃ আঞ্চীয়তার রক্ষণাবেক্ষণ করে, ওর বন্ধন ছিন্ন করো না, বরং যুক্ত রাখ। একে অপরের সাথে সম্বুদ্ধ কর। একটি পর্তনে **أَرْحَامٌ** ও রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নামে এবং আঞ্চীয়তার মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত অবস্থা ও কার্যাবলীর সংবাদ রাখেন এবং তিনি খুব ভালভাবে তোমাদের তত্ত্বাবধান করতে রয়েছেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে:

**وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ**

অর্থাৎ 'আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর সাক্ষী রয়েছেন।'

বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যে, যেন তুমি তাঁকে দেখছো, অথবা তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।' ভাবার্থ এই যে, তোমরা তাঁর প্রতি মনোযোগ দাও যিনি তোমাদের উঠায়, বসায়, চলায় ও ফেরায় তোমাদের রক্ষক হিসেবে রয়েছেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'হে মানবমণ্ডলী! একই বাপ-মায়ের মাধ্যমে তো তোমাদের জন্ম হয়েছে। সুতরাং তোমরা পরম্পরে একে অপরের প্রতি প্রেম-প্রীতি বজায় রেখো, দুর্বলদের সহায়তা কর এবং তাদের সাথে সম্বুদ্ধ কর। সহীহ মুসলিমে একটি হাদীসে রয়েছে যে, 'মুয়া'র প্রোত্র যখন নিজেদেরকে চাদরে আবৃত করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে, কেননা, তাদের শরীরে কাপড় পর্যন্ত ছিল না, তখন রাসূলুল্লাহ যোহরের নামায়ের পর দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করেন, যাতে তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করতঃ নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেনঃ

**يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِير**

অর্থাৎ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই যেন দেখে যে, সে আগামীকালের জন্যে কি সামনে পাঠিয়েছে?' (৫৯: ১৮) অতঃপর তিনি জনগণকে দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহিত করেন। ফলে যে যা পারলেন ঐ লোকগুলোকে দান করলেন। স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা, খেজুর, গম ইত্যাদি সব কিছুই দিলেন। মুসনাদ ও সুনানের মধ্যে অভাবের ভাষণের বর্ণনায় রয়েছে যে, পরে তিনি তিনটি আয়াত পাঠ করেন যার মধ্যে একটি এ আয়াতটিই।

২। আর পিতৃহীনগণকে তাদের ধন-সম্পত্তি প্রদান কর এবং পবিত্রতার সাথে অপবিত্রতার বিনিময় করো না ও তোমাদের ধন-সম্পত্তির সাথে তাদের ধন-সম্পত্তি ভোগ করো না; নিশ্চয়ই এটা গুরুতর অপরাধ।

৩। আর যদি তোমরা আশংকা কর যে পিতৃহীনগণের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীগণের মধ্য হতে তোমাদের মনমত দু'টি ও তিনটি ও চারটিকে বিয়ে কর; কিন্তু যদি তোমরা আশংকা কর যে, ন্যায় বিচার করতে পারবে না তবে মাত্র একটি অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার অধিকারী (ক্রীতদাসী); এটা অবিচার না করার নিকটবর্তী।

৪। আর নারীগণকে তাদের দেয় মোহর প্রদান কর কিন্তু যদি তারা সন্তুষ্টচিত্তে পর কিয়দাংশ প্রদান করে তবে বিবেচনা মত তৃষ্ণির সাথে ভোগ কর।

٤- وَاتُوا الِّيَتَمَيْ أَمْوَالَهُمْ وَ  
لَا تَبْدِلُوا الْخَيْثَ بِالْطِّبِّ  
وَلَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى  
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوَّاً كَبِيرًا

٣- وَإِنْ خَفْتُمُ الَا تُقْسِطُوا فِي  
الِّيَتَمَيْ فَانْكِحُوهُ مَا طَابَ  
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ  
وَرِبعٍ فَإِنْ خَفْتُمُ الَا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ  
إِيمَانَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى الَّ  
تَعْوِلُوا

٤- وَاتُوا النِّسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ  
نِحْلَةً فَإِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَئِ  
مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هِنِيَّا  
مَرِينَا

আল্লাহ তা'আলা পিতৃহীনদের অভিভাবকগণকে নির্দেশ দিচ্ছেন-পিতৃহীনেরা যখন প্রাণ বয়সে পৌছে ও বিবেকসম্পন্ন হয় তখন তাদেরকে তাদের মাল পুরোপুরি প্রদান করবে। কিছুমাত্র কম করবে না বা আত্মসাংও করবে না। তাদের মালকে তোমাদের মালের সঙ্গে মিশ্রিত করে ভক্ষণ করার বাসনা অন্তরে পোষণ করো না। হালাল মাল যখন আল্লাহ পাক তোমাদেরকে প্রদান করেছেন-তখন হারামের দিকে যাবে কেন? তোমাদের ভাগ্যে যে অংশ লিপিবদ্ধ তা তোমরা অবশ্যই প্রাণ হবে। তোমাদের হালাল মাল ছেড়ে দিয়ে অপরের মাল যা তোমাদের জন্যে হারাম তা কখনও গ্রহণ করো না। নিজেদের দুর্বল ও পাতলা পশুগুলো দিয়ে অপরের মোটাতাজাগুলো হস্তগত করো না। মন্দ দিয়ে ভাল নেয়ার চেষ্টা করো না। পূর্বে লোকেরা এক্রূপ করতো যে, তারা পিতৃহীনদের ছাগলের পাল হতে বেছে বেছে ভালগুলো নিয়ে নিজেদের দুর্বল ছাগলগুলো দিতো এবং এভাবে গণনা ঠিক রাখতো। মন্দ দিরহামগুলো তাদের মালে রেখে দিয়ে তাদের ভালগুলো নিয়ে নিতো। অতঃপর মনে করতো যে তারা ঠিকই করেছে। কেননা, ছাগলের পরিবর্তে ছাগল দিয়েছে এবং দিরহামের পরিবর্তে দিরহাম দিয়েছে। তারা পিতৃহীনদের সম্পদকে নিজেদের সম্পদের মধ্যে মিশ্রিত করে দিয়ে এ কৌশল করতো যে, এখন আর স্বাতন্ত্র্য কি আছে? তাই আল্লাহ পাক বলেন-‘তাদের সম্পদ নষ্ট করো না, কেননা, এটা বড় পাপ।’ একটি দুর্বল হাদীসেও আয়াতটির শেষ বাক্যের এ অর্থই বর্ণিত আছে।

সুনান-ই-আবু দাউদের একটি দু'আতেও “**حُبٌ**” শব্দটি পাপের অর্থে এসেছে। হ্যরত আবু আইয়ুব (রাঃ) স্বীয় পঞ্চাকে তালাক দেয়ার ইচ্ছে করলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ ‘এক তালাক প্রদানে পাপ হবে।’ সুতরাং তিনি স্বীয় সংকল্প হতে বিরত থাকেন। অন্য বর্ণনায় এ ঘটনাটি হ্যরত আবু তালহা (রাঃ) এবং হ্যরত উম্মে সুলায়েম (রাঃ)-এর ঘটনা বলে বর্ণিত আছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-‘কোন পিতৃহীনা বালিকার লালন পালনের দায়িত্ব যদি তোমাদের উপর ন্যস্ত থাকে এবং তোমরা তাকে বিয়ে করার ইচ্ছে কর, কিন্তু যেহেতু তার অন্য কেউ নেই, কাজেই তোমরা এক্রূপ করো না যে, তাকে মোহর কর দিয়ে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করবে, বরং আরও বহু স্ত্রীলোক রয়েছে তাদের মধ্যে তোমাদের পছন্দয়ত দু'টি, তিনটি এবং চারটিকে বিয়ে কর।’

হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ ‘একটি পিতৃহীনা বালিকা ছিল। তার মাল-ধনও ছিল এবং বাগানও ছিল। যে লোকটি তাকে লালন পালন করছিল সে

শুধুমাত্র তার মাল-ধনের লালসায় পূর্ণ মোহর ইত্যাদি নির্ধারণ না করেই তাকে বিয়ে করে নেয়। তখন এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়। আমার ধারণা এই যে, এই বাগানে ও মালে এ বালিকাটির অংশ ছিল।'

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, হ্যরত ইবনে শিহাব (রাঃ) হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-কে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ ‘হে ভাগ্নে! এটা পিতৃহীনা বালিকার বর্ণনা, যে তার অভিভাবকের অধিকারে রয়েছে এবং তার মালে তার অংশ রয়েছে। আর সে বালিকার মাল ও সৌন্দর্য তার চোখে লেগেছে। সুতরাং সে তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু অন্য জায়গায় বালিকাটি যতটা মোহর ইত্যাদি পেতো ততটা সে দেয় না। সুতরাং সে অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে যে, সে যেন সে বাসনা পরিত্যাগ করে এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকদেরকে পছন্দমত বিয়ে করে নেয়।’

অতঃপর জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এই ব্যাপারেই প্রশ্ন করে এবং **وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ** (৪: ১৬৭) আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়। তথায় বলা হয়—‘যখন পিতৃহীনা মেয়ের মাল ও সৌন্দর্য কম থাকে তখন তো অভিভাবক তার প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না, সুতরাং এর কোন কারণ নেই যে, তার মাল ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার পূর্ণ হক আদায় না করেই তাকে বিয়ে করে নেবে। হাঁ, তবে ন্যায়ের সাথে যদি পূর্ণ মোহর ইত্যাদি নির্ধারণ করতঃ বিয়ে করে তবে কোন দোষ নেই। নচেৎ স্ত্রীলোকের কোন অভাব নেই। তাদের মধ্যে হতে যেন পছন্দ মত সে বিয়ে করে। ইচ্ছে করলে দু'টি, তিনটি এবং চারটি পর্যন্ত করতে পারে। অন্য জায়গাতেও এ শব্দগুলো এ অর্থেই এসেছে।

ইরশাদ হচ্ছে—

**جَاعِلٌ الْمُلِئَكَةِ رَسُلًا أُولَئِي اْجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَثٍ وَرَبْعٍ**

অর্থাৎ ‘যে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দৃতরূপে প্রেরণ করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন দু'টি ডানা বিশিষ্ট, কেউ রয়েছেন তিনটি ডানা বিশিষ্ট এবং কেউ রয়েছেন চারটি ডানা বিশিষ্ট।’ (৩৫: ১) ফেরেশতাদের মধ্যে এর চেয়ে বেশী ডানা বিশিষ্ট ফেরেশতাও রয়েছেন। কেননা এটা দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু পুরুষের জন্যে এক সাথে চারটের বেশী স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ, যেমন এ আয়াতেই বিদ্যমান রয়েছে। হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) এবং জমহুরের এটাই উক্তি। এখানে আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহ ও দানের বর্ণনা দিচ্ছেন। সুতরাং চারটের বেশীর উপর সমর্থন থাকলেও অবশ্যই তা বলতেন।

ইমাম শাফিউদ্দীন (রাঃ) বলেনঃ ‘কুরআন কারীমের ব্যাখ্যাকারী হাদীস শরীফ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ছাড়া আর কারও জন্যে একই সাথে চারটের বেশী স্তু একত্রিত করা বৈধ নয়।’ এর উপরই উলামা-ই-কিরামের ইজমা’ হয়েছে। তবে কোন কোন শিআ’র মতে তা নয়টি পর্যন্ত একত্রিত করা বৈধ। বরং কোন কোন শিআ’র মতে তা নয়টির বেশী একত্রিত করলেও কোন দোষ নেই। তাদের মতে কোন সংখ্যাই নির্ধারিত নেই। তাদের দলীল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাজ। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে, তাঁর নয়জন পত্নী ছিলেন। সহীহ বুখারী শরীফের মুআল্লাক হাদীসের কোন কোন বর্ণনাকারী এগার জন বলেছেন।

হ্যরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) পনেরজন স্তুর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তেরজনের সাথে তাঁর সহবাস হয়েছিল। একই সময়ে এগারজন পত্নী তাঁর নিকট বিদ্যমান ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) নয়জন পত্নী রেখে ইন্তেকাল করেন। আমাদের পক্ষ হতে এর উত্তর এই যে, এটা একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যেই বৈধ ছিল। তাঁর উত্তরের জন্যে একই সাথে চারটের বেশী স্তু রাখার অনুমতি নেই।

এর প্রমাণ রূপে নিম্নের হাদীসগুলো পেশ করা যেতে পারেঃ (১) হ্যরত গায়লান ইবনে সালমা সাকাফী (রাঃ) যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তখন তাঁর দশজন স্তু বিদ্যমান ছিল। রাসূলুল্লাহ(সঃ) তাঁকে বলেনঃ ‘তোমার ইচ্ছেমত চারটি স্তু রেখে বাকীগুলো পরিত্যাগ কর।’ তিনি তাই করেন। অতঃপর হ্যরত উমার (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে তিনি তাঁর ঐ স্তুগুলোকেও তালাক দিয়ে দেন এবং স্বীয় ধন-সম্পদ স্বীয় ছেলেদের মধ্যে বন্টন করে দেন। হ্যরত উমার (রাঃ) এ সংবাদ পেয়ে তাঁকে বলেনঃ ‘সন্তুষ্ট তোমার শয়তান কথা চুরি করেছে এবং তোমার মনে এ ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছে যে, তুমি সত্ত্বরই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এজন্যেই তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছো যেন তারা তোমার সম্পত্তির অংশ না পায়। আর এ কারণেই তুমি তোমার সম্পদ তোমার ছেলেদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে রাজআত কর (ফিরিয়ে নাও) এবং তোমার ছেলেদের নিকট হতে মাল ফিরিয়ে নাও। যদি তুমি এ কাজ না কর তবে তোমার মৃত্যুর পর আমি তোমার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকেও তোমার উত্তরাধিকারণী বানিয়ে দেবো। কেননা, তুমি তাদেরকে এ ভয়েই তালাক দিয়েছো। আর মনে হচ্ছে যে,

তোমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়েছে। যদি তুমি আমার কথা অমান্য কর তবে জেনে রেখো যে, আমি তোমার কবরে প্রস্তর নিষ্কেপ করার জন্যে জনগণকে নির্দেশ প্রদান করবো, যেমন আবু রাগালের কবরে প্রস্তর নিষ্কেপ করা হয়।' (মুসনাদ-ই-আহমাদ, শাফিউল্লাহ, জামেউত তিরিমিয়ী, সুনান-ই-ইবনে মাজা, দারেকুতনী ইত্যাদি) মারফু' হাদীস পর্যন্ত তো এসব কিভাবেই রয়েছে।

তবে হ্যরত উমার (রাঃ)-এর ঘটনাটি শুধুমাত্র মুসনাদ-ই-আহমাদেই রয়েছে। কিন্তু এ অতিরিক্তুকু হাসান। তবে ইমাম বুখারী (রঃ) এটাকে দুর্বল বলেছেন এবং এর ইসনাদের দ্বিতীয় ধারা বর্ণনা করার পর ঐ ধারাকে অরক্ষিত বলেছেন। কিন্তু এ ক্রটি প্রদর্শনের ব্যাপারটাও চিন্তার বিষয়। সম্মানিত হাদীস বিশারদগণও এর উপর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু মুসনাদ-ই-আহমাদে বর্ণিত হাদীসটির সমস্ত বর্ণনাকারীই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তে নির্ভরযোগ্য। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ঐ দশজন স্ত্রীও মুসলমান হয়েছিলেন। (সুনান-ই-নাসাই)

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হলো যে, একই সময়ে যদি চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা বৈধ হতো তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) গায়লান (রাঃ)-কে দশজন স্ত্রীর মধ্যে যে কোন চারজনকে রেখে অবশিষ্ট ছয়জনকে তালাক দিতে বলতেন না, কেননা তাঁরা সবাই ইমান এনেছিলেন। এখানে এটা ও স্মরণ রাখার কথা যে, গায়লান (রাঃ)-এর নিকট তো দশজন স্ত্রী বিদ্যমান ছিলেনই, তথাপি তিনি ছয়জনকে পৃথক করিয়ে দিলেন, তাহলে নতুনভাবে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা কিরূপে সম্ভব হতে পারে? (২) সুনান-ই-আবু দাউদ ও ইবনে মাজা ইত্যাদির মধ্যে হাদীস রয়েছে, হ্যরত উমাইয়া আসাদী (রাঃ) বলেনঃ 'আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার আটটি স্ত্রী ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এটা বর্ণনা করি। তিনি বলেনঃ 'তোমার ইচ্ছেমত ওদের মধ্যে চারজনকে রাখ।' এর সনদ হাসান এবং এর সাক্ষীও রয়েছে। বর্ণনাকারীদের নামের হেরফের ইত্যাদি একাপ বর্ণনায় ক্ষতিকর হয় না। (৩) মুসনাদ-ই-শাফিউল্লাহ মধ্যে রয়েছে, হ্যরত নাওফিল ইবনে মুআবিয়া (রাঃ) বলেনঃ 'আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার ৫টা স্ত্রী ছিল। আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'ওদের মধ্যে পচ্চমত চারটিকে রাখ এবং একটিকে পৃথক করে দাও।' ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে বয়স্কা ছিল এবং নিঃসন্তান ছিল তাকে আমি তালাক দিয়ে দেই।' সুতরাং এ হাদীসগুলো হ্যরত গায়লানযুক্ত হাদীসের সাক্ষী, যেমন ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-'যদি একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বজায় রাখতে না পারার ভয় থাকে তবে একটিকেই যথেষ্ট মনে কর বা দাসীদেরকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাক।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে-

وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

অর্থাৎ 'তোমরা ইচ্ছে করলেও স্ত্রীর মধ্যে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে না।'(৪: ১২৯) এখানে এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, দাসীদের মধ্যে পালা করা ইত্যাদি ওয়জিব নয়, তবে মুস্তাহাব বটে। যে করে সে ভালই করে এবং যে না করে তারও কোন দোষ নেই। এর পরবর্তী বাক্যের ভাবার্থ কেউ কেউ বলেছেন, 'এটা তোমাদের দারিদ্র্য বেশী না হওয়ার অতি নিকটবর্তী।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছেঃ 'অর্থাৎ 'যদি তোমরা দারিদ্র্যের ভয় কর।' কোন আরব কবি বলেছেনঃ

فَمَا يَدْرِي الْفَقِيرُ مَتَىٰ غَنَاهُ \* وَمَا يَدْرِي الْغِنَىٰ مَتَىٰ يَعِيلُ

অর্থাৎ 'দারিদ্র্য ব্যক্তি জানে না যে, সে কখন ধনী হবে এবং ধনী ব্যক্তি জানে না যে, সে কখন দারিদ্র্য হবে।' যখন কোন ব্যক্তি দারিদ্র্য হয়ে পড়ে তখন আরবের লোকেরা বলে থাকে (عَالَ الرَّجُلُ') অর্থাৎ লোকটি দারিদ্র্য হয়ে পড়েছে। মোটকথা এ অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে এ তাফসীর খুব ভাল বলে মনে হচ্ছে না। কেননা, যদি আযাদ স্ত্রীলোকদের আধিক্য দারিদ্র্যের কারণ হতে পারে তবে দাসীদের আধিক্যও দারিদ্র্যের কারণ হতে পারবে। সুতরাং জমহূরের উক্তি সত্যই সঠিক যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'তোমরা অত্যাচার হতে বেঁচে যাও এটা তারই অতি নিকটবর্তী।' আরবে বলা হয়- (عَالٌ فِي الْحُكُمِ) অর্থাৎ 'সে হকুমের ব্যাপারে অত্যাচার করেছে।' আবু তালিবের নিম্নের বিখ্যাত কাসিদায় রয়েছে-

بِسْمِزَانِ قُسْطٍ لَا يَغِيْسُ شَعِيرَةً \* لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِلٍ

অর্থাৎ 'এমন দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করছো যা এক যব পরিমাণও কম করে না। তার নিকট স্বয়ং তার আঘাত সাক্ষী রয়েছে যে অত্যাচারী নয়।' তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, যখনই কুফাবাসী হযরত উসমান (রাঃ)-কে প্রদত্ত এক চিঠিতে তাঁকে কিছু দোষারোপ করে তখন তার উত্তরে তিনি লিখেন, অর্থাৎ 'আমি অত্যাচারের দাঁড়ি-পাল্লা নই।' সহীহ ইবনে হিক্বান প্রভৃতির মধ্যে একটি মারফু' হাদীসে এ বাক্যের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে- 'তোমরা অত্যাচার করো না।'

হ্যরত ইবনে আবি হাতিম বলেন যে, এর মারফু' হওয়া ভুল কথা, তবে এটা হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-এর উক্তি বটে। হ্যরত ইবনে আকবাস (রা), হ্যরত আয়েশা (রাঃ), হ্যরত মুজাহিদ (রঃ), হ্যরত ইকরামা, (রঃ), হ্যরত হাসান বসরী (রঃ), হ্যরত আবু মালিক (রঃ), হ্যরত আবু যারীন (রঃ), হ্যরত নাখচি (রঃ), হ্যরত শা'বী (রঃ), যাহ্হাক (রঃ), হ্যরত আতা খুরাসানী (রঃ), হ্যরত কাতাদাহ (রঃ), হ্যরত সুদী (রঃ), হ্যরত মুকাতিল (রঃ) প্রভৃতি হতেও এ অর্থ বর্ণিত আছে। হ্যরত ইকরামাও (রাঃ) আবু তালিবের উক্ত কাসিদাটি পেশ করেছেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নিজেও এটাই পছন্দ করেন।

এর্পর আল্লাহ তা'আলা বলেন-‘তোমরা নিজেদের স্ত্রীদেরকে খুশী মনে তাদের নির্ধারিত মোহর দিয়ে দাও যা দিতে তোমরা স্বীকৃত হয়েছো। তবে যদি স্ত্রী ইচ্ছে প্রণোদিত হয়ে তার সমস্ত মোহর বা কিছু অংশ মাফ করে দেয় তবে তা করার তার অধিকার রয়েছে এবং সে অবস্থায় স্বামীর পক্ষে তা ভোগ করা বৈধ। নবী (সঃ)-এর পরে কারও জন্যে মোহর ওয়াজিব করা ছাড়া বিয়ে করা জায়েয় নয় এবং ফাঁকি দিয়ে শুধু নামমাত্র মোহর ধার্য করাও বৈধ নয়।’

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হ্যরত আলী (রাঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ ‘তোমাদের মধ্যে যখন কেউ রোগাক্রান্ত হয় তখন তার উচিত যে, সে যেন তার স্ত্রীর মালের তিন দিরহাম বা কিছু কম বেশী গ্রহণ করতো তা দিয়ে মধু ক্রয় করে এবং আকাশের বৃষ্টির পানি তার সাথে মিশ্রিত করে, তাহলে তিনটি মঙ্গল সে লাভ করবে। একটি হচ্ছে স্ত্রীর মাল যাকে আল্লাহ পাক ত্ত্ব সহকারে খেতে বলেছেন, দ্বিতীয় হচ্ছে মধুর শিকা এবং তৃতীয় হচ্ছে কল্যাণময় বৃষ্টির পানি।’ হ্যরত আবু সালিহ (রঃ) বলেন যে, মানুষ তাদের মেয়েদের মোহর নিজেরা গ্রহণ করতো। ফলে এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয় এবং এ কাজ হতে বিরত রাখা হয়। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম ও তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) এ নির্দেশ শুনে জনগণ বলেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাদের পরম্পরের মোহর কি?’ তিনি বলেনঃ ‘যে জিনিসের উপরেই তাদের পরিবার সম্মত হয়ে যায়।’ (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)

রাসূলুল্লাহ (সঃ)! স্বীয় ভাষণে তিনবার বলেনঃ ‘তোমরা বিধবাদের বিয়ে দিয়ে দাও।’ তখন একটি লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাদের পরম্পরের মোহর কি?’ তিনি বলেনঃ ‘যার উপর তাদের পরিবারের লোক সম্মত হয়ে যাবে।’ এ হাদীসের ইবনে সালমানী নামক একজন বর্ণনাকারী দুর্বল, তা ছাড়া এতে ইনকিতাও রয়েছে।

৫। আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে ধন-সম্পত্তি নির্ধারিত করেছেন, তা অবোধদেরকে প্রদান করো না; এবং তা হতে তাদেরকে ভক্ষণ করাতে থাক, পরিধান করাতে থাক এবং তাদের সাথে সজ্ঞাবে কথা বল।

৬। আর পিতৃহীনগণ বিবাহযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও; অতঃপর যদি তাদের মধ্যে বিবেকবুদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়, তবে তাদের ধন-সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ কর; এবং তারা বয়োঃপ্রাঞ্চ হবে বলে ওটা অপব্যয় ও সত্ত্বরতা সহকারে আস্ত্রসাং করো না; এবং যে ব্যক্তি অভাব মুক্ত হবে সে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে, আর যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হবে সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে, অনন্তর যখন তাদের সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ করতে চাও তখন তাদের জন্যে সাক্ষী রেখো এবং আল্লাহ হিসেব গ্রহণে যথেষ্ট।

٥- وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ  
أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ  
قِيمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا  
مَعْرُوفًا ۝

٦- وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا  
بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْسَتُمْ  
مِنْهُمْ رِشَادًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا  
وَبِدَارًا أَن يَكْبِرُوا وَمَنْ كَانَ  
غَنِيًّا فَلِيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ  
فَقِيرًا فَلِيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ  
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ  
حَسِيبًا ۝

মহান আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন নির্বোধদেরকে তাদের মাল প্রদান না করে। মাল-ধন ব্যবসা ইত্যাদিতে খাটিয়ে আল্লাহ তা'আলা ওর দ্বারা মানুষের জীবন যাপনের উপায় করে দিয়েছেন, এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, অবোধদেরকে তাদের মাল খরচ করা হতে বিরত রাখা উচিত। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে, পাগল, নির্বোধ এবং বেদীন অন্যায়ভাবে স্বীয় মাল-ধন নিঃশেষে ব্যয় করে ফেলছে, তাদের এভাবে মাল খরচ করা হতে বাধা দিতে হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির ক্ষক্ষে বহু ঝণের ভার চেপে গেছে, যে ঝণ সে তার সমস্ত মাল দিয়েও পরিশোধ করতে পারে না, যদি মহাজন সে সময়ের শাসনকর্তার নিকট আবেদন করে তবে শাসনকর্তা তার সমস্ত মাল হস্তগত করবেন এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে বেদখল করে দেবেন। হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে *سُفَهَاءُ* শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে সন্তান-সন্তুতি ও স্ত্রীগণ, তদ্দুপ হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হ্যরত হাকাম ইবনে উয়াইনা (রাঃ), হ্যরত হাসান বসরী (রাঃ) এবং হ্যরত যহুহাক (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে যে, *سُفَهَاءُ* শব্দের ভাবার্থ স্ত্রী ও ছেলেমেয়েই বটে।

হ্যরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে পিতৃহীনেরা। মুজাহিদ (রাঃ), ইকরামা (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে স্ত্রীগণ। সুনান-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘স্বীয় স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করে এরা ছাড়া নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকেরা বুদ্ধিহীনা।’ তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যেও এ হাদীসটি দীর্ঘতার সাথে বর্ণিত আছে। হ্যরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে দুষ্ট দাস।

এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন-‘তাদেরকেও খাওয়াও, পরাও এবং তাদের সাথে উন্নত ব্যবহার কর।’ হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, ‘আল্লাহ পাক তোমার যে মালকে তোমার জীবন ধারণের উপায় করে দিয়েছেন তা তুমি তোমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে প্রদান করতঃ তাদের হাতের দিকে চেয়ে থেকো না। বরং তোমার মাল তুমি তোমার দখলেই রেখে ওকে ঠিক রাখ এবং তুমি স্বহস্তে তাদের খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা কর।’ হ্যরত আবু মূসা (রাঃ) বলেনঃ ‘তিনি প্রকারের লোক রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে কিন্তু তাদের প্রার্থনা (আল্লাহ পাক) কবৃল করেন না। প্রথম ঐ ব্যক্তি যার স্ত্রী দুষ্টা ও দুশ্চরিত্বা সন্দেশে তাকে তালাক প্রদান করে না। দ্বিতীয়

ঐ ব্যক্তি যে তার মাল নির্বোধদেরকে প্রদান করে থাকে, অথচ আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন-‘তোমরা তোমাদের মাল নির্বোধদেরকে প্রদান করো না।’ তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যার কারও উপরে খণ্ড রয়েছে এবং সে ঐ খণ্ডের উপর কাউকে সাক্ষী রাখেনি।’

এরপরে বলা হচ্ছে-‘তাদেরকে ভাল কথা বল’। অর্থাৎ তাদের সাথে উত্তম ও নম্রভাবে ব্যবহার কর। এ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, অভাবগ্রস্তদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা উচিত। যার নিজ হাতে খরচ করার অধিকার নেই তার খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা করা ও খবরা-খবর লওয়া এবং নম্র ব্যবহার করা উচিত।

অতঃপর অল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘তোমরা পিতৃহীনদের দেখাশুনা কর যে পর্যন্ত না তারা যৌবনে পদার্পণ করে।’ এখানে-**بَلْ** শব্দ দ্বারা প্রাণ বয়স বুঝনো হয়েছে এবং প্রাণ বয়সের পরিচয় তখনই পাওয়া যায় যখন এক বিশেষ প্রকারের স্বপ্ন দেখা যায় এবং এক বিশেষ প্রকারের পানি তীব্র বেগে বহিগত হয়।

**﴿** হ্যরত আলী (রাঃ) বলেনঃ ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উক্তিটি ভালভাবেই স্মরণ আছেঃ ‘স্বপ্নদোষের পর পিতৃহীনতাও নেই এবং সারা দিনরাত নীরব থাকাও নেই।’ অন্য হাদীসে রয়েছেঃ ‘তিনি প্রকারের লোক হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। (১) শিশু, যে পর্যন্ত না সে প্রাণ বয়ক্ষ হয়। (২) যুমন্ত ব্যক্তি, যে পর্যন্ত না সে জেগে উঠে। (৩) পাগল ব্যক্তি, যে পর্যন্ত না তার জ্ঞান ফিরে আসে।’ সুতরাং প্রাণ বয়সের নির্দর্শন একত্বে হচ্ছে এই।

দ্বিতীয় নির্দর্শন কারও কারও মতে এই যে, যখন তার বয়স পনেরো বছর হবে। এর দলীল হচ্ছে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি, যাতে তিনি বলেনঃ ‘উহদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে সঙ্গে নেননি। তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। খন্দকের যুদ্ধের সময় আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হায়ির করা হলে তিনি সম্মতন হন। সে সময় আমার বয়স ছিল পনেরো বছর।’ হ্যরত উমার ইবনে আবদুল আয়ীফ (রঃ)-এর নিকট এ হাদীসটি পৌছলে তিনি বলেনঃ ‘প্রাণ ও অপ্রাণ বয়সের সীমা এটাই।’

প্রাণ বয়সের তৃতীয় নির্দশন হচ্ছে নাভীর নীচে চুল গজান। এ ব্যাপারে আলেমদের তিনটি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তি এই যে, এটা প্রাণ বয়সের চিহ্ন! দ্বিতীয় উক্তি এই যে, মুসলমানদের মধ্যে এটা প্রাণ বয়সের চিহ্ন নয় এবং তৃতীয় উক্তি এই যে, মুসলমানদের মধ্যে এটা প্রাণ বয়সের চিহ্ন নয় কিন্তু যিন্দীদের মধ্যে এটা প্রাণ বয়সের চিহ্ন। কেননা, এটা সম্ভাবনা রয়েছে যে, কোন ঔষধের কারণে এ চুল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে এবং যুবক হওয়া মাত্রাই যিন্দীদের উপর জিয়িয়া কর ধার্য করা হয়। তাহলে তারা ওটা ব্যবহার করতে লাগলো কেন? কিন্তু সঠিক কথা এই যে, সকলের পক্ষেই এটা প্রাণ বয়সের চিহ্ন। কেননা, প্রথমতঃ এটা প্রকৃতিগত ব্যাপার। প্রতিষেধকের সম্ভাবনা খুব দূরের সম্ভাবনা। প্রকৃত কথা এই যে, এ চুল স্বীয় সময়মতই বের হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে—মুসনাদ-ই-আহমাদের হাদীসটি, যাতে হ্যরত আতিয়া যারায়ীর (রাঃ) বর্ণনা রয়েছে, তিনি বলেনঃ ‘বানু কুরাইয়ার যুদ্ধের পর আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে হাফির „করা হয়। তিনি নির্দেশ দেনঃ ‘এক ব্যক্তি দেখুক যে, বন্দীদের মধ্যে যাদের এ চুল বের হয়েছে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং যাদের বের হয়নি তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে।’ সে সময় আমার এ চুল বের হয়নি বলে আমাকে ছেড়ে দেয়া হয়।’ সুনান-ই-আরবাআর মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে এবং ইমাম তিরিমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

হ্যরত সা’দ (রাঃ)-এর সিদ্ধান্তের উপর বানু কুরাইয়া গোত্র সম্মত হয়ে যুদ্ধ হতে বিরত হয়েছিল। অতঃপর হ্যরত সা’দ (রাঃ) এ ফায়সালা করেন যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হোক এবং শিশুদেরকে বন্দী করা হোক। ‘গারায়েবী আবি উবায়েদের’ মধ্যে রয়েছে যে, একটি ছেলে একটি যুবতী মেয়ের সম্পর্কে বলে, ‘আমি তার সাথে ব্যভিচার করেছি।’ প্রকৃতপক্ষে এটা অপবাদ ছিল। হ্যরত উমার (রাঃ) তাকে অপবাদের হন্দ গালাবার ইচ্ছে করেন। কিন্তু বলেনঃ ‘তোমরা দেখ, যদি তার নাভীর নীচে চুল গজিয়ে থাকে তবে তার উপরে হন্দ লাগাবে নচেৎ নয়।’ যখন দেখা যায় যে, তার সেই চুল গজায়নি তখন তার হন্দ লাগানা বন্ধ রাখা হয়।

অতঃপর আল্লাহ বলেন—‘যখন তোমরা দেখ যে, তাদের ধর্ম গ্রহণের সামর্থ্য এবং মাল রক্ষার যোগ্যতা হয়েছে তখন তাদের অভিভাবকদের কর্তব্য হবে তাদের মাল তাদেরকে সমর্পণ করা। প্রয়োজন ছাড়াই শুধুমাত্র এই ভয়ে যে,

তারা বড় হওয়ামাত্রই তাদের মাল নিয়ে নেবে, কাজেই তার পূর্বেই তাদের মাল শেষ করে দেবে, খবরদার! এ কাজ করো না। যে ধনী হবে, নিজেরই খাওয়া পরার জিনিস যথেষ্ট থাকবে, তার তো কর্তব্য হবে তাদের মাল হতে কিছুই গ্রহণ না করা। মৃত জন্ম এবং প্রবাহিত রক্তের ন্যায় এ মাল তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম। হ্যাঁ, তবে যদি অভিভাবক দরিদ্র হয় তাহলে অবশ্যই তাকে লালন-পালন করার পারিশ্রমিক হিসেবে সময়ের প্রয়োজন ও দেশ প্রথা অনুযায়ী তার মাল হতে গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ। সে নিজের প্রয়োজন দেখবে এবং পরিশ্রমও দেখবে। যদি প্রয়োজন পরিশ্রম অপেক্ষা কম হয় তবে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করবে। আর যদি পরিশ্রম প্রয়োজন অপেক্ষা কম হয় তবে পরিশ্রমের বিনিময় গ্রহণ করবে।

অতঃপর এরূপ অভিভাবক যদি ধনী হয়ে যায় তবে তার সেই ভক্ষণকৃত ও গ্রহণকৃত মাল ফিরিয়ে দিতে হবে কি না সেই ব্যাপার দু'টি উক্তি রয়েছে। একটি উক্তি তো এই যে, ফিরিয়ে দিতে হবে না। কেননা, সে নিজের পরিশ্রমের বিনিময়ে তা গ্রহণ করেছে। ইমাম শাফিই (রঃ)-এর সহচরদের মতে এটাই সঠিক। কেননা, আয়াতে বিনিময় ছাড়া তাদের মাল হতে খাওয়াকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি বলেঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার নিকট কোন মাল নেই। একজন পিতৃহীনকে আমি লালন-পালন করছি। আমি তার আহার্যের মধ্য হতে কিছু খেতে পারি কি?’ তিনি বলেনঃ ‘হ্যাঁ, তুমি পিতৃহীনের মাল নিজের কাজে লাগাতে পার, যদি প্রয়োজনের বেশী গ্রহণ না কর, জমা না কর এবং এটাও না কর যে, নিজের মাল বাঁচিয়ে রেখে তার মাল খেয়ে ফেল।’ মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে এ রকমই বর্ণনা রয়েছে।

ইবনে হিবান (রঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘আমি পিতৃহীনকে ভদ্রতা শিখাবার জন্যে প্রয়োজন বশতঃ কোন জিনিস দিয়ে মারবো?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘যা দিয়ে তুমি তোমার শিশুকে শাসন-গর্জন করে থাক। নিজের মাল বাঁচিয়ে তার মাল খরচ করো না, তার সম্পদ দ্বারা ধনবান হওয়ার চেষ্টা করো না।’

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করে, ‘আমার নিজের উট রয়েছে এবং আমার নিকট যে পিতৃহীন প্রতিপালিত হচ্ছে তারও উট রয়েছে। আমি আমার উষ্ট্রগুলো দরিদ্রদেরকে দুধ পান করার জন্যে উপটোকন স্বরূপ দিয়ে থাকি। ঐ ইয়াতিমদের উষ্ট্রগুলোর দুধ পান করা কি আমার জন্যে বৈধ হবে?’

তখন হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেনঃ ‘ঐ ইয়ামতিমদের হারান উটগুলো যদি খুঁজে আন, ওগুলোর খড় পানির ব্যবস্থার কর, ওদের হাউজগুলো ঠিক করে থাক, ঐগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ কর তবে অবশ্যই তুমি ওগুলোর দুধ দ্বারা উপকার লাভ করতে পারবে। তবে এভাবে যে, যেন ঐ শিশুদের কোন ক্ষতি না হয় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্তও নেবে না।’ (মুআত্তা-ই-ইমাম মালিক) হ্যরত আতা’ ইবনে আবু রিবাহ (রঃ), হ্যরত ইকরামা (রঃ), হ্যরত ইবরাহীম নাখুদ (রঃ), হ্যরত আতিয়া আওফী (রঃ) এবং হ্যরত হাসান বসরী (রঃ)-এরও এটাই উক্তি।

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, অস্বচ্ছলতা দূর হয়ে যাওয়ার পর ইয়াতিমের মাল হতে ভক্ষিত ও গৃহীত জিনিস তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কেননা, মূলে তো তা নিষিদ্ধ। কোন কারণ বশতঃ বৈধ হয়েছিল মাত্র। ঐ কারণ যখন দূর হয়ে গেল তখন তার বিনিময় দিতে হবে। যেমন কেউ নিঃসহায় ও নিরূপায় হয়ে অপরের মাল ভক্ষণ করলো। অতঃপর প্রয়োজন মিটে যাবার পর যদি সুসময় ফিরে আসে তবে সেই ভক্ষিত মাল তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় দলীল এই যে, হ্যরত উমার (রাঃ) যখন খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হন তখন ঘোষণা করেনঃ ‘এখানে আমার জীবনোপায় পিতৃহীনের অভিভাবকের জীবনোপায়ের মতই। আমার প্রয়োজন না হলে বায়তুল মাল হতে আমি কিছুই গ্রহণ করবো না। আর যদি অভাব হয়ে পড়ে তবে ঝণস্বরূপ গ্রহণ করবো। যখন স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে তখন ফিরিয়ে দেবো।’ (ইবনে আবিদ দুনিয়া) এ হাদীসটি হ্যরত সাইদ ইবনে মানসুরও (রঃ) বর্ণনা করেছেন, এর ইসনাদ সহীহ। বায়হাকীর হাদীসের মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে। হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের বাক্যটির তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, ঝণরূপে ভক্ষণ করবে। অন্যান্য মুফাসিসিরগণ হতেও এটা বর্ণিত আছে।

হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেনঃ ‘সঙ্গতভাবে খাবার ভাবার্থ এই যে, তিন অঙ্গুলী দ্বারা খাবে। অন্য বর্ণনায় হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, সে নিজেরই মালকে শুধু নিজের প্রয়োজন পুরো হবার উপযাগীরূপেই খরচ করবে যাতে তার ইয়াতিমের মাল খরচ করার প্রয়োজনই না হয়। হ্যরত আমের শা’বী (রঃ) বলেনঃ ‘যদি এমনই নিরূপায় অবস্থা হয় যাতে মৃতদেহ ভক্ষণ হালাল হয়ে থাকে তবে অবশ্যই খাবে (ইয়াতিমের মাল) কিন্তু পরে তা

পরিশোধ করতে হবে।' হ্যরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী (রঃ) এবং হ্যরত রাবীআ' (রঃ) হতে এর তাফসীর নিম্নরূপ বর্ণিত আছে-'যদি ইয়াতিম দরিদ্র হয় তবে তার অভিভাবক তাকে তার প্রয়োজন অনুপাতে প্রদান করবে এবং তার অভিভাবক কিছুই পাবে না।' রচনায় কিন্তু এ অর্থ ঠিকভাবে বসে না। কিন্তু পূর্বে রয়েছে যে, যে ধনী হবে সে বিরত থাকবে। অর্থাৎ যে অভিভাবক ধনবান হবে সে ইয়াতিমের মাল গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে। তাহলে এখানেও এ ভাবার্থই হবে যে, 'যে অভিভাবক দরিদ্র হবে' এ অর্থ নয়। অন্য আয়াতে রয়েছে-

وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَامَةِ إِلَّا بِالْتِيمِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشْدَهُ

অর্থাৎ 'তোমরা পিতৃহীনের মালের নিকটও যেওনা, কিন্তু শুন্দরণের নিমিত্ত যেতে পার, অতঃপর যদি তোমাদের প্রয়োজন হয় তবে প্রয়োজনানুপাতে সংগতভাবে ওর মধ্য হতে খাও।' (১৭: ৩৪)

এরপর অভিভাবকদেরকে বলা হচ্ছে-যখন তারা প্রাণ বয়সে পৌছে যাবে এবং তোমরা তাদের মধ্যে বিবেচনা জ্ঞান লক্ষ্য করবে তখন সাক্ষী রেখে তাদের মাল তাদেরকে সমর্পণ করবে, যেন অঙ্গীকার করার সুযোগই না আসে। প্রকৃতপক্ষে সত্য সাক্ষী, পূর্ণ রক্ষক এবং সূক্ষ্ম হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহ তা'আলাই রয়েছেন, ইয়াতিমের মালের ব্যাপারে অভিভাবকের নিয়ত কি ছিল তা তিনি খুব ভালই জানেন।

অভিভাবক নিজেই হয়তো বা ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করেছে, ধ্বংস করেছে এবং মিথ্যা হিসেব লিখে রেখেছে, কিংবা হয়তো সৎ নিয়তের অধিকারী অভিভাবক ইয়াতিমের মাল পুরোপুরি রক্ষা করেছে এবং সঠিক হিসেব রেখেছে, এসব সংবাদ সেই সবজাত্তা এবং মহান রক্ষক আল্লাহ তা'আলার অবশ্যই জানা রয়েছে।

সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আবু যার (রাঃ)-কে বলেনঃ 'হে আবু যার! আমি তোমাকে দুর্বল ও শক্তিহীন দেখছি এবং আমি নিজের জন্যে যা পছন্দ করি তোমার জন্যে তা পছন্দ করি। সাবধান! কখনই তুমি দু' ব্যক্তিরও নেতা বা আমীর নির্বাচিত হয়ো না এবং কখনও কোন ইয়াতিমের মালের অভিভাবক নিযুক্ত হয়ো না।'

সূরাঃ নিসা ৮

৭। পুরুষদের জন্যে পিতামাতা ও  
আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত  
বিষয়ে অংশ রয়েছে এবং  
নারীদের জন্যেও পিতামাতা ও  
আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত  
বিষয়ে অংশ রয়েছে— অল্প বা  
অধিক নির্দিষ্ট পরিমাণ।

৮। আর যখন তা বন্টনের সময়ে  
স্বজনগণ, পিতৃহীনগণ এবং  
দরিদ্রগণ উপস্থিত হয়, তখন  
তা হতে তাদেরকেও জীবিকা  
দান কর এবং তাদের সাথে  
সঙ্গাবে কথা বল।

৯। আর যারা নিজেদের পশ্চাতে  
নিজেদের অসমর্থ  
সন্তানদেরকে ছেড়ে যাবে  
তাদের উপর যে ভীতি  
আসবে, তজ্জন্যে তাদের  
শংকিত হওয়া উচিত; সুতরাং  
তাদের আল্লাহকে ভয় করা ও  
সন্তাবে কথা বলা আবশ্যিক।

୧୦। ଯାରା ଅନ୍ୟାଯଭାବେ  
ପିତୃହୀନଦେର ଧନ-ସମ୍ପତ୍ତି ଘାସ  
କରେ, ନିକଟସ୍ଥ ତାରା ସ୍ଵିଯ  
ଉଦରେ ଅଗ୍ନି ବ୍ୟତୀତ କିଛୁଇ  
ଯୁଗୀକ ନିଭାତ) କ୍ଷୁଣ୍ଣ କ୍ଷକ୍ଷାଳ ହୃଦୟ  
ଭକ୍ଷଣ କରେ ନା ଏବଂ ସତ୍ତରରୁ  
ଶକ୍ତାଦ ଚାମାଳ ପ୍ରାଣିତ ଲକ୍ଷାଣ ନା ହୀନ  
ତାରା ଅଗ୍ନି ଶିଖ୍ୟାୟ ଉପନୀତ  
ପ୍ରାଣର ଦର୍ଶକ ନାମ ହୃଦୟ-(ଶାର) ଚାଲ  
ହୁବେ ।

٧- لِلْرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ  
كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

٨- وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا  
الْقُرْبَى وَالْيَتَمَّى وَالْمَسِكِينُ  
فَأَرْزَقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ  
قُولاً شَدِيدًا مَعْرُوفًا

٩- وَلَيَخْسَدُ الَّذِينَ لَوْتَرُكُوا مِنْ  
 خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا  
 عَلَيْهِمْ فَلَيَتَقَوَّلُوا اللَّهُ وَ  
 لِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ○

۱- إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
الْيَتَامَىٰ لَفْلَمَا إِنْتَمَا يَا كَلُونَ  
فِي بَطْوَنِهِمْ شَرِيراً وَسَيِّئَصَلُونَ

আরবের মুশরিকরদের প্রথা ছিল এই যে, কেউ মারা গেলে তার বড় সন্তানেরা তার সমস্ত মাল পেয়ে যেতো। তার ছোট সন্তানেরা ও স্ত্রীরা সম্পূর্ণরূপে বণ্ণিত হয়ে যেতো। ইসলাম এ নির্দেশ জারী করে সবাই জন্যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। বলা হয় যে, উত্তরাধিকারী সবাই হবে, প্রকৃত আত্মায়তাই হোক বা বিবাহ বন্ধনের কারণেই হোক বা আয়াদী সম্পর্কীয় কারণেই হোক না কেন, অংশ সবাই পাবে- অংশ কমই হোক আর বেশীই হোক।

হ্যরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত উম্মে কাজ্জাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হায়ির হয়ে আরয় করেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার দুটি ছেলে আছে। তাদের পিতা মারা গেছে এবং তাদের নিকট কিছুই নেই।’ এ হাদীসটি অন্য শব্দে উত্তরাধিকারের অন্য দু’টি আয়াতের তাফসীরেও ইনশাআল্লাহ অতিসত্ত্বরই আসবে। দ্বিতীয় আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে-‘যখন কোন মৃত ব্যক্তির মীরাস বন্টন হতে থাকবে, সে সময় যদি তার কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ও এসে পড়ে যাব কোন অংশ নেই এবং ইয়াতিম ও মিসকীনেরাও এসে যায় তবে তাদেরকেও কিছু কিছু প্রদান কর।’

ইসলামের প্রাথমিক যুগে তো এটা ওয়াজিব ছিল এবং কারও কারও মতে এটা মুসতাহাব ছিল, আর এখনও এ হকুম বাকী আছে কি না সে বিষয়ে দু’টি উক্তি রয়েছে। হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ)-এর মতে এ হকুম এখনও বাকী আছে। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ), হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হ্যরত আবু মুসা (রাঃ), হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ), হ্যরত আবুল আলিয়া (রঃ), হ্যরত শা’বী (রঃ), হ্যরত হাসান বসরী (রঃ), হ্যরত ইবনে সীরীন (রঃ), হ্যরত সাঙ্গৈদ ইবনে যুবাইর (রঃ), হ্যরত মাকহুল (রঃ), হ্যরত ইবরাহীম নাথঙ্গৈ (রঃ), হ্যরত আতা’ ইবনে আবি রিবাহ (রঃ), হ্যরত যুহরী (রঃ) এবং হ্যরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআম্বারও (রঃ) একথাই বলেছেন। এমনকি হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) ছাড়া এসব পণ্ডিত এ হকুমকে ওয়াজিব বলেছেন।

হ্যরত আবু উবাইদাহ (রাঃ) এক অসিয়তের অভিভাবকত্ব করেন। তিনি একটি ছাগী যবেহ করেন এবং ঐ তিন প্রকারের লোককে ডেকে ভোজন করিয়ে দেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ ‘এ আয়াতটি না থাকলে এটাও আমার মালই ছিল।’ হ্যরত উরওয়া (রাঃ) হ্যরত মুসআব (রাঃ)-এর মাল বন্টনের সময়েও এটা প্রদান করেন। হ্যরত যুহরীরও (রঃ) উক্তি এই যে, এ আয়াতটি

‘মুহকাম’- ‘মানসুখ’ নয়। একটি বর্ণনায় হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা অসিয়তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ)-এর ইন্তিকালের পর যখন তার ছেলে হ্যরত আবদুল্লাহ তাঁর পিতার মীরাস বন্টন করেন তখন তিনি পরিবারের সকল মিসকীন ও আজীয়-স্বজনকে প্রদান করেন এবং এ আয়াতটিই পাঠ করেন। আর সে সময় উম্মুল মুমিনীন হ্যরত আয়েশাও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) এটা জানতে পেরে বলেনঃ ‘তিনি ঠিক করেননি’। এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, এটা তখনই কার্যকরী হবে যখন মৃত ব্যক্তি অসিয়ত করে যাবে।’ (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)

কোন কোন মনীষীর উক্তি এই যে, এ আয়াতটি রহিতই হয়ে গেছে। যেমন হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি রহিত এবং একে রহিতকারী হচ্ছে بِوْصِيْكُمْ اللّهُ-এ আয়াতটি। অংশ নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে এ নির্দেশ ছিল। অতঃপর হকদারকে যখন আল্লাহ পাক হক পৌছিয়ে দেন তখন সাদকা শুধু ওটাই থাকে যা মৃত ব্যক্তি বলে যায়। হ্যরত সাইদ ইবনে মুসাইয়াবও (রঃ) এটাই বলেন যে, যদি ঐ লোকদের জন্যে অসিয়ত থাকে তবে সেটা অন্য কথা নচেৎ এ আয়াতটি মানসুখই বটে।

জমহুর ও ইমাম চতুষ্টয়ের এটাই মাযহাব। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এখানে এক বিশ্বয়কর উক্তি করেছেন। তাঁর দীর্ঘ ও কয়েকবারের লিখার সার কথা হচ্ছে নিম্নরূপঃ ‘অসিয়তের মাল বন্টনের সময় মৃত ব্যক্তির আজীয়-স্বজন এসে গেলে তাদেরকেও দাও এবং তথায় আগত মিসকীনদের সঙ্গে ন্যূনতার সাথে কথা বল ও উন্নত প্রদান কর’। কিন্তু এটা বিবেচ্য বিষয়।

হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এখানে বন্টনের অর্থ হচ্ছে মীরাসের বন্টন। সুতরাং এ উক্তিটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর উক্তির বিপরীত। এ আয়াতের সঠিক ভাবার্থ হচ্ছেঃ ‘মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টনের সময় যদি এসব দরিদ্র লোক উপস্থিত হয়ে যায় এবং তোমরা নিজ নিজ অংশ পৃথক করে ফেল আর এ বেচারারা তোমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে তখন তাদেরকে শূন্য হস্তে ফিরিয়ে দিও না। তাদেরকে তথা হতে নিরাশ করে শূন্য হস্তে ফিরিয়ে দেয়াকে পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ পছন্দ করেন না। সুতরাং আল্লাহর পথে সাদকা হিসেবে তাদেরকে কিছু প্রদান কর যেন তারা খুশী হয়ে যায়।’

যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ পাকের ঘোষণা রয়েছেঃ ‘তোমরা তাঁর ফল হতে থাও যখন তিনি ফল দান করেন এবং শস্য কর্তনের দিন তাঁর হক আদায় কর।’ ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ও দরিদ্র লোকদের ভয়ে যারা তাদেরকে না জানিয়ে গোপনে ক্ষেত্রের ফসল কেটে নেয় এবং গাছের ফল নামিয়ে থাকে তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা নিন্দে করেছেন। যেমন সূরা-ই-নূন-এ রয়েছে যে, এক বাগানের মালিকের মৃত্যুর পর তার ছেলেরা দরিদ্র ও মিসকীনদেরকে বঞ্চিত করার নিয়তে একদা রাত্রিকালে অতি সন্তর্পণে বাগানের ফল নামিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বাড়ী হতে রওনা হয়। তাদের পৌছার পূর্বেই তথায় আল্লাহ তা‘আলার শাস্তি নেমে আসে এবং সমস্ত বাগান পুড়ে ভেঞ্চ হয়ে যায়। অন্যের হক নষ্টকারীদের পরিণতি এরূপই হয়ে থাকে। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, যে মালে সাদকা মিলিত হয় অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বীয় মালের যাকাত প্রদান করে না, তার মাল সে কারণে ধ্বংস হয়ে যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন-‘যারা নিজেদের পশ্চাতে নিজেদের অসমর্থ সন্তানদেরকে ছেড়ে যাবে তাদের উপর যে ভীতি আসবে তজ্জন্যে তাদের শংকিত হওয়া উচিত।’ অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে যাচ্ছে এবং সেই অসিয়তে তার উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি হচ্ছে এমতাবস্থায় যে তা শ্রবণ করছে তার আল্লাহকে ভয় করতঃ ঐ অসিয়তকারীকে সঠিক পথ-প্রদর্শন করা উচিত এবং তার কর্তব্য এই যে, সে যেন ঐ অসিয়তকারীর মঙ্গল কামনা করে যেমন সে নিজের উত্তরাধিকারীদের মঙ্গল কামনা করে থাকে, যখন তাদের ক্ষতির ও ধ্বংসের আশংকা থাকে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত সা‘দ ইবনে আবি ওকাস (রাঃ)-এর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁকে দেখতে যান। সে সময় হ্যরত সা‘দ (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার বহু মাল রয়েছে এবং আমার একটি মাত্র কন্যা আছে। আমি আমার দুই তৃতীয়াংশ মাল আল্লাহর পথে দান করে দেই। আপনি আমাকে এর অনুমতি দিচ্ছেন কি?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘না।’ তিনি বলেনঃ ‘আচ্ছা, অর্ধেকের অনুমতি আছে কি?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘না।’ তিনি বলেনঃ ‘তাহলে এক তৃতীয়াংশের অনুমতি দিন।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘আচ্ছা, ঠিক আছে, কিন্তু এক তৃতীয়াংশও বেশী। তুমি যদি তোমার পিছনে তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে সম্পদশালী রূপে ছেড়ে যাও তবে এটা ওটা হতে উত্তম যে, তুমি তাদেরকে

দরিদ্ররপে ছেড়ে যাবে এবং তারা অন্যের কাছে হাত পেতে বেড়াবে।' হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মানুষ যদি এক তৃতীয়াংশেরও কম অর্থাৎ এক চতুর্থাংশের অসিয়ত করে তবে ওটাই উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক তৃতীয়াংশকেও বেশী বলেছেন।

ধর্মশাস্ত্রবিদগণ বলেন যে, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী যদি ধনী হয় তবে তো এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত করা মুসতাহাব। আর যদি উত্তরাধিকারী দরিদ্র হয় তবে তার চেয়ে কমের অসিয়ত করাই মুসতাহাব। এ আয়াতের দ্বিতীয় ভাবার্থ নিম্নরূপও বর্ণনা করা হয়েছে: 'তোমরা ইয়াতিমদের প্রতি একপই খেয়াল রাখ যেমন তুমি তোমার মৃত্যুর পর তোমার ছেট সন্তানদের প্রতি অন্য লোকদের খেয়াল রাখার কামনা কর। তুমি যেমন চাও না যে, তাদের মাল অন্যেরা অন্যায়ভাবে খেয়ে নিক এবং তারা বয়ঃপ্রাণ হয়ে দরিদ্র থেকে যাক, তদুপ তুমি অন্যদের সন্তানগণের মাল খেয়ো না।' এ ভাবার্থও খুব উত্তম বটে। এ কারণেই এর পরেই পিতৃহীনদের মাল অন্যায়ভাবে উক্ষণকারীদের শাস্তির কথা বলা হয় যে, এ লোকগুলো নিজেদের পেটে অগ্নি ভক্ষণ করছে এবং তারা জাহানামে প্রবেশ করবে।

প্রস্তুতীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'সাতটি এমন পাপ হতে তোমরা বেঁচে থাকো যা ধর্মের কারণ হয়ে থাকে।' তিনি জিজ্ঞাসিত হনঃ পাপগুলো কি কি? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ (১) 'আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন, (২) যাদু, (৩) অন্যায়ভাবে হত্যা, (৪) সুদ ভক্ষণ, (৫) পিতৃহীনদের মাল ভক্ষণ, (৬) জিহাদ হতে মুখ ফিরানো এবং (৭) সতী সাধ্বী সরলা মুসলিম নারীর প্রতি অপবাদ দেয়া।'

সুনান-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে রয়েছে যে, সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মিরাজের রাত্রের ঘটনা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ 'আমি বহু লোককে দেখেছি যে, তাদের ওষ্ঠ নীচে ঝুলতে রয়েছে এবং ফেরেশ্তাগণ তাদেরকে হেঁচড়িয়ে টেনে তাদের মুখ খুলে দিচ্ছেন। অতঃপর জাহানামের গরমপাথর তাদের মুখের ভেতরে চুকিয়ে দিচ্ছেন যা তাদের মুখের ভেতর দিয়ে ডুকে পিছনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং তারা ভীষণভাবে চীৎকার করছে। আমি হ্যরত জিবরাইল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করিঃ 'এরা কারা?' তিনি বলেনঃ 'এরা ইয়াতিমদের মাল ভক্ষণকারী যারা তাদের পেটের ভেতর আগুন ভরতে রয়েছে। অতিসত্ত্বরই তারা জাহানামে প্রবেশ করবে।'

হয়েরত সুন্দী (রঃ) বলেনঃ ‘পিতৃহীনদের মাল ভক্ষণকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার কবর হতে এমনভাবে উঠবে যে, তার মুখ দিয়ে, চক্ষু দিয়ে, নাক দিয়ে এবং কান দিয়ে অগ্নিশিখা বের হতে থাকবে! প্রত্যেক ব্যক্তি দেখেই চিনে নেবে যে, সে কোন পিতৃহীনের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে।’ তাফসীর-ই-ইবনে মিরন্দুওয়াই-এর একটি মারফু’ হাদীসেও এ বিষয়েরই কাছাকাছি বর্ণিত আছে। অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করছি যে, তোমরা ঐ দু’ দুর্বলের মাল পৌছিয়ে দাও, স্ত্রীদের মাল এবং পিতৃহীনদের মাল। তোমরা তাদের মাল হতে বেঁচে থাকো।”

সূরা-ই-বাকারায় এটা বর্ণিত হয়েছে যে, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন যাঁদের কাছে পিতৃহীনেরা লালিত পালিত হচ্ছিল তাঁরা তাদের আহার্য এবং পানীয় পর্যন্ত পৃথক করে দেন। তখন অবস্থা প্রায় এই দাঁড়ালো যে, যদি এ পিতৃহীনদের খানা পানির কোন কিছু বেঁচে যেতো তখন হয় তারা নিজেরাই এই বাসী জিনিস খেয়ে নিতো না হয় তা পচে নষ্ট হয়ে যেতো। বাড়ীর লোকেরা কেউ তাতে হাতও লাগাতো না। এটা উভয় দিক দিয়েই অপছন্দনীয় হলো। নবী (সঃ)-এর সামনেও এটা আলোচিত হলো। তখনঃ ﴿وَيَسْتَلُونَكُمْ عَنِ الْيَتَمَّى﴾ (১: ১১) (২৪: ২২০)-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। এর ভাবার্থ এই যে, যে কাজে তোমরা পিতৃহীনদের মঙ্গল বুঝতে পারো তাই কর। ফলে এর পরে খানা-পিনা এক সাথেই হতে থাকে।

১১। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের  
সম্বন্ধে তোমাদেরকে নির্দেশ  
দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের জন্যে  
দু’ কন্যার অংশের তুল্য; আর  
যদি শুধু কন্যাগণ দু’ জনের  
অধিক হয়, তবে তারা মৃত  
ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে  
দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে। আর  
যদি একটি মাত্র কন্যা হয়,  
তবে সে অর্ধেকাংশ প্রাপ্ত হবে  
এবং যদি মৃত ব্যক্তির কোন

١١- بُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي  
أَوَّلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ  
الْاَنْثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
اَشْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَّا مَا تَرَكَ  
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا  
الْنِصْفُ وَلَا يُبَوِّهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ

সন্তান থাকে, তবে তার পিতা-মাতার জন্যে অর্ধাং উভয়ের প্রত্যেকেরই জন্যে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে এক ষষ্ঠাংশ রয়েছে আর যদি তার কোন সন্তান না থাকে এবং শুধু পিতা-মাতাই তার উত্তরাধিকারী হয়, তবে তার মাতার জন্যে হবে এক তৃতীয়াংশ এবং যদি তার আতা থাকে, তবে সে যা নির্দেশ করে গেছে-সেই নির্দেশ ও খণ্ড অন্তে তার জননীর জন্যে এক ষষ্ঠাংশ, তোমাদের পিতা ও তোমাদের পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের অধিকতর উপরকারী তা তোমরা অবগত নও, এটাই আল্লাহর নির্দেশ; নিচয়ই আল্লাহ মহাঙ্গানী বিজ্ঞানময়।

مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ  
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ  
وَلَدٌ وَوْرِثَهُ أَبُوهُ فِلَامِيمُ الْثَّلِثَةِ  
فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخْوَةٌ فِلَامِيمُ  
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
بِهَا أَوْدِينَ أَبَاؤُكُمْ  
وَابْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمْ  
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فِرِيضَةٌ مِنْ  
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا  
حَكِيمًا

এ আয়াতটি, এর পরবর্তী আয়াতটি এবং সূরার শেষের আয়াতটি ইলমে ফারায়েয়ের আয়াত। এ পূর্ণ ইলমের দলীলরূপে আয়াতগুলোকে এবং হাদীসগুলোকে দলীলরূপে গ্রহণ করা হয়েছে যে, হাদীসগুলো যেন এ আয়াতগুলোরই তাফসীর ও ব্যাখ্যা। এখানে আমরা এ আয়াতটিরই তাফসীর লিখছি। বাকী মীরাসের যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা রয়েছে এবং ওতে যে দলীলসমূহের অনুধাবনে কিছু মতভেদ আছে তা বর্ণনা করার উপর্যুক্ত স্থান হচ্ছে আহকামের পুস্তকসমূহ-তাফসীর নয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাহায্য করুন! ফারায়েয বিদ্যা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানের ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। এ আয়াতসমূহে যে নির্ধারিত অংশসমূহের বর্ণনা রয়েছে সেগুলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সুনান-ই-আবি দাউদ ও সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যে রয়েছে যে, ‘ইলম’ প্রকৃতপক্ষে তিনটি। এছাড়া সবই অতিরিক্ত। প্রথম হচ্ছে কুরআন কারীমের আয়াতসমূহ যা দৃঢ় এবং যার আহকাম বাকী রয়েছে। দ্বিতীয় হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত অর্থাৎ হাদীসসমূহ যা প্রমাণিত। তৃতীয় হচ্ছে ‘ফারিয়া-ই-আদেলা’ অর্থাৎ উত্তরাধিকারের জিজ্ঞাস্য বিষয়সমূহ যা কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। সুনান-ই-ইবনে মাজার দ্বিতীয় দুর্বল সনদযুক্ত হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘তোমরা ফারায়েশ শিক্ষা কর এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দান কর, এটা হচ্ছে অর্ধেক ইলম। মানুষ এটা ভুলে যায় এবং এটাই প্রথম জিনিস যা আমার উম্মতের নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়া হবে।’ হ্যরত ইবনে উইয়াইনা (রঃ) বলেনঃ ‘একে অর্ধেক ইলম বলার কারণ এই যে, প্রায় সমস্ত মানুষকেই এর সম্মুখীন হতে হয়।’

সহীহ বুখারী শরীফে এ আয়াতের তাফসীরে হ্যরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ ‘আমি রংগু ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) আমাকে দেখতে আসেন। বানু সালমার মহল্লায় তাঁরা পদব্রজে আগমন করেন। আমি সে সময় অজ্ঞান ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) পানি চেয়ে নিয়ে অযু করেন। অতঃপর আমার উপর অযুর পানি ছিটিয়ে দেন। ফলে আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমি তখন বলিঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আমার মাল কিভাবে বন্টন করবো? সে সময় এ পবিত্র আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়।’ সহীহ মুসলিম, সুনান-ই-নাসাই প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি বিদ্যমান রয়েছে।

সুনান-ই-আবি দাউদ, জামেউত তিরমিয়ী, সুনান-ই-ইবনে মাজা, মুসনাদ-ই-আহমাদ ইবনে হাস্বল প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত সা’দ ইবনে রাবী’র সহধর্মীণী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ দু’টি হ্যরত সা’দের (রাঃ) কন্যা, এদের পিতা উহুদের যুদ্ধে আপনার সাথে শরীক ছিলেন। ঐ যুদ্ধেই তিনি শহীদ হন। এদের চাচা তাঁর সমস্ত মাল নিয়ে নেয়। এদের জন্যে কিছুই রাখেনি। এটা স্পষ্ট কথা যে, মাল ছাড়া এদের বিয়ে হতে পারে না।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ ‘এর ফায়সালা স্বয়ং আল্লাহ পাকই করবেন।’ সে সময় উত্তরাধিকারের আয়াত অবর্তীর্ণ হয়।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এদের চাচার নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে নির্দেশ দেনঃ ‘দুই তৃতীয়াংশ (তোমার ভাইয়ের সম্পত্তির) এ মেয়েগুলোকে দিয়ে দাও, এক অষ্টমাংশ এদের মাকে প্রদান কর এবং বাকি তোমার অংশ।’ বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, হ্যরত জাবের (রাঃ)-এর প্রশ্নের উপর এ সূরাটির শেষ আয়াত অবতীর্ণ হয়ে থাকবে যেমন অতিসত্ত্বরই ইনশাআল্লাহ আসছে। কেননা, তাঁর উত্তরাধিকারীণী তো শুধুমাত্র তাঁর বোনেরা ছিল। তাঁর মেয়ে তো ছিলই না। তিনি তো ‘**মুর্ক**’ ছিলেন। আর এ আয়াতটি এ সম্বন্ধেই অর্থাৎ হ্যরত সাদ ইবনে রাবী’ (রাঃ)-এর উত্তরাধিকারীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় এবং এর বর্ণনাকারীও হচ্ছেন স্বয়ং হ্যরত জাবির (রাঃ)। তবে ইমাম বুখারী (রঃ) এ হাদীসটিকেও এ আয়াতের তাফসীরেই এনেছেন। এ জন্যে আমরাও তাঁর অনুসরণ করেছি।

আয়াতটির ভাবার্থ হচ্ছে- ‘আল্লাহ তা’আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা শিক্ষা দিচ্ছেন। অজ্ঞতার যুগে লোকেরা তাদের সমস্ত মাল ছেলেদেরই শুধু প্রদান করতো এবং মেয়েদেরকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করতো। তাই আল্লাহ তা’আলা মেয়েদের জন্যে অংশ নির্ধারণ করেন। তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য রেখেছেন। কেননা, যতগুলো কর্তব্য পালন পূরুষদের দায়িত্বে রয়েছে ততটা স্ত্রীদের দায়িত্বে নেই। যেমন পরিবারের খাওয়া পরার জন্যে আয় ব্যয়ের দায়িত্ব, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য বহু কষ্ট তাদেরকে সহ্য করতে হয়। এ জন্যেই তাদের প্রয়োজন অনুপাতে তাদেরকে স্ত্রীদের দ্বিগুণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কোন কোন বিজ্ঞ মনীষী এখানে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বের করেছেন যে, আল্লাহ তা’আলা স্বীয় বান্দাদের উপর পিতা-মাতা হতেও বহু গুণে দয়ালু ও স্নেহশীল। পিতা-মাতাকে তিনি তাদের সন্তানদের ব্যাপারে অসিয়ত করছেন। সুতরাং জানা যাচ্ছে যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা করুণাময় আল্লাহ তাঁর সৃষ্টজীবের উপর যত বেশী দয়াবান তত দয়াবান বাপ মা তাদের সন্তানদের প্রতি নয়। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, বন্দীদের মধ্য হতে একটি শিশু তার মা হতে পৃথক হয়ে পড়ে। মা তার শিশুর খোঁজে পাগলিনীর ন্যায় ছুটাছুটি করে এবং যে শিশুকেই পায় তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরে দুধ পান করিয়ে দেয়। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীগণকে বলেনঃ ‘আচ্ছা বলতো, অধিকার থাকা

১. যে ব্যক্তির পিতা ও পুত্র থাকে না তাকে **মুর্ক** বলে।

সূরাঃ নিসা ৮

সত্ত্বেও কি এ স্তুরি লোকটি তার শিশুটিকে আগুনে নিষ্কেপ করতে পারে?’  
সাহাৰীগণ উভয়ে বলেনঃ ‘হে আল্লাহৰ রাসূল (সঃ)! কখনই না!’ তিনি তখন  
বলেনঃ ‘আল্লাহৰ শপথ! আল্লাহ তা’আলা স্বীয় বান্দাদের উপর এর চেয়েও  
বেশী দয়ালুৰ।’

ହ୍ୟରତ ଇବନେ ଆବାସ (ରାଃ) ବଲେନ ଯେ, ପୂର୍ବେ ଅଂଶୀଦାର ଓ ହକଦାର ଶୁଧୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛିଲ । ପିତା-ମାତା ଅସିଯତ ହିସେବେ କିଛୁ ପେଯେ ଯେତୋ ମାତ୍ର । ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ଏଟା ରହିତ କରେ ଦେନ ଏବଂ ପୁତ୍ରକେ କନ୍ୟାର ଦିଶୁଣ ପିତା-ମାତାକେ ଏକ ଷଷ୍ଠୀଅଂଶ ଓ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶଓ ବଟେ, ତ୍ରୀକେ ଏକ ଅଷ୍ଟମାଂଶ ଓ ଏକ ଚତୁର୍ଥୀଅଂଶ, ସ୍ଵାମୀକେ ଏକ ଚତୁର୍ଥୀଅଂଶ ଓ ଅର୍ଧେକ ଦେୟାର ନିର୍ଦେଶ ଦେନ ।

হ্যৱত ইবনে আবাস (রাঃ) আৱও বলেন যে, উত্তোধিকাৱেৱ আহকাম অবতীৰ্ণ হলে কতগুলো লোক এটা অপছন্দ কৱে ও বলেঃ 'স্ত্ৰীকে দেয়া হবে এক চতুৰ্থাংশ ও এক অষ্টমাংশ, মেয়েকে দেয়া হবে অর্ধাংশ এবং ছোট ছোট ছেলেদেৱ জন্যেও অংশ নিৰ্ধাৰণ কৱা হয়েছে, অথচ এদেৱ মধ্যে' কেউই না যুক্তেৱ জন্যে বেৱ হতে পাৱে, না গন্নীমতেৱ মাল আনতে পাৱে। সুতৰাং তোমৰা এ আয়াত হতে নীৱব থাক তাহলে সম্বতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভুলে যাবেন, কিংবা আমাদেৱ বলাৱ কাৱণে তিনি এ আহকাম পৱিবৰ্তন কৱবেন।'

অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (স):-কে বলেঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (স):! আপনি মেয়েকে তার পিতার পরিত্যক্ত মাল হতে অর্ধেক দিচ্ছেন অথচ না সে ঘোড়ার উপর বসার যোগ্যতা রাখে, না সে শঙ্কদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে। আপনি শিশুকেও উত্তরাধিকারীরূপে সাব্যস্ত করেছেন, তার দ্বারা কি উপকার পাওয়া যেতে পারে?’ এ লোকগুলো অভিতার যুগে এরূপ করতো যে, মীরাস শুধু তাদেরকেই প্রদান করতো যারা যুদ্ধের যোগ্য ছিল। তারা সবচেয়ে বড় ছেলেকে উত্তরাধিকার করতো।

এটা দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, যদি মেয়ে দু'য়ের অধিক না হয়, অর্থাৎ শুধু দু'টোই হয় তাহলেও এটাই হকুম অর্থাৎ তারাও দুই ত্তীয়াংশই পাবে। কেননা, দ্বিতীয় আয়াতে দু' বোনকে দুই ত্তীয়াংশ দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং যদি দু' বোন দুই ত্তীয়াংশ পায় তবে দু' মেয়ে দুই ত্তীয়াংশ পাবে না কেন? তাদের জন্যে তো দুই ত্তীয়াংশ হওয়া আরও বাধ্যনীয়।

অন্য হাদীসে এসেছে যে, দু'টি মেয়েকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দুই ত্তীয়াংশ দিয়েছেন। যেমন এ আয়াতের শান-ই-নযুলের বর্ণনায় হ্যরত সা'দের কন্যাদের ব্যাপারে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে এটাও এর দলীল যে, যদি পুত্র না থাকে এবং একটি মাত্র কন্যা থাকে তবে সে অর্ধেক অংশ পেয়ে যাবে, সুতরাং যদি দু'টি কন্যা থাকার অবস্থাতেও অর্ধেক অংশ দেয়ার নির্দেশ দেয়া উদ্দেশ্যে হতো তবে এখানে তা বর্ণনা করা হতো। এককে যখন পৃথক করা হয়েছে তখন জানা যাচ্ছে যে, দুয়ের বেশী থাকা অবস্থায় যে হকুম দু'জন থাকা অবস্থাও সেই হকুম।

অতঃপর বাপ-মায়ের অংশের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। বাপ-মায়ের অবস্থা বিভিন্নরূপ। প্রথম অবস্থা এই যে, মৃত ব্যক্তির যদি একাধিক মেয়ে থাকে এবং পিতা-মাতাও থাকে তবে পিতা-মাতা উভয়েই এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে। অর্থাৎ এক ষষ্ঠাংশ পাবে পিতা এবং এক ষষ্ঠাংশ পাবে মাতা। আর যদি মৃত ব্যক্তির একটি মাত্র কন্যা থাকে তবে অর্ধেক মাল তো মেয়েটি পাবে এবং এক ষষ্ঠাংশ মা পাবে ও এক ষষ্ঠাংশ বাপ পাবে, আরও যে এক ষষ্ঠাংশ অবশিষ্ট থাকছে ওটাও বাপ<sup>১</sup> ‘আসাবা’ হিসেবে পেয়ে যাবে। তাহলে এখানে পিতা তার নির্ধারিত এক ষষ্ঠাংশ পেয়ে যাচ্ছে এবং একই সঙ্গে ‘আসাবা’ হিসেবেও অবশিষ্ট অংশ পেয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, উত্তরাধিকারী শুধু পিতা ও মাতা। এ অবস্থায় মাতা পাবে এক ত্তীয়াংশ এবং অবশিষ্ট সমস্ত মাল পিতা ‘আসাবা’ হিসেবে পেয়ে যাবে। তাহলে পিতা প্রায় দুই ত্তীয়াংশ প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ মায়ের তুলনায় বাপ দ্বিগুণ পাবে। এখন যদি মৃতা স্ত্রীর স্বামীও বিদ্যমান থাকে কিংবা মৃত স্বামীর স্ত্রী থাকে, অর্থাৎ ছেলে মেয়ে নেই, বরং আছে শুধু পিতা-মাতা এবং স্বামী বা স্ত্রী, তবে এ ব্যাপারে তো আলেমগণ একমত যে, এ অবস্থায়

১. ‘যে উত্তরাধিকারীর অংশ নির্ধারিত নেই অথচ অংশ পেয়ে থাকে, তাকে ‘আসাবা’ বলে। যেমন পুত্র ইত্যাদি কোন কোন সময় উত্তরাধিকারী ও ‘আসাবা’ হয়ে থাকে।

স্বামী পাবে অর্ধেক এবং স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ। কিন্তু আলেমদের এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, এ অবস্থায় এর পরে মা কত পাবে? এতে তিনটি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তি এই যে, স্বামী বা স্ত্রীর (অংশ) নেয়ার পর যা বাকী থাকবে মা তার এক তৃতীয়াংশ পাবে। হয় স্ত্রী স্বামী ছেড়ে যাক বা স্বামী স্ত্রী ছেড়ে যাক। কেননা, অবশিষ্ট মাল তাদের ব্যাপারে যেন পুরো মাল। আর মায়ের অংশ হচ্ছে বাপের অর্ধেক। সুতরাং অবশিষ্ট মালের এক তৃতীয়াংশ মা নিয়ে নেবে এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশ বাপ প্রাপ্ত হবে।

হ্যরত উমার (রাঃ), হ্যরত উসমান (রাঃ) এবং হ্যরত আলী (রাঃ)-এর এটাই ফায়সালা। এটাই হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবিতেরও (রাঃ) উক্তি। সাতজন ফকীহ, ইমাম চতুর্ষয় এবং জমহুরেরও এটাই ফতওয়া। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এ দু' অবস্থায়ই মা সমস্ত মালের এক তৃতীয়াংশ পাবে। কেননা, আয়াতটি সাধারণ, স্বামী-স্ত্রী থাক আর নাই থাক, সাধারণভাবে ছেলেমেয়ে না থাকার সময় মাকে সমস্ত মালের এক তৃতীয়াংশ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এটাই হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি। হ্যরত আলী (রাঃ) এবং হ্যরত মুআয় ইবনে জাবাল (রাঃ) হতেও এভাবেই বর্ণিত আছে। হ্যরত শুরায়েহ (রাঃ) এবং হ্যরত দাউদ যাহেরীও (রঃ) এ কথাই বলেন। হ্যরত আবুল হাসান ইবনে লাবান বাসারীও (রঃ) স্বীয় ‘ইলম-ই-ফারায়ে সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ‘কিতাবুল ‘ঈজায়ে’ এ উক্তিকেই পছন্দ করেছেন। কিন্তু এ উক্তিটি বিবেচনা সাপেক্ষ, এমন কি দুর্বলও বটে। কেননা, আয়াতে মায়ের এ অংশ সেই সময় নির্ধারণ করেছে যখন সম্পূর্ণ মালের উত্তরাধিকারী শুধু পিতা ও মাতা হয়। আর যখন স্বামী বা স্ত্রী রয়েছে তখন তারা তাদের নির্ধারিত অংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে মা তারই এক তৃতীয়াংশ পাবে। তৃতীয় উক্তি এই যে, মৃত ব্যক্তি যদি পুরুষ হয় এবং তার স্ত্রী বিদ্যমান থাকে তবে শুধু এ অবস্থাতে মা সম্পূর্ণ মালের এক তৃতীয়াংশ পাবে। কেননা, স্ত্রী সমস্ত মালের এক চতুর্থাংশ পাবে। যদি সমস্ত মালকে বার ভাগ করা হয় তবে তিন ভাগ নেবে স্ত্রী, চার ভাগ নেবে মা এবং অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ পাবে পিতা।

কিন্তু যদি স্ত্রী মারা যায় এবং তার স্বামী বিদ্যমান থাকে তবে মার্মান্তিক অবশিষ্ট মালের এক তৃতীয়াংশ পাবে। ঐ অবস্থাতেও যদি মাকে সমস্ত মালের এক তৃতীয়াংশ দেয়া হয় তবে সে বাপ অপেক্ষাও বেঙ্গীণ্পেয়ে যাবে কারণ ফেয়ান মালের

ছয় ভাগ করা হলো, তিন ভাগ তো স্বামী পেয়ে গেল, মা পেলো দু'ভাগ এবং বাপ পাছে মাত্র এক ভাগ, যা মা অপেক্ষাও কম। সুতরাং এ অবস্থায় ছয় ভাগের মধ্যে তিন ভাগ পাবে স্বামী এবং বাকী তিন ভাগের মধ্যে মাকে দেয়া হবে এক ভাগ ও বাপকে দেয়া হবে দু'ভাগ। ইমাম ইবনে সীরীন (রাঃ)-এর এটাই উকি। একপই বুঝতে হবে যে, এ উকিটি দু'টি উকির সংমিশ্রণ। এটা ও দুর্বল। প্রথম উকিটিই সঠিক।

বাপ-মায়ের তৃতীয় অবস্থা এই যে, তারা মৃত ব্যক্তির ভাইদের সঙ্গে উত্তরাধিকারী হয়, তারা সহোদর ভাইই হোক অথবা বৈপিত্রেয় ভাইই হোক। এ অবস্থায় বাপের বিদ্যমানতায় ভাইগুলো কিছুই পাবে না, তবে তারা মাকে এক তৃতীয়াংশ হতে এক ষষ্ঠাংশে নামিয়ে দেবে। আর যদি অন্য কোন উত্তরাধিকারীই না থাকে এবং মায়ের সাথে শুধু বাপ থাকে তবে বাকী মাল সমস্তই বাপ পেয়ে যাবে। জমহুরের এটাই উকি। তবে হ্যরত ইবনে আবুস রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা হ্যরত উসমান (রাঃ)-কে বলেনঃ ‘দু’ ভাই মাতাকে এক তৃতীয়াংশ হতে সরিয়ে এক ষষ্ঠাংশে নিয়ে যায় না। কুরআন কারীমের মধ্যে ‘খোন্নাই’ শব্দ এসেছে এবং এটা বহু বচন। ভাবার্থ দু’ ভাই হলে ‘খোন্নাই’ শব্দ অর্থাৎ দ্বিচন ব্যবহার করা হতো।’ তৃতীয় খলিফা (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ ‘এটা বহু পূর্ব হতে চলে আসছে এবং এ ‘মাসআলা’টি এভাবেই চতুর্দিকে পৌছে গেছে। সমস্ত মানুষ এর উপরই আমল করছে। সুতরাং আমি এটা পরিবর্তন করতে পারি না।’ প্রথমতঃ এ বর্ণনাটি তো প্রমাণিতই নয়। এর বর্ণনাকারী শা’বার উপর ইমাম মালিক (রাঃ)-এর মিথ্যা প্রতিপাদন বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া এ কথাটি হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ)-এর না হওয়ার দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে এই যে, স্বয়ং তাঁর বিশিষ্ট সহচরগণ এবং উচ্চ পর্যায়ের ছাত্রগণও এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

হ্যরত যায়েদ (রাঃ) বলেন যে, দুইকেও ‘খোন্নাই’ বলা হয়। আমি এ মাসআলাটি পৃথক পুস্তিকায় পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি। হ্যরত সাইদ ইবনে কাতাদা’ (রাঃ) হতেও এরকমই বর্ণিত আছে। হ্যাঁ, তবে যদি মৃত ব্যক্তির একটিমাত্র ভাই থাকে তবে সে মাতাকে এক তৃতীয়াংশ হতে সরাতে পারবে না। উলামা-ই-কিরামের ঘোষণা মতে এতে নিপুণতা রয়েছে এই যে, ভাইদের বিয়ে, খাওয়া, পরা ইত্যাদির খরচ বহন পিতারই দায়িত্বে রয়েছে, মাতার দায়িত্বে নেই। সুতরাং পিতাকে অধিক দেয়ার মধ্যেই হিকমত নিহিত রয়েছে। এটা উত্তম উকি। কিন্তু

হ্যরত ইবনে আকবাস (রাঃ) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, ভাইয়েরা মায়ের যে এক ষষ্ঠাংশ কমিয়ে দিল তা পিতা পাবে না, বরং ওরাই পাবে। ঐ উক্তি খুবই বিরল। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস (রাঃ)-এর এ উক্তি সমস্ত উম্মতের বিপরীত। হ্যরত ইবনে আকবাস (রাঃ) বলেন যে, “প্র্যাক ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার পুত্র ও পিতা না থাকে।

এরপরে বলা হচ্ছে- ‘অসিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর মীরাস বন্ধিত হবে।’ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মনীষী এতে একমত যে, ঋণ অসিয়তের অগ্রবর্তী। আয়াতের তাৎপর্যের প্রতি গভীর চিন্তা সহকারে লক্ষ্য করলে এটাই পরিলক্ষিত হবে। জামেউত্ তিরমিয়ী প্রভৃতি হাদীস এন্টে রয়েছে, হ্যরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) বলেনঃ ‘তোমরা কুরআন কারীমের অসিয়তের নির্দেশ পূর্বে এবং ঋণের হুকুম পরে পাঠ করে থাক। কিন্তু জেনে রেখো যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) পূর্বে ঋণ পরিশোধ করিয়েছেন এবং পরে অসিয়ত জারী করেছেন। একই মাতাজাত ভ্রাতাগণ পরম্পর একে অপরের উত্তরাধিকারী হবে, বৈমাত্রেয় ভাইদের উত্তরাধিকারী হবে না। মানুষ তার সহোদর ভাইয়ের উত্তরাধিকারী হবে, কিন্তু ঐ ভাইয়ের উত্তরাধিকারী হবে না যার মা অন্য। এ হাদীসটি শুধু হ্যরত হারিস (রঃ) হতে বর্ণিত আছে এবং তাঁর এ হাদীস কোন কোন মুহাদ্দিস খণ্ডন করেছেন। কিন্তু তিনি ফারায়েয়ের হাফিজ ছিলেন। এ বিদ্যায় তাঁর বিশেষ চিন্তাকর্ষণ ও দক্ষতা ছিল। অংকেও তাঁর বেশ পাণ্ডিত্য ছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন- ‘আমি পিতা ও পুত্রগণকে প্রকৃত মীরাসে নিজ নিজ নির্ধারিত অংশ গ্রহণকারী করেছি এবং অজ্ঞতা যুগের প্রথা দূরীভূত করেছি। বরং ইসলামেও প্রথমে মাল শুধুমাত্র সম্ভানদেরকে দেয়ার নির্দেশ ছিল এবং বাপ মা শুধু অসিয়ত হিসেবে কিছু লাভ করতো, যেমন হ্যরত ইবনে আকবাস (রাঃ)-এর উক্তি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সেটাকেও রহিত করে দিয়েছেন। এখন এ হুকুম হচ্ছে যে, পিতার দ্বারা তোমাদের বেশী উপকার সাধিত হবে কि পুত্রের দ্বারা হবে তা তোমাদের জানা নেই। উভয় হতেই উপকারের আশা রয়েছে। এদের একের অপর হতে বেশী উপকার লাভের নিষ্ঠয়তা নেই। পিতার চেয়ে পুত্রের দ্বারা বেশী উপকার লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, আবার পুত্র অপেক্ষা পিতার দ্বারা ও বেশী উপকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।’

এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন-‘ঐ নিধারিত অংশ ও উত্তরাধিকারের এ আহকাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফরয করা হয়েছে। কোন আশায বা ভয়ে এতে কম-বেশী করার কোন স্থান নেই। না কাউকে বণ্ঘিত করা যাবে, না কাউকে বেশী দেয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা সবজাত্তা ও মহাবিজ্ঞ। যে যার হকদার তিনি তাকে তাই দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক জিনিসের স্থান তিনি খুব ভালই জানেন। তোমাদের লাভ ও ক্ষতি সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তাঁর কোন কাজ ও কোন নির্দেশ নিপুণতা শূন্য নয়। সুতরাং তাঁর নির্দেশাবলী তোমাদের মেনে চলা উচিত।’

## ১২। আর তোমাদের পঞ্জীগণের

যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে,  
তবে তারা যা পরিত্যাগ করে  
যায় তোমাদের জন্য তার  
অর্ধাংশ, কিন্তু যদি তাদের  
সন্তান-সন্ততি থাকে, তবে  
তারা যা অসিয়ত করেছে সেই  
অসিয়ত ও ঝণ অন্তে তাদের  
পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে  
তোমাদের জন্য এক চতুর্থাংশ  
এবং যদি তোমাদের কোন  
সন্তান-সন্ততি না থাকে তবে  
তোমরা যা পরিত্যাগ করে  
যাবে, তাদের জন্য তার এক  
চতুর্থাংশ, কিন্তু যদি তোমাদের  
সন্তান-সন্ততি থাকে তবে  
তোমরা যা অসিয়ত করবে  
সেই অসিয়ত ও ঝণ অন্তে  
তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি  
হতে তাদের জন্যে এক  
অষ্টমাংশ; যদি কোন মূল ও

১২- وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ  
أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ  
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصَيْنَ بِهَا أَوْ دِينٍ  
وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ  
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ  
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشَّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ  
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصَيْنَ بِهَا  
أَوْ دِينٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورث  
كَلْلَةً أَوْ مُرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ اخْتٌ

শাখা বিহীন পুরুষ বা স্ত্রী মারা  
যায় এবং তার এক ভাতা  
অথবা এক ভন্নী থাকে, তবে  
এতদুভয়ের মধ্য হতে  
প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে,  
আর যদি তারা তদপেক্ষা  
অধিক হয় তবে কৃত অসিয়ত  
পূরণ করার পর অথবা ঝণের  
পর কারও অনিষ্ট না করে  
তারা তার এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত  
হবে; এটাই আল্লাহর নির্দেশ  
এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী,  
সহিষ্ণু।

فِلْكُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس  
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ  
شُرَكَاءٌ فِي الْثُلُثِ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يَوْصِي بِهَا أَوْ دِينٌ  
غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

আল্লাহ তা'আলা বলেন—‘হে পুরুষ লোকেরা! তোমাদের স্ত্রীগণ যা ছেড়ে  
যাবে, যদি তাদের ছেলে মেয়ে থাকে তবে তোমরা এক চতুর্থাংশ পাবে। এটা  
তাদের অসিয়ত পূরণ ও ঝণ পরিশোধের পরে হবে। শৃঙ্খলা বিধান হচ্ছে এই  
যে, পূর্বে তাদের ঝণ পরিশোধ করতে হবে, তারপরে তাদের অসিয়ত পূরণ  
করতে হবে এবং পরে তাদের পরিত্যক্ত মাল বন্দিত হবে। এটা এমন একটি  
জিজ্ঞাস্য বিষয় যার উপর উচ্চতের সমন্ত আলেমের ইজমা রয়েছে। এ  
মাসআলায় পুত্রের হৃকুমে পৌত্র রয়েছে। এমনকি তাদের সন্তান এবং সন্তানের  
সন্তানও এ হৃকুমেরই আওতাভুক্ত। অর্থাৎ তাদের বিদ্যমানতায়ও স্বামী তার স্ত্রীর  
পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের অংশের কথা বলছেন যে, তারা স্বামীর  
পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে বা এক অষ্টমাংশ পাবে। স্বামীর সন্তান  
না থাকলে চতুর্থাংশ পাবে এবং সন্তান থাকলে এক অষ্টমাংশ পাবে। এই এক  
চতুর্থাংশ বা এক অষ্টমাংশের মধ্যে মৃত স্বামীর সমন্ত স্ত্রীই জড়িত থাকবে।  
চারজন, তিনজন বা দু'জন হলে তাদের মধ্যে এই অংশ সমানভাবে বন্দিত  
হবে। আর যদি একজনই হয় তবে অংশ সে একাই পাবে।-এর  
তাফসীর ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। শব্দটিকে ‘কালাম’ শব্দ হতে বের করা  
হয়েছে একালীল এই মুকুট ইত্যাদিকে বলা হয় যা মন্তককে চতুর্দিক হতে ঘিরে

নেয়। এখানে এর ভাবার্থ এই যে, তার উত্তরাধিকারী হচ্ছে চার পাশের লোক। তার আসল ও ফরা' অর্থাৎ মূল ও শাখা নেই।

হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-কে ‘মুল’ শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ ‘আমি আমার মতানুসারে উন্নত দিচ্ছি। যদি সেটা সঠিক হয় তবে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হবে। আর যদি ভুল হয় তবে শয়তানের পক্ষ থেকে হবে। আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সঃ) এটা হতে সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হবেন।’ মুল তাকেই বলে যার পিতা ও পুত্র থাকে না।’ হ্যরত উমার ফারক (রাঃ) খলীফা হলে তিনিও তাঁর অনুকূলেই মত প্রকাশ করেন এবং বলেন হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর মতের বিরুদ্ধাচরণ করতে আমি লজ্জাবোধ করি।’ (তাফসীর-ই ইবনে জারীর ইত্যাদি)

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ হ্যরত উমার (রাঃ)-এর সর্বশেষ যুগ আমি পেয়েছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি-'কথা ওটাই যা আমি বলেছি। সঠিক কথা' এই যে, ‘মুল তাকেই বলা হয় যার পিতা ও পুত্র নেই।’ হ্যরত আলী (রাঃ), হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ), হ্যরত আশবাঙ্গি (রাঃ), হ্যরত নাখঙ্গি (রঃ), হ্যরত হাসান বসরী (রঃ), হ্যরত কাতাদা (রঃ) এবং হ্যরত জাবির ইবনে যায়েদও (রঃ) এ কথাই বলেন। মদীনাবাসী, কুফাবাসী এবং বসরাবাসীরও এটাই উক্তি। সাতজন ধর্মশাস্ত্রবিদ, ইমাম চতুষ্টয় এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত জমহুর-ই-উলামাও এটাই বলেন। বহু মনীষী এর উপর ইজমা নকল করেছেন। একটি মারফু' হাদীসেও এটাই এসেছে। ইবনে লাবান (রঃ) বলেনঃ ‘ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে যে, ‘মুল তাকেই বলে যার সন্তান থাকে না।’ কিন্তু প্রথমটিই সঠিক এবং খুব সন্তুষ্ট বর্ণনাকারী ভাবার্থই বুঝেনি।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে-তার ভাই অথবা বোন থাকে, অর্থাৎ মা পক্ষীয় ভাই বা বোন যেমন হ্যরত সা'দ ইবনে আবি ওকাস (রাঃ) প্রভৃতি পূর্ববর্তী কয়েকজন মনীষীর কিরআত রয়েছে। হ্যরত আবু বকর (রাঃ) প্রভৃতি (মহামানব) হতেও এ তাফসীরই বর্ণিত আছে। তাহলে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। আর যদি একাধিক থাকে তবে সবাই এক ত্রৃতীয়াংশে অংশীদার হবে। মাতাজাত ভাতাগণ কয়েকটি কারণে অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ হতে পৃথক। একটি এই যে, যারা তাদেরকে উত্তরাধিকারী করে দিচ্ছে তাদেরও তারা উত্তরাধিকারী হবে। যেমন মা। দ্বিতীয় এই যে, তাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী অর্থাৎ ভাই ও বোন সমান

সমান মীরাস পাবে। তৃতীয় এই যে, তারা শুধুমাত্র ঐ সময়েই উত্তরাধিকারী হবে যখন মৃত ব্যক্তি পিতা ও পুত্রহীন হবে। সুতরাং তারা পিতা ও পিতামহ এবং পুত্র ও পৌত্রের বিদ্যমানতায় উত্তরাধিকারী হবে না। চতুর্থ এই যে, তারা এক তৃতীয়াংশের বেশী কোন অবস্থাতেই পায় না। তাদের সংখ্যা যতই বেশী হোক না কেন এবং পুরুষই হোক আর স্ত্রীই হোক।

হ্যরত উমার (রাঃ)-এর ফায়সালা মতে মাতাজাত ভাতা ভগী তাদের মীরাস পরম্পরের মধ্যে এভাবে বট্টন করবে যে, ভাই পাবে দ্বিগুণ এবং বোন পাবে একগুণ। হ্যরত যুহরী (রঃ) বলেন যে, হ্যরত উমার (রাঃ) এ ফায়সালা করতে পারেন না যে পর্যন্ত না তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনে থাকবেন। আয়তে তো এটা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে যে, যদি একাধিক থাকে তবে তারা সবাই এক তৃতীয়াংশে অংশীদার হবে। এমন অবস্থায় আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, যদি মৃতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্বামী, মাতা বা পিতামহী এবং দু' মা পক্ষীয় ভাই ও একটি বা একাধিক বাপ ও মা পক্ষীয় ভাই থাকে তবে জমহূরের মতে এ অবস্থায় স্বামী অর্ধেক পাবে, মাতা বা পিতামহী পাবে এক ষষ্ঠাংশ, মা পক্ষীয় ভাতাগণ পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং এতে মা ও বাপ উভয় পক্ষীয় ভাতাগণও জড়িত থাকবে।

আঁমীরুল মুমিনীন হ্যরত উমার ফারুক (রাঃ)-এর যুগে একপই একটি ঘটনা ঘটেছিল। তখন তিনি অর্ধেক মাল স্বামীকে প্রদান করেন এবং মা পক্ষীয় ভাতাগণকে প্রদান করেন এক তৃতীয়াংশ। পরে মা ও বাপ উভয় পক্ষীয় ভাতাগণ তাদের নিজেদের দাবীর কথা জানালে তিনি বলেনঃ ‘তোমরা তোমাদের মা পক্ষীয় ভাইদের সঙ্গেই অংশীদার রয়েছ। অন্যান্য বর্ণনায় হ্যরত উসমানেরও (রাঃ) একপ অংশীদার করে দেয়ার কথা বর্ণিত আছে। একপই একটি বর্ণনা হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। হ্যরত সাইদ ইবনে মুসাইয়াব (রাঃ), কাজী শুরাইহ (রঃ), মাসরুক (রঃ), তাউস (রঃ), মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ), ইবরাহীম নাখন্দি (রঃ), উমার ইবনে আবদুল আয়ীয (রঃ), সাওরী (রঃ) এবং শুরায়েক (রঃ)-এর এটাই উক্তি। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ) এবং ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুয়াহুও (রঃ) এ দিকেই গিয়েছেন।

তবে হ্যরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) এতে অংশীদার হওয়ার মত সমর্থন করতেন না। বরং তিনি ঐ অবস্থায় মা পক্ষীয় সন্তানদেরকে এক

ত্রৃতীয়াৎশ্ব প্রদান করতেন এবং একই মা-বাপের সন্তানদেরকে কিছুই প্রদান করতেন না। কেননা এরা আসাবা। আর আসাবা তখনই পেয়ে থাকে যখন নির্দিষ্ট অংশ প্রাপকদের অংশ নেয়ার পর বেঁচে যায়। এমন কি হ্যরত অকী ইবনে জাররাহ (রাঃ) বলেন যে, হ্যরত আলী (রাঃ) হতে এর বিপরীত করার কথা বর্ণিতই নেই। হ্যরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এবং আবু মুসা আশ আরীরও (রাঃ) এটাই উক্তি। হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) হতেও এটাই প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। শা'বী (রাঃ), ইবনে আবি লাইলা (রাঃ), ইমাম আবু হানীফা (রাঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (রাঃ), মুহাম্মাদ ইবনে হাসান (রাঃ), হাসান ইবনে ফিয়াদ (রাঃ), যুফার ইবনে হায়িল (রাঃ), ইমাম আহমাদ (রাঃ), ইয়াহইয়া ইবনে আদম (রাঃ), নাসীদ ইবনে হাম্মাদ (রাঃ), আবু সাউর (রাঃ), দাউদ ইবনে যাহেরীও (রাঃ) ঐদিকেই গিয়েছেন।

অতঃপর বলা হচ্ছে- ‘এই মীরাস বন্টন অসিয়ত পুরো করার পরে হতে হবে। অসিয়ত এমন হবে যে, যেন কোন অবিচার না হয়, কারও কোন ক্ষতি না হয়, কেউ অত্যাচারিত না হয়, কোন উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকার যেন মারা না যায় বা যেন কোন কম বেশী না হয়। এর বিপরীত অসিয়তকারী এবং এরূপ শরীয়ত বিরোধী অসিয়তের ব্যাপারে চেষ্টাকারী হচ্ছে আল্লাহ পাকের নির্দেশ অমান্যকারী, তাঁর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণকারী। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘অসিয়তের ব্যাপারে কারও কোন ক্ষতি সাধন করা কাবীরা গুনাহ।’ (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)

সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যে হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ)-এর উক্তিও এভাবেই বর্ণিত আছে। কোন কোন বর্ণনায় হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) হতে তাঁর এ ঘোষণার পরে আয়াতের এ অংশটি পাঠ করার কথাও বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনে জারীর (রাঃ)-এর উক্তি অনুসারে সঠিক কথা এই যে, এটা ‘মারফু’ হাদীস নয়, বরং মাওকুফ হাদীস। মৃত ব্যক্তি স্বীয় উত্তরাধিকারীর জন্যে কিছু চুক্তি করতে পারে কি-না এ ব্যাপারে ইমাম মহোদয়গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারও কারও মতে এরূপ চুক্তি করা ঠিক নয়। কেননা, এতে অপবাদের সুযোগ রয়েছে।

হাদীস শরীফে বিশুদ্ধ সনদে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক হক পৌছিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এখন উত্তরাধিকারীর জন্যে কোন অসিয়ত নেই।’ ইমাম মালিক (রাঃ), ইমাম আহমাদ

ইবনে হাস্বল (রঃ) এবং ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এরও এটাই উক্তি। ইমাম শাফিন্দে (রঃ)-এর প্রথম উক্তি এটাই ছিল। কিন্তু তাঁর শেষ উক্তি এই যে, চুক্তি করা ঠিক হবে। তাউস (রঃ), আতা' (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) এবং হ্যরত উমার ইবনে আবদুল আয়ীয় (রঃ)-এরও উক্তি এটাই। হ্যরত ইমাম বুখারীও (রঃ) এটাই পছন্দ করেছেন এবং স্বীয় প্রত্ত্ব সহীহ বুখারীর মধ্যে এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

এর প্রমাণ হিসেবে নিম্নরূপ একটি বর্ণনাও রয়েছেঃ ‘হ্যরত রাফে’ ইবনে খুয়ায়েজ (রাঃ) অসিয়ত করেন যে, ফায়ারিয়্যাহ যে জিনিসের উপর স্বীয় দরজা বন্ধ রাখে তা যেন খোলা না হয়।’ হ্যরত ইমাম বুখারী (রঃ) বলেনঃ ‘কোন কোন লোক বলেন যে, মৃত ব্যক্তির এ চুক্তি উত্তরাধিকারীগণের কুধারণার কারণেই বৈধ হয়। কিন্তু আমি বলি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তো বলেছেনঃ ‘তোমরা কুধারণা হতে বেঁচে থাক, কুধারণা সবেচেয়ে বড় মিথ্যা।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেছেনঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যাদের আমানত তোমদের নিকট রয়েছে তাদের নিকট তোমরা তা পৌছিয়ে দাও। এখানে উত্তরাধিকারী ও অউত্তরাধিকারীকে বিশিষ্ট করা হয়নি। এটা স্মরণীয় বিষয় যে, এ মতবিরোধ ঐ সময় রয়েছে যখন এ চুক্তি প্রকৃতই সঠিক হবে এবং প্রকৃত কাজ অনুযায়ী হবে। যদি এ চুক্তি শুধুমাত্র ছল- চাতুরীর জন্য হয় এবং কোন কোন উত্তরাধিকারীকে বেশী দেয়া ও কাউকে কম দেয়ার জন্যে হয় তবে তা পুরো করা যে হারাম এ বিষয়ে সবাই একমত। এ আয়াতের স্পষ্ট শব্দগুলোও এর অবৈধতার ফতওয়া দিচ্ছে। এরপরে বলা হচ্ছে যে, এগুলো হচ্ছে সেই আল্লাহর নির্দেশ যিনি মহাজ্ঞানী ও সহিষ্ণু।

### ১৩। এটাই আল্লাহর নির্দিষ্ট

সীমাসমূহ এবং যে কেউ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের অনুগত হয় তিনি তাকে এরূপ জাগ্রাতে প্রবিষ্ট করবেন- যার নিম্নে স্নোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে; এবং এটাই বড় সফলতা।

١٣ - تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَطِعْ  
الله ورسوله يدخله جنة تجري  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ  
فِيهَا وَذِلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

১৪। আর যে কেউ আল্লাহ ও  
তদীয় রাসূলকে অমান্য করে  
এবং তাঁর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ  
অতিক্রম করে, তিনি তাকে  
আগুনে নিষ্কেপ করবেন,  
তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান  
করবে এবং তার জন্যে  
লাঞ্ছনাপ্রদ শাস্তি রয়েছে।

١٤ - وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَتَعْدَ حَدْوَدَهُ يَدْخُلُهُ نَارًا  
خَالِدًا فِي هَاوَلَهَ عَذَابٌ  
مَهِينٌ

(۴)

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অবাধ্য হয় ও তাঁর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে সে জাহানামে নিষ্কিঞ্চ হবে, যার মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে। এরূপ লোকদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। অর্থাৎ এসব অবশ্য করণীয় কাজ এবং এ পরিমাণ যা আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন ও মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণকে তাদের আজীয়তার নৈকট্য এবং তাদের প্রয়োজন অনুপাতে যার জন্যে যে অংশ নির্দিষ্ট করেছেন এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সীমারেখা, তোমরা এগুলো ভেঙ্গে দিয়ো না বা অতিক্রম করো না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশাবলী মেনে নেয়, কোন ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে কোন উত্তরাধিকারীকে কম বেশী দেয়ার চেষ্টা করে না, বরং আল্লাহ পাকের নির্দেশ পুরোপুরি পালন করে, আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্মাতে প্রবিষ্ট করবেন যার তলদেশ দিয়ে স্নোতশ্বিনী সমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তারাই সফলকাম হবে এবং তাদেরই উদ্দেশ্য সফল হবে।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের নির্দেশ পরিবর্তন করে দেয়, কোন ওয়ারিসের মীরাস কম বেশী করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে না, বরং তাঁর নির্দেশের বিপরীত কাজ করে বা তাঁর বন্টনকে ভাল চক্ষে দেখে না কিংবা তাঁর আদেশকে ন্যায় মনে করে না, তারা চিরস্থায়ী অপমানজনক এবং বেদনাদায়ক শাস্তির মধ্যে অবস্থান করবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘একটি লোক সন্তুর বছর পর্যন্ত পুণ্যের কাজ করতে থাকে, অতঃপর সে অসিয়তে সময় অন্যায় ও অবিচার করে, ফলে তার পরিণতি খারাপ কার্যের উপর হয়ে থাকে এবং জাহানামে প্রবেশ করে।’

অপরপক্ষে আর একজন লোক সন্তুর বছর পর্যন্ত অসৎ কাজ করতে থাকে, অতঃপর সে স্বীয় অসিয়তে ন্যায় পন্থা অবলম্বন করে, ফলে তার পরিণতি ভাল কাজের উপর হয়ে থাকে এবং সে জান্মাতে প্রবেশ লাভ করে।’ অতঃপর এ হাদীসটির বর্ণনাকারী হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ ‘তোমরা اللَّهُ تِلْكَ حَدْوَدَهُ نَارًا

بَابُ الْأَضْرَارِ پর্যন্ত আয়াতটি পাঠ কর। সুনান-ই-আবি দাউদে **عَذَابٌ مُهِينٌ** এর মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘একজন পুরুষ লোক বা স্ত্রীলোক ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্যের কার্যে লেগে থাকে, অতঃপর সে মৃত্যুর সময় অসিয়তের ব্যাপারে কষ্ট ও ক্ষতিকর কাজ করে থাকে, তখন তার জন্যে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যায়’।

অতঃপর হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) **مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ** হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। জামেউত্ তিরমিয়ী ও সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে। ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেন। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে এ হাদীসটি পূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

#### ১৫। আর তোমাদের নারীদের

মধ্যে যারা নির্জ্জতার কাজ করে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, অনন্তর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তাদেরকে তোমরা গৃহসমূহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে উঠিয়ে না নেয় কিংবা আল্লাহ তাদের জন্যে কোন পথ নির্দেশ না করেন।

#### ১৬। আর তোমাদের মধ্য হতে যে কোন দু' ব্যক্তি এ নির্জ্জতার কাজ করবে, তাদের উভয়কেই শাস্তি প্রদান কর; কিন্তু তারা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সদাচারী হয়, তবে তদুভয় হতে প্রত্যাবর্তিত হও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তাওবা গ্রহণকারী, করুণাময়।

۱۵ - وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ  
نِسَاءٍ كُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ  
أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا  
فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ  
حَتَّىٰ يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلُ  
لَهُنَّ رَوَاهَةً سِيَّلًا  
الله لَهُنَّ سِيَّلًا

۱۶ - وَالَّذِينَ يَأْتِينَهَا مِنْكُمْ فَادْعُو  
هُمْ أَفَإِنْ تَابَا وَاصْلَحَا  
فَاعِرْضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
تَوَابَا رَحِيمًا

ইসলামের প্রাথমিক যুগে একপ নির্দেশ ছিল যে, ন্যায়বান সাক্ষীদের সত্য সাক্ষ্য দ্বারা কোন স্ত্রীলোকের অশ্রীলতা প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে যেন বাড়ীর বাইরে যেতে দেয়া না হয় বরং জন্মের মত বাড়ীতেই যেন আটক রাখা হয়। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে তাকে যেন ছেড়ে দেয়া না হয়। এটা বর্ণনা করার পর আল্লাহ পাক বলেন—হ্যাঁ তবে এটা অন্য কথা যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে কোন পথ নির্দেশ করে দেন। অতঃপর যখন অন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয় তখন পূর্বের ঐ নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। হ্যরত ইবনে আকবাস (রাঃ) বলেন যে, সূরা-ই-নূরের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকের জন্যে এ নির্দেশই ছিল। অতঃপর সূরা-ই-নূরের আয়াত অবতীর্ণ হলে বিবাহিতা নারীকে রজম করা অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা এবং অবিবাহিতা নারীকে একশ চাবুক মারার নির্দেশ দেয়া হয়।

হ্যরত ইকরামা (রঃ), হ্যরত সাওদ ইবনে যুবাইর (রঃ), হ্যরত হাসান বসরী (রঃ), হ্যরত আতা' খুরাসানী (রঃ), হ্যরত আবু সালেহ (রঃ), হ্যরত কাতাদাহ (রঃ), হ্যরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ), এবং হ্যরত যহ্যাকেরও (রঃ) এটাই উক্তি যে, এ আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে এবং এ বিষয়ে সবাই একমত। হ্যরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর যখন অহী অবতীর্ণ হতো তখন তা তাঁর উপর বড় ক্রিয়াশীল হতো এবং তিনি কষ্ট অনুভব করতেন ও তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যেতো। একদা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর উপর অহী অবতীর্ণ করেন। অহীর সময়কালীন অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি বলেনঃ ‘তোমরা আমার কথা গ্রহণ কর। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে পথ নির্দেশ করেছেন।

যদি বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা স্ত্রী ব্যভিচার করে তবে তাদেরকে একশ চাবুক মারতে হবে, অতঃপর প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে। আর অবিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রী ব্যভিচার করলে তাদেরকে একশ চাবুক মারতে হবে এবং এক বছর নির্বাসন দিতে হবে। (সহীহ মুসলিম ইত্যাদি) জামেউত্ তিরমিয়ীর মধ্যেও এ হাদীসটি শব্দের পরিবর্তনের সাথে বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এ রকমই সুনান-ই-আবি দাউদেও রয়েছে।

ইবনে মিরদুওয়াই-এর গারীব হাদীসে অবিবাহিত ও বিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীর এ নির্দেশের সাথে সাথে এও রয়েছে যে, যদি তারা বুঝে বুঝি হয় তবে

তাদেরকে রজম করতে হবে। কিন্তু এ হাদীসটি গারীব। তাবরানীর হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘সূরা-ই-নিসা অবতীর্ণ হওয়ার পর আবদ্ধ রাখার ছক্ষু অবিশ্ট নেই।’ এ হাদীস অনুযায়ী ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর মাযহাব এই যে, বিবাহিত ও বিবাহিতা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারণীকে চাবুকও মারতে হবে এবং রজমও করতে হবে। আর জমহুরের মতে চাবুক মারতে হবে না, শুধু রজম করতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত মায়েয (রাঃ)-কে এবং গামেদিয়াহ নারীকে রজম করেছিলেন কিন্তু চাবুক মারেননি। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) দু'জন ইয়াহুদীকে রজম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং রজমের পূর্বে তাদেরকে চাবুক মারার নির্দেশ দেননি। সুতরাং জমহুরের এ উক্তি অনুযায়ী জানা যাচ্ছে যে, রজমের পূর্বে চাবুক মারার নির্দেশ রাহিত হয়ে গেছে, সুতরাং এটা জরুরী নয়।

অতঃপর বলা হচ্ছে-যদি দু'জন পুরুষ পরম্পর এ নির্লজ্জতার কাজ করে তবে তোমরা তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। অর্থাৎ তাদেরকে তিরঙ্কার কর, অপদস্থ কর, জুতো মার ইত্যাদি। চাবুক মারা ও রজব করার নির্দেশ দ্বারা এ নির্দেশও রাহিত হয়ে যায়। হ্যরত ইকরামা (রঃ), হ্যরত আতা' (রঃ), হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) এবং হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থও হচ্ছে পুরুষ ও স্ত্রী। হ্যরত সুন্দী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঐ নব যুবকগণ যারা বিবাহিত নয়।

হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ‘লাওয়াতাতের’ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘কাউকে তোমরা হ্যরত লুত (আঃ)-এর কওমের কাজ করতে দেখলে তাকে এবং যার উপরে সে সেই কাজ করেছে তাকেও হত্যা করে ফেল।’

এরপর বলা হচ্ছে- ‘যদি তারা উভয়ে এ কাজ হতে বিরত থাকে এবং সংশোধিত হয় তবে তোমরা তাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করো না। কেননা, পাপ হতে প্রত্যাবর্তনকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির মতই।’

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-‘আল্লাহ তা'ওবা কবূলকারী, করুণাময়।’ সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যখন তোমাদের কারও দাসী ব্যভিচার করে তখন যেন সে তাকে চাবুক দ্বারা শাস্তি প্রদান করে এবং তার উপর আর যেন কোন শাসন গর্জন না করে।’ অর্থাৎ শাস্তি প্রদানের পর মনিব যেন তার দাসীকে আর কোন দোষারোপ না করে। কেননা, শাস্তি প্রদানই হচ্ছে পাপ মোচনের উপায়।

১৭। তাওবা কবুল করার দায়িত্ব  
যে আল্লাহর উপর রয়েছে তা  
তো শুধু তাদেরই জন্যে যারা  
অজ্ঞতা বশতঃ পাপ করে  
থাকে, তৎপর অবিলম্বে ক্ষমা  
প্রার্থনা করে; সুতরাং আল্লাহ  
তাদেরকেই ক্ষমা করবেন;  
আল্লাহ মহা জ্ঞানী  
বিজ্ঞানময় ।

১৮। আর তাদের জন্যে ক্ষমা  
নেই যারা ঐ পর্যন্ত পাপ  
করতে থাকে-যখন তাদের  
কারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত  
হয় তখন বলে, নিচয়ই আমি  
এখন ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং  
তাদের জন্যও নয় যারা  
অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুমুখে  
পতিত হয়েছে; তাদেরই জন্যে  
আমি বেদনাদায়ক শান্তি  
প্রস্তুত করে রেখেছি ।

ভাবার্থ এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর ঐ বান্দাদের তাওবা কবুল করে থাকেন  
যারা অজ্ঞানতা বশতঃ কোন খারাপ কাজ করে বসে, অতঃপর তাওবা করে,  
যদিও এ তাওবা মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখার পরেও গড়গড়ার পূর্বে হয় । হ্যরত  
মুজাহিদ (রঃ) প্রভৃতি মনীষী বলেন, ইচ্ছেপূর্বকই হোক আর ভুল বশতঃই হোক  
যে কেউই আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয় সেই অজ্ঞ, যে পর্যন্ত না সে তা হতে  
বিরত হয় ।'

হ্যরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেনঃ সাহাবা-ই-কিরাম বলতেন, 'বান্দা যে  
পাপ করে তা অজ্ঞতা বশতঃই করে ।' হ্যরত কাতাদাও (রঃ) সাহাবীদের একটি

১৭- إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ  
لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّوْءَ  
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ  
فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

১৮- وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ  
يَعْمَلُونَ السِّيَّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا  
حَضَرَ أَهْدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ  
إِنِّي تَبَتَّلْتُ إِلَيْنَاهُ وَلَا إِلَّا  
يَمْوَتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أَوْ لَيْكَ  
اعْتَدْنَا لَهُمْ عِذَابًا أَلِيمًا

দল হতে অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। হ্যরত আতা' (রঃ) এবং হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত আছে। অবিলম্বে তাওবা করে নেয়ার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে যে, মরণের ফেরেশতাকে দেখে নেয়ার পূর্বে মৃত্যু যন্ত্রণার সময়কে 'অবিলম্বে' বলা হয়েছে। সুস্থ থাকার সময় তাওবা করা উচিত। গড়গড়ার সময়ের পূর্বে তাওবা করলে সেই তাওবা গৃহীত হয়ে থাকে। হ্যরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, দুনিয়ার সমস্তই নিকটেই বটে। এ সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে।

(১) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের তাওবা কবূল করে থাকেন যে পর্যন্ত না গড়গড়া উপস্থিত হয়।' (জামেউত্ তিরমিয়ী) ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

(২) হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ 'যে কোন বান্দা তার মৃত্যুর এক মাস পূর্বেও তাওবা করে, তার তাওবা আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করে থাকেন, এমনকি তার পরেও বরং মৃত্যুর এক দিন পূর্বে হলেও, এমনকি এক ঘন্টা পূর্বে হলেও। যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে ও সত্যতার (সততার) সাথে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে, তিনি তার তাওবা কবূল করে থাকেন।'

(৩) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ 'যে ব্যক্তি তার মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তাওবা করে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাগ্রহণ করে থাকেন। আর যে এক মাস পূর্বে তাওবা করে তার তাওবাও আল্লাহ পাক কবূল করে থাকেন এবং যে এক সঞ্চাহ পূর্বে তাওবা করে তার তাওবাও তিনি গ্রহণ করেন। আর যে একদিন পূর্বে তাওবা করে তার তাওবাও গৃহীত হয়ে থাকে।' এটা শুনে হ্যরত আইয়ুব (রঃ) এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট যা শুনেছি তাই বলছি।'

(৪) মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, চারজন সাহাবী একত্রিত হন। তাঁদের মধ্যে একজন বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট শুনেছিঃ 'যে ব্যক্তি তার মৃত্যুর একদিন পূর্বেও তাওবা করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাও কবূল করে থাকেন।' অন্য একজন জিজ্ঞেস করেনঃ 'সত্যই কি আপনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে শুনেছেন?' তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ।' তখন ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে শুনেছিঃ 'যদি অর্ধদিন পূর্বেও তাওবা করে তবে সেই তাওবাও আল্লাহ তা'আলা কবূল করে থাকেন।'

তৃতীয়জন বলেনঃ ‘তুমি কি এটা শুনেছো?’ তিনি বলেনঃ ‘হ্যাঁ’, আমি স্বয়ং শুনেছি।’ তিনি বলেনঃ ‘আমি তো শুনেছিঃ ‘যদি এক প্রহর পূর্বেও তাওবা করার সৌভাগ্য হয় তবে সেই তাওবাও গৃহীত হয়ে থাকে।’ চতুর্থ ব্যক্তি বলেনঃ ‘আপনি এটা শুনেছেন?’ তিনি বলেনঃ ‘হ্যাঁ।’ তিনি বলেনঃ ‘আমি তো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এমন পর্যন্ত শুনেছিঃ ‘যে পর্যন্ত তার গড়গড়া উপস্থিতি না হয় সে পর্যন্ত তার জন্যে তাওবার দরজা খোলা থাকে।’

(৫) তাফসীর-ই-ইবনে মিরান্দুয়াই-এর মধ্যে রয়েছে, হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে পর্যন্ত গড়গড়া আরঞ্জ না হয় সে পর্যন্ত তাওবা কবৃল হয়ে থাকে।’ কয়েকটি মুরসাল হাদীসেও এ বিষয়টি রয়েছে। হ্যরত আবু কালাবা (রঃ) বলেন যে, যখন আল্লাহ তা‘আলা ইবলিসের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেন তখন সে অবকাশ চেয়ে বলেঃ ‘আপনার সম্মান ও মর্যাদার শপথ! আদম সন্তানের অন্তরে যে পর্যন্ত আজ্ঞা থাকবে সে পর্যন্ত আমি তার অন্তর হতে বের হবো না।’ আল্লাহ তা‘আলা তখন উত্তরে বলেনঃ ‘আমিও আমার সম্মান ও মর্যাদার শপথ করে বলছি যে, যে পর্যন্ত তার দেহে আজ্ঞা থাকবে সে পর্যন্ত আমি তার তাওবা কবৃল করবো।’ একটি মারফুৎ হাদীসেও এর কাছাকাছি বর্ণিত আছে। সুতরাং এ সমুদয় হাদীস দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, বান্দা যে পর্যন্ত জীবিত রয়েছে এবং তার জীবনের আশা আছে সে পর্যন্ত যদি সে আল্লাহ তা‘আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাওবা করে তবে আল্লাহ তা‘আলা তার তাওবা কবৃল করে থাকেন ও তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হন। আল্লাহ তা‘আলা মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

তবে হ্যাঁ, যখন সে জীবন হতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে, মৃত্যুর ফেরেশতা তাকে দেখতে পাবে এবং আজ্ঞা দেহ হতে বেরিয়ে কষ্টনালীতে পৌছে যাবে এবং গড়গড়া শুরু হয়ে যাবে তখন তার তাওবা গৃহীত হয় না। এ জন্যেও আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “জীবন ভর যে পাপ কর্যে লিঙ্ঘ থাকে এবং মৃত্যু অবলোকন করে বলে, ‘এখন আমি তাওবা করছি।’ এরূপ লোকের তাওবা গৃহীত হয় না।” যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে-

فَلَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا قَالُوا أَمْنًا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

(দুই আয়াত পর্যন্ত) তাৰার্থ এই যে, আমার শাস্তি দেখে নেয়ার পর ঈমানের স্বীকারোক্তি কোন উপকারে আসবে না। (৪০: ৮৪)

অন্য জায়গায় রয়েছে— **بَوْمَ يَاتِي بَعْضُ أَيْتِ رَبِّكَ** ভাবার্থ এই যে, যখন মানুষ সূর্যকে পশ্চিম দিকে উদিত হতে দেখবে তখন যে কেউ ঈমান আনয়ন করবে বা সৎকার্য সম্পাদন করবে তার সে সৎকাজ বা ঈমান কোন উপকারে আসবে না। (৬৪: ১৫৮)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘যারা কুফ্র ও শিরকের উপর মৃত্যু বরণ করে তাদেরও তাওবায় কোন উপকার হবে না, তাদের নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ বা বিনিময়ও নেয়া হবে না। যদিও তারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ দেবারও ইচ্ছে প্রকাশ করে।’ হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মহাপুরুষ বলেন যে, এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের তাওবা কবুল করে থাকেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন যে পর্যন্ত পর্দা পড়ে না যায়’।

তাঁকে তখন জিজ্ঞেস করা হয়, ‘পর্দা পড়ে যাওয়ার অর্থ কি?’ তিনি বলেনঃ ‘শিরকের অবস্থায় প্রাণ বহিগত হওয়া। এরূপ লোকদের জন্যেই আল্লাহ তা'আলা চিরস্থায়ী বেদনাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন।’

## ১৯। হে মুমিনগণ! এটা

তোমাদের জন্যে বৈধ নয় যে,  
তোমরা বলপূর্বক নারীদের  
উত্তরাধিকারী হও; এবং  
প্রকাশ্য অশ্লীলতা ব্যতীত  
তোমরা তাদেরকে যা প্রদান  
করেছ, তার কিয়দংশ গ্রহণের  
জন্যে তাদেরকে প্রতিরোধ  
করো না এবং তাদের সাথে  
সঙ্গাবে অবস্থান কর; কিন্তু  
যদি অরুচি অনুভব কর তবে  
তোমরা যে বিষয় দৃষ্টিত মনে  
কর আল্লাহ সেটাকে থচুর  
কল্যাণকর করতে পারেন।

— ۱۹ —  
يَا يَاهَا الَّذِينَ امْنَوْا  
لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا  
النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِعَضِ مَا  
أَتَتْهُمْ وَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَاتِيَنَّ  
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاسِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ فِيَانَ كَرِهُتُمُوهُنَّ  
فَعَسَى أَنْ تَكْرِهُوْا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

২০। আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছে কর এবং তাদের একজনকে রাশি রাশি ধন প্রদান করে থাক, তবে তোমরা তন্মধ্য হতে কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না; তবে কি তোমরা অপবাদ প্রয়োগ এবং প্রকাশ্য পাপ করে সেটা গ্রহণ করবে?

২১। এবং কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে? বস্তুতঃ তোমরা পরম্পর একে অন্যের নিকট উপস্থিত হয়েছিলে এবং তারা তোমাদের নিকট সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল।

২২। আর যা বিগত হয়েছে তদ্ব্যতীত তোমাদের পিতৃগণ নারীকূলের মধ্যে যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না; নিশ্চয়ই এটা অশুল ও অরুচিকর এবং নিকৃষ্টতর পন্থা।

সহীহ বুখারীর মধ্যে রয়েছে, হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন, কোন লোক মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীকে তার স্ত্রীর পূর্ণ দাবীদার মনে করা হতো। সে ইচ্ছে করলে তাকে নিজেই বিয়ে করে নিতো, ইচ্ছে করলে অন্যের সাথে বিয়ে দিয়ে দিতো, আবার ইচ্ছে করলে তাকে বিয়ে করতেই দিতো না। ঐ স্ত্রীলোকটির আঙ্গীয়-স্বজন অপেক্ষা এ লোকটিকেই তার বেশী হকদার মনে করা হতো। অঙ্গতা যুগের এ জগন্য প্রথার বিরুদ্ধে এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়।

٤- وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتِبْدَالَ زَوْجٍ  
مَكَانَ زَوْجٍ وَأَتِيمٌ إِحْدَاهُنَّ  
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  
أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتَانًا وَإِثْمًا  
مِنْنَا

٢١- وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ  
أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ  
وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ مِيشاقًا غَلِيظًا

٢٢- وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ  
إِبْرَاهِيمَ وَمَوْلَانَاهُ  
أَبْاءَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا  
قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً  
وَمَقْتَأَ وَسَاءَ سَبِيلًا

(৩)  
(৫)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, মানুষ ঐ স্ত্রীলোকটিকে বাধ্য করতো যে, সে যেন মোহরের দাবী পরিত্যাগ করে কিংবা সে যেন আর বিয়েই না করে। এও বর্ণিত আছে যে, কোন স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে একটি লোক এসে ঐ স্ত্রীর উপর একখানা কাপড় নিষ্কেপ করতো এবং ঐ লোকটিকেই ঐ স্ত্রীলোকটির দাবীদার মনে করা হতো। এটাও বর্ণিত আছে যে, ঐ স্ত্রীলোকটি সুন্দরী হলে ঐ কাপড় নিষ্কেপকারী ব্যক্তি তাকে বিয়ে করে নিতো এবং বিশ্রী হলে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে বিধবা অবস্থাতেই রেখে দিতো। অতঃপর সে তার উত্তরাধিকারী হয়ে যেতো। এও বর্ণিত আছে যে, ঐ মৃত ব্যক্তির অন্তরঙ্গ বন্ধু ঐ স্ত্রীর উপর কাপড় নিষ্কেপ করতো। অতঃপর ঐ স্ত্রী তাকে কিছু মুক্তিপণ বা বিনিময় প্রদান করলে সে তাকে বিয়ে করার অনুমতি দিতো, নচেৎ সে আজীবন বিধবাই থেকে যেতো।

হ্যরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) বলেন, মদীনাবাসীদের প্রথা ছিল এই যে, কোন লোক মারা গেলে যে ব্যক্তি তার মালের উত্তরাধিকারী হতো সে তার স্ত্রীও উত্তরাধিকারী হতো। তারা স্ত্রীলোকদের সাথে অত্যন্ত জর্ঘন্য ব্যবহার করতো। এমনকি তালাক প্রদানের সময়েও তাদের সাথে শর্ত করতো যে, তারা নিজেদের ইচ্ছেমত তাদের বিয়ে দেবে। এ প্রকারের বন্দীত্ব হতে মুক্ত হওয়ার এ পদ্ধা বের করা হয়েছিল যে, ঐ নারীগণ ঐ পুরুষ লোকদেরকে মুক্তিপণ স্বরূপ কিছু প্রদান করতো। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্যে এটা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, আবু কায়েস ইবনে আসলাত মারা গেলে তার পুত্র অজ্ঞতা যুগের প্রথা অনুযায়ী তার স্ত্রীকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। হ্যরত আতা' (রঃ) বলেন যে, অজ্ঞতার যুগে মানুষ মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে কোন একটি শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ কাজে লাগিয়ে দিতো। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যখন কোন লোক মারা যেতো তখন তার পুত্রকেই তার স্ত্রীর বেশী হকদার মনে করা হতো। সে ইচ্ছে করলে নিজেই তার বিমাতাকে বিয়ে করতো বা ইচ্ছেমত আতা, আতুপ্পুত্র কিংবা অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতো।

হ্যরত ইকরামা (রঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, আবু কায়েসের ঐ স্ত্রীর নাম ছিল উম্মে কাবীশাহ (রাঃ)। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ঐ সংবাদ প্রদান করে বলেন, এ লোকগুলো না আমাকে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গণ্য করে আমার স্বামীর মীরাস প্রদান করছে, না আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে যে আমি অন্য কারও

সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি। সে সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, কাপড় নিক্ষেপের পূর্বেই যদি মৃত ব্যক্তির স্ত্রী পালিয়ে গিয়ে তার পিত্রালয়ে চলে যেতো তবে সে মুক্তি পেয়ে যেতো।

হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যার নিকট কোন পিতৃহীনা বালিকা থাকতো তাকে সে আটক রাখতো এ আশায় যে, তার স্ত্রী মারা গেলে সে তাকে বিয়ে করবে কিংবা তার পুত্রের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দেবে। এসব কথার দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এ আয়াত দ্বারা এসব কুপ্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং স্ত্রীলোকদেরকে এসব বিপদ হতে রক্ষা করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন- ‘স্ত্রীদের বাসস্থানকে সংকীর্ণ করতঃ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে বাধ্য করো না যে, তারা যেন সমস্ত মোহর বা মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দেয় বা তাদের অবশ্য প্রাপ্য কোন হক পরিত্যাগ করে। কেননা, তাদেরকে শাসন গর্জন করে এই কাজে বাধ্য করা হচ্ছে।

হ্যরত ইবনে আবুস রাও (রাঃ) বলেন, ‘এর ভাবার্থ এই “যে, স্ত্রী পছন্দ হচ্ছে না, তার সাথে মনোমালিন্য হচ্ছে, কাজেই তাকে ছেড়ে দিতে চায়। কিন্তু ছেড়ে দিলে মোহর ইত্যাদি সমস্ত হক পুরোপুরি দিতে হবে। এর থেকে বাঁচবার জন্যে স্ত্রীকে কষ্ট দিচ্ছে এবং তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে, যেন সে নিজেই বাধ্য হয়ে সমস্ত প্রাপ্য ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।’

আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে এসব জঘন্য প্রথা হতে বিরত রাখেন। ইবনে সালমানী (রাঃ) বলেন, ‘এ আয়াত দু'টির মধ্যে প্রথম আয়াতটি অজ্ঞতা যুগের প্রথাকে উঠিয়ে দেয়ার জন্যে এবং দ্বিতীয় আয়াতটি ইসলামী রীতির সংশোধনের জন্যে অবতীর্ণ হয়। ইবনে মুবারকও (রাঃ) এটাই বলেন।

এরপর বলা হচ্ছে-‘কিন্তু যদি তাদের দ্বারা প্রকাশ্য অশ্লীলতা প্রকাশ পায়।’ সাহাবী ও তাবেঙ্গণের অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে প্রকাশ্য অশ্লীলতার ভাবার্থ হচ্ছে ব্যভিচার। অর্থাৎ সে সময় তাদের নিকট হতে মোহর ফিরিয়ে নেয়া বৈধ। সে সময় তাদের জীবনকে সঙ্কটময় করে তোলা উচিত, যেন তারা খোলা করে নিতে বাধ্য হয়ে পড়ে।’ যেমন সূরা-ই-বাকারার মধ্যে রয়েছে- ‘তোমাদের জন্যে বৈধ নয় যে, তাদেরকে প্রদত্ত মোহর হতে তোমরা কিছু গ্রহণ কর, কিন্তু শুধু সেই সময় পার যখন তাদের উভয়ের আল্লাহর সীমা ঠিক রাখতে না পারার ভয় হবে।’ কারও কারও মতে <sup>فَاحْشَةً مُّبِينَ</sup>-এর ভাবার্থ হচ্ছে স্বামীর

বিরুদ্ধাচরণ করা, তার অবাধ্য হওয়া, তার সাথে ঝুঁট ব্যবহার করা, তার হক পুরোপুরি আদায় না করা ইত্যাদি।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, আয়াতের শব্দগুলো সাধারণ, এর মধ্যে ব্যতিচারও রয়েছে এবং এ আচরণও রয়েছে। অর্থাৎ এ সর্বাবস্থায় স্বামীর জন্যে স্ত্রীর জীবন সংকটপূর্ণ করে তোলা বৈধ, যেন সে তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেয় ও পরে তাকে পৃথক করে দেয়। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর একথা খুবই যুক্তিযুক্ত। ইতিপূর্বে এটা ও বর্ণিত হয়েছে যে, এ পর্যন্ত এ আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা যুগের ঐ কুপ্রথাগুলো যা হতে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এ পূর্ণ বর্ণনা ইসলাম দ্বারা অজ্ঞতা যুগের প্রথাগুলোকে সরিয়ে দেয়ার জন্যেই দেয়া হয়েছে।

ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন, ‘মক্কার কুরাইশদের মধ্যে এ প্রথা চালু ছিল যে, কোন লোক কোন ভদ্র মহিলাকে বিয়ে করতো। অতঃপর তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হলে স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদান করতো। কিন্তু এ শর্ত করতো যে, স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া অন্য জায়গায় বিয়ে করতে পারবে না। একথার উপর সাক্ষী নির্ধারণ করতো এবং চুক্তিপত্র লিখে নেয়া হতো। তখন কোন জায়গা হতে বিয়ের গয়গাম এলে স্ত্রী যদি সে বিয়েতে সম্মত হতো তবে তার পূর্ব স্বামী বলতো, তুমি যদি আমাকে এত টাকা দাও তবে তোমাকে বিয়ের অনুমতি প্রদান করবো। স্ত্রী সম্মত হলে তো ভালই, নচেৎ তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে দেয়া হতো না। ওর নিষিদ্ধতা ঘোষণায় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।’ মুজাহিদ (রঃ)-এর কথামত, এ নির্দেশ এবং সূরা-ই-বাকারার আয়াতের নির্দেশ একই।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন—‘তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সঙ্গাবে অবস্থান কর, তাদের সাথে ন্যূন ব্যবহার কর। সাধ্যানুযায়ী নিজের অবস্থাও ভাল রাখ। তোমরা যেমন চাও যে, তোমাদের স্ত্রীরা উত্তম সাজে সুসজ্জিতা থাকুক, তদুপ তোমরাও তাদের মনস্তুষ্টির জন্য নিজেদেরকে সুন্দর সাজে সজ্জিত রাখ।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে—

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থাৎ ‘সঙ্গাবে যেমন তোমাদের অধিকার তাদের উপর রয়েছে তেমনই তাদের অধিকারও তোমাদের উপর রয়েছে।’ (২৪২৮) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোন্নম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে সর্বোন্নম ব্যবহারকারী হয়। আমি আমার সহধর্মীদের সাথে খুবই উত্তম ব্যবহার করে থাকি।’

রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় পত্নীদের সাথে অত্যন্ত নম্র ব্যবহার করতেন, তাঁদের সাথে হাসি মুখে কথা বলতেন, তাঁদেরকে সদা খুশী রাখতেন, মনোমুক্তকর কথা বলতেন, তাঁদের অন্তর তিনি স্বীয় মুষ্টির মধ্যে রাখতেন, তাঁদের জন্যে উত্তম খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতেন, প্রশান্ত মনে তাঁদের উপর খরচ করতেন এবং মাঝে মাঝে তিনি এমন কথাও বলতেন যে, তাঁরা হেসে উঠতেন। এমনও ঘটেছে যে, তিনি উশুল মুমিনীন হ্যরত আয়েশা (রঃ)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। সে দৌড়ে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) আগে বেড়ে যান। কিছু দিন পর আবার দৌড় প্রতিযোগিতা হলে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) পিছনে পড়ে যান। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘শোধ বোধ হয়ে গেল।’ এর দ্বারাও তার উদ্দেশ্য ছিল হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-কে সন্তুষ্ট রাখা।

যে পত্নীর ঘরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রাত্রি যাপনের পালা পড়তো তথায় তাঁর সমস্ত সহধর্মীগণ একত্রিত হতেন। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতেন, আলাপ আলোচনা হতো এবং মাঝে মাঝে এমনও হতো “যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের সাথে রাত্রের খাবার খেতেন। অতঃপর তাঁরা নিজ নিজ ঘরে চলে যেতেন এবং তিনি তথায়ই রাত্রি যাপন করতেন। স্বীয় সহধর্মীর সাথে একই চাদরে শয়ন করতেন, জামা খুলে ফেলতেন, শুধু লুঙ্গি পরে থাকতেন। ইশার নামায়ের পর ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ একথা সেকথা বলতেন যেন সহধর্মীদের মন খুশী হয়। মোটকথা তিনি স্ত্রীদেরকে অত্যন্ত ভালবাসার সাথে রাখতেন। সুতরাং মুসলমানদেরও স্ত্রীদের সাথে প্রেম-গ্রীতি বজায় রাখা উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন—‘আমার নবী (সঃ)-এর অনুসরণেই তোমাদের মঙ্গল রয়েছে।’ এর বিষ্ণারিত আহকাম বর্ণনার জায়গা তাফসীর নয় বরং ওর জন্য ঐ বিষয়েরই অস্ত্ররাজি রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ “মন না চাইলেও স্ত্রীদের বাসস্থানের সুবন্দোবন্ত করার মধ্যেই এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, ওর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বড় রকমের মঙ্গল দান করেন। হয় তো তাদের উদরে সৎ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং তাদের দ্বারা আল্লাহ পাক উত্তম সৌভাগ্যের অধিকারী করবেন।” বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “মুমিন পুরুষ যেন মুমিন স্ত্রীকে পৃথক করে না দেয়। যদি সে তার একটি আধিচ কথায় অসন্তুষ্ট হয় তবে সে স্ত্রী তার কোন ব্যবহার দ্বারা সন্তুষ্টও করবে।”

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—‘তোমাদের কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ইচ্ছে করে এবং তার স্থানে অন্যকে স্ত্রীরূপে প্রাহ্লণ করতে চায় তবে সে

যেন তার স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহর হতে কিছুই ফিরিয়ে না দেয়, যদিও তাকে প্রচুর মাল প্রদান করে থাকে'। সূরাঃ আলে ইমরানের মধ্যে قِنْطَارًا<sup>۱</sup> শব্দের তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। সুতরাঃ এখানে পুনরাবৃত্তির কোন আবশ্যকতা নেই। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, স্ত্রীকে মোহর হিসেবে প্রচুর মাল প্রদান করাও বৈধ। হ্যরত উমার (রাঃ) প্রথমে প্রচুর মোহর হতে নিষেধ করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর সে কথা ফিরিয়ে নেন।

যেমন মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, তিনি বলেছিলেনঃ ‘তোমরা মোহর নির্ধারণের ব্যাপারে বাড়াবাঢ়ি করো না। যদি এটা পার্থিব ব্যাপারে কোন ভাল জিনিস হতো বা আল্লাহ তা’আলার নিকট মুত্তাকী পরিচয়ের কাজ হতো তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-ই সর্ব প্রথম ওর উপর আমল করতেন। তিনি তো তাঁর কোন স্ত্রীর বা কন্যার মোহর বারো আওকিয়্যার (প্রায় একশ পঁচিশ টাকা) বেশী করেননি। মানুষ অতিরিক্ত মোহর বেঁধে বিপদে পড়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রী তার উপর বোৰা স্বরূপ হয়ে যায় এবং তার অন্তরে তার প্রতি শক্রতার সৃষ্টি হয়। সে তখন স্ত্রীকে বলে, ‘তুমি আমার ক্ষেক্ষ মোশক ঝুলিয়ে দিয়েছ।’

এ হাদীসটি বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হ্যরত উমার (রাঃ) নবী (সঃ)-এর মিস্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে বলেন, ‘হে জনমগুলী! তোমরা লম্বা চওড়া মোহর বাঁধতে আরম্ভ করলে কেন? রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সহচরবর্গ তো চারশ দিরহামের (প্রায় একশ টাকা) বেশী মোহর করেননি। এটা যদি অধিক মুত্তাকী হওয়া এবং দানশীলতার কাজ হতো তবে তোমরা ওর দিকে অগ্রগামী হতে না। সাবধান! আজ হতে আমি যেন শুনতে না পাই যে কেউ চারশ দিরহামের বেশী মোহর নির্ধারণ করেছ।’ এ কথা বলে নীচে নেমে আসেন তখন একজন কুরাইশ রমণী সম্মুখে এসে তাঁকে বলেনঃ ‘হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি জনগণকে চারশ দিরহামের বেশী মোহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন?’ তিনি বলেনঃ হ্যাঁ। তখন স্ত্রীলোকটি বলেন, ‘আল্লাহ তা’আলা যে কালাম অবতীর্ণ করেছেন তা কি আপনি শুনেননি?’ তিনি বলেন, ‘ঐ কালাম কি?’ স্ত্রীলোকটি বলেন, ‘শুনুন, আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

وَاتَّبِعُمْ أَحَدَهُنَّ - قِنْطَارًا<sup>۱</sup>

অর্থাৎ ‘এবং তোমরা তাদের কাউকে বিপুল ধনরাশি দিয়ে থাক’। হ্যরত উমার (রাঃ) তখন বলেনঃ ‘হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। উমার (রাঃ) হতে তো প্রত্যেকেই বেশী জানে।’ অতঃপর তিনি ফিরে যান এবং তৎক্ষণাৎ

মিস্বরের উপর উঠে জনগণকে সম্মোধন করে বলেনঃ ‘হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে চারশ দিরহামের বেশী মোহর দিতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন বলছি যে, যে কোন লোক তার মাল হতে ইচ্ছেমত মোহর নির্ধারণ করতে পারে। আমি বাধা দেব না।’

অন্য একটি বর্ণনায় ঐ স্ত্রীলোকটির আয়াতটিকে নিম্নরূপ পাঠ করার কথা বর্ণিত আছেঃ

وَاتْسِمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ

অর্থাৎ ‘এবং তোমরা তাদেরকে প্রচুর স্বর্গ প্রদান করে থাক।’ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর পঠনেও এরপই বর্ণিত আছে এবং ‘উমারের উপর একটি স্ত্রীলোক বিজয় লাভ করলো’ হ্যরত উমার (রাঃ)-এর এ উক্তিও বর্ণিত আছে।

একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ ‘যদিও বিল কিস্সা অর্থাৎ ইয়াযিদ ইবনে হুসাইন হারেসীরও, মেয়ে হয় তথাপি তারও মোহর বেশী নির্ধারণ করো না। আর তোমরা যদি এরপ কর তবে ঐ অতিরিক্ত অংক বায়তুল মালে জমা করে নেবো।’ তখন এক দীর্ঘ দেহ ও চওড়া নাক বিশিষ্টা স্ত্রীলোক বলেনঃ ‘জনাব! আপনি এ কথা বলতে পারেন না।’ তখন হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ ‘কেন?’ তিনি বলেনঃ ‘যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা বলেছেনঃ -وَاتْسِمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا- তখন হ্যরত উমার (রাঃ) বলেন, ‘স্ত্রীলোকটি ঠিক বলেছে এবং পুরুষ লোকটি ভুল করেছে।’

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন- ‘তোমাদের স্ত্রীদেরকে প্রদত্ত মোহর তোমরা কিরণে ফিরিয়ে নেবে? অথচ তোমরা তাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছ, অযোজন মিটিয়েছ, তারা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং তোমারা তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছ। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।’

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের ঐ হাদীসে রয়েছে যার মধ্যে একটি লোকের তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ পেশ করার কথা বর্ণিত আছে, অতঃপর তাদের উভয়ের শপথ গ্রহণ তার পরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উক্তিঃ ‘তোমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তা আল্লাহ তা‘আলা ভালভাবেই জানেন। তোমাদের মধ্যে কেউ এখনও তাওবা করছে কি?’ তিনি এ কথা তিনবার বলেন। তখন পুরুষ লোকটি বলে, ‘তার মোহর সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ ‘ওর বিনিময়েই তো সে তোমার জন্য বৈধ হয়েছিল। এখন যদি তুমি তার উপর মিথ্যে অপবাদ দিয়ে থাক তবে তো এটা আরও বহু দূরের কথা।’

অনুরূপভাবে আরও একটি হাদীসে রয়েছে যে, হ্যরত নায়রা (রাঃ) একটি কুমারীকে বিয়ে করেন। তার সাথে মিলিত হতে গিয়ে তিনি দেখেন যে, সে ব্যভিচার দ্বারা গভর্বতী হয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এটা বর্ণনা করলে তিনি তাকে পৃথক করিয়ে দেন এবং হ্যরত নায়রা (রাঃ)-কে মোহর দিয়ে দিতে বলেন এবং স্ত্রীকে চাবুক মারার নির্দেশ দেন এবং বলেনঃ ‘যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সে তোমার গোলাম হবে এবং মোহর তো তাকে বৈধ করার কারণ ছিল।’ (সুনান-ই-আবি দাউদ)

মোটকথা আয়াতের ভাবার্থ এই যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিলন হয়েই গেছে। সুতরাং এখন মোহর ফিরিয়ে নেয়ার কোন অর্থ থাকে না। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন-বিবাহ বন্ধন হচ্ছে একটা দৃঢ় অঙ্গীকার যার মধ্যে তোমরা আবদ্ধ হয়েছ। তোমরা মহান আল্লাহর এ নির্দেশ শুনেছঃ ‘তোমরা তাদেরকে বন্ধনে রাখলে ভালভাবে রাখ, আর পরিত্যাগ করলে উত্তম পস্তায় পরিত্যাগ কর।’ হাদীস শরীফেও রয়েছেঃ ‘তোমরা স্ত্রীদেরকে আল্লাহর আমানত দ্বারা গ্রহণ করে থাক এবং তাদেরকে আল্লাহর কালেমা দ্বারা নিজেদের জন্যে বৈধ করে থাক।’ অর্থাৎ বিবাহের খুৎবার সাক্ষ্য দ্বারা তাদেরকে হালাল করে থাক।

মিরাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে যেসব দানে ভূষিত করা হয়েছিল তন্মধ্যে একটি এও ছিল যে, তাঁকে বলা হয়েছিল-‘তোমার উম্মতের কোন ভাষণই বৈধ নয় যে পর্যন্ত না সে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তুমি আমার বান্দা এবং রাসূল।’ (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম) সহীহ মুসলিম শরীফে হ্যরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেনঃ ‘তোমরা স্ত্রীদেরকে আল্লাহর আমানতরূপে গ্রহণ করেছ এবং তাদেরকে আল্লাহর কালেমা দ্বারা হালাল করেছ।’

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বিমাতাকে বিয়ে করার অবৈধতা বর্ণনা করতঃ তার সম্মান ও মর্যাদার কথা প্রকাশ করেছেন। এমনকি বাপ হয়তো শুধু বিয়েই করেছে, এখনও মা পিতালয় হতে বিদায় হয়েও আসেনি। এমতাবস্থায় তার তালাক হয়ে গেল বা পিতা মারা গেল তথাপিও ঐ স্ত্রী তার ছেলের উপর হারাম হয়ে যাবে। এর উপর ইজমা হয়ে গেছে। হ্যরত আবু কায়েশ (রাঃ) যিনি একজন বড় মর্যাদা সম্পন্ন আনসারী সাহাবী ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কায়েস তাঁর স্ত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, অথচ তিনি তার বিমাতা ছিলেন। তখন তার বিমাতা তাকে বলেন, ‘তুমি তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন সৎ লোক।

কিন্তু আমি তোমাকে আমার ছেলেরূপ গণ্য করে থাকি। আচ্ছা, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট যাচ্ছি।'

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে তিনি (পুত্রের বিমাতা) সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ 'তুমি বাড়ী ফিরে যাও।' অতঃপর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়-'যাকে বাপ বিয়ে করেছে তাকে বিয়ে করা পুত্রের জন্য হারাম।' এ ধরনের আরও বহু ঘটনা সে সময় বিদ্যমান ছিল যাদেরকে এ কামনা হতে বিরত রাখা হয়েছিল। এক তো হলো এ আবু কায়েশ (রাঃ)-এর ঘটনা। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল উষ্মে উবাইদিল্লাহ যামরা' (রাঃ)।

দ্বিতীয় ঘটনা ছিল হ্যরত খালাফ (রাঃ)-এর যাঁর ঘরে হ্যরত আবু তালহা (রাঃ)-এর কন্যা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে সাফওয়ান তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছে করেছিল। হ্যরত সাহিলী (রাঃ) বলেন যে, অঙ্ককার যুগে একপ বিয়ে চালু ছিল এবং সেটাকে নিয়মিত বিয়ে মনে করা হতো ও সম্পূর্ণ হালাল বলে গণ্য করা হতো। এ জন্যেই এখানেও বলা হচ্ছে-'আতীতে যা হয়েছে তা হয়েছেই।' যেমন দু'বোনকে একত্রে বিয়ে করার অবৈধতার কথা বর্ণনা করার পর এটাই বলা হয়েছে। কিনানা ইবনে খুয়াইমাও এ কাজ করেছিল অর্থাৎ স্বীয় পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল। তার গভেই নায়ারের জন্য হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘোষণা বিদ্যমান রয়েছেঃ 'আমার উপরের বংশের উৎপত্তিও বিয়ের দ্বারাতেই হয়েছে ব্যাভিচারের দ্বারা নয়।' তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, এ প্রথা তাদের মধ্যে বরাবরই চালু ছিল, বৈধ ছিল এবং বিবাহ বলে গণ্য ছিল।

হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) বলেন যে, যে আম্বায়কে (বিয়ে করা) আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন ঐ সবকে অজ্ঞতা যুগের লোকেরাও হারাম বলে জানতো। শুধুমাত্র বিমাতা ও দু'বোনকে এক সাথে বিয়ে করাকে তারা হালাল মনে করতো। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকের মধ্যে এদেরকেও হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। হ্যরত আতা' (রঃ) এবং হ্যরত কাতাদাহও (রঃ) এটাই বলেন।

এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, সাহিলী (রাঃ) কিনানার যে ঘটনাটি নকল করেছেন তা চিন্তা ও বিবেচনার বিষয়-সম্পূর্ণরূপে সঠিক নয়। যা হোক, এ সম্বন্ধে এ উম্মতের উপর সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং এটা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। এমনকি আল্লাহ পাক বলেন যে, নিশ্চয়ই এটা অশ্রীল ও অরুচিকর এবং নিকৃষ্টতর পন্থা।

অন্য জায়গায় ঘোষিত হচ্ছে—‘তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেয়ো না, নিশ্চয়ই এটা অশুলি কাজ ও নিকৃষ্টতর পস্তা।’ এখানে ওর চেয়েও বেশী বলেছেন যে, এটা অরুচিকরও বটে। অর্থাৎ এটা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও জঘন্য কাজ। এর ফলে পিতা ও পুত্রের মধ্যে শক্রতার সৃষ্টি হয়। এটা সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে সে তার পূর্ব স্বামীর প্রতি শক্রতাই পোষণ করে থাকে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহধর্মীগণকে মুমিনদের মা রূপে গণ্য করা হয়েছে এবং উম্মতের উপর মা দের মতই তাঁদেরকেও হারাম করা হয়েছে। কেননা, তাঁরা নবী (সঃ)-এর সহধর্মী, আর তিনি স্বীয় উম্মতের পিতার মতই। এমনকি ইজমা দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, তাঁর হক বাপ দাদার হকের চাইতেও বেশী। বরং তাঁর প্রতি ভালবাসাকে জীবনের প্রতি ভালবাসার উপরেও স্থান দেয়া হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে, একাজ আল্লাহ তা‘আলার অস্তুষ্টির কারণ এবং অতি নিকৃষ্ট পস্তা। সুতরাং যে একাজ করে সে ধর্মত্যাগীর মধ্যে গণ্য। কাজেই তাকে হত্যা করা হবে এবং তার মাল ‘ফাই’<sup>১</sup> হিসেবে বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হবে।

সুনান ও মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একজন সাহাবীকে ঐ ব্যক্তির দিকে প্রেরণ করেন যে তার পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল। উক্ত সাহাবীর প্রতি নির্দেশ হয়েছিল যে, তিনি যেন তাকে হত্যা করেন ও তার মাল নিয়ে নেন। হ্যরত বারা’ ইবনে আফিব (রাঃ) বলেনঃ ‘আমার পিতৃব্য হ্যরত হারিস ইবনে উমায়ের (রাঃ) নবী (সঃ) প্রদত্ত পতাকা নিয়ে আমার নিকট দিয়ে গমন করলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে কোথায় পাঠিয়েছেন?’ তিনি বলেন, ‘আমি ঐ ব্যক্তির দিকে প্রেরিত হয়েছি যে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে। তার গর্দান মারার জন্যে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে’। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)

মাসআলাঃ এর উপর আলেমদের ইজমা রয়েছে যে, যে স্ত্রীর সঙ্গে পিতার সঙ্গম হয়েছে, হয় বিয়ে করেই হোক বা দাসী করেই হোক কিংবা সন্দেহের কারণেই হোক, ঐ স্ত্রীকে বিয়ে করা পুত্রের জন্যে হারাম। হ্যাঁ, তবে যদি সঙ্গম না হয়, শুধুমাত্র সহবাস হয় কিংবা তার এমন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করে যে অঙ্গের প্রতি নয়র করা অপরিচিত হওয়ার অবস্থাতেও তার জন্যে হালাল ছিল না, এতে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদ তো সে অবস্থাতেও স্ত্রীকে পুত্রের উপর

১. বিনা যুদ্ধেই শক্রদের নিকট থেকে যে মাল পাওয়া যায় তাকে ফাই বলা হয়।

হারাম বলে থাকেন। হাফিয় ইবনে আসাকেরের নিম্নের ঘটনা দ্বারাও এ মাযহাবের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ঘটনাটি এই যে, হ্যরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর ক্রীতদাস হ্যরত খুদায়েজ হামশী (রাঃ) হ্যরত মুআবিয়ার জন্যে গৌরবর্ণের একটি সুশ্রী দাসী ত্রয় করেন এবং কাপড় ছাড়াই সাদীটিকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেন। তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিল। এ ছড়ি দ্বারা ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ‘উত্তম সামগ্রী, যদি তাঁর সামগ্রী হতো’।

অতঃপর তিনি বলেন, ‘একে ইয়ায়ীদ ইবনে মুআবিয়ার নিকট পাঠিয়ে দাও।’ আবার বলেন, ‘না, না থাম। রাবীআ’ ইবনে আমর হারসী (রঃ)-কে আমার নিকট ডেকে আন।’ তিনি একজন বড় ধর্মশাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি এলে হ্যরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁকে নিম্নের মাসআলাটি জিজ্ঞেস করেনঃ ‘আমি এ স্ত্রীলোকটির এই এই অঙ্গ দেখেছি। সে কাপড় পরিহিতা ছিল না। এখন আমি তাকে আমার পুত্র ইয়ায়ীদের নিকট পাঠাবার মনস্ত করেছি। এ তার জন্যে বৈধ হবে কি?’ হ্যরত রাবীআ’ বলেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন! এক্ষণে করবেন না। এ তাঁর যোগ্য হয়নি।’ তখন হ্যরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেন, ‘আপনি ঠিকই বলেছেন।’

অতঃপর তিনি তাঁর লোকদেরকে বলেন, ‘যাও, আবদুল্লাহ ইবনে সাদা ফাযায়ী (রাঃ)-কে ডেকে আন।’ তিনি এলেন। তিনি গোধুম বর্ণের ছিলেন। তাঁকে হ্যরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেন, ‘এ দাসীটি আমি তোমাকে দান করছি, যেন তোমার সাদা বর্ণের সন্তান জন্ম লাভ করে।’ এই আবদুল্লাহ ইবনে সাদা (রাঃ) ছিলেন ঐ ব্যক্তি যাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত ফাতিমা (রাঃ)-কে প্রদান করেছিলেন। তিনি তাঁকে লালন পালন করেন, অতঃপর আল্লাহর নামে আযাদ করে দেন। তিনি হ্যরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর নিকট চলে আসেন।

## ২৩। তোমাদের জন্যে অবৈধ

করা হয়েছে— তোমাদের  
মাতৃগণ, তোমাদের কন্যাগণ,  
তোমাদের ভগ্নিগণ, তোমাদের  
ফুফুগণ, তোমাদের খালাগণ,  
তোমাদের ভ্রাতৃ কন্যাগণ,  
তোমাদের ভগ্নি কন্যাগণ,  
তোমাদের সেই মাতৃগণ যারা

۲۳ - حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتِكُمْ  
وَبِنْتَكُمْ وَأَخْوَتِكُمْ وَعَمْتِكُمْ  
وَخَلْتِكُمْ وَبِنْتَ الْأَخِ وَبِنْتَ  
الْأَخِيَّ وَأَمْمَةَ تَكَمَّلُكُمُ الَّتِي

তোমাদেরকে স্তন্য দান  
করেছে, তোমাদের দুঁফ  
ভগ্নিগণ, তোমাদের স্ত্রীদের  
মাতৃগণ, তোমরা যাদের  
অভ্যন্তরে উপনীত হয়েছে সেই  
স্ত্রীদের যে সকল কন্যা  
তোমাদের ক্ষেত্রে অবস্থিতা,  
কিন্তু যদি তোমরা তাদের  
মধ্যে উপনীত না হয়ে থাক  
তবে তোমাদের জন্যে কোন  
অপরাধ নেই; এবং যারা  
তোমাদের ওরসজাত, সে  
পুত্রদের পঞ্জীগণ এবং যা  
অতীত হয়ে গেছে তত্ত্বতীত  
দু' ভগ্নিকে একত্রিক করা।  
নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল!  
করুণাময়।

أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَتْكُمْ مِنْ  
الرَّضَاعَةِ وَامْهَتْ نِسَاءُكُمْ  
وَرِبَّبُوكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ  
مِنْ نِسَاءِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ  
يَهُنَّ فَإِنَّ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
وَحَلَّلَ إِلَيْكُمُ الْأَبْنَاءُ كُمُ الَّذِينَ مِنْ  
أَصْلَابِكُمْ وَانْتَجَمُعُوا بَيْنَ  
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

বৎশজাত, দুঁফ পান সম্বন্ধীয় এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে যেসব স্ত্রীলোক পুরুষদের জন্যে হারাম এ আয়াতে তাদেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন যে, সাত প্রকারের নারী বৎশের কারণে এবং সাত প্রকারের নারী বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে পুরুষদের উপর হারাম করা হয়েছে।

অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। ভগ্নি কন্যাগণ পর্যন্ত তো হচ্ছে বৎশজাত আঞ্চীয়। জমহুর উলামা এ আয়াত দ্বারা দলীল নিয়েছেন যে, ব্যতিচার দ্বারা যে মেয়ে জন্মগ্রহণ করবে সে মেয়েটিও ঐ ব্যতিচারীর উপর হারাম হবে। কেননা, সেও মেয়ে, অতএব হারাম। ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ)-এর এটাই মাযহাব। ইমাম শাফিন্দ (রঃ) হতে এর বৈধতার কথা বর্ণিত আছে। কেননা, শরীয়ত হিসেবে এটা কন্যা নয়। সুতরাং উত্তরাধিকারের ব্যাপারে যেমন মেয়ের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সে উত্তরাধিকার পায় না, তদুপরই আয়াতের মধ্য যে কয়জনকে হারাম করা হয়েছে তাদের অন্তর্ভুক্ত সে নয়।

এরপর বলা হচ্ছে-‘তোমাদের আপন মাতা যেমন তোমাদের উপর হারাম, তদ্বপ্তি তোমাদের দুধ-মাতাও তোমাদের জন্য হারাম।’ সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছেঃ ‘জন্ম যাকে হারাম করে স্তন্যপানও তাকে হারাম করে।’ সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, ‘বংশের কারণে যে হারাম হয়, দুঞ্চিক পানের কারণেও সে হারাম হয়।’

ধর্মশাস্ত্রবিদগণ এতে চারটি অবস্থা এবং কেউ কেউ ছয়টি অবস্থা নির্দিষ্ট করেছেন যা আহকামের শাখার গ্রন্থরাজির মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এর মধ্যে কিছুই নির্দিষ্ট নেই। কেননা, ওরই মত কতগুলো অবস্থা বংশের মধ্যেও পাওয়া যায় এবং ঐ অবস্থাগুলোর মধ্যে কতগুলো শুধু বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণেই হারাম হয়ে থাকে। সুতরাং হাদীসের উপর কোন প্রতিবাদ উঠতে পারে না।

এখন কয়বার দুধপান করলে অবৈধতা সাব্যস্ত হয় সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। দুধপান „করামাত্রই অবৈধতা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। ইমাম মালিক (রঃ) এ কথাই বলেন। হ্যরত ইবনে উমার (রঃ), সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ), উরওয়া (রঃ), ইবনে যুবাইর (রঃ) এবং যুহরী (রঃ)-এর উক্তি এটাই। দলীল এই যে, স্তন্য পান এখানে সাধারণ।

কেহ কেহ বলেন যে, তিনবার পান করলে অবৈধতা সাব্যস্ত হবে। যেমন সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘একবার চোষণ করা বা দু’বার পান করা হারাম করেন।’ এ হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ (রঃ), ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইহ (রঃ), আবু উবাইদাহ (রঃ) এবং আবু সাউরও এ কথাই বলেন। আলী (রাঃ), আয়িশা (রাঃ), উম্মে আফযাল (রাঃ), ইব্ন যুবাইর (রঃ), সুলাইমান ইব্ন ইয়াসার (রঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। তাঁদের দলীল হচ্ছে সহীহ মুসলিমের উপরোক্ত হাদীসটি।

হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে কুরআন পাকের মধ্যে দশবার দুধ পানের উপর অবৈধতার হকুম অবর্তীর্ণ হয়েছিল। পরে ওটা রহিত হয়ে পাঁচবারের উপর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত ওটা পঠিত হতে থাকে। দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে হ্যরত সালহা বিনতে সাহীল (রাঃ)-এর বর্ণনাটি, তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন হ্যরত আবু হ্যাইফার (রাঃ) গোলাম হ্যরত সালিম (রাঃ)-কে পাঁচবার দুধপান করিয়ে দেন।

কোন স্ত্রীলোক তাঁর নিকট কোন পুরুষ লোকের যাতায়াতকে পছন্দ করলে এ হাদীসটি অনুযায়ীই হ্যরত আয়েশা (রাঃ) তাকে এ নির্দেশই দিতেন। ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ) এবং তাঁর সহচরগণেরও ঘোষণা এটাই যে, পাঁচবার দুধ পানই নির্ভরযোগ্য। এটা স্মরণীয় বিষয় যে, জমহুরের মতে এ দুধপান শিশুর দুধ ছেড়ে দেয়ার পূর্বে অর্থাৎ দু'বছরের মধ্যেই হতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা-ই-বাকারার **حَوْلَيْنِ كَامْلِيْنِ** (২৪: ২৩৩)-এর তাফসীরের মধ্যে দেয়া হয়েছে। আবার এ দুধ পানের ক্রিয়া দুধ মাতার স্বামী পর্যন্ত পৌছবে কি-না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

জমহুর ও ইমাম চতুষ্টয়ের মতে এটা স্বামীর উপরও ক্রিয়াশীল হবে কিন্তু পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষীর মতে এটা শুধু দুধ দাত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে, দুধ পিতা পর্যন্ত পৌছবে না। এর ব্যাখ্যার স্থান হচ্ছে আহকামের বড় বড় গ্রন্থগুলো, তাফসীর নয়।

আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘শাশুড়ী হারাম।’ যে মেয়ের সাথে বিয়ে হবে, এ বিবাহ বন্ধনের সাথে সাথেই তার মা হারাম হয়ে যাবে, মেয়ের স্বামী তার সঙ্গে সঙ্গম করুক আর নাই করুক। হ্যাঁ, তবে যে নারীকে বিয়ে করছে তার সাথে তার পূর্ব স্বামীর ওরসজাত কন্যা রয়েছে। এখন যদি বিয়ের পর ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামী তার সাথে সঙ্গম করে থাকে তবে তার মেয়েটি তার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে যাবে।

আর যদি সঙ্গমের পূর্বেই স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে তার কন্যা তার স্বামীর জন্যে হারাম হবে না। এজন্যেই এ আয়াতে এ শর্ত লাগানো হয়েছে। কোন কোন লোক **হেন্** সর্বনামটিকে শাশুড়ী ও প্রতিপালিতা মেয়ে উভয়ের দিকেই ফিরিয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, শাশুড়ীও ঐ সময় হারাম হয় যখন তার মেয়ের সঙ্গে তার জামাতার নির্জনবাস হয়, নচেৎ হারাম হয় না। শুধু বিবাহ বন্ধন দ্বারা স্ত্রীর মাতাও হারাম হয় না এবং স্ত্রীর মেয়েও হারাম হয় না।

হ্যরত আলী (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি কোন মেয়েকে বিয়ে করেছে, অতঃপর সঙ্গমের পূর্বেই তালাক দিয়েছে, সে ঐ মেয়ের মাতাকে বিয়ে করতে পারে, যেমন প্রতিপালিতা মেয়েকে এভাবেই তার মাতাকে তালাক দেয়ার পর বিয়ে করা যায়। হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) হতেই আর একটি বর্ণনা রয়েছে যে,

যখন ঐ স্ত্রী তার স্বামীর সাথে সঙ্গমের পূর্বেই মারা যাবে এবং এ স্বামী তার উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে তখন তার মাতাকে স্ত্রীরপে গ্রহণ করা মাকরুহ হবে। হ্যাঁ, তবে যদি সঙ্গমের পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয় তবে ইচ্ছে করলে তার মাতাকে বিয়ে করতে পারে।

হ্যরত আবু বকর ইবনে কিনানা (রাঃ) বলেন, ‘আমার পিতা তায়েফের একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেন। তার সাথে আমার নির্জন বাস হয়নি এমতাবস্থায় আমার চাচা (মেয়েটির পিতা) মারা যান। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ আমার শাশুড়ী বিধবা হন। তিনি বড় সম্পদ শালিনী ছিলেন। তাই আমার পিতা আমাকে পরামর্শ দেন যে, আমি যেন তাঁর মেয়েকে তালাক দিয়ে তাঁকেই বিয়ে করি।

আমি তখন হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এ মাসআলাটি জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, ‘তুমি তাকে বিয়ে করতে পার।’ অতঃপর আমি হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞাস করি। তিনি বলেন, ‘তুমি তাকে বিয়ে করতে পার না।’ আমি আমার পিতার নিকট এটা বর্ণনা করি। তিনি ঐ দু’ মনীষীর ফতওয়া লিখে দিয়ে হ্যরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখেন। হ্যরত মুআবিয়া (রাঃ) উত্তরে লিখেন, ‘আমি হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করতে পারি না। তোমরাই অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করছো, কারণ অবস্থা তোমাদের সামনে রয়েছে। সে ছাড়া আরও বহু স্ত্রীলোক রয়েছে।’ মোটকথা তিনি অনুমতিও দিলেন না এবং নিষেধও করলেন না। আমার পিতা তখন তাঁর বাসনা আমার শাশুড়ীর দিক হতে ফিরিয়ে নেন এবং তাঁর সাথে আমার বিয়ে দেয়া হতে বিরত থাকেন।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন যে, স্ত্রীর কন্যা ও স্ত্রীর মাতার একই ভুকুম। যদি স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম না হয় তবে এ দু’জনই হালাল হবে। কিন্তু এর ইসনাদে সন্দেহযুক্ত বর্ণনাকারী রয়েছে। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ)-এর এটাই উক্তি। ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এবং হ্যরত ইবনে আব্বাসও (রাঃ) ঐ দিকেই গেছেন। হ্যরত মুআবিয়া (রাঃ) এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। শাফিই মাযহাব অবলম্বীদের মধ্যে আবুল হাসান (রঃ) আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাবুনী (রঃ) হতেও রাফেঙ্গির উক্তি অনুযায়ী এটাই বর্ণিত আছে। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত আছে! কিন্তু পরে তিনি তাঁর একথা হতে প্রত্যাবর্তন করেন।

তাবরানীর হাদীসে রয়েছে যে, ‘ফায়ারাহ গোত্রের শাখা ‘কাথ’ গোত্রের একটি লোক একটি নারীকে বিয়ে করে। অতঃপর তার বিধবা মাতার সৌন্দর্যের প্রতি তার দৃষ্টি নিবন্ধ হয়। তাই সে হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে মাসআলা জিজ্ঞেস করে, ‘তার মাতাকে বিয়ে করা আমার জন্যে বৈধ কি?’ তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ।’ সুতরাং সেই মহিলাটিকে তালাক দিয়ে তার মাতাকে বিয়ে করে নেয়। তার ছেলেমেয়েও হয়।

অতঃপর হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) মদীনায় আগমন করেন। এখানে তিনি এ মাসআলাটি বিশ্লেষণ করেন। ফলে তিনি জানতে পারেন যে, এটা হালাল নয়। অতঃপর তিনি কুফা প্রত্যাবর্তন করে ঐ লোকটিকে বলেন, ‘তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। সে তোমার জন্যে হারাম।’ লোকটি তাঁর আদেশ প্রতিপালন করতঃ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়।

জমহুর উলামা এ দিকেই গেছেন যে, মেয়ে শুধু বিবাহ বন্ধন দ্বারা হারাম হয় না। যে পর্যন্ত না তার মায়ের সঙ্গে তার স্বামীর সঙ্গম হয়। তবে মেঁয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই সঙ্গম না হলেও মা হারাম হয়ে যায়। হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন যে, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নির্জনবাসের পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয় কিংবা মহিলাটি মারা যায়, তখন তার মা তার স্বামীর জন্যে হালাল নয়। এটা সন্দেহযুক্ত বলেই তিনি তা অপছন্দ করেন। হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হ্যরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ), হ্যরত মাসরুক (রঃ), হ্যরত তাউস (রঃ), হ্যরত ইকরামা (রঃ), হ্যরত আতা’ (রঃ) হ্যরত হাসান বসরী (রঃ), হ্যরত ইবনে সীরীন (রঃ), হ্যরত কাতাদাহ (রঃ) এবং হ্যরত যুহরী (রঃ) হতেও এরপরই বর্ণিত আছে। ইমাম চতুর্ষিয়, সাতজন ধর্মশাস্ত্রবিদ, জমহুর উলামা এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষীবর্গের এটাই মাযহাব।

ইমাম ইবনে জুরায়েজ (রঃ) বলেন, ঐ মনীষীদেরই উক্তি সঠিক যাঁরা শাশুড়ীকে উভয় অবস্থাতেই হারাম বলে থাকেন। কেননা, মহান আল্লাহ তাদের অবৈধতার সঙ্গে সঙ্গমের শর্ত আরোপ করেননি, যেমন মেয়ের মায়ের জন্যে এ শর্ত আরোপ করেছেন। তাছাড়া এর উপর ইজমা হয়েছে যা এমন দলীল যে, যার বিপরীত করা সে সময় বৈধই নয় যখন ওর উপর সবাই একমত হয়। সনদের ব্যাপারে সমালোচনা থাকলেও একটি গারীব হাদীসেও এটা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যখন কোন পুরুষ কোন স্ত্রীকে বিয়ে করে তখন

তার মাকে বিয়ে করা হালাল নয়, স্বামী ঐ মেয়ের সঙ্গে সঙ্গম করুক আর নাই করুক। হ্যাঁ, তবে যে মহিলাকে বিয়ে করেছে তাকে যদি সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয় তবে ইচ্ছে করলে তার মেয়েকে বিয়ে করতে পারে।’ এ হাদীসটির সনদ দুর্বল বটে, কিন্তু এ মাসআলার উপর ইজমা হয়ে গেছে যা এর বিশুদ্ধতার উপর এমন এক সাক্ষী যার পরে আর কোন সাক্ষ্যের আবশ্যিকতা নেই।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন—‘তোমাদের প্রতিপালিতা ঐ মেয়েগুলো তোমাদের জন্যে হারাম যারা তোমাদের ক্রোড়ে অবস্থিতা, যদি তাদের মাতাদের সঙ্গে তোমাদের নির্জনবাস হয়ে থাকে।’ জমহুরের ঘোষণা এই যে, তারা ক্রোড়ে লালিতা পালিতা হোক আর নাই হোক সর্বাবস্থাতেই হারাম হবে। যেহেতু একুপ মেয়েরা সাধারণতঃ তাদের মাতাদের সাথেই থাকে এবং স্বীয় বৈপিত্রের (সৎ বাপের) নিকট প্রতি পালিতা হয় সেহেতু একথা বলা হয়েছে। এটা কোন শর্ত নয়। যেমন নিম্নের আয়াতে রয়েছে—

وَلَا تُكْرِهُوْ فَتَبِعُوْ بِكُمْ عَلَى الْبِرِّ فَإِنْ أَرْدَنْ تَحْصِنُا

অর্থাৎ ‘যদি তোমাদের দাসীরা পবিত্র থাকতে ইচ্ছে করে তবে তোমরা তাদেরকে নির্লজ্জতার কার্যে বাধ্য করো না।’ (২৪: ৩৩) এখানেও ‘যদি তারা পবিত্র থাকতে ইচ্ছে করে’ এ শর্তটি ঘটনার প্রাধান্য হিসেবে করা হয়েছে। অর্থ এই নয় যে, যদি তারা পবিত্র থাকতে না চায় তবে তাদেরকে নির্লজ্জতার কাজে উত্তেজিত কর। অনুরূপভাবে এ আয়াতেও বলা হয়েছে যে, যদি ক্রোড়ে অবস্থান করে। তাহলে বুঝা গেল যে, ক্রোড়ে অবস্থান না করলেও হারাম হবে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, হ্যরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আমার বোন আবৃ সুফইয়ানের কল্য ইয়্যাহকে বিয়ে করুন।’ তিনি বলেনঃ ‘তুমি এটা পছন্দ করো?’ হ্যরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন ‘হ্যাঁ, আমি আপনাকে শুন্য রাখতে পারি না। তাছাড়া এ সৎকার্যে আমি আমার বোনকেও জড়িয়ে দেব না কেন?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ ‘জেনে রেখো যে, এটা আমার জন্যে বৈধ নয়।’

উম্মুল মুমিনীন হ্যরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) তখন বলেন, ‘আমি তো শুনেছি যে, আপনি নাকি আবৃ সালমা (রাঃ)-এর মেয়েকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘উম্মে সালমা (রাঃ)-এর গর্ভের মেয়েটির কথা বলছো?’

তিনি বলেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘জেনে রেখো, প্রথমতঃ সে আমার উপর এ জন্যে হারাম যে, সে আমার প্রতিপালিতা, সে আমারই ক্রোড়ে লালিতা পালিতা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ যদি একুপ না হতো তবুও সে আমার উপর হারামই হতো। কেননা, সে আমার দুঃখ ভাতার কন্যা, আমার ভাতুপ্পুত্রী। আমাকে ও তার পিতা আবু সালমা (রাঃ)-কে সাওবিয়া দুধ পান করিয়েছিলেন। সাবধান! তোমাদের কন্য ও ভগ্নীদেরকে আমার উপর পেশ করো না।’

সহীহ বুখারীর মধ্যে নিম্নরূপ শব্দ রয়েছেঃ ‘উম্মে সালমা (রাঃ)-এর সাথে আমার বিয়ে যদি নাও হতো তথাপি সে আমার উপর হালাল হতো না।’ সুতরাঃ অবৈধতার মূল তিনি বিয়েকেই স্থির করেছেন। এ মাযহাবই হচ্ছে ইমাম চতুর্ষিয়ের, সাতজন ধর্ম শাস্ত্রবিদের এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহুরের। এও বলা হয়েছে যে, যদি মেয়েটি ক্রোড়ে প্রতিপালিতা হয় তবে হারাম হবে নচেৎ হারাম হবে না।

হ্যরত মালিক ইবন আউস ইবন হাদসান (রঃ) বলেন, আমার স্ত্রী সন্তানাদি রেখে মারা যায়। তার প্রতি আমার খুবই ভালবাসা ছিল। এ জন্য তার মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত শোকভিভূত হয়ে পড়ি। ঘটনাক্রমে হ্যরত আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি আমাকে চিন্তিত দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। আমি ঘটনাটি তাঁর নিকট বর্ণনা করি। তিনি তখন আমাকে বলেন, ‘তোমার পূর্বে তার স্বামীর কোন সন্তান আছে কি?’ আমি বলি হ্যাঁ, একটি কন্যা ‘আছে এবং সে তায়েফে অবস্থান করে।’ তিনি বলেন, ‘মেয়েটিকে বিয়ে করে নাও।’

আমি তখন কুরআন কারীমের এ আয়াতটি পাঠ করে তাঁকে বলি, এর ভাবার্থ কি হবে? তিনি বলেনঃ ‘এটা সে সময় হতো যদি সে তোমার নিকট লালিতা পালিতা হতো। আর সে তো তোমার কথামত তায়েফে রয়েছে। তোমার নিকটেই তো নেই।’ এর ইসনাদ সহীহ হলেও এ উক্তি সম্পূর্ণ গারীব।

হ্যরত দাউদ ইবনে আলী যাহেরী (রঃ) এবং তাঁর সহচরগণ ঐদিকেই গেছেন। রাফেস্ট (রঃ) হ্যরত ইমাম মালিক (রঃ)-এরও এ উক্তির কথাই বলেছেন। ইবনে হাযামও (রঃ) এটাই গ্রহণ করেছেন। আমাদের শায়েখ হাফিয়

আবি আদিল্লাহ যাহবী (রঃ) বলেন, ‘আমি এ কথাটি শায়েখ তাকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়া (রঃ)-এর নিকট পেশ করলে তিনি ওটাকে অত্যন্ত কঠিন অনুভব করেন এবং নীরবতা অবলম্বন করেন।’<sup>১১</sup> শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে ঘর। যেমন হযরত আবু উবাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তবে নিজের অধিকারে যে দাসী রয়েছে এবং তার সাথে তার মেয়েও রয়েছে, তার সম্বন্ধে হযরত উমার (রাঃ) জিজ্ঞাসিত হন যে, ‘একের পর অন্য বৈধ হবে কি-না?’ তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেন, ‘এক আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, হালাল এবং অন্য আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে হারাম। সুতরাং আমি ওটা কখনও করবো না।’

শায়েখ আবু উমার ইবনে আদিল্লাহ (রঃ) বলেন, ‘কারও জন্যে এটা হালাল নয় যে, কোন স্ত্রীলোকের উপর অধিকার লাভ করার কারণে তার সঙ্গে সঙ্গম করবে অতঃপর একই অধিকারের উপর ভিত্তি করে তার মেয়ের সঙ্গেও সঙ্গম করবে এবং এ মাসআলায় আলেমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কেননা আল্লাহ তা‘আলা ওটাকে বিয়েতেও হারাম বলে ঘোষণা করেছেন।

আলেমদের মতে কারও উপরে অধিকার লাভ বিয়েরই অনুসারী। কিন্তু হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে যে বর্ণনা দেয়া হয় তার উপর ফতওয়া প্রদানকারী ইমামগণ এবং তাদের অনুসারী কেউই নেই। হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা মেয়ে এবং মেয়ের মেয়ে এভাবে যতই নিম্নস্তরে যাক না কেন, সবাই হারাম। হযরত কাতাদা (রঃ)-এর বর্ণনা মতে হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ‘-دخلتم بہن دخلم- এর ভাবার্থ হচ্ছে ‘নারীদেরকে বিয়ে করা।’ হযরত আতা’ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ‘তাদের কাপড় সরিয়ে দেয়া, স্পর্শ করা এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তাদের পদময়ের মধ্যস্থলে বসে পড়া।’ ইবনে জুরাইজ জিজ্ঞেস করেন, ‘যদি এ কাজ স্ত্রীর বাড়ীতেই হয়? হযরত আতা’ উত্তরে বলেন, ‘এখানকার ওখানকার দু’টোর ভুক্ত একই। এরূপ যদি হয়ে যায় তবে তার মেয়ে তার স্বামীর উপর হারাম হয়ে যাবে।’

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, শুধু নির্জনবাসের দ্বারাই তার মেয়ের অবৈধতা সাব্যস্ত হয় না। যদি সঙ্গম করা, স্পর্শ করা এবং কামপ্রবৃত্তির সাথে

তার কোন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে একথা সাব্যস্ত হয় যে, স্ত্রীর মেয়ে তার উপর হারাম হবে না।

এরপর বলা হচ্ছে—‘তোমাদের পুত্রবধুগণও তোমাদের উপর হারাম, যারা তোমাদের উরসজাত পুত্রদের পত্নী’। অর্থাৎ পালক পুত্রের স্ত্রী হারাম নয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে—

فَلَمَّا قَضَى زِيدٌ مِنْهَا وَطَرَا زَوْجَنَا كَهَا لِكَبِيلًا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حِرْجٌ  
فِي ازْوَاجِ أَدْعِيَاءِ هُمْ -

অর্থাৎ ‘যখন যায়েদ তার নিকট হতে স্বীয় প্রয়োজন পুরো করে নেয়, তখন আমি তাকে তোমার বিবাহে দিয়ে দেই, যেন মুমিনদের উপর তাদের পালিত পুত্রদের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা না থাকে।’ (৩০: ৩৭)

হ্যরত আতা’ (রঃ) বলেন, ‘আমরা শুনতাম যে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত যায়েদ (রাঃ)-এর স্ত্রী হ্যরত যায়নাব (রাঃ)-কে বিয়ে করেন তখন মক্কার কুরাইশরা তাঁর সমালোচনা শুরু করে দেয়। তখন মাজুল আব্দুল্লাহ কুরাইশী (৩০: ৪) এ আয়াতটি এবং মাক্তাব কুরাইশী (৩০: ৪০) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আয়াতগুলোর অর্থ হচ্ছেঃ ‘তোমাদের পালক পুত্রগণকে তিনি তোমাদের পুত্র করেননি।’ মুহাম্মাদ (সঃ) তোমাদের পুরুষদের কারও পিতা নয়।’

হ্যরত হাসান ইবনে মুহাম্মাদ (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতগুলো অস্পষ্ট, যেমন তোমাদের পুত্রদের স্ত্রীগণ, তোমাদের শাশুড়ীগণ। হ্যরত তাউস (রঃ), হ্যরত ইবরাহীম (রঃ), হ্যরত যুহরী (রঃ) এবং হ্যরত মাকতুল (রঃ) হতেও এ রূপকথা বর্ণিত আছে। আমি বলি অস্পষ্টের ভাবার্থ হচ্ছে সাধারণ। অর্থাৎ যাদের সাথে সঙ্গম করা হয়েছে এবং যাদের সাথে সঙ্গম করা হয়নি সবাই এর মধ্যে জড়িত। শুধু বিয়ে করার পরেই অবৈধতা সাব্যস্ত হয়ে যায়, সঙ্গম হোক আর নাই হোক। এ মাসআলার উপর সবাই একমত যে, কেউ যদি প্রশ়া করে, ‘আয়াতে তো শুধু উরসজাত পুত্রের উল্লেখ আছে, তাহলে দুধ পুত্রের স্ত্রী অবৈধ হওয়া কিরূপে সাব্যস্ত হবে।’ তবে এর উত্তর হবে এই যে, ওর অবৈধতা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্নের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। তিনি বলেনঃ ‘স্তন্যপান দ্বারা ওটাই হারাম হয় যা হারাম হয় বংশের দ্বারা।’ জমহূরের মাযহাব এটাই

যে, দুধ পুত্রের স্ত্রীও হারাম। কোন কোন লোক তো এর উপরই ইজমা নকল করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন—‘বিবাহে দু’ বোনকে একত্রিত করাও তোমাদের জন্যে হারাম। অধীনস্থ দাসীদের উপরও এ হকুম প্রযোজ্য যে, একই সময় দু’ বোনের সাথে সঙ্গম করা হারাম। কিন্তু অঙ্গতার যুগে যা হয়ে গেছে তা আমি ক্ষমা করে দিলাম।’ সুতরাং জানা গেল যে, আগামীতে কোন সময় এ কাজ কারও জন্যে বৈধ নয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে—

لَا يَذْوَقُونَ فِتْنَةً الْمَوْتِ إِلَّا مُؤْمِنَةً الْأُولَىٰ

অর্থাৎ ‘প্রথম মৃত্যু ছাড়া তথায় তারা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না।’ (৪৪:৫৬) তাহলে জানা যাচ্ছে যে, আগামীতে আর মৃত্যুর আগমন ঘটবে না।

সাহাবা, তাবেঈন, ইমানগণ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের ইজমা আছে যে, একই সাথে দু’ বোনকে বিয়ে করা হারাম। যে ব্যক্তি মুসলমান হবে এবং তার বিয়েতে দু’বোন থাকবে, তাকে এ অধিকার দেয়া হবে যে, সে যে কোন একজনকে রাখবে অপরজনকে তালাক দেবে। আর এটা তাকে করতেই হবে। হ্যরত যহুহাক ইবনে ফীরোয় (রাঃ) বলেন, ‘আমি যখন মুসলমান হই তখন আমার বিয়েতে দু’ স্ত্রী ছিল যারা পরম্পর ভগ্নী ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন একজনকে তালাক দিয়ে দেই।’ (মুসনাদ-ই-আহমাদ)

সুনান-ই-ইবনে মাজা, সুনান-ই-আবি দাউদ ও জামেউত্ তিরমিয়ীর মধ্যে এ হাদীসটি রয়েছে। জামেউত্ তিরমিয়ীর মধ্যে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘এ দু’জনের মধ্যে যাকে ইচ্ছে রাখ অপরজনকে তালাক দাও।’ ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এ হাদসিটি হাসান বলেছেন। সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যে আবু খাররাশের একুপ ঘটনাও বর্ণিত আছে। সম্ভবতঃ যহুহাক ইবনে ফীরোয়েরই কুনইয়াত আবু খাররাশ হবে এবং ঘটনাটি একই হবে। আবার এর বিপরীত হবারও সম্ভাবনা রয়েছে। হ্যরত দায়লামী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আরয় করেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার বিবাহে দু’বোন রয়েছে।’ তিনি বলেনঃ ‘তাদের মধ্যে যাকে চাও একজনকে তালাক দিয়ে দাও।’ (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই)

সুতরাং দায়লামী অর্থে হ্যরত যহুক ইবনে ফীরোয়কেই বুঝানো হয়েছে। তিনি ইয়ামনের ঐ নেতৃবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা অভিশপ্ত আসওয়াদ আনসী মুতানাকীকে হত্যা করেছিলেন। পরম্পর দু' বোন এ রূপ দু'জন দাসীকে একই সাথে একত্রিত করে তাদের সাথে সঙ্গম করাও হারাম। এর দলীল হচ্ছে এ আয়াতটির সাধারণতা, যার মধ্যে স্ত্রী ও দাসী উভয়ই জড়িত রয়েছে।

হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি এটাকে মকরহ বলেন। প্রশ্নকারী বলে, কুরআন কারীমে যে রয়েছে-

اَلْمَلِكُ اِيمَانُكُمْ

অর্থাৎ ‘কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী’(২৩: ৭) তখন হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, ‘তোমার উটও তো তোমার দক্ষিণ হস্তের অধিকারে রয়েছে।’ জমহুরের প্রসিদ্ধ উক্তিও এটাই এবং ইমাম চুতষ্টয় প্রভৃতি মনীষীও এ কথাই বলেন। তবে পূর্ববর্তী কোন কোন মহামানব এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

হ্যরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-কে এ মাসআলাটি জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘একটি আয়াত এটাকে হালাল করছে এবং অপরটি হারাম করছে। আমি তো এটা হতে নিষেধ করি না।’ প্রশ্নকারী তথা হতে বের হয়। পথে একজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁকেও এ প্রশ্ন করে। তিনি বলেন, ‘আমার অধিকার থাকলে এরূপ কার্যকারীকে আমি শিক্ষামূলক শান্তি প্রদান করতাম।’

ইমাম মালিক (রঃ) বলেন, ‘আমার ধারণা এ উক্তিকারী খুব সম্ভব হ্যরত আলী (রাঃ) ছিলেন।’ হ্যরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত আছে। ‘ইসতিয়কার-ই-ইবনে আবদিল বারর’ গ্রন্থে রয়েছে যে, এ ঘটনার বর্ণনাকারী কাবীসা’ ইবনে যাভীর হ্যরত আলী (রাঃ)-এর নাম নেয়নি, কারণ সে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের প্রিয়পাত্র ছিল এবং তাদের উপর তাঁর নাম খুব কঠিন ঠেকতো।

হ্যরত আইয়াস ইবনে আমের বলেন, আমি হ্যরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করি, ‘আমার অধিকারে দু'টি দাসী রয়েছে যারা পরম্পর দু' বোন। একজনের সাথে আমি সম্পর্ক স্থাপন করেছি এবং আমার ওরসে তার সন্তানাদিও হয়েছে। এখন আমার মনে চাচ্ছে যে, তার বোনটি যে

সূরাঃ নিসা ৪

আমার দাসী হিসেবে রয়েছে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি। তাহলে বলুন শরীয়তে এ ব্যাপারে কি হুকুম রয়েছে’?

তিনি বলেন, ‘প্রথম দাসীটিকে আযাদ করে দিয়ে তার বোনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পার।’ তিনি বলেন, লোকে তো বলে যে, আমি তার বিয়ে করিয়ে দিয়ে তার বোনের সঙ্গে মিলিত হতে পারি।’ হ্যরত আলী (রাঃ) তখন বলেন, ‘দেখ এ অবস্থাতেও ক্ষতি রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, যদি তার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় বা মারা যায় তবে সে পুনরায় তোমার নিকট ফিরে আসবে। সুতরাং তাকে আযাদ করে দেয়ার মধ্যেই নিরাপত্তা রয়েছে।’

অতঃপর তিনি আমার হাত ধারণ করে বলেন, ‘জেনে রেখো যে, আযাদ ও দাসী স্ত্রীলোকদের হুকুম বৈধতা ও অবৈধতার দিক দিয়ে একই। হ্যাঁ, তবে সংখ্যায় পার্থক্য রয়েছে। আযাদ মহিলাদেরকে চারটের বেশী একত্রিত করা যায় না। কিন্তু দাসীদের সংখ্যার কোন শর্ত নেই।’ দুঞ্চিপানের সম্পর্কের ফলে ঐ সমুদয় স্ত্রীলোক হারাম হয়ে যায়, বংশীয় সম্পর্কের কারণে যেগুলো হারাম হয়ে থাকে। স্বরণ রাখতে হবে যে, হ্যরত উসমান (রাঃ)-এর মতই হ্যরত আলী (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে। যেমন তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, হ্যরত আলী (রাঃ) বলেছেন, ‘পরম্পর বোন হয় একুপ দু’টি দাসীকে একই সময়ে একত্রিত করে তাদের সাথে সঙ্গম করার বৈধতা এক আয়ত দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে এবং অপর আয়ত দ্বারা অবৈধতা সাব্যস্ত হচ্ছে।’

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘দাসীদের সাথে আমার আত্মীয়তার কারণে তারা অন্যান্য গুটিকয়েক দাসীকে আমার উপর হারাম করে থাকে। কিন্তু তাদের পরম্পরের আত্মীয়তার কারণে হারাম করে না। অজ্ঞতা যুগের লোকেরাও ঐ সমুদয় নারীকে হারাম বলে জানতো যাদেরকে তোমরা হারাম মনে করে থাক। কিন্তু তারা শুধু পিতার স্ত্রীকে অর্থাৎ বিমাতাকে এবং একই সাথে বিবাহে দু’ বোনকে একত্রিত করাকে হারাম মনে করতো না। কিন্তু ইসলাম এসে এ দু’টোকেও হারাম করে দেয়। এ জন্যেই এ দু’টোর অবৈধতার বর্ণনার সাথে সাথে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন যে, যে বিয়ে হয়েছে তা হয়েছেই।

হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, ‘যে আযাদ স্ত্রীলোকগুলো হারাম ঐ দাসীগুলোও হারাম। হ্যাঁ, তবে সংখ্যায় এক নয়। অর্থাৎ আযাদ মহিলাদেরকে

চারটের বেশী একত্রিত করা যায় না। কিন্তু দাসীদের জন্যে কোন সীমা নেই।' হ্যরত শা'বীও (রঃ) এটাই বলেন।

হ্যরত আবু আমর (রঃ) বলেন, 'হ্যরত উসমান (রাঃ) এ ব্যাপারে যা বলেছেন, পূর্ববর্তী মনীষীদের একটি দলও এটাই বলেছেন, যাঁদের মধ্যে হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) রয়েছেন। কিন্তু প্রথমতঃ এর নকলে তো স্বয়ং ঐ মনীষীদের মধ্যেই বহু কিছু মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ এ উক্তির দিকে বিবেকসম্পন্ন আলেমগণ মোটেই মনোযোগ দেননি এবং তা গ্রহণও করেননি। হেজায, ইরাক, সিরিয়া এমনকি পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রবিদ ওর বিপক্ষে রয়েছেন।' মুষ্টিমেয় কয়েকজন শুধু শব্দের প্রতি লক্ষ্য করেই এবং কোন চিন্তা ও বুদ্ধি বিবেচনা না করেই তাঁদের হতে পৃথক রয়েছেন ও ইজমার বিপরীত মত পোষণ করেছেন। যাঁরা পূর্ণ জ্ঞানের ও বিবেচনা শক্তির অধিকারী তাঁরা সবাই এ বিষয়ে একমত যে, দু'বোনকে যেমন বিবাহে একত্রিত করা যায় না, তদুপ ঐ দাসীদের সাথেও একই সময় সঙ্গম করতে পারে না, যারা পরম্পর বোন।

অনুরূপভাবে মুসলমানদের ইজমা রয়েছে যে, এ আয়াতে মাতা, কন্যা, বোন ইত্যাদিকে হারাম করা হয়েছে। এদের সাথে যেমন বিয়ে হারাম, তদুপ যদি তারা দাসী হয়ে অধীন হয়ে যায়, তবে তাদের সাথেও মিলন হারাম।

মোটকথা, বিয়ের ও দাসীদের উপর অধিকার লাভের পরে, এ দু' অবস্থাতেই এরা সবাই সমান। না তাদেরকে বিয়ে করে তাদের সাথে মিলন বৈধ, না তাদের উপর অধিকার লাভের পর তাদের সাথে মিলন বৈধ।

অনুরূপভাবে এ হৃকুমই হচ্ছে একই সাথে দু' বোনকে একত্রিত করণ এবং শাশুড়ীর ও স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ওরসজাত কন্যার একত্রিত করণ। স্বয়ং তাদের জমহূরেরও এটাই মাযহাব। আর এটাই হচ্ছে ঐ দলীল যা ঐ গুটিকয়েক বিপক্ষীর উপর পূর্ণ সনদ ও পরিপূর্ণ হজ্জত।

মোটকথা একই সাথে দু' বোনকে বিয়েতে একত্রিত করাও হারাম এবং দু' বোনকে দাসীরূপে রেখে তাদের সাথে মিলিত হওয়াও হারাম।

(চতুর্থ পারা সমাপ্ত)

২৪। এবং নারীদের মধ্যে  
সধবাগণ; কিন্তু তোমাদের  
দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী—  
আল্লাহ তোমাদের জন্য  
তাদেরকে বিধিবদ্ধ করেছেন,  
এতদ্যতীত তোমাদের জন্যে  
বৈধ করা হয়েছে যে, তোমরা  
স্তীয় ধনের দ্বারা ব্যভিচারের  
উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহবদ্ধ  
করার জন্যে তাদের অনুসন্ধান  
কর, অনন্তর তাদের দ্বারা যে  
ফলভোগ করেছ, তজ্জন্যে  
তাদেরকে তাদের নির্ধারিত  
দেয় প্রদান কর এবং কোন  
অপরাধ হবে না— যদি  
নির্ধারণের পর তোমরা  
পরম্পর সম্ভত হও, নিশ্চয়ই  
আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

٢٤— وَالْمُحْسِنُونَ مِنَ النِّسَاءِ  
إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابٌ  
اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا  
وَرَأَءَ ذِلِّكُمْ إِنْ تَبْتَغُوا  
بِأَمْوَالِكُمْ مَحْصُنَينَ غَيْرَ  
مُسْفِحَينَ فِيمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ  
مِنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ أَجْوَاهُنَّ  
فَرِيضَةٌ وَلَا جَنَاحٌ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا تَرْضِيَتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
الْفِرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا  
حَكِيمًا ۝

অর্থাৎ যেসব নারীর স্বামী রয়েছে তারাও তোমাদের জন্যে হারাম। তবে হ্যাঁ, কাফিরদের যেসব স্ত্রী যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দিনী হয়ে তোমাদের অধিকারে আসবে, এক ঝটুকাল অতিক্রান্ত হবার পর তারা তোমাদের জন্যে বৈধ হবে। মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যারত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘আওতাসের যুদ্ধে কতগুলো সধবা স্ত্রীলোক বন্দিনী হয়ে আসে। আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদের সাথে মিলিত হওয়াকে বৈধ করা হয়’। জামেউত্ তিরমিয়ী, সুনান-ই-ইবনে মাজা, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গঠন্তেও এ হাদীসটি রয়েছে। তাবরানীর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এটা খাইবার যুদ্ধের ঘটনা।

পূর্ববর্তী মনীষীদের একটি দল এ আয়াতের সাধারণতা হতে দলীল গ্রহণ করে বলেন যে, দাসীকে বিক্রি করে দেয়াই হচ্ছে তার স্বামীর পক্ষ হতে তালাক

প্রাণি। হযরত ইবরাহীম (রঃ)-কে এ মাসআলাটি জিজ্ঞেস করা হলে তিনি হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর ফতওয়াটিই বর্ণনা করতঃ এ আয়াতটি পাঠ করেন।

অন্য সনদ দ্বারা বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, ‘যখন কোন সধবা নারী বিক্রীতা হয় তখন তার দেহের বেশী হকদার হচ্ছে তার মনিব।’ হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং হযরত ইবনে আবুসেরও (রাঃ) ফতওয়া এই যে, তার বিক্রিতা হওয়াই হচ্ছে তালাক প্রাণি।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে রয়েছে যে, দাসীর তালাক হয় প্রকারের। তাকে বিক্রি করাও তালাক, আযাদ করাও তালাক, দান করাও তালাক, অব্যাহতি দেয়াও তালাক এবং তার স্বামীর তালাক দেয়াও তালাক।<sup>১</sup> হযরত ইবনুল মুসাইয়াব (রঃ) বলেন যে, সধবা নারীদের সাথে বিয়ে হারাম। কিন্তু দাসীরা এর ব্যতিক্রম, তাদের বিক্রি হওয়াই তালাক।

হযরত মুআম্বার (রঃ) এবং হযরত হাসান বসরীও (রঃ) এটাই বলেছেন। এ গুরুজনদের তো উক্তি এই, কিন্তু জমহুর তাঁদের বিরোধীমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন যে, দাসীদের বিক্রি তাদের জন্যে তালাক নয়। কেননা, ক্রেতা হচ্ছে বিক্রেতার প্রতিনিধি এবং বিক্রেতা তার সুফল স্বীয় অধিকার হতে বের করছে এবং দাসীর নিকট হতে ছিনিয়ে নিয়ে ক্রেতার নিকট বিক্রি করছে।

তাঁদের দলীল হচ্ছে হযরত বুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীসটি যা সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, উশুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত বুরাইরা (রাঃ)-কে দ্রুয় করে আযাদ করে দেন। তখন কিন্তু তাঁর হযরত মুগীস (রাঃ)-এর সঙ্গেকার বিয়ে বাতিল হয়নি। বরং রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে সে বিয়ে বাতিল করার বা বাকী রাখার অধিকার প্রদান করেন। হযরত বুরাইরা (রাঃ) বিয়ে বাতিল করাকেই পছন্দ করেন। এ ঘটনাটি প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। সুতরাং ঐ গুরুজনদের কথা অনুযায়ী বিক্রি হওয়াই যদি তালাক হতো তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত বুরাইরা (রাঃ)-কে তাঁর বিক্রি হয়ে যাবার পর বিয়ে বাতিল করার বা ঠিক রাখার অধিকার দিতেন না।

১. এখানে ৫ প্রকারের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। ৬ষ্ঠ প্রকারটি মূল তাফসীরে নেই।

অধিকার দেয়ার দলীল হচ্ছে বিয়ে ঠিক থাকার। কাজেই আয়াতে শুধু এ স্ত্রীলোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা যুক্তে বন্দিনী হয়ে মুসলমানদের অধিকারে এসেছে। এও বলা হয়েছে যে, ‘مُحْصَنَاتٌ’ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে পুণ্যশীলা রঘণীগণ। অর্থাৎ পুণ্যবতী নারীগণ তোমাদের জন্যে হারাম-যে পর্যন্ত না তোমরা বিয়ে, সাক্ষী, মোহর ও অভিভাবকের মাধ্যমে তাদের সতীত্বের অধিকারী হও, একজন হোক, দু'জন হোক, তিনজন হোক বা চারজন হোক। হ্যরত আবুল আলিয়া (রঃ) এবং হ্যরত তাউস (রঃ) এ ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন। উমার (রঃ) এবং উবাইদাহ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে-চারটের বেশী স্ত্রী তোমাদের জন্যে হারাম। হ্যাঁ, তবে দাসীদের ব্যাপারে এ সংখ্যা নেই।

অতপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-‘এ নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর লিখে দিয়েছেন, অর্থাৎ চারটের হুকুম। সুতরাং এটাই তোমাদের জন্যে অবশ্যপালনীয়, তোমারা ওর সীমা ছাড়িয়ে যেওনা। তোমরা তাঁর শরীয়ত ও ফরযগুলো মেনে চল।’ এও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হারাম নারীদেরকে স্বীয় গ্রন্থে প্রকাশ করে দিয়েছেন।

এরপরে বলা হচ্ছে-‘যেসব নারীর হারাম হ্বার কথা বর্ণনা করা হলো, তারা ছাড়ি সমস্ত নারী তোমাদের জন্যে হালাল।’ একটি ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ চারের কম তোমাদের জন্যে হালাল। কিন্তু এ উক্তি দূরের উক্তি। প্রথমটাই সঠিক ভাবার্থ। এটাই হ্যরত আতা’ (রঃ)-এর উক্তি।

হ্যরত কাতাদা (রঃ) এর ভাবার্থ বর্ণনা করেন যে, এর দ্বারা দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতটিই এ লোকদের দলীল, যারা বিবাহে একই সময়ে দু' বোনকে একত্রিত করার বৈধতার সমর্থক এবং এ লোকদেরও দলীল যাঁরা বলেন যে, একটি আয়াত ওকে হালাল করছে ও একটি আয়াত হারাম করছে।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘তোমরা এ হালাল নারীদেরকে স্বীয় মাল দ্বারা গ্রহণ কর। আয়াদ নারীদেরকে চারজন পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে এবং দাসীদেরকে সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই বিয়ে করতে পারবে, তবে শরীয়তের পন্থায় হতে হবে’। এ জন্যেই বলা হয়েছে-‘ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহবন্ধ করার জন্যে।’

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-‘যেসব স্ত্রী হতে তোমরা ফল ভোগ কর, সে ফল ভোগের বিনিময়ে তাদেরকে মোহর প্রদান কর।’ যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে-

وَكَيْفَ تَأْخِذُونَهُ وَقَدْ أَفَضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ

অর্থাৎ ‘কিরুপে তোমরা তা (মোহর) গ্রহণ করবে? অথচ তোমরা পরম্পর একে অন্যের নিকট উপস্থিত হয়েছিলে।’ (৪: ২১) আর এক জায়গায় রয়েছে-

وَاتُّوا النِّسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً

অর্থাৎ ‘তোমরা খুশী মনে স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর।’ (৪: ৮) অন্য স্থানে রয়েছে-

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا اتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

অর্থাৎ ‘তোমরা স্ত্রীদেরকে যা কিছু প্রদান করেছ তা হতে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্যে বৈধ নয়।’ (২: ২২৯) এ আয়াত দ্বারা ‘মুত্ত্বা’<sup>১</sup> বিবাহের উপর দলীল গ্রহণ করা হয়েছে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ‘মুত্ত্বা’ শরীয়তেরই বিধান ছিল। পরে তা রহিত হয়ে যায়। ইমাম শাফিউদ্দিন (রাঃ) এবং উলামা-ই-কিরামের একটি দল বলেন যে, ‘মুত্ত্বা’ দু’বার বৈধ করা হয়, অতঃপর রহিত করা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, তার চেয়েও বেশীবার বৈধ হয়েছে ও রহিত হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, একবার মাত্র বৈধ হয়েছে, তারপরে রহিত হয়ে গেছে। এরপরে আর বৈধ হয়নি। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী হতে প্রয়োজনের সময় এর বৈধতার কথা বর্ণিত আছে। হ্যরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রাঃ) হতেও একপথে একটি বর্ণনা বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ), উবাই ইবনে কাব (রাঃ), সাঙ্গীদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) এবং সুন্দী (রাঃ) হতে শব্দের পরে <sup>মন্তব্য</sup> এর পঠন বর্ণিত আছে। কিন্তু জমহুর এর উল্টো।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হ্যরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি এর উত্তম মীমাংসা করেছে যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) খাইবারের যুদ্ধে মুত্ত্বা’র বিবাহ হতে এবং পালিত গাধার মাংস হতে নিষেধ করেছেন। এ হাদীসের শব্দগুলো আহকামের ঘস্তসমূহে বিস্তারিতভাবে রয়েছে। সহীহ মুসলিম শরীফে হ্যরত সুবরা’ ইবনে মা’বাদ জুহনী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলেন। তিনি ইরশাদ করেনঃ ‘হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে মুত্ত্বা’র অনুমতি দিয়েছিলাম। জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা’আলা কিয়ামত পর্যন্ত ওটাকে হারাম করে দিয়েছেন। যার নিকট এ প্রকারের স্ত্রী রয়েছে সে যেন তাকে পরিত্যাগ করে এবং তোমরা যা কিছু তাদেরকে দিয়ে রেখেছো তা হতে কিছুই গ্রহণ করো না।’

১. ‘মুত্ত্বা’ হচ্ছে অস্থায়ী বা সাময়িক বিবাহ। কোন বস্তুর বিনিময়ে কোনরূপ ফল ভোগ করলে তাকে ‘মুত্ত্বা’ বলে।

সহীহ মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায় হজ্জে একথা বলেছিলেন। হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে যার ব্যাখ্যার স্থান হচ্ছে আহকামের গ্রন্থসমূহ।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন-‘মোহর নির্ধারণের পর যদি তোমরা পরম্পরের সম্মতিক্রমে কিছু মীমাংসা করে নাও তবে কোন অপরাধ হবে না’। যাঁরা পূর্ববর্তী বাক্যকে ‘মুত্ত্বা’র অর্থে নিয়েছেন, তাঁরা এর ভাবার্থ এরূপ বর্ণনা করেন যে, যখন নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন পুনরায় সময় বাড়িয়ে নেয়ায় এবং যা কিছু দিয়েছে তার উপর আরও কিছু দেয়ায় কোন পাপ নেই। সুন্দী (রঃ) বলেন যে, ইচ্ছে করলে পূর্বে নির্ধারিত মোহরের পর সময় শেষ হবার পূর্বে যা দিয়েছে সে বলবে-‘আমি এত সময়ের জন্যে পুনরায় ‘মুত্ত্বা’ করছি।’

সুতরাং যদি গর্ভাশয়ের পূর্বে ঐ বেশীটা ঠিক করে নেয় তবে সময় শেষ হয়ে যাবার পর তার কোন ক্ষমতা থাকবে না। ঐ স্ত্রী পৃথক হয়ে যাবে এবং এক ঝুঁতুকাল অপেক্ষা করে স্বীয় গর্ভাশয়কে পরিত্র করে নেবে। এ দু’ জনের মধ্যে উত্তরাধিকার নেই। স্ত্রীলোকটিও পুরুষ লোকটির উত্তরাধিকারিণী হবে না এবং পুরুষ লোকটিও স্ত্রীলোকটির উত্তরাধিকারী হবে না। আর যে মনীষীগণ বলেন যে, এটা সুন্নাত বিবাহ সম্পর্কীয় কথা, তাঁদের নিকটে এর ভাবার্থ তো পরিষ্কার যে, এখানে মোহর আদায়ের গুরুত্বের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যেমন বলা হয়েছে- ‘মোহর সহজভাবে ও খুশী মনে দিয়ে দাও। তবে মোহর নির্ধারিত হবার পর যদি স্ত্রী তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য মাফ করে দেয় তবে স্বামী বা স্ত্রীর কারও কোন পাপ নেই।’ হ্যরত হায়রামী (রঃ) বলেন, ‘মানুষ মোহর নির্ধারণ করে দেয়। অতঃপর তার দরিদ্র হয়ে যাবারও সম্ভাবনা রয়েছে। সে সময় যদি স্ত্রী তার প্রাপ্য ছেড়ে দেয় তবে তা বৈধ।’ ইমাম ইবনে জারীরও এ উক্তিকেই পছন্দ করেছেন।

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, ‘তাদেরকে পূর্ণ মোহর প্রদান কর। অতঃপর তাদেরকে বসবাস করার বা পৃথক হয়ে যাবার পূর্ণ অধিকার দাও।’ এরপর বলা হচ্ছে-‘আল্লাহ তা‘আলা মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়’। এ বৈধতা বা অবৈধতা সম্পর্কীয় নির্দেশাবলীর মধ্যে যে নিপুণতা ও যুক্তিযুক্ততা রয়েছে তা তিনিই খুব ভাল জানেন।

২৫। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিশ্বাসিনী ও স্বাধীনা রূপণীকে বিয়ে করার শক্তি সামর্থ না রাখে, তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার অধিকারী- সেই বিশ্বাসিনী দাসীঃ আল্লাহ তোমাদের বিশ্বাস বিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন, তোমরা এক অপর হতে সমুদ্ভূত, অতএব তাদের মনিবদ্দের অনুমতিক্রমে ব্যভিচারিণী ও গুণ প্রেমিকা ব্যতীত সতী-সাধীদেরকে বিয়ে কর, অতএব যখন তারা বিবাহবন্ধ হয়, তৎপর যদি তারা ব্যভিচার করে, তবে তাদের প্রতি স্বাধীনা নারীদের শাস্তির অর্ধেক, এটা তাদেরই জন্যে তোমাদের মধ্যে যারা দুষ্কার্যকে ভয় করে এবং যদি বিরত থাক, তবে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

٢٥- وَمَنْ لَمْ يُسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولًا إِنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَّيْتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُهُنَّ لَا يَرْجُونَ أَهْلَهُنَّ وَاتَّوْهُنَّ أَجْوَرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مَحْصَنَتِ غَيْرِ مُسْفِحَتِ وَلَا مَتْخَذَتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْسَنْ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاجِحَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

যারা স্বাধীনা নারীদেরকে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে না এখানে তাদেরই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। হ্যরত রাবীআ' (রঃ) বলেন যে, 'শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে ইচ্ছে ও বাসনা। অর্থাৎ দাসীকে বিয়ে করবে যখন তার প্রতি বাসনা জাগবে।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এ উক্তি এনেছেন, অতঃপর তিনি সেটা খণ্ডন করেছেন। ভাবার্থ এই যে, মুসলমানদের অবস্থা যখন এরূপ হবে তখন তাদের অধিকারে যে দাসীগুলো থাকবে তাদেরকে তারা বিয়ে করবে।

সমস্ত কার্যের যথার্থতা আল্লাহ পাকের নিকটে প্রকাশমান। মানুষ তো শুধু বাহ্যিকটাই দেখে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- ‘হে মানবমণ্ডলী! তোমরা স্বাধীন ও দাস সবাই ঈমানী সম্পর্কের দিক দিয়ে একই। দাসীদেরকে তাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর’। জানা যাচ্ছে যে, দাসীদের অভিভাবক হচ্ছে তাদের মনিবগণ। তাদের অনুমতি ছাড়া দাসীদের বিবাহ সাধিত হয় না। অনুরূপভাবে দাসেরাও তাদের মনিবদের সম্মতি লাভ ছাড়া বিয়ে করতে পারে না।

হাদীস শরীফে রয়েছেঃ ‘যে দাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করে সে ব্যভিচারী।’ তবে যদি কোন দাসীর অধিকারিণী কোন স্ত্রীলোক হয় তবে তার অনুমতিক্রমে ঐ দাসীর বিয়ে ঐ ব্যক্তি দিয়ে দেবে যে স্ত্রীলোকের বিয়ে দিতে পারে। কেননা, হাদীস শরীফে রয়েছেঃ ‘নারী যেন নারীর বিয়ে না করায়, নারী যেন নিজের বিয়ে নিজে না দেয়, ঐ নারীরা ব্যভিচারিণী যারা নিজেরা নিজেদের বিয়ে দিয়ে থাকে।’

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-‘স্ত্রীদের মোহর সত্তুষ্টিতে দিয়ে দাও। তারা দাসী বলে তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ নির্ধারিত মোহর হতে কিছুই কম করো না।’

অতঃপর বলা হচ্ছে-‘তোমরা লক্ষ্য রাখ যে, নারীরা যেন নির্লজ্জতার কাজে আসঙ্গ না হয়, না তারা এমন হয় যে, কেউ যদি তাদের প্রতি আসঙ্গ হয় তবে তারাও তাদের প্রতি আসঙ্গ হয়ে পড়ে, না তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচারিণী হয়, না গোপনে গোপনে ব্যভিচার করে যে এদিকে ওদিকে গোপন বন্ধ খুঁজে বেড়ায়।’ যাদের মধ্যে এরূপ জঘন্য আচরণ রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করতে আল্লাহ তা'আলা চরমভাবে নিষেধ করেছেন। উহ্সিন্না শব্দের দ্বিতীয় পঠন আহ্সান্নাও রয়েছে। বলা হয়েছে যে, দু'টোর অর্থ একই। এখানে ‘<sup>حَسَانٌ</sup>’ শব্দের ভাবার্থ ইসলাম বা বিবাহিতা হওয়া।

মুসনাদ-ই-আহমাদের একটি মারফু’ হাদীসে রয়েছে যে, তাদের ‘<sup>حَسَانٌ</sup>’ হচ্ছে ইসলাম ও পবিত্রতা। কিন্তু এ হাদীসটি মুনকার এবং এতে দুর্বলতাও রয়েছে। একজন বর্ণনাকারীর নাম নেই। এরূপ হাদীস দলীলের যোগ্য নয়। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, ‘<sup>حَسَانٌ</sup>’ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে বিবাহ। হ্যরত ইবনে আবুবাস

(রাঃ), মুজাহিদ (রাঃ), ইকরামা (রঃ), তাউস (রঃ), ইবনে যুবাইর (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), কাতাদাহ (রঃ) প্রমুখের এটাই উক্তি।

হযরত আবু আলী তাবারী (রঃ) স্বীয় ‘ঈযাহ’ নামক গ্রন্থে হযরত ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ) হতে এটাই নকল করেছেন। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন, ‘দাসীর <sup>‘হ’</sup><sub>‘م’</sub> হওয়ার অর্থ এই যে, সে কোন স্বাধীন ব্যক্তির সাথে বিবাহিতা হয়ে যায়। অনুকূলপতাবে দাসের <sup>‘ح’</sup><sub>‘ص’</sub> হওয়া এই যে, সে কোন স্বাধীনা মুসলিমা নারীর সাথে বিবাহিত হয়।’ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এটা নকল করা হয়েছে। হযরত শা’বী (রঃ) ও হযরত নাখোও (রঃ) একথাই বলেন। এটাও বলা হয়েছে যে, এ দু’ পঠন হিসেবে অর্থ কখনও পরিবর্তিত হয়ে যায়। ‘উহসিন্না’ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে বিবাহ এবং ‘আহ্সান্না’ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে ইসলাম। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাই পছন্দ করেন। কিন্তু বাহ্যতঃ ভাবার্থ এখানে বিবাহই হবে। কেননা, আয়াতের পরবর্তী আলোচনা ওটাই প্রমাণ করছে। ‘আইমানের’ বর্ণনা তো শব্দসমূহের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে।’

মোটকথা জমহূরের মাযহাব অনুযায়ী আয়াতটির অর্থে এখনও জটিলতা রয়েছে। কেননা, জমহূরের উক্তি এই যে, দাসীকে ব্যভিচারের কারণে ৫০ চাবুক মারতে হবে, সে মুসলমানই হোক আর অবিশ্বাসিনীই হোক, বিবাহিতাই হোক বা অবিবাহিতাই হোক। অথচ আয়াতের অর্থে বুঝা যাচ্ছে যে, অবিবাহিতা দাসীর উপর কোন হন্দই নেই (শাস্তি নেই)। এর বিভিন্ন উভয় দেয়া হয়েছে। জমহূরের উক্তি এই যে, প্রকাশ্য অর্থ ভাবার্থের উপর অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। এ জন্যে যে সাধারণ হাদীসগুলোর মধ্যে দাসীদের হন্দ মারার বর্ণনা রয়েছে ঐগুলোকে আমরা এ আয়াতের ভাবার্থের উপর অগ্রগণ্য করেছি।

সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ) স্বীয় ভাষণে বলেন, ‘হে জনমণ্ডলী! নিজেদের দাসীদের উপর ‘হন্দ’ প্রতিষ্ঠিত কর, তারা বিবাহিতাই হোক আর অবিবাহিতাই হোক। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে তাঁর ব্যভিচারিণী দাসীকে ব্যভিচারের ‘হন্দ’ (শাস্তি) মারার নির্দেশ প্রদান করেন। সে সময় দাসীটি ‘নিফাসের’ অবস্থায় ছিল বলে আমার ভয় হয় যে, না জানি সে হন্দের চাবুক মারার কারণে মরেই যায়। তাই আমি সে সময় তাকে শাস্তি না দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘তুমি ভাল কাজই করেছ। সে ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ‘হন্দ’ লাগাবে না।’

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ ‘সে নিফাস হতে মুক্ত হলে তাকে পঞ্চাশ কোড়া মারবে।’ হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ ‘যখন তোমাদের মধ্যে কারও দাসী ব্যভিচার করে এবং তা প্রকাশ পেয়ে যায় তখন সে যেন তাকে হন্দ মারে, কিন্তু যেন তাকে শাসন গর্জন না করে। দ্বিতীয়বার যদি ব্যভিচার করে তবে আবার যেন শাস্তি দেয়, কিন্তু এবারেও যেন শাসন গর্জন না করে। তৃতীয়বার যদি যিনি করে এবং তা প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে যেন তাকে বিক্রি করে দেয়, যদিও চুলের রশির বিনিময়েও হয়।’

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, যদি তৃতীয়বার তার দ্বারা এ কাজ হয় তবে চতুর্থবার যেন বিক্রি করে দেয়। আবদুল্লাহ ইবনে আইয়াশ ইবনে আবু রাবী আল্মাখযুমী (রঃ) বলেন, ‘আমাদের কয়েকজন কুরাইশ যুবককে হ্যরত উমার ফারুক (রাঃ) রাষ্ট্রীয় দাসীদের কয়েক জনকে হন্দ মারার নির্দেশ দেন। আমরা তাদেরকে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে পঞ্চাশ চাবুক মারি।’ এটা তাঁদেরই দ্বিতীয় উন্নত যাঁরা একথার দিকে গেছেন যে, অবিবাহিতা দাসীদের উপর কোন শাস্তি নেই। তাঁরা বলেন যে, এ প্রহার শুধুমাত্র আদব দেয়ার জন্যে এবং এ কাজ হতে বিবরত রাখার জন্যে।

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ দিকেই গিয়েছেন। তাউস (রঃ), সাঈদ (রঃ), আবু উবায়েদ (রঃ) এবং দাউদ ইবনে আলী আয্যাহেরীরও (রঃ) এটাই মাযহাব। তাঁদের বড় দলীল হচ্ছে আয়াতের ভাবার্থ এবং শর্তের ভাবার্থ এটাই। অধিকাংশের নিকট এটাই নির্ভরযোগ্য। এ জন্যেই এটা সাধারণের উপর অগ্রগণ্য হতে পারে। আর হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) ও হ্যরত যায়েদ ইবনে খালিদ (রঃ)-এর হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞাসিত হন, ‘যখন অবিবাহিতা দাসী ব্যভিচার করে তখন তার হকুম কি?’ তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘যদি সে ব্যভিচার করে তবে তাকে হন্দ লাগাও, যদি পুনরায় ব্যভিচার করে তবে পুনরায় চাবুক মার, অতঃপর তাকে চুল দ্বারা পাকান রজ্জুর বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে দাও।’

হাদীসটির বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব (রঃ) বলেন, ‘আমি জানিনা যে, তৃতীয়বারের পর বলেছেন কি চতুর্থবারের পর বলেছেন।’ সুতরাং এ হাদীসটিকে অবলম্বন করে তাঁরা উন্নত দেন, ‘দেখুন এখানে হন্দের পরিমাণ ও চাবুকের সংখ্যা বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু বিবাহিতার ব্যাপারে পরিষ্কার বর্ণনা

দেয়া হয়েছে এবং কুরআন পাকের মধ্যে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, দাসীদের শাস্তি হচ্ছে স্বাধীনা নারীদের অর্ধেক। সুতরাং কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফের মধ্যে এভাবে আনুকল্য করা ওয়াজিব হয়ে গেল'। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এর চেয়েও অধিকতর স্পষ্ট হচ্ছে ঐ হাদীসটি যা হ্যরত সাঈদ ইবনে মানসুর (রাঃ) হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) হতে নকল করেছেন। হাদীসটি এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'কোন দাসীর উপর হন্দ নেই যে পর্যন্ত না সে বিবাহিতা হয়। অতএব যখন সে বিবাহিতা হবে তখন তার উপর বিবাহিতা স্বাধীনা নারীর অর্ধেক হন্দ হবে।' ইবনে খুয়াইমাও (রাঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, হাদীসটিকে মারফু' বলা ভুল, বরং এটা মাওকুফ হাদীস। অর্থাৎ এটা হ্যরত ইবনে আবাসেরই (রাঃ) উক্তি। বায়হাকী (রাঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর ফায়সালাও এটাই। তিনি বলেন যে, হ্যরত উমার (রাঃ) ও আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসগুলো একই ঘটনার মীমাংসা।

আর হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিরও কয়েকটি উন্নত রয়েছে। একতো এই যে, এটাকে উঠানে হয়েছে ঐ দাসীর উপর যে বিবাহিতা। এরূপে হাদীসদ্বয়ের মধ্যে আরও সাদৃশ্য একত্রিত হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় এই যে, এ হাদীসের 'হন্দ' শব্দটি কোন বর্ণনাকারী তুকিয়ে দিয়েছে এবং তার দলীল হচ্ছে উন্নরের প্রতারণা। তৃতীয় এই যে, এ হাদীসটি হচ্ছে দু'জন সাহাবীর এবং ঐ হাদীসটি শুধু একজন সাহাবীর এবং দুই ও একের মধ্যে দুই-ই অংগণ্য। এভাবেই এ হাদীসটি সুনান-ই-নাসাইর মধ্যেও বর্ণিত হয়েছে এবং ওর সনদ সহীহ মুসলিমের শর্তের উপর রয়েছে যে, হ্যরত ইবাদ ইবনে তামীর (রাঃ) তাঁর চাচা বদরী সাহাবী হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যখন দাসী ব্যভিচার করে তখন তাকে চাবুক মার, আবার করে তো আবার মার, পুনরায় ব্যভিচার করলে পুনরায় চাবুক মার, অতঃপর চুল দ্বারা পাকান একটি রঞ্জুর বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দাও'।

চতুর্থ উন্নত এই যে, কোন বর্ণনাকারী যে (‘গুল্ড’)-এর উপর হন্দ শব্দের প্রয়োগ করেছেন এতে কোন বৈচিত্র নেই এবং তিনি হয়তো 'জিল্দ'-কে 'হন্দ' ধারণা করে থাকবেন কিংবা হয় তো আদব দেয়ার উদ্দেশ্যে শাস্তি দেয়ার উপর হন্দ শব্দের প্রয়োগ করেছেন। যেমন হন্দ শব্দের প্রয়োগ ঐ শাস্তির উপরও করা

হয়েছে যে রুগ্ন ব্যভিচারীকে একটি খেজুরের গুচ্ছ দ্বারা প্রহার করেছিল যে গুচ্ছে ছোট ছোট একশটি শাখা ছিল। আর যেমন ‘হন্দ’ শব্দের প্রয়োগ ঐ ব্যক্তির উপরও করা হয়েছে যে স্বীয় স্ত্রীর ঐ দাসীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছিল যে দাসীকে তার স্ত্রী তার জন্যে হালাল করেছিল। তবুও তাকে শুধুমাত্র শাসনমূলক শাস্তির জন্যে একশ চাবুক মারা হয়েছিল।

এটা ইমাম আহমাদ (রাঃ) প্রমুখ পূর্ববর্তী মনীষীর ধারণা। কিন্তু প্রকৃত ‘হন্দ’ শুধু এই যে, অবিবাহিতকে একশ চাবুক মারা হবে এবং বিবাহিতকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। হ্যরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর ঘোষণা এই যে, দাসীর যে পর্যন্ত বিয়ে না হবে সে পর্যন্ত তাকে ব্যভিচারের জন্যে প্রহার করা হবে না। এর ইসনাদ বিশুদ্ধ বটে, কিন্তু এর দু’টো অর্থ হতে পারে। একতো এই যে, তাকে মোটেই প্রহার করা হবে না। ‘হন্দের’ও না, অন্য কোন শাস্তিরও না। এটা অর্থ হলে এ উক্তি সম্পূর্ণই গারীব। হতে পারে যে, তিনি শব্দের প্রতি লক্ষ্য করেই এ ফতওয়া দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট হয়তো হাদীস পৌছেন। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, তাকে হন্দ মারা হবে না। যদি এ অর্থ নেয়া হয় তবে এটা ওর উল্টো নয় যে, তাকে অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে। তাহলে এটা হ্যরত ইবনে আবুস সাঈদ (রাঃ) প্রমুখ মনীষীর ফতওয়ার অনুরূপ হয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ পাকেরই আছে।

তৃতীয় উক্তির এই যে, বিবাহিতা দাসীর উপর স্বাধীনা নারীর তুলনায় অর্ধেক শাস্তি হওয়ার প্রমাণ আয়াতে কারীমায় রয়েছে। কিন্তু বিবাহিতা হওয়ার পূর্বে কিতাব ও সুন্নাতের সাধারণত্বের মধ্যে এও জড়িত রয়েছে যে তাকেও একশ চাবুক মারা হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেন-

الَّزَانِيْةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ

অর্থাৎ ‘ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষের প্রত্যেককে একশ চাবুক মার।’ (২৪: ২)

আর যেমন হ্যরত ‘উবাদা’ ইবনে সামিত (রাঃ)-এর হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘তোমরা আমার কথা গ্রহণ কর, আমার কথা বুঝো নাও, আল্লাহ তাদের জন্যে রাস্তা বের করে দিয়েছেন, যদি উভয়ই অবিবাহিত ও অবিবাহিতা হয় তবে একশ চাবুক ও এক বছর নির্বাসন। আর যদি দু’জনই বিবাহিত ও বিবাহিতা হয় তবে এক বছর নির্বাসন ও প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করণ’।

এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম শরীফেও রয়েছে এবং এ প্রকারের আরও হাদীস রয়েছে। হ্যরত দাউদ ইবনে আলী আয্যাহেরী (রঃ)-এরও এটাই উক্তি। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুর্বল। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বিবাহিতা দাসীদেরকে স্বাধীনা নারীদের তুলনায় অর্ধেক চাবুক মারার বর্ণনা দিয়েছেন অর্থাৎ পঞ্চাশ চাবুক। তাহলে যদি সে বিবাহিতা না হয় তদুপরি তাকে তার চেয়েও অধিক চাবুক কিরূপে মারা যেতে পারে? অথচ শরীয়তের তো আইন এই যে, বিবাহের পূর্বে শাস্তি কম হবে এবং বিবাহের পর শাস্তি বেশী হবে। সুতরাং এর বিপরীত কিরূপে সঠিক হতে পারে?

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর সাহাবীগণ অবিবাহিতা দাসীর ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন এবং তিনি উত্তর দিচ্ছেনঃ ‘তাকে চাবুক মার’। কিন্তু ‘একশ চাবুক মার’ একথা বলছেন না। সুতরাং যদি তার এ হৃকুমই হতো, যেমন দাউদ ইবনে আলী আয্যাহেরী (রঃ) বুঝেছেন, তবে সে হৃকুম বর্ণনা করে দেয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওয়াজিব হতো। কেননা, তাঁদের এ প্রশ্ন তো শুধু এজন্যেই ছিল যে, দাসী বিবাহিতা হয়ে যাওয়ার পর তাকে একশ চাবুক মারার বর্ণনা দেয়া হয়নি। নচেৎ এ শর্ত লাগানোর কি প্রয়োজন ছিল যে, তাঁরা বলছেন, ‘যদি সে বিবাহিতা না হয়?’ কেননা, ঐরূপ হলে বিবাহিতা ও অবিবাহিতার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতো না যদি এ আয়াত অবতীর্ণ না হতো।

কিন্তু যেহেতু এ দু' অবস্থার মধ্যে একটি অবস্থা সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত হয়েই গিয়েছিলেন, এ জন্যেই দ্বিতীয় অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, সাহাবীগণ যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর উপর দর্কন পাঠ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তা বর্ণনা করেন।

অতঃপর তিনি বলেনঃ ‘ইসলাম তো এরকমই যেরকম তোমাদের জানা আছে।’ অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنَا صَلَوَا عَلَيْهِ وَسِلَمُوا (৩৩ : ৫৬) আল্লাহ তা'আলার এ ফরমান অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)- এর উপর দর্কন ও সালাম পাঠাবার নির্দেশ দেয়া হয় তখন সাহাবীগণ বলেন, ‘সালামের নিয়ম ও ওর শব্দগুলো তো আমাদের জানা আছে, আপনি ‘সালাতের’ অবস্থা বর্ণনা করুন।’ সুতরাং এ প্রশ্নটিও ঠিক ঐ রকমই।

আয়াতের ‘মাফছ্মের’ চতুর্থ উত্তর হচ্ছে আবু সাউরের উত্তর যা দাউদের উত্তর হতেও বেশী দুর্বল। তিনি বলেন, ‘যখন দাসীরা বিবাহিতা হয়ে যাবে তখন তাদের ব্যভিচারের ‘হন্দ’ হবে বিবাহিতা স্বাধীনা ব্যভিচারিণী নারীদের হন্দের অর্ধেক।’ তাহলে এটাতো স্পষ্ট কথা যে, বিবাহিতা স্বাধীনা ব্যভিচারিণী নারীদের শান্তি হচ্ছে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা। আর এটাও স্পষ্ট কথা যে, এরূপ শান্তির অর্ধেক করা যায় না। সুতরাং সে অবস্থায় দাসীদেরকেও হত্যা করতে হয় এবং বিবাহের পূর্বে পঞ্চাশ চাবুক মারতে হয়। কেননা, বিবাহের পূর্বে স্বাধীনা নারীদের একশ চাবুক মারার নির্দেশ রয়েছে।

অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে ভাবার্থ বুঝাতেই তিনি ভুল করেছেন। এটা জমত্তুরের মতেরও বিপরীত। এমন কি ইমাম শাফিউদ্দিন (রাঃ) বলেন, ‘কোন মুসলমানের এতে মতবিরোধ নেই যে, দাস দাসীর ব্যভিচারের শান্তি ‘রজম’ অর্থাৎ পাথর মেরে হত্যা করা মোটেই নয়। কেননা, আয়াত এটা প্রমাণ করছে যে, তাদের উপর স্বাধীনা নারীদের তুলনায় অর্ধেক শান্তি<sup>١</sup> মুক্তি<sup>٢</sup> শব্দে যে হচ্ছে তা হচ্ছে -عَهْدُ لِمُحَمَّدٍ- এর আলিফ লাম। অর্থাৎ সেই মুক্তি<sup>৩</sup>-এর মধ্যে যাদের বর্ণনায় আয়াতের প্রারম্ভের অর্ধেক শান্তি<sup>৪</sup> হচ্ছে। এর মধ্যে হয়ে গেছে। এর ভাবার্থ শুধুমাত্র স্বাধীনা নারীগণ। এ সময় এখানে স্বাধীনা নারীদের বিবাহের মাসআলার আলোচনা নয় বরং আলোচনা হচ্ছে এই যে, ইরশাদ হচ্ছে-‘স্বাধীন নারীদের ব্যভিচারের যে শান্তি ছিল, দাসীদের উপর তার অর্ধেক শান্তি।’ তাহলে জানা গেল যে, এটা ঐ শান্তির বর্ণনা, যা অর্ধেক হতে পারে এবং তা হচ্ছে চাবুক। যেমন একশর অর্ধেক পঞ্চাশ। কিন্তু ‘রজম’ এমন এক শান্তি যার অংশ হতে পারে না। এ বিষয়ে আল্লাহ তা’আলা সবচেয়ে ভাল জানেন।

মুসনাদ-ই-আহমাদে একটি ঘটনা রয়েছে, যা আবু সাউরের মাযহাবের পূর্ণ খণ্ডনকারী। ঘটনাটি এই যে, সুফিয়া নামী একটি দাসী একজন দাসের সঙ্গে ব্যভিচার করে এবং ঐ ব্যভিচারের ফলেই একটি শিশুর জন্ম হয়। ব্যভিচারী দাসটি শিশুটির দাবী করে। মুকাদ্দমাটি হযরত উসমান (রাঃ)-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। হযরত উসমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর উপর এর মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলল্লাহ (সঃ) স্বয়ং এ ব্যাপারে যে মীমাংসা করেছেন আমিও সে মীমাংসাই করবো। শিশুটি হবে দাসীর মনিবের এবং ব্যভিচারীর জন্যে পাথর রয়েছে।’ অতঃপর উভয়কে পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে চাবুক মারেন।

এও বলা হয়েছে যে, 'মাফহূম'-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উপর হতে নীচের উপর সতর্কতা। অর্থাৎ যখন সে বিবাহিতা হবে তখন তার 'হন্দ' হবে স্বাধীনা নারীদের তুলনায় অর্ধেক। অতএব, তাদের উপর 'রজুম' তো কোন অবস্থাতেই নেই। বিয়ের পূর্বেও নেই, পরেও নেই। উভয় অবস্থাতেই শুধু চাবুকই রয়েছে। এর দলীল হচ্ছে হাদীস। 'ইফসাহ' নামক গ্রন্থের লেখক এ কথাই বলেন। ইবনে আবদিল হাকাম (রাঃ) ইমাম শাফিউ (রাঃ) হতেও এটা বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হকী দ্বীয় পুস্তক কিতাবুস সুনানে ওয়াল আ'সারের মধ্যে এটা এনেছেন। কিন্তু এ উক্তি আয়াতের শব্দ হতে বহু দূরে রয়েছে। কেননা, অর্ধেক শাস্তি হবার দলীল শুধু কুরআন কারীমের আয়াত, অন্য কিছুই নয়। সূতরাঃ ওটা ছাড়া অন্য কিছুর অর্ধেক হওয়া কিরণে বুঝা যাবে?

এটাও বলা হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে বিবাহিতা হওয়া অবস্থায় শুধুমাত্র ইমামই 'হন্দ' কায়েম করতে পারেন, এ অবস্থায় এ দাসীর মনিব তার উপর 'হন্দ' জারী করতে পারে না। ইমাম আহমাদ ইবনে হাষলের মাযহাবে একটি উক্তি এটাই। তবে বিয়ের পূর্বে দাসীর মনিবের এ অবস্থায় তার উপর 'হন্দ' জারী করার অধিকার রয়েছে এমন কি তার উপর নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই 'হন্দ' অর্ধেকই থাকবে। এটাও কিন্তু বহু দূরের কথা। কেননা, আয়াতের মধ্যে এরও প্রমাণ নেই। যদি এ আয়াতটি না হতো তবে আমরা জানতে পারতাম না যে, দাসীদের ব্যাপারে অর্ধেক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে এবং সে অবস্থায় তাদেরকেও সাধারণেই অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ণ 'হন্দ' অর্থাৎ একশ চাবুক এবং প্রস্তর নিষ্কেপে হত্যার হকুম তাদের উপরও জারী করা ওয়াজিব হতো। যেমন সাধারণ বর্ণনা দ্বারা এটা সাব্যস্ত রয়েছে।

হ্যরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'হে জনগণ! তোমাদের অধীনস্থ দাসীদের উপর 'হন্দ' জারী কর। বিবাহিতাই হোক আর অবিবাহিতাই হোক। তাছাড়া পূর্ব বর্ণিত অন্যান্য সাধারণ হাদীসগুলোর মধ্যেও স্বামীবিশিষ্টা বা স্বামীহীনার কোন ব্যাখ্যা নেই। হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে হাদীসটিকে জম্হূর দলীলরূপে প্রহণ করেছেন তা এই যে, যখন তোমাদের কারও দাসী ব্যতিচার করে, অতঃপর তার ব্যতিচার প্রকাশিত হয় তখন তার উপর 'হন্দ' জারী করা তার উচিত এবং পরে শাসন গর্জন করা উচিত নয়।

মোটকথা, দাসীর ব্যতিচারের শাস্তির ব্যাপারে কয়েকটি উক্তি রয়েছে। প্রথমতঃ এই যে, তার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তাকে পঞ্চাশ চাবুক মারতে হবে

এবং বিয়ে হওয়ার পরেও এ শাস্তি থাকবে। কিন্তু তাকে নির্বাসন দেয়া হবে কি-না সে ব্যাপারে তিনটি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তি এই যে, তাকে নির্বাসন দেয়া হবে। দ্বিতীয় এই যে, তাকে নির্বাসন দেয়া হবে না। তৃতীয় উক্তি এই যে, তার নির্বাসন অর্ধসমাপ্ত রাখা হবে। অর্থাৎ ছ’মাসের নির্বাসন হবে, পূর্ণ এক বছরের নয়। পূর্ণ এক বছর নির্বাসন হলো স্বাধীনা নারীদের জন্যে। এ তিনটি উক্তিই ইমাম শাফিউর মাযহাবেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আবু হানীফা (রাঃ)-এর মতে নির্বাসন শুধুমাত্র শাসনমূলক শাস্তি, ‘হন্দ’ হিসেবে নয়। এটা ইমামের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। তিনি নির্বাসন দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। পুরুষ ও নারী উভয়ই এ হন্দুমেরই অন্তর্গত।

তবে ইমাম মালিকের মাযহাব এই যে, নির্বাসন শুধু পুরুষদের জন্যে, নারীদের জন্যে নয়। কেননা, নির্বাসন তো শুধু তার নিরাপত্তার জন্যে এবং নারীদেরকে যদি নির্বাসন দেয়া হয় তবে নিরাপত্তা হতে বেরিয়ে যাবে। নর ও নারীদেরকে দেশান্তর করা সম্বন্ধীয় হাদীস শুধুমাত্র হ্যরত উবাদাহ ইবনে সাবিত (রাঃ) এবং হ্যরত আবু হৱাইরা (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অবিবাহিতা ব্যক্তিচারীর ব্যাপারে ‘হন্দ’ মারার এবং এক বছর দেশান্তর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (সহীহ বুখারী) এর ভেতরে উদ্দেশ্যে এটাই ছিল যে, এতে তার নিরাপত্তা থাকবে, কিন্তু নারীকে দেশান্তর করাতে কোন নিরাপত্তা নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ তা’আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, অবিবাহিতা দাসীকে ব্যক্তিচারের কারণে পঞ্চাশ চাবুক মারতে হবে এবং তাকে আদব দেয়ার উদ্দেশ্যে কিছু মারপিট করতে হবে। কিন্তু তার জন্যে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, বিবাহের পূর্বে তাকে মারা হবে না, যেমন হ্যরত সাইদ ইবনে মুসাইয়াব (রাঃ)-এর উক্তি। কিন্তু যদি তার ভাবার্থ এই হয় যে, তাকে মোটেই না মারা উচিত তবে এটা জটিল ব্যাখ্যাযুক্ত মাযহাব হবে। নচেৎ তাকে দ্বিতীয় উক্তির অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

সে উক্তিটি এই যে, বিবাহের পূর্বে একশ চাবুক এবং বিবাহের পর পঞ্চাশ চাবুক। যেমন দাইদ ইবনে আলী আয়াহেরীর উক্তি এবং এটাই হচ্ছে সমস্ত উক্তির মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল উক্তি এবং এটাও অন্তর্দৃশ্য যে, বিয়ের পূর্বে পঞ্চাশ

চাবুক ও বিয়ের পর ‘রজম’। যেমন আবু সাউরের উক্তি। সঠিক কথা আল্লাহ পাকই সবচেয়ে বেশী জানেন।

এরপরে বলা হচ্ছে-‘উপরোক্ত শর্তগুলোর বিদ্যমানতায় দাসীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হলো এই লোকদেরকে যাদের ব্যভিচারে পতিত হয়ে যাবারও ভয় রয়েছে এবং স্ত্রী মিলনের উপর ধৈর্যধারণ কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তাদের জন্যে অবশ্যই পবিত্র দাসীদের সাথে বিবাহ বৈধ।’ সে সময়েও কিন্তু ধৈর্যধারণ করতঃ দাসীদেরকে বিয়ে না করাই উত্তম। কেননা, তাদের গর্ভে যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তারা তাদের মনিবের দাসী বা দাস হবে। হ্যাঁ, তবে যদি তাদের স্বামী দরিদ্র হয় তবে ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ)-এর প্রাচীন উক্তি অনুযায়ী এ সন্তানগুলোর অধিকারী তাদের মনিব হবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা’আলা বলেন- যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর তবে এটা তোমাদের জন্যে উত্তম এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। জমহুর উলামা এ আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, দাসীর সঙ্গে বিবাহ বৈধ। তবে এটা অবশ্যই বৈধ সে সময় যে সময় স্বাধীনা নারীদেরকে বিয়ে করার ক্ষমতা না থাকবে এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে দমন করারও শক্তি থাকবে না। বরং ব্যভিচারে পতিত হয়ে যাবারও ভয় থাকবে। কেননা, এতে একটি অসুবিধা এই রয়েছে যে, এর ফলে সন্তানেরা দাসত্বে আবদ্ধ হয় এবং স্বাধীনা নারীদেরকে ছেড়ে দিয়ে দাসীদেরকে বিয়ে করায় এক প্রকারের মানহানির কারণ হয়। তবে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও তাঁর সহচরগণ জমহুরের বিপরীত মতপোষণ করেন। তাঁরা বলেন যে, এ দু’টো শর্ত নেই বরং যার বিয়েতে কোন স্বাধীনা নারী নেই তার জন্যে দাসীকে বিয়ে করা বৈধ। এই দাসী মুসলমানই হোক বা আহলে কিতাবই হোক, যদিও তার আয়াদ নারীকে বিয়ে করার ক্ষমতাও থাকে এবং যদিও তার নির্লজ্জতার কাজে পতিত হওয়ার ভয়ও না থাকে। এর বড় দলীল হচ্ছে নিম্নের আয়াতটিঃ

وَالْمُحْكَمُ صَنْتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ

অর্থাৎ ‘এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পবিত্র ও পরহেজগার নারীদেরকে (বিয়ে কর)।’ তাঁরা বলেন যে, আয়াতটি সাধারণ। এর মধ্যে স্বাধীনা ও দাসী সবাই জড়িত রয়েছে।<sup>১</sup> বলা হয় পবিত্র ও পরহেজগার মহিলাদেরকে। কিন্তু এর বাহ্যিক লক্ষণও ঐ মাসআলার উপরই রয়েছে যা জমহুরের মাযহাব। এ বিষয়ে আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন।

২৬। আল্লাহ তোমাদের জন্যে  
বর্ণনা করতে এবং  
তোমাদেরকে তোমাদের  
পূর্ববর্তীগণের আদর্শসমূহ  
প্রদর্শন করতে ও তোমাদেরকে  
ক্ষমা করতে ইচ্ছে করেন এবং  
আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

২৭। আর আল্লাহ তোমাদেরকে  
ক্ষমা করতে ইচ্ছে করেন এবং  
যারা প্রবৃত্তির পূজারী তারা  
ইচ্ছে করে যে, তোমরা ঘোর  
অধঃপতনে পতিত হও।

২৮। আল্লাহ তোমাদের সাথে লঘু  
ব্যবহার করতে চান-যেহেতু  
মানুষ দুর্বল (ক্লপে) সৃষ্টি  
হয়েছে।

কুরআন ঘোষণা করে- ‘হে মুমিনগণ! আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর  
হালাল ও হারাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে চান, যেমন এ সূরায় এবং অন্যান্য  
সূরাসমূহে তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী  
লোকদের প্রশংসনীয় পথে চালাতে চান, যেন তোমরা তাঁর শরীয়তের উপর  
আমল করতে থাক যে কাজ তাঁর নিকট প্রিয় ও যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট। তিনি  
তোমাদের তাওবা কবুল করতে চান। যে পাপ ও অন্যায়কার্য হতে তোমরা  
তাওবা করে থাক সে তাওবা তিনি সত্ত্বে কবুল করে থাকেন। তিনি মহাজ্ঞানী  
ও মহা বিজ্ঞানময়। স্বীয় শরীয়তে, স্বীয় অনুমানে, স্বীয় কার্যে ও স্বীয় ঘোষণায়  
তিনি সঠিক জ্ঞান ও পূর্ণ নিপুণতার অধিকারী। প্রবৃত্তি পূজারীরা অর্থাৎ শয়তানের  
দাস ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানেরা এবং অসৎ লোকেরা তোমাদের পদস্থলন ঘটিয়ে  
তোমাদেরকে সত্য ও সরল পথ হতে সরিয়ে দিয়ে অন্যায় ও অসত্যের পথে  
চালাতে চায়। আল্লাহ তা‘আলা শরীয়তের আহকাম নির্ধাণের ব্যাপারে  
তোমাদের পথ সহজ করতে চান এবং এর উপর ভিত্তি করেই কতগুলো শর্ত

٢٦- يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ  
وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ  
٢٧- وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَوَبَ  
عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ  
الشَّهُوتَ أَنْ تَمِيلُوا مِيَالًا  
عَظِيمًا

٢٨- يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَخْفِفَ عَنْكُمْ  
وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

সূরাঃ নিসা ৪

আরোপ করতঃ দাসীদেরকে বিয়ে করে নেয়া তোমাদের জন্যে বৈধ করেছেন। মানুষ জন্মগত দুর্বল বলে মহান আল্লাহ স্বীয় আহকামের মধ্যে কোন কাঠিন্য রাখেননি। মানুষ সৃষ্টিগতই দুর্বল বলে তার আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি দুর্বল। তারা স্ত্রীদের ব্যাপারে দুর্বল। তারা এখানে এসে একেবারে বোকা বনে যায়।

তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মিরাজের রাত্রে ‘সিদরাতুল মুনতাহা’ হতে ফিরে আসেন এবং হ্যরত মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘আপনার উপর কি ফরয করা হয়েছে?’ তিনি বলেনঃ ‘প্রত্যহ দিন রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায।’ তখন হ্যরত মূসা (আঃ) বলেনঃ ‘আপনি ফিরে যান এবং মহান আল্লাহর নিকট লঘুকরণের জন্যে প্রার্থনা করুন। আপনার উম্মতের মধ্যে এটা পালনের শক্তি নেই। আপনার পূর্ববর্তী লোকদেরকে আমি পরীক্ষা করেছি। তারা এর চেয়ে বহু কমেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। আর আপনার উম্মত তো কর্ণের, চক্ষুর এবং অন্তরের দুর্বলতায় তাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে।’

অতএব রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফিরে যান এবং দশ ওয়াক্ত কমিয়ে আনেন। পুনরায় হ্যরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে একই আলোচনা হয়। তিনি পুনরায় “ফিরে যান এবং আবার দশ ওয়াক্ত কম করিয়ে আনেন। অবশেষে পাঁচ ওয়াক্ত থেকে যায়।

২৯। হে মুমিনগণ! তোমরা  
পরম্পর সম্ভতিক্রমে ব্যবসা  
ব্যতীত অন্যায়ভাবে  
পরম্পরের ধন-সম্পত্তি থাস  
করো না এবং তোমরা  
নিজেদেরকে হত্যা করো না;  
নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের  
প্রতি ক্ষমাশীল।

৩০। আর সীমা অতিক্রম করে ও  
অত্যাচার করে যে এ কাজ  
করে, ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি  
তাকে জাহানামে নিক্ষেপ  
করবো এবং এটা আল্লাহর  
পক্ষে সহজসাধ্য।

٢٩- يَا يَهُوَ أَلِّيَّا الدِّينِ امْنَوْ لَا تَأْكِلُوا أَمْ وَالَّكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

৩- وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَذَوْ نَأَيْ وَظَلْمًا فَسَوْ فَنْصِلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

৩১। তোমরা যদি সেই মহা  
পাপসমূহ হতে বিরত হও যা  
হতে তোমাদেরকে নিষেধ করা  
হয়েছে, তাহলেই আমি  
তোমাদের অপরাধ ক্ষমা  
করবো এবং তোমাদেরকে  
সম্মান-প্রদ গন্তব্যস্থানে প্রবিষ্ট  
করবো ।

۳۱- إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَارَ مَا  
تَنْهَوْنَ عَنْهُ وَمَا  
سِيَّاتِكُمْ وَنَدِخْلَكُمْ مَدْخَلًا  
كَرِيمًا ۝

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইমানদার বান্দাদেরকে একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে  
ভক্ষণ করতে নিষেধ করছেন। সে উপার্জনের দ্বারাই হোক যা শরীয়তে হারাম,  
যেমন-সুদ খাওয়া, জুয়া খেলা বা এরকমই প্রত্যেক প্রকারের কৌশলের দ্বারাই  
হোক, যদিও এটাকে শরীয়তে বৈধ রাখা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ  
তা'আলা খুব ভালই জানেন। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হচ্ছে,  
একটি লোক কাপড় ক্রয় করছে এবং বলছে, ‘আমার যদি পছন্দ হয় তবে রেখে  
দেব, নচেৎ কাপড় এবং একটি দিরহাম ফিরিয়ে দেব’। এর হুকুম কি? হ্যরত  
ইবনে আব্বাস (রাঃ) আয়াতটি পাঠ করেন। অর্থাৎ তাকে অন্যায়ভাবে মাল  
ভক্ষণকারীর অন্তর্ভুক্ত করেন। হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি  
'মুহাকাম' অর্থাৎ রহিত নয়। এটা কিয়ামত পর্যন্ত রহিত হতে পারে না। হ্যরত  
আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন  
মুসলমানগণ একে অপরের মাল ভক্ষণ করা পরিত্যাগ করেন। যার ফলে لِسْ  
عَلَى الْأَعْسَمِ حَرْجٌ (৪৮: ১৭) আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তিজারাতান শব্দটিকে  
তিজারাতুনও পড়া হয়েছে। এটি استثناءً منقطع - যেমন বলা হচ্ছে-‘অবৈধতাযুক্ত  
কারণসমূহ দ্বারা মাল জমা করো না।’ কিন্তু শরীয়তের পস্থায় ব্যবসা দ্বারা লাভ  
করা বৈধ, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিক্রমে হয়ে থাকে। যেমন অন্য জায়গায়  
বলা হয়েছে-‘কোন নিষ্পাপ প্রাণকে মেরো না। তবে হকের সঙ্গে হলে জায়েয  
আছে।’ যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে-‘তথায় তারা প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর মৃত্যুর  
স্বাদ গ্রহণ করবে না।’

হ্যরত ইমাম শাফিফ্স (রঃ) এ আয়াত হতে দলীল গ্রহণ করে বলেন, ‘সম্মতি  
ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় শুন্দ হয় না। কেননা, এটাই হচ্ছে সম্মতির পূর্ণ সনদ। শুধুমাত্র  
আদান-প্রদান কখনও সম্মতির উপর দলীল হতে পারে না।’ জমাহুর এর বিপরীত

মতপোষণ করেন। অন্যান্য তিনজন ইমামের উক্তি এই যে, মৌখিক কথা বার্তা যেমন সম্মতির প্রমাণ, অদ্রপ আদান-প্রদানও সম্মতির দলীল। কোন কোন মনীষী বলেন যে, কম মূল্যবান সাধারণ জিনিসে শুধু লেন-দেনই যথেষ্ট এবং এরকমই ব্যবসার সে নিয়ম থাকে। সহীহ মাযহাবে তো সতর্কতামূলক দৃষ্টিতে কথা বার্তায় স্বীকৃতি থাকা অন্য কথা। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ক্রয়-বিক্রয় হোক বা দান হোক, সব কিছুর মধ্যেই এ হ্রকুম রয়েছে। তাফসীর-ই-ইবনে জারীর (রঃ)-এর একটি ‘মারফু’ হাদীসে রয়েছেঃ ‘ব্যবসা হচ্ছে সম্মতি এবং ব্যবসার পরেই ইখতিয়ার রয়েছে। কোন মুসলমানের অন্য মুসলমানকে প্রতারিত করা বৈধ নয়।’ এ হাদীসটি ‘মুরসাল’। মজলিসের শেষ পর্যন্তও পূর্ণ সম্মতির অধিকার রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েরই পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ইখতিয়ার রয়েছে।’ এ হাদীস অনুসারেই ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম শাফিউ (রঃ) এবং তার সহচরদের ফতওয়া রয়েছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমতুরেরও ফতওয়া এর উপরে ভিত্তি করেই। এ পূর্ণ সম্মতির মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের তিন দিন পরে ইখতিয়ার দেয়াও জড়িত রয়েছে যদিও সে ইখতিয়ার পূর্ণ এক বছরের জন্যেও হয়, যেমন গ্রামবাসী প্রভৃতি লোকদের মধ্যে রয়েছে।

ইমাম মালিক (রঃ)-এর প্রসিদ্ধ মাযহাব এটাই, যদিও তাঁর মতে শুধুমাত্র আদান-প্রদান দ্বারাই ক্রয়-বিক্রয় শুন্দ হয়ে থাকে। শাফিউ মাযহাবেরও একটা উক্তি এটাই এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, মানুষ ব্যবসায়ের জন্যে যে অল্প মূল্যের সাধারণ জিনিস রেখে থাকে তাতে শুধুমাত্র আদান-প্রদানই যথেষ্ট হবে। আসহাবের কারও কারও ইখতিয়ার এটাই, যেমন মুওফাকুন আলাইহি।

এরপর বলা হচ্ছে—‘আল্লাহ তা'আলার হারাম কাজগুলো করে এবং তাঁর অবাধ্য হয়ে, আর অন্যায়ভাবে একে অপরের মাল ভক্ষণ করে তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধূংস করো না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর অত্যন্ত দয়ালু। তাঁর প্রত্যেক আদেশ ও নিষেধ দয়ায় পরিপূর্ণ।’

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আমর ইবনে আল আস (রাঃ)-কে ‘যাতুস্সালাসিলের’ যুদ্ধের বছরে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি

বলেন, একদা কঠিন শীতের রাত্রে আমার স্বপ্নদোষ হয়, এমনকি গোসল করাতে আমি আমার জীবনের উপর ভয় করি। সুতরাঃ আমি তায়াশুম করে নিয়ে আমার জামাআতকে ফজরের নামায পড়িয়ে দেই। অতঃপর ফিরে এসে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হই। তাঁর নিকট আমি আমার এ ঘটনাটি বর্ণনা করি।

তিনি বলেনঃ ‘তুমি কি তাহলে অপবিত্র অবস্থায় তোমার সঙ্গীদেরকে নামায পড়িয়েছ?’ আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কঠিন ঠাণ্ডা ছিল এবং আমার প্রাণের ভয় ছিল। অতঃপর আমার মনে পড়ে গেল যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন-‘তোমরা নিজেদেরকে ধ্রংস করো না।’ একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে উঠেন এবং আমাকে কিছুই বলেননি।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, লোকেরাই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করেছিলেন এবং তিনি জিজ্ঞেস করায় হ্যরত আমর ইবনে আস (রাঃ) এ ওয়র পেশ করেছিলেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছেঃ ‘যে..ব্যক্তি কোন লোহা দ্বারা আঘাত্য করবে, সে কিয়ামত পর্যন্ত জাহানামের মধ্যে লোহা দ্বারা আঘাত্য করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি জেনে-শুনে জীবন দেয়ার উদ্দেশ্যে বিষপান করবে, সে সদা-সর্বদার জন্যে জাহানামে বিষপান করতে থাকবে।’

আর একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ ‘যে নিজেকে যে জিনিস দ্বারা হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সে জিনিস দ্বারা শান্তি দেয়া হবে।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘোষণায় রয়েছেঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে একটি লোক আহত হয়। সে ছুরি দিয়ে স্বীয় হাত কেটে দেয়। রক্ত বন্ধ হয় না এবং তাতেই সে মারা যায়। তখন আল্লাহ পাক বলেন-‘আমার বান্দা নিজেকে ধ্রংস করার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করেছে, সুতরাঃ আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।’

এজন্যেই আল্লাহ তা‘আলা এখানে বলেন-‘যে কেউ অত্যাচার ও সীমা অতিক্রম করে একাজ করবে, অর্থাৎ হারাম জেনেও স্বীয় বীরত্বপূর্ণ দেখিয়ে ঐ কাজ করবে, সে জাহানামী হবে।’ সুতরাঃ প্রত্যেকেরই এ কঠিন ভীতি প্রদর্শন ব্যাপারে ভয় করা উচিত। অন্তরের পর্দা খুলে আল্লাহ তা‘আলার এ নির্দেশ শ্রবণ করতঃ হারাম কাজ হতে (মানুষের) বিরত থাকা উচিত।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন-‘তোমরা যদি বড় বড় পাপ হতে বেঁচে থাক তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবো।’

হয়রত আনাস (রাঃ) হতে মারফু' রূপে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমরা ওর মত কিছুই দেখিনি যা আমাদের প্রভুর পক্ষ হতে আমাদের নিকট পৌছেছে, অতঃপর আমরা তাঁর জন্যে আমাদের পরিবার ও সম্পদ হতে পৃথক হবো না যে, তিনি আমাদের বড় বড় পাপগুলো ছাড়া ছোট ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন'। এরপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। এ আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীসও রয়েছে। আমরা কিছু কিছু এখানে বর্ণনা করছি।

মুসনাদ-ই-আহমাদে হয়রত সালমান ফারেসী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেনঃ 'জুম'আর দিন কি, তা তুমি জান কি?' আমি উত্তরে বলি, ওটা ঐদিন যে দিনে আল্লাহ তা'আলা আমাদের পিতা হয়রত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি জমা করেন।'

তিনি বলেনঃ 'আমি যা জানি তা শুন। যে ব্যক্তি এ দিন ভালভাবে পবিত্রতা লাভ করতঃ জুম'আর নামাযের জন্যে আগমন করে এবং নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করে, তার সে কাজ পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত সমস্ত পাপ মোচনের কারণ হয়ে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে হত্যা কাজ হতে বেঁচে থাকে'।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে, হয়রত আবু হুরাইরা (রাঃ) ও হয়রত সাঈদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ভাষণ দান কালে বলেনঃ 'যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাঁর শপথ!' এ কথা তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর তিনি মাথা নীচু করেন। আমরা সকলেই নীচু করি এবং জনগণ কাঁদতে আরম্ভ করে। আমাদের অন্তর কেঁপে উঠে যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) কোন্ জিনিসের উপরই বা শপথ করলেন এবং নীরবতাই বা অবলম্বন করলেন কেন? অল্লক্ষণ পরে তিনি মন্তক উত্তোলন করেন এবং তাঁর চেহারা প্রফুল্ল ছিল, যা দেখে আমরা এত খুশী হই যে, আমরা লাল রঙের উট পেলেও এত খুশী হতাম না। তখন তিনি বলতে আরম্ভ করেনঃ 'যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রম্যানের রোয়া রাখে, যাকাত আদায় করে এবং সাতটি কাবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকে, তার জন্যে জালাতের সমস্ত দরজা খুলে রাখা হবে এবং তাকে বলা হবে-'নিরাপত্তার সাথে তথায় চলে যাও।'

তাতে যে সাতটি পাপের উল্লেখ আছে তার বিস্তারিত বিবরণ সহীহ বুখারী ও মুসলিমে নিম্নরূপ এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'ধর্মসকারী সাতটি পাপ

হতে তোমরা বেঁচে থাক।' জিজ্ঞেস করা হয়, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এগুলো কি?' তিনি বলেনঃ '(১) আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করা। (২) যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ তাকে হত্যা করা, তবে শরীয়তের কোন কারণে যদি তার রক্ত হালাল হয় সেটা অন্য কথা। (৩) যাদু করা। (৪) সুদ-ভক্ষণ করা। (৫) প্রতিহীনের মাল ভক্ষণ করা। (৬) কাফিরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করা। (৭) সতীসাধ্বী পরিত্র মুসলমান নারীদেরকে অপবাদ দেয়া।'

একটি বর্ণনায় যাদুর পরিবর্তে 'হিজরত করার' পর পুনরায় ফিরে এসে স্বদেশে অবস্থান' এ উক্তিটি রয়েছে। এটা অবশ্যই স্বরণযোগ্য কথা যে, উল্লিখিত সাতটি পাপকে কাবীরা বলার ভাবার্থ এই নয় যে, শুধুমাত্র এগুলোই কাবীরা গুনাহ, যেমন কারও কারও এ ধারণা রয়েছে। কিন্তু এটা একেবারেই ভুল কথা, বিশেষ করে ঐ সময়, যখন ওর বিপরীত দলীল বিদ্যমান থাকে। আর এখানেতো পরিষ্কার ভাষায় অন্যান্য কাবীরা গুনাহগুলোরও বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নলিখিত হাদীসগুলো দ্রষ্টব্যঃ

মুসতাদরিক-ই-হাকিমে রয়েছে যে, বিদায় হজ্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হে জনমগুলী! জেনে রেখো যে, নামাযীরা হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু, যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিতভাবে আদায় করে, রম্যানের রোয়া রাখে, ফরয জেনে এবং পুণ্য লাভের নিয়ত করে খুশী মনে যাকাত আদায় করে, আর ঐ সমুদয় কাবীরা গুনাহ হতে বিরত থাকে যেগুলো হতে আল্লাহ দূরে থাকতে বলেছেন।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ কাবীরা গুনাহগুলো কি?' তিনি বলেনঃ 'শিরুক, হত্যা, যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন, পিতৃহীনের মাল ভক্ষণ, পরিত্র নারীদেরকে অপবাদ দেয়া, পিতা- মাতার অবাধ্য হওয়া এবং তোমাদের জীবন ও মরণের কিবলাহ বায়তুল্লাহ শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা। জেনে রেখো যে ব্যক্তি মৃত্যু পর্যন্ত এ বড় বড় পাপগুলো হতে দূরে সরে থাকবে এবং নামায ও যাকাত নিয়মিতভাবে আদায় করবে, সে আল্লাহর নবী (সঃ)-এর সঙ্গে জান্নাতে সোনার অঞ্চলিকায় অবস্থান করবে'।

হ্যরত তায়লাস ইবনে মাইয়াস (রঃ) বলেন, আমি কয়েকটি পাপকার্য করে বসি যা আমার মতে কাবীরা গুনাহই ছিল। আমি হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বলি যে, আমি কয়েকটি পাপকার্য করেছি যেগুলোকে কাবীরা গুনাহ বলেই মনে করি। তিনি বলেন, ঐগুলো কি?

আমি বলি যে, আমি এই এই কাজ করেছি। তিনি বলেন, এগুলো কাবীরা গুনাহ নয়। আমি বলি যে, আমি আরও এই এই কাজ করেছি। তিনি বলেন, ‘এগুলোও কাবীরা গুনাহ নয়।’ এসো, আমি তোমাকে কাবীরা গুনাহগুলো গণনা করে শুনিয়ে দেই। এগুলো হচ্ছে নয়টি। (১) আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে অংশী স্থাপন করা। (২) কাউকে বিনা কারণে হত্যা করা। (৩) যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা। (৪) পবিত্রা নারীদেরকে অপবাদ দেয়া। (৫) সুদ ভক্ষণ করা। (৬) অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা। (৭) মসজিদ-ই-হারামে ধর্মদ্রোহীতা ছড়িয়ে দেয়া। (৮) যাদুকে বৈধ মনে করা। (৯) বিনা কারণে পিতা-মাতাকে কাঁদানো।

হ্যরত তায়লাস (রাঃ) বলেন, ‘এটা বর্ণনা করার পরেও হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) লক্ষ্য করেন যে, আমার ভয় তখনও কমেনি। কাজেই তিনি বলেন, তোমার কি জাহান্নামে প্রবেশের ভয় এবং জান্নাতে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা আছে?’ আমি বলি, হ্যাঁ! তিনি বলেন, ‘আচ্ছা, তোমার পিতা-মাতা বেঁচে আছেন কি?’ আমি বলি, শুধু মা বেঁচে আছেন। তিনি তখন বলেন, ‘আচ্ছা, তুমি তাঁকে নরম কথা বল, আহার করাতে থাক এবং এসব কাবারী গুনাহ থেকে বেঁচে থাক, তাহলেই তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে।’

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হ্যরত তায়তাসা ইবনে আলী হিন্দী (রাঃ) হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর সঙ্গে আরাফা প্রান্তরে আরাফার দিনে ‘পীলু’ বৃক্ষের নীচে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তখন হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) স্বীয় মস্তক ও চেহারার উপর পানি ঢালছিলেন। তাতে এও রয়েছে যে, যখন হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) অপবাদ দেয়ার কথা উল্লেখ করেন, তখন আমি বলি, এটাও কি হত্যার মতই খুব বড় পাপঃ তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওর মধ্যে পাপসমূহের বর্ণনায় যাদুরও উল্লেখ রয়েছে।

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ সময় হয়েছিল এবং আমি তাঁকে কাবীরা গুনাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট শুনেছি যে, কাবীরা গুনাহ সাতটি।’ আমি জিজ্ঞেস করি, কি কি? তিনি বলেনঃ ‘শিরুক ও অপবাদ।’ আমি বলি, এ দু’টোও কি রক্তের মতই অন্যায়ঃ তিনি বলেনঃ ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর কোন মুমিনকে বিনা কারণে হত্যা করা, যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করা, যাদু করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং তোমাদের জীবন ও মৃত্যুর কিবলাহ বায়তুল্লাহ শরীফে ধর্মদ্রোহীতার কাজ করা।’

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আল্লাহর যে বান্দা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করে না, নামায সু-প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত আদায় করে, রম্যানের রোয়া রাখে এবং কাবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকে, সে জান্নাতী।’ একটি লোক জিজ্ঞেস করেন, ‘কাবীরা গুনাহগুলো কি?’ তিনি বলেনঃ ‘আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করা, মুমিন প্রাণকে হত্যা করা এবং যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করা’।

ইবনে মিরদুওয়াই স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইয়ামানবাসীর নিকট একটি পত্র লিখিয়ে পাঠিয়ে দেন। যাতে ফরযসমূহ, সুন্নাতসমূহ এবং দিয়াত অর্থাৎ জরিমানার নির্দেশসমূহ লিখিত ছিল এবং এ পত্রখানা তিনি হ্যরত আমর ইবনে হাযাম (রাঃ)-এর হাতে তাদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। এ পত্রে নিম্নলিখিত কথাটিও ছিলঃ ‘কিয়ামতের দিন বড় বড় পাপসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হবে এই যে, মানুষ আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করে, কোন মুমিন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণের ভয়ে পলায়ন করে, মা-বাপের অবাধ্য হয়, স্ত্রীলোকেরা যে পাপ করেনি তাদের প্রতি এরূপ পাপের অপবাদ দেয়, যাদু শিক্ষা করে, সুন্দ খায় এবং ইয়াতিমের মাল ধ্বংস করে।’

অন্য বর্ণনায় কাবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কথাও রয়েছে। আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, কাবীরা গুনাহগুলো বর্ণনা করার সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) হেলান দিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা কথার উল্লেখ করেন তখন তিনি সোজা হয়ে বসে পড়েন এবং বলেনঃ ‘সাবধান! তোমরা মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা কথা হতে দূরে থাকবে।’ তিনি একথা বার বার বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সাহাবীগণ বলেন, ‘যদি তিনি নীরব হতেন।’

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বলেনঃ ‘তা এই যে, তুমি অন্য কাউকে আল্লাহর অংশীদার কর, অথচ একমাত্র তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’ আমি জিজ্ঞেস করি, তার পরে কোনটি? তিনি বলেনঃ ‘তার পরে এই যে, তোমার সন্তান তোমার সাথে আহার করবে এ ভয়ে তুমি তাকে হত্যা করে ফেল।’ আমি জিজ্ঞেস করি, তারপর কোনটি? তিনি বলেনঃ ‘তারপরে এই

যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে ব্যভিচারে লিঙ্গ হয়ে পড়।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) *وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّا أُخْرَ* (২৫: ৬৮) হতে *إِلَّا مَنْ تَأْبَ* (২৫: ৭০) পর্যন্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন।

মুসনাদ-ই-ইবনে হাত্তিমে রয়েছে যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) মসজিদ-ই-হারামে হাতীমের মধ্যে বসে ছিলেন। তাঁকে এক ব্যক্তি মদ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। তখন তিনি বলেনঃ 'আমার মত বুড়ো বয়সের মানুষ কি এ স্থানে বসে আল্লাহর রাসূলের (সঃ) উপর মিথ্যা কথা বলতে পারে?' অতঃপর তিনি বলেন, 'মদ্য পান হচ্ছে বড় পাপসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ। এ কাজ হচ্ছে সমস্ত দুশ্চরিত্রার মূল। মদখোর ব্যক্তি নায়াম পরিত্যাগকারী হয়ে থাকে। সে স্বীয় মা, খালা এবং ফুফুর সাথে ব্যভিচার করতেও দ্বিধাবোধ করে না।' এ হাদীসটি গারীব।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইস্তিকালের পর হ্যরত আবু বকর (রাঃ), হ্যরত উমার (রাঃ) এবং অন্যান্য আরও বহু সাহাবা-ই-কিরাম একবার একটি মজলিসে বসেছিলেন। তথায় কাবীরা গুনাহগুলোর আলোচনা চলছিল যে, সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটিঃ কারও নিকট সর্বশেষ উত্তর ছিল না। তখন তাঁরা হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-কে পাঠান যে, তিনি যেন হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করে আসেন। তিনি তাঁর নিকট গমন করেন। তিনি উত্তরে বলেন যে, সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে মদ্যপান। হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, 'আমি ফিরে এসে উক্ত মজলিসে এ উত্তর শুনিয়ে দেই। কিন্তু মজলিসের লোক সান্ত্বনা লাভ করলেন না। সুতরাং তাঁরা সবাই উঠে গিয়ে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ)-এর বাড়ী গমন করেন এবং তাঁরা নিজেরাই তাঁকে জিজ্ঞেস করেন।'

তখন তিনি বর্ণনা করেনঃ জনগণ নবী (সঃ)-এর সামনে একটি ঘটনা বর্ণনা করে যে, বানী ইসরাইলের বাদশাহদের মধ্যে একজন বাদশাহ একটি লোককে গ্রেফতার করে। অতঃপর লোকটিকে বলে, হয় তুম জীবনের আশা ত্যাগ কর না হয় এ কাজগুলোর মধ্যে কোন একটি কর, অর্থাৎ মদ্যপান কর বা অন্যান্যভাবে কাউকে হত্যা কর কিংবা শূকরের মাংস ভক্ষণ কর। লোকটি কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনার পর হাল্কা জিনিস মনে করে মদ্যপান করতে সম্মত হয়। কিন্তু মদ্যপান করা মাত্রই সে নেশার অবস্থায় ঐ সমুদয় কাজও করে বসে যা হতে সে পূর্বে বিরত ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ ঘটনাটি শুনে আমাদেরকে বলেনঃ ‘যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, আল্লাহ তা‘আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবূল করেন না। আর যে ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যন্ত অবস্থাতেই মারা যায় এবং তার মৃত্যুলীতে সামান্য পরিমাণও মদ্য থেকে যায়, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং যদি মদ্যপান করার পর চল্লিশ দিনের মধ্যেই মারা যায় তবে তার অজ্ঞতা যুগের মৃত্যু হয়ে থাকে।’ এ হাদীসটি দুর্বল। অন্য একটি হাদীসে মিথ্যা শপথকেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাবীরা গুনাহ বলে গণ্য করেছেন। (সহীহ বুখারী ইত্যাদি)

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে মিথ্যা শপথের পর নিম্নের উক্তিও রয়েছেঃ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর শপথ করে কোন কথা বলে এবং তাতে মশার সমানও বাড়িয়ে কিছু বলে, তার অন্তরে একটা কাল দাগ হয়ে যায়, যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থেকে যায়।’ মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘মানুষের তার পিতা-মাতাকে গালি’ দেয়াও কাবীরা গুনাহ।’ জনগণ জিজ্ঞেস করে, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মানুষ তার পিতা-মাতাকে কিরূপে গালি দেবে?’ তিনি বলেনঃ ‘এভাবে যে, সে অন্যের বাপকে গালি দেয়, অন্য লোকটি তখন তার বাপকে গালি দেয়, সে অন্যের মাকে গালি দেয়, অন্য লোকটি তখন তার মাকে গালি দেয়।’

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘সবচেয়ে বড় কাবীরা গুনাহ এই যে, মানুষ তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়।’ জনগণ জিজ্ঞেস করে, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কিরূপে হতে পারে?’ তিনি বলেনঃ ‘অন্যের মা-বাপকে বলে নিজের মা-বাপকে বলিয়ে নেয়া।’ সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘মুসলমানকে গালি প্রদান মানুষকে ফাসিক বানিয়ে দেয় এবং তাকে হত্যা করা হচ্ছে কুফরী।’

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘কাবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে কোন মুসলমানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা এবং একটা গালির পরিবর্তে দু’টো গালি দেয়া। জামেউত তিরমিয়ীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি বিনা ওয়ারে দু’টি নামাযকে একত্রিত করে, সে কাবীরা গুনাহসমূহের দু’টি দরজার একটি দরজার মধ্যে প্রবেশ করে থাকে।’

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হ্যরত আবু কাতাদাতুল আদাভী হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘হ্যরত উমার ইবনে খাতাব (রাঃ)-এর যে পত্র আমাদের সামনে পাঠ করা হয় তাতে এও ছিল যে, বিনা ওয়রে দু’ নামাযকে একত্রিত করা কাবীরা গুনাহ এবং যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করাও কাবীরা গুনাহ।’ মোটকথা, যোহর, আসর কিংবা মাগরিব ও ইশা সময়ের পূর্বে বা পরে শরীয়তের অবকাশ ছাড়া একত্রিত করে পড়া কাবীরা গুনাহ। তাহলে যারা মোটেই (নামায) পড়ে না তাদের পাপের তো কোন ঠিক ঠিকানাই নেই। যেমন, সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘বান্দা ও শিরকের মধ্যে স্থলে রয়েছে নামাযকে ছেড়ে দেয়া।’

সুনানের একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আমাদের ও কাফিরদের মধ্যে পৃথককারী জিনিস হচ্ছে নামাযকে ছেড়ে দেয়া। যে ব্যক্তি নামাযকে ছেড়ে দিল সে কুফরী করলো।’ অন্য একটি বর্ণনায় তাঁর এ উক্তিটি ও নকল করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিল তার কার্যাবলী বিনষ্ট হয়ে গেল। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেল তার যেন মাল ও পরিবার পরিজন ধ্রংস হয়ে গেল।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করে, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কাবীরা গুনাহ কি কি?’ তিনি বলেনঃ ‘আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে অংশী স্থাপন করা, তাঁর নিয়ামত ও করুণা হতে নিরাশ হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহর মকর হতে<sup>১</sup> নির্ভয় থাকা এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহ।’

হ্যরত বায়্যার (রঃ) হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একটি লোক জিজ্ঞেস করেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কাবীরা গুনাহগুলো কি?’ তিনি বলেনঃ ‘আল্লাহর সঙ্গে শিরুক করা, আল্লাহর নিয়ামত ও করুণা হতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর মকর থেকে নির্ভয় থাকা এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ।’ কিন্তু এর ইসনাদে সমালোচনা রয়েছে। সবচেয়ে সঠিক কথা এই যে, এ হাদীসটি মাওকুফ।

১. মকর শব্দটি আল্লাহর ব্যাপারে ফন্দির প্রতিশোধ নেয়া বুঝায়।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই এর মধ্যে রয়েছে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, ‘সর্বাপেক্ষা বড় পাপ হচ্ছে মহা সম্মানিত আল্লাহ তা‘আলার প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা।’ এ বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল। ইতিপূর্বে ঐ হাদীসটি ও বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে হিজরতের পর পুনরায় কাফিরদের দেশে বসতি স্থাপন করাকেও কাবীরা গুনাহ বলা হয়েছে। এ হাদীসটি তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে। সাতটি কাবীরা গুনাহর মধ্যে একটি এটিকে গণনা করা হয়েছে। কিন্তু এর ইসনাদের ব্যাপারে চিন্তার বিষয় রয়েছে এবং একে মারফু’ বলা সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক কথা এটাই যা তাফসীরে ইবনে জারীরের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, একদা হ্যরত আলী (রাঃ) কুফার মসজিদে মিস্বরে দাঁড়িয়ে খৃৎবা দিচ্ছিলেন। তাতে তিনি বলেন, ‘হে জনগণ! কাবীরা গুনাহ সাতটি।’ একথা শুনে লোকগুলো চীৎকার করে উঠে। তিনি তিনবার ওরই পুনরাবৃত্তি করেন।

অতঃপর তিনি বলেন, ‘তোমরা আমাঁকে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করছো না কেন?’ জনগণ তখন বলে, ‘হে আমীরুল মুমিনীন! বলুন, ওগুলো কি?’ তিনি বলেন, ‘আল্লাহর সঙ্গে অংশী স্থাপন করা, যে প্রাণ বধ করা আল্লাহ হারাম করেছেন তা বধ করা, পবিত্রা স্ত্রীলোকদের প্রতি অপবাদ দেয়া, পিতৃহীনের মাল ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া, যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা এবং হিজরতের পর পুনরায় কাফিরদের দেশে এসে বসতি স্থাপন করা।’ হাদীসটির বর্ণনাকারী হ্যরত সাহল (রঃ) তাঁর পিতা হ্যরত সাহল ইবনে খাইসুমার (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, ‘এটাকে কিভাবে কাবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত করলেন?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘হে প্রিয় বৎস! একটি লোক হিজরত করে মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হলো, গনীমতের মালে তার অংশ নির্ধারিত হলো, মুজাহিদদের নামের তালিকায় তার নাম এসে গেছে। অতঃপর সে সমস্ত জিনিস পরিত্যাগ করতঃ বেদুস্ত হয়ে গিয়ে কাফিরদের দেশে ফিরে গেল এবং যেমন ছিল তেমনই হলো, এর চেয়ে বড় অন্যায় আর কি হতে পারে?’

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বিদায় হজ্জের খৃৎবায় বলেনঃ ‘সাবধান! আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না, অন্যায় হত্যা হতে বেঁচে থাক, তবে শরীয়তের অনুমতি অন্য জিনিস, ব্যভিচার করো না এবং চুরি করো না।’ ঐ হাদীসটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, অসিয়তের ব্যাপারে কারও ক্ষতি সাধন করাও একটি কাবীরা গুনাহ। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে,

একদা সাহাবায়ে কেরাম কাবীরা গুনাহসমূহের উল্লেখ করেন যে, আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার ছির করা, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা, ধর্মযুদ্ধ থেকে পলায়ন করা, পাক পবিত্র রামণীদের প্রতি অপবাদ দেয়া, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা বলা, ধোকা দেয়া, খিয়ানত করা, যাদু করা, সুদ খাওয়া এগুলো সব কাবীরা গুনাহ। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘আর ঐ গুনাহকে কোথায় রাখছে যে, লোকেরা আল্লাহর ওয়াদা এবং নিজেদের কসমকে অল্প মূল্যে বিক্রি করে ফিরছে। আল্লাতের শেষ পর্যন্ত তিনি তেলাওয়াত করেন।’ এর ইসনাদ স্পষ্ট এবং হাদীসটি হাসান।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীয়ে বলেছে যে, রিসরে কতগুলো লোক হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-কে জিজেস করেনঃ ‘আল্লাহ তা’আলার কিতাবের মধ্যে আমরা কতগুলো জিনিস এমন পাচ্ছি যেগুলোর উপর আমাদের আমল নেই। তাই, আমরা এ সম্বন্ধে আমীরুল মুমিনীন হ্যরত উমার (রাঃ)-কে জিজেস করতে চাই।’ হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) তাদেরকে নিয়ে মদীনায় আগমন করেন। তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হ্যরত উমার (রাঃ) তাঁকে জিজেস করেন, ‘কবে এসেছো?’ তিনি উত্তরে বলেন, ‘এতদিন হলো।’ পুনরায় জিজেস করেন, ‘অনুমতিক্রমে এসেছো কি?’ তারও উত্তর তিনি দেন। অতঃপর তিনি জনগণের কথা উল্লেখ করেন।

হ্যরত উমার (রাঃ) বলেন, ‘তাদেরকে একজিত কর! এরপর তিনি তাদের বিকট আগমন করেন এবং তাদের মধ্যে একজনকে জিজেস করেন, ‘তোমাকে আল্লাহ ও ইসলামের সত্যতার শপথ! তুমি কি সম্পূর্ণ কুরআন কারীম পাঠ করেছো?’ লোকটি বলেন, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বলেন, ‘তুমি কি ওকে তোমার অন্তরে ঝুঁকিতও রেখেছো?’ তিনি বলেন, ‘না।’ তিনি যদি ‘হ্যাঁ’ বলতেন তবে হ্যরত উমার (রাঃ) তাঁকে দলীল প্রমাণাদি দ্বারা অপারণ করে দিতেন।

এরপর তিনি বলেন, ‘তুমি ওকে স্বীর চাঁকে, স্বীয় জিহবায় এবং স্বীয় চালচলনেও ঝুঁকিত রেখেছো কি?’ তিনি বলেনঃ ‘না।’ অতঃপর তিনি এক এক করে সবাইকেই এ প্রশ্নই করেন। তারপর তিনি বলেন, ‘তোমরা উমার (রাঃ)-কে এ কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করতে চাও যে, তিনি যেন জনগণকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সোজা করে দেন। আমার দোষক্রটির কথা আমার এই পূর্ব হতেই জানতেন।’ অতঃপর তিনি أَنْ تَعْتَبُوا كَبَانِرْ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفِرُ অন্তর্ভুক্ত শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অর্থাৎ ‘যদি তোমরা সেই

মহাপাপসমূহ হতে বিরত হও যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলেই আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবো।' এরপর তিনি বলেন, 'মদীনাবাসী তোমাদের আগমনের কারণ জানে কি?' তাঁরা বলেন, 'না।' তিনি বলেন, 'তারাও যদি এটা জানতো তবে এ সম্বন্ধে আমার তাদেরকেও উপদেশ দিতে হতো।' এর ইসনাদও হাসান এবং পঠনও হাসান। যদিও হ্যরত উমার (রাঃ) হতে হাসানের এ বর্ণনাটির মধ্যে 'ইনকিতা' রয়েছে তথাপি এ ক্রটি পূরণের পক্ষে এর পূর্ণ প্রসিদ্ধিই যথেষ্ট।

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে, হ্যরত আলী (রাঃ) বলেন, 'কাবীরা গুনাহ হচ্ছে, আল্লাহর সঙ্গে অংশী স্থাপন করা, কাউকে হত্যা করা, পিতৃহীনের মাল ভক্ষণ করা, পবিত্র স্ত্রীলোকদেরকে অপবাদ দেয়া, যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করা, হিজরতের পর কাফিরদের দেশে অবস্থান করা, যাদু করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, সুদ খাওয়া, জামাআত হতে পৃথক হওয়া এবং ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গে দেয়া। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে অংশী স্থাপন করা, তাঁর প্রশংসন্তা ও করুণা হতে নিরাশ হওয়া এবং তার মকর হতে নির্ভয় থাকা।'

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, সূরা-ই-নিসার প্রথম ত্রিমিতি আয়াতে কাবীরা গুনাহর বর্ণনা রয়েছে। অতঃপর তিনি *إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَّارًا*-এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। হ্যরত বুরাইদা (রাঃ) বলেন, 'কাবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে অংশী স্থাপন করা, বাপ-মাকে অসন্তুষ্ট করা, পরিত্তির পর অতিরিক্ত পানি প্রয়োজন বোধকারীদেরকে না দেয়া এবং নিজের নরপতিকে কারও মাদী পশুর জন্যে কিছু নেয়া ছাড়া না দেয়া।'

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের একটি মারফু' হাদীসে রয়েছে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আটকিয়ে রাখা যাবে না এবং অতিরিক্ত ঘাস হতেও বাধা দেয়া যাবে না'। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন তিন প্রকারের পাপীদের দিকে আল্লাহ তা'আলা করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পানি ও অতিরিক্ত ঘাসকে আটকিয়ে রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন না।' হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'কাবীরা গুনাহ

عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا (৬০: ১২) -এ আয়াতটির মধ্যে। হ্যরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) এ আয়াতটিকে আল্লাহ তা'আলার বিরাট ইহসানের মধ্যে বর্ণনা করেন এবং এর উপর বড় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। অর্থাৎ -**إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ** -এ আয়াতটিকে।

একবার হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সামনে জনগণ বলেন, 'কাবীরা গুনাহ হচ্ছে সাতটি।' তিনি বলেন, 'কোন কোন সময় সাতটি।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বলেন, 'কমপক্ষে সাতটি নচেৎ সত্তরটি।' অন্য একটি লোকের কথায় তিনি বলেনঃ 'ওটা হচ্ছে সাতশ পর্যন্ত এবং সাতশ হচ্ছে খুবই নিকটে। হ্যাঁ, তবে জেনে রেখো যে, ক্ষমা প্রার্থনার পর কাবীরা আর কাবীরা থাকে না। আর সদা-সর্বদা করতে থাকলে সাগীরাও আর সাগীরা থাকে না।'

অন্য সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, 'যে পাপের উপর জাহানামের, আল্লাহর ক্রোধের, অভিসম্পাতের এবং শাস্তির ভীতি প্রদর্শন রয়েছে স্টেই কাবীরা গুনাহ।' আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যা হতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেন স্টেই কাবীরা। যে কার্যে আল্লাহর অবাধ্যতা প্রকাশ পায় ওটাই বড় পাপ। এখন তাবেঙ্গণের উক্তি আলোচনা করা যাচ্ছেঃ

হ্যরত উবাইদাহ (রঃ) বলেন, 'কাবীরা গুনাহ হচ্ছে-আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শিরক করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া, সচরিত্ব মেয়েদের (ব্যভিচারের) অপবাদ দেয়া ও হিজরতের পর স্বদেশ প্রিয়তা।' হাদীসের বর্ণনাকারী হ্যরত ইবনে আউন (রঃ) স্বীয় শিক্ষক মুহাম্মাদ (রঃ)-কে জিজেস করেনঃ 'যাদু কাবীরা গুনাহ নয় কি?' তিনি বলেন, 'এটা অপবাদের মধ্যে এসে গেল। এ শব্দটির মধ্যে বহু জঘন্যতা জড়িত রয়েছে।'

হ্যরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রঃ) কাবীরা গুনাহের উপর কুরআন কাবীমের আয়াত পড়েও শুনিয়ে দেন। শিরকের উপর আয়াত পাঠ করেন-

وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطِّيرُ  
أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ -

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শিরক করলো সে যেন আকাশ হতে পড়ে গেল অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে অথবা বাতাস তাকে দূরে কোন অজানা জঘন্য স্থানে নিষ্কেপ করবে।' (২২: ৩১) ইয়াতীমের মাল নষ্ট করার উপর আয়াত পেশ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْبَيْتِمَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا -

অর্থাৎ ‘নিশ্চয়ই যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে, নিশ্চয়ই তারা তাদের পেটের মধ্যে আগুন ভক্ষণ করে।’ (৪: ১০) সুদ খাওয়ার উপর পাঠ করেন-

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ النَّذِي يَتْخَبِطُ  
الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ -

অর্থাৎ ‘যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা কিয়ামতের দিন জ্ঞানশূন্য ও পাগলের মত হয়ে উঠবে।’ (২৪: ২৭৫) অপবাদের উপর পড়েন-

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمَأُونَ الْمُحْرَمَ صَنَّتِ الْغَفِيلَتِ الْمُؤْمِنَةِ

অর্থাৎ ‘যারা পবিত্রা, উদাসীনা, মুমিনা নারীদেরকে অপবাদ দেয়।’ (২৪: ২৩) যুক্তক্ষেত্র হতে পলায়নকারীদের উপর পাঠ করেন-

يَا يَاهَا الَّذِينَ امْنَوْا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا -

অর্থাৎ ‘হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কাফিরদের মোকাবিলায় দণ্ডয়মান হও, তখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না।’ (৪: ১৫) হিজরতের পর কাফিরদের দেশে অবস্থানের উপর আয়াত পাঠ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى

অর্থাৎ ‘যারা সুপথ প্রাণিত পর ধর্মত্যাগী হয়।’ (৪৭: ২৫) কোন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার উপর আয়াত পাঠ করেন-

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا

অর্থাৎ ‘যে কোন মুমিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে তার শাস্তি হচ্ছে জাহানাম, যার মধ্যে সে চির অবস্থান করবে।’ (৪: ৯৩)

‘হ্যরত আতা’ (রঃ) হতেও কাবীরা গুনাহুর বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে এবং তাতে মিথ্যা সাক্ষ্যের কথা ও রয়েছে। হ্যরত মুগীরা (রঃ) বলেন, ‘হ্যরত আবু বকর (রাঃ) এবং হ্যরত উমার (রাঃ)-কে মন্দ বলাও কাবীরা গুনাহুই।’ আমি বলি যে, আলেমদের একটি দল ঐ লোকদেরকে কাফির বলেছেন যারা সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)-কে মন্দ বলে থাকে। হ্যরত ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রঃ) হতে এটা বর্ণিত আছে।

হয়েরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রঃ) বলেন, ‘আমি এটা কল্পনা করতে পারি না যে, কোন ব্যক্তির অন্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি ভালবাসা রয়েছে অথচ হয়েরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি শক্রতা পোষণ করে।’ (জামেউত্ তিরমিয়ী)

হয়েরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, ‘কাবীরা গুনাহ হচ্ছে-আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে অংশী স্থাপন করা, তাঁর আয়াতসমূহ ও রাসূলদের সাথে কুফরী করা, যাদু করা, সন্তানদেরকে হত্যা করা, আল্লাহ তা‘আলার সন্তান ও স্ত্রী সাব্যস্ত করা এবং এ ধরনের কাজ ও কথা যার পরে কোন পুণ্যের কাজ গৃহীত হয় না। হাঁ, তবে যেসব পাপকার্যের পর ধর্ম অবশিষ্ট থাকতে পারে এবং আমল গৃহীত হতে পারে এরূপ পাপসমূহ আল্লাহ তা‘আলা পুণ্যের বিনিময়ে ক্ষমা করে থাকেন।’

হয়েরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা ঐ লোকদেরকে ক্ষমা করার অঙ্গীকার করেছেন যারা কাবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকে।’ আর আমাদের নিকট এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘তোমরা কাবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাক, সোজা ও ঠিক এবং শুভ সংবাদ গ্রহণ কর।’

মুসনাদ-ই-আবদুর রায়্যাকে সহীহ সনদে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ ‘আমার উম্মতের কাবীরা গুনাহকারীদের জন্যেও আমার শাফা‘আত রয়েছে।’ ইমাম তিরমিয়ীও (রঃ) একে হাসান বলেছেন। যদিও এর বর্ণনা ও সনদ দুর্বলতা শূন্য নয়, তথাপি এর যে সাক্ষীগুলো রয়েছে তাতেও সঠিক বর্ণনা রয়েছে। যেমন একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘তোমরা কি মনে কর যে, আমার শাফা‘আত শুধু মুত্তাকী ও মুমিনদের জন্যই? না, না। বরং ঐ গুনাহগুর পাপীদের জন্যেই।’

এখন আলেমদের উক্তি বর্ণিত হচ্ছেঃ কাবীরা গুনাহ কাকে বলে সে সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন যে, যার উপর শরঙ্গ হন্দ (শরীয়তের শাস্তি) রয়েছে সেটাই কাবীরা গুনাহ। কেউ বলেন যে, যার উপর কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে কোন শাস্তির উল্লেখ রয়েছে, সেটাই কাবীরা গুনাহ। কারও উক্তি এই যে, যাতে দ্বীনদারী কর হয় এবং সততা হ্রাস পায়, সেটাই হচ্ছে কাবীরা গুনাহ। কায়ী আবু সাঈদ হারভী (রঃ) বলেন যে, যার হারাম হওয়া শব্দের দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং যার অবাধ্যতার উপর কোন হন্দ থাকে, সেটাই কাবীরা গুনাহ। যেমন হত্যা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে যে কোন ফরয কাজ ছেড়ে দেয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা বর্ণনা এবং মিথ্যা শপথও কাবীরা গুনাহ।

কাষী রহিয়ানী (৮) বলেন যে, কাবীরা গুনাহ হচ্ছে সাতটিৎ বিনা কারণে কাউকে হত্যা করা, ব্যভিচার করা, পুরুষে পুরুষে নির্লজ্জতার কাজে (লোওয়াতাত) লিঙ্গ হওয়া, মদ্যপান করা, চুরি করা, জবরদস্থল করা এবং অপবাদ দেয়া (সতী নারীকে)। অপর বর্ণনায় অষ্টমও একটি আছে, তা হচ্ছে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান। আর এর সাথে নিম্নেরগুলোকে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে—সুদ খাওয়া, বিনা ওয়রে রমযানের রোয়া পরিত্যাগ করা, মিথ্যা শপথ করা, আচীর্যতার সম্পর্ক ছিন্ন করা, মম-বাপের অবাধ্য হওয়া, জিহাদ হতে পলায়ন করা, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা, বিনা ওয়রে সময়ের পূর্বে নামায আদায় করা ওজনে কম বেশী করা, বিনা কারণে মুসলমাকে হত্যা করা, জেনে শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করা, তাঁর সাহাবীগণকে গালি দেয়া, বিনা কারণে সাক্ষ্য গোপন করা, ঘৃষ নেয়া, পুরুষ ও স্ত্রীদের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করা, বাদশাহের নিকট পরোক্ষ নিন্দে করা, যাকাত দেয়া বন্ধ করা, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভাল কার্যের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ না করা, কুরআন কারীম শিক্ষা করে ভুলে যাওয়া, আণীকে আগুন দ্বারা পুড়িয়ে ফেলা, বিনা ওয়রে স্ত্রীর তার স্বামীর নিকটে না যাওয়া, আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হওয়া, তাঁর মকর হতে নির্ভয় হওয়া, আলেম ও কারীদের ক্ষতিসাধন করা, যিহার করা, শূকরের গোশত ভক্ষণ করা এবং মৃত জিনিস খাওয়া। তবে খুবই প্রয়োজন বোধে মৃত জন্মুর গোশত খেলে সেটা অন্য কথা।

ইমাম রাফেই (৮) বলেন যে, এগুলোর কয়েকটির সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বড় বড় গুনাহসমূহের ব্যাপারে মনীষীগণ বহু গ্রন্থ ও প্রণয়ন করেছেন। আমাদের শায়েখ হাকিম আবু আবদুল্লাহ যাহরী (৮) একটি পুস্তক লিখেছেন, যার মধ্যে তিনি সত্তরটি কাবীরা গুনাহ সংখ্যা দিয়েছেন। এও বলা হয়েছে যে, কাবীরা গুনাহ হচ্ছে ঐগুলো যেগুলোর উপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) জাহানামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। এ প্রকারের গুনাহই যদি গণনা করা যায় তবে বহু গুনাহই বেরিয়ে যাবে। আর যদি কাবীরা গুনাহ ঐ (ধরনের) কাজের প্রত্যেকটিকে বলা হয় যা হতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) দূরে থাকতে বলেছেন তবে তো কাবীরা গুনাহ অসংখ্য হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জ্ঞান রাখেন।

১. যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ একপ কোন নারীর কোন আঙ্গের সঙ্গে স্ত্রীর ভুলনা করাকে যিহার বলে। যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে **أَنْتَ عَلَيَّ كَظِهْرٍ أَمِّيْ** অর্থাৎ ‘তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মত।’

৩২। এবং তোমরা ওর আকাঞ্চা  
করো না যদ্বারা আল্লাহ  
একের উপর অপরকে  
গৌরবান্বিত করেছেন,  
পুরুষেরা যা উপার্জন করেছে  
তাতে তাদের অংশ রয়েছে  
এবং নারীগণ যা উপার্জন  
করেছে তাতে তাদের অংশ  
আছে এবং তোমরা আল্লাহরই  
নিকট গৌরব প্রার্থনা কর,  
নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে  
মহাজ্ঞানী ।

وَلَا تَتَمْنُوا مَا فِي الْأَرْضِ  
بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا اَكْتَسَبْنَاهُنَّ رَوِيدَةٌ  
مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمًا ॥

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিলেন- ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! পুরুষ লোকেরা জিহাদে অংশগ্রহণ করে থাকে, আর আমরা নারীরা এ পুণ্য হতে বঞ্চিত থাকি। অনুরূপভাবে মীরাসও আমরা পুরুষদের তুলনায় অর্ধেক পেয়ে থাকি। সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (জামেউত্ত তিরমিয়ী) অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এর পরে আবার আইন নাই নাই নাই (৩: ১৯৫) -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, নারীরা নিম্নরূপ আকাঞ্চা পোষণ করেছিলঃ ‘আমরা যদি পুরুষ হতাম তবে তো আমরাও জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম।’ আরও একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, একটি স্ত্রীলোক নবী (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, ‘দেখুনতো একজন পুরুষ দু’জন স্ত্রীর সমান অংশ পেয়ে থাকে, দু’জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান মনে করা হয়, তাছাড়া আমলের ব্যাপারেও একুপ যে, পুরুষের জন্যে একটি পুণ্য এবং নারীর জন্যে অর্ধপুণ্য।’ তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

সুন্দী (রঃ) বলেন, পুরুষ লোকেরা বলেছিল, ‘আমরা যখন দ্বিগুণ অংশের মালিক তখন আমরা দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হবো না কেন?’ আর ঐ দিকে স্ত্রীলোকেরা বলেছিল, ‘আমাদের উপর তো জিহাদ ফরয়ই নয় তবে আমরা

শাহাদাতের পুণ্য লাভ করবো না কেন?’ এতে আল্লাহ তা‘আলা উভয়কেই বাধা দেন এবং বলেন—‘তোমরা আমার অনুগ্রহ যাঞ্চ্ছা করতে থাক।’

হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) এর ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন—‘মানুষ যেন এ আশা পোষণ না করে যে, যদি অমুক ব্যক্তির মাল ও সত্তান আমার হতো।’ এর উপর এ হাদীস দ্বারা কোন অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে না যাতে রয়েছে যে, ঈর্ষার যোগ্য মাত্র দু’জন। এক ঐ ধনী ব্যক্তি যে স্বীয় মাল আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়, আর অন্য ব্যক্তি বলে, ‘যদি আমার মাল থাকতো তবে আমিও একপ ভাবে তা আল্লাহ তা‘আলার পথে খরচ করতে থাকতাম।’ অতএব দু’ ব্যক্তিই পুণ্য লাভের ব্যাপারে সমান। কেননা এটা নিষিদ্ধ নয়। অর্থাৎ একপ পুণ্য লাভের লোভ দুষ্পীয় নয়। এখানে একপ জিনিস একপ পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে লাভ করার আকাঞ্চ্ছা রয়েছে যা প্রশংসনীয়। আর ওখানে অপরের জিনিস নিজের অধিকারে নিয়ে নেয়ার নিয়ত রয়েছে যা সব সময়ই নিন্দনীয়। সুতরাং একপভাবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অনুগ্রহ যাঞ্চ্ছা করা নিষিদ্ধ।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘প্রত্যেককেই তার কার্যের প্রতিদান দেয়া হবে। ভাল কার্যের প্রতিদান ভাল এবং মন্দ কার্যের প্রতিদান মন্দ হবে।’ আবার ভাবার্থ এও হতে পারে যে, সকলকেই তাদের হক অনুযায়ী উত্তরাধিকার প্রদান করা হবে।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে—‘আমার নিকট আমার অনুগ্রহ যাঞ্চ্ছা করতে থাক, পরস্পর একে অপরের ফয়লত চাওয়া অনর্থক হবে। হ্যাঁ, তবে আমার নিকট যদি আমার অনুগ্রহ যাঞ্চ্ছা কর তবে আমি কৃপণ নই, বরং আমি দাতা, সুতরাং আমি দান করবো এবং অনেক কিছুই দান করবো।’

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘হে জনমগুলী! আল্লাহ তা‘আলার নিকট তাঁর অনুগ্রহ যাঞ্চ্ছা কর। তাঁর নিকট চাওয়া তিনি খুব পছন্দ করেন। জেনে রেখো যে, সবচেয়ে বড় ইবাদত হচ্ছে প্রশংসন্তা ও করুণার জন্যে অপেক্ষা করা এবং তার প্রতি আশা রাখা।’

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, একপ আশা পোষণকারীকে আল্লাহ তা‘আলা পছন্দ করেন। আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী। কে পাওয়ার যোগ্য এবং কে দারিদ্র্যের যোগ্য, কে পারলৌকিক নিআমতের দাবীদার, আর কে তথায় লাঞ্ছিত হওয়ার যোগ্য তা তিনিই খুব ভাল জানেন। তাকে তিনি তার আসবাব ও মাধ্যম জোগাড় করে দেন এবং তার জন্যে তা সহজ করে দেন।

৩৩। আর আমি সমস্তেই

উত্তরাধিকারী করেছি যা  
তাদের পিতা-মাতা ও  
আজীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে  
যায় এবং তোমাদের দক্ষিণ  
হস্ত যাদের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ;  
অতএব তোমরা তাদেরকে  
তাদের অংশ প্রদান কর;  
নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে  
সাক্ষী।

وَلِكُلٍ جعلنا مَوَالِيَ مَمَّا  
تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَالَّذِينَ عَقدْتَ أَيْمَانَكُمْ  
فَاتُوهُمْ نِصْبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿৬৩﴾

বহু মুফাসিসির হতে বর্ণিত আছে যে, (মَوَالِي) শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে ‘উত্তরাধিকারী’। কারও কারও মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে ‘আসাবা’। পিতৃব্য পুত্রদেরকেও ‘মাওলা’ বলা হয়। যেমন হ্যরত ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিম্নের কবিতায় রয়েছেঃ

مَهْلًا بَنِي عِمَّنَا مَهْلًا مَوَالِيْنَا \* لَا يَظْهَرُنَّ بَيْنَنَا مَا كَانَ مَدْفُونًا

সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ হল এই যে, হে জনগণ! তোমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকের জন্যে আমি আসাবা বানিয়ে দিয়েছি যারা সে মালের উত্তরাধিকারী হবে যা তাদের পিতা-মাতা এবং আজীয়-স্বজন ছেড়ে যাবে। আর যারা তোমাদের মুখের ভাই তাদেরকে তাদের উত্তরাধিকারের অংশ প্রদান কর। যেমন শপথের সময় তোমাদের মধ্যে অঙ্গীকার হয়েছিল।

এটা ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের নির্দেশ। পরে এটা রহিত হয়ে যায় এবং নির্দেশ দেয়া হয় যে, যাদের সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছে সে অঙ্গীকার ঠিক রাখতে হবে এবং তাদেরকে ভুলে যাওয়া চলবে না, কিন্তু তারা মীরাস পাবে না। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, (মَوَالِي) শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে উত্তরাধিকারী। আর পরবর্তী বাক্যের ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তথাকার প্রথা অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের আনসার ভাইদের উত্তরাধিকারী হতেন এবং আনসারদের আজীয়-স্বজন তাঁদের উত্তরাধিকারী হতেন না। সুতরাং এ আয়াত

দ্বারা উক্ত প্রথা রহিত হয়ে যায় এবং তাদেরকে বলা হয়—‘তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে সাহায্য কর, তাদের উপকার কর এবং তাদের মঙ্গল কামনা কর। কিন্তু তারা তোমাদের মীরাস পাবে না। হ্যাঁ, তবে তোমরা তাদের জন্য অসিয়ত করে যাও।’ ইসলামের পূর্বে প্রথা ছিল এই যে, দুই ব্যক্তি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে বলতো, ‘আমি তোমার উক্তরাধিকারী।’ এভাবে আরব গোত্রগুলো অঙ্গীকার ও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়তো।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘অজ্ঞতার যুগের শপথ এবং অঙ্গীকার ও চুক্তিকে ইসলাম আরও দৃঢ় করেছে। কিন্তু এখন ইসলামে শপথ এবং এ প্রকারের আহাদ ও অঙ্গীকার নেই। ঐগুলোকে এ আয়াতটি রহিত করে দিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে যে, চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিদের তুলনায় আত্মীয়-স্বজনগণই আল্লাহর কিতাবের নির্দেশক্রমে বেশী উত্তম।’

ইমাম ইবনে জারীর (রাঃ) হ্যরত ইবনে আকবাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘ইসলামে “শপথ নেই এবং অজ্ঞতা যুগের প্রত্যেক শপথকে ইসলাম আরও দৃঢ় করেছে। যদি আমাকে লাল রঙের উটও দেয়া হয় এবং এ শপথকে ভেঙ্গে দিতে বলা হয় যা দারুণ নদওয়ায় করা হয়েছিল, তথাপি আমি তা পছন্দ করবো না।’ হ্যরত ইমাম ইবনে জারীর (রাঃ) হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আমি বাল্যকালে ‘মুতায়্যাবাইনের’ শপথের সময় আমার মাতুলদের সাথে ছিলাম। সুতরাং আমি লাল রঙের উট পেলেও সে শপথকে ভেঙ্গে দেয়া পছন্দ করবো না।’ সুতরাং এটা শ্রবণ রাখার যোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশ ও আনসারের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তা ছিল শুধুমাত্র প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করার জন্যে।

হ্যরত কায়েস ইবনে আ’সেম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ‘কসম’ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ ‘অজ্ঞতার যুগে যে কসম ছিল তা তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকবে, কিন্তু ইসলামে কসম নেই।’

হ্যরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘ইসলামে ‘হলফ’ নেই, কিন্তু অজ্ঞতা যুগের হলফকে ইসলাম দৃঢ় করেছে।’ মুক্তি বিজয়ের দিনেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়িয়ে স্বীয় ভাষণে এ কথাই ঘোষণা করেছিলেন।

হ্যরত দাউদ ইবনে হুসাইন (রঃ) বলেন, আমি হ্যরত উম্মে সা'দ বিনতে রুবায়ের (রাঃ) নিকট কুরআন কারীম পাঠ করতাম। আমার সাথে তাঁর পৌত্র মুসা ইবনে সা'দও (রঃ) পড়তেন। হ্যরত উম্মে সা'দ (রাঃ) পিতৃহীনা অবস্থায় হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে লালিতা পালিতা হয়েছিলেন। আমি এ আয়াতের পাঠ করি। তখন শিক্ষিকা আমাকে বাধা দিয়ে বলেনঃ ‘<sup>عَدْتُ</sup> পড়। জেনে রেখ যে, এ আয়াতটি হ্যরত আবু বকর (রাঃ) এবং তাঁর পুত্র হ্যরত আবদুর রহমান (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

হ্যরত আবদুর রহমান (রাঃ) প্রথমে ইসলাম গ্রহণে অঙ্গীকৃতি জানিয়েছিলেন। তাই হ্যরত আবু বকর (রাঃ) শপথ করে বলেনঃ ‘আমি তাকে উত্তরাধিকারী করবো না’। অতঃপর যখন তিনি মুসলমানদের তরবারীর চাপে বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন তখন হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ হয় যে, তিনি যেন স্বীয় পুত্র আবদুর রহমানকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত না করেন। কিন্তু এ উক্তি গারীব। প্রথমটিই সঠিক উক্তি।

মোটকথা, এ আয়াত এবং হাদীসসমূহ দ্বারা ঐ মনীষীদের উক্তি খণ্ডন করা হচ্ছে যাঁরা শপথ ও অঙ্গীকারের উপর ভিত্তি করে এখনও উত্তরাধিকার দেয়ার পক্ষপাতি। যেমন ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এবং তাঁর সহচরদের এ ধারণা রয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ) হতেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু সঠিক মাযহাব হচ্ছে জমহুরের মাযহাব এবং ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিন্স (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ)-এর প্রসিদ্ধ মাযহাবও সঠিকই বটে।

অতএব, উল্লিখিত আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হচ্ছে তার আজ্ঞায়-স্বজন, অন্য কেউ নয়। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘অংশীদার উত্তরাধিকারীদেরকে তাদের অংশ মুতাবিক অংশ দিয়ে বাকী যা থাকবে তা আসাবাগণ পাবে। উত্তরাধিকারী হচ্ছে ওরাই যাদের বর্ণনা ফারায়েয়ের দু'টি আয়াতে রয়েছে। আর যাদের সঙ্গে তোমরা দৃঢ়চূক্তি ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছো (অর্থাৎ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে) তাদেরকে মীরাস প্রদান কর।’ এর পরে যে হলফ হবে তা ক্রিয়াশীল মনে করা হবে না। আবার এও বলা হয়েছে যে, অঙ্গীকার ও শপথ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার

পূর্বেই হোক বা পরেই হোক নির্দেশ একই যে, যাদের সাথে অঙ্গীকার করা হবে তারা মীরাস পাবে না। হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ)-এর উক্তি অনুসারে তাদের অংশ হচ্ছে সাহায্য সহানুভূতি, মঙ্গল কামনা এবং অসিয়ত-মীরাস নয়। তিনি বলেন, ‘জনগণ অঙ্গীকার ও চুক্তি করতো যে, তাদের মধ্যে যে প্রথমে মারা যাবে অপর জন তার ওয়ারিস হবে।’ সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা-

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيْيَ أُولِيَّاءَ كُمْ مَعْرُوفًا۔

এ আয়াতটি অবতীর্ণ করে নির্দেশ দেন যে, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন একে অপরের সাথে বেশী সম্পর্কযুক্ত, তবে তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সাথে সম্মত কর ব্যবহার কর। (৩৩: ৬) অর্থাৎ তাদের জন্যে যদি এক তৃতীয়াংশ মাল অসিয়ত করে যাও তবে তা বৈধ। সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ কাজও এটাই। পূর্ববর্তী আরো বহু মনীষী হতে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি **‘وَأُولُوا الْأَرْحَامِ’**-এ আয়াত দ্বারা রাখিত হয়ে গেছে।

হ্যরত সান্দ ইবনে যুবাইর (রঃ) বলেন যে, ‘তাদেরকে তাদের অংশ দাও’-এর ভাবার্থ হচ্ছে মীরাস। হ্যরত আবু বকর (রাঃ) একটি লোককে স্থীয় ‘মাওলা’ বানিয়েছিলেন এবং তাকে উত্তরাধিকারী করেছিলেন। হ্যরত ইবনুল মুসাইয়াব (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ঐ লোকদের ব্যাপারে অবর্তীণ হয় যারা নিজেদের পুত্রদের ছাড়া অন্যদেরকে নিজেদের পুত্র বানিয়ে নিতো এবং তাদেরকে তাদের সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে সাব্যস্ত করতো। তাই আল্লাহ তা‘আলা তাদের অংশ অসিয়তের মাধ্যমে দিতে বলেছেন এবং মীরাস দিতে বলেছেন অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনদেরকে। আল্লাহ তা‘আলা শুধু মুখের ও পালিত পুত্রদেরকে মীরাস দিতে নিষেধ করেছেন এবং খুব অপছন্দও করেছেন। তবে তাদেরকে অসিয়তের মাধ্যমে দিতে বলেছেন।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন, আমার নিকট মনোনীত উক্তি হচ্ছে এই যে, ‘তাদেরকে অংশ দাও’-এর ভাবার্থ হচ্ছে-তাদেরকে সাহায্য সহানুভূতির অংশ দাও। কিন্তু এটা নয় যে, তাদেরকে তাদের মীরাসের অংশ দাও। এ অর্থ করলে আয়াতটিকে ‘মানসুখ’ বলার কোন কারণ থাকে না বা একথা বলারও প্রয়োজন হয় না যে, এ নির্দেশ পূর্বে ছিল এখন নেই। বরং আয়াত শুধু এ কথার নির্দেশ করেছে যে, তোমাদের মধ্যে একে অপরের সাহায্য সহানুভূতি করার যে অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা পূরণ কর। সুতরাং এ আয়াতটি

‘মুহকাম’ ও রহিতহীন। কিন্তু ইমাম সাহেবের এ উক্তির ব্যাপারে কিছু চিন্তার বিষয় রয়েছে। কেননা, এটা নিঃসন্দেহ যে, কতগুলো অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রূতি শুধু সাহায্য সহানুভূতির উপরই হতো। কিন্তু এতেও সন্দেহ নেই যে, কতগুলো অঙ্গীকার মীরাসের উপরও হতো। যেমন পূর্ববর্তী বহু গুরুজন হতে বর্ণিত হয়েছে এবং যেমন হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ)-এর তাফসীরেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, মুহাজিরগণ আনসারদের উত্তরাধিকারী হতেন এবং তাঁদের আস্তীয়গণ উত্তরাধিকারী হতেন না। অবশ্যে এটা রহিত হয়ে যায়। তাহলে ইমাম ইবনে জারীর (রাঃ) একথা কিরণে বলতে পারেন যে, এ আয়াতটি ‘মুহকাম’ ও রহিতহীন? এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

**৩৪। পুরুষগণ নারীদের উপর  
সুপ্রতিষ্ঠিত যেহেতু আল্লাহ  
তাদের মধ্যে একের উপর  
অপরকে গৌরবাভিত করেছেন  
এবং এ হেতু যে, তারা স্বীয়  
ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে  
থাকে; সুতরাং যে সমস্ত নারী  
পুণ্যবর্তী তারা আনুগ্যত করে,  
আল্লাহর সংরক্ষিত ধন্দন  
বিষয় সংরক্ষণ করে; এবং  
যদি নারীগণের অবাধ্যতার  
আশংকা হয়, তবে তাদেরকে  
সদুপদেশ প্রদান কর এবং  
তাদেরকে শয্যা হতে পৃথক  
কর ও তাদেরকে প্রহার কর,  
অনন্তর যদি তারা তোমাদের  
অনুগ্যত হয় তবে তাদের  
জন্যে অন্য পক্ষ অবলম্বন  
করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ  
সমুন্নত মহীয়ান।**

٣٤-الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَىٰ  
النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ  
بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَّبِمَا  
أَنْفَقُوا مِمَّا مَوَالَاهُمْ  
فَالصِّلْحَةُ قِنْتَ حِفْظَ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حِفْظَ اللَّهُ وَالَّتِي  
تَخَافُونَ نَشَوْهُنَ فِعْظُوهُنَ  
وَاهْجَرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاضْرِبُوهُنَ فِي أَطْعَنْكُمْ فَلَا  
تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سِبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْهِ كِبِيرًا

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, পুরুষ হচ্ছে স্ত্রীর নেতা। সে স্ত্রীকে সোজা ও ঠিক-ঠাককারী। কেননা, পুরুষ স্ত্রীর উপর মর্যাদাবান। এ কারণেই নবুওয়াত পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অনুরূপভাবে শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে খলীফা একমাত্র পুরুষই হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘ঐ সব লোক কখনও মুক্তি পেতে পারেন না যারা কোন নারীকে তাদের শাসনকর্ত্তী বানিয়ে নেয়’। (সহীহ বুখারী) এরূপভাবে বিচারপতি প্রভৃতি পদের জন্যেও শুধু পুরুষেরাই যোগ্য। নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা লাভের দ্বিতীয় কারণ এই যে, পুরুষেরা নারীদের উপর তাদের মাল খরচ করে থাকে, যে খরচের দায়িত্ব কিংবা ও সুন্নাহ তাদের প্রতি অর্পণ করেছে। যেমন মোহরের খরচ, খাওয়া পরার খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ। সুতরাং জন্মগতভাবেও পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম এবং উপকারের দিক দিয়েও পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীর উপরে। এ জন্যেই স্ত্রীর উপর পুরুষকে নেতা বানানো হয়েছে।

অন্য জায়গা রয়েছে **‘وَلِلْجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ’** অর্থাৎ ‘তাদের উপর (স্ত্রীদের) পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে।’ (২৪: ২২৮) হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) বলেন, ‘এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, নারীদেরকে পুরুষদের আনুগত্য (স্বীকার) করতে হবে এবং তাদের কাজ হচ্ছে সন্তানাদির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং স্বামীর মালের হিফায়ত করা ইত্যাদি।’

হ্যরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, ‘একটি স্ত্রীলোক নবী (সঃ)-এর সামনে স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তার স্বামী থাকে থাপ্পড় মেরেছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রতিশোধ নেয়ার হকুম প্রায় দিয়েই ফেলেছিলেন, এমন সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং প্রতিশোধ গ্রহণ হতে বিরত রাখা হয়।’

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, একজন আনসারী (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার স্বামী আমাকে ঢড় মেরেছে। ওর চিহ্ন এখনও আমার চেহারায় বিদ্যমান রয়েছে।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ “তার এ অধিকার ছিল না।” সেখানেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমি চেয়েছিলাম এক রকম এবং আল্লাহ তা'আলা চাইলেন অন্য রকম।”

হ্যরত শা'বী (রাঃ) বলেন যে, মাল খরচ করার ভাবার্থ হচ্ছে মোহর আদায় করা। দেখা যায় যে, পুরুষ যদি স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তবে

লে'আনের (একের অপরকে অভিশাপ দেয়াকে 'লে'আন' বলে) হৃকুম রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি স্তী স্বামীর সম্পর্কে একথা বলে এবং প্রমাণ করতে না পারে তবে স্তীকে চাবুক মারা হয়। অতএব, নারীদের মধ্যে সতী সাধ্বী হচ্ছে ঐ নারী, যে তার স্বামীর মাল রক্ষণাবেক্ষণ করে, যা রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “উভয় ঐ নারী যখন তার স্বামী তার দিকে তাকায় তখন সে তাকে সন্তুষ্ট করে, যখন কোন নির্দেশ দেয় তখন তা পালন করে এবং যখন সে বিদেশে গমন করে তখন সে নিজেকে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ হতে নিরাপদে রাখে ও স্থীয় স্বামীর মালের হিফায়ত করে।”

অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন কোন নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রম্যানের রোয়া রাখবে, স্থীয় গুণাঙ্গের হিফায়ত করবে এবং স্বামীকে মেনে চলবে, তাকে বলা হবে—যে কোন দরজা দিয়ে চাও জানাতে প্রবেশ কর।”

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—যেসব নারীর দুষ্টামিকে তোমরা ভয় কর, অর্থাৎ যারা তোমাদের উপরে হতে চায়, তোমাদের অবাধ্যাচরণ করে, তোমাদেরকে কোন গুরুত্ব দেয় না এবং তোমাদের প্রতি শক্রতা পোষণ করে, তাদেরকে তোমরা প্রথমে মুখে উপদেশ প্রদান কর, নানা প্রকারে তাদের অস্তরে তাকওয়া সৃষ্টি কর, স্বামীর অধিকারের কথা তাদেরকে বুঝিয়ে দাও। তাদেকে বল—দেখ, স্বামীর এত অধিকার রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যদি কাউকে আমি এ নির্দেশ দিতে পারতাম যে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করবে তবে নারীকে নির্দেশ দিতাম যে, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। কেননা, তার উপর সবচেয়ে বড় হক তারই রয়েছে।’

সহীহ বুখারী শরীফে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যখন কোন লোক তার স্তীকে বিছানায় আহ্বান করে এবং সে অস্বীকার করে তখন সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।’ সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে রাত্রে কোন স্তী রাগার্বিতা হয়ে স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে, সকাল পর্যন্ত আল্লাহর রহমতের ফেরেশ্তা তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকে।’

তাই এখানে ইরশাদ হচ্ছে—একপ অবাধ্য নারীদেরকে প্রথমে মুখ্যাতে চেষ্টা কর অথরা বিছানা হতে পৃথক রাখ। হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, “অর্থাংশ্যন তো বিছানার উপরেই করাবে, কিন্তু পার্শ্ব পরিবর্তন করে থাকবে এবং সঙ্গম করবে না। তার সাথে কথা বলাও বক্ষ রাখতে পারো এবং স্ত্রীর জন্য এটাই হচ্ছে বড় শাস্তি।” কোন কোন তাফসীরকারকের মতে তাকে পার্শ্বে শুভেও দেবে না।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “স্ত্রীর তার স্বামীর উপর কি হক রয়েছে?” তিনি বলেনঃ “যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন পরবে তখন তাকেও পরাবে, তার মুখে মেরো না, গালি দিও না, ঘর হতে পৃথক করো না, ক্ষেত্রের সময় যদি শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে কথা বক্ষ কর তথাপি তাকে ঘর হতে বের করো না।” অতঃপর বলেনঃ “তাতেও যদি ঠিক না হয় তবে তাকে শাসন-গর্জন করে এবং মেরে-পিটেও সরল পথে আনয়ন করো।”

সহীহ মুসলিমে নবী (সঃ)-এর বিদায় ইজ্জের ভাষণে রয়েছেঃ “নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তারা তোমাদের সেবিকা ও অধীনস্থ। তাদের উপর তোমাদের হক এই যে, যাদের যাতায়াতে তোমরা অসম্মুষ্ট তাদেরকে তারা আসতে দেবে না। যদি তারা একপ না করে তবে তোমরা তাদেরকে যেনে-তেন প্রকারে সুরক্ষ করতে পার। কিন্তু তোমরা তাদেরকে কঠিনভাবে প্রহার করতে পার না, যে প্রহারের চিহ্ন প্রকাশ পায়। তোমাদের উপর তাদের হক এই যে, তোমরা তাদেরকে খাওয়াবে ও পরাবে এবং এমন প্রহার করা উচিত নয় যার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে, কোন অঙ্গ ভেঙ্গে যায় কিংবা কোন অঙ্গ আহত হয়।”

হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, ‘এরপরও যদি তারা বিরত না হয় তবে ক্ষতিপূরণ নিয়ে তালাক দিয়ে দাও।’ একটি হাদিসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আল্লাহর দাসীদেরকে প্রহার করো না।’ এরপর একদা হ্যরত উমার ফারুক (রাঃ) এসে আরয় করেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল! নারীরা আপনার এ নির্দেশ শুনে তাদের স্বামীদের উপর বীরত্বপনা দেখানো আরম্ভ করেছে।’ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে মারার অনুমতি দেন। তখন পুরুষদের পক্ষ হতে বেদম মারপিট শুরু হয়ে যায় এবং বছ নারী অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘জেনে রেখ যে, আমার নিকট নারীদের অভিযোগ পৌছেছে। মনে রেখ যে, যারা স্ত্রীদের উপর শক্তি প্রয়োগ করে তারা ভাল মানুষ নয়।’ (সুনান-ই-আবি দাউদ)

হয়েরত আশআস (রাঃ) বলেন, একদা আমি হয়েরত উমার (রাঃ)-এর আতিথ্য গ্রহণ করি। ঘটনাক্রমে সে দিন তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছু তিক্ততার সৃষ্টি হয়। হয়েরত উমার (রাঃ) স্বীয় পত্নীকে প্রহার করেন, অতঃপর আমাকে বলেন, ‘হে আশআস (রাঃ)! তিনটি কথা শ্বরণ রেখ, যা আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শ্বরণ রেখেছি। এক তো এই যে, স্বামীকে জিজ্ঞেস করতে হবে না যে, তিনি স্বীয় স্ত্রীকে কেন মেরেছেন। দ্বিতীয় এই যে, বিতরের নামায না পড়ে শুতে হবে না। তৃতীয় কথাটি বর্ণনাকারীর মনে নেই। (সুনান-ই-নাসাই) অতঃপর বলেন, ‘তখন যদি নারীরা তোমাদের বাধ্য হয়ে যায় তবে তোমরা তাদের প্রতি কোন কঠোরতা অবলম্বন করো না, মারপিট করো না এবং অসম্ভুষ্টি প্রকাশও করো না।’

‘আল্লাহ সম্মুন্নত ও মহীয়ান।’ অর্থাৎ যদি নারীদের পক্ষ হতে দোষক্রটি প্রকাশ পাওয়া ছাড়াই বা দোষক্রটি করার পর সংশোধিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তোমরা তাদেরকে শাসন-গর্জন কর, তবে জেনে রেখ যে, তাদেরকে সাহায্য করা ও তাদের পক্ষ হতে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন এবং নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান।

৩৫। আর যদি তোমরা উভয়ের

মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর,  
তবে তার বংশ হতে একজন  
বিচারক ও ওর বংশ হতে  
একজন বিচারক নির্দিষ্ট কর;  
যদি তারা মীমাংসা আকাঞ্চ্ছা  
করে তবে আল্লাহ তাদের  
মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করবেন;  
নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী,  
অভিজ্ঞ।

وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا  
فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ  
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوْفِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ  
الَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَيْرًا

উপরে ঐ অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, অবাধ্যতা ও বক্রতা যদি স্ত্রীর পক্ষ হতে হয়। আর এখানে ঐ অবস্থার বর্ণনা দেয় হচ্ছে যে, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একে অপরের প্রতি বিরুপ মত পোষণ করে তবে কি করতে হবেং এ ব্যাপারে উলামা-ই-কিরাম বলেন যে, এরূপ অবস্থায় শাসনকর্তা একজন

নির্ভরযোগ্য ও বুদ্ধিমান বিচারক নিযুক্ত করবেন। যিনি দেখবেন যে, অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি কার পক্ষ হতে হচ্ছে। অতঃপর তিনি অত্যাচারীকে অত্যাচার হতে বাধা দান করবেন। যদি এর দ্বারা কোন সন্তোষজনক ফল পাওয়া না যায় তবে শাসনকর্তা স্ত্রীর পক্ষ হতে একজন ও পুরুষের পক্ষ হতে একজন বিচারক নির্ধারণ করবেন এবং তাঁরা দু'জন মিলিতভাবে বিষয়টি যাচাই করে দেখবেন। অতঃপর যাতে তাঁরা মঙ্গল বিবেচনা করবেন সে মীমাংসাই করবেন। অর্থাৎ হয় তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করবেন, না হয় মিলন ঘটিয়ে দেবেন। কিন্তু শরীয়তের প্রচারক (সঃ) তো ঐ কাজের দিকেই আগ্রহ উৎপাদন করেছেন যে, তাঁরা যেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলন ঘটাবারই যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বিচারকদ্বয়ের যাচাইয়ে যদি স্বামীর দিক হতে অন্যায় প্রমাণিত হয় তবে তাঁরা এ স্ত্রীকে তার স্বামী হতে পৃথক করে রাখবেন এবং স্বামীকে বাধ্য করবেন যে, সে যেন তার চরিত্র ভাল না করা পর্যন্ত স্ত্রী হতে পৃথক থাকে এবং তার খরচ বহন করে। আর যদি দুষ্টামি স্ত্রীর দিক হতে প্রমাণিত হয় তবে তাঁরা তার স্বামীকে খরচ বহন করতে বাধ্য করবেন না, বরং স্ত্রীকেই করবেন। অনুরূপভাবে যদি বিচারকদ্বয় তালাকের ফায়সালা করেন তবে স্বামী তালাক দিতে বাধ্য হবে। আর যদি তাঁরা তাদের পরম্পরারেই বসবাসের ফায়সালা করেন তবে সেটাও তাদেরকে মানতে হবে। এমনকি হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তো বলেন যে, সালিসদ্বয় যদি তাদেরকে একত্রীকরণের ফায়সালা করেন এবং সে ফায়সালা একজন মেনে নেয় ও অপরজন না মানে আর ঐ অবস্থাতেই একজনের মৃত্যু হয়ে যায় তবে যে সম্ভত ছিল সে অসম্ভত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু যে অসম্ভত ছিল সে সম্ভত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না। (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর)

এ রকমই একটি বিবাদে হ্যরত উসমান (রাঃ) হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হ্যরত মু'আবিয়া (রাঃ)-কে সালিস নিযুক্ত করেন এবং তাঁদেরকে বলেন, ‘তোমরা যদি তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে চাও তবে সংযোগ স্থাপিত হয়ে যাবে। আর যদি বিচ্ছেদ আনয়নের ইচ্ছে কর তবে বিচ্ছেদই হয়ে যাবে।’

একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হ্যরত আকীল ইবনে আবু তালিব (রাঃ) হ্যরত ফাতিমা বিনতে উৎবা ইবনে রাবিআ' (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। হ্যরত ফাতিমা (রাঃ) হ্যরত আকীল (রাঃ)-কে বলেন, ‘তুমি আমার নিকট আসবেও এবং আমি তোমার খরচও বহন করবো।’ তখন এই ঘটতে থাকে যে, হ্যরত

আকীল (রাঃ) যখন হয়রত ফাতিমা (রাঃ)-এর নিকট আসার ইচ্ছে করতেন তখন তিনি (ফাতিমা রাঃ) জিজ্ঞেস করতেন, ‘উৎবা ইবনে রাবিজা’ এবং ‘শাইবা ইবনে রাবিজা’ কোথায় রয়েছে? হয়রত আকীল (রাঃ) বলতেন, ‘তোমার বাম পার্শ্বে জাহানামে রয়েছে।’ এতে হয়রত ফাতিমা (রাঃ) কুপিতা হয়ে স্বীয় কাপড় ঠিক করে নিতেন (অর্থাৎ অন্ধবৃত্ত দেহ বন্ধে আবৃত করতেন)। একদিন হয়রত আকীল (রাঃ) হয়রত উসমান (রাঃ)-এর নিকট এসে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। হয়রত উসমান (রাঃ) এতে হেসে উঠেন এবং হয়রত ইবনে আবাস (রাঃ) ও হয়রত মু'আবিয়া (রাঃ)-কে তাঁদের সালিস নিযুক্ত করেন। হয়রত ইবনে আবাস (রাঃ) তো বলছিলেন যে, তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করা হোক। কিন্তু হয়রত মু'আবিয়া (রাঃ) বলেছিলেন, ‘আমি বানু আবদ-ই-মানাফের মধ্যে এ বিচ্ছেদ অপছন্দ করি।’ তখন তাঁরা হয়রত আকীল (রাঃ)-এর গৃহে আগমন করেন। এসে দেখেন যে, দরজা বন্ধ রয়েছে এবং স্বামী-স্ত্রী দু'জনই ভেতরে রয়েছেন। তখন তাঁরা ফিরে আসেন।

মুসনাদ-ই-আবদুর রায়যাকে রয়েছে যে, আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকালে এক দম্পত্তি মনোমালিন্যের ঝগড়া নিয়ে হয়রত আলী (রাঃ)-এর নিকট আগমন করেন। উভয়ের সাথে নিজ নিজ ভাস্তুপক্ষীয় লোক ছিল। হয়রত আলী (রাঃ) উভয় দল হতে একজন করে লোক বেছে নিয়ে তাঁদেরকে সালিস নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি সালিসদ্বয়কে বলেন, ‘তোমাদের কাজ কি তা তোমরা জান কি? তোমাদের কাজ হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীকে একত্রিত করণ বা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান।’ একথা শুনে স্ত্রী বলে, ‘আমি আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তের উপর সম্মত রয়েছি, সেটা হয় সংযোগ হোক, না হয় বিচ্ছেদই হোক।’ কিন্তু স্বামী বলে, ‘বিচ্ছেদে আমি সম্মত নই।’ তাতে হয়রত আলী (রাঃ) বলেন, ‘না, না। আল্লাহর শপথ! তোমাকে দু'টোতেই সম্মত হতে হবে।’

অতএব, আলেমদের ইজমা হয়েছে যে, একপ অবস্থায় এ সালিসদ্বয়ের দু'টোরই স্বাধীনতা রয়েছে। এমনকি হয়রত ইবরাহীম লাখজি (রঃ) বলেন যে, তাঁর ইচ্ছে করলে দু'টি বা তিনটি তালাকও দিতে পারেন। হয়রত ইমাম মালিক (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। হ্যাঁ, তবে হয়রত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, তাঁদের একত্রিত করণের অধিকার রয়েছে বটে, কিন্তু বিচ্ছেদ করণের অধিকার নেই। হয়রত কাতাদু (রঃ) এবং হয়রত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ)-এরও এটাই উক্তি। ইমাম আহমাদ (রঃ), আবু সাউর এবং (রঃ)

দাউদের মাযহাব এটাই। তাঁদের দলীল হচ্ছে ﴿نُبَرِّيدَا إِصْلَاحًا﴾ যুক্ত আয়াতটি। কেননা, এতে বিচ্ছেদের উল্লেখ নেই। হ্যাঁ, তবে যদি তাঁরা দু'জন দু'পক্ষ হতে ওয়াকীল (উকিল) নির্বাচিত হল তবে অবশ্যই তাঁদের সংযোগ ও বিচ্ছেদ দু'টোরই অধিকার রয়েছে। আর এতে কারও বিরোধ নকল করা হয়নি। এটাও মনে রাখতে হবে যে, এ দু'জন সালীস শাসনকর্তার পক্ষ হতে নিযুক্ত হবেন এবং তাঁর পক্ষ হচ্ছেই ফায়সালা করবেন, যদিও তাঁতে উভয়পক্ষ অসম্মত থাকে। অথবা সালীসদ্বয়, স্বামী ও স্ত্রীর পক্ষ হতে ওয়াকীল (উকিল) নির্বাচিত হবেন। জমহুরের মাযহাব হচ্ছে প্রথমটি। তাঁদের দলীল হচ্ছে এই যে, কুরআন হাকিম তাঁদের নাম 'হাকাম' রেখেছে এবং 'হাকামে'র ফায়সালায় কেউ সন্তুষ্ট হোক আর অসন্তুষ্টই হোক সর্বাবস্থাতেই তাঁদের ফায়সালা শিরোধার্য।

আয়াতের বাহ্যিক শব্দগুলো জমহুরের পক্ষেই রয়েছে। ইয়াম শাফিউদ্দিন (রঃ)-এর নিতুন উক্তি এটাই এবং ইয়াম আবু হানিফা (রঃ) ও তাঁর সহচরদের এটাই উক্তি। দ্বিতীয় উক্তি যাঁদের তাঁরা বলেন যে, যদি তাঁরা 'হাকামের' অবস্থায় হতেন তবে হ্যারত আলী (রাঃ) এই স্বামীকে কেন বললেন- তোমার স্ত্রী যখন দু' অবস্থাকেই মেনে নিয়েছে তখন তুমি না মানলে তুমি মিথ্যবাদীরূপে সাব্যস্ত হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলারই জ্ঞান সবচেয়ে বেশী রয়েছে।

ইয়াম ইবনে বাবুর (রঃ) বলেন, এ কথার উপর আলেমদের ইজমা হয়েছে যে, দু'জন সালীসের উক্তির মধ্যে যখন মতবিরোধ দেখা দেবে তখন অপরের উক্তির উপর কোন গুরুত্ব দেয়া হবে না। একথার উপরও ইজমা হয়েছে যে, যদি সালীসদ্বয় সংযোগ স্থাপন করতে চান তবে তাঁদের ফায়সালা কার্যকরী হবে। কিন্তু যদি তাঁরা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করতে চান তাহলেও তাঁদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে কিনা সে বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু জমহুরের মাযহাব এটাই যে, সে সময়েও তাঁদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে যদিও তাঁদেরকে ওয়াকীল (উকিল) বানালো না হয়।

৩৬। এবং তোমরা আল্লাহরই

ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে

কোন বিষয়ে অংশী স্থাপন

করো না; এবং পিতা-মাতার

সাথে সদ্যবিহার কর

৩৬۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا

بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا

وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْبَرِّ مِمَّا

وَيُنْهَى

وَالْمَسْكِينُ وَالْجَارُ ذِي  
الْقُرْبَى وَالْجَارُ الْجُنُبُ  
وَالصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ وَابْنُ  
السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ  
مُخْتَالاً فَخُوراً ۝

ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ସ୍ମୀୟ ଇବାଦତେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଚ୍ଛେନ ଏବଂ ସ୍ମୀୟ ଏକତ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରତେ ବଲଛେନ ଏବଂ ତୀର୍ତ୍ତ ସାଥେ ଅନ୍ୟ କାଉକେ ଅଂଶୀଦାର କରତେ ନିଷେଧ କରଛେନ । କେନା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆହାର୍ୟଦାତା, ନିଆମତ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ସମ୍ମତ ସୃଷ୍ଟଜୀବେର ଉପର ସଦା-ସର୍ବଦା ଓ ସର୍ବାବସ୍ଥାୟ ଦାନେର ବୃଦ୍ଧି ବର୍ଣ୍ଣକାରୀ ଏକମାତ୍ର ତିନିଇ । ସୁତରାଏ ଏକମାତ୍ର ତିନିଇ ହଞ୍ଚେନ ଇବାଦତେର ଯୋଗ୍ୟ ।

হ্যৱত মু'আয (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “বান্দাদের উপর আল্লাহর হক কী তা জান কি?” তিনি উত্তরে বলেন, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সঃ) খুব ভাল জানেন।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তা হচ্ছে এই যে, বান্দা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করবে না।” অতঃপর তিনি বলেনঃ “বান্দা যখন এটা করবে তখন আল্লাহর জিশ্বায় তাদের হক কী রয়েছে তা জান কি? তা এই যে, তিনি তাদেরকে শান্তি দেবেন না।”

ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ବଲେନ-ତୋମରା ପିତା-ମାତାର ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଦ୍ୟବହାର କରତେ ଥାକ ।  
କେନନା, ତାରାଇ ତୋମାଦେରକେ ଅନ୍ତିତ୍ତୁହୀନତା ହତେ ଅନ୍ତିତ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରାର କାରଣ ।  
କୁରାନ କାରୀମେର ଅନେକ ଆୟାତେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଇବାଦତେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେଇ  
ପିତା-ମାତାର ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଦ୍ୟବହାର କରାର ନିର୍ଦେଶ ଦିଯେଛେ । ସେମନ ଏକ ଜାୟଗାୟ  
ରୁଯେଛେ—

أَنِ اشْكُرْلِيْ وَلِوَالِدِيْكَ

অর্থাৎ “তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং তোমার পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।” (৩১: ১৪) আর এক জায়গায় রয়েছে—

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاً.

অর্থাৎ “তোমার প্রভু এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমার একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সম্মতবহার করবে।” (১৭: ২৩) এখানেও এ নির্দেশ দেয়ার পর হস্তম দিচ্ছেন— ‘তোমরা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথেও ভাল ব্যবহার কর।’ যেমন হাদীস শরীফে এসেছেঃ “মিসকীনদের উপর সাদকা শুধু সাদকাই হয় এবং আত্মীয়দের উপর সাদকা সাদকাও হয় এবং সাথে সাথে আত্মীয়তার সংযোগ স্থাপনও হয়।”

অতঃপর নির্দেশ হচ্ছে—‘তোমরা পিতৃহীনদের সাথেও উস্তুর ব্যবহার কর। কেননা, তাদের দেখাওনাকারী, তাদের মন্তকোপারি স্নেহের হস্তচালনাকারী, তাদেরকে সোহাগকারী এবং স্নেহ ও আদরের সাথে তাদেরকে পানাহারকারী দুনিয়া হতে বিদায় প্রাপ্ত করেছে।’

এরপর মিসকীনদের সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা, তারা অভাবগ্রস্ত, রিক্ত হস্ত এবং পরমুখাপেক্ষী। তাই আল্লাহ পাক বলেন—‘তোমরা এ মিসকীনদের অভাব দূর কর এবং তাদের কাজকর্ম করে দাও।’ ফকীর ও মিসকীনের পূর্ণ বর্ণনা সূরা-ই-বারাআতে ইনশাআল্লাহ আসবে।

এবারে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘তোমরা প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখ। তাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। তারা সম্পর্কীয় প্রতিবেশীই হোক আর সম্পর্ক বিহীনই হোক, তারা মুসলমানই হোক বা ইয়াহুদী ও শ্রীষ্টানই হোক।’ এও বলা হয়েছে যে, <sup>١</sup>أَبْلَرْ ذِي الْقُرْبَى—<sup>٢</sup>أَبْلَرْ الْجِنْبُ—এর ভাবার্থ হচ্ছে স্ত্রী এবং <sup>١</sup>أَبْلَرْ ذِي الْقُرْبَى—<sup>২</sup>أَبْلَرْ الْجِنْبُ—এর ভাবার্থ হচ্ছে সফরের বস্তু। প্রতিবেশীদের ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। নিম্নে কিছু বর্ণিত হচ্ছে— (১) মুসলাম-ই-আহমাদে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “হযরত জিবরাইল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে এত বেশী উপদেশ দেন যে, আমার ধারণা হয় তিনি প্রতিবেশীদেরকে উস্তুরাধিকারী বানিয়ে দেবেন।” (২) মুসলাম-ই-আহমাদেই রয়েছে, হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেনঃ “সঙ্গীদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট উস্তুর সঙ্গী ঐ ব্যক্তি যে তার সঙ্গীর সাথে উস্তুর ব্যবহার করে থাকে এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে আল্লাহ

তা'আলার নিকট উত্তর প্রতিবেশী এই ব্যক্তি যে প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করে।” (৩) মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হযরত উমার (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “মানুষের উচিত ময় যে, সে প্রতিবেশীকে পরিত্ণ না করে নিজে তৎপুরু সহকারে আহার করে।” (৪) মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা স্বীয় সাহাবীবর্গকে জিজ্ঞেস করেনঃ “‘ব্যভিচার সম্বন্ধে তোমরা কি বল?’ সাহাবীগণ বলেন, ওটা অবৈধ। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সঃ) ওটাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত ওটা অবৈধই থাকবে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “জেনে রেখ যে, দশজন নারীর সাথে ব্যভিচারকারী ব্যক্তি এই ব্যক্তি অপেক্ষা কম পাপী যে তার প্রতিবেশীর স্তুর সাথে ব্যভিচার করে।” পুনরায় তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমরা চুরি সম্বন্ধে কি বল? তারা উত্তরে বলেন, “ওটাকেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) হারাম করেছেন এবং ওটাও কিয়ামত পর্যন্ত হারামই থাকবে।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ “জেনে রেখ যে, যে চোর দশ বাড়ীতে চুরি করেছে তার পাপ এই চোরের পাপ হতে হালকা, যে তার প্রতিবেশীর ঘর হতে কিছু চুরি করে।” (৫) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি?” তিনি বলেনঃ “তা এই যে, তুমি আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন কর, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।” আমি বলি, ভারপুর কোনটি? তিনি বলেনঃ “তারপরে এই যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে ব্যভিচারে লিঙ্গ হও।” (৬) একজন আনসারী সাহাবী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হায়ির হওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি হতে বের হই, তখাক গিয়ে দেখি যে, একটি লোক দাঁড়িয়ে আছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর মুখেমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ধারণা করি যে, সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তাঁর কোন কাজ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং লোকটির সাথে কথাবার্তা চলছে। অধিক বিলম্ব হয়ে যায়। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ক্রান্তির খারপা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। অনেকক্ষণ পর তিনি কিরে আসেন এবং আমার নিকট আগমন করেন। আমি বলি, “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই লোকটি তো বহুক্ষণ ধরে আপনাকে দাঢ় করিয়ে রেখেছিল। আমি তো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। ইহতো আপনার পা ক্রান্তি হয়ে পড়েছে।” তিনি বলেনঃ “আচ্য তুমি তাকে দেখেছো?”

আমি বলি, হ্যাঁ খুব ভাল করে দেখেছি। তিনি বলেন, “তুমি কি জান তিনি কে ছিলেন? তিনি ছিলেন ইবরাত জিবরাস্ল” (আঃ)। তিনি প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে আমার প্রতি চাপ সৃষ্টি করছিলেন। তিনি তাদের এত বেশী হক বর্ণনা করেন যে, আমার মনে সন্দেহ হয়, মা জানি আজ তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারীই বানিয়ে দেন।” অতঃপর তিনি বলেন, “তুমি ধনি তাকে সালাম করতে তবে অবশ্যই” তিনি তোমার সালামের উত্তর দিতেন। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)

(৭) মুসনাদ-ই-আধ্য ইবনে ইমাদে রয়েছে, ইবরাত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, পল্লী অঞ্চল হতে একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও ইবরাত জিবরাস্ল (আঃ) এ জায়গায় নামায পড়ছিলেন যেখানে জানাযার নামায পড়া হতো। নামায শেষে এই লোকটি বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! অন্য একটি লোক যে আপনার সাথে নামায পড়ছিলেন তিনি কে?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ‘তুমি খুব উত্তম জিনিস দেখেছো।’ তিনি ছিলেন জিবরাস্ল (আঃ)। তিনি প্রতিবেশীর ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন। আমার ধারণা হয় যে, অতিসত্ত্বই তাকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন।

(৮) আবু বকর আল বায়য়ায (রঃ)-এর গ্রন্থে ইবরাত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “প্রতিবেশী তিনি প্রকারের রয়েছেঃ (১) এক হক বিশিষ্ট অর্থাৎ নিম্নতম। (২) দু’ হক বিশিষ্ট এবং (৩) তিনি হক বিশিষ্ট অর্থাৎ সর্বোচ্চ। এক হক বিশিষ্ট ত্রি প্রতিবেশী যে মুশরিক এবং যার সঙ্গে কোন আভীয়তার সম্পর্ক নেই। দু’ হক বিশিষ্ট এই প্রতিবেশী যে মুসলমান, কিন্তু তার সঙ্গে আভীয়তার সম্পর্ক নেই। তার এক হক হলো ইসলামের হক এবং দ্বিতীয় হক ইচ্ছে প্রতিবেশীর হক। তিনি হক বিশিষ্ট হচ্ছে এই প্রতিবেশী যে মুসলমান এবং তার সাথে আভীয়তার সম্পর্কও রয়েছে। কাজেই তার প্রথম হক হলো ইসলামের হক, দ্বিতীয় হক হলো প্রতিবেশীর হক এবং তৃতীয় হক হলো আভীয়তার হক।”

(৯) মুসনাদ-ই-আহমাদে ইবরাত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, ‘আমার দু’টি প্রতিবেশী রয়েছে। আমি একজনের কাছে উপচোকন পাঠাতে চাই, তাহলে কার কাছে পাঠাবো?’ তিনি উত্তরে বলেনঃ “যার দরজা নিকটে হবে।”

(১০) তাবরানীর হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযু করেন। জনগণ তাঁর অযুর পানি নিয়ে শরীরে মলতে আরম্ভ করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ ‘একুপ করছো কেন?’ তাঁরা বলেন, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর মহবতে’। তখন তিনি বলেনঃ ‘যে এতে খুশী হয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) তাকে ভালবাসেন সে যেন যখন কথা বলে তখন সত্য বলে, যখন আমানত দেয়া হয় তখন তা আদায় করে এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে সন্দ্বিবহার করে।’

(১১) মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলার সামনে প্রথম যে ঝগড়া পেশ করা হবে তা হবে দু’জন প্রতিবেশীর ঝগড়া।”

এরপর আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন—‘তোমরা পার্শ্ববর্তী সহচরের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার কর।’ বহু তাফসীর কারকের মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে স্ত্রী, আবার অনেকের মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে সফরের সঙ্গী। এও বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণভাবে এর ভাবার্থ হচ্ছে বন্ধু ও সঙ্গী। সে সঙ্গী সফরেরই হোক বা বাড়ীর পার্শ্বেরই হোক। এর ভাবার্থ হচ্ছে অতিথি। আবার যে পথ চলতে চলতে থেমে গেছে একুপ লোককেও ‘ইবনুস সাবিল’ বলা হয়েছে। সুতরাং যদি অতিথিরও এ অর্থ নেয়া হয় যে সফরে চলতে চলতে অতিথি হয়ে গেছে তবে দু’টো এক হয়ে যায়। এরও পূর্ণ বর্ণনা সূরা-ই-বারাআতে আসবে ইনশাআল্লাহ।

অতঃপর বলা হচ্ছে—‘তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী তাদের সঙ্গেও সৎ ব্যবহার কর।’ কেননা, ঐ গরীবেরা তো তোমাদের হাতে রয়েছে। তাদের উপর তো তোমাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কাজেই তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা এবং সাধ্যানুসারে তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) তো স্বীয় মরণ রোগেও স্বীয় উম্মতকে এর জন্যে অসিয়ত করে গেছেন। তিনি বলেনঃ ‘হে লোক সকল! নামায ও দাসদের প্রতি খুব খেয়াল রাখবে।’ বার বার তিনি একথা বলতেই থাকেন, অবশ্যে তাঁর বাকশক্তি রহিত হয়ে যায়।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তুমি নিজে যা খাও ওটাও সাদকা, যা তোমার সন্তানদেরকে খাওয়াও ওটাও সাদকা, যা তোমার স্ত্রীকে খাওয়াও ওটাও সাদকা এবং যা তোমার পরিচারককে খাওয়াও ওটাও সাদকা।”

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) স্বীয় দারোগাকে বলেন, ‘গোলামদেরকে তাদের আহার্য দিয়েছো কি?’ তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত দেইনি।’ তখন হ্যরত আবদুল্লাহ (রঞ্জ) বলেন, যাও, দিয়ে এসো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘মানুষের জন্যে এ পাপই যথেষ্ট যে, সে যে আহার্যের মালিক তা সে আটকিয়ে রাখে।’

সহীহ মুসলিমে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘অধীনস্থ গোলামের হক এই-যে, তাকে খাওয়ানো, পান করানো ও পরানো হবে এবং তার দ্বারা তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেয়া হবে না।’

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যখন তোমাদের কারও পরিচারক তার খাদ্য নিয়ে আসে তখন তোমাদের উচিত যে, যদি পার্শ্বে বসিয়ে খাওয়াতে না পার তবে কমপক্ষে তাকে ‘দু’ এক গ্রাস দিয়ে দেবে। তোমরা এটা খেয়াল রাখবে যে, রান্না করার গরম ও কষ্ট তাকেই ভোগ করতে হয়েছে।’ অন্য বর্ণনা রয়েছেঃ ‘তোমাদের উচিত তো এই যে, তাকে সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াবে। যদি খাদ্য কম হয় তবে তাকে ‘দু’ গ্রাস দিয়ে দেবে।’ তিনি বলেন, ‘তোমাদের গোলামও তোমাদের ভাই। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং যার অধীনে তার ভাই থাকবে তাকে যেন সে তার খাবার হতে খেতে দেয়, যা সে পরবে তা হতে যেন তাকেও পরতে দেয়। তাদের দ্বারা এমন কাজ করিয়ে নেবে না যাতে তারা অসমর্থ হয়ে পড়ে। যদি এরূপ কোন কাজ এসেই পড়ে তবে নিজেরাও তাদেরকে সাহায্য করবে।’ (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন-‘অহংকারীও আস্তানানীকে আল্লাহ তা‘আলা ভালবাসেন না।’ তারা নিজেদেরকে ভাল মনে করলেও আল্লাহ পাকের নিকট তারা আদৌ ভাল নয়। তারা নিজেদেরকে বড় ও সম্মানিত মনে করলেও আল্লাহ তা‘আলার নিকট তারা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। জনগণের দৃষ্টিতেও তারা হয় ও তুচ্ছ। তারা কত বড় অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ যে, কারও উপর কিছু অনুগ্রহ করলে তাকে সে অনুগ্রহের খৌটা দেয়, কিন্তু তাদের প্রভুর যে নিআমত তাদের উপর রয়েছে তার জন্য তারা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। মানুষের মধ্যে বসে তারা গর্ব করে বলে আমি এত বড় লোক, আমার এটা আছে, ওটা আছে।

হ্যরত আবু রাজা হারভী (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক দুশ্চরিত্র ব্যক্তি অহংকারী ও আত্মস্মরী হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন, ‘পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি পাপাচারী ও হতভাগা হয়ে থাকে।’ অতঃপর তিনি ‘**وَرَبِّنَا بِوَالدَّيْنِ وَلَمْ يَجْعَلْنَا جَبَارًا شَفِيقًا**’ (১৯: ৩২) -এ আয়াতটি পাঠ করেন। হ্যরত আওয়াম ইবনে হাওশাবও (রঃ) এটাই বলেন।

হ্যরত মাতরাফ (রঃ) বলেন, ‘আমার নিকট হ্যরত আবু যার (রাঃ)-এর একটি বর্ণনা পৌছেছিল এবং আমার মনের বাসনা ছিল যে, কোন সময় নিজেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর নিজেরই মুখে বর্ণনাটি শুনবো। ঘটনাক্রমে একবার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি তাঁকে বলি, আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, আপনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। হাদীসটি হচ্ছে: ‘আল্লাহ তা‘আলা তিন প্রকার লোককে পছন্দ করেন এবং তিন প্রকার লোককে অপছন্দ করেন।’ হ্যরত আবু যার (রাঃ) বলেন-‘হ্যাঁ, এটা সত্য। আমি কি আমার বন্ধুর (সঃ) উপর মিথ্যা আরোপ করবো?’ এ কথা তিনি তিনবার বলেন। আমি তখন বলি আচ্ছা, এই তিন প্রকারের লোক কারো যাদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলা কুপিতঃ তিনি বলেন, ‘অহংকারী ও আত্মাভিমানী ব্যক্তি। তারপরে তিনি বলেন-‘এটা তো আপনি আল্লাহ তা‘আলার কিতাবের মধ্যেও পেয়ে থাকেন।’ অতঃপর তিনি ‘**إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مِنْ كَانَ مُخْتَلِفًا فَخُورًا**’ (৪: ৩৬)-এ আয়াতটি পাঠ করেন।

বানু হাজীম গোত্রের একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেন ‘আমাকে কিছু উপদেশ দিন।’ তিনি বলেনঃ ‘কাপড় পায়ের গিঠের নীচে ঝুলিয়ে (লটকিয়ে) দিওনা। কেননা, এটা হচ্ছে অহংকার ও আত্মস্মরিতা যা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না।’

৩৭। যারা কৃপণতা করে ও  
লোকদেরকে কার্পণ্য শিক্ষা  
দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় সম্পদ  
হতে যা দান করেছেন তা  
গোপন করে এবং আমি সে  
অবিশ্বাসীদের জন্যে  
অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত  
করে রেখেছি।

٣٧  
**إِنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ  
النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتَمُونَ مَا  
أَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدُنَا  
لِلْكُفَّارِينَ عَذَابًا مُهِينًا**

৩৮। এবং যারা লোকদেরকে

দেখাবার জন্যে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, আর তাদের সহচর শয়তান-

সে নিকৃষ্ট সঙ্গীই রয়ে।

৩৯। আর এতে তাদের কি হতো— যদি তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতো এবং আল্লাহ তাদেরকে যা প্রদান করেছেন তা হতে ব্যয় করতো? এবং আল্লাহ তাদের বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

ইরশাদ হচ্ছে— যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কার্যে মাল খরচ করতে কার্পণ্য করে, যেমন বাপ-মাকে প্রদান করতে এবং আজ্ঞায়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, সম্পর্কযুক্ত ও সম্পর্ক বিহীন প্রতিবেশী, মুসাফির এবং দাস-দাসীকে অভাবের সময় আল্লাহর উদ্যাস্তে দান করার কার্যে কার্পণ্য করে, শুধু তাই নয় বরং লোকদেরকেও কার্পণ্য শিক্ষা দেয়। এবং আল্লাহ তা'আলার পথে খরচ না করার পরামর্শ দেয়, তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক খাণ্ডি।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ ‘কার্পণ্য অপেক্ষা বড় রোগ আর কি হতে পারে?’ তিনি আরো বলেছেনঃ ‘হে মানবমণ্ডলী! তোমরা কার্পণ্য হতে বেঁচে থাক। এটাই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ঝংস করে দিয়েছে। এর কারণেই তাদের মধ্যে আজ্ঞায়তার সম্পর্ক ছিন্নতা, অন্যায় ও দুর্কার্য প্রকাশ পেয়েছিল।’

এরপর বলা হচ্ছে— তারা এ দুটি দুর্কার্যের সাথে সাথে আরও একটি দুর্কার্যে লিঙ্গ হয়। তা এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নি'আমত্সমূহ গোপন করে, ঐগুলো প্রকাশ করে না। ঐগুলো না তাদের খাওয়া প্রয়ায় প্রকাশ পায়, না আদান-প্রদানে প্রকাশিত হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে—

۳۸۔ وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رَبَّ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكْنِي الشَّيْطَنَ لَهُ قُرْبَانًا

۳۹۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْا مُنِوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرِبِّهِ لَكَنُودٌ \* وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذِلْكَ لَشَهِيدٌ \*

অর্থাৎ ‘নিশ্চয়ই মানুষ তার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ। আর নিশ্চয়ই সে নিজেই তার ঐ অবস্থা ও অভ্যাসের উপর সাক্ষী।’ (১০০: ৬-৭) তার পরে বলেনঃ

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ \*

অর্থাৎ ‘নিশ্চয়ই সে মালের প্রেমে পাগল।’ (১০০: ৮) এখানেও বলা হয়েছে যে, সে আল্লাহর অনুগ্রহ গোপন করছে। এরপর তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। ‘কুফর’ শব্দের অর্থ হচ্ছে গোপন করা এবং ঢেকে দেয়া। ক্ষণও আল্লাহ তা‘আলার নিয়ামতকে গোপন করে, ওর উপরে পর্দা নিষ্কেপ করে, অর্থাৎ ঐ নিয়ামতসমূহ অস্বীকার করে। সুতরাং সে নিয়ামতসমূহের অস্বীকারকারী হয়ে গেল।

হাদীস শরীফে রয়েছেঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন বান্দার উপর স্বীয় নি‘আমত দান করেন তখন চান যে, ওর চিহ্ন যেন তার উপরে প্রকাশ পায়।’ নবী (সঃ)-এর প্রার্থনায় রয়েছে—

وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا

অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি আপনার নি‘আমতের প্রতি কৃতজ্ঞ বানিয়ে দিন এবং তার কারণে আমাদেরকে আপনার প্রশংসাকারী করুন, ওগুলো গ্রহণকারী বানিয়ে দিন ও ঐগুলো আমাদের উপর পূর্ণতাবে দান করুন।’

পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষীর উক্তি এই যে, এ আয়াতটি ইয়াহুন্দীদের ঐ কার্পণ্যের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যে কার্পণ্য তারা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর গুণাবলী গোপন করার ব্যাপারে করতো। এ জন্যেই এর শেষে রয়েছে—‘আমি কাফিরদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।’

এ আয়াতটি যে ইয়াহুন্দীদের কার্পণ্যের ব্যাপারেও হতে পারে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্পষ্টতঃ এখানে মালের ক্ষণতার কথাই বর্ণনা করা হচ্ছে, যদিও ইলমের ক্ষণতা এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। এটা ভুললে চলবে না যে, এ আয়াতে আজীব্য-স্বজন ও দুর্বলদেরকে মাল প্রদানের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে পরবর্তী আয়াতে লোকদেরকে দেখাবার জন্যে মাল প্রদানকারীদের নিন্দে করা হয়েছে। এখানে বর্ণনা দেয়া হয়েছে ঐ ক্ষণদের যারা

টাকা পয়সাকে দাঁত দিয়ে ধরে রাখে। তার পরে বর্ণনা দেয়া হয়েছে ঐ লোকদের যারা মাল খরচ তো করে বটে, কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্যে ও দুনিয়ায় নাম নেয়ার জন্যে।

যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে: ‘যে তিনি প্রকারের লোকের জন্যে জাহান্নাম প্রজ্ঞালিত করা হবে, তারা এ রিয়াকারগণই হবে। রিয়াকার আলেম, রিয়াকার গাযী এবং রিয়াকার দাতা। এ দাতা বলবে, ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রত্যেক রাস্তায় স্বীয় মাল খরচ করেছিলাম।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, ‘তুমি মিথ্যা বলছো। তোমার ইচ্ছা তো শুধু এই ছিল যে, তুমি বড় দাতাঙুপে প্রসিদ্ধি লাভ কর। সুতরাং তা বলা হয়ে গেছে।’ অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ। তা আমি তোমাকে দুনিয়াতেই দিয়ে দিয়েছি। কাজেই তুমি তোমার উদ্দেশ্য লাভ করেছ।

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আদী ইবনে হাতিম (রাঃ)-কে বলেনঃ ‘তোমার পিতা স্বীয় দান দ্বারা যা চেয়েছিল তা সে পেয়ে গেছে।’ আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞাসিত হন, ‘আবদুল্লাহ ইবনে জাদ আনতো একজন বড় দাতা ছিল। সে দরিদ্র ও অভিবীদের সাথে বড়ই উত্তম ব্যবহার করতো এবং আল্লাহর নামে বহু গোলাম আযাদ করেছিল, সে কি এর কোন লাভ পাবে না?’ তিনি বলেনঃ না, সে তো সারা জীবনে একদিনও বলেনি—‘হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমার পাপ মার্জনা করুন।’

এজন্যেই এখানেও আল্লাহ তা‘আল্লাহ বলেন—আল্লাহ ও কিয়ামতের উপর তাদের বিশ্বাস নেই, নতুবা তারা শয়তানের ফাঁদে পড়তো না এবং খারাপকে ভালো মনে করতো না। তারা শয়তানের সঙ্গী। সঙ্গীর দুষ্কার্যের উপর তাদের দুষ্কার্য চিন্তা করে নাও। একজন আরব কবি বলেনঃ

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلُ وَسْلُ عَنْ قَرِينِهِ \* فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي

অর্থাৎ ‘মানুষের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করো না, বরং জিজ্ঞেস কর তার সাথী সম্বন্ধে, প্রত্যেক সাথী তার সাথীরই অনুসারী হয়ে থাকে।’

এরপর ইরশাদ হচ্ছে— ‘তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নে, সঠিক পথে চলতে, রিয়াকারী পরিত্যাগ করতে এবং ইখলাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে কিসে বাধা দিছে? তাতে তাদের ক্ষতি কি আছে? বরং সরাসরি উপকারই রয়েছে। কারণ এর ফলে তাদের পরিণাম ভাল হবে। তারা আল্লাহর

পথে খরচ করতে সংকীর্ণ মনোভাব প্রকাশ করছে কেন? তারা আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করছে না কেন? আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে খুব ভাল করেই জানেন। তাদের ভাল ও মন্দ নিয়তের জ্ঞান তাঁর পুরোপুরিই রয়েছে। ভাল কার্যের তাওফীক লাভ করার যোগ্য ও অযোগ্য সবই তাঁর নিকট প্রকাশমান। ভাল লোকদেরকে তিনি ভাল কাজ করার তাওফীক প্রদান করতঃ স্বীয় সন্তুষ্টির কাজ তাদের দ্বারা করিয়ে নিয়ে তাদেরকে তাঁর নৈকট্য দান করে থাকেন। পক্ষান্তরে মন্দ লোকদেরকে তিনি স্বীয় মহা মর্যাদাসম্পন্ন দরবার হতে দূরে সরিয়ে দেন। যার ফলে তাদের দুনিয়া ও আখিরাত ধূস হয়ে থাকে।' আল্লাহ পাক আমাদেরকে ওটা হতে আশ্রয় দান করুন!

৪০। নিচয়ই আল্লাহ বিন্দুমাত্র  
অত্যাচার করেন না এবং যদি  
কোন সৎকার্য থাকে তবে তিনি  
ওটা দিগ্নিত করেন এবং  
আল্লাহ তাঁর নিকট হতে মহান  
প্রতিদান প্রদান করেন।

৪১। অনন্তর তখন কি দশা  
হবে-যখন আমি প্রত্যক্ষ ধর্ম  
সম্প্রদায় হতে সাক্ষী আনয়ন  
করবো এবং তোমাকেই তাদের  
প্রতি সাক্ষী করবো?

৪২। যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও  
রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে,  
তারা সেদিন কামনা করবে-  
যেন ভূমণ্ডল তাদের সাথে  
সমতল হয় এবং আল্লাহর  
নিকট তারা কোন কথাই  
গোপন করতে পারবে না।

٤- إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَعِّفُهَا

وَيُؤْتَ مِنْ لَدْنِهِ أَجْرًا عَظِيمًا

٤١- فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ

أَمْيَّبِ شَهِيدٍ وَجَئْنَا بِكَ عَلَىٰ

هُولَاءِ شَهِيداً

٤٢- يَوْمَئِذٍ يُوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا

وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْتَسْوَيْ بِهِمْ

الْأَرْضَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ

حِدِيثًا

(৪)

আল্লাহ তা'আলা বলেন-'তিনি কারও উপর অত্যচার করেন না, কারও পুণ্য নষ্ট করেন না, আরও বৃদ্ধি করে তার পুণ্য ও প্রতিদান কিয়ামতের দিন দান করবেন।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে-

### وَنَصَّعُ الْمُوازِينَ الْقِسْطَ

অর্থাৎ 'আমি ন্যায় বিচারের দাঁড়িপাল্লা রাখবো।' (২১: ৪৭) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন যে, হ্যরত লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে বলেন-

يَبْنِي إِنَّمَا إِنَّمَا رَانِ تَكْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ  
أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ حَبِيرٌ

অর্থাৎ 'বাছা! যদি কোন জিনিস সরিষার দানার সমানও হয় এবং তা কোন পাথরে বা আকাশসমূহ অথবা পৃথিবীর মধ্যে থাকে, আল্লাহ তা আনয়ন করবেন, নিশ্চয়ই তিনি সুস্মদশী ও অভিজ্ঞ।' (৩১: ১৬) আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يُوْمَئِذٍ يَصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوُا أَعْمَالَهُمْ \* فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ  
خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ \*

অর্থাৎ 'সে দিন মানুষ বিভিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে যেন তাদেরকে তাদের কার্যাবলী দেখানো হয়, অতএব সে অণুপরিমাণও যা সৎকাজ করেছে তা দেখতে পাবে এবং অণুপরিমাণও যা মন্দ কাজ করেছে তাও দেখতে পাবে।' (৯৯:৬-৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শাফ'আতযুক্ত সুন্দীর্ঘ হাদীসে রয়েছেঃ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ফিরে এসো এবং যার অন্তরে সরিষার দানার সমানও ঈমান দেখ তাকে জাহানাম হতে বের করে আন। সূত্রাঃ বহু মাখলুক জাহানাম হতে মুক্তি পাবে। হ্যরত আবু সাইদ (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলতেন, 'তোমরা ইচ্ছা করলে কুরআন কারীমের- এ- ইনَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ- আয়াতটি পাঠ করে নাও।'

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কোন দাস বা দাসীকে আনয়ন করা হবে এবং একজন আহ্বানকারী হাশরের ময়দানের সমস্ত লোককে শুনিয়ে উচ্চেষ্ট্বের বলবেন, এ হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুক। যে কারও প্রাপ্য তার জিম্মায় রয়েছে সে যেন এসে নিয়ে যায়। সেদিন অবস্থা এই হবে যে, স্ত্রীলোক

চাইবে তার কোন প্রাপ্য পিতার উপর, মাতার উপর, ভাতার উপর বা স্বামীর উপর থাকলে সে দৌড়িয়ে এসে নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি **فَلَا إِنْسَابٌ يُوْمِئْذَ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ** (২৩: ১০১)-এ আয়াতটি পাঠ করেন। অর্থাৎ সেদিন বংশ ও আত্মায়তার সম্পর্ক থাকবে না এবং তারা পরম্পর জিজ্ঞাসাবাদও করবে না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হক ইচ্ছেমত ক্ষমা করবেন। কিন্তু মানুষের প্রাপ্য ক্ষমা করবেন না। যখন দাবীদারগণ এসে যাবে তখন তাকে বলা হবে, তাদের প্রাপ্য আদায় কর। সে তখন বলবে, দুনিয়াতো শেষ হয়ে গেছে, আজ আমার হাতে কি রয়েছে যে, তা আমি দেবো? অতএব তার সৎ কার্যাবলী নেয়া হবে এবং দাবীদারদেরকে দেয়া হবে।

এভাবেই প্রত্যেকের প্রাপ্য আদায় করা হবে। এখন লোকটি যদি আল্লাহভক্ত হয় তবে তার কাছে এক সরিষার দানা পরিমাণ পুণ্য অবশিষ্ট থাকলেও আল্লাহ তা'আলা ওকে বৃদ্ধি করতঃ শুধুমাত্র ওরই উপর ভিত্তি করে তাকে জানাতে নিয়ে যাবেন। অতঃপর তিনি-

**إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ - وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ بِضَاعِفَهَا**

-এ আয়াতটি পাঠ করেন। আর যদি লোকটি আল্লাহভক্ত না হয়, বরং পাপী ও দুরাচার হয় তবে তার অবস্থা এই হবে যে, ফেরেশ্তাগণ বলবেন-‘হে আল্লাহ! তার পুণ্যগুলো শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখনও দাবীদারগণ বাকী রয়েছে।’

তখন নির্দেশ দেয়া হবে-‘দাবীদারদের পাপগুলো তার উপর চাপিয়ে দাও। অতঃপর তাকে জাহানামে প্রবিষ্ট কর।’ এ মাওকুফ হাদীসটির কিছু কিছু ‘শাওয়াহিদ’ মারফু’ হাদীসেও বিদ্যমান রয়েছে।

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হ্যরত উমার (রাঃ)-এর উক্তি রয়েছে **مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عِشْرُ امْثَالِهَا**—এ আয়াতটি মরুচারী আরবদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এর উপর তাঁকে প্রশ্ন করা হয়ঃ ‘তাহলে মুহাজিরদের ব্যাপারে কোন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়?’ তিনি উত্তরে বলেনঃ ‘এর চেয়ে উত্তম **إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ**—এ আয়াতটি।

হ্যরত সান্দ ইবনে মুবাইর (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার সৎ কারণে মুশরিকেরও শাস্তি কম করা হবে। হ্যাঁ, তবে জাহানাম হতে তো বের হবেই না। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, হ্যরত আব্বাস (রাঃ) রাসূলল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল

(সঃ)! আপনার চাচা আবু তালিব আপনার আশ্রয়দাতা ছিলেন। তিনি আপনাকে লোকদের কষ্ট দেয়া হতে রক্ষা করতেন এবং আপনার পক্ষ হতে তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন, তাহলে তার কোন লাভ হবে কি?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘হ্যাঁ, তিনি খুব অল্প আগুনের মধ্যে রয়েছেন। যদি আমার এ সম্পর্ক না থাকতো তবে তিনি জাহানামের একেবারে নিম্ন তলায় থাকতেন।’

কিন্তু খুব সম্ভব এ উপকার শুধুমাত্র আবু তালিবের জন্যেই নির্দিষ্ট। অন্যান্য কাফির এ হৃকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, মুসনাদ-ই-তায়ালেসীর হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ মুমিনের কোন পুণ্যের উপর অত্যাচার করেন না। দুনিয়ায় খাওয়া-পরা ইত্যাদির আকারে ওর প্রতিদান পেয়ে থাকে এবং আবিরাতে সওয়াবের আকারে ওর প্রতিদান পাবে। হ্যাঁ, তবে কাফির তো তার পুণ্য দুনিয়াতেই খেয়ে নেয়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তার নিকটে কোন পুণ্যই থাকবে না।

এ আয়াতে “**أَجْرٌ عَظِيمٌ**”-এর ভাবার্থ হচ্ছে জান্নাত। “আমরা আল্লাহ পাকের নিকট জান্নাত যাঞ্চ্ছা করছি। মুসনাদ-ই-আহমাদের একটি গারীব হাদীসে রয়েছে, হ্যরত আবু উসমান (রঃ) বলেন, আমি সংবাদ পাই যে, আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মুমিন বান্দাকে একটি পুণ্যের বিনিময়ে এক লক্ষ পুণ্য দান করে থাকেন।’ আমার বড়ই বিস্ময় বোধ হয় এবং আমি বলি- আমি তো তোমাদের সবার চাহিতে অধিক হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর খিদমতে থেকেছি। আমি তো কখনও তাঁর নিকট এ হাদীসটি শুনিনি। তখন আমি দৃঢ় সংকল্প করে ফেলি যে, আমি নিজেই গিয়ে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতঃ এটা জিজ্ঞেস করে আসবো।

অতএব আমি সফরের আসবাবপত্র ঠিক করে নিয়ে এ বর্ণনাটির সত্যতা নিরূপণের জন্যে যাত্রা শুরু করি। আমি জানতে পারি যে, তিনি হজ্জে গিয়েছেন। আমি ও হজ্জের নিয়ত করে তথায় পৌছি। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, হে আবু হুরাইরা (রাঃ)! আমি শুনেছি যে, আপনি এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটা কি সত্য? তিনি তখন বলেন, ‘তুমি কি এতে বিস্ময় বোধ করছো? তুমি কি কুরআন কারীম পাঠ করনি যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে উত্তম ঝণ দেয়, আল্লাহ তাকে তা বহুগণে বৃদ্ধি করে দিয়ে থাকেন।’

অন্য আয়াতে রয়েছে, “وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ” (১৮: ৩৮) “পরকালের তুলনায় ইহকালের জগতের আসবাবপত্র খুবই অল্প।” (১৮: ৩৮) আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছিঃ ‘একটি পুণ্যকে বৃদ্ধি করে ওর বিনিময়ে দু’ লক্ষ পুণ্য প্রদান করবেন।’ এ হাদীসটি অন্যান্য পন্থায়ও বর্ণিত আছে।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সেদিন নবীগণকে সাক্ষী রূপে পেশ করা হবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে-

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رِبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَبُ وَجَعَلَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشَّهِدَاءَ

অর্থাৎ “পৃথিবী স্বীয় প্রভুর আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, আমলনামা দেয়া হবে এবং নবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে আনয়ন করা হবে।” (৩৯: ৬৯) অন্য এক জায়গায় ঘোষণা করা হয়েছে-

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ

অর্থাৎ ‘সেই দিন প্রত্যেক উম্মতের উপর আমি তাদেরই মধ্য হতে সাক্ষী প্রেরণ করবো।’ (১৬: ৮৯)

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে বলেন, ‘আমাকে কিছু কুরআন কারীম পাঠ করে শুনাও।’ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তখন বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আপনাকে কুরআন কারীম পাঠ করে কি শুনাবো? কুরআন কারীম তো আপনার উপরই অবতীর্ণ হয়েছে।” তিনি বলেনঃ ‘হ্যাঁ, কিন্তু আমি অন্যের নিকট হতে শুনতে চাই।’ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, ‘আমি তখন সূরা নিসা পাঠ করতে আরম্ভ করি। পড়তে পড়তে যখন আমি

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٌ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا (৪: ৪১)

-এ আয়াতটি পাঠ করি তখন তিনি বলেনঃ ‘যথেষ্ট হয়েছে।’ আমি দেখি যে, তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত ছিল।’

হ্যরত মুহাম্মাদ ইবনে ফুয়ালা আনসারী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বানী যুফ্র গোত্রের নিকট আগমন করেন এবং সে পাথরের উপর বসে পড়েন যা এখন পর্যন্ত সে মহল্লায় বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর সাথে হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হ্যরত মুয়ায় ইবনে জাবাল (রঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীও ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) একজন কারীকে বলেনঃ “কুরআন কারীম পাঠ কর।” তিনি পড়তে পড়তে যখন উক্ত আয়াত পর্যন্ত পৌছেন তখন তিনি এত ক্রন্দন করেন যে, তাঁর গওদেশ এবং শুশ্রূ সিঙ্গ হয়ে যায় এবং তিনি আরয করেনঃ “হে আমার প্রভু! আমি যাদের সামনে রয়েছি তাদের উপর আমার সাক্ষ্য দান সম্ভব, কিন্তু যাদেরকে আমি দেখিনি তাদের ব্যাপারে কিরূপে এটা সম্ভব?” (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমি তাদের উপর সাক্ষী আছি যতদিন পর্যন্ত আমি তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছি। অতঃপর যখন আপনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন তখন আপনিই তাদের উপর রক্ষক।” হ্যরত আবু আবদুল্লাহ কুরতুবী স্বীয় পুস্তক ‘তাজকেরা’য় একটি পরিচ্ছেদ করেছেনঃ ‘নবী (সঃ)-এর স্বীয় উম্মতের উপর সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে যা এসেছে।’ তাতে তিনি হ্যরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াবের এ উক্তি এনেছেন যে, সকাল সন্ধ্যায় নবী (সঃ)-এর উপর তাঁর উম্মতের কার্যাবলী তাদের নামসহ পেশ করা হয়। সুতরাং তিনি কিয়ামতের দিন তাদের উপর সাক্ষ্য দান করবেন। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন।

কিন্তু প্রথমতঃ এটা হ্যরত সাঈদ (রঃ)-এর নিজের উক্তি। দ্বিতীয়তঃ এর সনদে ইনকিতা<sup>১</sup> রয়েছে। এতে একজন বর্ণনাকারী সন্দেহযুক্ত যার নামই নেই। তৃতীয়তঃ এ হাদীসটি মারফু’রূপে বর্ণনাই করেন না। হ্যাঁ, তবে ইমাম কুরতুবী (রঃ) এটাকে গ্রহণ করে থাকেন। হাদীসটি আনার পর তিনি বলেন, পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক সোমবার ও বৃষ্টিবার আল্লাহ তা’আলার সামনে কার্যাবলী পেশ করা হয় এবং নবীদের উপর ও পিতা-মাতার উপর প্রতি শুক্রবার হাযির করা হয়, আর এতে কোন তা’আরুব্য বা পরম্পর বিরোধ নেই। কাজেই সম্ভবতঃ আমাদের নবী (সঃ)-এর কাছে প্রত্যেকদিন এবং অন্যান্য নবীদের কাছে প্রতি শুক্রবার উম্মতের কার্যাবলী পেশ করা হয়।

আল্লাহ তা’আলা বলেন-সেদিন কাফিরেরা এবং রাসূল (সঃ)-এর অবাধ্যাচরণকারীরা আকাঞ্চ্ছা করবে যে, যদি যমীন ফেটে যেতো এবং তারা ওর ভেতরে প্রবেশ করতে পারতো এবং পরে মাটি সমতল হয়ে যেতো তবে কতইনা ভাল হতো! কেননা, তারা সেই দিন অসহ্য সন্ত্রাস, অপমান এবং শাসন-গর্জনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে-

১. বর্ণনাকারীদের যোগসূত্র ছিল হওয়াকে ‘ইনকিতা’ বলে।

يُوْمٌ يَنْظُرُ الْمَرءُ مَا قَدِمَتْ يَدُهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ إِلَيْتُنِي كُنْتُ تَرَابًا۔

অর্থাৎ ‘যেদিন মানুষ সম্মুখে প্রেরিত কার্যাবলী স্বচক্ষে দেখে নেবে এবং কাফির বলবে- যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম।’ (৭৮: ৮০)

অতঃপর বলা হচ্ছে-‘তারা সেদিন এ সমস্ত কাজের কথা স্বীকার করে নেবে যা তারা দুনিয়ায় করেছিল এবং একটি কথাও তারা গোপন করতে পারবে না।’ তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে, হ্যরত সাইদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজেস করেন, ‘কুরআন কারীমের এক জায়গায় তো রয়েছে-

وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كَانَ مُشْرِكِينَ۔

অর্থাৎ ‘আমাদের প্রভু আল্লাহর শপথ! আমার মুশরিক ছিলাম না।’ (৬:২৩) অন্য স্থানে রয়েছে- অর্থাৎ ‘তারা আল্লাহর নিকট কোন কথাই গোপন করবে না।’ এ দু’টি আয়াতের ভাবার্থ কি?

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মুশরিকরা যখন দেখবে যে, মুসলমান ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না তখন তারা পুরস্পর বলাবলি করবে- এস আমরা অস্বীকার করে বসি। তখন তারা বলবে- **وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كَانَ مُشْرِكِينَ** অতঃপর আল্লাহ তা’আলা তাদের মুখমণ্ডলের উপর মোহর লাগিয়ে দেবেন এবং তাদের হাতগুলো ও পাণ্ডুলো কথা বলতে থাকবে। তাই আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ **وَلَا يَكُتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا**

মুসলাদ-ই-আবদুর রায়ঘাকে রয়েছে যে, ঐ লোকটি এসে বলেন, ‘কুরআন পাকের মধ্যে বহু জিনিস আমার নিকট বৈসাদৃশ্য ঠেকছে।’ তখন হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ ‘তোমার উদ্দেশ্য কি? কুরআন কারীমের ব্যাপারে তোমার কি সন্দেহ রয়েছে?’ লোকটি বলেন, ‘সন্দেহ তো নেই। কিন্তু আমার জ্ঞানে কুরআন পাকের মধ্যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।’ হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘যেখানে যেখানে তুমি বৈসাদৃশ্য মনে করছো এগুলো উল্লেখ কর তো।’ তখন লোকটি উপরোক্ত আয়াতদ্বয় পেশ করে বলেন, একটি দ্বারা গোপন করা প্রমাণিত হচ্ছে এবং অপরটি দ্বারা গোপন না করা প্রমাণিত হচ্ছে। তখন হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ উত্তর প্রদান করতঃ দু’টি আয়াতের আনুকূল্য বুঝিয়ে দেন।

অন্য একটি বর্ণনায় প্রশ়িকারীর নামও এসেছে যে, তিনি ছিলেন হ্যরত নাফে' ইবনে আয়্রাক (রাঃ)। ঐ বর্ণনায় এও এসেছে যে, হ্যরত ইবনে আবুআস (রাঃ) লোকটিকে বলেন, 'আমার ধারণা এই যে, তুমি তোমার সঙ্গীদের নিকট হতে আসছো। সেখানেও হয় তো এ আলোচনা চলছিল। তুমি হয়তো বলেছো—'আমি হ্যরত ইবনে আবুআস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করে আসছি' আমার ধারণা যদি সত্য হয় তবে যখন তুমি তাদের নিকট ফিরে যাবে তখন তাদেরকে সংবাদ দেবে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সমস্ত লোককে একই স্থানে একত্রিত করবেন। সে সময় মুশরিকরা বলবে, আল্লাহ তা'আলা একমাত্র একত্রবাদীদের ছাড়া কারও নিকট হতে কিছুই গ্রহণ করবেন না, কাজেই এসো আমরা অস্বীকার করি।

অতঃপর আল্লাহ পাক তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তখন তারা বলবে—  
وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ رَبَّنَا مَا كَنَّا مُشْرِكِينَ  
অর্থাৎ 'আল্লাহর শপথ। আমরা মুশরিক ছিলাম না।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দেবেন এবং তাদের হাত-পা কথা বলবে ও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তারা মুশরিক ছিল। সে সময় তারা কামনা করবে যে, যেন ভূমঙ্গল তাদের সাথে সমতল হয় এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কথাই তারা গোপন করতে পারবে না। এটা ইবনে জারীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

### ৪৩। হে মুমিনগণ! মন্তব্যস্থায়

যে পর্যন্ত না স্বীয় বাক্য  
হৃদয়ঙ্গম করতে পার এবং  
পথাতিক্রম ব্যতীত অবগাহন  
না করা পর্যন্ত অপবিদ্রাবস্থায়  
নামায়ের নিকটবর্তী হয়ে না;  
এবং যদি তোমরা পীড়িত হও  
কিংবা প্রবাসে অবস্থান কর  
অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ  
পায়খানা হতে প্রত্যাগত হয়  
কিংবা রমণী স্পর্শ করে এবং

— ৪৩ —  
يَا يَاهُ سَالَّمٌ إِنَّ الَّذِينَ امْنَوْا لَهُ  
تَقْرِيبًا الصَّلَاةَ وَإِنَّمَا سَكَرَى  
هُنَّ مَا تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا  
جُنْبًا إِلَّا عَابِرُ سَبِيلٍ حَتَّى  
تَغْتِسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضِيَ أَوْ  
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ  
مِنَ الْفَاعِطِ أَوْ لِمَسْتَمْ  
النِّسَاءُ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

পানি না পাওয়া যায়, তবে  
বিশুদ্ধ মাটির অব্রেষণ কর,  
তদ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও  
হস্তসমূহ মুছে ফেল; নিচয়ই  
আল্লাহ মার্জনাকারী,  
ক্ষমাশীল।

فَتِيمْمُوا صَعِيدًا طِبَّا  
فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا ۝

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ঈমানদার বান্দাদেরকে নেশার অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করছেন। কেননা, সে সময় নামাযী নিজেই বুঝতে পারে না যে, সে কি বলছে? সঙ্গে সঙ্গে নামাযের স্থানে অর্থাৎ মসজিদে আসতে তাকেও নিষেধ করছেন এবং অবগাহনের পূর্বে অপবিত্র লোককেও নিষেধ করছেন। হ্যাঁ, তবে এরূপ ব্যক্তি কোন কার্য বশতঃ যদি মসজিদের একটি দরজা দিয়ে গিয়ে অন্য দরজা দিয়ে ফিরে আসে এবং তথায় অবস্থান না করে তবে এ যাতায়াত বৈধ।

নেশার অবস্থায় নামাযের নিকটে না যাওয়ার নির্দেশ মদ্য হারাম হওয়ার পূর্বে ছিল। যেমনঃ সূরা-ই-বাকারার *يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْخُمُرِ وَالْمُبَيْسِرِ* (২৪: ২১৯)-এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হাদীসে প্রকাশিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন এ আয়াতটি হ্যরত উমার (রাঃ)-এর সামনে পাঠ করেন তখন হ্যরত উমার (রাঃ) প্রার্থনা করেন-‘হে আল্লাহ! মদ্য সম্বন্ধে আরও পরিষ্কারভাবে আয়াত অবতীর্ণ করুন।’ তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ নেশার অবস্থায় নামাযের নিটকবর্তী না হওয়ার আয়াতটি নাযিল হয়। এরপরে লোকেরা নামাযের সময় মদ্যপান পরিত্যাগ করে। এটা শুনে হ্যরত উমার (রাঃ) পুনরায় এ প্রার্থনাই করেন। তখন *يَا يَاهَا الَّذِينَ امْنَوْا إِنَّمَا الْخُمُرُ وَالْمُبَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ* ফেল অন্ত মন্তহোন *وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعْلَكُمْ تَفْلِحُونَ* (৫: ৯০-৯১) পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। যার মধ্যে মদ্য হতে দূরে থাকার পরিষ্কার নির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে। এটা শুনে হ্যরত উমার (রাঃ) বলেন, ‘আমরা বিরত থাকলাম।’ এ বর্ণনার একটি সনদে রয়েছে যে, যখন সূরা-ই-নিসার এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং নেশার অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয় তখন প্রথা ছিল, যখন নামায আরম্ভ করা হতো তখন একটি লোক উচ্চেষ্ট্বে ঘোষণা করতো-‘মাতাল ব্যক্তি যেন নামাযের নিটকবর্তী না হয়।’

সুনান-ই-ইবনে মাজায় রয়েছে, হ্যরত সাদ (রাঃ) বলেন, ‘আমার ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। একজন আনসারী খাদ্য রান্না করতঃ বহু লোককে দাওয়াত দেন। আমরা ভোজনে পরিত্থু হই। অতঃপর আমরা মদ্যপান করে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি। এরপরে আমরা পরম্পরের গৌরব প্রকাশ করতে থাকি। একটি লোক উটের চোয়ালের অস্থি উঠিয়ে হ্যরত সাদ (রাঃ)-কে মেরে দেয়, যার ফলে তাঁর নাক আহত হয় এবং ওর চিহ্ন থেকে যায়।’ সে সময় পর্যন্ত মদ্য হারাম হয়নি। অতঃপর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।’ এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমেও পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) জনগণকে জিয়াফত করেন। জনগণ আহারের পর মদ্যপান করেন এবং জ্ঞানশূন্য হয়ে যান। এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত এসে যায়। একজনকে ইমাম করা হয়। তিনি পাঠ করেনঃ

قُلْ يَا يَهَا الْكُفَّارُونَ \* مَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \* وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \*

সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং মন্তব্যস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়। এ হাদীসটি জামেউত্ তিরমিয়ীর মধ্যেও রয়েছে এবং এটা হাসান।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, হ্যরত আলী (রাঃ), হ্যরত আবদুর রহমান (রাঃ) এবং তৃতীয় একজন সাহাবী মদ্যপান করেন। হ্যরত আবদুর রহমান (রাঃ)-কে ইমাম বানান হয়। কুরআন কারীমের সূরা তিনি বিশ্বখ্লভাবে পাঠ করেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুনান-ই-আবি দাউদ এবং সুনান-ই-নাসাইর মধ্যেও এ বর্ণনাটি রয়েছে।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরেও আর একটি বর্ণনা রয়েছে যে, হ্যরত আলী (রাঃ) ইমাম হন এবং যেভাবে পড়তে চেয়েছিলেন সেভাবে পড়তে পারেননি। তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) ইমাম হয়েছিলেন এবং তিনি নিম্নরূপ পাঠ করেছিলেনঃ

قُلْ يَا يَهَا الْكُفَّارُونَ \* أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \* وَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* وَإِنَّ  
عَابِدَ مَا أَعْبُدَتُمْ \* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ \*

তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং ঐ অবস্থায় নামায পড়া হারাম ঘোষণা করা হয়।

হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, ‘মদ্যের অবৈধতার পূর্বে মানুষ মাতাল অবস্থায় নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে একুপ করতে নিষেধ করে দেয়া হয়।’ (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) হ্যরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর লোক এ কাজ হতে বিরত থাকে।

অতঃপর সম্পূর্ণরূপে মদ্যের অবৈধতা ঘোষিত হয়। হ্যরত যহুক (রঃ) বলেন যে, এখানে ভাবার্থ মদ্যের মন্ততা নয় বরং ভাবার্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এখানে মদ্যের মন্ততা ভাবার্থ হওয়াই সঠিক কথা এবং এখানে নেশায় উন্নত লোকদেরই সঙ্গেধন করা হয়েছে। কিন্তু এটটা নয় যে, শরীয়তের আহকাম তাদের উপর জারী হতেই পারে না। কেননা, নেশায় একুপ মন্ততাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে পাগলেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ‘উসূল’ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মনীষীদের উক্তি এই যে, সঙ্গেধন দ্বারা ঐ লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় যারা কথা বুঝতে পারে। এমন উন্নত ব্যক্তিদেরকে সঙ্গেধন করা যেতে পারে না যারা কিছুই বুঝে না যে, তাদেরকে কি বলা হচ্ছে। কেননা, সঙ্গেধন অনুধাবন করার শর্ত হচ্ছে তাকলীফের।

এও বলা হয়েছে যে, যদিও শব্দ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে—‘তোমরা মাতাল অবস্থায় নামায পড়ো না, কিন্তু ভাবার্থ হচ্ছে—তোমরা নেশার জিনিস পানাহারও করো না।’ কেননা, এটা কিরূপে সম্ভব যে, একজন মদ্যপায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিক সময়ে আদায় করতে পারে অথচ সে বরাবর মদ্য পান করতেই থাকে? এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার রয়েছে। তাহলে এ নির্দেশও ঠিক ঐ নির্দেশরই মত যেখানে বলা হয়েছে—‘হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যতটা ভয়ের তাঁর হক রয়েছে এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মরো না।’ এখানে ভাবার্থ এই যে, তোমারা সদা-সর্বদা একুপ প্রস্তুতি গ্রহণ কর এবং এমন সৎ কার্যাবলী সব সময় সম্পাদন করতে থাক যে, যখন তোমরা মরণ বরণ করবে তখন যেন তোমাদের মৃত্যু ইসলামের উপরেই হয়।

দ্রুপ এ আয়াতে যে নির্দেশ হচ্ছে— যে পর্যন্ত না তোমরা বুঝতে পার যে, তোমরা কি বলছ, এটা হচ্ছে নেশার সীমাবেধ। অর্থাৎ নেশার অবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে বুঝতে হবে যে নিজের কথাই বুঝতে পারে না। নেশায় উন্নত ব্যক্তি কুরআন কারীম বিশৃংখলভাবে পাঠ করে থাকে। তার বুঝবার এবং চিন্তা গবেষণা করবার সুযোগ হয় না। সে নামাযে বিনয়ও প্রকাশ করতে পারে না।

মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘নামায পড়া অবস্থায় তোমাদের কারও তন্ত্র এলে সে যেন ফিরে আসে এবং ঘূর্মিয়ে পড়ে যে পর্যন্ত না সে বুঝতে পারে যে সে কি বলছে।’ সহীহ বুখারী ও সুনান-ই-নাসাইর মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে। হাদীসের কতক শব্দ এও রয়েছেঃ ‘সে চায় ক্ষমা প্রার্থনা করতে কিন্তু হ্যতো তার মুখ দিয়ে বিপরীত কথা বেরিয়ে যাবে।’

এবারে বলা হচ্ছে-‘অপবিত্র ব্যক্তিও যেন গোসল করার পূর্বে নামাযের নিকটবর্তী না হয়। হ্যাঁ, তবে অতিক্রম করা হিসেবে মসজিদের ভেতর দিয়ে গমন করা জায়েয়’। হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন যে, একপ অপবিত্র অবস্থায় মসজিদের ভেতরে যাওয়া জায়েয় নয়। তবে মসজিদের একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় কোন দোষ নেই। মসজিদে বসতে পারবে না। আরও বহু সাহাবী ও তাবেঙ্গির এটাই উক্তি।

হ্যরত ইয়ায়ীদ ইবনে আবু হাবীব বলেন যে, “কতগুলো আনসার যাঁরা মসজিদের চতুর্দিকে বাস করতেন তাঁরা অপবিত্র হলে বাড়ীতে হ্যতো পানি থাকতো না, আর তাঁদের ঘরের দরজা মসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকতো, তাঁদেরকে অনুমতি দেয়া হয় যে, তাঁরা ঐ অবস্থাতেই মসজিদ দিয়ে গমন করতে পারেন।

সহীহ বুখারী শরীফে তো একথা স্পষ্টভাবে রয়েছে যে, লোকদের ঘরের দরজা মসজিদেই ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় মরণ রোগের সময় বলেনঃ ‘মসজিদে যেসব লোকের দরজা রয়েছে সবগুলো বক্ষ করে দাও। শুধুমাত্র হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর দরজাটি রেখে দাও।’ এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইস্তিকালের পর তাঁর স্তলাভিক্ষ হ্যরত আবু বকরই (রাঃ) হবেন এবং তাঁর প্রায় সব সময় মসজিদে যাতায়াতের প্রয়োজন হবে যেন তিনি মুসমানদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ মীমাংসা করতে পারেন। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) সমস্ত দরজা বক্ষ করে হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর দরজা খুলে রাখতে নির্দেশ দেন। সুনানের কোন কোন হাদীসে হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর পরিবর্তে হ্যরত আলী (রাঃ)-এর নাম রয়েছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক ওটাই যা সহীহতে রয়েছে।

এ আয়াত দ্বারা অধিকাংশ ইমাম দলীল গ্রহণ করেছেন যে, অপবিত্র লোকের মসজিদে অবস্থান নিষিদ্ধ। তবে গমন করা বৈধ। হায়েয় ও নিফাস বিশিষ্ট

নারীদেরও এ হকুম। কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে, একুপ নারীদের জন্যে মসজিদ দিয়ে গমনও বৈধ নয়। কেননা, এতে মসজিদে অপবিত্রতা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার অন্য কেউ বলেন যে, যদি এ ভয় না থাকে তবে তাদের গমনও বৈধ।

সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেনঃ ‘আমাকে মসজিদ হতে মাদুরটি এনে দাও।’ তিনি তখন বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি হায়েয়ের অবস্থায় রয়েছি।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘হায়েয় তো তোমার হাতে নেই।’ এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, খ্তুবতী নারী মসজিদে যাতায়াত করতে পারে। নিফাস বিশিষ্টা নারীরও এ হকুম। এরা রাস্তায় চলা হিসেবে যাতায়াত করতে পারে।

সুনান-ই-আবু দাউদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘোষণা রয়েছেঃ ‘আমি খ্তুবতী নারী ও অপবিত্র লোকদের জন্যে মসজিদকে হালাল করি না।’ ইমাম আবু মুসলিম খান্তাবী (রঃ) বলেন, ‘এ হাদীসটিকে একটি দল দুর্বল বলেছেন। কেননা, এর একজন বর্ণনাকারী আফলাত ইবনে খালীফাতুল আমেরী অপরিচিত।’ কিন্তু সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যে এ বর্ণনাটি রয়েছে। তাতে আফলাতের স্থলে মা’দূম যিহ্লী রয়েছে। প্রথম হাদীসটি হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে এবং এ দ্বিতীয় হাদীসটি হ্যরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। কিন্তু সঠিক নাম হ্যরত আয়েশারই (রাঃ) বটে।

জামেউত্ তিরিয়মীর মধ্যে অন্য একটি হাদীস হ্যরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘হে আলী! এ মসজিদে অপবিত্র হওয়া তোমার ও আমার ছাড়া আর কারও জন্যে হালাল নয়।’ এ হাদীসটি সম্পূর্ণই দুর্বল এবং এটা কখনই সাব্যস্ত হতে পারে না। এতে সালিম নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে যে পরিত্যাজ্য এবং তার শিক্ষক আতিয়াও দুর্বল। এ বিষয়ে আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

এ আয়াতের তাফসীরে হ্যরত আলী (রাঃ) বলেন, ‘ভাবার্থ এই যে, অপবিত্র ব্যক্তি এ অবস্থায় গোসল না করে নামায পড়তে পারে না, কিন্তু যদি সফরে থাকে এবং পানি না পায় তবে পানি না পাওয়া পর্যন্ত পড়তে পারে।’ হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হ্যরত সাইদ ইবনে মুবাইর (রঃ) এবং হ্যরত যহুহাক (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ), হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) হ্যরত যায়েদ (রঃ) এবং হ্যরত আবদুর রহমান (রঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত হয়েছে।

হ্যেরত আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, ‘আমরা শুনতাম যে, এ হাদীসটি সফরের হকুমে অবর্তীণ হয়েছে।’ এ হাদীস দ্বারাও এ মাসআলার সাক্ষ্য হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন: ‘পবিত্র মাটি হচ্ছে মুসলমানকে পবিত্রকারী যদিও দশ বছর পর্যন্ত পানি পাওয়া না যায়। যখন পানি পাওয়া যাবে তখন ওটাই ব্যবহার করবে, এটাই তোমার জন্যে উত্তম।’ (সুনান ও মুসনাদ-ই-আহমাদ)

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এ দু’টি উক্তির মধ্যে উত্তম হচ্ছে ঐ লোকদের উক্তি যাঁরা বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে অতিক্রম করা হিসেবে মসজিদে গমন করা। কেননা, যে মুসাফির অপবিত্র অবস্থায় পানি পাবে না তার হকুমতো পরে পরিষ্কারভাবে রয়েছে। সুতরাং এখানেও যদি এ ভাবার্থই হয় তবে পরে আবার একে অন্য বাক্যে ফেরানোর কোন আবশ্যিকতা থাকে না।

অতএব আয়াতের অর্থ এখন এই হলো যে, হে মুমিনগণ! তোমরা মাতাল অবস্থায় মসজিদে যেওনা যে পর্যন্ত তোমরা নিজেদের কথা নিজেরাই বুঝতে না পার। অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থাতেও তোমরা মসজিদে যেওনা যে পর্যন্ত অবগাহন না কর। তবে রাস্তা অতিক্রম করা হিসেবে যাওয়া বৈধ। **عَابِرٌ** শব্দের অর্থ হচ্ছে আসা-যাওয়া অর্থাৎ অতিক্রম করা। এর **مُصْدَرٌ عَبُورًا** বা **عَبُورًا** এসে থাকে। যখন কেউ নদী অতিক্রম করে তখন আরববাসীরা বলে, **فَلَانُ النَّهَرُ**, অর্থাৎ ‘অন্য নদী অতিক্রম করেছে।’

অনুরূপভাবে যে শক্তিশালী উট সফরে পথ অতিক্রম করে তাকেও তারা বলে, **عَلَى إِسْفَارٍ** অর্থাৎ উট ভ্রমণ পথ অতিক্রম করেছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) যে উক্তিটির পৃষ্ঠপোষকতা করেন, জমতুরেরও ঐ উক্তি। আর আয়াত দ্বারা বাহ্যতঃ এটাই প্রকাশ পাচ্ছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলা সে অসম্পূর্ণ অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করছেন যা নামাযের উদ্দেশ্যের বিপরীত। অনুরূপভাবে নামাযের স্থানে এমন অবস্থায় আসতে বাধা দিচ্ছেন যা সে স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার উল্টো। এ বিষয়ে আল্লাহ তা’আলার জ্ঞান ভাল রয়েছে।

তারপর যে আল্লাহ পাক বলেন-‘যে পর্যন্ত তোমরা গোসল না কর।’ এটা দলীল হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ) এবং ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ)-এর যে, অপবিত্র ব্যক্তির মসজিদে অবস্থান নিষিদ্ধ, যে পর্যন্ত সে গোসল না করবে বা যদি পানি না পায় কিংবা পানি পায় কিন্তু তা ব্যবহারের ক্ষমতা না থাকে তবে তায়াস্মুম করে নেবে।

ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, অপবিত্র ব্যক্তি যখন নামায পড়ে নেবে তখন তার জন্যে মসজিদে অবস্থান বৈধ। যেমন মুসনাদ-ই-আহমাদ এবং সুনান-ই-সাঙ্গদ মানসূরে বর্ণিত আছে। হ্যরত আতা' ইবনে ইয়াসার (রঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণকে দেখেছি যে, তারা অপবিত্র হতেন এবং অযু করে মসজিদে বসে থাকতেন।' এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এখন কোন্ কোন্ সময় তায়াম্মুম করা জায়েয তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যে রোগের কারণে তায়াম্মুম জায়েয হয় ওটা হচ্ছে ঐ রোগ যে ঐ সময় পানি ব্যবহার করলে কোন অঙ্গ নষ্ট হওয়ার বা রোগের সময় বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। কোন কোন আলেম প্রত্যক্ষ রোগের জন্য তায়াম্মুমের অনুমতির ফতওয়া দিয়েছেন। কেননা আয়াত সাধারণ।

হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, একজন আনসারী ঝঁঝ ছিলেন। না তিনি দাঁড়িয়ে অযু করতে পারেতন, না তাঁর কোন সেবক ছিলো যে তাঁকে পানি দেয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এটা বর্ণনা করেন। সে সময় এ হৃকুম অবতীর্ণ হয়। এ বর্ণনাটি মুরসাল।

তায়াম্মুমের বৈধতার দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে সফর। সে সফর দীর্ঘই হোক বা ক্ষুদ্র হোক। **طَلْقِتُمْ وَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوْهُنَّ** এবং **وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ** উক্তি রয়েছে। একটি এই যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে সঙ্গম। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে-

**وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ  
فِرِيْضَةً فِيْصُفُّ مَا فَرَضْتُمْ**

অর্থাৎ 'যদি তোমরা সঙ্গমের পূর্বে স্ত্রীদেরকে তালাক প্রদান কর এবং তাদের মোহর নির্দিষ্ট কর তবে যা নির্দিষ্ট করেছো তারা তার অর্ধেক পাবে।' (২: ২৩৭)

অন্য আয়াতে রয়েছে- 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নারীদেরকে বিয়ে কর অতঃপর সঙ্গমের পূর্বে তালাক প্রদান কর তখন তাদের জন্যে 'ইদত' নেই।' এখানেও **وَهُنْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوْهُنَّ** রয়েছে। হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে **أَوْ لِمُسْتُمُ الْبِسَاءَ** (৫: ৬)-এর ভাবার্থ সঙ্গম। হ্যরত আলী (রাঃ), হ্যরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), হ্যরত মুজাহিদ (রঃ), হ্যরত তাউস (রঃ), হ্যরত হাসান বসরী (রঃ), হ্যরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রাঃ), হ্যরত

সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ), হ্যরত শা'বী (রঃ), হ্যরত কাতাদা (রঃ) হ্যরত মুকাতিল ইবনে হিবান (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

হ্যরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ) বলেন, ‘একবার এ শব্দের উপর আলোচনা হলে কতগুলো মাওয়ালী বলেন যে, এটা সঙ্গম নয় এবং কতগুলো আরব বলেন যে, এটা সঙ্গম। আমি হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এটা বর্ণনা করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন-‘তুমি কাদের সঙ্গে ছিলে?’ আমি বলি- ‘আমি মাওয়ালীদের সঙ্গে ছিলাম।’ তিনি বলেন, ‘মাওয়ালীগণ পরাজিত হয়েছে।’ এবং **মুবাশৰত** অর্থ হচ্ছে সঙ্গম। আল্লাহ তা’আলা এখানে কিনায়া করেছেন। অন্যান্য কয়েকজন মনীষী এর ভাবার্থ সাধারণ স্পর্শ করা নিয়েছেন।

নিজের শরীরের কোন অংশ স্ত্রীর শরীরের কোন অংশের সাথে মিলিয়ে নিলেই অযু ওয়াজিব হয়ে যায়। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, ‘সঙ্গম ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশ স্পর্শ করাকে **লম্স** বলা হয়। তিনি বলেন যে, চুম্বনও **লম্স**-এরই অন্তর্ভুক্ত এবং ওতেও অযু করা অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়বে।’ তিনি আরও বলেন, ‘সঙ্গম করায়, হাত দ্বারা স্পর্শ করায় এবং চুম্বন করায় অযু করতে হয়।’-এর ভাবার্থ স্পর্শ করা।

হ্যরত ইবনে উমারও (রাঃ) চুম্বন দেয়াতে অযু ফরয হওয়ার উক্তিকারী ছিলেন এবং ওটাকেও **লম্স**-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। হ্যরত উবাইদাহ (রাঃ), হ্যরত আবু উসমান (রাঃ), হ্যরত সাবিতা (রাঃ), হ্যরত ইবরাহীম (রাঃ) এবং হ্যরত যায়েদও (রাঃ) বলেন যে, **لمس**-এর ভাবার্থ হচ্ছে সঙ্গম ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশ স্পর্শ করা। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, ‘মানুষের স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন দেয়া এবং হাত দ্বারা স্পর্শ করা হচ্ছে **মلامس**’- এতে অযু ফরয হয়ে যাবে।’ (মুআত্তা-ই-মালিক)

দারেকুত্নীর হাদীসের মধ্যে স্বয়ং হ্যরত উমার (রাঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনা এর বিপরীতও পাওয়া যায় যে, তিনি অযুর অবস্থায় ছিলেন এবং স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন দেন, অতঃপর অযু করেননি, ঐ অবস্থাতেই নামায আদায় করেন। সুতরাং এ দু'টি বর্ণনাকে সঠিক মেনে নেয়ার পর এ ফায়সালা করতেই হবে যে, তিনি অযুকে মুস্তাহাব মনে করতেন। আল্লাহ তা’আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সাধারণ স্পর্শতেই অযু করতে হবে এ উক্তি হচ্ছে শাফিন্দ (রঃ) এবং তাঁর সহচরের। ইমাম মালিক ও প্রসিদ্ধ ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ) হতেও এ উক্তিই বর্ণিত আছে। যাঁরা এ উক্তি করেন তাঁরা বলেন যে, এখানে দু'টি কিরআত রয়েছে। একটি হচ্ছে লা-মাসতুম এবং অপরটি হচ্ছে লামাসতুম। আর কুরআন কারীমের মধ্যে হাত দ্বারা স্পর্শ করার উপরও لَمْسٌ শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে—**وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمْسُهُ** (৬৪: ৭) এটা স্পষ্টকথা যে, এখানে ভাবার্থ হচ্ছে হাত দ্বারা স্পর্শ করা। অনুরূপভাবে হ্যরত মায়েয ইবনে মালিক (রাঃ)-কে রাসূল (সঃ) বলেছিলেনঃ ‘সম্ভবতঃ তুমি চুম্বন দিয়ে বা হাত দ্বারা স্পর্শ করে থাকবে।’ সেখানেও لَمْسَتْ শব্দ রয়েছে এবং শুধু হাত লাগানোর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্য হাদীসে রয়েছে **وَالْيَدُ زَنَّا هَا اللَّمْسُ** অর্থাৎ ‘হাতের ব্যভিচার হচ্ছে হাত দ্বারা স্পর্শ করা।’ হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একুপ খুব কম দিনই অতিবাহিত হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট এসে আমাদেরকে চুম্বন দেননি বা হাত দ্বারা স্পর্শ করেননি।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে নিষেধ করেছেন। এখানেও এর অর্থ হচ্ছে হাত দ্বারা স্পর্শ করার ক্রয়-বিক্রয়। অতএব হাদীসটিকে যেমন সঙ্গমের উপর প্রয়োগ করা হয় তদুপ হাত দ্বারা স্পর্শ করার উপরও প্রয়োগ করা হয়। কবি বলেনঃ

**وَلَمْسَتْ كَفَّيْ كَفَّهُ أَطْلَبَ الْغِنَىٰ**

অর্থাৎ ‘আমার হাত তার হাতের সাথে মিলিত হয়েছে, আমি ধন চাই।’

ইবনে আবি লাইলা হ্যরত মু'আয (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ লোকটির ব্যাপারে মীমাংসা কী হতে পারে যে একটি অপরিচিত নারীর সঙ্গে শুধু ব্যভিচার ছাড়া ঐ সমস্ত কাজ করেছে যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয়ে থাকে।

তখন- (১১৪: ১১৪) এ আয়াতটি **أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزَلْفًا مِنَ الْبَلِ** অবর্তীর্ণ হয়। বর্ণনাকারী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন লোকটিকে বলেন, অযু কর ও নামায আদায কর। হ্যরত মু'আয (রাঃ) বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কি একমাত্র তার জন্যে নির্দিষ্ট, না সমস্ত মুসলমানের জন্য

সাধারণ?’ তিনি উত্তর দেনঃ ‘বরং এটা সমস্ত মুসলমানের জন্যে সাধারণ।’ ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে যায়েদার হাদীস থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, এর সনদ সংযুক্ত নয়। ইমাম নাসাঈ (রঃ) হতে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেন।

মোটকথা, এটার উক্তিকারী এ হাদীসটি সম্বন্ধে বলেন, ‘লোকটিকে অযু করার নির্দেশ দেয়ার কারণ এই যে, সে স্ত্রীলোকটিকে স্পর্শ করেছিল মাত্র সঙ্গম করেনি। এর উত্তর এই দেয়া যায় যে, প্রথমতঃ এটা মুনকাতা। ইবনে আবি লাইলা ও হ্যরত মু'আয়ের মধ্যে সাক্ষাত প্রমাণিত নয়।

দ্বিতীয়তঃ হতে পারে যে, তাকে ফরয নামায আদায়ের জন্যে অযু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমন হ্যরত আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘যে বান্দা কোন পাপ করার পর অযু করে দু’ রাকআত নামায আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপ মার্জনা করে থাকেন। এ হাদীসটি পূর্ণভাবে সূরাঃ আলে ইমরানের *ذَكْرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ* (৩: ১৩৫)-এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন, ‘এ উক্তি দুটির মধ্যে উত্তম হচ্ছে ঐ লোকদের উক্তি যাঁরা বলেন যে, *أَوْ لِمَسْتُ النِّسَاءَ*—এর ভাবার্থ হচ্ছে সঙ্গম, অন্য কিছু নয়।’ কেননা, সহীহ মারফু’ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কোন পত্নীকে চুম্বন দেন এবং অযু না করেই নামায আদায় করেন। হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযু করতেন, অতঃপর চুম্বন দিতেন এবং পরে অযু না করেই নামায আদায় করতেন।’

হ্যরত হাবীব (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কোন সহধর্মীকে চুম্বন করতেন, অতঃপর নামাযে যেতেন এবং অযু করতেন না।’ আমি বলি, সে স্ত্রী আপনিই হতেন। তখন তিনি মুচকি হেসে উঠেন। এর সনদে সমালোচনা রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সনদে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, উপরের বর্ণনাকারী অর্থাৎ হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে শ্রবণকারী হচ্ছেন হ্যরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ)।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে—‘অযুর পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে চুম্বন করতেন এবং পুনরায় অযু করতেন না।’ অন্য সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি চুম্বন করেন এবং পরে অযু না করেই নামায আদায় করেন।

হ্যরত উমে সালমা (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ) চুম্বন করতেন অথচ তিনি রোষার অবস্থায় থাকতেন এবং তাতে তাঁর রোষাও নষ্ট হতো না ও তিনি

নতুনভাবে অ্যুও করতেন না’। (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) হ্যরত যায়নাব সাহমিয়া’ (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ) চুম্বন দেয়ার পর অ্যু না করেই নামায আদায় করতেন।’

এরপর আল্লাহ পাক বলেন-‘যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্বুম কর।’ এর দ্বারা অধিকাংশ ধর্মশাস্ত্রবিদ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্বুম করার অনুমতি রয়েছে পানি অনুসন্ধানের পর। ‘কুরুবে ফুরু’র মধ্যে অনুসন্ধানের অবস্থাও বর্ণনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে হ্যরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে দেখেন যে, সে লোকদের সাথে নামায না পড়ে পৃথক হয়ে রয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘জনগণের সাথে তুমি নামায পড়লে না কেন? তুমি কি মুসলমান নও?’ লোকটি বলে, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি মুসলমান তো বটে, কিন্তু আমি অপবিত্র হয়ে গেছি এবং পানি পাইনি।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘ঐ অবস্থায় তোমার জন্যে মাটি যথেষ্ট ছিল।’ **تَبِعْمُ شَدَرَ** শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছে করা।

আরবেরা বলে - **أَرْثَىٰ إِيمَانَكَ اللَّهُ يُحْفَظِيهِ** অর্থাৎ ‘আল্লাহ তা’আলা স্বীয় হিফায়তের সঙ্গে তোমার প্রতি ইচ্ছে পোষণ করুন।’ ইমরুল কায়েসের নিম্নের কবিতায়ও **تَبِعْمُ** শব্দটি এ অর্থেই এসেছেঃ

وَلَمَّا رَأَ رَأَتْ أَنَّ الْمَنِيَّةَ وَرَدَهَا \* وَإِنَّ الْحُصْنَى مِنْ تَحْتِ أَقْدَمَهَا دَامِيًّا  
تَبِعْمَتِ الْعَيْنُ التَّيْ عِنْدَ ضَارِبٍ \* يَفْسِئُ عَلَيْهَا الْفَيْ عَرَضُهَا طَامِيًّا

শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ জিনিস যা ভৃপৃষ্ঠের উপর চড়ে গেছে। সুতরাং মাটি, বালু, গাছ প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত।

বলা হয়েছে যে, যে জিনিস মাটির শ্রেণীভুক্ত, যেমন বালু, ইট এবং চুন ইত্যাদি। এটা ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মাযহাব। আবার শুধু মাটিকেও **صَعِيدٌ** বলা হয়েছে এবং এটা হচ্ছে ইমাম শাফিঙ্গ (রঃ) ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ) এবং তাঁদের সহচরদের উক্তি। এর প্রথম দলীল তো কুরআন কারীমের এ শব্দগুলো **فَتَصْبِحَ صَعِيدًا زُلْفًا** অর্থাৎ ‘সুতরাং ওটা পিছিল মাটি হয়ে যাবে।’ (১৮: ৪০) দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে সহীহ মুসলিমের নিম্নে হাদীসটিঃ

হ্যরত হৃষাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আমাদেরকে সমস্ত মানুষের উপর তিনটি মর্যাদা দেয়া হয়েছে

(১) আমাদের সারিগুলো ফেরেশতাদের সারির মত করা হয়েছে (২) আমাদের জন্যে সমস্ত ভূমিকে মসজিদ করা হয়েছে এবং (৩) ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকাকে আমাদের জন্যে পবিত্র ও পবিত্রকারী বানানো হয়েছে যখন আমরা পানি না পাই।'

হাদীসের শব্দগুলোর মধ্যে **تَرْبَةٌ** শব্দ রয়েছে এবং অন্য সনদে **تَرْبَةٌ**-এর স্থলে **تَرْأَبٌ** শব্দ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ হাদীসে কৃপা প্রকাশের সময় মাটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যদি অন্য কোন জিনিস অযুর স্থলবর্তী হতো তবে সাথে সাথে ওরও উল্লেখ করতেন। এখানে **طَبِّ** শব্দটির অর্থের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, ওর ভাবার্থ হচ্ছে হালাল এবং কারও কারও মতে ওর ভাবার্থ হচ্ছে পবিত্র।

যেমন হাদীস শরীফ রয়েছে, হররত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘পবিত্র মাটি হচ্ছে মুসলমানদের অযু, যদিও দশ বছর পর্যন্ত পানি পাওয়া না যায়। অতঃপর যখন পানি পাওয়া যাবে তখন সে যেন তা তার শরীরে বুলিয়ে দেয়। এটাই তার জন্যে উত্তম।’ ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। হাফিয় আবুল হাসান কাত্তানও (রঃ) একে বিশুদ্ধ বলেছেন। সবচেয়ে পবিত্র মাটি হচ্ছে ক্ষেত্র ভূমির মাটি। এমন কি তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে একে মারফু’ রূপে আনা হয়েছে।

এরপর বলা হচ্ছে-‘ঐ মাটি স্বীয় মুখমণ্ডলে ও হাতে ঘর্ষণ কর।’ তায়াম্মুম হচ্ছে অযুর স্থলবর্তী। এটা শুধুমাত্র পবিত্রতা লাভের জন্যে সমস্ত শরীরে ঘর্ষণের জন্যে নয়। সুতরাং শুধু মুখে ও হাতে ঘর্ষণ করলেই যথেষ্ট হবে। এর উপর ইজমা হয়েছে। কিন্তু তায়াম্মুম করার নিয়মে মতবিরোধ রয়েছে।

নতুন শাফিঙ্গ মাযহাব এই যে, দু’বার করে মুখ এবং দু’খানা হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহু করা ওয়াজিব। কেননা, **بَلْ**-এর প্রয়োগ কাঁদের নিম্নাংশ পর্যন্ত ও হাতের কনুই পর্যন্ত এর উপর হয়ে থাকে। যেমন অযুর আয়াতে রয়েছে। আর এ শব্দেরই প্রয়োগ হয়ে থাকে এবং ভাবার্থ শুধু হস্তদ্বয়ের তালু হয়ে থাকে। যেমন চোরের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন- **فَاقْطِعُوا إِيْدِيهِمَا** (৫:৩৮) এখানে তায়াম্মুমের হৃকুমে হাতের বর্ণনা হচ্ছে সাধারণ এবং অযুর হৃকুমে হচ্ছে শর্তযুক্ত। এজন্যেই ‘মুতলাক’-কে ‘মুকাইয়াদ’-এর হৃকুমে উঠান হবে। কেননা, অযুর মধ্যে ব্যাপক পবিত্রতা বিদ্যমান রয়েছে। কেউ কেউ এর দলীলরূপে দারেকুতনী (রঃ)-এর বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘তায়াম্মুত হচ্ছে দু’বার (হাত) মারা। একবার হাত মেরে মুখের উপর ঘর্ষণ করা

এবং আর একবার হাত মেরে দু' হাতকে কনুই পর্যন্ত ঘর্ষণ করা।' কিন্তু হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা, এর ইসনাদে দুর্বলতা রয়েছে। হাদীসটি প্রমাণিত নয়।

সুনান-ই-আবু দাউদের একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় হস্ত একটি দেয়ালের উপর মারেন এবং মুখমণ্ডলে ঘর্ষণ করেন, দ্বিতীয়বার হাত মেরে স্বীয় হস্তদ্বয়ের উপর ঘর্ষণ করেন। কিন্তু এর ইসনাদে মুহাম্মাদ ইবনে সাবিত আবদী দুর্বল। কোন কোন হাফিয়-ই-হাদীস তাকে দুর্বল বলেছেন। এ হাদীসটিই কোন কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা মারফু' করেন না, বরং হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর কাজ বলে থাকেন। ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম আবু যারআ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে আ'দীর (রঃ) সিদ্ধান্ত এই যে, এ হাদীসটি মাওকুফই বটে। ইমাম বাযহাকী (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসকে মারফু' বলা মুনকার।

নিম্নের হাদীসটি ইমাম শাফিন্দে (রঃ)-এর দলীল। হ্যরত ইবনুস্ম সাম্মা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তায়াম্মুম করেন এবং স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের উপর হাত ফিরিয়ে দেন। হ্যরত আবু জাহাম (রাঃ) বলেন, 'আমি দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রস্তাব করছেন। আমি তাঁকে সালাম দেই কিন্তু তিনি উভর দিলেন না। তিনি দেয়ালের নিকট গিয়ে তাঁর উভয় হস্তদ্বয় মারেন এবং হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ঘর্ষণ করেন। অতঃপর তিনি আমার সালামের উভর দেন।' (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) এতো ছিল ইমাম শাফিন্দে (রঃ)-এর নতুন মাযহাব। তাঁর প্রাচীন মাযহাব এই যে, তায়াম্মুমে মার তো দু'টোই, কিন্তু দ্বিতীয় মারে হাতকে কজি পর্যন্ত ঘর্ষণ করতে হবে।

তৃতীয় উক্তি এই যে, শুধু একটি বার মার অর্থাৎ শুধু একবার হস্তদ্বয় মাটির উপর মেরে নেয়াই যথেষ্ট। ধূলিযুক্ত হাতকে মুখের উপর এবং হস্তদ্বয়ের কজি পর্যন্ত ফিরিয়ে নেবে।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, একটি লোক আমীরুল মুমিনীন হ্যরত উমার ফারক (রাঃ)-এর নিকট আগমন করে বলে-'আমি অপবিত্র হয়ে গেছি এবং পানি পাইনি। আমাকে কি করতে হবে?' তিনি বলেন, 'নামায পড়তে হবে না।' তাঁর দরবারে হ্যরত আম্মারও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বলেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি স্বরণ নেই যে, আমরা এক সেনাদলে

ছিলাম। আমি ও আপনি দু'জন অপবিত্র হয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের নিকট পানি ছিল না। আপনি তো নামায পড়েননি। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নামায আদায় করেছিলাম। ফিরে এসে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হায়ির হই এবং আমি তাঁর নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করি। তখন তিনি হেসে উঠেন ও বলেনঃ ‘তুমি এরূপ করলেই যথেষ্ট হতো।’ অতঃপর তিনি মাটিতে হাত মারেন এবং ফুঁ দিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ে হাত ফিরিয়ে নেন।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘তায়াম্মুমে একবারই হাত মারতে হয় যা মুখমণ্ডলের জন্যে ও হস্তদ্বয়ের তালুর জন্যে।’ মুসনাদ-ই-আহমাদেরই আর একটি হাদীসে রয়েছে, হ্যরত শাকীক (রঃ) বলেন, ‘আমি হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ও হ্যরত আবু মূসা (রাঃ)-এর সঙ্গে বসেছিলাম। হ্যরত আবু ইয়া’লা (রাঃ), হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে বলেন, ‘যদি কেউ পানি না পায় তবে সে যেন নামায না পড়ে।’ একথা শুনে হ্যরত আবদুল্লাহ বলেন, ‘হ্যরত আম্মার (রাঃ) হ্যরত উমার (রাঃ)-কে যা বলেছিলেন তা কি আপনার শ্বরণ নেই যে, আমাকে ও আপনাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) উচ্চে চড়িয়ে (কোন এক জায়গায়) পাঠিয়েছিলেন। তথায় আমি অপবিত্র হয়ে যাই এবং মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নামায পড়ে লই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে এ সংবাদ দেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে উঠে বলেনঃ ‘তুমি এরূপ করলেই যথেষ্ট হতো।’ অতঃপর তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় ভূমির উপর মারেন এবং হস্তের তালুদ্বয় এক সাথে ঘর্ষণ করেন ও মুখমণ্ডলে একবার হাত ফিরিয়ে নেন। মার একবারই ছিল।’ হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ‘এতে কিন্তু হ্যরত উমার (রাঃ) সন্তুষ্ট হননি।’ একথা শুনে হ্যরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, তাহলে সূরা-ই-নিসার এ আয়াতটিকে কি করবেন যাতে রয়েছে—‘পানি না পেলে পবিত্র মাটির ইচ্ছে কর।’ হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এর উক্তর দিতে পারেননি এবং বলেন, জেনে রাখুন যে, যদি আমরা জনগণকে তায়াম্মুমের অনুমতি দিয়ে দেই তবে খুব সম্ভব পানি যখন তাদের কাছে খুব ঠাণ্ডা অনুভূত হবে তখন তারা তায়াম্মুম করতে আরম্ভ করবে।’

সুরাঃ মায়েদায় ঘোষিত হয়েছে—

فَامْسِحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَابْدِيْكُمْ مِنْهُ

অর্থাৎ ‘ওটা তোমাদের মুখমণ্ডলে ও তোমাদের হাতে ঘর্ষণ কর।’ (৫: ৬) এটা দ্বারা হ্যরত ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ) দলীল গ্রহণ করেছেন যে, তায়াম্মুম পবিত্র

মাটি দ্বারা হওয়া ও ওটা ধূলিযুক্ত হওয়া যাতে ধূলি হাতে লেগে যায় এবং মুখ ও হাতের উপর ঘর্ষণ করা যায়, এটা জরুরী। যেমন হ্যরত আবু জাহাম (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে বর্ণনা করা রয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রস্তাব করতে দেখেন এবং সালাম করেন। তাতে এও রয়েছে যে, ঐ কার্য শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) দেয়ালের পার্শ্বে যান এবং স্বীয় লাঠি দ্বারা কিছু মাটি উঠিয়ে নিয়ে ওটা হাতে মেরে তায়াম্বুম করেন।

এরপর ঘোষিত হচ্ছে—‘আল্লাহ তোমাদের উপর তোমাদের ধর্মে সংকীর্ণতা ও কাঠিন্য আনয়ন করতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান। এ জন্যেই পানি না পাওয়ার সময় মাটি দ্বারা তায়াম্বুম করাকে তোমাদের জন্যে বৈধ করেছেন এবং তোমাদের উপর স্বীয় নি‘আমত দান করেছেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। সুতরাং এ উদ্ধত এ নি‘আমতের সঙ্গে নির্দিষ্ট। যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা পূর্বে কাউকেও দেয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্যে সমস্ত ভূমিকে মসজিদ ও পবিত্রিকারী বানানো হয়েছে। আমার উদ্ধতের যে কোন জায়গায় নামায়ের সময় এসে যাবে সেখাই নামায পড়ে নেবে। তার মসজিদও তার অযু সেখানেই তার নিকট বিদ্যমান রয়েছে। (৩) আমার জন্যে যুদ্ধলক্ষ মালকে হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কারও জন্যে হালাল করা হয়নি। (৪) আমাকে সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। (৫) সমস্ত নবী (আঃ)-কে শুধুমাত্র নিজ নিজ সম্পদায়ের নিকট পাঠানো হতো। কিন্তু আমি সারা দুনিয়ার নিকট প্রেরিত হয়েছি।’

সহীহ মুসলিমের উন্নতি দিয়ে ঐ হাদীসেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘সমস্ত লোকের উপর আমাদেরকে তিনটি ফয়লত দেয়া হয়েছে। (১) আমাদের সারিগুলো ফেরেশ্তাদের সারির মত বানানো হয়েছে। (২) আমাদের জন্য সারা ভূমিকে মসজিদ বানানো হয়েছে। (৩) পানি পাওয়া না গেলে ওর মাটিকে অযু বানানো হয়েছে।’ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দিচ্ছেন—পানি না পাওয়ার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাতের উপর মাসেহ কর, তিনি মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। তাঁর মার্জনা ও ক্ষমার অবস্থা এই যে, পানি না পাওয়ার সময় তায়াম্বুমকে শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করতঃ ঐভাবে নামায আদায় করার অনুমতি দান করেছেন। তিনি এ অনুমতি না দিলে তোমরা কঠিন

অবস্থার মধ্যে পড়ে যেতে। কেননা, এ পরিত্র আয়াতে নামাযকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন নেশার অবস্থায় বা অপবিত্র অবস্থায় কিংবা বে-অযু অবস্থায় নামায পড়াকে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন যে পর্যন্ত সে নিজের কথা নিজেই বুঝতে না পারবে, নিয়মিতভাবে গোসল না করবে এবং শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী অযু না করবে। কিন্তু রোগের অবস্থায় ও পানি না পাওয়ার অবস্থায় তায়াম্মুমকে অযু ও গোসলের স্থলবর্তী করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহের জন্যে আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যেই।

এখন তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়ার ঘটনা বর্ণনা হচ্ছে। আমরা সূরা-ই-নিসার এ আয়াতের তাফসীরে এ ঘটনাটি যে বর্ণনা করছি, এর কারণ এই যে, সূরা-ই-মায়েদার তায়াম্মুমের আয়াতটি এ আয়াতের পর অবতীর্ণ হয়। এর প্রমাণ এই যে, স্পষ্টতঃ এটিই হচ্ছে মদ্য নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের আয়াত এবং মদ্য হারাম হয় উভদ যুদ্ধের কিছুদিন পর, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বানূ নাফীরের ইয়াহুদীদেরকে অবরোধ করে রেখেছিলেন। আর কুরআন শরীফের যে সূরাগুলো শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়, সূরা-ই-মায়েদাহ ঐগুলোর মধ্যে একটি। বিশেষ করে এ সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং তায়াম্মুমের শান-ই-নযুল এখানে বর্ণনা করাই যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ তা'আলার উন্নত তাওফীক দানের উপরই নির্ভর করছি।

মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত অয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রূতিতে হ্যরত আসমা (রাঃ)-এর নিকট হতে একটি হার ধার করেছিলেন। উক্ত হারটি সফরে কোন জায়গায় হারিয়ে যায়। হারটি অনুসন্ধানের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোক পাঠিয়ে দেন। হার পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ওটা খুঁজতে খুঁজতে নামাযের ওয়াক্ত এসে যায়। তাদের নিকট পানি ছিল না। তারা বিনা অযুতেই নামায আদায় করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে ওটা বর্ণনা করেন। সে সময় তায়াম্মুমের হুকুম অবতীর্ণ হয়। হ্যরত উসায়েদ ইবনে হজায়ের (রাঃ) তখন হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, ‘আল্লাহর আপনাকে উন্নত প্রতিদান প্রদান করুন। আল্লাহর শপথ! আপনার উপর যে বিপদ এসে থাকে তার পরিণাম মুসলমানদের জন্য মঙ্গলজনকই হয়।’

হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে কোন এক সফরে বের হই। যখন আমরা ‘বায়দা’ অথবা ‘যাতুল জায়েশ’ নামক স্থানে

ছিলাম তখন আমার হারটি ভেঙ্গে কোথায় পড়ে যায়। হারটি খুঁজবার জন্য যাত্রীদলসহ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তথায় থেমে যান। তখন না আমাদের নিকট পানি ছিল, না ঐ প্রান্তরের কোন জায়গায় পানি ছিল। জনগণ আমার পিতা হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন-'দেখুন আমরা তাঁর কারণে কি বিপদেই না পড়েছি!' অতএব আমার পিতা আমার নিকট আগমন করেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার উরুর উপর স্বীয় মস্তক রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এসেই তিনি আমাকে বলেন, 'তুমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ও জনগণকে এখানে থামিয়ে দিয়েছো। এখন না তাদের নিকট পানি রয়েছে, না কোন জায়গায় পানি দেখা যাচ্ছে?' মোটকথা তিনি আমাকে খুব শাসন গর্জন করেন এবং আল্লাহ জানেন কত কি তিনি আমাকে বলেছেন। এমনকি স্বীয় হস্ত দ্বারা আমার পার্শ্ব দেশে প্রহার করতেও থাকেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে বলে আমি সামান্য নড়াচড়াও করিনি। সারা রাত্রি কেটে যায়। সকালে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জেগে উঠেন। কিন্তু পানি ছিল না। সে সময় আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন। তখন সমস্ত লোক তায়াম্মুম করেন। হ্যরত উসায়েদ ইবনে হজায়ের (রাঃ) তখন বলেনঃ 'হে আবু বকরের পরিবারবর্গ! এ বরকত আপনাদের প্রথম নয়। তখন যে উটে আমি আরোহণ করেছিলাম ঐ উটটি উঠালে ওর নীচে আমার হার পেয়ে যাই।' (সহীহ বুখারী)

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হ্যরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় পত্নী হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে 'যাতুল জায়েশ' এর মধ্য দিয়ে গমন করছিলেন। তথায় হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-এর ইয়ামানী হারটি ভেঙ্গে কোথায় পড়ে যায়। ঐ হারটি খুঁজবার জন্য জনগণ তথায় থেমে যান। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সঙ্গীয় মুসলমানগণ সারা রাত্রি তথায় কাটিয়ে দেন। সকালে উঠে দেখেন যে, পানি মোটেই নেই। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর উপর পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্রতা লাভ করার অনুমতি দানের আয়াত অবতীর্ণ করেন। মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে উঠে মাটির উপর হাত মারেন এবং হাতে যে মাটি লাগে তা ঝেড়ে না ফেলেই স্বীয় চেহারার উপর ও হস্তদ্বয়ের উপর কাঁধ পর্যন্ত ও হাতের নীচ হতে বগল পর্যন্ত ঘর্ষণ করেন।

ইবনে জারীর (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, এর পূর্বে তো হ্যরত আবু বকর (রাঃ) হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-এর উপর ভীষণ রাগভিত হয়েছিলেন। কিন্তু তায়াম্মুমের অনুমতির হৃকুম অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদ শনে আনন্দিত চিত্তে স্বীয় কন্যার নিকট আগমন করেন এবং বলেন, ‘তুমি বড়ই কল্যাণময়ী। মুসলমানেরা এত বড় অবকাশ পেয়েছে।’

অতঃপর মুসলমানগণ একবার হাত মেরে চেহারা ঘর্ষণ করেন এবং দ্বিতীয়বার হাত মেরে কন্তু পর্যন্ত ও বগল পর্যন্ত হস্তদ্বয় ঘর্ষণ করেন।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর বর্ণনায় রয়েছে, হ্যরত আসলা’ ইবনে সুরাইক (রাঃ) বলেনঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর উন্নীটি চালনা করছিলাম যার উপর তিনি আরোহিত ছিলেন। তখন ছিল শীতকাল, রাত্রে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছিল, সে সময় আমি অপবিত্র হয়ে পড়ি। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যাত্রার ইচ্ছে করেছেন। ঐ অবস্থায় আমি তাঁর উন্নী ছালনা করতে অপছন্দ করি। সাথে সাথে আমার এটাও ধারণা হয় যে, ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করলে আমি মরেই যাবো বা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বো। আমি চুপে চুপে একজন আনসারীকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর উন্নীটির লাগাম ধরতে বলি। সুতরাং তিনি লাগাম ধরে চলতে থাকেন, আর আমি আগুন জ্বলে পানি গরম করতঃ গোসল করে লই। তারপর দৌড়ে গিয়ে যাত্রীদলের নিকট পৌছি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেনঃ ‘আসলা’ ব্যাপার কি? উন্নীটির চলন কেমন যেন বিগড়ে গেছে?’ আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এতক্ষণ আমি উন্নী চালাইনি। বরং অমুক আনসার (রাঃ) চালনা করছিলেন। তিনি তখন বলেনঃ ‘এর কারণ কি?’ আমি তখন সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করি। তখন আল্লাহ তা’আলা **لَا تَقْرِبُوا الصَّلْوَةَ** হতে **غُفْرًا** পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।’ এ বর্ণনাটি অন্য সনদেও বর্ণিত আছে।

৪৪। তোমরা কি তাদের প্রতি

লক্ষ্য করনি, যাদেরকে প্রত্যেক

এক অংশ প্রদত্ত হয়েছে? তারা

বিপথ ত্রয় করেছে এবং ইচ্ছে

করে যে, তুমিও পথভ্রান্ত হও।

۴۴-**أَمْ تَرِإِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا**

**نَصِيبًا مِّنِ الْكِتَبِ يَشْتَرُونَ**

**الضَّلَلَةَ وَيَرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا**

**السَّبِيلَ ط**

৪৫। এবং আল্লাহ তোমাদের শক্রকুলকে সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন; এবং আল্লাহই যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষক এবং আল্লাহই প্রচুর সাহায্যকারী ।

৪৬। ইয়াহুন্দীদের মধ্যে কেউ কেউ যথাস্থান হতে বাক্যাবলী পরিবর্তিত করে এবং বলে-আমরা শ্রবণ করলাম ও অধ্যাহ্য করলাম; এবং তারা স্বীয় জিহ্বা বিকৃত করে ও ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে বলে যে, শোন-শোনা যায় না ও ‘রায়েনা’; এবং যদি তারা বলতো- আমরা শুনলাম ও স্বীকার করলাম- এবং শুন ও ‘উনযুর না’ তাহলে এটা তাদের পক্ষে উভয় ও সুসঙ্গত হতো; কিন্তু আল্লাহ তাদের অবিশ্বাসহেতু তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন; অতএব অল্ল সংখ্যক ব্যক্তিত তারা বিশ্বাস করে না ।

আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করেছেন- ইয়াহুন্দীদের (কেয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক) একটি নিন্দনীয় স্বভাব এও রয়েছে যে, তারা সুপথের বিনিময়ে ভাস্তপথকে গ্রহণ করেছে, শেষ নবী (সঃ)-এর উপর যা অবর্তীর্ণ হয়েছে তা হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নিছে এবং পূর্ববর্তী নবীগণ হতে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর গুণাবলী সম্বন্ধে যে জ্ঞান তারা প্রাপ্ত হয়েছে সেটাও তারা শিষ্যদের নিকট হতে নৈবেদ্য নেয়ার লোভে প্রকাশ করছে না । বরং সাথে সাথে

٤٥- وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ  
وَكَفِيَ اللَّهُ وَلِيَا وَكَفِيَ بِاللَّهِ  
نَصِيرًا ۝

٤٦- مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَحْرُفُونَ  
الْكِلَمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ  
سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ  
مُسْمَعَ وَرَأَيْنَا لَيْلًا بِالسَّيْرِ  
وَطَعْنًَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ  
قَالُوا سَمِعْنَا وَاطَّعْنَا وَاسْمَعْ  
وَانظَرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ  
وَاقْوَمْ وَلِكِنْ لِعْنَهُمْ اللَّهُ  
بِكُفَّرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

এটা ও কামনা করছে যে, স্বয়ং মুসলমানেরাও যেন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলার গ্রন্থকে অস্বীকার করে এবং সুপথ ও সঠিক ইলমকে পরিত্যাগ করে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শক্রদের সংবাদ খুব ভালভাবেই রাখেন। তিনি তোমাদেরকে তাদের হতে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন তাদের প্রতারণার ফাঁদে না 'পড়। তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সাহায্যই যথেষ্ট। তোমরা বিশ্বাস রাখ যে, যারা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তিনি তাদের অবশ্যই সহায়তা করে থাকেন এবং তিনি তাদের সাহায্যকারী হয়ে যান। তৃতীয় আয়াতটি যা 'شَدِّدْ عَلَيْهِمْ مِنْ شَدَّدْتِي' শব্দটি জন্স বর্ণনা করার জন্য এসেছে। যেমন **فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ** (২২ : ৩০) অতঃপর ইয়াহুন্দীদের ঐ দলের যে পরিবর্তন করণের কথা বলা হচ্ছে, তার ভাবার্থ এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার কথার ভাবার্থ বদলিয়ে দেয় এবং ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। আর এ কাজ তারা জেনে শুনে ও বুঝে সুন্ধে করে থাকে। এর ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা নকল করেছেন যে, তারা বলে- 'হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনি যা কিছু বলেন আমরা তা শুনি কিন্তু মান্য করি না।' তাদের কুফরী ও ধর্মদ্রোহীতার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তারা জেনে ও বুঝে স্পষ্টভাষায় কিভাবে নিজেদের অপবিত্র খেয়ালের কথা প্রকাশ করছে এবং বলছে- 'আমরা যা বলি তা আপনি শুনুন, আল্লাহ করেন আপনি না শুনেন।' কিন্তু প্রথম ভাবার্থটিই অধিকতর সঠিক। এ কথা তারা উপহাস ও বিদ্রূপের ছলে বলতো। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করুন। তারা **رَاعَنَا** বলতো। এর দ্বারা বাহ্যতঃ বুঝা যেতো যে তারা বলছে- 'আমাদের দিকে কান লাগিয়ে দিন।' কিন্তু তারা এ শব্দ দ্বারা ভাবার্থ গ্রহণ করতো- আপনি বড়ই উদ্ধৃত ও অহংকারী। এর পূর্ণ ভাবার্থ **رَاعَنَا لَا تَقُولُوا رَاعَنَا** (২: ১০৪)-এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যা তারা বাইরে প্রকাশ করতো, স্বীয় জিহ্বাকে বক্র করে বিদ্রূপ সূচক ভঙ্গিতে অন্তরের মধ্যে তার উল্টো ভাব গোপন করে রাখতো। প্রকৃতপক্ষে তারা রাসূলল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে বেয়াদবী করতো। তাই তাদেরকে হিদায়াত করা হচ্ছে যে, তারা যেন এ দু'অর্থযুক্ত শব্দগুলো বর্ণনা পরিত্যাগ করে এবং স্পষ্টভাবে বলে, আমরা শুনলাম ও মানলাম, আপনি আমাদের আরয শুনুন ও আমাদের দিকে

দেখুন। এ কথা তাদের জন্য উত্তম এবং এটাই হচ্ছে পরিষ্কার, সরল, সোজা এবং উপযুক্ত কথা। কিন্তু তাদের অন্তরকে মঙ্গল হতে বহুদূরে নিষ্কেপ করা হয়েছে। প্রকৃত ঈমান পূর্ণভাবে তাদের অন্তরে স্থানই পায় না। এ বাক্যের তাফসীরও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ভাবার্থ এই যে, উপকার দানকারী ঈমান তাদের মধ্যে নেই।

### ৪৭। হে গ্রন্থ প্রাণগণ! তোমাদের

সঙ্গে যা আছে তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী যা অবতীর্ণ করেছি তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; এর পূর্বে যে, আমি বহু মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেই, তৎপর তাদেরকে পৃষ্ঠের দিকে উল্টিয়ে দেই অথবা শনিবারীয়দের প্রতি যেকুপ অভিসম্পাত করেছিলাম তদ্ধপ তাদের প্রতিও অভিসম্পাত করিঃ; এবং আল্লাহর আদেশ সুসম্পন্ন হয়েই থাকে।

### ৪৮। নিষ্কয়ই আল্লাহ- তাঁর সাথে অংশীস্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না এবং তদ্যুতীত যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন; এবং যে কেউ আল্লাহর অংশী হ্রিয় করে, সে মহাপাপে আবদ্ধ হয়েছে।

يَا يَهُآ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ  
إِمْنَوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا  
مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ إِنْ نَطِمِسْ  
وَجْهُهَا فَنَرَدْهَا عَلَى أَدْبَارِهَا  
أَوْ نَلْعَنْهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ  
السَّبِيلِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ  
بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ  
يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ  
أَفْتَرَ إِثْمًا عَظِيمًا

আল্লাহ তাঁ'আলা ইয়াতুন্দী ও খ্রীষ্টানদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন- ‘আমি আমার মহা মর্যাদাবান গ্রন্থ আমার উত্তম নবী (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে স্বয়ং তোমাদের কিতাবের সত্যতা ও স্বীকৃত রয়েছে। সুতরাং তোমরা এর

উপর ঈমান আনয়ন কর এর পূর্বে যে, আমি তোমাদের আকৃতি বিকৃত করে দেই। অর্থাৎ মুখ বিপরীত দিকে করে দেই এবং তোমাদের চক্ষু এ দিকের পরিবর্তে ঐ দিকে হয়ে যায়।' কিংবা ভাবার্থ এই যে, 'তোমাদের চেহারা নষ্ট করে দেই যাতে তোমাদের কান, নাক সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতঃপর এ বিকৃত চেহারাও উল্টো হয়ে যায়।' এ শাস্তি তাদের কর্মেরই পূর্ণ ফল। এরা সত্য হতে সরে মিথ্যার দিকে এবং সুপথ হতে বিপথের দিকে ধাবিত হচ্ছে, কাজেই আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে ধমক দিয়ে বলছেনঃ 'আমিও এভাবেই তোমাদের মুখ উল্টিয়ে দেবো যেন তোমাদেরকে পিছন পায় চলতে হয়। তোমাদের চক্ষুগুলো তোমাদের গ্রীবার দিকে করে দেবো'। আর এ রকমই তাফসীর কেউ কেউ 'كَعَنَّا فِي أَعْنَاقِهِمْ' (৩৬: ৮) -এ আয়াতের তাফসীরেও করেছেন। মোটকথা তাদের পথভ্রষ্টতা ও সুপথ হতে সরে পড়ার এ খারাপ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে- 'আমি তোমাদেরকে সত্যপথ হতে সরিয়ে ভাস্তির পথের' দিকে নিয়ে যাবো, তোমাদেকে কাফির বানিয়ে দেবো এবং তোমাদের চেহারা বানরের চেহারার মত করে দেবো।'

আবু যায়েদ (রঃ) বলেনঃ 'ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ এই যে, তাদেরকে হিয়ায় হতে সিরিয়ায় পৌছিয়ে দেন।' এও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি শুনেই হ্যরত কা'ব ইবনে আহবার (রাঃ) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, হ্যরত ইবরাহীম (রঃ)-এর সামনে যখন হ্যরত কা'ব (রঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের আলোচনা হয়, তখন তিনি বলেনঃ 'হ্যরত কা'ব (রঃ) হ্যরত উমার (রাঃ)-এর যুগে মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু বায়তুল মুকাদ্দাস যাওয়ার পথে মদীনায় আগনম করেন। হ্যরত উমার (রাঃ) তাঁর নিকট গিয়ে বলেনঃ 'হে কা'ব (রঃ)! মুসলমান হয়ে যাও।' উভরে তিনি বলেনঃ আপনারা তো কুরআন কারীমে পড়েছেন-'যাদের দ্বারা তাওরাত উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, অতঃপর তারা তা উঠায়নি তাদের দৃষ্টান্ত গাধার ন্যায়, যে বোৰা বহন করে থাকে।' আর আপনি এটাও জানেন যে, যাদের দ্বারা তাওরাত উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আমিও তাদের মধ্যে একজন। তখন হ্যরত উমার তাঁকে ছেড়ে দেন। তিনি এখান হতে রওয়ানা হয়ে হেমসে পৌছেন। তথায় তিনি শুনতে পান যে, তাঁরই বংশের একজন লোক *بِإِيمَانِهِ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَبَ اُمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا* *وَمُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ* *مِنْ قَبْلِ اَنْ نَطْمِسَ وجوهًا فَنَرَدَهَا عَلَى اَدْبَارِهَا*

-এ আয়াতটি পাঠ করছেন। তাঁর পাঠ শেষ হলে হ্যরত কা'ব (রঃ) ভয় করেন যে, এ আয়াতে যাদেরকে এ শাস্তি প্রদানের ভয় দেখানো হয়েছে তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান কি-না এবং না জানি তাঁর আকারই বিকৃত হয়ে যায়। সুতরাং তৎক্ষণাতঃ তিনি বলে উঠেনঃ **يَارَبِّ أَسْلَمْتُ** অর্থাৎ “হে আমার প্রভু! আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।”

অতঃপর তিনি হেম্স হতেই স্বীয় দেশ ইয়ামনে ফিরে আসেন। এখানে এসে তিনি সপরিবারে মুসলমান হয়ে যান।

মসুনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হ্যরত কা'ব (রঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণিত আছে যে, তাঁর শিক্ষক আবু মুসলিম জালিলী তাঁর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ব্যাপারে বিলম্বের কারণে সদা তাঁকে তিরক্ষার করতে থাকেন। অতঃপর তাওরাতে যে নবীর শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, মুহাম্মাদ (সঃ) সত্যই সেই নবী কি-না তা দেখার জন্য হ্যরত কা'ব (রঃ)-কে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। হ্যরত কা'ব (রঃ) বলেনঃ ‘আমি মদীনায় পৌছি। হঠাৎ আমি শুনতে পাই যে, একটি লোক কুরআন কারীমের নিষ্ঠের আয়াতটি পাট করছেনঃ

يَا يَاهَا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَبَ اِمْنَوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصِدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ  
نَطِمْسَ وُجُوهًا فَنَرْدَهَا عَلَى اَدْبَارِهَا۔

অর্থাৎ ‘হে গ্রন্থ প্রাঙ্গণ! তোমাদের সঙ্গে যা আছে-তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী যা আমি অবতীর্ণ করেছি, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এর পূর্বে যে, আমি বহু মুখ্যগুল বিকৃত করে দেই, তৎপর তাদেরকে পৃষ্ঠের দিকে উল্টিয়ে দেই।’ এটা শুনেই আমি চমকিত হয়ে উঠি এবং তাড়াতাড়ি গোসলের কাজে লেগে পড়ি। আমি আমার চেহারার উপর হাত দিয়ে দেখি যে, না জানি আমার দৈমান আনয়নে বিলম্ব হয়, ফলে আমার মুখ্যগুল পৃষ্ঠের দিকে উল্টে যায়! এরপর অতিসত্ত্বে আমি মুসলমান হয়ে যাই।

অতঃপর বলা হচ্ছে- ‘অথবা শনিবারীয়দের প্রতি আমি যেরূপ অভিসম্পাত করেছিলাম তদুপর তাদের উপরও অভিসম্পাত করি।’ অর্থাৎ যারা কৌশল করে শনিবার দিন মৎস শিকার করেছিল, অথচ সে দিন তাদেরকে মৎস শিকার করতে নিষেধ করা হয়েছিল। যার প্রতিফল স্বরূপ তারা বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছিল। এর বিস্তারিত ঘটনা ইন্শাআল্লাহ সূরা-ই-আ'রাফে আসবে।

এরপর বলা হচ্ছে— আল্লাহর আদেশ সুসম্পন্ন হয়েই থাকে। তিনি যখন কোন নির্দেশ দেন তখন এমন কেউ নেই যে, তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে বা তাকে বাধা প্রদান করে। এরপরে আল্লাহ পাক বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা তার সাথে অংশীস্থাপনকারীর পাপ মার্জনা করেন না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, সে মুশারিক, তার জন্যে ক্ষমার দরজা বন্ধ। এ পাপ ছাড় অন্য পাপ যত বেশী হোক না কেন তিনি ইচ্ছে করলে ক্ষমা করতে পারেন। এ পরিত্র আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে। আমরা এখানে কিছু কিছু বর্ণনা করছি।

(১) মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ পাপের বিভাগ (দেওয়ান) হচ্ছে তিনটি। প্রথম হচ্ছে ঐ পাপ যার আল্লাহ তা'আলা কোন পরওয়া করেন না। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ পাপ যা আল্লাহ তা'আলা কখনও ক্ষমা করেন না। যে পাপ তিনি ক্ষমা করেন না তা হচ্ছে শিরক। আল্লাহ তা'আলা বলেন—‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে অংশীস্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না।’ অন্য জায়গায় বলেন, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীস্থাপন করে তিনি তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। যে দেওয়ানের আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন গুরুত্ব নেই তা হচ্ছে বান্দার নিজের জীবনের উপর অত্যাচার করা, যার সম্পর্ক বান্দা ও আল্লাহর সাথে রয়েছে। যেমন সে কোন দিনের রোধা ছেড়ে দিয়েছে বা নামায ছেড়েছে। আল্লাহ তা'আলা এটা ক্ষমা করে থাকেন। আর আল্লাহ তা'আলা যে দেওয়ানের কিছুই ছাড়েন না তা হচ্ছে বান্দাদের পরম্পরের অত্যাচার যার কিসাস বা প্রতিশোধ গ্রহণ জরুরী হয়ে থাকে।

(২) মুসনাদ-ই-আবু বাকার আল-বায়্যারের মধ্যে হ্যরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেনঃ অত্যাচার তিন প্রকার। প্রথম হচ্ছে ঐ অত্যাচার যা আল্লাহ ক্ষমা করেন না। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ অত্যাচার, আল্লাহ তা'আলা যার কিছুই ছাড়েন না। যে অত্যাচার আল্লাহ ক্ষমা করেন না তা হচ্ছে শিরক। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে বড় অত্যাচার।’ দ্বিতীয় অত্যাচার হচ্ছে বান্দাদের নিজের জীবনের উপর অত্যাচার, যার সম্পর্ক তাদের ও তাদের প্রভুর মধ্যে রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা যে অত্যাচারের কিছুই

ছাড়েন না তা হচ্ছে বান্দাদের একের অপরের প্রতি অত্যাচার, আল্লাহ তা'আলা এটা ছেড়ে দেন না যে পর্যন্ত একে অন্যের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ না করে।

(৩) মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ ‘আল্লাহ তা'আলা সমস্ত পাপই মার্জনা করে থাকেন, শুধু ঐ ব্যক্তিকে তিনি ক্ষমা করেন না যে কুফরীর অবস্থায় মারা যায় এবং ঐ ব্যক্তিকে মার্জনা করেন না, যে কোন মুমিনকে জেনে শুনে হত্যা করে।’

(৪) মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন-‘হে আমার বান্দা! তুমি যে পর্যন্ত আমার ইবাদত করতে থাকবে এবং আমার নিকট হতে ভাল আশা পোষণ করবে, আমিও তোমার ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করতে থাকব। হে আমার বান্দা! তুমি যদি সারা পৃথিবীপূর্ণ পাপ নিয়ে আমার নিকট আগমন কর, আমি পৃথিবীপূর্ণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবো এ শর্তে যে, তুমি আমার সাথে অংশীদারণ করনি।’

(৫) মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আবু যার (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ বলে এবং এর উপরই মৃত্যুবরণ করে সে অবশ্যই জান্মাতে যাবে।’ এ কথা শুনে হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, ‘যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরি করে?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরি করে।’ তিনবার একই প্রশ্ন ও উত্তর হয়। চতুর্থবারে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘যদিও আবু যারের নাক ধূলায় মলিন হয়।’ তথা হতে হযরত আবু যার (রাঃ) স্বীয় চাদর টানতে টানতে বের হন এবং বলতে বলতে যানঃ ‘যদিও আবু যারের নাক ধূলায় মলিন হয়।’ এরপরেও যখনই তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখন এ বাক্যটি অবশ্যই বলতেন। এ হাদীসটি অন্য সনদে কিছু অতিরিক্তার সঙ্গেও বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে যে, হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, ‘আমি মদীনার প্রাস্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে চলছিলাম। আমাদের দৃষ্টি ছিল উভদ পাহাড়ের দিকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘হে আবু যার (রাঃ)!’ আমি বলিঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি হায়ির আছি। তিনি বলেনঃ ‘জেনে রেখো যে, যদি আমার নিকট এ উভদ পাহাড়ের সমানও স্বর্গ থাকে তবুও আমি চাইবো না যে, তৃতীয় সন্ধ্যায় আমার নিকট ওর মধ্য হতে কিছু অবশিষ্ট থাক ঐ দীনারটি ছাড়া যা আমি ঝণ

পরিশোধের জন্য রেখে দেই। বাকী সমস্ত মাল আমি এভাবে ও এভাবে আল্লাহর পথে আল্লাহর বান্দাদেরকে দিয়ে দেবো।' আর তিনি ডানে, বামে ও সম্মুখে অঙ্গলি নিষ্কেপ করেন। অতঃপর কিছুক্ষণ ধরে আমরা চলতে থাকি। আবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডাক দেন ও বলেনঃ এখানে যার অধিক রয়েছে, কিয়ামতের দিন তার অল্প থাকবে; কিন্তু যে একুপ করে এবং তিনি তার ডানে, বামে ও সামনে অঙ্গলি ভরে এভাবে ইশারা করেন। আবার কিছুক্ষণ চলার পর আমাকে বলেনঃ 'হে আবু যার (রাঃ)! তুমি এখানে থামো, আমি আসছি।' তিনি চলে যান এবং আমার চক্ষু হতে অদৃশ্য হন কিন্তু আমি তাঁর শব্দ শুনতে পাই। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি যে, না জানি একাকী পেয়ে তাঁকে কোন শক্তি আক্রমণ করে বসে। আমি তাঁর নিকট পৌছার ইচ্ছে করি, কিন্তু সাথে সাথে তাঁর এ নির্দেশ আমার স্মরণ হয়-'আমি না আসা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা কর'। সুতরাং আমি সেখানেই রয়ে গেলাম। অবশ্যে তিনি ফিরে আসেন। আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি কেমন যেন শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম? তিনি বলেনঃ আমার নিকট হ্যরত জিবরাইল (আঃ) এসেছিলেন এবং বলেছিলেন-'আপনার উম্মতের মধ্যে যে এমন অবস্থায় মারা যাবে যে, সে আল্লাহর সঙ্গে কাউকেও শরীক করেনি, সে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে।' আমি বলি-'যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরি করে?' তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে।' এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এও রয়েছে যে, হ্যরত আবু যার (রাঃ) বলেনঃ 'আমি রাত্রে বের হই। দোখি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) চলতে রয়েছেন। আমি ধারণা করি যে, সম্ভবতঃ এ সময় তিনি কাউকেও সঙ্গে নিতে চান না। তাই আমি চন্দ্রের ছায়ায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে চলতে থাকি। তিনি ঘুরে যখন আমাকে দেখতে পান তখন বলেনঃ 'কে তুমি?' আমি বলি- আবু যার, আল্লাহ আমাকে আপনার প্রতি উৎসর্গ করুন। তখন তিনি আমাকে বলেনঃ 'এসো আমার সঙ্গে চল।' কিছুক্ষণ ধরে আমরা চলতে থাকি। অতঃপর তিনি বলেনঃ 'আধিক্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন অল্পের অধিকারী হবে, তারা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধন-মাল দিয়েছেন, সেই মাল তারা ডানে, বামে, সামনে, পিছনে ভাল কাজে খরচ করে থাকে।' আবার কিছুক্ষণ চলার পর আমাকে বলেনঃ 'এখানে বস।' তিনি আমাকে এমন এক জায়গায় বসিয়ে দেন যার চতুর্দিকে পাথর ছিল। তিনি আমাকে বলেনঃ 'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে বসে থাক।' অতঃপর তিনি চলে যান এবং দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হয়ে যান। তাঁর খুব বিলম্ব হয়ে যায়। অবশ্যে

আমি দেখি যে, তিনি বলতে বলতে আসছেনঃ ‘যদিও ব্যভিচার করে থাকে এবং যদিও ছুরি করে থাকে।’ যখন তিনি আমার নিকট পৌছেন তখন আমি থাকতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে আপনার উপর উৎসর্গ করুন, আপনি মাঠের প্রান্তে কার সাথে কথা বলছিলেন? আমি শুনেছি, তিনি আপনাকে উত্তরও দিচ্ছিলেন। তিনি বলেনঃ তিনি ছিলেন জিবরাইল (আঃ)। এখানে এসে তিনি আমাকে বলেনঃ ‘আপনার উম্মতকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীস্থাপন না করা অবস্থায় মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে।’ আমি বলি, ‘হে জিবরাইল (আঃ)। যদিও সে ছুরি করে এবং ব্যভিচারও করে?’ তিনি বলেনঃ ‘হ্যাঁ।’ আমি বলি, ‘যদিও সে ছুরি করে এবং ব্যভিচারও করে?’ তিনি বলেনঃ ‘হ্যাঁ, এমনকি যদি সে মদ্যপানও করে।’

(৬) মুসনাদ-ই-আবু ইবনে হামীদের মধ্যে হ্যরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ওয়াজিবকারী জিনিসগুলো কি?’ তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি শিরক না করেই মারা গেল তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব এবং যে ব্যক্তি শিরক করে মারা গেল তার জন্যে জাহনাম ওয়াজিব।’ এ হাদীসটি অন্য রীতিতেও বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে— ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শিরক না করেই মারা গেল তার জন্যে ক্ষমা বৈধ। আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছে করলে তাকে শান্তি দেবেন এবং ইচ্ছে করলে ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে তাকে তিনি ক্ষমা করেন না। ঐ ব্যক্তিকে ছাড়া যাকে তিনি ইচ্ছে ক্ষমা করে থাকেন’। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম) অন্য সনদ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ ‘বান্দার উপর ক্ষমা সর্বদা চালু থাকে যে পর্যন্ত পর্দা না পড়ে যায়।’ জিজ্ঞেস করা হয়, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! পর্দা পড়া কি?’ তিনি বলেনঃ ‘যে ব্যক্তি শিরক না করা অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে সাক্ষাত করে তার জন্যে আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমা বৈধ হয়ে যায়। তিনি ইচ্ছে করলে তাকে শান্তি দেবেন এবং ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে দেবেন।’ অতঃপর তিনি ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾-এ আয়াতটি পাঠ করেন। (মুসনাদ-ই-আবু ইয়া’লা)।

(৭) মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীস্থাপন না করে মারা গেল সে জান্নাতে প্রবেশ করলো।’

(৮) মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা সাহাবীদের নিকট আগমন করেন এবং বলেনঃ ‘তোমাদের মহান সম্মানিত প্রভু আমাকে আমার উম্মতের মধ্যকার সন্তুষ্ট হাজার লোকের উপর এ অধিকার দিয়েছেন যে, তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমার জন্য আমার উম্মতের ব্যাপারে যা রাষ্ট্রিত রয়েছে তা আমি তাঁর নিকট প্রকাশ করবো।’ তখন কোন একজন সাহাবী (রাঃ) বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তা‘আলা আপনার জন্যে কি ওটা সংরক্ষিত রাখবেন?’ একথা শুনে তিনি ভেতরে প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি তাকবীর পাঠ করতে করতে বাইরে আসেন এবং বলেনঃ ‘আমার প্রভু আমাকে প্রত্যেক হাজারের সঙ্গে সন্তুষ্ট হাজার বেশী দান করেছেন এবং তাঁর নিকটে ঐ সংরক্ষিত অংশও রয়েছে।’ হ্যরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করেন তখন হ্যরত আবু রাহাম (রঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘ঐ সংরক্ষিত জিনিস কি?’ জনগণ তখন আবু রাহাম (রঃ)-কে ধমক দিয়ে বলেনঃ ‘কোথায় তুমি এবং কোথায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সংরক্ষিত জিনিস?’ হ্যরত আবু আইয়ুব (রাঃ) জনগণকে তখন বলেনঃ ‘তোমরা লোকটিকে ছেড়ে দাও। এসো আমি আমার ধারণা মতে তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সংরক্ষিত জিনিসের সংবাদ দেই। এমনকি আমি প্রায় নিশ্চিতকৃপেই বলতে পারি যে, ঐ জিনিস হচ্ছে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশ লাভ যে খাঁটি অন্তরে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ এক, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা’বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দা এবং রাসূল।’

(৯) হ্যতর আবু আইয়ুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলে, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার একটি ভাতুল্পুত্র রয়েছে, সে হারাম হতে বিরত থাকে না।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ ‘তার দ্বীনদারী কিরণপ?’ লোকটি বলে, ‘সে নামাযী ও আল্লাহর একত্বাদে বিশ্বাসী।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ ‘যাও, তার নিকট তার দ্বীন দান হিসেবে যাঞ্চগা কর। যদি অস্বীকার করে তবে কিনে নাও।’ লোকটি গিয়ে তার নিকট যাঞ্চগা করে। কিন্তু সে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। লোকটি এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ সংবাদ দেয়। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘আমি তাকে স্বীয় ধর্মের প্রতি অটল পেলাম।’ সে সময় *إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِّكَ بِالْعِظَمِ*-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)

(১০) হ্যরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে বলে, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি কোন প্রয়োজন ও প্রয়োজন বিশিষ্টকে না করে ছাড়িনি।’ তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘তুমি কি তিন বার এ সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাঝুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল?’ লোকটি বলে, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বলেনঃ ‘এটা এ সবগুলোর উপর জয়যুক্ত হবে।’

(১১) মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত যমযম ইবনে জাওশল ইয়ামানী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘আমাকে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, ‘হে জাওশ ইয়ামানী (রঃ)! কোন মানুষকে কখনও বল না যে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন না।’ আমি তখন বলি, ‘হে আবু হুরাইরা (রাঃ)! এ কথাতো আমাদের প্রত্যেকেই ক্রোধের সময় তার ভাই ও বন্ধুকে বলে থাকে।’ তিনি বলেন, সাবধান! কখনও বলো না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘বানী ইসরাইলের মধ্যে দু’টি লোক ছিল। একজন ছিল চরম উপাসক এবং অপরজন ছিল দ্বীয় জীবনের উপর অত্যাচারী। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভাতৃত্বভাব ছিল। উপাসক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রায় কোন না কোন পাপ কার্যে লিঙ্গ দেখত এবং তাকে বলতো, ‘তুমি এ কাজ হতে বিরত থাক। সে তখন উভয়ে বলতো, ‘আমাকে আমার প্রভুর উপর ছেড়ে দাও। তুমি কি আমার রক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছো?’ একদা উপাসক ব্যক্তি দেখে যে, সে পুনরায় এমন এক পাপ কাজ করতে রয়েছে যা তার নিকট অত্যন্ত বড় পাপ বলে মনে হয়। তাই সে তাকে বলে, ‘তোমাকে সতর্ক করছি, তুমি বিরত থাক।’ সে ঐ উত্তরই দেয়। উপাসক ব্যক্তি তখন বলেঃ ‘আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তোমাকে কখনও ক্ষমা করবেন না এবং তোমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন না।’ আল্লাহ তা‘আলা তখন তাদের নিকট ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন যিনি তাদের ক্লহ কব্য করে নেন। যখন তারা আল্লাহ তা‘আলার নিকট একত্রিত হয় তখন আল্লাহ তা‘আলা ঐ পাপীকে বলেন- ‘আমার করুণার ভিত্তিতে তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।’ আর ঐ উপাসককে বলেন- ‘তোমার কি প্রকৃত জ্ঞান ছিল? তুমি কি আমার অধিকৃত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান ছিলে? (হে ফেরেশতাগণ!) তোমরা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাও।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘যাঁর হাতে আবুল কাসিম (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! সে এমন এক কথা মুখ দিয়ে বের করে যা তার দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংস করে দেয়।’

(১২) তাবরানীর হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন- যে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছে যে, আমি পাপ মার্জনায় সক্ষম, আমি তার পাপ মার্জনাই করে থাকি এবং এতে কোন পরওয়া করি না যে পর্যন্ত না আমার সঙ্গে অংশী স্থাপন করে।’

হাফিয় আবু বাকর আল বায়্যায় (রঃ) এবং হাফিয় আবুল ইয়ালা (রঃ)-এর গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে কার্যের উপর আল্লাহ তা‘আলা কোন পুরক্ষারের অঙ্গীকার করেছেন তা তিনি অবশ্যই পূরণ করবেন এবং যে কার্যের উপর শাস্তির অঙ্গীকার করেছেন তা তাঁর ইচ্ছাধীন।’

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাহাবীগণ হত্যাকারী, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণকারী, পবিত্র নবীদের উপর অপবাদ প্রদানকারী এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীদের ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করতাম না। অবশ্যে-*إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَاءُ*-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়- এবং নবী (সঃ)-এর সাহাবীগণ সাক্ষ্য প্রদান হতে বিরত থাকেন।’

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ ‘আল্লাহ তা‘আলার কিতাবের মধ্যে যে সমস্ত পাপ কার্যের উপর জাহান্নামের বর্ণনা রয়েছে সেসব কার্যে লিঙ্গ ব্যক্তিদের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আমরা কোন সন্দেহ পোষণ করতাম না। অবশ্যে আমাদের উপর উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এটা শুনার পর আমরা সাক্ষ্য দেয়া হতে বিরত থাকি এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহ তা‘আলার উপর সমর্পণ করি।’

বায়্যায় (রঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, বড় বড় পাপ কার্যে লিঙ্গ ব্যক্তিদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা হতে আমরা বিরত ছিলাম। অবশ্যে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে উপরোক্ত আয়াত শ্রবণ করি এবং তিনি একথাও বলেনঃ ‘আমি আমার শাফাআতকে কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের কাবীরা শুনাহ্কারীদের জন্যে পিছিয়ে রেখেছি।’ ইমাম আবু জাফর রায়ী (রঃ)-এর বর্ণনায় হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর নিম্নলিপ উক্তি রয়েছেঃ যখন *يَعْبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ انْفُسِهِمْ* অর্থাৎ ‘হে আমার ঐ বান্দাগণ যারা নিজেদের

জীবনের উপর অত্যাচার করেছো, তোমরা আমার করুণা হতে নিরাশ হয়ো না'। (৩৯: ৫৩) -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন একটি লোক দাঁড়িয়ে বলে, হে আল্লাহর নবী (সঃ)! আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনকারীও কিঃ? আল্লাহর রাসূল (সঃ) তার এ প্রশ্ন অপছন্দ করেন এবং তাকে ‘**إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ**’ এ আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন।

ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) হ্যরত উমার (রাঃ)-এর রীতি হতে বর্ণনা করেছেন যে, ‘সূরা-ই-তানযীল’-এর এ আয়াতটি তাওবার সঙ্গে শর্তযুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি যে কোন পাপ কার্য হতে তাওবা করে, আল্লাহ তা‘আলা তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হন, যদিও সে বারবার সেই কাজ করে। সুতরাং নিরাশ না হওয়ার আয়াতে তাওবার শর্ত অবশ্যই রয়েছে। নচেৎ তার, সাথে মুশর্রিকও চলে আসবে এবং ভাবার্থ সঠিক হবে না। কেননা ‘**إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ**’ -এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান রয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলার সাথে অংশী স্থাপনকারীর ক্ষমা নেই। হ্যাঁ, তবে এটা ছাড়া অন্যান্য পাপের জন্য যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন যদিও সে তাওবা না করে। এ ভাবার্থ হলে এ আয়াতই অপেক্ষাকৃত বেশী আশা উৎপাদক হবে। এসব বিষয় আল্লাহ পাকই সব চেয়ে বেশী জানেন।

এরপর বলা হচ্ছে- ‘যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে অংশী স্থাপন করে সে মহাপাপে আবদ্ধ হয়েছে।’ যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে-

**إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** -

অর্থাৎ ‘নিচয়ই শিরুক খুব বড় অত্যাচার।’ (৩১: ১৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সবচেয়ে বড় পাপ কি?: রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘তা এই যে, তুমি আল্লাহর অংশ স্থির কর, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’ অতঃপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে হ্যরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘আমি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপের কথা বলছি।’ অতঃপর তিনি ‘**وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَ إِثْمًا**’ -এ অংশটুকু পাঠ করেন। তারপর বলেনঃ এবং মা-বাপের অবাধ্য হওয়া। অতঃপর তিনি ‘**أَن اشْكُرْ لِي وَلُوا الدِّيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ**’ -এ (৩১: ১৪)

অংশটুকু পাঠ করেন। অর্থাৎ ‘আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল।’

৪৯। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা স্বীয় পবিত্রতা প্রকাশ করে? বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পবিত্র করেন এবং তারা সূত্র পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না।

৫০। লক্ষ্য কর- তারা কিরণে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে! এবং এটি স্পষ্ট অপরাধী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

৫১। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে ঘষ্টের একাংশ প্রদত্ত হয়েছে? তারা প্রতিমা ও শয়তানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অবিশ্বাসীদেরকে বলে যে, বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ অপেক্ষা তারাই অধিকতর সুপর্যবেক্ষণ।

৫২। এদেরই প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন; এবং আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি তার জন্যে কোনই সাহায্যাকারী পাবে না।

٤٩- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكِّونَ

أَنفُسَهُمْ بِإِلَهٍ لَا يُبَرِّكُ مَنْ

يَشَاءُ وَلَا يَظْلِمُونَ فَتِيلًاً

٥٠- اَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ

اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ اِثْمًا

٤٨ مِبِينًا

٥١- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ اُوتُوا

نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ

بِالْجِبْرِ وَالْطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ

لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُؤُلَاءِ اَهْدَى مِنَ

الَّذِينَ امْنَوْا سَبِيلًا

٥٢- اُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ

وَمَنْ يَلْعَنَ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَهُ

نَصِيرًا

الْمَ تَرِإِلِيٰ، الَّذِينَ بِزُكْرَونَ أَنْفُسَهُمْ  
হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) এবং হ্যরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, **‘আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয় পাত্র’** এবং আরও বলেছিলঃ ‘ইয়াতুন্দী ও স্তুষ্টানদের ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে না।’

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, তারা তাদের নাবালক ছেলেদেরকে দুআ ও নামাযে তাদের ইমাম করতো এবং তাদেরকে নিষ্পাপ বলে ধারণা করতো। এও বর্ণিত আছে যে, তাদের ধারণায় তাদের যেসব ছেলে মারা গেছে তাদের মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভ করবে এবং তারা তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট সুপারিশ করবে ও তাদেরকে পবিত্র করবে। তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডনে এ আয়াতটি অবর্তীণ হয়।

হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) ইয়াতুন্দীদের তাদের ছেলেদেরকে ইমাম করার ঘটনা বর্ণনা করে বলেনঃ ‘তারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা‘আলা কোন পাপীকে কোন নিষ্পাপের কারণে পবিত্র করেন না।’ তারা বলতোঃ ‘আমাদের শিশুরা যেমন নিষ্পাপ, তদ্বপ্র আমরাও নিষ্পাপ।’ এও বলা হয়েছে যে, হ্যরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) বলেনঃ ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন প্রশংসাকারীর মুখ মাটির দ্বারা পূর্ণ করে দেই।’

সহীহ বুখারীর ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে, হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে অন্য একটি লোকের প্রশংসা করতে শুনতে পেয়ে বলেনঃ ‘অফসোস! তুমি তোমার সঙ্গীর ক্ষম কেটে দিলে।’ অতঃপর বলেনঃ ‘যদি তোমাদের কারও কোন ব্যক্তির প্রশংসা করা অপরিহার্য হয়েই পড়ে তবে যেন সে বলে-আমি অমুক ব্যক্তিকে এক্রপ মনে করি। কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা‘আলার নিকট এক্রপই পবিত্র এ কথা যেন না বলে।’

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, হ্যরত উমার ইবনে খাতাব (রাঃ) বলেনঃ ‘যে ব্যক্তি বলে-আমি আলেম সে মূর্খ এবং যে বলে -আমি জান্নাতী সে জাহান্নামী।’ তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ ‘তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে ভয় এই যে, কেউ স্বীয় মতকেই পছন্দ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে যে, সে একজন মুমিন, সে কাফির। যে বলে যে, সে একজন আলেম সে মূর্খ এবং যে বলে যে, সে জান্নাতে রয়েছে। সে জাহান্নামে রয়েছে।’

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, হ্যরত মু'আবিয়া (রাঃ) খুব কম হাদীস বর্ণনা করতেন এবং খুব কম জুম'আই এরূপ গেছে যেখানে তিনি নিম্নের কথাগুলো বলেননিঃ 'যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা মঙ্গলের ইচ্ছে করেন তাকে তিনি ধর্মের বোধ শক্তি দান করেন। এ মাল হচ্ছে মিষ্ট ও সবুজ রঙের। সুতরাং এটা যে তার হকের সাথে গ্রহণ করবে তার জন্যে তাতে বরকত দেয়া হবে। তোমরা একে অপরের প্রশংসা করা হতে বিরত হও। কেননা, এটা হচ্ছে যবেহ করারই তুল্য।' এ পরের বাক্যটি হ্যরত মু'আবিয়া (রাঃ) হতে সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যেও বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেন যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ 'সকালে মানুষ তার ধর্ম নিয়ে বের হয়। অতঃপর যখন সে ফিরে আসে তখন তার নিকট তার ধর্মের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। (এভাবে যে,) সে কারও সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার প্রশংসা করতে আরম্ভ করে দেয় ও শপথ করে করে বলেঃ 'নিশ্চয়ই আপনি এরূপই বটে, আপনি এরূপই বটে।' অথচ না সে তার ক্ষতির অধিকারী, না লাভের অধিকারী এবং এ কথাগুলোর পরেও হয়তো তার দ্বারা কোন কাজ হয় না। অথচ সে আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করে দিলো। অতঃপর তিনি - أَلْمَ تَرَى إِلَى الَّذِينَ يُرْبِكُونَ أَنفُسَهُمْ - এ আয়াতটি পাঠ করেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা فَلَا تُرْزُكُوا أَنفُسَكُمْ (৩২: ৩২)-এ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে। তাই, এখানে বলা হচ্ছেঃ 'বরং আল্লাহ তা'আলাই যাকে ইচ্ছে পবিত্র করেন।' কেননা, সমুদয় জিনিসের মূলতত্ত্ব একমাত্র তিনিই জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 'তারা সূত্র পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না।' অর্থাৎ তিনি সূত্রের ওজন পরিমাণও কারোও পুণ্য ছেড়ে দেবেন না। فَتِيلٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে খেজুরের আঁটির মধ্যস্থলের সূত্রটি। আবার এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওটা হচ্ছে ঐ সূতা যা অঙ্গুলি দ্বারা পাকানো হয়।

এরপর আল্লাহ পাক বলেন- 'লক্ষ্য কর, কিরূপে তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে!' যেমন তারা বলছে, আমরা আল্লাহর পুত্র ও প্রিয় পাত্র, ইয়াতুন্দী ও স্ত্রীষ্ঠান ছাড়া আর কেউ জানাতে যাবে না, আমাদেরকে নির্দিষ্ট সামান্য কয়েক দিন জাহানামে থাকতে হবে। আর যেমন তারা তাদের পূর্বপুরুষের সৎকার্যের উপর নির্ভর করে রয়েছে। অথচ একের কাজ অন্যকে কোন উপকার দেয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

تِلْكَ امَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ

‘অর্থাৎ ‘ওটা একটা দল যা অতীত হয়েছে, তারা যা উপার্জন করেছে তা তাদের সঙ্গে এবং তোমরা যা উপার্জন করেছো তা তোমাদের সঙ্গে।’ (২৪:১৩৪)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তাদের এসব কথা বলাই তাদের প্রকাশ্য অপরাধী হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। হ্যরত উমার ইবনে খাত্বাব (রাঃ) বলেন যে جبْ شَدِّيْرُ الْأَرْثَ حَقَّ ‘যাদু’ এবং طَاغُوتُ شَدِّيْর অর্থ হচ্ছে শয়তান। হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ), আবুল আলিয়া (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), আতা’ (রঃ), ইকরামা (রঃ), সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ), শা’বী (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), যহুক (রঃ) এবং সুন্দীও (রঃ) একথাই বলেন। এও বলা হয়েছে যে، جبْ হচ্ছে আবিসিনীয় শব্দ। ওর অর্থ হচ্ছে শয়তান। এটা শিরুক, প্রতিমা, যাদুকর ইত্যাদি অর্থেও এসেছে। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা হয়াই ইবনে আখতাবকে বুঝান হয়েছে। আবার কারও কারও মতে এ হচ্ছে কাব ইবনে আশরাফ। হাদীসে রয়েছে যে, পাথীসমূহের নাম নিয়ে শুভাশুভ সূচিত করা এবং মাটিতে রেখা টেনে কার্যাবলীর মীমাংসা করা হচ্ছে جبْ হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে، جبْ হচ্ছে শয়তানের শুন শুন শব্দ। طَاغُوتُ শদের বিশেষণ সূরা-ই-বাকারায় হয়ে গেছে, সুতরাং এখানে ওর পুনরাবৃত্তি নিষ্পত্যোজন।

হ্যরত জাবির (রাঃ) طَاغُوتُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেনঃ ‘তারা ছিল যাদুকর এবং তাদের নিকট শয়তান আসতো।’ মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, তারা হচ্ছে মানুষ রূপী শয়তান। তাদের নিকট মানুষ তাদের বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তাদেরকে বিচারক মেনে থাকে। হ্যরত ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে প্রত্যেক ঐ জিনিস, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া যার ইবাদত করা হয়।

এরপর আল্লাহ পাক বলেন- ‘তাদের মূর্খতা, ধর্মহীনতা এবং স্বীয় গ্রন্থের সাথে কুফরী এত চরমে পৌছে গেছে যে, তারা কফিরদেরকে মুসলমানদের উপর প্রাধান্য ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হয়াই ইবনে আখতাব এবং কা’ব ইবনে আশরাফ মকাবাসীদের নিকট আগমন করে। মকাবাসীরা তাদেরকে বলেঃ ‘তোমরা আহলে কিতাব ও পঞ্জিত লোক। আচ্ছা বলতো আমরা ভাল, না মুহাম্মাদ (সঃ) ভালঃ তখন তারা বলেঃ ‘তোমরা কি এবং মুহাম্মাদ (সঃ) কি?’ মকাবাসীরা বলেঃ ‘আমরা আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত রাখি, উট যবেহ্ করে আহার করিয়ে থাকি, দুষ্ক মিশ্রিত পানি পান করিয়ে থাকি, ক্রীতদাসদেরকে মুক্ত করিয়ে থাকি।

হাজীদেরকে পানি পান করিয়ে থাকি। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ (সঃ) তো আমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে এবং গেফার গোত্রের চোর হাজীরা তাঁর সঙ্গলাভ করেছে। এখন বলতো, আমরা ভাল, না সে ভাল? তখন ঐ দু'জন বলেঃ ‘তোমরাই ভাল। তোমরাই সোজা ও সঠিক পথে রয়েছে।’

সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তাদের ব্যাপারেই <sup>‘إِنَّ شَاءَ نَكَّ هُوَ الْأَبْرَ’</sup>- এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। বানু অয়েল ও বানু নায়ির গোত্রের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক যখন আরবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত করছিল এবং তয়াবহ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল, সে সময় যখন তারা কুরাইশদের নিকট আগমন করে তখন কুরাইশরা তাদেরকে আলেম ও দরবেশ মনে করে জিজেস করেঃ ‘বলুন তো আমাদের ধর্ম উত্তম, না মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ধর্ম উত্তম?’ এলোকগুলো বলেঃ ‘তোমাদের ধর্মই উত্তম এবং তোমরাই অধিকতর সঠিক পথে রয়েছো।’ সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে অভিশঙ্গ দল বলে ঘোষণা করা হয়। আরও বলা হয় যে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। তারা শুধু কাফিরদেরকে নিজেদের দলভুক্ত করার জন্যই তাদের জ্ঞানের বিপরীত এ তোষামোদমূলক কথাগুলো উচ্চারণ করছে। কিন্তু তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা কৃতকার্য হতে পারে না। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। তারা সমস্ত আরবকে দলভুক্ত করতঃ এ সম্মিলিত বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে মদীনার উপর আক্রমণ চালায়। ফলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনার চতুর্দিকে পরিখা খনন করতে বাধ্য হন। অবশেষে সারা জগত দেখে নেয় যে, তাদের ষড়যন্ত্র তাদের উপরই প্রত্যাবর্তিত হয়। তারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়। আল্লাহ তা'আলাই মুসলমানদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যান এবং স্বীয় প্রতাপ ও ক্ষমতার বলে কাফিরদেরকে উল্টো মুখে নিষ্কেপ করেন।

৫৩। তবে কি রাজত্বে তাদের  
জন্যে কোন অংশ রয়েছে?

বস্তু তঃ তখন তারা  
লোকদেরকে খর্জুর কণাও  
প্রদান করবে না।

— ৫৩ —  
أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنْ

الْمُلْكِ فَإِذَاً لَا يُؤْتُونَ  
النَّاسَ نَقِيرًا لَا  
○

সূরাঃ নিসা ৪

৫৪। তবে কি তারা লোকদের  
প্রতি এ জন্যে হিংসে করে যে,  
আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ  
হতে কিছু দান করেছেন?  
ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি  
ইবরাহীম বংশীয়গণকে গ্রহ্ণ ও  
বিজ্ঞান দান করেছি এবং  
তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্য  
প্রদান করেছি।

৫৫। অনন্তর তাদের মধ্যে  
অনেকেই ওর প্রতি বিশ্বাস  
স্থাপন করেছে এবং অনেকেই  
ওটা হতে বিরত রয়েছে; এবং  
(তাদের জন্যে) শিখা বিশিষ্ট  
জাহানামই যথেষ্ট।

এখানে অস্বীকৃতি সূচক ভাষায় আল্লাহ পাক প্রশ়্ন করেছেনঃ ‘তারা কি  
রাজত্বের কোন অংশের মালিক?’ অর্থাৎ তারা মালিক নয়। অতঃপর তাদের  
কার্পণ্যের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যদি এরূপ হতো তবে তারা কারো কোন  
উপকার করতো না। বিশেষ করে তারা আল্লাহ তা’আলার শেষ নবী (সঃ)-কে  
এতটুকুও দিত না যতটুকু খেজুরের আঁটির মধ্যস্থলে পর্দা থাকে। যেমন অন্য  
আয়াতে আছে

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيِّ إِذَا لَامْسَكْتُمْ خَشِبَةَ الْإِنْفَاقِ  
অর্থাৎ ‘তুমি বল-যদি তোমরা আমার প্রভুর করুণা ভাণ্ডারের অধিকারী হতে  
তবে তোমরা খরচ হয়ে যাবার ভয়ে (খরচ করা হতে)সম্পূর্ণরূপে বিরত  
থাকতে।’ (১৭: ১০০) এটা স্পষ্ট কথা যে, এতে সম্পদ কমে যেতে পারে না,  
তথাপি কৃপণতা তোমাদেরকে ভয় দেখিয়ে থাকে। এজন্যেই আল্লাহ তা’আলা  
বলেন যে, মানুষ বড়ই কৃপণ। তাদের কার্পণ্যের বর্ণনা দেয়ার পর তাদের হিংসার  
বর্ণনা দেয়া হচ্ছে- আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে যে বড় নবুওয়াত দান করেছেন

٥٤- أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ  
مَا أَتَنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
فَقَدْ أَتَانَا أَلَّا بِإِرْهِيمَ  
الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَاتَّبَعْنَاهُمْ  
مَلْكًا عَظِيمًا ۝

٥٥- فَمِنْهُمْ مَنْ أَمْنَ بِهِ وَمِنْهُمْ  
مَنْ صَدَ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ  
سَعِيرًا ۝

এবং তিনি যেহেতু আরবের অন্তর্ভুক্ত, বানী ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত নন সেহেতু তারা হিংসায় জুলে যাচ্ছে ও জনগণকে তাঁর সত্যতা স্বীকার করা হতে বিরত রাখছে।

হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) বলেনঃ ‘এখানে ﴿أَنَّا سَمِعْنَا﴾-এর ভাবার্থ হচ্ছে আমরা, অন্য কেউ নয়।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন-‘আমি ইবরাহীমের বৎশধরকে নবুওয়াত দিয়েছিলাম যারা ছিল বানী ইসরাইল গোত্র এবং হ্যরত ইবরাহীমের সন্তানদেরই অন্তর্ভুক্ত। আমি তাদের উপর গ্রস্ত অবতীর্ণ করেছি, রীতি-নীতি শিক্ষা দিয়েছি এবং রাজত্বও দান করেছি। তথাপি তাদের মধ্যে অনেক মুমিন থাকলেও অনেক কাফিরও ছিল। তারা নবী ও কিতাবকে মেনে নেয়নি। নিজেরা তো স্বীকার করেইনি, এমনকি অন্যদেরকেও বিরত রেখেছিল। অথচ ঐ সব নবী (আঃ) বানী ইসরাইল ছিল। কাজেই তারা যখন নিজেদের নবীদেরকেই অস্বীকার করেছে তখন হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তারা তোমাকে যে অস্বীকার করবে এতে আর বিশ্বয়ের কি আছে? কারণ তুমি তো তাদের মধ্য হতে নও।’

আবার ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তাদের মধ্যে কতক লোক শেষ নবী (সঃ)-এর উপর ঈমান এনেছিল এবং কতক লোক ঈমান আনেনি। সুতরাং এ কাফিরেরা তাদের কুফরীর উপর খুবই দৃঢ় রয়েছে এবং সুপথ হতে বহু দূরে সরে পড়েছে।

অতঃপর তাদেরকে তাদের শাস্তির কথা শোনানো হচ্ছে যে, জাহান্নামের আগনে দক্ষিণত হওয়াই তাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের অস্বীকৃতি, অবাধ্যতা, মিথ্যা প্রতিপাদন ও বিরোধিতার এ শাস্তিই যথেষ্ট।

৫৬। নিচয়ই যারা আমার  
নিদর্শনসমূহের প্রতি  
অবিশ্বাসী হয়েছে তাদেরকে  
অবশ্যই আমি অগ্নিকুণ্ডে  
প্রবিষ্ট করবো; যখন তাদের  
চর্ম বিদ্ধ হবে, আমি  
তৎপরিবর্তে তাদের চর্ম  
পরিবর্তিত করে দেবো- যেন  
তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ  
করে, নিচয়ই আল্লাহ  
পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

۵۶- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَتِنَا<sup>۱۱</sup>  
سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلْمًا  
نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنِهِمْ  
جُلُودًا أَغَيْرَهَا لِيَذُوقُوا  
الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا  
حَكِيمًا<sup>۱۲</sup>

৫৭। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন  
করতঃ সৎ কার্যাবলী সম্পাদন  
করেছে, নিশ্চয়ই আমি  
তাদেরকে জানাতে প্রবিষ্ট  
করবো— যার নিম্নে  
শ্রোতৃস্থিনীসমূহ প্রবাহিতা,  
তন্মধ্যে তারা চিরকাল  
অবস্থান করবে; তথায় তাদের  
জন্যে শুক্ষা সহধর্মণীসকল  
রয়েছে; এবং আমি তাদেরকে  
ছায়াশীতল স্থানে প্রবিষ্ট  
করবো।

যারা আল্লাহর নির্দেশাবলী অঙ্গীকার করে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে  
জনগণকে বিদ্রোহী করে তোলে, এখানে তাদেরই শাস্তি ও মন্দ পরিণামের বর্ণনা  
দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে জাহানামের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে এবং সেই  
আগুন তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে নেবে এবং তাদের শরীরের সূক্ষ্ম লোম  
পর্যন্ত জ্বলিয়ে দেবে। শুধু এটাই নয়, বরং এ শাস্তি হবে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী।  
একটি চামড়া পুড়ে গেলে আবার নতুন চামড়া লাগিয়ে দেয়া হবে, যা হবে সাদা  
কাগজের মত। এক একজন কাফিরের শত শত চামড়া হবে এবং প্রত্যেক  
চামড়ার উপর নানা প্রকার পৃথক পৃথক শাস্তি হবে। এক এক দিনে সত্ত্বে  
হাজারবার চামড়া পরিবর্তন করা হবে। অর্থাৎ ঐ লোকগুলোকে বলা হবে—  
'পুনরায় তোমরা ফিরে এসো' তখন এগুলো পুনরায় ফিরে আসবে।

হ্যরত উমার (রাঃ)-এর সামনে এ আয়াতটি পাঠ করা হলে তিনি পাঠককে  
দ্বিতীয়বার পাঠ করে শুনাতে বলেন। পাঠক দ্বিতীয়বার পাঠ করেন। হ্যরত  
মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ 'আমি আপনাকে এর তাফসীর  
শুনাচ্ছি। এক এক ঘন্টায় একশবার করে পরিবর্তন করা হবে।' হ্যরত উমার  
(রাঃ) তখন বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে একপই শুনেছি'  
(তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই প্রভৃতি)

৫৭- وَالَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا  
الصِّلْحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا  
أَزْوَاجٌ مَطْهَرَةٌ وَنَدْخِلُهُمْ ظِلَالًا  
ظَلِيلًا

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, সে সময় হ্যরত কা'ব (রাঃ) বলেছিলেনঃ ‘এ আয়াতের তাফসীর আমার মনে আছে। আমি এটা আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে পাঠ করেছিলাম।’ তখন হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ ‘আচ্ছা বলতো। যদি এটা ঐরূপই হয় যেকুপ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছি তবে তো আমি তা মেনে নেবো, নচেৎ ওর প্রতি কোন জ্ঞানে করবো না।’ তখন হ্যরত কা'ব (রাঃ) বলেনঃ ‘এক ঘন্টায় একশ বিশ বার।’ এটা শুনে হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে এ রকমই শুনেছি।’

হ্যরত রাবী ইবনে আনাস (রাঃ) বলেনঃ ‘পূর্ববর্তী গ্রন্থে লিখা রয়েছে যে, তাদের চামড়া হবে চালিশ হাত ও পঁচাত্তর হাত। আর তাদের পেট এত বড় হবে যে, তাতে পর্বত রাখলেও ধরে যাবে। যখন ঐ চামড়াগুলো আগুনে পুড়ে যাবে তখন অন্য চামড়া এসে যাবে।’ অন্য হাদীসে এর চেয়েও বেশী রয়েছে।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ জাহানামে জাহানামবাসীকে এত বড় করা হবে যে, তার কানের লতি ও কঙ্কের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব হবে সাতশ বছরের পথ। তার চামড়া হবে সন্তরগজ পূরু এবং দাঁত হতে উভদ পাহাড়ের মত। আবার চামড়া হতে ভাবার্থ পোষাকও নেয়া হয়েছে। কিন্তু এটা দুর্বল এবং প্রকাশ্য শব্দের বিপরীত।

এরপর সৎ লোকদের পরিণামের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আদন জাহানে অবস্থান করবে যার নিম্নদেশে স্নোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তাদের ইচ্ছেমত নদীগুলো প্রবাহিত হবে। স্বীয় অট্টালিকায়, বাগানে, পথে মোটকথা যেখানেই তার মন চাইবে সেখানেই নদীগুলো বইতে থাকবে। সবচেয়ে বড় মজার কথা এই যে, এসব নিয়ামত হবে চিরস্থায়ী। এগুলো না নষ্ট হবে, না কিছু ঝাস পাবে, না ধ্বংস হবে না শেষ হবে এবং না ফিরিয়ে নেয়া হবে। আরও থাকবে তাদের জন্যে সুন্দরী হূরগণ, যারা হবে হায়েয়-নেফাস, ময়লা, দুর্গন্ধ এবং অন্যান্য জঘন্য বিশেষণ হতে সম্পূর্ণ পরিত্ব। আর তাদের জন্যে হবে সুদূর প্রসারিত গাছের ছায়া, যা হবে অত্যন্ত আরামদায়ক ও মনোমুক্ষকর।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘জাহানাতে এমন একটি বৃক্ষ থাকবে যার ছায়ায় একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে তবুও তার ছায়া শেষ হবে না। ওটা হচ্ছে ‘শাজারাতুল খুলদ’ (চিরস্থায়ী বৃক্ষ)।’

৫৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ  
তোমাদেরকে আদেশ করছেন  
যে, গচ্ছিত বিষয় ওর  
অধিকারীকে অর্পণ কর; এবং  
যখন তোমরা লোকদের মধ্যে  
বিচার-মীমাংসা কর, তখন  
ন্যায় বিচার করো; অবশ্যই  
আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম  
উপদেশ দান করছেন,  
নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী,  
পরিদর্শক।

- ৫৮ -

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدِوَا  
الْأَمْنِيَّةِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا  
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنَّ  
تَحْكِيمَكُمْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ  
يُعْلَمُ بِمَا يَعْصِمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بِصِيرًا

আল্লাহ তা'আলা গচ্ছিত বিষয় ওর অধিকারীকে অর্পণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। হ্যরত সুমরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে তোমাদের সাথে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে, তুমি তার গচ্ছিত দ্রব্য আদায় কর এবং যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না’। (মুসনাদ-ই-আহমাদ ও সুনান) আয়াতের শব্দগুলো সাধারণ। আল্লাহ তা'আলার সমস্ত হক আদায় করণও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন রোয়া, নামায, কাফ্ফারা, নয়র ইত্যাদি। আর বান্দাদের পরম্পরের সমস্ত হক এর অন্তর্গত। যেমন গচ্ছিত রাখা দ্রব্য ইত্যাদি। সুতরাং যে ব্যক্তি যে হক আদায় করবে না তার জন্য কিয়ামতের দিন তাকে ধরা হবে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করিয়ে দেয়া হবে। এমন কি শিং বিশিষ্ট ছাগল কোন শিং বিহনী ছাগলকে মেরে থাকলে ওর প্রতিশোধও ঘৃহণ করিয়ে দেয়া হবে।’

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ সাক্ষ্য দানের কারণে সমস্ত পাপ মুছে যায়, কিন্তু আমানত মুছে যায় না। যদি কোন লোক আল্লাহর পথে শহীদও হয়ে থাকে তাকেও কিয়ামতের দিন আনয়ন করা হবে এবং বলা হবে- ‘আমানত আদায় কর।’ সে উত্তরে বলবে, ‘এখন তো দুনিয়ায় নেই, সুতরাং আমি আমানত কোথা হতে আদায় করব?’ অতঃপর সে ঐ জিনিস জাহানামের তলদেশে দেখতে পাবে এবং তাকে

বলা হবে—‘ওটা নিয়ে এসো’। সে ওটা তার ক্ষম্বে বহন করে চলতে থাকবে। কিন্তু ওটা পড়ে যাবে এবং সে পুনরায় ওটা নিতে যাবে। অতএব সে ঐ শাস্তিতেই জড়িত থাকবে।

হযরত যাযান (রাঃ) এ বর্ণনাটি শুনে হযরত বারা'র (রাঃ) নিকট এসে বর্ণনা করেন। হযরত বারা' (রাঃ) বলেনঃ “আমার ভাই সত্যই বলেছেন।” অতঃপর তিনি কুরআন কারীমের إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدِّعُ الْأَمْنِيَّةَ إِلَى أَهْلِهَا পাঠ করেন। হযরত ইবনে আবাস (রাঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (রাঃ) বলেন যে, সৎ ও অসৎ উভয়ের জন্যেই এ একই নির্দেশ।

হযরত আবুল আলিয়া (রাঃ) বলেন যে, যে জিনিসের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যা নিষেধ করা হয়েছে ঐসবগুলোই আমানত। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, নারীর নিকট তার লজ্জাস্থান একটি আমানত। হযরত রাবী' ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন, তোমার ও অপরের মধ্যে যে লেন-দেন হয়ে থাকে ঐ সবগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন, ‘ওটাও এর অন্তর্ভুক্ত যে, বাদশাহ দ্বারের দিন নারীদেরকে খুৎবা শুনাবেন।’ এ আয়াতের শান-ই-নযুলে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা জয় করেন এবং শাস্তিভাবে বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করেন তখন তিনি স্বীয় উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করতঃ তাওয়াফ করেন। সে সময় তিনি হাজরে আসওয়াদকে স্বীয় লাঠি দ্বারা স্পর্শ করছিলেন। তারপর তিনি কা'বা গৃহের চাবি রক্ষক হযরত উসমান ইবনে তালহাকে আহবান করেন এবং তার নিকট চাবি যাঞ্জগা করেন। হযরত উসমান ইবনে তালহা (রাঃ) চাবি প্রদানে সম্মত হয়েছেন এমন সময় হযরত আবাস (রাঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল! চাবিটি আমার হাতে সমর্পণ করুন, যেন যমযমের পানি পান করানো ও কা'বা গৃহের চাবি রক্ষণাবেক্ষণ এ উভয় কাজ আমাদের বংশের মধ্যে থাকে। একথা শোনামাত্রই হযরত উসমান ইবনে তালহা (রাঃ) হাত টেনে নেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিতীয়বার চাইলে একই ব্যাপারই ঘটে। তিনি ত্বরিত আমানতের সঙ্গে দিচ্ছি।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বা গৃহের দরজা খুলে দেন। ভেতরে প্রবেশ করে তিনি সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মূর্তি ছিল, যার হাতে শুভাশুভ নিরূপণের তীর ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘আল্লাহ তা'আলা ঐ মুশরিকদেরকে ধ্বংস করুন। এ তীরের

সঙ্গে হয়রত ইবরাহীম (আঃ)-এর কি সম্বন্ধ রয়েছে?" অতঃপর তিনি ঐ সমুদয় জিনিসকে ধ্বংস করে ওদের স্থানে পানি ঢেলে দেন এবং ঐগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেন। অতঃপর তিনি বাইরে এসে কাঁবার দরজার উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেনঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বৃদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার সত্য করে দেখিয়েছেন। তিনি বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সমুদয় সৈন্যকে একক সভাই পরাজিত করেছেন।

অতঃপর তিনি একটি সুদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। সে ভাষণে তিনি এ কথা ও বলেনঃ "অজ্ঞতা যুগের সমস্ত বিবাদ এখন আমার পদতলে দলিত হয়েছে, সেটা মালের বিবাদই হোক বা জানের বিবাদই হোক। হ্যাঁ, তবে বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাজীদেরকে পানি পান করানোর মর্যাদা যাদের ছিল তাদেরই থাকবে।"

এ ভাষণ দানের পর তিনি সবেমাত্র বসেছেন এমন সময় হয়রত আলী (রাঃ) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! চাবিটি আমাকে প্রদান করুন, যেন বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদেরকে যমযমের পানি পান করানোর মর্যাদা এ দু'টোই এক জায়গায় একত্রিত হয়।" কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) চাবিটি তাঁকে দিলেন না। তিনি মাকাম-ই-ইবরাহীমকে কাঁবার ভেতর হতে বের করে কাঁবার দেয়ালের সাথে মিলিয়ে রেখে দেন এবং লোকদেরকে বলেনঃ 'এটাই আমাদের কিবলাহ।'

অতঃপর তিনি তাওয়াফের কাজে লেগে পড়েন। তিনি শুধুমাত্র দু'বার প্রদক্ষিণ করেছেন এমন সময় হয়রত জিব্রাইল (আঃ) অবতীর্ণ হন এবং *رَأَى اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنِيَّةَ إِلَيْ أَهْلِهَا*<sup>১</sup>-এ আয়াতটি পাঠ করতে আরম্ভ করেন। তখন হয়রত উমার (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার মা-বাপ আপনার উপর উৎসর্গ হোক, আমি-এর পূর্বে তো আপনাকে এ আয়াতটি পাঠ করতে শুনিনি।' তখন তিনি হয়রত উসমান ইবনে তালহা (রাঃ) -কে ডেকে তাঁকে চাবিটি দিয়ে দেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ 'আজকের দিন হজ্র পুরা করার দিন এবং উন্নম ব্যবহার করার দিন।' এ উসমান ইবনে তালহা (রাঃ) যাঁর বংশের মধ্যে এখন পর্যন্ত কাঁবাতুল্লাহর চাবি রক্ষিত হয়ে আসছে, তিনি হৃদায়বিয়ার সঙ্গি এবং মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। সে সময় হয়রত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) ও হয়রত আমর ইবনুল আস (রাঃ) মুসলমান হন। তাঁর চাচা উসমান ইবনে তালহা উভদের যুদ্ধে

মুশরিকদের সাথে ছিল, এমনকি তাদের পতাকাবাহক ছিল এবং সেখানই কুফরীর অবস্থায় মারা যায়। মোটকথা প্রসিদ্ধ কথা তো এই যে, এ আয়াতটি এ সম্বন্ধেই অবর্তীর্ণ হয়। এখন এ সম্বন্ধে অবর্তীর্ণ হয়ে থাক আর নাই থাক এর ভুক্ত হচ্ছে সাধারণ। যেমন হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রাঃ) এবং হ্যরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া (রঃ)-এর উক্তি এই যে, এর দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যেক ব্যক্তির আমানত আদায় করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে-‘ন্যায়ের সঙ্গে মীমাংসা কর।’ বিচারকদেরকে সর্বাপেক্ষা বড় বিচারপতির পক্ষ হতে নির্দেশ হচ্ছে-‘কোন অবস্থাতেই তোমরা ন্যায়ের অঞ্চল পরিত্যাগ করো না।’ হাদীস শরীফে রয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা বিচারকের সঙ্গে থাকেন যে পর্যন্ত না সে অত্যাচার করে। যখন সে অত্যাচার করে তখন তা তারই দিকে সমর্পণ করেন। একটি হাদীসে রয়েছেঃ ‘এক দিনের ন্যায় বিচার চল্লিশ বছরের ইবাদতের সমান।’

অতঃপর বলা হচ্ছে-‘গচ্ছিত জিনিস ওর অধিকারীকে’ অর্পণ করার নির্দেশ এবং ন্যায় বিচার করার নির্দেশ ও অনুরূপভাবে শরীয়তের সমস্ত আদেশ ও নিষেধ তোমাদের জন্য উত্তম ও ফলদায়ক, যেসব আদেশ ও নিষেধ আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের প্রতি জারী করে থাকেন।’

আল্লাহ তা‘আলা বলেন-‘তিনি শ্রবণকারী, পরিদর্শক।’ অর্থাৎ তিনি তোমাদের কথাসমূহ শ্রবণকারী এবং তোমাদের কার্যাবলী পরিদর্শনকারী। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হ্যরত উক্বা ইবনে আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখেছি, তিনি **سَمِيعًا بَصِيرًا**-এ আয়াতটি পড়ছিলেন। তিনি বলেন-‘তিনি প্রত্যেক জিনিস পরিদর্শনকারী।’ মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে, হ্যরত আবু ইউনুস (রঃ) বলেন, ‘আমি হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-কে **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُوا الْأَمْنَى إِلَيْ أَهْلِهَا** এ-আয়াতটি পড়তে শুনতে পাই, তিনি **إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا** যে **إِنَّ اللَّهَ يَعْظِمُكُمْ بِإِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا**-এ পর্যন্ত পাঠ করেন এবং স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলি স্বীয় কানের উপর রাখেন ও ওর পার্শ্ববর্তী অঙ্গুলিটি চক্ষুর উপর রাখেন এবং বলেন, এরপই আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আয়াতটি পড়তে শুনছি এবং তিনি এভাবেই অঙ্গুলি দুটি রাখতেন।’ হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী হ্যরত যাকারিয়া (রঃ) বলেন, আমাদের শিক্ষক হ্যরত মুকরী (রঃ) অর্থাৎ আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে ইয়ায়ীদ (রঃ) এভাবেই ইঙ্গিত করে আমাদেরকে এ আয়াতটি পড়ে শুনিয়েছেন। সে সময়

হ্যরত যাকারিয়া (রঃ) তাঁর ডান হাতের বৃন্দাঙ্গুলি তাঁর ডান চোখের উপর রাখেন এবং তার পার্শ্ববর্তী অঙ্গুলি তাঁর ডান কানে রাখেন। অতঃপর তিনি বলেন, ‘একপে !’ (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম) এভাবে ইমাম আবু দাউদও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে হিবানও (রঃ) স্বীয় পুস্তক ‘সহীহ’-এর মধ্যে এটা এনেছেন। ইবনে মিরদুওয়াইও (রঃ) স্বীয় তাফসীরে এটা এনেছেন। এর সনদের মধ্যে আবু ইউনুস যে রয়েছেন তিনি হ্যরত আবু হুরাইরার মাওলা। তাঁর নাম হচ্ছে সালিম ইবনে যুবাইর।

৫৯। হে মুমিনগণ! তোমরা  
আল্লাহর অনুগত হও ও  
রাসূলের অনুগত হও এবং  
তোমাদের অন্তর্গত  
আদেশদাতাগণের; অতঃপর  
যদি তোমাদের মধ্যে কোন  
বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয়  
তবে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে  
প্রত্যাবর্তিত হও— যদি তোমরা  
আল্লাহ ও পরকালের প্রতি  
বিশ্বাস করে থাক; এটাই  
কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর  
পরিসমাপ্তি।

۵۹- يَا بِهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطْبِعُوا  
اللَّهَ وَاطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِ  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي  
شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَوْبِيلًا ۝

সহীহ বুখারী শরীফে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি ছোট নৌবাহিনীতে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে হুয়ায়ফা ইবনে কায়েস (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তাঁর ব্যাপারে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং একজন আনসারীকে তার নেতৃত্ব দান করেন। একদা তিনি সৈন্যদের উপর কি এক ব্যাপারে ভীষণ রাগাভিত হয়ে বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্যের নির্দেশ দেননি?’ তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, ‘তোমরা জ্ঞালানী কাষ্ঠ জমা কর।’ অতঃপর তিনি আগুন আনিয়ে নিয়ে কাষ্ঠগুলো জ্বালিয়ে দেন।

তারপরে তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে এ আগন্তের মধ্যে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলাম। তখন একজন নব্য যুবক সৈন্যদেরকে বলেন, ‘আপনারা অগ্নি হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর নিকট আশ্রয় নিয়েছেন। আপনারা তাড়াতাড়ি করবেন না যে পর্যন্ত না আপনারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর তিনিও যদি আপনাদেরকে আগন্তে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন তবে ওতে প্রবেশ করবেন।’ অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ফিরে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন তিনি বলেনঃ তোমরা যদি আগন্তে প্রবেশ করতে তবে আর কখনও সে আগন্ত হতে বের হতে না। জেনে রেখো, আনুগত্য শুধু আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির কার্যেই রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যেও হাদীসটি হ্যরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। সুনান-ই-আবু দাউদে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘শ্রবণ করা ও মান্য করা মুসলমানের উপর ফরয, তা তার নিকট প্রিয়ই হোক বা অপচন্দনীয়ই হোক, যে পর্যন্ত না (আল্লাহ ও রাসূলের) অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়। যখন অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হবে তখন শ্রবণও করতে হবে না এবং মান্যও করতে হবে না।’

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হ্যরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা শ্রবণ করা ও মান্য করার উপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করি, তাতে আমাদের সন্তুষ্টিই হোক বা অসন্তুষ্টিই হোক, আমরা কঠিন অবস্থাতেই থাকি বা সহজ অবস্থাতেই থাকি এবং যদিও আমাদের উপর অপরকে প্রাধান্য দেয়া হয়, আর আমরা কার্যের যোগ্য ব্যক্তি হতে কার্য ছিনিয়ে না নেই। তিনি বলেন, কিন্তু এই যে, তোমরা স্পষ্ট কুফরী দেখ যার ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত কোন প্রকাশ্য দলীল রয়েছে। (সে সময় তোমাদেরকে শ্রবণও করতে হবে না, মান্যও করতে হবে না)।

সহীহ বুখারী শরীফে হ্যরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা শ্রবণ কর ও মান্য কর যদিও তোমাদের উপর একজন শুন্দু মন্তক বিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাসকে আমীর বানিয়ে দেয়া হয়। সহীহ মুসলিম শরীফে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘আমার বন্ধু (সঃ) আমাকে শ্রবণ করার ও মান্য করার উপদেশ দিয়েছেন যদিও সে একজন ক্রটিযুক্ত হাত-পা বিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাসও হয়’।

সহীহ মুসলিমে হ্যরত উম্মে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছেন-‘যদি তোমাদের উপর একজন ক্রীতদাসকে আমেল বানিয়ে দেয়া হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করে তবে তোমরা তার কথা শ্রবণ করবে ও মান্য করবে।’ অন্য বর্ণনায় ‘কর্তিত অঙ্গ বিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাস’-এ শব্দগুলো রয়েছে। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ ‘আমার পরে সতুরই তোমাদের উপর ভাল আমীর ভাল হুকুম চালাবে এবং মন্দ আমীর মন্দ হুকুম চালাবে। সত্যের অনুরূপ কার্যে তোমরা প্রত্যেকেরই আদেশ শুনবে ও মানবে এবং তাদের পিছনে নামায পড়তে থাকবে। যদি তারা ভাল কাজ করে তবে তাদের জন্যেও মঙ্গল এবং তোমাদের জন্যেও মঙ্গল। আর যদি তারা মন্দ কাজ করে তবে তোমাদের জন্যে মঙ্গল বটে কিন্তু তাদের মন্দ কর্মের প্রতিফল তাদেরকেই ভোগ করতে হবে।’

হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘বানী ইসরাইলের মধ্যে ক্রমাগত একের পর এক নবী আসতে থাকতেন। কিন্তু আমার পরে কোন নবী নেই, বরং খ্লীফা রয়েছে এবং তারা অধিক সংখ্যক হবে।’ জনগণ জিজ্ঞেস করেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন?’ তিনি বলেনঃ ‘প্রথম জনের বায়আত পূর্ণ কর, তারপর তার পরবর্তী জনের বায়আত পূর্ণ কর। তোমরা তাদেরকে তাদের হক পূর্ণভাবে দিয়ে দাও। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে তাদের প্রজাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।’

হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি স্বীয় আমীরের কোন অপচন্দীয় কাজ দেখে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। যে ব্যক্তি দল হতে অর্ধ হাত দূরে সরে যাবে সে অজ্ঞতা যুগের মৃত্যুবরণ করবে।’ (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) -কে বলতে শুনেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি আনুগত্য হতে হাত টেনে নেয় সে কিয়ামতের দিন হজ্জত ও দলীল ছাড়াই আল্লাহ তা‘আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যাবে যে তার কারও বশ্যতা স্বীকার নেই, সে অজ্ঞতার যুগের মৃত্যুবরণ করবে।’ (সহীহ মুসলিম)

সহীহ মুসলিমেই হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আবদ-ই-রাবিল কা'বা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বায়তুল্লাহ শরীফে গিয়ে দেখি যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আস (রাঃ) কা'বা ঘরের ছায়ায় বসে রয়েছেন এবং তথায় একটি জনসমাবেশ রয়েছে। আমিও ঐ সমাবেশের এক পার্শ্বে বসে পড়ি। সে সময় হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, ‘এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমরা এক মজলিসে অবতরণ করি। কেউ তাঁর তাঁবু ঠিক করতে লেগে পড়েন, কেউ স্বীয় তীর গুছিয়ে নেন এবং কেউ অন্য কোন কাজে লেগে পড়েন। এমন সময় হঠাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘোষণাকারী সকলকে ডাক দিয়ে বলেন-‘নামাযের জন্য একত্রিত হোন।’ অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট একত্রিত হই। তখন তিনি বলেনঃ ‘প্রত্যেক নবী (আঃ)-এর উপর আল্লাহ পাক ফরয করেছেন যে, তিনি যেন স্বীয় উম্মতকে তাঁর জানা সমস্ত ভাল কথা শিখিয়ে দেন এবং তাঁর দৃষ্টিতে যা কিছু মন্দ তা হতে যেন তাদেরকে সতর্ক করেন। জেনে রেখো, এ উম্মতের নিরাপত্তার যুগ হচ্ছে এ প্রথম যুগ। শেষ যুগে বড় বড় বিপদ আসবে যা মুসলমানগণ অপছন্দ করবে এবং ক্রমাগত ফির্তনা আসতে থাকবে। একটি হাঙ্গামা উপস্থিত হলে মুমিন মনে করবে যে, তাতেই তার ধ্বংস রয়েছে। ওটা সরে গিয়ে আর একটি ওর চেয়েও বড় গওণগোল আসবে যাতে সে নিজের ধ্বংস অনিবার্য বলে বিশ্বাস করবে। এভাবেই ক্রমাগত হাঙ্গামা, ভয়াবহ পরীক্ষা এবং ভীষণ বিপদ আসতেই থাকবে। সুতরাং যে ব্যক্তি জাহান্নাম হতে দূরে থাকতে ও জান্নাতে অংশ নিতে চায়, সে যেন মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত আল্লাহর উপর ও কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস রাখে। জনগণের সাথে যেন ঐ ব্যবহার করে যা সে নিজের জন্যে পছন্দ করে। জেনে রেখো যে ব্যক্তি ইমামের বায়আত গ্রহণ করলো সে তার হাতের ক্ষমতা এবং অন্তরের ফল তাকে দিয়ে দিল। তখন তার আনুগত্য স্বীকার করা তার উচিত। তখন যদি অন্য কেউ এসে ঐ ক্ষমতা ইমাম হতে ছিনিয়ে নেয়ার ইচ্ছে করে তবে তোমরা তার গর্দান উড়িয়ে দাও।’ আবদুর রহমান (রঃ) বলেন, আমি নিকটে গিয়ে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-কে বলি, আমি আপনাকে আল্লাহ তা'আলার কসম দিয়ে বলছি, আপনি কি স্বয়ং এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনেছেনঃ তখন তিনি তাঁর দু'খানা হাত স্বীয় কান ও অন্তরের দিকে বাঢ়িয়ে দিয়ে বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে এ দু'কানে শুনেছি এবং এ অন্তরে রক্ষিত রেখেছি’। আমি তখন বলি, আপনার চাচাত ভাই হ্যরত মুআ'বিয়া (রাঃ)-কে দেখুন যে, তিনি আমাদেরকে

আমাদের পরম্পরের মাল অন্যায়ভাবে খেতে ও পরম্পর যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন, অথচ আল্লাহ তা'আলা এদু'টো কাজ হতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

يَا يَهَا الَّذِينَ امْنَوْا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا -

অর্থাৎ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা পরম্পর সম্ভিতক্রমে ব্যবসা ব্যতীত অন্যায়ভাবে পরম্পরের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করো না এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যাও করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাশীল।’ (৪: ২৯) এটা শুনে হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। অতঃপর তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের কাজে তোমরা তার আদেশ মান্য কর এবং তাঁর অবাধ্যাতার কোন নির্দেশ দিলে তা মান্য করো না’। এ সম্পর্কে আরও বহু হাদীস রয়েছে।

أَطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَمْرُ مِنْكُمْ -

এ আয়াতের তাফসীরেই হ্যরত সুন্দী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। হ্যরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-কে এর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। ঐ সেনাবাহিনীতে হ্যরত আম্বার ইবনে ইয়াসারও (রাঃ) ছিলেন। ঐ সেনাবাহিনী যে গোত্রের দিকে যাওয়ার ইচ্ছে করেছিলেন সে দিকেই চলছিলেন। রাত্রিকালে তাদের গ্রামের নিকটে তাঁরা শিবির সন্নিবেশ করেন। ঐ লোকগুলো শুষ্ঠুরের মাধ্যমে এ সংবাদ জেনে নেয় এবং ঐ রাত্রেই তারা সবাই গ্রাম হতে পলায়ন করে। শুধুমাত্র একটি লোক রয়ে যায়। সে তার পরিবারের লোককে নির্দেশ দেয়ায় তারা তাদের আসবাবপত্র জমা করে। অতঃপর সে রাত্রির অন্ধকারেই হ্যরত খালিদ (রাঃ)-এর সেনাবাহিনীর মধ্যে চলে আসে এবং ঠিকানা জেনে হ্যরত আম্বার (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়। হ্যরত আম্বার (রাঃ)-কে সে বলে, ‘হে আবুল ইয়াক্যান! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমার সারা গোত্র এখানে আপনাদের আগমন সংবাদ শুনে পলায়ন করেছে। শুধু আমি রয়ে গেছি। তাহলে আগামীকাল কি আমার এ ইসলাম আমার জন্যে উপকারী হবে? যদি আমি উপকৃত না হই তবে আমিও পালিয়ে যাই।’ হ্যরত আম্বার (রাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই তোমার এ ইসলাম দ্বারা

তোমার উপকার লাভ হবে। তুমি পালিয়ে যেয়ো না, ওখানেই থাক।' সকালে হ্যরত খালিদ (রাঃ) আক্রমণ চালান এবং ঐ লোকটি ছাড়া আর কাউকেও পেলেন না। তাকে তিনি মালসহ গ্রেফতার করেন। হ্যরত আম্বার (রাঃ) এ সংবাদ জানতে পেরে হ্যরত খালিদ (রাঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং তাকে বলেন, 'একে ছেড়ে দিন। সে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আমার আশ্রয়ে রয়েছে।' হ্যরত খালিদ (রাঃ) তখন তাঁকে বলেন, 'আপনি তাকে আশ্রয় দেয়ার কে?' এতে উভয় মনীষীর মধ্যে কিছু বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আম্বার (রাঃ)-এর এ আশ্রয় দানকে বৈধ বলে ঘোষণা করেন এবং আগামীতে আমীরের পক্ষ হতে কাউকে আশ্রয় দিতে নিষেধ করে দেন।

আবার দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়ে যায়। এতে হ্যরত খালিদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেন, 'আপনি এ নাক কাটা গোলামকে কিছু বলছেন না? দেখুন তো, সে আমাকে কিরূপ অন্যায় কথা বলছে?' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'হে খালিদ (রাঃ)! হ্যরত আম্বার (রাঃ)-কে মন্দ বলো না। যে আম্বার (রাঃ)-কে গালি দেবে, আল্লাহ পাক তাকে গালি দেবেন। যে ব্যক্তি আম্বার (রাঃ)-এর শক্রতা পোষণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার সঙ্গে শক্রতা পোষণ করবেন। যে ব্যক্তি আম্বার (রাঃ)-কে অভিশাপ দেবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অভিশাপ দেবেন।' হ্যরত আম্বার (রাঃ) ক্রোধে তথা হতে প্রস্থান করেন। হ্যরত খালিদ (রাঃ) তখন দৌড়ে গিয়ে তাঁর (কাপড়ের) অঞ্চল টেনে ধরেন এবং স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও অবশেষে তিনি তাঁকে ক্ষমা করতে সম্মত হন।

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর ও তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই) হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **أُولَئِكَ الْمُرْدَافَا** দ্বারা বোধশক্তি সম্পন্ন ও ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আলেমগণ। বাহ্যিক কথা তো এটাই মনে হচ্ছে, তবে প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ পাকেরই রয়েছে। এ শব্দটি সাধারণ, এর ভাবার্থ 'আমীর' ও 'আলেম' উভয়ই হতে পারে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-

**لَوْلَا يَنْهَا مِنْهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحَبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ أَلْئَمُ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ**

অর্থাৎ 'তাদের আলেমগণ তাদেরকে মিথ্যা কথা বলা হতে এবং সুদ ভক্ষণ হতে নিষেধ করে না কেন?'(৫: ৬৩) অন্য জায়গায় রয়েছে-

فَاسْأُلُوا هُنَّا لِمَ لَمْ يَعْلَمُوا وَنَّ-

অর্থাৎ ‘তোমরা না জানলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর।’ (১৬: ৫৩) সহীহ হাদীসে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আমার আনুগত্য স্বীকারকারী হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারকারী এবং যে আমার অবাধ্য হয়েছে সে আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্য হয়েছে। যে ব্যক্তি আমার নির্বাচিত আমীরের অবাধ্য হয়েছে সে আমারই অবাধ্য হয়েছে।’ সুতরাং এ হলো আলেম ও আমীরগণের অনুগত্য স্বীকারের নির্দেশ। এ আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে- ‘তোমরা আল্লাহ তা‘আলার আনুগত হও’ অর্থাৎ তাঁর কিতাবের অনুসারী হও। ‘আল্লাহ তা‘আলার রাসূলের অনুগত হও’ অর্থাৎ তাঁর সুন্নাতের উপর আমল কর। আর তোমাদের আদেশদাতাদের আনুগত্য স্বীকার কর। অর্থাৎ তাদের ঐ নির্দেশের প্রতি অনুগত হও যেখানে আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য রয়েছে। তারা যদি আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশের বিপরীত কোন আদেশ করে তবে তাদের সে আদেশ মান্য করা মোটেই উচিত নয়। কেননা, এ সময়ে আলেম ও আমীরদের আদেশ মান্য করা হারাম। যেমন ইতিপূর্বে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আনুগত্য শুধু আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির কার্যেই রয়েছে। অর্থাৎ তাদের আনুগত্য রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর নির্দেশের বেষ্টনীর মধ্যে।

মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে এর চেয়েও স্পষ্ট হাদীস রয়েছে। সেখানে হ্যরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্যতার কার্যে আনুগত্য নেই।’ অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন-‘যদি তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হও।’ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সঃ)-এর হাদীসের দিকে ফিরে এসো, যেমন হ্যরত মুজাহিদ (রঃ)-এর তাফসীরে রয়েছে। সুতরাং এখানে স্পষ্ট ভাষায় মহা সম্মানিত আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে যে, যে মাসআলায় মানুষের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, ঐ মাসআলা ধর্মনীতি সম্পর্কীয়ই হোক বা ধর্মের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কীয়ই হোক, এর মীমাংসার জন্যে একটিমাত্র পথ রয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা‘আলার কিতাব ও রাসূল (সঃ)-এর হাদীসকে মীমাংসাকারী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এ দু’টোর মধ্যে যা রয়েছে তাই মেনে নিতে হবে। যেমন কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতের রয়েছে-

وَمَا أَخْتَلَ فَتُمْفِرِّبٌ مِّنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

অর্থাৎ ‘যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ সৃষ্টি কর, ওর ফায়সালা আল্লাহ তা‘আলার নিকট রয়েছে।’ (৪২: ১০) অতএব, কিতাব ও সুন্নাহ যা নির্দেশ দেবে এবং যে মাসআলার উপর সঠিকতার সাক্ষ্য প্রদান করবে ওটাই সত্য এবং অন্য সবই মিথ্যা । কুরআন কারীমে ঘোষণা হচ্ছে সত্যের পরে যা রয়েছে তা শুধু পথভূষ্টতাই বটে ।’ এ জন্যেই এখানেও এ নির্দেশের সাথেই ইরশাদ হচ্ছে ‘যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক ।’ অর্থাৎ যদি তোমরা ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হও তবে যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই এবং যাতে মতভেদ রয়েছে, যে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করা হয়, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর হাদীস দ্বারা এসবের মীমাংসা কর, এ দু’টোর মধ্যে যা রয়েছে তাই মেনে নাও ।’ অতএব, সাব্যস্ত হলো যে, মতভেদী জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মীমাংসার জন্য যারা কিতাব ও সুন্নাহৰ দিকে ফিরে আসে না তারা আল্লাহ তা‘আলার উপর বিশ্বাস রাখে না ।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে-বিবাদসমূহে ও মতভেদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই তোমাদের জন্যে উত্তম এবং এটাই হচ্ছে কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি । এটাই হচ্ছে উত্তম প্রতিদান লাভের কাজ ।

## ৬০। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য

করনি- যারা ধারণা করে যে, তোমার প্রতি যা অবর্তীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবর্তীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা নিজেদের মোকদ্দমা শয়তানের নিকট নিয়ে যেতে চায় যদিও তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল- যেন তাকে অবিশ্বাস করে; এবং শয়তান ইচ্ছে করে যে, তাদেরকে সুদূর বিপদে বিভ্রান্ত করে ।

۶۔-الَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ  
يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ أَمْنَوْا بِمَا أَنْزَلَ  
إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ  
بِرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى  
الْطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمْرَوْا أَنْ  
يَكْفِرُوا بِهِ وَبِرِيدُ الشَّيْطَنِ أَنْ  
يُضْلِلَهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

সূরাঃ নিসা ৪

৬১। আর যখন তাদেরকে বলা  
হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ  
করেছেন তদ্বিকে এবং  
রাসূলের দিকে এসো, তখন  
তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে  
যে, তারা তোমা হতে বিমুখ  
হয়ে বিছিন্ন রয়েছে।

৬২। অনন্তর তখন কিরণ  
হবে-যখন তাদের হস্তসমূহ  
যা পূর্বে থেরণ করেছে,  
তজ্জন্মে তাদের উপর বিপদ  
উপনীত হবে? তখন তারা  
আল্লাহর শপথ করতে করতে  
তোমার দিকে আসবে যে-  
কল্যাণ ও সশ্রিলন ব্যতীত  
আমরা কিছুই কামনা করিনি।

৬৩। তাদের অন্তরসমূহে যা  
আছে, আল্লাহ তা' পরিষ্কার  
আছেন; অতএব তুমি তাদের  
দিক হতে নির্লিপ্ত হও ও  
তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান  
কর এবং তাদেরকে তাদের  
সম্বন্ধে হৃদয়স্পর্শী কথা বল।

٦١- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ  
رَأَيْتُ الْمُنْفِقِينَ يَصْدُونَ عَنْكَ  
صَدُودًا ۝

٦٢- فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ  
مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ  
جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّا أَرْدَنَا  
إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۝

٦٣- أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ  
مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ  
وَعِظِّهِمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ  
قُوْلًا بَلِيغًا ۝

উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন।  
যারা মুখে স্বীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলার পূর্বের সমষ্টি কিতাবের উপর এবং  
এ কুরআন কারীমের উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। কিন্তু যখন কোন  
বিবাদের মীমাংসা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তখন তারা কুরআন মাজীদ  
ও হাদীস শরীফের দিকে প্রত্যাবর্তন করে না, বরং অন্য দিকে যায়। এ আয়াতটি

ঐ দু'ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যাদের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা দিয়েছিল। একজন ছিল ইয়াহুদী এবং অপর জন ছিল আনসারী। ইয়াহুদী আনসারীকে বলছিল, চল আমরা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট হতে এর মীমাংসা করিয়ে নেবো। আনসারী বলছিল চল আমরা কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট যাই। এও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি ঐ মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা বাইরে ইসলাম প্রকাশ করতো বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অজ্ঞতা যুগের আহ্কামের দিকে আকৃষ্ট হতে চাচ্ছিল। এ ছাড়া আরও উক্তি রয়েছে। আয়াতটি স্বীয় আদেশ ও শব্দসমূহ হিসেবে সাধারণ। এ সমুদয় ঘটনা এর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির দুর্নাম ও নিন্দে করছে, যে কিতাব ও সুন্নাহকে ছেড়ে অন্য কোন বাতিলের দিকে স্বীয় ফায়সালা নিয়ে যায়। এখানে এটাই হচ্ছে 'তাগুত'-এর ভাবার্থ। 'শব্দের অর্থ হচ্ছে 'গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়া।' যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَفْيَنَا عَلَيْهِ أَبَا نَا

অর্থাৎ 'যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে-বরং আমরা অনুসরণ করবো ঐ জিনিসের যার উপরে আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি।' (২৪: ১৭০) মুমিনদের এ উত্তর হতে পারে না। বরং তাদের উত্তর অন্য আয়াতে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে-

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاطَّعْنَا

অর্থাৎ 'মুমিনদেরকে যখন তাদের মধ্যে ফায়সালার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের এ উত্তরই হয় যে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।' (২৪: ৫১)

এরপর মুনাফিকদেরকে নিন্দে করা হচ্ছে যে, হে নবী (সঃ)! যখন তারা তাদের পাপের কারণে বিপদে পড়ে এবং তোমার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তখন তারা দৌড়িয়ে তোমার নিকট আগমন করে এবং ওয়র পেশ করতঃ শপথ করে করে বলে- 'আমরা কল্যাণ ও সম্মিলন ব্যতীত কিছুই কামনা করিনি এবং আপনাকে ছেড়ে আমাদের মোকদ্দমা অন্যের নিকট নিয়ে যাওয়ার আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের মন যোগানো ও তাদের সাথে বাহ্যিক মিল রাখা। তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক আস্থা মোটেই নেই।' যেমন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে বলেন: فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ  
পর্যন্ত। অর্থাৎ পর্যন্ত।

‘যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তুমি তাদেরকে (মুনাফিকদেরকে) দেখবে যে, তারা তাদের (ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান) সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের সর্বপ্রকারের চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং বলবে- আমাদের বিপদে পড়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে, সুতরাং খুব সম্ভব আল্লাহ বিজয় আনয়ন করবেন অথবা নিজের কোন হৃকুম জারী করবেন এবং এর ফলে তারা তাদের অন্তরে লুকায়িত উদ্দেশ্যের কারণে লজ্জিত হবে।’ (৫: ৫২)

হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) বলেন যে, আবু বারয়া আসলামী ছিল একজন যাদুকর। ইয়াহুদীরা তাদের কতক মোকদ্দমার মীমাংসা তার দ্বারা করিয়ে নিত। একটি ঘটনায় মুশরিকেরাও তার নিকট দৌড়িয়ে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে <sup>الْمَرْءُ</sup> হতে <sup>إِنْ أَرْدَنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا</sup> পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এরপর বলা হচ্ছে- এ প্রকারের লোকের অর্থাৎ মুনাফিকদের অন্তরে কি রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন। তাঁর নিকট ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কোন জিনিসও গুপ্ত নয়। তিনি তাদের ভেতরের ও বাইরের সব খবরই রাখেন। সুতরাং হে নবী (সঃ)! তুমি তাদের দিক হতে নির্লিপ্ত থাক এবং তাদেরকে তাদের অন্তরের খারাপ উদ্দেশ্যের কারণে শাসন-গর্জন করো না। তারা যেন কপটতা দ্বারা অন্যদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি না করে তজ্জন্যে তাদেরকে সদুপদেশ দিতে থাক এবং তাদের সাথে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় কথা বল ও তাদের জন্যে প্রার্থনাও কর।

## ৬৪। আমি এতদ্যুতীত কোনই

রাসূল প্রেরণ করিনি যে, আল্লাহর আদেশে তাদের আনুগত্য স্বীকার করা হবে, এবং যদি তারা স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট আগমন করতো, তৎপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো আর রাসূল ও তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতেন, তবে নিচয়ই তারা আল্লাহকে তাওবা করুকারী, করণায়ময় আশ্ব হতো।

- ৬৪ -  
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا  
لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنْهُمْ لَدُ  
لَّا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ  
ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ  
فَاسْتغفِرُوا اللَّهَ وَاسْتغفِرْلَهُمْ  
رَسُولُهُمْ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا  
رَحِيمًا

৬৫। অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনও বিশ্বাসস্থাপনকারী হতে পারবে না— যে পর্যন্ত তোমাকে অভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক না করে, তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা শান্তভাবে পরিগ্রহণ করে।

ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক যুগের রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করা তাঁর উদ্ঘতের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফরয হয়ে থাকে। রিসালাতের পদমর্যাদা এই যে, তাঁর সমস্ত আদেশকে আল্লাহ তা'আলার আদেশ মনে করা হবে। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন : ﴿بِإِذْنِ اللّٰهِ﴾—এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, এর ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে এবং তা তার শক্তি ও ইচ্ছের উপরই নির্ভর করে। অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছে ছাড়া কেউ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে পারে না। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ ﴿إِذْ تَحْسُنُهُمْ بِإِذْنِهِ﴾ অর্থাৎ ‘যখন তুমি তাঁর হৃকুমে তাদের উপর জয়যুক্ত হয়েছিলে ।’ (৩: ১৫২) এখানেও ﴿إِذْ﴾ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে তাঁর ক্ষমতা ও ইচ্ছা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য ও পাপীদের প্রতি ইরশাদ করেছেন যে, তারা যেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করতঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটও যেন তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার আবেদন জানায়। তারা যখন একুপ করবে তখন নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবা কবূল করবেন এবং তাদের প্রতি দয়া পরিবশ হয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।

আবু মানসূর আস্সাববাগ্ (রঃ) স্বীয় প্রসিদ্ধ গল্লের পুষ্টকে উৎবীর (রঃ) একটি বর্ণনা নকল করেছেন। উৎবী (রঃ) বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমাধির পার্শ্বে বসেছিলাম। এমন সময় সেখানে এক বেদুঈনের আগমন ঘটে। সে বলে, আস্সালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ (হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)! আমি আল্লাহ তা'আলার ﴿وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا﴾

— ৬৫ —  
 فَلَا وَرِبَّ لَأَيُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ  
 يُحَكِّمُوكُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  
 وَمَمْ لَا يَحِدُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ  
 حَرْجًا مِّمَّا فَضَيَّتْ وَسِلِّمُوا  
 تَسْلِيمًا

- اَنفُسْهُمْ جَاءُوكُمْ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُلَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا  
উক্তি শুনেছি। তাই আমি আপনার সামনে স্বীয় পাপের জন্যে আল্লাহ তা'আলার  
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও আপনার শাফাআত কামনা করছি।' অতঃপর সে নিম্নের  
কবিতাটি পাঠ করেঃ

يَا خَيْرُ مَنْ دُفِنتَ بِالْقَاعِ أَعْظَمُهُ \* فَطَابَ مِنْ طِبِّهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكْمَ  
نَفْسِي الْفِدَاُ لِقَبِيرٍ أَنْ سَاكِنُهُ \* فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

অর্থাৎ 'হে ঐ সবের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি! যাদের অঙ্গগুলো প্রান্তরে প্রোথিত  
হয়েছে এবং সেগুলোর সুবাসে পর্বত ও প্রান্তর সুরভিত হয়েছে। সে কবরের জন্য  
আমার প্রাণ উৎসর্গিত হোক, যে কবরে আপনি অবস্থানকারী। ওতে রয়েছে  
পবিত্রতা, দানশীলতা ও ভদ্রতা।' অতঃপর বেদুইন চলে যায় এবং আমার চোখে  
নিদ্রা চেপে বসে। আমি স্বপ্নে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে যেন বলছেনঃ  
'যাও, ঐ বেদুইনকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপ  
মার্জনা করেছেন।'

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র ও সম্মানিত সত্ত্বার শপথ করে বলছেনঃ  
'কোন ব্যক্তিই ঈমানের সীমার মধ্যে আসতে পারে না যে পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে  
আল্লাহ তা'আলার শেষ নবী (সঃ)-কে ন্যায় বিচারক রূপে মেনে না নেবে এবং  
প্রত্যেক নির্দেশকে, প্রত্যেক মীমাংসাকে, প্রত্যেক সুন্নাতকে, প্রত্যেক হাদীসকে  
গ্রহণযোগ্য রূপে স্বীকার না করবে। আর অন্তর ও দেহকে একমাত্র ঐ রাসূলেরই  
(সঃ) অনুগত না করবে।' মোটকথা, যে ব্যক্তি তার প্রকাশ্য, গোপনীয়, ছোট ও  
বড় প্রতিটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসকে সমস্ত নীতির মূল মনে করবে  
সে হচ্ছে মুমিন। অতএব নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তারা যেন তোমার মীমাংসাকে  
সন্তুষ্টিতে মেনে নেয় এবং স্বীয় অন্তরে যেন কোন প্রকারের সংকীর্ণতা পোষণ  
না করে। তারা যেন সমস্ত হাদীসকেই স্বীকার করে নেয়। তারা যেন না  
হাদীসসমূহকে স্বীকার করা হতে বিরত থাকে, না ঐগুলোকে সরিয়ে দেয়ার  
উপায় অনুসন্ধান করে, না ওর মত অন্য কোন জিনিসকে মর্যাদা সম্পন্ন মনে  
করে, না ঐ গুলো খণ্ডন করে এবং না ঐ গুলো মেনে নেয়ার ব্যাপারে  
তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়।' যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘোষণা করেনঃ 'যাঁর অধিকারে  
আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারে না যে  
পর্যন্ত না সে স্বীয় প্রবৃত্তিকে ঐ জিনিসের অনুগত করে যা আমি আনয়ন  
করেছি।'

সহীহ বুখারী শরীফে হ্যরত উরওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, নর্দমা দিয়ে বাগানে পানি নেয়ার ব্যাপারে একটি লোকের সঙ্গে হ্যরত যুবাইর (রাঃ)-এর বিবাদ হয়। নবী (সঃ) তখন বলেনঃ ‘হে যুবাইর (রাঃ)! তোমার বাগানে পানি নেয়ার পর তুমি আনসারীর বাগানে পানি যেতে দাও।’ তাঁর একথা শুনে আনসারী বলে, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সে আপনার ফুপাতো ভাই তো!’ এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা মুবারক পরিবর্তিত হয় এবং তিনি বলেনঃ ‘হে যুবাইর (রাঃ)! তুমি তোমার বাগানে পানি দেয়ার পর তা বক্ষ রেখো যে পর্যন্ত না সে পানি বাগানের প্রাচীর পর্যন্ত পৌছে যায়। অতঃপর পানি তোমার প্রতিবেশীর দিকে ছেড়ে দাও।’ প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন পদ্ধা বের করেন যাতে হ্যরত যুবাইর (রাঃ)-এর কষ্ট না হয় এবং আনসারীরও প্রশংসন দেওয়া যায়। কিন্তু আনসারী যখন সেটা তার পক্ষে উত্তম মনে করলো না, তখন তিনি হ্যরত যুবাইর (রাঃ)-কে তাঁর পূর্ণ হক প্রদান করলেন। হ্যরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি ধারণা করি যে, ﴿فَلَا وَرِبَّكَ﴾  
‘...’-এ আয়াতটি এ ব্যাপারেই অবর্তীর্ণ হয়। **يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكُ فَيَمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ**

মুসনাদ-ই-আহমাদের একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, এ আনসারী বদরী সাহাবী ছিলেন। অন্য বর্ণনা হিসেবে উভয়ের মধ্যে বিবাদ ছিল এই যে, পানির নালা হতে প্রথমেই ছিল হ্যরত যুবাইর (রাঃ)-এর বাগান এবং তারপরে ঐ আনসারীর বাগান। আনসারী হ্যরত যুবাইর (রাঃ)-কে বলতেন, ‘পানি বক্ষ করবেন না। পানি আপনা আপনি এক সাথে দু’ বাগানেই আসবে।’

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের আর একটি খুব বেশী দুর্বল বর্ণনায় এ আয়াতের শান-ই-নয়ুল এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, দু’ব্যক্তি তাদের বিবাদের মীমাংসার জন্যে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তিনি একটা মীমাংসা করে দেন। কিন্তু মীমাংসা যার প্রতিকূল হয়েছিল সে বলে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মীমাংসার জন্যে আপনি আমাদেরকে হ্যরত উমার (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘ঠিক আছে, তোমরা সেখানেই যাও।’ তারা এখানে আসলে যার অনুকূলে ফায়সালা হয়েছিল সে সমস্ত ঘটনা হ্যরত উমারের নিকট বর্ণনা করে। হ্যরত উমার (রাঃ) অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, ‘এটা সত্য কি?’ সে স্বীকার করে নেয়। হ্যরত উমার (রাঃ) তখন তাদেরকে বলেন, ‘এখানে তোমরা থাম, আমি এসে ফায়সালা করছি।’ তিনি তরবারী নিয়ে আসলেন এবং যে ব্যক্তি বলেছিল, ‘আমাদেরকে হ্যরত উমার (রাঃ) এর নিকট পাঠিয়ে দিন’ তার গর্দান উড়িয়ে দেন। অপর ব্যক্তি এটা দেখেই দৌড়ে পালিয়ে আসে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমি পালিয়ে না আসলে আমার মঙ্গল ছিল না।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ ‘আমি উমার

(রাঃ)-কে একুপ জানতাম না যে, তিনি একুপ বীরত্বপনা দেখিয়ে একজন মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করবেন।' সে সময় এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়। ফলে ঐ ব্যক্তির রক্ত বিফলে যায় এবং হ্যরত উমার (রাঃ)-কে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু এ নিয়ম চালু হয়ে যাওয়া আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। তাই তিনি 'লَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ' (৪: ৬৬) -এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ করেন যা পরে আসছে।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যেও এ বর্ণনাটি রয়েছে যা গারীব ও মুরসাল। ইবনে আবি লাহীআহ নামক বর্ণনাকারী দুর্বল। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন। অন্য সনদের মাধ্যমে বর্ণিত আছে যে, দু' ব্যক্তি তাদের বিবাদ মীমাংসার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়। তিনি হক পছ্টীর পক্ষে মীমাংসা করেন। কিন্তু মীমাংসা যার প্রতিকূলে হয়েছিল সে বলে, 'আমি সম্মত নই।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তুমি কি চাও?' সে বলে, 'আমি হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট যেতে চাই।'

উভয়ে হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট পৌছে। হ্যরত আবু বকর (রাঃ) ঘটনাটি শুনে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে ফায়সালা করেছেন তোমাদের জন্যে ওটাই ফায়সালা।' সে তাতেও সম্মত না হয়ে সঙ্গীকে বলে, 'চল আমরা হ্যরত উমার (রাঃ)-এর নিকট যাবো।' তথায় তারা গমন করেন। তথায় যা সংঘটিত হয় তা উপরে বর্ণিত হয়েছে। (তাফসীর-ই-ইবনে হাফিয আবু ইসহাক)

৬৬। আর আমি যদি তাদের উপর বিধিবদ্ধ করতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা স্বীয় গৃহপ্রাচীর হতে নিষ্কান্ত হও, তবে তাদের অল্ল সংখ্যক ব্যতীত ওটা করতো না এবং যদিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা যদি তারা করতো তবে নিশ্চয়ই ওটা তাদের জন্যে কল্যাণকর ও অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হতো।

۶۶-  
وَلَوْا نَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ  
أَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا  
مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا  
قِلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْا نَهْمَ فَعَلُوا  
مَا يُوْعِظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا  
لَّهُمْ وَاشْدُ تَشْيِتاً

৬৭। এবং তখন আমি তাদেরকে  
অবশ্যই স্বীয় সন্ধান হতে  
বৃহত্তর প্রতিদান প্রদান  
করতাম।

৬৮। এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে  
সরল পথ-প্রদর্শন করতাম।

৬৯। আর যে কেউ আল্লাহ ও  
রাসূলের অনুগত হয়, তবে  
তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে  
যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ  
করেছেন; অর্থাৎ নবীগণ, সত্য  
সাধকগণ, শহীদগণ ও  
সৎকর্মশীলগণ এবং এরাই  
সর্বোত্তম সঙ্গী।

৭০। এটাই আল্লাহর অনুগ্রহ;  
এবং আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট।

٦٧ - وَإِذَا لَاتَّيْنَاهُم مِّنْ لَدُنَّا  
أَجْرًا عَظِيمًا لَا

٦٨ - وَلَهُ دَيْنُهُمْ صَرَاطًا  
مُّسْتَقِيمًا

٦٩ - وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ  
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ  
عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ  
وَالشَّهِادَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسَنَ  
أُولَئِكَ رَفِيقًا

٧٠ - ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ  
وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন— অধিকাংশ লোক একুপ যে, তাদেরকে যদি  
ঐ নিষিদ্ধ কাজগুলো করারও নির্দেশ দেয়া হতো যা তারা এ সময়ে করতে  
রয়েছে তবে তারা ঐ কাজগুলোও করতো না। কেননা, তাদের হীন প্রকৃতিকে  
আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচারণের উপরই গঠন করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ  
তা'আলা এখানে তাঁর ঐ জ্ঞানের সংবাদ দিচ্ছেন যা হয়নি। কিন্তু যদি হতো তবে  
কিরূপ হতো? হ্যরত আবু ইসহাক সাবীঈ (রঃ) বলেন যে, যখন  
”লো আনা কৰিনা“ এ-<sup>১</sup> আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয় তখন একজন অনীয়ী  
বলেছিলেনঃ ‘যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ নির্দেশ দিতেন তবে অবশ্যই  
আমরা তা পালন করতাম। কিন্তু তিনি আমাদেরকে এটা হতে বাঁচিয়ে নিয়েছেন  
বলে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।’ যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথা শুনেন  
তখন তিনি বলেনঃ ‘নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যাদের  
অন্তরে ঈমান মজবুত পর্বত অপেক্ষাও বেশী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।’ (মুসনাদ-ই-  
ইবনে আবি হাতিম)

অন্য সনদে রয়েছে যে, কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) এ কথা বলেছিলেন। সুন্দী (রঃ) বলেন যে, একজন ইয়াতুন্দী হ্যরত কায়েস ইবনে শাম্মাস (রাঃ)-কে গর্ব করে বলেছিলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা আমাদের উপর স্বয়ং আমাদের হত্যা ফরয করেছিলেন এবং আমরা তা পালন করেছিলাম।’ তখন হ্যরত সাবিত (রাঃ) বলেনঃ ‘যদি আমাদের উপর ওটা ফরয করা হতো তবে আমরাও তা পালন করতাম।’ তখন এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘যদি এ নির্দেশ দেয়া হতো হবে তা পালনকারীদের মধ্যে একজন ইবনে উষ্মে আবদও (রাঃ) হতো’। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি পড়ে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রাঃ)-এর দিকে হাত বাড়িয়ে ইঙ্গিত করত বলেনঃ ‘এর উপর আমলকারীদের মধ্যে এও একজন।’

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ যদি এ লোকগুলো আমার আদেশ পালন করতো এবং আমার নিষিদ্ধ জিনিস ও কাজ হতে বিরত থাকতো তবে আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ অপেক্ষা ওটাই তাদের জন্যে উত্তম হতো। এটাই হতো তাদের জন্য কল্যাণকর ও অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত। সে সময় আমি তাদেরকে জান্নাত দান করতাম এবং দুনিয়া ও আখিরাতের উত্তম পথ প্রদর্শন করতাম।’

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশের উপর আমল করে এবং নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকে তাকে আল্লাহ তা‘আলা সম্মানের ঘরে নিয়ে যাবেন এবং নবীদের বক্তুরূপে পরিগণিত করবেন। তারপর সত্য সাধকদের বক্তু করবেন, যাদের মর্যাদা নবীদের পরে। তারপর তাদেরকে তিনি শহীদের সঙ্গী করবেন। অতঃপর সমস্ত মুমিনের সঙ্গী করবেন যাদের ভেতর ও বাহির সুসজ্জিত। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, এরা কতই না পবিত্র ও উত্তম বক্তু!

সহীহ বুখারী শরাফে রয়েছে, হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘প্রত্যেক নবী (আঃ)-কে তাঁর রোগাক্রান্ত অবস্থায় দুনিয়ায় অবস্থানের এবং আখিরাতের দিকে গমনের মধ্যে অধিকার দেয়া হয়।’ যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) রোগাক্রান্ত হন, যে রোগ হতে তিনি আর উঠতে পারেননি তখন তাঁর কঠিন বসে যায়। সে সময় আমি তাঁকে বলতে শুনি, ‘ওদের সঙ্গে যাদের উপর আল্লাহ তা‘আলা অনুগ্রহ করেছেন, যারা নবী, সত্য সাধক, শহীদ ও সৎকর্মশীল। আমি তখন জানতে পারি যে, তাঁকে অধিকার দেয়া হয়েছে’।

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, তাঁর নিম্নের শব্দগুলো এসেছে, ‘হে আল্লাহ! আমি সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বস্তুর সাথে মিলন যাঞ্ছা করছি।’ অতঃপর তিনি এন্থর জগত হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। এ কথা তিনি তিনবার পবিত্র মুখে উচ্চারণ করেন। পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত তাঁর উক্তির ভাবার্থ এটাই।

### এ পবিত্র আয়াতের শানে নয়লঃ

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে, হ্যরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন আনসারী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে অত্যন্ত চিত্তিত দেখে চিন্তার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এখানে তো সকাল সন্ধ্যায় আমরা আপনার খেদমতে এসে উঠা বসা করছি এবং আপনার মুখমণ্ডলও দর্শন করছি। কিন্তু কাল কিয়ামতের দিন তো আপনি নবীগণের সমাবেশে সর্বোচ্চ আসনে উপবিষ্ট থাকবেন। তখন তো আমরা আপনার নিকট পৌছাতে পারবো না! রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন উত্তর দিলেন না। সে সময় হ্যরত জিবরাইল (আঃ) এ আয়াতটি আনয়ন করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন লোক পাঠিয়ে উক্ত আনসারীকে সুসংবাদ প্রদান করেন। এ হাদীসটি মুরসাল সনদেও বর্ণিত আছে, যে সনদটি খুবই উত্তম।

‘হ্যরত রাবী’ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ বলেন, ‘এটা তো স্পষ্ট কথা যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মর্যাদা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন কারীদের বহু উর্ধে। সুতরাং জানাতে যখন এঁরা সব একত্রিত হবেন তখন তাঁদের পরম্পরের মধ্যে কিরণে দেখা সাক্ষাৎ হবে?’ তখন উপরোক্ত আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিম্নমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট নেমে আসবে এবং তারা সব ফুল বাগানে একত্রিত হবে। তারা আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করবে ও তাঁর প্রশংসা করবে। তারা যা চাইবে তাই পাবে এবং তন্মধ্যে সদা তারা আমোদ-আহলাদ করতে থাকবে।’

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলে, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আপনাকে আমার প্রাণ হতে, পরিবার পরিজন হতে এবং সন্তান অপেক্ষাও বেশী ভালবাসি। আমি বাড়ীতে থাকি বটে, কিন্তু আপনাকে শ্রণ করা মাত্র আপনার নিকট আগমন ছাড়া আমি আর ধৈর্য ধারণ

করতে পারি না । অতঃপর এসে আপনাকে দর্শন করি । কিন্তু যখন আমি আমার ও আপনার মৃত্যুর কথা শ্বরণ করি এবং নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, আপনি নবীদের সঙ্গে সুউচ্চ প্রকোষ্ঠে অবস্থান করবেন, তখন আমার ভয় হয় যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ লাভ করলেও আপনাকে হয়তো দেখতে পাবো না ।’ সে সময় উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় । এ বর্ণনাটির আরও ধারা রয়েছে ।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, হ্যরত রাবিআ’ ইবনে কা’ব আসলামী (রাঃ) বলেন, ‘আমি রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে অবস্থান করতাম এবং তাঁকে পানি ইত্যাদি এনে দিতাম । একদা তিনি আমাকে বলেনঃ ‘কিছু যাঞ্জগা কর’ । আমি বলি, জান্নাতে আপনার বন্ধুত্ব যাঞ্জগা করছি । তিনি বলেনঃ ‘এটা ছাড়া অন্য কিছু?’ আমি বলি, এটাও এটাই বটে । তখন তিনি বলেনঃ ‘তা হলে অধিক সিজদার মাধ্যমে তুমি তোমার জীবনের উপর আমাকে সাহায্য কর ।’

মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত আমর ইবনে মুররাতুল জাহনী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেন, ‘আমি সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ মা’বুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল । আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, স্বীয় মালের যাকাত প্রদান করি এবং রম্যানের রোয়া রাখি ।’ তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় অঙ্গুলি উঠিয়ে ইঙ্গিত করতঃ বলেনঃ ‘যে ব্যক্তি এর উপরই মৃত্যবরণ করবে সে কিয়ামতের দিন এভাবে নবীদের সঙ্গে, সত্য সাধকদের সঙ্গে এবং শহীদদের সঙ্গে অবস্থান করবে । কিন্তু শর্ত এই যে, সে যেন পিতা-মাতার অবাধ্য না হয় ।’

মুসনাদ-ই-আহমাদেই রয়েছে, হ্যরত আনাস (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ তা’আলার পথে এক হাজার আয়াত পাঠ করে সে কিয়ামতের দিন ইনশাআল্লাহ নবীদের, সত্য সাধকদের, শহীদদের এবং সৎ কর্মশীলদের সঙ্গে মিলিত হবে । আর এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী ।’ জামেউত তিরমিয়ীর মধ্যে হ্যতর আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বণিক- নবী, সিদ্ধীক ও শহীদের সঙ্গে থাকবে ।’

সহীহ ও মুসনাদ হাদীস গ্রন্থসমূহে সাহাবা-ই-কিরামের একটি বিরাট দল হতে ক্রম পরম্পরায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হন যে একটি গোত্রের সাথে ভালবাসা রাখে কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হয়নি । তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘মানুষ তাদের সঙ্গেই থাকবে যাদেরকে সে ভালবাসতো ।’

হয়রত আনাস (রাঃ) বলেন, ‘মুসলমানেরা এ হাদীস শুনে যত খুশী হয়েছিল এত খুশী অন্য কোন জিনিসে হয়নি। আল্লাহর শপথ! আমার ভালবাসা তো রাসূলুল্লাহ (সঃ), হয়রত আবু বকর (রাঃ) এবং হয়তর উমার (রাঃ)-এর সঙ্গে রয়েছে। তাই, আমি আশা রাখি যে, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে তাঁদের সঙ্গেই উঠাবেন, যদিও আমার আমল তাঁদের মত নয়।’

হয়রত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘জান্নতবাসীরা তাদের অপেক্ষা উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন জন্নাতবাসীদেরকে তাদের প্রাসাদ এরূপ দেখবে যেরূপ তোমরা পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত কোন উজ্জ্বল তারকা দেখে থাক। তাদের মধ্যে বহু দূরের ব্যবধান থাকবে।’ তখন সাহাবীগণ (রাঃ) বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এসব প্রাসাদ তো নবীদের জন্যে নির্দিষ্ট থাকবে। সুতরাং তথায় তো তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ পৌছতে পারবে না।’ তখন নবী (সঃ) বলেনঃ ‘হ্যাঁ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যেসব লোক আল্লাহ তা‘আলা উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করেছে তারাও তথায় পৌছে যাবে।’ (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

হয়রত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন হাবশী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে কিছু প্রশ্ন করার জন্যে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ ‘জিজ্ঞেস কর ও অনুধাবন কর।’ সে বলে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তা‘আলা আপনাদেরকে আকারে, রঙে এবং নবুওয়াতে আমাদের উপর মর্যাদা দান করেছেন। আপনি যাঁর উপর ঈমান এনেছেন আমিও যদি তাঁর উপর ঈমান আনি এবং যেসব নির্দেশ আপনি পালন করেন আমিও যদি তা পালন করি তবে কি আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গ লাভ করবো?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ ‘হ্যাঁ। যে আল্লাহ তা‘আলার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! কৃষ্ণ বর্ণের হাবশী এমন সাদা উজ্জ্বল হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে যে, তার ঔজ্জ্বল্য এক হাজার বছরের পথের দূরত্ব হতেও দৃষ্টিগোচর হবে।’ অতঃপর তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে তার জন্যে আল্লাহ তা‘আলার নিকট অঙ্গীকার রয়েছে এবং যে ব্যক্তি ‘সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহী’ বলে তার জন্যে এক লক্ষ চবিশ হাজার পুণ্য লিখা হয়।’ তখন আর এক ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যখন এত পুণ্য লাভ হবে তখন আমরা ধৰ্মস কিরণে হতে পারি। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘একজন লোক কিয়ামতের দিন এত পুণ্য নিয়ে হায়ির হবে যে, যদি তা কোন পর্বতের উপর রাখা হয় তবে

তার উপর ভারী বোঝা হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মধ্যে একটি নি'আমত দাঁড়িয়ে যাবে এবং ওরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে এ সমুদয় আমল খুবই অল্প রূপ পরিলক্ষিত হবে। হ্যাঁ, তবে আল্লাহ তা'আলা যদি তাকে স্বীয় পূর্ণ করণা দ্বারা ঢেকে দিয়ে জান্নাত দান করেন সেটা অন্য কথা। সে সময় *هُلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا* (১-২০) পর্যন্ত আয়াতগুলো অবর্তীর্ণ হয়। তখন হাবশী বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)। জান্নাতে আপনার চক্ষু যা দেখবে আমার চক্ষুও কি তা দেখতে পাবে?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘হ্যাঁ’। একথা শুনে সে কেঁদে পড়ে এবং এত বেশী ত্রুট্য করে যে, তাতেই তার জীবনলীলা শেষ হয়ে যায়। হ্যারত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, ‘আমি ঐ লোকটির মৃত দেহ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কবরে নামাতে দেখেছি।’ এ বর্ণনাটি গারীব এবং মুনকারও বটে। এর সনদও দুর্বল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ “হতেই অনুগ্রহ ও দান এবং তাঁর বিশেষ করণা, যার কারণে তাঁর বান্দা এত মর্যাদা লাভ করেছে, এটা সে তার কার্যবলে লাভ করেনি। আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন।’ অর্থাৎ হিদায়াত ও তাওফীক লাভের হকদার যে কে তাঁর খুব ভালভাবেই জানা আছে।

৭১। হে মুমিনগণ! তোমরা স্বীয় আত্মরক্ষিকা গ্রহণ কর, তৎপর পৃথকভাবে বহিগত হও অথবা সশ্রিতিভাবে অভিযান কর।

৭২। আর তোমাদের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যে শৈথিল্য করে; অনঙ্গ যদি তোমাদের উপর বিপদ নিপত্তি হয় তবে বলেঃ আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল যে, আমি তখন তাদের সাথে বিদ্যমান ছিলাম না।

يَا يَهَا أَلَّا إِنَّمَا خُذُوا  
- ৭১

حِذْرَكُمْ فَانِفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ  
أِنْفِرُوا جَمِيعًا ○

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لِي بِطِئْنَ  
- ৭২

فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ  
قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُونْ  
مَعْهُمْ شَهِيدًا ○

৭৩। এবং যদি আল্লাহর সন্ধিন  
হতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ  
সম্পদ অবর্তীণ হয় তবে  
এক্ষণভাবে বলে যেন  
তোমাদের মধ্যে ও তার মধ্যে  
কোনই সম্বন্ধ ছিল না— বস্তুতঃ  
যদি আমিও তাদের সঙ্গী  
হ্তাম তবে মহান ফলপ্রদ  
সুফল লাভ করতাম।

৭৪। অতএব যারা ইহকালের  
বিনিময়ে পরকাল ক্রয় করেছে  
তারা যেন আল্লাহর পথে  
সংগ্রাম করে; এবং যে  
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তৎপর  
নিহত অথবা বিজয়ী হয় তবে  
আমি তাকে মহান প্রতিদান  
প্রদান করবো।

٧٣- وَلِئِنْ أَصَابُكُمْ فَضْلٌ مِّنْ  
اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَانَ لَمْ تَكُنْ  
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُوْدَةٌ يُلِتْنَى  
كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفْوَزُ فَوْزًا  
عَظِيمًا ۝

٧٤- فَلَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  
بِالآخِرَةِ وَمَنْ يَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ  
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন সর্বদা  
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ধ্রহণ করে। সদা যেন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থাকে যাতে শক্ররা  
অতি সহজে তাদের উপর জয়যুক্ত না হয়। তারা সব সময় যেন প্রয়োজনীয় অস্ত্র  
প্রস্তুত রাখে, নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে এবং শক্তি দৃঢ় করে। নির্দেশ  
মাত্রাই যেন তারা বীর বেশে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে যায়। ছোট ছোট সৈন্যদলে  
বিভক্ত হয়েই হোক বা সবাই সম্মিলিত হয়েই হোক সুযোগমত তারা যেন যুদ্ধের  
অস্ত্রান্বয় মাত্রাই বেড়িয়ে পড়ে। তারা যেন যুদ্ধের বহু বচন। আবার কখনও  
এর বহু বচন নাই নেই ও আসে।

হয়েরত ইবনে আকবাস (রাঃ)-এর উক্তি অনুসারে ‘فَانْفِرُوا ثُبَّاتٍ’-এর অর্থ হচ্ছে তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বহিগত হও।’ আর ‘أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا’-এর অর্থ হচ্ছে ‘তোমরা সম্মিলিতভাবে বেড়িয়ে পড়।’ মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), সুন্দী (রঃ), কাতাদাহ (রঃ), যহহাক (রঃ), আতা’ আল খুরাসানী (রঃ), মুকাতিল ইবনে হিবান (রঃ) এবং খাসীফ আল জায়ারীও (রঃ) এ কথাই বলেন।

‘وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ يُؤْمِنْ بِيَوْمِ الْحِسْبَانِ’-এ আয়াতটি মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। মুনাফিকদের স্বভাব এই যে, নিজেও তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে এবং অপরকেও যুদ্ধে না যেতে উৎসাহিত করে। যেমন মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের কার্যকলাপ ছিল। আল্লাহ তা‘আলা তাকে অপমানিত করুন।

তাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ তা‘আলার কোন হিকমতের কারণে যদি মুসলমানরা তাদের শক্রদের উপর বিজয় লাভে অসমর্থ হয় বরং শক্ররাই তাদের উপর চেপে বসে এবং মুসলমানদের ক্ষতি হয় ও তাদের লোক শাহাদাত বরণ করে তখন ঐ মুনাফিকরা বাড়িতে বসে ফুলতে থাকে এবং স্বীয় বুদ্ধির উপর গৌরব বোধ করে। তারা তখন তাদের জিহাদে অংশগ্রহণ না করাকে আল্লাহ তা‘আলার দান বলে গণ্য করে। কিন্তু ঐ নির্বোধের বুঝে না যে, ঐ মুজাহিদেরা জিহাদে অংশগ্রহণের ফলে যে পুণ্য লাভ করেছে তা হতে তারা সম্পূর্ণরূপে বধিত রয়েছে। যদি তারাও জিহাদে অংশ নিত তবে মুসলমানদের মত তারাও গায়ী হওয়ার মর্যাদা এবং ধৈর্য ধারণের পুণ্য লাভ করতো অথবা শহীদ হওয়ার গৌরব লাভ করতো। পক্ষান্তরে যদি মুসলমান মুজাহিদগণ আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শক্রদের উপর জয়ী হয় এবং শক্ররা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায় আর এর ফলে মুসলমানেরা যুদ্ধলক্ষ মাল নিয়ে ও দাস-দাসী নিয়ে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে, তবে ঐ মুনাফিকরা চরম দুঃখিত হয় এবং দীর্ঘ নিঃশ্঵াস ফেলে এত হা-হ্তাশ করে ও এমন এমন কথা মুখ দিয়ে বের করে যে, যেন মুসলমানদের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধই ছিল না। তাদের ধর্মই যেন অন্য। তারা তখন বলে, ‘হায়! আমরাও যদি তাদের সঙ্গে থাকতাম তবে আমরাও গনীমতের মাল পেতাম এবং তাদের মত আমরাও দাস-দাসী ও ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে যেতাম।’

মোটকথা, দুনিয়া লাভই তাদের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। সুতরাং যারা ইহকালের বিনিময়ে পরকালকে বিক্রি করে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জিহাদ ঘোষণা করা উচিত। তারা কুফরী ও অবিশ্বাসের কারণে দুনিয়ার সামান্য লাভের বিনিময়ে আখিরাতকে ধ্রংস করেছে। তাই মুনাফিকদের বলা হচ্ছে— হে মুনাফিকের দল! তোমরা জেনে রেখো যে, যারা আল্লাহ তা'আলার পথের মুজাহিদ তারা কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। তাদের উভয় হস্তে লাভু রয়েছে। নিহত হলেও তাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট রয়েছে বিরাট প্রতিদান এবং বিজয়ী বেশে ফিরে আসলেও রয়েছে গন্মিতের মালের বিরাট অংশ।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছেঃ ‘আল্লাহর পথের মুজাহিদের যামিন হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। হয় তিনি তাকে মৃত্যু দান করে জালাতে পৌছিয়ে দেবেন, আর না হয় যেখান হতে সে বের হয়েছে সেখানেই যুদ্ধলক্ষ মালসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন।’

৭৫। তোমাদের কি হয়েছে যে,

তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ  
করছো না? অথচ পুরুষগণ,  
নারীবৃন্দ এবং শিশুদের মধ্যে  
যারা দুর্বল— তারা বলে যে,  
হে আমাদের প্রতিপালক!  
আমাদেরকে অত্যাচারী  
অধিবাসীদের এই নগর হতে  
বহিগত করুন এবং স্বীয়  
সন্ত্রিধান হতে আমাদের  
পৃষ্ঠপোষক ও নিজের নিকট  
হতে আমাদের জন্য  
সাহায্যকারী প্রেরণ করুন।

— ৭৫ —  
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي

سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

وَالْوِلَدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رِبَّنَا

أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

الظَّالِمُونَ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا

مِنْ لِدْنِكَ وِلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا

مِنْ لِدْنِكَ نَصِيرًا

৭৬। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে  
তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম  
করে এবং যারা অবিশ্বাসী  
হয়েছে তারা শয়তানের পথে  
যুদ্ধ করে; অতএব তোমরা  
শয়তানের সুস্বদগণের সাথে  
যুদ্ধ কর; নিচয়ই শয়তানের  
কৌশল দুর্বল।

٧٦- الَّذِينَ أَمْنَوْا يُقَاتِلُونَ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ  
فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَنِ إِنَّ  
كَيْدَ الشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে তাঁর পথে জিহাদের জন্য উদ্বৃদ্ধ করছেন। তিনি তাদেরকে বলছেন- ‘গুটি কয়েক দুর্বল ও অসহায় লোক মকায় রয়েগেছে যাদের মধ্যে নারী ও শিশুরাও রয়েছে। মকায় অবস্থান তাদের জন্যে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তাদের উপর কাফিরেরা নানা প্রকার উৎপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে মুক্ত করে আন। তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছে- ‘হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি এ অত্যাচারীদের গ্রাম হতে অর্থাৎ মক্কা হতে বহিগত করুন।’ মক্কাকে নিম্নের আয়াতেও গ্রাম বলা হয়েছে-

وَكَائِنٌ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرِيرِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ

অর্থাৎ ‘বহু গ্রাম তোমার ঐ গ্রাম অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী ছিল যে গ্রাম অর্থাৎ গ্রামবাসী তোমাকে বের করে দিয়েছে।’ (৪৭: ১৩) ঐ দুর্বল লোকেরা মক্কার কাফিরদের অত্যাচারের অভিযোগ পেশ করছে এবং সাথে সাথে স্বীয় প্রার্থনায় বলছে- ‘হে আমাদের প্রভু! আপনার পক্ষ হতে আপনি আমাদের জন্যে পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী নির্বাচন করুন।’

সহীহ বুখারী শরীফে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘আমি এবং আমার আশ্বা ও ঐ দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।’ অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) المُسْتَضْعِفِينَ (অবস্থাপূর্ণ মানুষ)-এ অংশটুকু পাঠ করে বলেন, ‘আমি ও আমার আশ্বা ঐ লোকদের অন্তর্গত ছিলাম যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুর্বল ও অসহায় করে বেরেছিলেন।’

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘মুমিনগণ আল্লাহ তা’আলার আদেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে থাকে। পক্ষান্তরে কাফিরেরা শয়তানের আনুগত্যের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। সুতরাং মুসলমানদের উচিত যে, তারা যেন আল্লাহ তা’আলার শক্র ও শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করে এবং বিশ্বাস রাখে যে, শয়তানের কলাকৌশল সম্পূর্ণরূপে বৃথায় পর্যবসিত হবে।

### ৭৭। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য

করনি— যাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের হস্তসমূহ সংরক্ষ রাখ এবং নামায প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর। অনন্তর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফরয করে দেয়া হলো তখন তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করে তদ্রাপ মানুষকে ভয় করতে লাগলো বরং তদপেক্ষাও অধিক ভয় এবং তারা বললো— হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করলেন? কেন আমাদেরকে আর কিছুকালের জন্যে অবসর দিলেন না? তুমি বল— পার্থিব সম্পদ অকিঞ্চিতকর এবং ধর্মভীরুগণের জন্যে পরকালই কল্যাণকর; এবং তোমরা খর্জুর বীজ পরিমাণ ও অত্যাচারিত হবে না।

77-**الَّمَّا تَرَى إِلَيَّ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كَفَوا إِيمَانَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّوَّ الزَّكُوْةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فِرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةَ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لَمْ كُتِبْتْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخْرَتْنَا إِلَيْهِ أَجَلَ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِبِّلًا**

৭৮। তোমরা যেখানেই থাক মৃত্যু  
তোমাদেরকে পেয়ে যাবে-  
যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে  
অবস্থান কর; এবং যদি  
তাদের উপর কোন কল্যাণ  
অবতীর্ণ হয় তবে বলে-এটা  
আল্লাহর নিকট হতে এবং  
যদি তাদের প্রতি অমঙ্গল  
নিপত্তি হয় তবে বলে যে,  
এটা তোমার নিকট হতে  
হয়েছে, তুমি বল- সমস্তই  
আল্লাহর নিকট হতে হয়;  
অতএব ঐ সম্প্রদায়ের কি  
হয়েছে যে, তারা কোন কথা  
বুঝবার নিকটবর্তীও হয় না।

৭৯। তোমার নিকট যে কল্যাণ  
উপস্থিত হয় তা আল্লাহর  
সন্ধান হতে এবং তোমার  
উপর যে অমঙ্গল নিপত্তি হয়  
তা তোমার নিজ হতে হয়ে  
থাকে; এবং আমি তোমাকে  
মানবমঙ্গলীর জন্যে রাসূলরূপে  
প্রেরণ করেছি; আর আল্লাহর  
সাক্ষীই যথেষ্ট।

٧٨- أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمْ  
الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ  
مَشِيدٍ وَإِنْ تِصْبِهِمْ حَسَنَةٌ  
يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ  
تِصْبِهِمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ  
عِنْدِكُمْ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
فَمَا لِهُؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا  
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حِدِيثًا ۝

٧٩- مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ  
فِيمَنِ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ  
سَيِّئَةٍ فِيمَنِ نَفِسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ  
لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَىٰ بِاللَّهِ  
شَهِيدًا ۝

ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন মুসলমানরা মকায়  
অবস্থান করছিল তখন তারা ছিল দুর্বল। তারা মর্যাদাসম্পন্ন শহরে বাস করছিল।  
তখন কাফিরদেরই প্রাধান্য বজায় ছিল। মুসলমানরা তাদেরই শহরে ছিল।

কাফিরেরা সংখ্যায় খুব বেশী ছিল এবং যুদ্ধের অন্ত-শস্ত্রও ছিল তাদের অধিক। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেননি। বরং তাদেরকে কাফিরদের অত্যাচার সহ্য করারই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে আরও আদেশ করেছিলেন যে, তিনি যেসব হুকুম আহকাম অবতীর্ণ করেছেন ঐগুলোর উপর যেন তারা আমল করে। যেমন তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত আদায় করে। সাধারণতঃ যদিও তখন তাদের মালের আধিক্য ছিল না তথাপি দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য করা ও তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার নির্দেশ দেন।

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্যে এটাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন যে, তারা যেন এখানে কাফিরদের বিরুদ্ধে অন্ত ধারণ না করে বরং সবর ও ধৈর্যের দ্বারাই যেন কাজ নেয়। আর ওদিকে কাফিররা ভীষণ বীরত্বের সাথে মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের পাহাড় চাপিয়ে দেয়। তারা ছেট-বড় প্রত্যেককেই কঠিন হতে কঠিনতম শাস্তি দিতে থাকে। কাজেই মুসলমানগণ অত্যন্ত সংকীর্ণতার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করছিল। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে যেতো এবং তারা কামনা করতো যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দিতেন।

অবশ্যে যখন তাদেরকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দেয়া হয় তখন মুসলমানরা স্বীয় মাত্বামি, আঘায়-স্বজন সবকে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করে মদীনায় হিজরত করে। তথায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সর্বপ্রকারের সুবিধা ও নিরাপত্তা দান করেন। সাহায্যকারী হিসেবে তারা মদীনার আনসারদেরকে পেয়ে যায় এবং তাদের সংখ্যাও বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাছাড়া তারা যথেষ্ট শক্তি ও অর্জন করে।

তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যুদ্ধ করে। জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হওয়া মাত্রাই কতক লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। জিহাদের কথা চিন্তা করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত এবং স্ত্রীদের বিধিবা হওয়া ও শিশুদের পিতৃহীন হওয়ার দৃশ্য তাদের চেথের সামনে ভেসে উঠে। ভয় পেয়ে তারা বলে উঠে— ‘হে আমাদের প্রভু! এখনই কেন আমাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করলেন? আমাদেরকে আরও কিছুদিন অবসর দিতেন!’ এ বিষয়কেই অন্য আয়াতে নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে:

وَيَقُولُ الَّذِينَ أَمْنَوا لَوْلَا نَزَّلْتَ سُورَةً فَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةً  
مُّحَكَّمَةً وَذِكْرٌ فِيهَا الْقِتَالُ (৪৭: ২০)

এর সংক্ষিপ্ত ভাবর্থ এই যে, মুমিনগণ বলে-(যুদ্ধের) কোন সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় এবং তাতে জিহাদের বর্ণনা দেয়া হয় তখন কৃগু অন্তরবিশিষ্ট লোকেরা চীৎকার করে উঠে এবং ঝঁকুঁশিত করে তোমার দিকে তাকায় এবং ঐ ব্যক্তির মত চক্ষু বন্ধ করে নেয় যে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অচৈতন্য হয়ে থাকে। তাদের জন্যে আফসোস!

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মক্কায় হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, ‘হে আল্লাহর নবী (সঃ)! কুফরীর অবস্থায় আমরা সম্মানিত ছিলাম, আর আজ ইসলামের অবস্থায় আমাদের লাঞ্ছিত মনে করা হচ্ছে।’ তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘আমার উপর আল্লাহ পাকের এ নির্দেশই রয়েছে যে, আমি যেন ক্ষমা করে দেই। সাবধান কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো না।’

অতঃপর মদীনায় হিজরতের পর এখানে যখন জিহাদের আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন লোকেরা বিরত থাকে। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইমাম নাসাই (রঃ), ইমাম হাকিম (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) ও এটা বর্ণনা করেছেন।

হ্যরত সুন্দী (রঃ) বলেন যে, তাদের উপর নামায ও যাকাত ফরয ছিল। তখন তারা আকাঙ্ক্ষা করে যে, জিহাদও যদি ফরয করা হতো!

অতঃপর যখন জিহাদের হৃকুম অবতীর্ণ হয় তখন দুর্বল ঈমানের লোকেরা মানুষকে ঐরূপ ভয় করতে লাগে যেমন আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করা উচিত; বরং তার চেয়েও বেশী ভয় করতে থাকে এবং বলে-‘হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের উপর জিহাদ কেন ফরয করলেন? স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত আমাদেরকে দুনিয়ায় সুখ ভোগ করতে দিলেন না কেন?’ তখন তাদেরকে উত্তর দেয়া হয় যে, দুনিয়ার সুখ ভোগ খুবই অস্থায়ী এবং জান্নাতের তুলনায় খুবই নগণ্যও বটে। আর আখিরাত আল্লাহ তা‘আলাকের জন্য দুনিয়া হতে বহুগুণ উত্তম ও পবিত্র।

হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ইয়াতুন্দীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাদেরকে উত্তরে বলা হয়-‘আল্লাহভীরুদ্দের পরিণাম সূচনা হতে বহুগুণে

উত্তম। তোমাদেরকে তোমাদের কার্যের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। তোমাদের একটি সৎ আমলও বিনষ্ট হবে না। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কারও উপর এক চুল পরিমাণও অত্যাচার হওয়া অসম্ভব। এ বাক্যে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ উৎপাদন করে পরকালের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে জিহাদের উভেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

فُلْ مُسَنَّادٍ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, হ্যরত হাসান বসরী (রঃ)-এ مَتَاعُ الدِّنِيَا قَلِيلٌ আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ ‘আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর সদয় হোন যে দুনিয়ায় এভাবেই থাকে। দুনিয়ার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এ রকমই অবস্থা যেমন একজন নিদিত ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের কোন পছন্দনীয় জিনিস দেখতে পায় কিন্তু চক্ষু খোলা মাত্রই জানতে পারে যে, মূলে কিছুই ছিল না। হ্যরত আবু মুস্তাফা (রঃ)-এর নিম্নের কবিতাংশটি কতই না সুন্দরঃ

وَلَا خَيْرٌ فِي الدِّنِيَا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ \* لَهُ مِنَ اللَّهِ فِي دَارِ الْمَقَامِ نَصِيبٌ

فَإِنْ تَعْجِبْ رِجَالًا فَإِنَّهَا \* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَالزَّوَالُ قَرِيبٌ

অর্থাৎ দুনিয়ায় ঐ ব্যক্তির জন্য কোনই মঙ্গল নেই, যার জন্যে আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোনই অংশ নেই, যদিও দুনিয়া কতক লোককে বিস্ময় বিমুক্ত করে, কিন্তু এটা খুব অল্পই সুখ এবং এর ধ্রংস খুব নিকটবর্তী।

এরপর বলা হচ্ছে-‘তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবেই যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর।’ কোন মধ্যস্থতা কাউকেও এটা হতে বাঁচাতে পারবে না। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ -

অর্থাৎ ‘এর উপর যত কিছু রয়েছে সবই ধ্রংসশীল।’(৫৫: ২৬) আর এক আয়াতে আছেঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ -

অর্থাৎ ‘প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী।’ (৩: ১৮৫) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ -

অর্থাৎ ‘তোমার পূর্বেও আমি কোন মানুষের জন্য চিরস্থায়ী জীবন নির্ধারণ করিনি।’(২১: ৩৪) এগুলো বলার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ জিহাদ করুক আর

নাই করুক একমাত্র আল্লাহ পাকের সত্তা ছাড়া সকলকেই একদিন না একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। প্রত্যেকের জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে এবং প্রত্যেকের মৃত্যুর স্থানও নির্দিষ্ট রয়েছে।

হ্যরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) স্বীয় মরণ শয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেনঃ ‘আল্লাহর শপথ! আমি বহু বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতঃ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছি। তোমরা এসে দেখ যে, আমার শরীরের এমন কোন অঙ্গ নেই যেখানে বল্লম, বর্ণা, তীর, তরবারী বা অন্য কোন অঙ্গের চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আমার ভাগ্যে মৃত্যু লিখা ছিল না বলে আজ তোমরা দেখ যে আমি গৃহ শয্যায় মৃত্যুবরণ করছি। সুতরাং কাপুরুষের দল আমার জীবন হতে যেন শিক্ষা গ্রহণ করে।’

আল্লাহ তা'আলা বলেন- মৃত্যুর থাবা হতে উচ্চতম, সুদৃঢ় এবং সংরক্ষিত দুর্গ ও অট্টালিকাও রক্ষা করতে পারবে না। কেউ কেউ বলেন যে, **‘بِرُوحٍ شَدِيرٍ’** ভাবার্থ হচ্ছে আকাশের বুরুজ। কিন্তু এটা দুর্বল উক্তি। সঠিক কথা এই যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে সুরক্ষিত প্রাসাদাসমূহ। অর্থাৎ মৃত্যু হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যে কোন সুব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক না কেন ওটা নির্ধারিত সময়েই আসবে, একটুও আগে পিছে হবে না। যুহাইর ইবনে আবি সালমা বলেনঃ

**وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنْلِنَهُ \* لَوْ رَامَ اسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلْمٍ**

অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি মৃত্যুর কারণে পলায়ন করে তাকে মৃত্যু পেয়ে বসবেই, যদিও সে সোপানের সাহায্যে আকাশ মার্গেও আরোহণ করে।’

‘**شَكْرِيَّةً مُشَبِّدَةً**’ শব্দটিকে কেউ কেউ ‘তাশদীদ’ সহ বলেছেন এবং কেউ কেউ ‘তাশদীদ’ ছাড়াই বলেছেন। দু’টোরই একই অর্থ। কিন্তু কারও কারও মতে আবার এ দু’টোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মুশাইয়্যাদাহ পড়লে অর্থ হবে সুনীর্ঘ এবং মুশায়াদাহ পড়লে অর্থ হবে চুন দ্বারা সুশোভিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীর -ই-ইবনে জারীর এবং মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে একটি সুনীর্ঘ গল্ল হ্যরত মুজাহিদ (রঃ)-এর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, পূর্ব যুগে একটি স্ত্রীলোক গর্ভবতী ছিল। তার প্রসব বেদনা উঠে এবং সে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে। সে তখন তার পরিচারককে বলে, ‘যাও কোন জায়গা হতে আগুন নিয়ে এসো’। পরিচারক বাইরে গিয়ে দেখে যে, দরজার উপর একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটি পরিচারককে জিজ্ঞেস করে, ‘স্ত্রী লোকটি কি সন্তান প্রসব করেছেন?’ সে বলে, ‘কন্যা সন্তান।’

লোকটি তখন বলে, ‘জেনে রেখ যে, এ মেয়েটি একশ জন পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করবে এবং এখন স্ত্রীলোকটির যে পরিচারক রয়েছে শেষে তার সাথে এ মেয়েটির বিয়ে হবে। আর একটি মাকড়সা তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে।’

এ কথা শুনে চাকরটি সেখান হতে ফিরে যায় এবং ঐ মেয়েটির পেট ফেড়ে দেয়। অতঃপর তাকে মৃতা মনে করে তথা হতে পলায়ন করে। এ অবস্থা দেখে তার মা তার পেট সেলাই করে দেয় এবং চিকিৎসা করতে আরম্ভ করে। অবশ্যে মেয়েটির ক্ষতস্থান ভাল হয়ে যায়। ইতিমধ্যে এক যুগ অতিবাহিত হয়। মেয়েটি ঘৌবনে পদার্পণ করে। সে খুব সুন্দরী ছিল।

তখন সে ব্যভিচারের কাজ শুরু করে দেয়। আর ওদিকে ঐ চাকরটি সমুদ্র পথে পালিয়ে গিয়ে কাজ-কাম আরম্ভ করে দেয় এবং বহু অর্থ উপার্জন করে। দীর্ঘদিন পর প্রচুর ধন-সম্পদসহ সে তার সেই গ্রামে ফিরে আসে। তারপর সে একটি বৃক্ষ স্ত্রীলোককে ডেকে পাঠিয়ে বলেঃ ‘আমি বিয়ে করতে চাই। এ গ্রামের যে খুব সুন্দরী মেয়ে তার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও।’

বৃক্ষ তথা হতে বিদায় নেয়। ঐ গ্রামের ঐ মেয়েটি অপেক্ষা সুন্দরী মেয়ে আর একটিও ছিল না বলে সে তাকেই বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি প্রস্তাব সমর্থন করে এবং বিয়ে হয়ে যায়। সে সব কিছু ত্যাগ করে লোকটির নিকট চলেও আসে। তার ঐ স্বামীকে জিজ্ঞেস করেঃ ‘আচ্ছা বলুনতো, আপনি কে? কোথা হতে এসেছেন এবং কিভাবেই বা এখানে এসেছেন?’ লোকটি তখন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে বলেঃ ‘এখানে আমি একটি স্ত্রীলোকের পরিচারক ছিলাম। তার মেয়ের সঙ্গে একপ কাজ করে এখান হতে পালিয়ে গিয়েছিলাম। বহু বছর পরে এসেছি।’

তখন মেয়েটি বলে, ‘যে মেয়েটির পেট ফেড়ে আপনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। আমি সেই মেয়ে।’ এ বলে সে তাকে তার ক্ষত স্থানের দাগও দেখিয়ে দেয়। তখন লোকটির বিশ্বাস হয়ে যায় এবং মেয়েটিকে বলে, ‘তুমি যখন ঐ মেয়ে তখন তোমার সম্বন্ধে আমার আর একটি কথা জানা আছে। তা এই যে, তুমি আমার পূর্বে একশ জন লোকের সঙ্গে মিলিত হয়েছো।’ মেয়েটি তখন বলে, ‘কথা তো ঠিকই, কিন্তু আমার গণনা মনে নেই।’

লোকটি বলে ‘তোমার সম্বন্ধে আমার আরও একটি কথা জানা আছে। তা এই যে, একটি মাকড়সা তোমার মৃত্যুর কারণ হবে। যা হোক, তোমার প্রতি

আমার খুবই ভালবাসা রয়েছে। কাজেই আমি তোমাকে একটি সুউচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করে দিচ্ছি। তুমি সেখানে অবস্থান করবে। তাহলে সেখানে কোন পোকা-মাকড়ও প্রবেশ করতে পারবে না’।

সে তাই করে। মেয়েটির জন্যে একপই একটি প্রাসাদ নির্মিত হয় এবং সে সেখানেই বাস করতে থাকে, কিছুদিন পর একদা তারা স্বামী-স্ত্রী ঐ প্রাসাদের মধ্যে বসে রয়েছে, এমন সময় হঠাৎ ছাদের উপর একটি মাকড়সা দেখা যায়। ঐ লোক তখন তার স্ত্রীকে বলে, ‘দেখ, আজ এখানে মাকড়সা দেখা গেছে’। ওটা দেখা মাত্রই মেয়েটি বলে, ‘আচ্ছা, এটা আমার প্রাণ নেয় নেবেই কিন্তু আমিই এর প্রাণ নেব।’

অতঃপর সে চাকরকে বলেঃ ‘মাকড়সাটিকে আমার নিকট জ্যান্ত ধরে আন।’ চারকটি ধরে আনে। সে তখন মাকড়সাটিকে স্বীয় পায়ের বৃন্দাঙ্গুলি দিয়ে দলিত করে। ফলে মাকড়সাটির প্রাণ বায়ু নির্গত হয়। ওর দেহের যে রস বের হয় ওরই এক আধ ফেঁটা তার বৃন্দাঙ্গুলির নখ ও মাংসের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। ফলে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং পা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। তাতেই তার জীবনলীলা শেষ হয়ে যায়।

হ্যরত উসমান (রাঃ)-এর উপর বিদ্রোহীগণ যখন আক্রমণ চালায় তখন তিনি বলেনঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মতকে ঐক্যবন্ধ করুন।’ অতঃপর তিনি নিম্নের ছন্দ দু’টি পাঠ করেনঃ

أَرِيَ الْمُوتَ لَا يُبْقِي عَزِيزًا وَلَمْ يَدْعُ \* لِعَادٍ مَلَادًا فِي الْبِلَادِ وَمَرِيعًا  
بَبِيتِ أَهْلِ الْحِصْنِ وَالْحِصْنُ مُغْلَقٌ \* وَيَانِي الْجِبَالَ فِي شَمَارِيْخَهَا مَعًا

হায়রের বাদশাহ সাতেরুনকে পারস্য সমাট সাবুর যুল আলতাফ যে হত্যা করেছিল সে ঘটনাটিও আমরা এখানে বর্ণনা করছি। ইবনে হিশাম বলেছেন যে, সাবুর যখন ইরাকে অবস্থান করছিল সে সময় তার এলাকার উপর সাতেরুন আক্রমণ চালিয়েছিল। এর প্রতিশোধ স্বরূপ সাবুর যখন তার উপর আক্রমণ চালায় তখন সে দুর্গের দরজা বন্ধ করে তাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। দু’বছর পর্যন্ত দুর্গ অবরোধ করে রাখা হয় কিন্তু কোনক্রমেই দুর্গ বিজিত হয় না।

একদা সাতেরুনের নায়িরা নাম্মী এক কন্যা তার পিতার দুর্গে টহল দিচ্ছিল। এমন সময় সাবুরের উপর তার দৃষ্টি যায়। সে সময় সাবুর শাহী রেশমী পোশাক পরিহিত ছিল এবং তার মন্তকে ছিল রাজমুকুট। নায়িরা মনে মনে বলে-তোর

সাথে আমার বিয়ে হলে কতইনা উত্তম হতো! সুতরাং গোপনে তার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে আরম্ভ করে এবং সাবুর ওয়াদা করে যে, যদি এ মেয়েটি তাকে দুর্গ দখল করিয়ে দিতে পারে তবে সে তাকে বিয়ে করবে।

সাতেরুন ছিল বড়ই মদ্যপায়ী। সারারাত তার মদ্যের নেশাতেই কেটে যেতো। মেয়েটি এ সুযোগেরই সম্ভবহার করে। রাতে স্বীয় পিতাকে মদমত্ত অবস্থায় দেখে চুপে চুপে তার শিয়র হতে দুর্গের দরজার চাবিটি বের করে নেয় এবং তার নির্ভরযোগ্য ক্রীতদাসের মাধ্যমে সাবুরের নিকট পৌছিয়ে দেয়। সাবুর তখন ঐ চাবি দিয়ে দুর্গের দরজা খুলে দেয় এবং ভেতরে প্রবেশ করে সাধারণভাবে হত্যাকার্য চালিয়ে যায়।

অবশ্যে দুর্গ তার দখলে এসে যায়। এও বলা হয়েছে যে, ঐ দুর্গে একটি যাদুযুক্ত জিনিস ছিল। ওটা ভাঙ্গতে না পারলে এ দুর্গ জয় করা সম্ভব ছিল না। ঐ মেয়েটিই ওটা ভাঙ্গবার পদ্ধতি বলে দেয় যে, একটি সাদাকালো মিশ্রিত রঙের কবুতর এনে তার পা কোন কুমারী মেয়ের প্রথম ঝাতুর রঙ দ্বারা রঞ্জিত করতে হবে, তারপর কবুতরটিকে ছেড়ে দিলেই ওটা উড়ে গিয়ে ঐ দুর্গের দেয়ালে বসবে। আর তেমনি যাদুযুক্ত জিনিসটি পড়ে যাবে এবং দুর্গের সিংহদ্বার খুলে যাবে।

অতএব সাবুর তাই করে এবং দুর্গ জয় করতঃ সাতেরুনকে হত্যা করে। অতঃপর সমস্ত লোককে তরবারীর নীচে নিষ্কেপ করে এবং সারা শহর ধ্বংস করে দেয়। তারপর সাতেরুনের কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে স্বীয় রাজ্য ফিরে আসে এবং তাকে বিয়ে করে নেয়। একদা রাত্রে মেয়েটি স্বীয় শয্যায় শুয়ে আছে কিন্তু তার ঘূম আসছে না। সে অস্ত্রিতা প্রকাশ করছে। তার এ অবস্থা দেখে সাবুর তাকে জিজ্ঞেস করেঃ ‘ব্যাপার কি?’ সে বলে, ‘সম্ভবতঃ বিছানায় কিছু রয়েছে যে কারণে আমার ঘূমে ধরছে না।’ প্রদীপ জ্বালিয়ে বিছানায় অনুসন্ধান চালানো হলো। অবশ্যে তৃণ জাতীয় গাছের ছেট একটি পাতা পাওয়া গেল।

তার এ চরম বিলাসিতা দেখে সাবুর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো যে, ছেট একটি পাতা বিছানায় থাকার কারণে তার ঘূম আসছে না! তাই তাকে জিজ্ঞেস করলো, ‘তোমার পিতার নিকট তোমার জন্যে কি কি থাকতো?’ সে বললোঃ ‘আমার জন্যে থাকতো নরম রেশমের বিছানা এবং পাতলা নরম রেশমের পোশাক। আর আমি আহার করতাম পায়ের অস্ত্রির মজ্জা এবং পান করতাম

খাঁটি সূরা। এ ব্যবস্থাই আমার আকৰা আমার জন্যে রেখেছিলেন।' মেয়েটি একপ ছিল যে, বাহির হতে তার পায়ের গোছার (গোড়ালির) মজ্জা পর্যন্তও দেখা যেতো।

একথাণ্ডে সাবুরের মনে অন্য এক উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং মেয়েটিকে বলেঃ 'যে পিতা তোমাকে এভাবে লালন পালন করেছে, তুমি তোমার সে পিতার সাথে এ ব্যবহার করেছো যে, আমার দ্বারা তাকে হত্যা করিয়েছো এবং তার রাজ্যকে ছারখার করিয়েছো। কাজেই আমার সঙ্গেও যে তুমি একপ ব্যবহার করবে না তা আমি কিরূপে বিশ্বাস করতে পারি?' তৎক্ষণাত্মে সে নির্দেশ দেয় যে, তার চুলকে ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে ঘোড়াকে লাগামহীন ছেড়ে দেয়া হোক। তাই করা হয়। ঘোড়া নাচতে লাফাতে আরম্ভ করে এবং এভাবে তাকে এ নশ্বর জগৎ হতে চির বিদায় প্রহণ করতে হয়।

আল্লাহপাক বলেন-যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবর্তীণ হয় অর্থাৎ যদি তারা খাদ্যশস্য, ফল, সন্তানাদি ইত্যাদি লাভ করে তবে তারা বলে-'এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে এসেছে।' আর যদি তাদের উপর কোন অঙ্গস্তুল 'নিপত্তি হয় অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, মাল ও সন্তানের স্বল্পতা এবং ক্ষেত্র ও বাগানের ক্ষতি ইত্যাদি পৌছে যায় তখন তারা বলে-'হে নবী (সঃ)! এটা আপনার কারণেই হয়েছে।' অর্থাৎ এটা নবী (সঃ)-এর অনুসরণ এবং মুসলমান হওয়ার কারণেই হয়েছে। ফিরাউনের অনুসারীরাও অঙ্গস্তুলের বেলায় হ্যরত মুসা (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে কু-লক্ষণ বলে অভিহিত করতো। যেমন কুরআন কারীমের এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ

فَإِذَا جَاءُهُمْ الْحَسْنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سِيِّئَةٌ  
يَطِيرُوا بِمُؤْسَى وَمَنْ مَعَهُ -

অর্থাৎ 'যখন তাদের নিকট কোন মঙ্গল পৌছে তখন তারা বলে- এটা আমাদের জন্যই হয়েছে এবং যখন তাদের নিকট কোন অঙ্গস্তুল পৌছে তখন তারা মূসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে কুলক্ষণে বলে থাকে।'(৭ : ১৩১)

আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ

অর্থাৎ 'কতক লোক এমন রয়েছে যারা এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করে থাকে।'(২২: ১১) অতএব এখানেও এ মুনাফিকরা যারা বাহ্যিক মুসলমান

কিন্তু অন্তরে ইসলামকে ঘৃণা করে তাদের নিকট যখন কোন অঙ্গল পৌছে তখন তারা ঝট করে বলে ফেলে যে, এ ক্ষতি ইসলাম গ্রহণের কারণেই হয়েছে। সুন্দী (১০) বলেন যে, এখানে حَسْنَةً শব্দের ভাবার্থ বৃষ্টিপাত হওয়া, গৃহপালিত পশুর আধিক্য হওয়া, ছেলেমেয়ে বেশী হওয়া এবং স্বচ্ছলতা আসা। এসব হলে তারা বলতো-‘এটা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতেই হয়েছে।’ আর যদি এর বিপরীত হতো তবে তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কেই এ জন্যে দায়ী করতো এবং তাঁকে বলতো-‘এটা আপনার কারণেই হয়েছে।’ অর্থাৎ আমরা আমাদের বড়দের আনুগত্য ছেড়ে এ নবী (সঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করেছি বলেই আমরা এ বিপদে পড়েছি।

তাই আল্লাহ পাক তাদের এ অপবিত্র কথা ও জগন্য বিশ্বাসের খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন-‘সবই আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। তাঁর ফায়সালা ও ভাগ্যলিখন প্রত্যেক ভাল-মন্দ, ফাসিক, ফাজির, মুমিন এবং কাফির সবারই উপরেই জারী রয়েছে। ভাল ও মন্দ সবই তাঁর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।’

অতঃপর তিনি তাদের সে উক্তি খণ্ডন করছেন যা তারা শুধুমাত্র সন্দেহ, অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা এবং অত্যাচারের বশবর্তী হয়েই বলে থাকে। তিনি বলেন- তাদের কি হয়েছে যে, কোন কথা বুঝবার যোগ্যতা তাদের মধ্য হতে লোপ পাচ্ছে؟ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ<sup>وَلَا يَمْنَعُهُ شَيْءٌ</sup> সম্পর্কে যে একটি গারীব হাদীস রয়েছে তারও এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।

‘মুসনাদ-ই-বায়্যায়ে’ হ্যরত আমর ইবনে শুয়াইব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন- তাঁর দাদা বলেন, ‘আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বসেছিলাম, এমন সময় কতগুলো লোককে সঙ্গে নিয়ে হ্যরত আবু বকর (রাঃ) এবং হ্যরত উমার (রাঃ) আগমন করেন। তাঁরা উচ্চেংস্বরে কথা বলছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে তাঁরা দু’জন বসে পড়েন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ ‘উচ্চেংস্বরে কিসের আলোচনা চলছিল?’ এক ব্যক্তি বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হ্যরত আবু বকর (রাঃ) বলছিলেন যে, পুণ্য এবং মঙ্গল আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে হয়ে থাকে এবং মন্দ ও অঙ্গল আমাদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।’

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘তুমি কি বলছিলে?’ হ্যরত উমার (রাঃ) বলেন, ‘আমি বলছিলাম যে, দু’টোই আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে’। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ ‘এ তর্ক

প্রথম প্রথম হয়রত জিবরাস্তেল (আঃ) ও হয়রত মিকাইল (আঃ)-এর মধ্যেও হয়েছিল। হয়রত মিকাঈল (আঃ) ঐ কথাই বলেছিলেন যা হয়রত আবু বকর (রাঃ) বলছিল এবং হয়রত জিবরাস্তেল (আঃ) ঐ কথাই বলেছিলেন যা তুমি (হয়রত উমার রাঃ) বলছিলে। তাহলে আকাশবাসীদের মধ্যে যখন মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে তখন পৃথিবীবাসীদের মধ্যে এটা হওয়া তো স্বাভাবিক'।

অতঃপর ইসরাফীল (আঃ)-এর উপর এর মীমাংসার ভার পড়ে যায়। তিনি মীমাংসা করেন যে, ভাল ও মন্দ দু'টোই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই হয়ে থাকে।' অতঃপর তিনি তাঁদের দু'জনকে সম্মোধন করে বলেনঃ 'তোমরা আমার সিদ্ধান্ত শুনে নাও এবং স্মরণ রেখো আল্লাহ তা'আলা যদি স্বীয় অবাধ্যাচরণ না চাইতেন তবে তিনি ইবলিশকে সৃষ্টি করতেন না।'

কিন্তু শায়খুল ইসলাম ইমাম তাকিয়ুদ্দীন আবু আবাস হয়রত ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি মাওয়ু' এবং যেসব মুহাদ্দিস হাদীস পরীক্ষা করে থাকেন তাঁরা সবাই একমত যে, এ হাদীসটি তৈরী করে নেয়া হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্মোধন করে বলছেনঃ অতঃপর এ সম্মোধন সাধারণ হয়ে গেছে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সকলকেই সম্মোধন করে বলছেন— 'তোমাদের নিকট যে কল্যাণ উপস্থিত হয় তা আল্লাহ তা'আলারই অনুগ্রহ, দয়া ও করুণা। আর তোমাদের উপর যে অঙ্গল নিপত্তি হয় তা তোমাদের স্বীয় কর্মেরই প্রতিফল।' যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَمَا أَصَابُكُمْ مِنْ مُصِبَّةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ إِلَيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ۔

অর্থাৎ তোমাদের উপর যে বিপদ পৌছে তা তোমাদের হাত যা অর্জন করেছে তারই কিছুটা প্রতিফল এবং তিনি তোমাদের অধিকাংশ পাপই ক্ষমা করে দেন। (৪২: ৩০) এর ভাবার্থ হচ্ছে— 'তোমার পাপের কারণে'। অর্থাৎ কার্যেরই প্রতিফল।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তির শরীরের সামান্য ছাল উঠে যায় বা তার পদস্থলন ঘটে কিংবা তাকে কিছু কাজ করতে হয়, ফলে শরীর দিয়ে ঘাম বের হয়, ওটাও কোন না কোন পাপের কারণেই হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলা যে পাপগুলো দেখেও দেখেন না এবং ক্ষমা করে থাকেন সেগুলো তো অনেক রয়েছে।" এ মুরসাল হাদীসটির বিষয়বস্তু একটি মুতাসিল সহীহ হাদীসেও রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! মুমিনকে যে দুঃখকষ্ট পৌছে, এমনকি তার পায়ে যে কাঁটা ফুটে সে কারণেও আল্লাহ তা‘আলা তার পাপ মার্জনা করে থাকেন।’ হযরত আবু সালিহ (রঃ) বলেন- **وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سُيئَةٍ فِيمَنْ نَفِسِكَ**- এর ভাবার্থ এই যে, যে অঙ্গল তোমার উপর নিপত্তি হয় তার কারণ হচ্ছে তোমার পাপ। হ্যাঁ, তবে ওটাও ভাগ্যে আল্লাহ তা‘আলাই লিখেছেন।

হযরত মুতরাফ ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, তোমরা তকদীর সম্বন্ধে কি জিজ্ঞেস করছো? তোমাদের জন্যে কি সূরা-ই-নিসার-

**وَإِنْ تُصِبُّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سُيئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ**

-এ আয়াতটি যথেষ্ট নয়! আল্লাহর শপথ! মানুষকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট সমর্পণ করা হয়নি বরং তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাঁরই নিকট তারা ফিরে যাবে। এ উক্তিটি খুবই দৃঢ় ও মজবুত এবং এটা কাদরিয়াহ এবং জাবরিয়াহ সম্প্রদায়ের উক্তিকে চরমভাবে খণ্ডন করেছে। এ তর্ক-বিতর্কের জায়গা তাফসীর নয়।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন- ‘হে নবী (সঃ)! তোমার কাজ হচ্ছে শুধু শরীয়তকে প্রচার করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কাজকে, তাঁর আদেশ ও নিষেধকে মানুষের নিকট পৌছিয়ে দেয়া। আল্লাহ তা‘আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি তোমাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। অনুরূপভাবে তাঁরই সাক্ষ্য এ ব্যাপারেও যথেষ্ট যে, তুমি প্রচারকার্য চালিয়েছো। তোমার ও তাদের মধ্যে যা কিছু হচ্ছে তিনি সব কিছুই দেখেছেন। তারা তোমার সাথে যে অবাধ্যাচরণ ও অহংকার করছে তাও তিনি দেখতে রয়েছেন।

৮০। যে কেউ রাসূলের অনুগত

হয় নিশ্চয়ই সে আল্লাহরই  
অনুগত হয়ে থাকে; এবং যে  
ফিরে যায় আমি তার জন্যে  
তোমাকে রক্ষকরূপে থেরণ  
করিনি।

- ৮ -  
**مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تُولِيَ فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حِفِظًا**

৮১। আর তারা বলে- আমরা অনুগত; কিন্তু যখন তারা তোমার নিকট হতে বের হয়ে যায় তখন তাদের একদল- তুমি যা বল তার বিরুদ্ধে পরামর্শ করে; এবং তারা যা পরামর্শ করে আল্লাহ তা লিপিবদ্ধ করেন; অতএব তাদের প্রতি বিমুখ হও ও আল্লাহর উপর নির্ভর কর; এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হচ্ছে- 'আমার বান্দা ও রাসূল হয়রত মুহাম্মদ (সঃ)-এর যে অনুগত প্রকারাত্তরে সে আমারই অনুগত। তার যে অবাধ্য সে আমারই অবাধ্য। কেননা, আমরা নবী (সঃ) নিজের পক্ষ হতে কিছুই বলে না। আমার পক্ষ হতে তার উপর যে অঙ্গী করা হয় তাই সে বলে থাকে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমাকে যে মানে সে আল্লাহকে মানে এবং যে আমাকে অমান্য করে সে আল্লাহকে অমান্য করে। আর যে আমীরের অনুগত হয় সে আমারই অবাধ্য হয়'। এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন- যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, হে নবী (সঃ)! তার পাপ তোমার উপর নেই। তোমার কাজ তো শুধুমাত্র পৌছিয়ে দেয়া। ভাগ্যবান ব্যক্তি মেনে নেবে এবং মুক্তি ও পুণ্য লাভ করবে। তবে তাদের ভাল কাজের পুণ্য তুমিও লাভ করবে। কেননা, তার পথপ্রদর্শক তো তুমই এবং তার সংকার্যের শিক্ষকও তুমই। আর যে ব্যক্তি মানবে না সে হতভাগা। সে নিজের ক্ষতি নিজেই করবে।

তাদের পাপ তোমার উপর হবে না। কেননা, তুমি বুঝাতে ও সত্যপথ প্রদর্শনে কোন প্রকার ত্রুটি করনি। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অনুগত ব্যক্তি সুপথ প্রাপ্ত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অবাধ্য ব্যক্তি নিজের জীবনেরই ক্ষতি সাধনকারী।

-৮১  
وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا  
بَرُزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَابِفَةٍ  
مِّنْهُمْ غَيْرُ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ مَا يَبْتَغِي  
عَنْهُمْ وَتَوْكِلُ عَلَى اللَّهِ  
وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا

এরপর মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা বাহ্যিকভাবে তো আনুগত্য স্বীকার করছে এবং আনুগত্য প্রকাশ করছে কিন্তু যখনই দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাচ্ছে, এখান হতে চলে গিয়ে নিজের জায়গায় পৌছে তখন এমন হয়ে যায় যে, তাদের রূপ যেন এরূপ ছিলই না। এখানে যা কিছু বলেছিল, রাত্রে গোপনে গোপনে তার সম্পূর্ণ বিপরীত পরামর্শ করতে থাকে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের এ গোপন ষড়যন্ত্র সবই জানেন। তাঁর নির্ধারিত ফেরেশতাগণ তাদের এ কার্যাবলী এবং এসব কথা তাঁর নির্দেশক্রমে তাদের আমলনামায় লিখে নিচ্ছেন।

সুতরাং তাদেরকে ধর্মক দেয়া হচ্ছে যে, তাদের এ চাল-চলন করতই না জঘন্য। তোমাদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট তোমাদের ঐ সব কাজ গুপ্ত নেই। তোমরা তোমাদের ভেতর ও বাহির যখন এক রাখতে পারছো না তখন তোমাদের ভেতর ও বাহিরের সমস্ত সংবাদ যিনি রাখেন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের এ নিকৃষ্ট কাজের জন্যে "কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের স্বভাব "অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন-

وَيَقُولُونَ امْنًا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطْعُنَا

অর্থাৎ 'তারা বলে- আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছি ও আনুগত্য স্বীকার করেছি।'(২৪: ৮৭)

অতঃপর আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ) কে নির্দেশ দিচ্ছেন- তুমি তাদের প্রতি বিমুখ হও; ধৈর্য অবলম্বন কর, তাদের ক্ষমা করে দাও এবং তাদের অবস্থা তাদের নাম করে করে তাদেরকে বলো না। তুমি তাদের হতে সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় থাকো। আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর কর। যে ব্যক্তি তাঁর উপর নির্ভর করে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যান।

৮২। তারা কেন কুরআনের প্রতি

মনঃসংযোগ করে না? আর

যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত

অন্য কারও নিকট হতে হতো

তবে তারা ওতে বহু মতানৈক্য

প্রাপ্ত হতো।

-৮২-  
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ

كَانَ مِنْ عِنْدِنِيْرِ اللّٰهِ

لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ○

৮৩। আর যখন তাদের নিকট  
কোন শাস্তি বা ভীতিজনক  
বিষয় উপস্থিত হয় তখন তারা  
ওটা রটনা করতে থাকে এবং  
যদি তারা ওটা রাসূলের ও  
তাদের আদেশদাতাদের প্রতি  
সমর্পণ করতো তবে তাদের  
মধ্যে তত্ত্বানুসঞ্চিতসুগন্ধ ওটা  
উপলক্ষি করতো, এবং যদি  
তোমাদের প্রতি আল্লাহর  
অনুগ্রহ ও করুণা না হতো  
তবে অঙ্গ সংখ্যক ব্যক্তীত  
তোমরা শয়তানের অনুগমন  
করতে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন কুরআন  
কারীমকে চিন্তা ও গবেষণা সহকারে পাঠ করে। ওটা হতে যেন তারা বিমুখ না  
হয়, অবজ্ঞা না করে। ওর মজবুত রচনা, নৈপুণ্য পূর্ণ নির্দেশাবলী এবং  
বাকচাতুর্য সম্বন্ধে যেন চিন্তা করে। সাথে সাথে এ সংবাদও দিচ্ছেন যে, এ  
পবিত্র গ্রন্থটি মতভেদ ও মতানৈক্য হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। কেননা, এটা মহা  
বিজ্ঞানময় ও চরম প্রশংসিত আল্লাহরই বাণী। তিনি নিজে সত্য এবং অদ্বিতীয়  
তাঁর কালামও সম্পূর্ণ সত্য। যেমন অন্য আয়াতে ঘোষণা করেছেনঃ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفْغَالَهَا

অর্থাৎ 'তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করে না, না তাদের অন্তর  
তালাবন্ধ রয়েছে?' (৪৭ : ২৪)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—'মুশরিক ও মুনাফিকদের ধারণা হিসেবে এ  
কুরআন যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নায়িলকৃত না হতো এবং কারও  
মনগড়া কথা হতো তবে অবশ্যই মানুষ ওর মধ্যে বহু মতভেদ লক্ষ্য করতো।'  
অর্থাৎ মানুষের কথা বৈপরীত্যশূন্য হওয়া অসম্ভব। এটা অবশ্যই হতো যে,  
এখানে কিছু পেতো ওখানে কিছু পেতো, হয়তো এক জায়গায় ওরই বিপরীত

- ৪৩ -  
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ  
أَوِ الْخَوْفِ أَذْاعُوا بِهِ وَلَوْ  
رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَئِ  
الْأَمْرِ مِنْهُمْ لِعِلْمِهِ الَّذِينَ  
يُسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا  
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ  
لَا تَبْعَثُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًاً

কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এ পবিত্র গ্রন্থের এসব ক্রটি হতে মুক্ত হওয়া এরই পরিষ্কার দলীল যে, এটা আল্লাহ্ পাকেরই বাণী। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞানে পরিপক্ষ আলেমদের কথা বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলে, আমরা এগুলোর উপর ঈমান এনেছি, এগুলো সবই আমাদের প্রভুর পক্ষ হতে আগত। অর্থাৎ স্পষ্ট আয়াত ও অস্পষ্ট আয়াত সবই সত্য। এ জন্যই তারা অস্পষ্ট আয়াতগুলোকে স্পষ্ট আয়াতগুলোর দিকে ফিরিয়ে থাকে এবং এর ফলে তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা স্পষ্ট আয়াতগুলো অস্পষ্ট আয়াতগুলোর দিকে ফিরিয়ে থাকে এবং এর ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম প্রকারের লোকদের প্রশংসা করেছেন এবং দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের নিন্দা করেছেন।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হ্যরত আমর ইবনে শুয়াইব (রাঃ) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁর দাদা বলেনঃ আমি এবং আমার ভাই এমন এক সমাবেশে বসেছিলাম যা আমার নিকট এত প্রিয় ছিল যে, আমি একটি লাল বর্ণের উট পেলেও এমজলিসের তুলনায় ওটাকে নগণ্য মনে করতাম। আমরা এসে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরজার উপর কয়েকজন মর্যাদাবান সাহাবী (রাঃ) দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমরা ভদ্রতা রক্ষা করে এক দিকে বসে পড়ি। তথায় কুরআন মাজীদের কোন আয়াত নিয়ে আলোচনা চলছিল এবং তাঁদের মধ্যে কিছু মতান্বেক্য দেখা দিয়েছিল। অবশেষে কথা বেড়ে যায় এবং তাঁরা পরম্পর উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটা শুনতে পেয়ে কুপিত অবস্থায় বাইরে আগমন করেন এবং তাঁর চেহারা মুবারক রক্ত বর্ণ ধারণ করেছিল। তাঁদের উপর মাটি নিষ্কেপ করতঃ বলেনঃ ‘তোমরা নীরবতা অবলম্বন কর। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা তাদের নবীদের উপর মতান্বেক্য আনয়ন করেছিল এবং আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াতকে অপর আয়াতের বিপরীত বলেছিল। জেনে রেখো যে, কুরআন মাজীদের কোন আয়াত অপর আয়াতের সত্যতা প্রতিপাদন করে। তোমরা যেটা জান তার উপর আমল কর এবং যেটা জাননা সেটা যারা জানে তাদের উপর ছেড়ে দাও।’

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, সাহাবা-ই-কিরাম তাকদীর সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ ‘যদি আমি এ সমাবেশে না বসতাম!’ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি দুপুরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারের উপস্থিত হই। আমি বসে রয়েছি এমন সময় দুটি লোকের মধ্যে

একটি আয়াতের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং কঠিন উচ্চ হতে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের ধ্বংসের একমাত্র কারণই ছিল আল্লাহ তা‘আলার কিতাবে তাদের মতভেদ সৃষ্টি করা’। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)

এরপর ঐ তাড়াছড়োকারীদেরকে বাধা দেয়া হচ্ছে যারা কোন নিরাপত্তা বা ভয়ের সংবাদ পাওয়া মাত্রই সত্যাসত্য যাচাই না করেই এদিক হতে ওদিক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকে। অথচ ওটা সম্পূর্ণ ভুল সংবাদ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। সহীহ মুসলিম শরীফের ভূমিকায় হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘মানুষকে মিথ্যাবাদী বলার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বর্ণনা করে।’ সুনান-ই-আবু দাউদের মধ্যেও এ বর্ণনাটি রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হ্যরত মুগীরা ইবনে শু’বা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) **وَ قَبْلَ** হতে নিষেধ করেছেন এবং **বলেছেনঃ** অর্থাৎ ‘লোকেরা যেসব কথা বলে থাকে এরপ বহু কথা সত্যাসত্য যাচাই ও চিন্তা ভাবনা না করেই যে ব্যক্তি বর্ণনা করে থাকে।’

সুনান-ই-আবি দাউদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি কোন কথা বর্ণনা করে এবং সে ধারণা করে যে, ওটা যথার্থ নয় সেও মিথ্যাবাদীদের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী।’ এখানে আমরা হ্যরত উমার (রাঃ)-এর হাদীসটি বর্ণনা করছি যার বিশুদ্ধতার উপর মতোক্য রয়েছে। যখন তিনি শুনেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সহধর্মীগণকে তালাক দিয়েছেন। তখন তিনি স্বীয় বাড়ী হতে বের হয়ে এসে মসজিদে প্রবেশ করেন। এখানেও তিনি জনগণকে একথাই বলতে শুনেন। সুতরাং স্বয়ং তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘আপনি কি আপনার সহধর্মীগণকে তালাক দিয়েছেন?’ তিনি বলেনঃ ‘না।’ তখন তিনি-‘আল্লাহ আকবার’ পাঠ করেন। হাদীসটি দীর্ঘতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, অতঃপর তিনি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচৈরঃব্রহ্মে ঘোষণা করেনঃ ‘হে জনমগুলী! রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর পত্নীগণকে তালাক দেননি।’ সে সময় এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়। হ্যরত উমার (রাঃ) এ ব্যাপারে তত্ত্ব অনুসন্ধান করেছেন। সুতরাং তিনি তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের মধ্যে একজন। কোন জিনিসকে ওর ঠিকানা ও আগার হতে বের করাকে **استبطاط** বলা

হয়। যখন লোক খনি খনন করে ওর মধ্যে হতে কোন জিনিস বের করে তখন আরববাসীরা **إِسْتَبْطَلُّ** এ কথা বলে থাকেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-'যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হতো তবে অল্ল সংখ্যক ব্যতীত অর্থাৎ পূর্ণ মুমিন ব্যতীত তোমরা শয়তানের অনুসারী হয়ে যেতে।' এরূপ স্থলে এ অর্থও হয় যে, তোমরা সবাই শয়তানের অনুসারী হয়ে যেতে। আরবী কবিতাতেও এ অর্থের ব্যবহার দেখা যায়।

৮৪। অতএব আল্লাহর পথে

যুদ্ধকর; তোমার নিজের ছাড়া তোমার উপর অন্য কোন ভার অর্পণ করা হয়নি এবং বিশ্বাসীদেরকে উদ্বৃক্ষ কর; অচিরেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সংগ্রাম প্রতিরোধ করবেন; এবং আল্লাহ সংগ্রামে সুদৃঢ় ও শাস্তি দানে কঠোর।

৮৫। যে কেউ সৎ সুপারিশ করবে সে ওর দরুন অংশ পাবে এবং যে কেউ অসৎ সুপারিশ করবে সে ওর দরুন অংশ প্রাপ্ত হবে; এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিদাতা।

৮৬। আর যখন তোমরা শুভাশিষ্যে সম্ভাষিত হও, তবে তোমরাও তা হতে শ্রেষ্ঠতর শুভ সম্ভাষণ কর অথবা ওটাই প্রত্যর্পণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

٨٤- فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا

تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحْرِضِ  
الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ  
يَكْفَ بِأَسْ أَذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ  
أشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنْكِيلًا

٨٥- مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً

يَكْنَ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ  
يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكْنَ لَهُ  
كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ مَقِيتًا

٨٦- وَإِذَا حِسِّيْتُمْ بِتَحْيَةٍ فَحِيْوا

بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رَدُّوهَا إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
حَسِّيْبًا

৮৭। আল্লাহ- তিনি ব্যতীত কেউ  
মা'বুদ নেই; নিশ্চয়ই এতে  
সন্দেহ নেই যে, তিনি  
তোমাদেরকে একত্রিত  
করবেন; এবং বাক্যে আল্লাহ  
অপেক্ষা কে বেশী  
সত্যপরায়ণ!

٨٧-**اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**  
**لِيَجْمَعُنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ**  
**لَا رَبَّ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ**  
**اللَّهِ حِدِيثًا** ﴿٦﴾

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে তিনি যেন, নিজেই আল্লাহ তা'আলার পথে যুদ্ধ করেন, যদিও কেউ তাঁর সাথে যোগ না দেয়। হ্যরত আবু ইসহাক (রঃ) হ্যরত বারা' ইবনে আযিব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘যদি কোন মুসলমান একাই থাকে এবং শক্ররা একশ জন হয় তবে কি মুসলমানটি তাদের সঙ্গে জিহাদ করবে?’ তিনি বলেনঃ হ্যাঁ।

তখন হ্যরত আবু ইসহাক (রঃ) বলেনঃ কিন্তু কুরআন কারীমের নিম্নের আয়াত দ্বারা এর নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

**وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ**

অর্থাৎ ‘তোমরা নিজেদের হাতে ধ্বংসের মধ্যে নিষ্কিঞ্চ হয়ো না।’ (২:১৯৫) হ্যরত বারা' (রাঃ) তখন বলেনঃ শুন, আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ ‘তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর; তোমার নিজের ছাড়া তোমার উপর অন্য কোন ভার অর্পণ করা হয়নি এবং মুমিনদেরকে উদ্ধৃত কর’। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)

মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে এটুকু বেশীও রয়েছে, মুশরিকদের উপর একাই আক্রমণকারী নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিষ্কেপকারী নয়, বরং এর ভাবার্থ হচ্ছে আল্লাহর পথে খরচ করা হতে নিজের হাতকে বাধাদানকারী। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)-কে বলেনঃ ‘আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন সুতরাং তোমরাও জিহাদ কর।’ এ হাদীসটি দুর্বল।

এরপর বলা হচ্ছে-মুমিনদের মধ্যে সাহস জাগিয়ে তোল এবং তাদেরকে জিহাদের জন্যে উদ্ধৃত কর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)

যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের ব্যুহ ঠিক করতে করতে বলেনঃ “তোমরা এই জান্নাতের দিকে দাঁড়িয়ে যাও যার প্রস্তু হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সমান।” জিহাদের জন্যে উদ্বৃদ্ধ করার বহু হাদীস রয়েছে।

সহীহ বুখারী শরীফে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, নামায প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত দেয় এবং রম্যানের রোগ্য রাখে, আল্লাহর উপর (তার) এ হক রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন, সে আল্লাহর পথে হিজরতই করুক বা স্বীয় জন্মভূমিতে বসেই থাকুক।’ তখন সাহাবীগণ বলেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)। আমরা লোকদেরকে কি এ শুভ সংবাদ শুনিয়ে দেবো না?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ ‘জেনে রেখো, জান্নাতে একশটি সোপান রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে এক একটি সোপানের উচ্চতা আকাশ ও পৃথিবীর উচ্চতার সমান। এ সোপানগুলো আল্লাহ তা‘আলা এই লোকদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। অতএব তোমরা জান্নাত যাঞ্চা করলে ফিরদাউস জান্নাত যাঞ্চা করো। ওটাই হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। ওর উপরই রহমানের আরশ রয়েছে এবং ওটা হতেই জান্নাতের নদীগুলো প্রবাহিত হয়।’

সহীহ মুসলিমে হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘হে আবু সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রভুরূপে, ইসলামকে ধর্মরূপে এবং মুহাম্মদ (সঃ)-কে রাসূল ও নবীরূপে মেনে নিতে সম্মত হয়েছে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব।’ এতে হ্যরত আবু সাঈদ (রাঃ) বিশ্বিত হয়ে বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এর পুনরাবৃত্তি করুন।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় ওটা বর্ণনা করে বলেনঃ ‘আর একটি আমল রয়েছে যার কারণে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দার দরজা একশঙ্গ উঁচু করে দেন। এক দরজা হতে অন্য দরজার উচ্চতা আকাশ ও পৃথিবীর উচ্চতার সমান।’ তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই আমলটি কি?’ তিনি বলেনঃ ‘আল্লাহর পথে জিহাদ।’

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! যখন তুমি জিহাদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে তখন মুসলমানেরাও তোমার শিক্ষার কারণে জিহাদের জন্যে প্রস্তুত হবে এবং আল্লাহর সাহায্য তোমাদের সঙ্গেই থাকবে। সত্ত্বরই আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের সংগ্রাম প্রতিরোধ করবেন, তারা সাহস হারিয়ে ফেলবে।

কাজেই তারা তোমাদের মোকাবিলায় আসতে পারবে না । আল্লাহ তা'আলা সংগ্রামে সুদৃঢ় এবং তিনি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দানকারী । তিনি এর উপর সক্ষম যে, দুনিয়াতেও তাদেরকে পরাজিত করবেন ও শাস্তি দেবেন এবং অনুরূপভাবে আখিরাতেও তাঁরই হাতে ক্ষমতা থাকবে । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا تَصْرِفُنَّهُمْ وَلِكُنْ لِيَبْلُوا بِعَضُّكُمْ بِسَعْيٍ

অর্থাৎ ‘তিনি ইচ্ছে করলে স্বয়ং তাদের নিকট হতে প্রতিশোধ নিতে পারেন কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পরম্পর পরীক্ষা করছেন ।’ (৪৭ : ৪)

এরপর বলা হচ্ছে- ‘যে কেউ উত্তম সুপারিশ করবে সে ওটা হতে অংশপ্রাপ্ত হবে এবং যে কেউ নিকৃষ্ট সুপারিশ করবে সেও ওটা হতে অংশ পাবে’ । সহীহ হাদীসে রয়েছে যে নবী (সঃ) বলেছেনঃ ‘তোমরা সুপারিশ কর, প্রতিদান পাবে । আল্লাহ যা চাইবেন স্বীয় নবী (সঃ)-এর ভাষায় তা জারী করবেন ।’ এ আয়াতটি একে অপরের সুপারিশ করার ব্যপারে অবতীর্ণ হয় । আল্লাহ তা'আলার এত দয়ালু যে, শুধু সুপারিশ করলেই প্রতিদান পাওয়া যাবে । সে সুপারিশে কাজ হোক আর নাই হোক । আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের রক্ষক এবং প্রত্যেক জিনিসের উপর বিদ্যমান । তিনি প্রত্যেকের হিসেব গ্রহণকারী । তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান । প্রত্যেকের তিনি আহার দাতা এবং প্রত্যেক মানুষের কার্যাবলীর পরিমাণ গ্রহণকারী ।

এরপর বলা হচ্ছে-‘হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে কেউ সালাম করে, তখন তোমরা তার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাকে তার সালামের উত্তর দাও, অথবা তদ্রূপ শব্দই বলে দাও ।’ সুতরাং তার অপেক্ষা উত্তম শব্দে উত্তর দেয়া মুসতাহাব এবং তার অনুরূপ শব্দে উত্তর দেয়া ফরয ।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে, হ্যরত সালামান ফারেসী (রাঃ) বলেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেঃ **السلامُ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ** অতঃপর তিনি বলেনঃ **أَعْلَمُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ** একটি লোক এসে বলে, **السلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ،** তিনি উত্তরে বলেনঃ **أَسْلَمْتَكَ اللَّهُمَّ** আবার আর একটি লোক এসে বলে, **السلامُ عَلَيْكَ** তখন তিনি উত্তরে বলেনঃ **وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ** । লোকটি তখন বলেঃ ‘হে আল্লাহর নবী (সঃ)! আপনার উপর আমার বাপ-মা কুরবান হোক, অমুক অমুক

ব্যক্তি আপনার নিকট এসে সালাম করলে আপনি তাদেরকে কিছু অতিরিক্ত শব্দের দ্বারা উত্তর প্রদান করলেন। কিন্তু আমাকে তো সেভাবে উত্তর দিলেন নাঃ’ তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ ‘তুমি আমার জন্যে কিছুই অবশিষ্ট রাখনি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন—“যখন তোমাদের উপর সালাম করা হয় তখন তোমরা তার অপেক্ষা উত্তম বাক্যে উত্তর দাও বা ওটাই ফিরিয়ে দাও।” এ জন্যেই আমি এই শব্দগুলোই ফিরিয়ে দিয়েছি।’

এ বর্ণনাটি মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমেও এরূপই মুআল্লাক রূপে বর্ণিত আছে। আবু বকর ইবনে মিরদুওয়াইও এটা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমি এটা মুসনাদে দেখিনি। এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এ হাদীস দ্বারা এটাও জানা গেল যে, সালামের বাক্য **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ**-এ শব্দগুলোর চেয়ে বেশী নেই। যদি বেশী থাকতো তবে নবী (সঃ) অবশ্যই এ শেষের সাহাবীর সালামের উত্তরে ওটা বলতেন।

মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করতঃ **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ** বলে বসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তর দিয়ে বলেনঃ সে দশটি নেকী পেল; দ্বিতীয় একজন এসে **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ** বলে বসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘সে বিশটি পুণ্য পেলো।’ ত্বরীয় একজন এসে বলেঃ **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ**। তিনি বলেনঃ ‘সে ত্রিশটি পুণ্য লাভ করলো।’ ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এ হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) এ আয়াতটিকে সাধারণভাবে গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলার মাখলুকের মধ্যে যে কেউ সালাম দেবে তাকে উত্তর দিতে হবে যদিও সে মাজুসীও হয়। হ্যরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, সালামের উত্তর উত্তমরূপে দেয়ার বিধান হচ্ছে মুসলমানদের জন্যে এবং ওটাকেই ফিরিয়ে দেয়ার বিধান হচ্ছে যিস্মীদের জন্যে। কিন্তু এ তাফসীরের ব্যাপারে কিছু চিন্তার বিষয় রয়েছে। যেমন উপরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে—‘তার সালামের চেয়ে উত্তম উত্তর দেবে এবং যদি মুসলমান সালামের সমস্ত শব্দই বলে দেয় তবে উত্তরদাতাকে ওটাই ফিরিয়ে দিতে হবে।’ যিস্মীদেরকে নিজে সালাম দেয়া ঠিক নয়। তবে সে যদি সালাম দেয় হবে তাকে তার শব্দেই উত্তর দিতে হবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যখন কোন ইয়াহুদী সালাম করে তখন খেয়াল রেখো, কেননা, তাদের কেউ ﷺ বলে থাকে, তখন তোমরা একে বলবে।’

সহীহ মুসলিমে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘ইয়াহুদী ও শ্রীষ্টানকে তোমরা প্রথমে সালাম করো না। পথে যদি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় তবে তাদেরকে পথের সংকীর্ণতার দিকে যেতে বাধ্য কর।’

ইমাম হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, সালাম দেয়া নফল এবং সালামের উত্তর দেয়া ফরয। উলামা-ই-কিরামের উক্তিও এটাই। সুতরাং কেউ যদি উত্তর না দেয় তবে সে পাপী হবে। কেননা, সালামের উত্তর দেয়া হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার আদেশ।

সুনান-ই-আবি দাউদে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা জানাতে প্রবেশ করতে পার না যে পর্যন্ত পরম্পরের মধ্যে ভালবাসা স্থাপন না করবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দেবো না যা করলে তোমাদের পরম্পরের ভালবাসা স্থাপিত হবে? তা হচ্ছে এই যে, তোমরা পরম্পর সালাম বিনিময় করবে।’

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় তাওহীদের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং ইবাদতের যোগ্য যে তিনি একাই তা প্রকাশ করছেন। শপথও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এজন্যেই দ্বিতীয় বাক্যকে, لَّمَّا د্বারা আরম্ভ করা হয়েছে যা কসমের জওয়াবে এসে থাকে। অতএব هُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ আল্লাহ তা‘আলার এ উক্তিটি হচ্ছে এবং حَبْرٌ قَسْمٌ যে তিনি পূর্বের ও পরের সমস্ত লোককে হাশরের মাঠে একত্রিত করবেন এবং সকলকেই তাদের কার্যের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। আর কথায় আল্লাহ তা‘আলা অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে আছে? অর্থাৎ কেউই নেই। তাঁর সংবাদ, তাঁর অঙ্গীকার এবং তাঁর শাস্তির ভয় প্রদর্শন সবই সত্য। ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া পালনকর্তা কেউ নেই।

সূরাঃ নিসা ৪

৮৮। অনন্তর তোমাদের কি  
হয়েছে যে, তোমরা  
মুনাফিকদের সঙ্গে দুল  
হলে? এবং তারা যা অর্জন  
করেছে তজ্জন্যে আল্লাহ  
তাদেরকে বিবর্তিত করেছেন;  
আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেন,  
তোমরা কি তাকে পথ প্রদর্শন  
করতে চাও? এবং আল্লাহ  
যাকে পথভ্রান্ত করেছেন,  
বস্তুতঃ তুমি তার জন্যে  
কোনই পথ পাবে না।

৮৯। তারা ইচ্ছে করে যে, তারা  
যেরূপ অবিশ্বাস করেছে,  
তোমরাও অন্দুপ অবিশ্বাস কর  
যেন তোমরাও তাদের সদৃশ  
হও; অতএব তাদের মধ্য  
হতে বক্তু গ্রহণ করো না— যে  
পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে  
দেশ ত্যাগ করে; অতঃপর  
যদি তারা প্রতিগমন করে,  
তবে তাদেরকে ধর এবং  
যেখানে পাও তাদেরকে সংহার  
কর; এবং তাদের মধ্য হতে  
বক্তু অথবা সাহায্যকারী গ্রহণ  
করো না।

৯০। কিন্তু তোমাদের মধ্যে ও  
তাদের মধ্যে সক্ষিবদ্ধ  
সম্প্রদায়ের সাথে যারা  
সম্মিলিত হয়, অথবা  
তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে  
সংকুচিত চিন্ত হয়ে যারা

- ৮৮ -  
فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ

فِئَتِينَ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا  
كَسَبُوا إِنْ تَرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مِنْ  
أَصْلَ اللَّهِ وَمَنْ يَضْلِلِ اللَّهُ  
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝

- ৮৯ -  
وَدُولَوْ تَكْفِرُونَ كَمَا

كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا  
تَرْجِذُونَ مِنْهُمْ أُولَئِكَهُنَّ  
يَهَا جَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ  
تُولُوا فَخَذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ  
حِيثُ وَجَدُّتُمُوْهُمْ وَلَا تَتْرِجِذُو  
مِنْهُمْ وَلِيَا وَلَا نَصِيرَا ۝

- ৯০ -  
إِلَّا الَّذِينَ يَصْلُوْنَ إِلَى قُوْمٍ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْشَاقٌ أَوْ  
جَاءُوكُمْ حِصْرَتْ صَدُورُهُمْ

তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়,  
এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছে  
করতেন তবে তোমাদের উপর  
তাদেরকে শক্তিশালী করতেন,  
তাহলে নিশ্চয়ই তারা  
তোমাদের সাথে সংঘাম  
করতো; অতঃপর যদি তারা  
তোমাদের দিক হতে নিবৃত্ত  
হয় এবং তোমাদের সাথে  
সংঘাম না করে এবং  
তোমাদের নিকট সঙ্গি প্রার্থনা  
করে, তবে আল্লাহ তাদের  
প্রতিকূলে তোমাদের জন্যে  
কোন পছ্টা করেননি।

১১। অচিরেই তুমি একুপও প্রাণ  
হবে- যারা তোমাদের দিক  
হতে শান্তির সাথে ও স্বীয়  
সম্প্রদায় হতে শান্তির সাথে  
থাকতে ইচ্ছে করে; যখন তারা  
বিরোধের দিকে প্রত্যাবর্তিত  
হয়, তখন তাতেই নিপত্তি  
হয়; অনন্তর যদি তারা  
তোমাদের দিক হতে নিবৃত্ত না  
হয় ও সঙ্গি প্রার্থনা না করে  
এবং তাদের হস্তসমূহ  
প্রতিরোধ না করে, তবে  
তাদেরকে ধর এবং যেখানে  
পাও তাদেরকে সংহার কর;  
এদেরই জন্যে আল্লাহ  
তোমাদেরকে প্রকাশ্য  
আধিপত্য দান করেছেন।

أَن يَقْاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا  
قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسْطَطُهُمْ  
عَلَيْكُمْ فَلَقْتُلُوكُمْ فَإِن  
أَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ  
وَالْقَوْمُ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ فَمَا  
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

٩١- سَتَجِدُونَ أَخْرِينَ يُرِيدُونَ  
أَن يَامِنُوكُمْ وَيَامِنُوا قَوْمَهُمْ  
كُلَّمَا رَدُوا إِلَى الْفِتْنَةِ  
أَرْكَسُوا فِيهَا فَإِن  
لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيَلْقَوْا إِلَيْكُمْ  
الْسَّلَمُ وَيَكْفُوا إِلَيْهِمْ  
فَخَذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حِيثُ  
ثِقْفَتُمُوهُمْ وَأَوْلِئِكُمْ جَعَلْنَا  
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنًا مُبِينًا

মুনাফিকদের কোন ব্যাপারে যে মুসলমানদের দু' প্রকার মত হয়েছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন উভদ প্রান্তে গমন করেন তখন তাঁর সাথে মুনাফিকেরাও ছিল। তারা যুদ্ধের পূর্বেই ফিরে এসেছিল। তাদের ব্যাপারে কতক মুসলমান বলছিলেন যে, তাদেরকে হত্যা করে ফেলা উচিত। আবার অন্য কয়েকজন বলছিলেন যে, হত্যা করা হবে না, কেননা তারাও মুমিন। তখন এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘এটা পবিত্র শহর, এটা নিজেই মালিন্য এমনভাবে দূর করে দেবে যেমনভাবে ভাটি লোহাকে পরিষ্কার করে থাকে’। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) উভদ যুদ্ধের ঘটনা সম্বন্ধে বলেন যে, উভদের যুদ্ধে মুসলমানদের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল এক হাজার। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল তিনশ লোককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে সাতশ জন রয়ে গিয়েছিলেন। হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন যে, মক্কায় এমন কতগুলো লোক ছিল যারা ইসলামের কালেমা পাঠ করেছিল। কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য করতো। তারা নিজেদের কোন বিশেষ প্রয়োজনে মক্কা হতে বের হয়। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ তাদেরকে কোন বাধা প্রদান করবেন না। কেননা, প্রকাশ্যে তারা কালেমা পড়েছিল।

মদীনার মুসলমানগণ যখন এ সংবাদ জানতে পারেন তখন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেনঃ ‘এ কাপুরুষদের সাথে প্রথমে জিহাদ করা হোক। কেননা, এরা আমাদের শক্রদের পৃষ্ঠপোষক।’ কিন্তু কতক লোক বলেন, ‘সুবহানাল্লাহ! যারা আমাদের মতই কালেমা পড়ে তোমরা তাদের সাথেই যুদ্ধ করবে। শুধু এ কারণে যে, তারা হিজরত করেনি এবং নিজেদের ঘরবাড়ী ছাড়েনি? আমরা কিভাবে তাদের রক্ত ও মাল হালাল করতে পারি?’

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে তাদের এ মতানৈক্য হয়েছিল। তিনি নীরব ছিলেন। সে সময় এ আয়াত অবর্তীর্ণ হয়। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম) হ্যরত সাদ ইবনে মু'আয বলেন যে, হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-কে যখন অপবাদ দেয়া হয়েছিল সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিশ্রের উপর দাঁড়িয়ে বলেনঃ ‘কে আছে যে আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের উৎপীড়ন হতে রক্ষা করে?’ সে সময় আউস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় ঐ ব্যাপারেই

এ আয়াতটি অবর্তীণ হয়। কিন্তু এ উক্তিটি গারীব। এ ছাড়া আরও উক্তি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার কারণে ধ্রংস করেছেন। তাদের হিদায়াতের কোন পথ নেই। তারাতো চায় যে খাঁটি মুসলমানও তাদের মত পথভঙ্গ হয়ে যাক।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘তাদের অন্তরে যখন তোমাদের প্রতি এত শক্রতা রয়েছে তখন তোমাদেরকে নিষেধ করা হচ্ছে যে, যে পর্যন্ত তারা হিজরত না করে সে পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে নিজের মনে করো না। তোমরা এটা মনে করো না যে, তারা তোমাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী। বরং তারা নিজেরাই এর যোগ্য যে, নিয়মিতভাবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। অতঃপর ওদের মধ্য হতে ঐ লোকদেরকে পৃথক করা হচ্ছে যারা কোন এমন সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে চলে যায় যাদের সঙ্গে মুসলমানদের সংক্ষি ও চুক্তি রয়েছে। তখন তাদের হুকুম সংক্ষিযুক্ত সম্প্রদায়ের মতই হবে।

সুরাকাহ ইবনে মালিক মুদলেজী বলে-বদর ও উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলমানেরা জয়যুক্ত হয় এবং আশে-পাশের লোকদের মধ্যে ইসলাম ভালভাবে ছড়িয়ে পড়ে তখন আমি জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার গোত্র বানু মুদলিজের বিরুদ্ধে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে এক সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করার সংকল্প করেছেন। আমি তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থি হয়ে আরয করি- আমি আপনাকে অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিছি। তখন জনগণ বলেনঃ ‘চুপ কর।’ কিন্তু তিনি বলেনঃ ‘তাকে বলতে দাও। তুমি কি বলতে চাও, বল।’ আমি তখন বলি, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি আমার সম্প্রদায়ের দিকে সেনাবাহিনী পাঠাতে চাচ্ছেন। আমি চাই, আপনি তাদের সাথে এ শর্তে সংক্ষি করুণ যে, যদি কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তারাও মুসলমান হয়ে যাবে। আর যদি তারা মুসলমান না হয় তবে তাদের উপরও আপনি আক্রমণ করবেন না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-এর হাতখানা স্বীয় হাতের মধ্যে নিয়ে বলেনঃ ‘তুমি এর সাথে যাও এবং এর কথা অনুসারে তার কওমের সাথে সংক্ষি করে এসো।’ সুতরাং এ শর্তে সংক্ষি হয়ে গেল যে, তারা ধর্মের শক্রদেরকে কোন প্রকারের সাহায্য করবে না এবং যদি কুরাইশরা মুসলমান হয়ে যায় তবে তারাও মুসলমান হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা-

وَدَا لَوْ تَكْفِرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءٌ فَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَّاءَ

-এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ এরা চায় যে, তাদের মত তোমরাও কুফরী কর যেন তোমরা সমান হয়ে যাও। সুতরাং তাদের মধ্যে হতে কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। এ বর্ণনাটি তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যেও রয়েছে। তাতে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তখন **إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ** -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে সম্মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে। সুতরাং যারা তাদের সঙ্গে মিলিত হবে তারাও তাদের মতই পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। কালামের শব্দের সাথে এরই বেশী সম্পর্ক রয়েছে।

সহীহ বুখারী শরীফে হৃদায়বিয়ার সন্ধি ঘটনায় রয়েছে যে, এরপর যে চাইতো মদীনার মুসলমানদের সাথে মিলিত হতো এবং চুক্তিপত্রের কারণে নিরাপত্তা লাভ করতো। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, নিম্নের আয়াতটি এ হকুমকে রাহিত করে দেয়ঃ

**فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرَمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حِيثُ وَجَدْتُمُوهُمْ**

অর্থাৎ ‘যখন হারাম মাসগুলো অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর’। (১০: ৫) এরপর অন্য একটি দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে আসা হয় বটে কিন্তু তারা সংকুচিত চিন্ত হয়ে হায়ির হয়। তারা না তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়, না তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করা পছন্দ করে। বরং তারা ত্তীয় পক্ষীয় লোক। তাদেরকে না তোমাদের শক্ত বলা যেতে পরে, না বন্ধু বলা যেতে পারে। সুতরাং এটাও আল্লাহ পাকের একটা অনুগ্রহ যে, তিনি তাদেরকে তোমাদের উপর শক্তিশালী করেননি। তিনি ইচ্ছে করলে তাদের ক্ষমতা দান করতেন এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার স্পৃহা তাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলতেন। সুতরাং যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে এবং তোমাদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করে তবে তোমাদের জন্যে তাদের সাথে যুদ্ধ করবার অনুমতি নেই।

বদরের যুদ্ধে বানূ হাশিম গোত্রের কতগুলো লোক মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছিল। যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অন্তরে অপছন্দ করেছিল, তারাই ছিল এ প্রকারের লোক। যেমন হ্যরত আব্বাস (রাঃ)

ইত্যাদি। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আববাস (রাঃ)-কে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন এবং তাঁকে জীবিত ফ্রেফতার করতে বলেছিলেন।

অতঃপর আর একটি দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যারা বাহ্যতঃ উপরোক্ত দলের মতই কিন্তু তাদের নিয়ত খুবই কুণ্ঠিত, তারা মুনাফিক। এ মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে ইসলাম প্রকাশ করতঃ স্বীয় জান ও মাল মুসলমানের হাত হতে রক্ষা করতো আর ওদিকে কাফিরদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের বাতিল মা'বুদের ইবাদত করতো এবং তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করতঃ তাদের সাথেই মিলেমিশে থাকতো যেন তাদের নিকটেও নিরাপদে থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল কাফির। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَإِذَا خَلَقْنَا إِلَيْهِ بَطْرِيزٌ هُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ

অর্থাৎ 'যখন তারা শয়তানদের সন্নিকটে একাকী হয়, তখন বলে— নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি।' (২: ১৪) এখানেও বলা হচ্ছে—যখন তারা বিরোধের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় তখন তাতেই নিপত্তি হয়। এখানেও ফন্তে শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে শিরক। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এ লোকগুলোও মুক্তাবাসী ছিল। এখানে এসে তারা রিয়াকারী রূপে ইসলাম গ্রহণ করতো এবং মুক্তায় ফিরে গিয়ে মৃত্তিপূজা করতো। তাই তাদের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যদি তারা তোমাদের দিক হতে নিবৃত্ত না হয় ও সক্ষি প্রার্থনা না করে তবে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করো না, বরং তাদের সাথে যুদ্ধ কর, বন্দী কর এবং যেখানেই পাও হত্যা কর। তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে প্রকাশ্য আধিপত্য দান করেছেন।

## ৯২। কোন মুমিনের উচিত নয়

যে, ভ্রম ব্যতীত কোন মুমিনকে হত্যা করে; যে কেউ ভ্রম বশতঃ কোন মুমিনকে হত্যা করে, তবে সে জনেক মুমিন দাসকে মুক্ত করে দেবে এবং তার আজ্ঞায়-স্বজনগণকে হত্যা বিনিময় সমর্পণ করবে;

- ৭২ -  
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ  
مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًأً وَمَنْ قَاتَلَ  
مُؤْمِنًا خَطًأً فَتَحِيرَ رَقْبَةَ  
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَهُ مَسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

কিন্তু হ্যাঁ, তবে যদি ক্ষমা করে দেয়, অনন্তর যদি সে তোমাদের শক্র সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ও মুমিন হয় তবে জনেক মুমিন দাসকে মুক্তি দান করবে; এবং যদি সে তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে সঞ্চিবদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয় তবে তার ব্রজনদেরকে হত্যা বিনিময় অর্পণ করবে এবং জনেক মুমিন দাসকে মুক্তি করবে; কিন্তু যদি সে ওটা থাণ্ডা না হয়, তবে আল্লাহর নিকট হতে ক্ষমা থাণ্ডির জন্যে একাধিক্রমে দু' মাস রোয়া রাখবে; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

৯৩। আর যে কেউ স্বেচ্ছায় কোন মুমিনকে হত্যা করে তবে তার শাস্তি জাহানাম-তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তার প্রতি ঝুঁক হয়েছেন ও তাকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করেছেন।

إِلَّا أَن يَصْدِقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ  
قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَتَحْرِير رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ  
مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيشَاقٌ  
فِدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِير  
رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
فَصِيَامٌ شَهْرِينِ مُتَتَابِعَيْنِ  
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ  
عَلِيًّا حَكِيمًا ۝

وَمَنْ يَقْتَلْ مُؤْمِنًا مَتَعِدًا ۹۳  
فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا  
وَغَضِيبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ  
وَاعْدَلُهُ عِذَابًا عَظِيمًا ۝

রক্ত হালাল নয়, কিন্তু তিনটির মধ্যে যে কোন একটি কারণে (হত্যা করা বৈধ)। (১) কাউকে হত্যা করা, (২) বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করা এবং (৩) ধর্ম ত্যাগ করে দল হতে বিছিন্ন হওয়া।' এ তিনটি কাজ কারও দ্বারা সংঘটিত হলে প্রজাদের মধ্যে কারও তাকে হত্যা করার অধিকার নেই বরং এটা হচ্ছে ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধির অধিকার। এরপরে 'الْأَخْطَلِ' রয়েছে এবং এটা হচ্ছে 'استنَا، منقطع' যেমন নিম্নের কবিতায় রয়েছেঃ

مَنْ الْبَيْضِ لَمْ تَعْنِ بَعِيدٌ أَوْ لَمْ تَطَّا \* عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا رَطَابَرِدُ مَرْحَلًا

এ আয়াতের শান-ই-নযুলে একটি উক্তি এই বর্ণিত আছে যে, এটা আবু জেহেলের বৈপিত্রেয় ভাই আইয়াশ ইবনে আবু রাবী'আর (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাঁর মাতার নাম আসমা বিনতে মুখরামা। তিনি একটি লোককে হত্যা করেছিলেন। লোকটির নাম ছিল হারস ইবনে ইয়ায়ীদ আল গামেদী।

ঘটনা এই যে, হ্যরত আইয়াশ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর ভাই আবু জেহেলের সঙ্গে হারস ইবনে ইয়ায়ীদ যোগ দিয়ে তাঁকে শাস্তি প্রদান করে। ফলে তিনি মনে সংকল্প করেন যে, সুযোগ পেলেই হারস ইবনে ইয়ায়ীদকে হত্যা করবেন। কিন্তু দিন পর হারসও মুসলমান হয়ে যায় এবং হিজরতও করে। হ্যরত আইয়াশ (রাঃ) কিন্তু এ খবর জানতেন না। মক্কা বিজয়ের দিন সে তাঁর চোখে পড়ে যায় এবং এখনও সে কুফরীর উপরই রয়েছে এই মনে করে হঠাতে তার উপর আক্রমণ করতঃ তাকে হত্যা করে ফেলেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অন্য উক্তি এই যে, এ আয়াতটি হ্যরত আবু দারদা (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঘটনা এই যে, তিনি একজন কাফিরের উপর তরবারী উঠিয়েছেন এমন সময় সে ঈমানের কালেমা পাঠ করে। কিন্তু হ্যরত আবু দারদা (রাঃ) তার উপর তরবারী বসিয়েই দেন এবং লোকটি নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে ঘটনাটি বর্ণিত হলে হ্যরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, 'সে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে কালেমা পড়েছিল।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তুমি কি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছিলে?' এ ঘটনাটি বিশুদ্ধ হাদীসেও রয়েছে কিন্তু সেখনে অন্য সাহাবীর নাম আছে।

অতঃপর ভ্রমবশতঃ হত্যার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, কোন মুসলমান যদি অপর কোন মুসলমানকে ভ্রমবশতঃ হত্যা করে তবে দু'টো জিনিস ওয়াজিব হবে।

প্রথম হচ্ছে একটি দাসকে মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা-বিনিময় প্রদান করা। ঐ দাসের ব্যাপারে আবার শর্ত এই যে, তাকে হতে হবে মুমিন। কাফির দাসকে মুক্ত করলে তা যথেষ্ট হবে না এবং ছোট নাবালক দাসও যথেষ্ট হবে না যে পর্যন্ত সে স্বেচ্ছায় ঈমান আনয়নের মত বয়স প্রাপ্ত না হবে।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর মনোনীত উক্তি এই যে, ঐ ছেলের বাপ-মাদু'জনই যদি মুসলমান হয় তবে যথেষ্ট হবে, নচেৎ হবে না। জমহুরের মাযহাব এই যে, মুসলমান হওয়া শর্ত, ছোট বা বড় হওয়ার কোন শর্ত নেই।

মুসলিম-ই-আহমাদে রয়েছে যে, একজন আনসারী (রা) কৃষ্ণবর্ণের একটি দাসী নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাথির হয়ে বলেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! একটি মুসলমান দাস বা দাসী মুক্ত করার দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে। যদি এ দাসীটিকে আপনি মুসলমান মনে করেন তবে আমি তাকে মুক্ত করে দেবো’। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন ঐ দাসীটিকে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই?’ সে বলেঃ ‘হ্যাঁ।’ তিনি বলেনঃ ‘তুমি কি এ সাক্ষ্যও দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল?’ সে বলে, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বলেনঃ ‘মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর তোমার বিশ্বাস আছে কি?’ সে বলে, ‘হ্যাঁ।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন আনসারীকে বলেনঃ ‘তাকে আযাদ করে দাও।’ এ হাদীসের ইসলাম বিশুদ্ধ এবং ঐ সাহাবী কে ছিলেন তা গুণ থাকা সনদের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

এ বর্ণনাটি হাদীসের আরও বহু পুস্তকে নিম্নরূপে বর্ণিত রয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) দাসীটিকে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘আল্লাহ কোথায় আছেন?’ সে বলে, ‘আকাশে।’ তিনি বলেনঃ ‘আমি কে?’ সে বলে, ‘আপনি আল্লাহ রাসূল (সঃ)।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন সাহাবীকে বলেনঃ ‘তাকে আযাদ করে দাও, সে মুমিন।’ তাহলে অমবশতঃ হত্যার কারণে এক তো গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব ও দ্বিতীয় হচ্ছে রক্তপণ আদায় করা ওয়াজিব যা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে সমর্পণ করতে হবে। এটাই হচ্ছে তার হত্যার বিনিময়। এ রক্তপণ হচ্ছে একশটি উট এবং এগুলো হবে পাঁচ প্রকারের। (১) বয়স প্রথম বছর পেরিয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে একপ বিশটি উষ্টী। (২) এ বয়সেরই বিশটি উষ্টী। (৩) দ্বিতীয় বছর পেরিয়ে তৃতীয় বছরে পড়েছে একপ বিশটি উষ্টী। (৪) তৃতীয় বছর পেরিয়ে চতুর্থ বছরে পড়েছে একপ বিশটি উষ্টী। (৫) চতুর্থ বছর পেরিয়ে পঞ্চম

বছরে পড়েছে একুপ বিশটি উল্টো। এটাই হচ্ছে ভয়ে হত্যার বিনিময় যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফায়সালা করেছেন। (সুনান ও মুসনাদ-ই-আহমাদ)

এ হাদীসটি হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে মাওকুফ রূপেও বর্ণিত আছে। হ্যরত আলী (রাঃ) এবং একটি জামাআত হতেও এটাই নকল করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে, এ রক্তপণ চার প্রকারেও বন্টন করা হয়েছে। এ রক্তপণে হত্যাকারীর ‘আকেলার’ উপর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ তার প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের পরের নিকটতম আত্মীয়দের উপর ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফিন্দি (রঃ) বলেনঃ ‘এ বিষয়ে আমি কোন বিপরীত মতপোষণকারী পাইনি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) রক্তপণের ফায়সালা এ লোকদের উপর করেছেন। এটা হাদীস-ই-খাস্সাহ হতে অধিক। ইমাম শাফিন্দি (রঃ) যে হাদীসগুলোর দিকে ইঙ্গিত করেছেন ঐগুলো অনেক রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যাইল গোত্রের দু’টি মহিলা পরস্পর বিবাদে লিঙ্গ হয়। একজন অপরজনকে একটি পাথর মেরে দেয়। সে গর্ভবতী ছিল। সন্তানও নষ্ট হয়ে যায় এবং সেও মারা যায়। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে বর্ণিত হলে তিনি ফায়সালা দেন যে, এ শিশুর রক্তপণ হচ্ছে একটি প্রাণ, দাস বা দাসী এবং ঐ নিহত মহিলার রক্তপণ ওয়াজিব হবে হত্যাকারীণীর প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের পরবর্তী আত্মীয়দের উপর। এর দ্বারা এও জানা গেল যে, যে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা ভুল বশতঃ হয়ে যায়, রক্তপণ হিসেবে তার হুকুম শুধু ভুল বশতঃ হত্যার মতই। কিন্তু ঐ অবস্থায় বন্টন হবে তিনের উপর। কেননা, সেখানে ইচ্ছাপূর্বক হত্যার সঙ্গেও সামঞ্জস্য রয়েছে।

সহীহ বুখারী শরীফে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-কে একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে খুয়াইমা গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তথায় গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করলো বটে কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ আসলেন<sup>”</sup> অর্থাৎ ‘আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম’-এ কথার পরিবর্তে<sup>”</sup> অর্থাৎ ‘আমরা বেদ্বীন হয়ে গেলাম’ এ কথা বললো। হ্যরত খালিদ (রাঃ) তাদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি মহান আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে আরয করেনঃ ‘হে আল্লাহ! আমি খালিদ (রাঃ)-এর এ কার্যে আপনার নিকট অসন্তোষ প্রকাশ করছি এবং নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করছি।’

অতঃপর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে খুযাইমা গোত্রের নিকট পাঠিয়ে দেন এবং তাদের নিহতদের রক্তপণ এবং আর্থিক সমস্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধির ভুলের বোকা বায়তুলমালকেই বহন করতে হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-'রক্তপণ ওয়াজিব বটে, কিন্তু যদি নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন স্বেচ্ছায় রক্তপণ ক্ষমা করে দেয় তবে তা করার অধিকার তাদের রয়েছে। তারা ওটা সাদকা হিসেবে ক্ষমা করে দিতে পারে।' এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে- নিহত ব্যক্তি যদি মুসলমান হয় কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজন অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফির হয় তবে হত্যাকারীর দায়িত্বে রক্তপণ নেই। ঐ অবস্থায় তাকে শুধু গোলাম আযাদ করতে হবে। আর যদি নিহত ব্যক্তির অলী ও উত্তরাধিকারী এমন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, যাদের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি ও চুক্তি রয়েছে, তবে রক্তপণ আদায় করতে হবে। আর যদি নিহত ব্যক্তি কাফির হয় তবে কারও মতে পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে, কারও মতে অধিক দিতে হবে এবং কারও মতে এক তৃতীয়াংশ দিতে হবে।' এর বিস্তারিত বিবরণ আহকামের পুস্তকগুলোতে দ্রষ্টব্য। হত্যাকারীকে একজন মুমিন গোলামও আযাদ করতে হবে। দারিদ্র্যতা বশতঃ যদি কোন ব্যক্তি তাতে সক্ষম না হয় তবে তাকে ক্রমাগত দু'মাস রোয়া রাখতে হবে। রোগ, হায়েয়, নিফাস ইত্যাদির মত কোন শরীয়ত সম্মত ওয়ার ছাড়াই মধ্যে কোন একদিন যদি রোয়া ছেড়ে দেয় তবে আবার নতুনভাবে রোয়া শুরু করতে হবে। সফরের ব্যাপারে দু'টি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তি এই যে, এটাও একটি শরীয়ত সমর্থিত ওয়ার। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এটা একটি শরীয়ত সমর্থিত ওয়ার নয়।

এরপরে বলা হচ্ছে- ভ্রমবশতঃ হত্যার তাওবার উপায় এই যে, গোলাম আযাদ করতে না পারলে ক্রমাগত দু'মাস রোয়া রাখতে হবে। যদি রোয়া রাখতেও সক্ষম না হয় তবে ষাটটি মিসকীনকে খানা খেতে দেয়া তার উপর ওয়াজিব কি-না এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একটি উক্তি এই যে, রোয়া রাখতে না পারলে ৬০টি মিসকীনকে খানা খেতে দিতে হবে। যেমন যিহারের কাফ্ফারায় রয়েছে। সেখানে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা না করার কারণ এই যে, এটা হচ্ছে ভীতি প্রদর্শনের স্থান। সুতরাঃ সহজ পস্তা যদি বলে দেয়া হতো তবে আতৎক ও সন্ত্রাস এতটা প্রকাশ পেতো না। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, রোয়ার পরে আর কিছুই নেই। যদি থাকতো

তবে সাথে সাথেই বর্ণনা করে দেয়া হতো। প্রয়োজনের সময় হতে বর্ণনাকে পিছিয়ে দেয়া ঠিক নয়। ‘আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়’ -এর তাফসীর ইতিপূর্বে কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।

অমবশতঃ হত্যার বর্ণনার পর এখন ইচ্ছাপূর্বক হত্যার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এর কঠিন ভৌতিযুক্ত শাস্তির কথা বলা হচ্ছে। এটা এমন একটা পাপ যাকে শিরকের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَى وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي  
حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

অর্থাৎ ‘মুমিন তারাই যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে মা'বুদুরপে খাড়া করে না এবং তারা কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না।’ (২৫: ৬৮)

অন্য জায়গায় ঘোষিত হচ্ছেঃ اتْلَ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا مُّبَلِّغاً (৬: ১৫১) এখানেও আল্লাহ তা'আলা হারামকৃত কার্যাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে শিরক ও হত্যার বর্ণনা দিয়েছেন। এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম রক্তের ফায়সালা করা হবে।’ সুনান-ই-আবি দাউদে হ্যরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘মুমিন পুণ্যে ও মঙ্গলে বেড়ে চলে যে পর্যন্ত না সে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে। যখন সে এটা করে তখন সে ধৰ্মস হয়ে যায়।’ অন্য হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট সারা জগতের পতন একজন মুসলমানের হত্যা অপেক্ষা হালকা।

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, যদি সারা ভূপৃষ্ঠের ও আকাশের অধিবাসী একজন মুসলমানকে হত্যার কাজে একত্রিত হয় তবে আল্লাহ সকলকেই উল্টো মুখে জাহানামে নিষ্কেপ করবেন। আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যার ব্যাপারে অর্ধেক কথা দিয়েও সাহায্য করে, সে কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উঠবে যে, তার কপালে লিখা থাকবেঃ এ ব্যক্তি আল্লাহর করুণা হতে বাধ্যিত।

হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ)-এর উক্তি তো এই যে, যে ব্যক্তি মুমিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে তার তাওবা কবুলই হয় না। কুফাবাসী এ মাসআলায়

মতভেদ করলে হ্যরত ইবনে যুবাইর (রঃ) হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি বলেন, 'وَالَّذِينَ لَا يُدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّا أَخْرَى' (২৫: ৬৮) -এটা শেষ আয়াত যাকে অন্য কোন আয়াত রহিত করেনি। তিনি আরও বলেনঃ 'وَمَنْ يَقْتَلْ مَوْمِنًا مَتَعْمِدًا فِي جَهَنَّمِ' -এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবর্তীণ হয়।

অতএব যখন কোন লোক ইসলামের অবস্থায় শরীয়ত সমর্থিত কারণ ছাড়াই কোন মুসলমানকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহানাম এবং তার তাওবা গ্রহণীয় হবে না। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) যখন হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এ বর্ণনাটি শ্রবণ করেন তখন বলেন, 'কিন্তু যে অনুত্পন্ন হয়।' হ্যরত সালেম ইবনে আবুল জাদ (রঃ) বলেন, হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) যখন অঙ্ক হয়ে গিয়েছিলেন সে সময় একদা আমরা তাঁর নিকটে বসেছিলাম। এমন সময় একটি লোক এসে তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়ে বলে, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে জেনে শুনে হত্যা করে তার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?' তিনি বলেন, 'তার শাস্তি জাহানাম যার মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে। আল্লাহ তা'আলা তার উপর রাগাভিত, তার উপর তাঁর অভিসম্পাত রয়েছে এবং তার জন্যে রয়েছে ভীষণ শাস্তি।' লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করে, 'যদি সে তাওবা করতঃ ভাল কাজ করে এবং হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়?' তিনি বলেন, 'তার মা তার জন্যে ক্রন্দন করুক, তার তাওবা ও সুপথ প্রাপ্তি কোথায়ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আমি তোমাদের নবী (সঃ) হতে শুনেছিঃ তার মা তার জন্যে কাঁদুক, যে কোন মুমিনকে জেনে শুনে হত্যা করেছে সে নিহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাকে স্বীয় ডান বা বাম হস্তে ধরে নিয়ে রহমানের আরশের সামনে আনবে এবং ডান হাতে বা বাম হাতে স্বীয় মস্তক ধারণ করবে। তার শিরায় শিরায় রক্ত টগবগ করবে এবং সে আল্লাহ তা'আলাকে বলবে 'হে আল্লাহ! সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল তা তাকে জিজ্ঞেস করুন।' যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এ আয়াতটি অবর্তীণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত একে রহিতকারী কোন আয়াত অবর্তীণ হয়নি।

অন্য বর্ণনায় এটুকু বেশীও রয়েছেঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)- এর ইন্দ্রিকালের পর কোন অহী অবর্তীণ হবে না।' হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ), হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ), হ্যরত আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ), হ্যরত উবাইদুল্লাহ ইবনে উমায়ের (রাঃ), হ্যরত কাতাদাহ (রাঃ) এবং হ্যরত যহুকও (রঃ) হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতের সঙ্গে রয়েছেন।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি স্বীয় হত্যাকারীকে ধরে আল্লাহ তা'আলার সামনে নিয়ে আসবে এবং অন্য হাতে স্বীয় মস্তক ধারণ করবে, অতঃপর বলবেঃ ‘হে আমার প্রভু! সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল তা তাকে জিজ্ঞেস করুন।’ তখন হত্যাকারী বলবে, ‘আমি তাকে হত্যা করেছিলাম যেন আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।’ তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ ‘নিশ্চয়ই ওটা আমার জন্যে।’

অন্য একজন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে ধরে নিয়ে আসবে এবং বলবেঃ ‘হে আমার প্রভু! এ লোকটি কেন আমাকে হত্যা করেছিল তা তাকে জিজ্ঞেস করুন।’ হত্যাকারী তখন বলবে, ‘আমি তাকে হত্যা করেছিলাম যেন অমুকের সম্মান বৃদ্ধি পায়।’ তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ ‘ওটা তার জন্যে নয়। তুমি তার পাপের বোঝা নিয়ে ফিরে যাও।’ অতঃপর তাকে জাহানামে নিষ্কেপ করা হবে, সন্তুর বছরে সে ঐ গর্তের তলদেশে পৌছবে।

মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত মু'আবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ ‘খুব সম্ভব আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পাপ মার্জনা করবেন, কিন্তু শুধু ঐ ব্যক্তিকে (ক্ষমা করবেন না) যে কুফরীর অবস্থায় মারা যায়, অথবা ঐ ব্যক্তিকে (মার্জনা করবেন না) যে কোন মুমিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে।’

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে ইবনে যাকারিয়া (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি উশু দ্বারদা (রাঃ) হতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু দ্বারদা (রাঃ) হতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ “খুব সম্ভব আল্লাহ তা'আলা সমস্ত পাপ মার্জনা করবেন, কিন্তু (মার্জনা করবেন না) যে মুশরিক হয়ে মরেছে বা যে কোন মুমিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করেছে।” এ হাদীসটি দুর্বল। হ্যরত মু'আবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিই রক্ষিত।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, সে মহাসম্মানিত আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে।’ এ হাদীসটি মুনকার এবং এর ইসনাদেও বহু সমালোচনা রয়েছে।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হ্যরত হুমায়েদ (রঃ) বলেন, আমার নিকট হ্যরত আবুল আলিয়া আগমন করেন। সে সময় আমার নিকট আমার এক

বন্ধুও ছিলেন।' তিনি আমাদেরকে বলেন, 'তোমরা দু'জন আমার অপেক্ষা বয়সে ছোট এবং আমার চেয়ে তোমাদের হাদীসও বেশী মনে রয়েছে, চল আমরা বাশার ইবনে আসেম (রঃ)-এর নিকট গমন করি।' আমরা তথায় পৌছলে হ্যরত আবুল আলিয়া (রঃ) হ্যরত বাশার (রঃ)-কে বলেনঃ 'এদেরকেও এই হাদীসটি শুনিয়ে দিন।' তিনি তখন হাদীসটি শুনাতে আরম্ভ করেন। হ্যরত উকবা ইবনে মালিক লাইসী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি ছোট সেনাদল প্রেরণ করেন। তারা একটি গোত্রের উপর আক্রমণ চালায়। গোত্রের লোকগুলো পালিয়ে যায়। তাদের সাথে অন্য একটি লোকও পালিয়ে যাচ্ছিল। মুসলিম সৈন্যদের একজন তার পশ্চাদ্বাবন করে এবং খোলা তরবারী নিয়ে তার নিকট পৌছে যায়। তখন লোকটি বলে, 'আমি তো মুসলমান।' মুসলিম সৈন্যটি তার কথার উপর কোনই গুরুত্ব না দিয়ে তাকে হতা করে ফেলে। এ সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং কঠোর উক্তি করেন। হত্যাকারীও এ সংবাদ পেয়ে যায়। একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় ঐ হত্যাকারী বলে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লোকটি তো এ কথা শুধু প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যেই বলেছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন এবং ভাষণ দিতেই থাকেন। লোকটি দ্বিতীয়বার ঐ কথাই বলে। কিন্তু এবারেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুখ ফিরিয়ে নেন। সে ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে তৃতীয়বার বলে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লোকটি তো শুধু প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই এ কথা বলেছিল। এবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার প্রতি মনোযোগী হন এবং তাঁর চেহারায় অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তিনি বলেনঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমিনের হত্যাকারীর উপর অঙ্গীকৃতি জানিয়েছেন।' এ কথা তিনি তিনবার বলেন। এ বর্ণনাটি সুনান-ই-নাসাইর মধ্যেও রয়েছে।

অতএব একটি মাযহাব তো হলো এই যে, জেনে শুনে হত্যাকারীর তাওবা গ্রহণীয় নয়। দ্বিতীয় মাযহাব এই যে, তাওবা তার ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে রয়েছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহূরের মাযহাব এটাই যে, সে যদি তাওবা করে, আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, বিনয় প্রকাশ করে এবং সৎকার্যাবলী সম্পাদন করতে থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা গ্রহণ করবেন এবং নিহত ব্যক্তিকে স্বীয় পক্ষ হতে বিনিময় প্রদান করতঃ সন্তুষ্ট করবেন। আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত আয়াত গুলোর মধ্যে যা বলেছেন তা হচ্ছে এবং 'খ্ৰ' (২৫: ৬৮-৬৯) পর্যন্ত আয়াত গুলোর মধ্যে যা বলেছেন তা হচ্ছে এবং 'খ্ৰ'

-এর মধ্যে রহিতকরণের সম্ভাবনাই নেই। আর ঐ আয়াতটি মুশরিকদের জন্যে এবং এ আয়াতকে মুমিনের জন্যে নির্দিষ্ট করা প্রকাশ্যের বিপরীত এবং কোন দলীলের মুখ্যাপেক্ষী। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ পাক বলেনঃ

**قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ**

অর্থাৎ ‘হে আমার ঐ বান্দারা যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছো, তোমরা আমার করুণা হতে নিরাশ হয়ো না।’ (৩৯: ৫৩) এ আয়াতটি সাধারণ, সুতরাং কুফরী, শিরুক, নিফাক, হত্যা ইত্যাদি সমস্ত পাপই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব পাপকার্যে লিঙ্গ হবার পর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং তাওবা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ পাক বলেনঃ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ إِنْ يَشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ** (৪: ৪৮)-এ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা শিরুক ছাড়া অন্যান্য সমস্ত পাপ ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে দেবেন। এটা তাঁর একটা বড় অনুকম্পা যে, তিনি এ সূরার মধ্যেই এখন আমরা যে আয়াতের তাফসীর করছি এর পূর্বে একবার স্বীয় সাধারণ ক্ষমার আয়াত বর্ণনা করেছেন। এ আয়াতের পরই অনুরূপভাবে স্বীয় সাধারণ ক্ষমার কথা পুনরায় ঘোষণা করেছেন যেন আশা দৃঢ় হয়।

এখানে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ঐ হাদীসটিও উল্লেখযোগ্য যাতে রয়েছে যে, বানী ইসরাইলের মধ্যে একজন লোক একশোটি লোককে হত্যা করেছিল। অতঃপর সে একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করে, ‘আমার তাওবা গৃহীত হবে কি?’ তিনি উত্তরে বলেন, ‘তোমার মধ্যে ও তোমার তাওবার মধ্যে কে প্রতিবন্ধক হবে?’ অতঃপর তিনি তাকে পুণ্যময় শহরে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে বলেন। অতএব সে ঐ শহরে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়। পথে সে মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং রহমতের ফেরেশতা এসে তাকে নিয়ে যান। এ হাদীসটিকে পূর্ণভাবে কয়েক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। বানী ইসরাইলের মধ্যেই যখন ক্ষমার এ ব্যবস্থা রয়েছে তখন আমাদের মধ্যে তো সে ক্ষমার ব্যবস্থা বহুগুণে বেশী থাকা উচিত। কেননা, বানী ইসরাইল এমন বহু অন্যায় কাজে লিঙ্গ হয়ে পড়েছিল যা থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে যুক্ত রেখেছেন। আর তিনি বিশ্ব শাস্তির দৃত ও নবীদের নেতা হ্যরত মুহাম্মাদ

(সঃ)-কে পাঠিয়ে এমন ধর্ম তিনি আমাদেরকে দান করেছেন যা আকাশেও শান্তিদায়ক এবং পৃথিবীতেও শান্তিদায়ক। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সরল ও পরিষ্কার ধর্ম। কাজেই এখানে হত্যাকারীর তাওবার দরজা বন্ধ হবে কেন?

তাহলে এখানে হত্যাকারীর যে শান্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার ভাবার্থ এই যে, তার শান্তি হচ্ছে এই যদি আল্লাহ তা'আলা শান্তি দেন। যেমন আবু হুরাইরা (রাঃ) এবং পূর্বযুগীয় মনীষীদের একটি দল একথাই বলেন। এমনকি এ অর্থবোধক একটি হাদীসও তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু সনদ হিসেবে হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক শান্তির ভয় প্রদর্শনের ভাবার্থ এই যে, ওর পিছনে যদি কোন সৎ আমল না থাকে তবে সে পাপের শান্তি ওটাই হবে যে শান্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

শান্তির ভয় প্রদর্শনের ব্যাপারে আমাদের নিকট সঠিক ও উত্তম পদ্ধা এটাই। সত্য সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। আর হত্যাকারীর জাহানামী হওয়ার ব্যাপারেও এটা প্রযোজ্য যে, সে চিরদিন জাহানামে থাকবে না। তার জাহানামী হওয়া হয়রত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি অনুসারে তাওবা গৃহীত না হওয়ার কারণেই হোক বা জমহুরের উক্তি অনুযায়ী ওর পিছনে কোন সৎকার্য না থাকার কারণেই হোক।

এখানে ”خُلُود“ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে বহুদিন অবস্থান-চিরদিন অবস্থান নয়। যেমন হাদীস-ই-মুতাওয়াতির দ্বারা সাব্যস্ত আছে যে, জাহানাম থেকে ঐ ব্যক্তি ও বের হবে যার অন্তরে সরিষার ছেট দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে। উপরে যে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে বলা হয়েছে: “খুব সন্তু আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পাপই ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু (ক্ষমা করবেন না) যে কাফির হয়ে যাবে বা যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে জেনে শুনে হত্যা করবে।” এ হাদীসে عَسَىٰ শব্দটি হচ্ছে تَرْجِي বা আশা উদ্দীপক। তাহলে এ দু’ অবস্থায় (কুফরী ও মুমিন হত্যা) যদিও আশা উঠে যায়, কিন্তু সংঘটন অর্থাৎ এক্রপ ঘটে যাওয়া এ দু’টোর মধ্যে একটিতে উঠে যায় না এবং সেটা হচ্ছে হত্যা। কেননা, শিরীক ও কুফরীর ক্ষমা না হওয়া তো কুরআন মাজীদের শব্দ দ্বারাই সাব্যস্ত হয়েছে। আর যে হাদীসগুলোর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, হত্যাকারী নিহত ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট ধরে আনবে সেগুলোও সম্পূর্ণরূপে সঠিক। এতে মানুষের অধিকার রয়েছে বলে তাওবা দ্বারা এ পাপ ক্ষমা হতে পারে না। বরং মানুষের হক তো তাওবার অবস্থাতেও হকদারকে পৌছিয়ে দিতে হবে। এতে যেমন হত্যা রয়েছে তদ্রপ চুরি, জবরদখল, অপবাদ এবং অনান্য হককুল ইবাদও

রয়েছে। এগুলো তাওবা দ্বারা ক্ষমা না হওয়া ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। এ অবস্থায় তাওবার বিশুদ্ধতার জন্যে শর্ত হলো প্রাপকদের প্রাপ্যগুলো আদায় করে দেয়া। আর আদায় করা যখন অসম্ভব তখন কিয়ামতের দিন দাবীদারগণ দাবী অবশ্যই করবে। কিন্তু দাবী করলেই যে শান্তি ঘটেই যাবে এটা জরুরী নয়। এও সম্ভব যে, হত্যাকারীর সমস্ত ভাল কাজের পুণ্য নিহত ব্যক্তিকে দেয়া হবে বা আংশিক পুণ্য দেয়া হবে এবং তাকে দেয়ার পরেও হয়তো হত্যাকারীর নিকট কিছু পুণ্য থেকেও যাবে, আর ওর বিনিময়ে হয়তো আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আবার এটাও অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পক্ষ হতে নিহত ব্যক্তিকে হুর, প্রাসাদ, উচ্চ মর্যাদা এবং জাল্লাত দিয়ে তার দাবী পূরণ করবেন এবং ওরই বিনিময়ে হয়তো সে তার হস্তকে খুশী মনে ক্ষমা করে দেবে, ফলে আল্লাহ তা'আলা ও তাকে মাফ করবেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে ভাল জানেন। ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর জন্যে কিছু ইহলৌকিক নির্দেশ রয়েছে এবং কিছু পারলৌকিক নির্দেশ রয়েছে।

ইহজগতে তার উপর আল্লাহ তা'আলা নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে প্রভৃত্য দান করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلَيْهِ سُلْطَانًا

অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তির অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে, আমি তার অভিভাবককে প্রভৃত্য দান করেছি।’ (১৭: ৩৩) তাঁর অধিকার রয়েছে যে, প্রতিশোধ নিতে পারে অর্থাৎ হত্যাকারীকেও হত্যা করাতে পারে কিংবা ক্ষমা করতে পারে, রক্তপণও আদায় করতে পারে। এর রক্তপণও খুব কঠিন। এটা তিন ভাগে বিভক্ত। (১) ত্রিশটি দিতে হবে ঐ উট যেগুলোর বয়স তিন বছর পার হয়ে চতুর্থ বছরে পড়েছে। (২) ত্রিশটি দিতে হবে ঐ উট যেগুলো পঞ্চম বছরে পড়েছে। (৩) চালিশটি দিতে হবে গর্ববতী উষ্ণী। এগুলো আহকামের পুস্তকসমূহে সাব্যস্ত রয়েছে। সজ্ঞানে হত্যাকারীর উপর গোলাম আযাদ করা বা একাধিক্রমে দু'মাস রোয়া রাখা অথবা ষাটটি মিসকীনকে খানা খাওয়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে কি-না সে ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ) ও তাঁর সহচরগণের ও আলেমদের একটি দলের উক্তি এই যে, ভ্রমবশতঃ হত্যায় যখন এ ব্যবস্থা রয়েছে তখন ইচ্ছাপূর্বক হত্যায় থাকাতো আরও যুক্তিযুক্ত। ঐগুলোর উপর উন্নত হিসেবে শরীয়ত অসম্ভব, মিথ্যা শপথের কাফ্ফারা পেশ করা হয়েছে এবং তাঁরা ইচ্ছাপূর্বক ছেড়ে দেয়া নামায়ের কায়াকে তার ওয়র বানিয়েছেন, যেমন ভুলের সময় তার উপর ইজমা রয়েছে।’

ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর সহচরগণ এবং অন্যান্যগণ বলেন যে, ইচ্ছাপূর্বক হত্যা কাফফারা হতে অনেক বড়। এজন্যেই তাতে কাফফারা নেই। অনুরূপভাবে মিথ্যা শপথ এবং ঐ দু' অবস্থায়ও ইচ্ছাপূর্বক ছেড়ে দেয়া নামাযের মধ্যে পার্থক্য করণের তাঁদের কোন পথ নেই। কেননা, তাঁরা ইচ্ছাপূর্বক ছেড়ে দেয়া নামাযের কাষা ওয়াজিব হওয়ার সমর্থক। পূর্বদলের একটি দলীল মুসনাদ-ই-আহমাদে বর্ণিত নিম্নের হাদীসটিও বটেঃ হযরত গারীফ ইবনে আইয়াশ আদদায়লামী (রঃ) বলেন, আমরা হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রাঃ)-এর নিকট এসে বলি, আমাদেরকে এমন একটি হাদীস শুনিয়ে দিন যাতে কোন কম বেশী থাকবে না।’ একথা শুনে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন—‘তোমরা যখন কুরআন কারীম নিয়ে পাঠ কর তখন তাতে কম বেশী কর না কি?’ তখন আমরা বলি, ‘আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, যা আপনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছেন।’ তিনি তখন বলেন, আমরা আমাদের এমন একটি লোকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়েছিলাম যে লোকটি হত্যার কারণে নিজেকে জাহান্নামী করে নিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘তার পক্ষ হতে একটি দাসকে মুক্ত কর। তার এক একটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ এই লোকটির এক একটি অঙ্গ জাহান্নাম হতে মুক্ত করবেন।’

৯৪। হে মুমিনগণ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে বহিগত হও তখন প্রত্যেক কাজ তথ্য নিয়ে করো, এবং কেউ তোমাদেরকে ‘সালাম’ করলে তাকে বলো না যে, তুমি মুমিন নও; তোমরা কি পার্থিব জীবনের সম্পদ অনুসন্ধান করছো? তবে আল্লাহর নিকট প্রচুর সম্পদ রয়েছে; প্রথমে তোমরা ঐরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন; অতএব তোমরা স্থির করে নাও যে, তোমরা যা করছো নিশ্চয়ই আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।

يَا يَهُوَ أَنْتَ إِلَهُ الَّذِينَ امْسَأْلَوْا  
ضَرَبْتَمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا  
وَلَا تَقُولُوا لِمَنِ الْقَى إِلَيْكُمْ  
السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ  
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ  
اللَّهِ مَغَانِيمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كَنْتُمْ  
مِنْ قَبْلِ فَمَنِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ॥

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বানু সালীম গোত্রের একটি লোক ছাগল চরাতে চরাতে সাহাবা-ই-কিরামের একটি দলের পার্শ্ব দিয়ে গমন করে এবং তাদেরকে সালাম দেয়। তখন সাহাবীগণ পরম্পর বলাবলি করেনঃ এ লোকটি মুসলমান তো নয় শুধু জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে সালাম করছে। অতএব তাঁরা তাকে হত্যা করতঃ ছাগলগুলো নিয়ে নবী (সঃ)-এর নিকট চলে আসেন। সে সময়ই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

হাদীসটি বিশুদ্ধ তো বটে কিন্তু কতক লোক কয়েকটি কারণে এটাকে ক্রটিযুক্ত বলেছেন। প্রথম কারণ এই যে, এর একজন বর্ণনাকারী সাম্মাক ছাড়া এ পছ্যায় আর কেউ এটা বের করেনি। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এটা তার হ্যরত ইকরামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করার ব্যাপারেও সংশয় রয়েছে। তৃতীয় কারণ এই যে, এর শান-ই-নয়লে আরও ঘটনা বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন, এটা মুহলিম ইবনে জাসামার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। অন্য কেউ বলেন যে, এটা হ্যরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এছাড়া আরও উক্তি রয়েছে। কিন্তু আমি বলি যে, এ সমুদয় কথাই বজ্ঞানীয়। কেননা, সাম্মাক হতে বহু বড় বড় ইমাম এটা বর্ণনা করেছেন।

সহীহ গ্রন্থে ইকরামা (রাঃ) হতেও দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। এ বর্ণনাটিই অন্য পছ্যায় সহীহ বুখারীতে হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। হ্যরত সাঈদ ইবনে মানসূরও (রাঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীর এবং মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, একটি লোককে তার পিতা ও তার স্পন্দায়ের লোক তাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পৌছানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে প্রেরণ করে। পথে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রেরিত এক সেনাবাহিনীর সাথে রাত্রিকালে তার সাক্ষাৎ ঘটে। সে তাঁদের নিকট নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস না হওয়ায় শক্র জ্ঞানে তাঁরা তাকে হত্যা করে ফেলেন। তার পিতা এ সংবাদ পেয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করে। ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করে রক্তপন আদায় করেন এবং তাকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে বিদায় করেন।

মুহলিম ইবনে জাসামার ঘটনা এই যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাদরাদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ইয়মের দিকে প্রেরণ করেন। আমি একটি ক্ষুদ্র মুসলিম সেনাদলের সাথে বের হই যার মধ্যে ছিলেন

আবু কাতাদাহ (রাঃ), হারিস ইবনে রাবঙ্গ (রাঃ) এবং মুহলিম ইবনে জাসামা ইবনে কায়েস। আমরা বাতনে ইয়মে পৌছলে আমের ইবনে আযবাত আশজাঙ্গি উটে চড়ে সেখান দিয়ে গমন করেন। তাঁর সাথে বহু আসবাবপত্র ছিল। আমাদের পার্শ্ব দিয়ে গমনের সময় তিনি আমাদেরকে সালাম দেন। তখন আমরা তাঁকে হত্যা করা হতে বিরত থাকি। কিন্তু মুহলিম ইবনে জাসামা তাঁকে পারস্পরিক বিবাদের ভিত্তিতে হত্যা করে দেয় এবং তার উট ও আসবাবপত্র নিয়ে নেয়। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ফিরে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করি। তখন উপরোক্ত আয়াতটি অবর্তীণ হয়। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হ্যরত আমের (রাঃ) ইসলামী রীতিতে সালাম দেন। কিন্তু অজ্ঞতা যুগে শক্রতার কারণে মুহলিম ইবনে জাসামা তাঁকে তীর মেরে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি আমের (রাঃ)-এর লোকদের সাথে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁর পক্ষ হতে উয়াইনা ও আকরা' কথা বলে। আকরা' বলে, 'হে আল্লাহ! রাসূল (সঃ)! আজ সে খুশী হয়েছে, কিন্তু কাল সে দুঃখ ভোগ করবে'। তখন উয়াইনা বলে, 'না, না। আল্লাহর শপথ! (তাকে ছাড়া হবে না) যে পর্যন্ত তার স্ত্রীদের উপর ঐ বিপদ না পৌছবে যে বিপদ আমাদের স্ত্রীদের উপর পৌছেছে। মুহলিম ইবনে জাসামা দু' খানা চাদর পরিহিত হয়ে আগমন করে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে বসে পড়ে এ আশায় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করবেন না।' সে তখন অত্যন্ত লজ্জিত হয় এবং কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়ে ও চাদরে চক্ষু মুছতে মুছতে বিদায় হয়। সাতদিনও অতিক্রান্ত হয়নি এর মধ্যেই সে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। জনগণ তাকে সমাধিস্থ করে। কিন্তু ভূমি তার দেহ উপরে উঠিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে এ ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি বলেনঃ 'তোমাদের এ সঙ্গী অপেক্ষা বহুগুণ দুষ্ট লোককেও ভূমি গ্রহণ করেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এই যে, তিনি তোমাদেরকে মুসলমানের মর্যাদা প্রদর্শন করবেন।' অতঃপর জনগণ তাকে পাহাড়ের উপর নিষ্কেপ করে এবং তার উপর পাথর চাপিয়ে দেয়। সে সময় এ আয়াতটি অবর্তীণ হয়। (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) সহীহ বুখারী শরীফে হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) হতে মুআল্লাকরণে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত মিকদাদ (রাঃ)-কে বলেনঃ 'যখন একজন মুমিন কাফির সম্প্রদায়ের মধ্যে তার ঈমান গোপন

রেখেছিল, অতঃপর সে তার ঈমান প্রকাশ করা সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করলে? তোমরাও তো মকায় এরূপই তোমাদের ঈমান গোপন রেখেছিলে?

মুসনাদ-ই-বায়যায়ে হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করেন যার মধ্যে হ্যরত মিকদাদও (রাঃ) ছিলেন। যখন তারা শক্রদের নিকট পৌছেছেন তখন সবাই এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শুধু একটি লোক রয়ে যায় যার নিকট বহু মাল ছিল। সে তাঁদেরকে দেখামাত্রই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও হ্যরত মিকদাদ (রাঃ) তার উপর আক্রমণ করতঃ তাকে হত্যা করে দেন। তখন তাঁর সঙ্গীদের এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, ‘যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, আল্লাহ ছাড়া কেন মা'বুদ নেই তাকে তুমি হত্যা করলে? আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে এটা বর্ণনা করবো।’ অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করতঃ বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! একটি লোক সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তাকে মিকদাদ (রাঃ) হত্যা করেছেন।’ তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘তোমরা মিকদাদ (রাঃ)-কে আমার নিকট ডেকে আন।’ (তিনি আসলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেন)ঃ ‘হে মিকদাদ (রাঃ)! তুমি এমন এক লোককে হত্যা করলে যে ’اللَّهُ أَكْبَرُ পাঠ করেছিল? কিয়ামতের দিন তুমি এ اللَّهُ أَكْبَرُ-এর সামনে কি করবে? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ(সঃ) বলেনঃ ‘হে মিকদাদ (রাঃ)! এ লোকটি গোপন মুসলিম ছিল। আর সে ইসলাম প্রকাশ করা সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করে দিলে? অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন- ‘আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রচুর গনীমত রয়েছে। অর্থাৎ গনীমতের লোভে তোমরা এরূপ অবহেলা প্রদর্শন করছো এবং ইসলাম প্রকাশকারীকেও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হত্যা করছো, তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে এ গনীমতও রয়েছে এবং তা তাঁর নিকট প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সেগুলো তিনি তোমাদেরকে হালাল উপায়ে প্রদান করবেন। ওটা তোমাদের জন্যে এ মাল অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম হবে। তোমরা তোমাদের ঐ সময়কে শ্বরণ কর যখন তোমরাও এরূপ ছিলে। তখন তোমরাও দুর্বলতার কারণে তোমাদের ঈমান প্রকাশ করার সাহস রাখিনি। তোমরা তোমাদের কওমের মধ্যে গোপনে চলাফেরা করতে। আজ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আজ তিনি তোমাদেরকে শক্তি

দিয়েছেন বলেই তোমরা খোলাখুলি ইসলাম প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছো। তাহলে আজও যারা শক্রদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ রয়েছে এবং প্রকাশ্যে ইসলাম প্রকাশ করতে পারছে না, তারা যদি তোমাদের সামনে তার ইসলাম প্রকাশ করে তবে তা মেনে নিতে হবে। যেমন তিনি বলেনঃ

وَذْكُرُوا إِذَا نَّتَمْ قَلْيَلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ ‘তোমরা তোমাদের ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর যখন তোমরা অল্প ছিলে ও ভূপঞ্চে দুর্বল বলে বিবেচিত হচ্ছিলে।’ (৮: ২৬ মোটকথা, ইরশাদ হচ্ছে যে, যেমন এ ছাগলের রাখালটি স্বীয় ঈমান গোপন রেখেছিল তদ্বপ্ত তোমরাও ইতিপূর্বে সংখ্যায় অল্প ছিলে, তোমাদের শক্তি কম ছিল, কাজেই তোমরাও তখন মুশরিকদের মধ্যে তোমাদের ঈমান গোপন রেখেছিলে। ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরাও তখন মুমিন ছিলে না। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর অনুগ্রহ করতঃ তোমাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করেছেন।

হ্যরত উসামা (রাঃ) শপথ করে বলেছিলেন, ‘এরপরে আর কখনও ‘লা-ইলাহা ইল্লাহ’ উচ্চারণকারীকে হত্যা করবো না’। কেননা, এ ব্যাপারে তাঁরা পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। অতঃপর গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয়বার বলা হচ্ছে—‘তোমরা যা করছো তা খুব ভেবে চিন্তে কর।’

অতঃপর ধর্মক দেয়া হচ্ছে—‘আল্লাহ তা‘আলাকে তোমরা তোমাদের কার্যকলাপের ব্যাপারে উদাসীন মনে করো না। তোমরা যা কিছু করছো তার তিনি পূর্ণ খবর রাখছেন’।

৯৫। মুমিনদের মধ্যে যারা কোন দুঃখ পীড়া ব্যতীতই গৃহে বসে থাকে, আর যারা স্বীয় ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে— তারা সমান নয়; আল্লাহ ধন প্রাণ দ্বারা ধর্মযুদ্ধকারীগণকে উপবিষ্টগণের উপর পদ-মর্যাদায় গৌরবান্বিত করেছেন;

- ৯৫ -  
لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ  
الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَئِي الضَّرَبِ  
وَالْمُجَهَّدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضْلُ اللَّهِ  
عَلَى الْمُجْهَدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ

এবং সকলকেই আল্লাহ  
কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান  
করেছেন এবং উপবিষ্টগণের  
উপর ধর্মযোদ্ধাগণকে মহান  
প্রতিদানে গৌরবাভিত  
করেছেন ।

وَانْفِسُهُمْ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرْجَةٌ  
وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسْنِي  
وَفَضْلَ اللَّهِ الْمُجِهِدِينَ عَلَى  
الْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

৯৬। স্বীয় সন্নিধান হতে

পদ-মর্যাদা ক্ষমা ও করুণা  
(দ্বারা গৌরবাভিত করেছেন)  
এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল,  
করুণাময় ।

١٠ وَانْفِسُهُمْ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرْجَةٌ  
١١ وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسْنِي  
١٢ وَفَضْلَ اللَّهِ الْمُجِهِدِينَ عَلَى  
١٣ الْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

٩٦ - دَرْجَتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হ্যরত বারা' (রাঃ) বলেন যে, „যখন এ আয়াতের প্রাথমিক শব্দগুলো অবতীর্ণ হয়—‘গৃহে উপবিষ্টগণ ও ধর্মযোদ্ধাগণ সমান নয়’ তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত যায়েদ (রাঃ)-কে ডেকে নিছিলেন এমন সময়ে হ্যরত উষ্মে মাকতূম (রাঃ) উপস্থিত হন এবং বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তো অঙ্ক !’ তখন **غَيْرُ أُولَئِي الضَّرَرِ**-এ অংশটুকু অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ ঐ উপবিষ্টগণ সমান নয় যারা বিনা ওয়ারে গৃহে উপবিষ্ট থাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হ্যরত যায়েদ (রাঃ) স্বীয় দোয়াত, কলম ও কালি নিয়ে এসেছিলেন। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, ইবনে উষ্মে মাকতূম (রাঃ) বলেছিলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি আমার ক্ষমতা থাকতো তবে আমি অবশ্যই জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম।’ তখন **غَيْرُ أُولَئِي الضَّرَرِ**-এ শব্দগুলো অবতীর্ণ হয়। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উরু হ্যরত যায়েদ (রাঃ)- এর উপর ছিল। হ্যরত যায়েদ (রাঃ)- এর উরুর উপর এত চাপ পড়ে যে, যেন তা ভেঙেই যাবে। আর একটি হাদীসে রয়েছে, হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেন, যখন এ শব্দগুলোর অহী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয় এবং ‘সকীনা’ তাঁকে আবৃত করে সে সময় আমি তাঁর পার্শ্বদেশে বসেছিলাম, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উরু আমার উপর এত ভারী অনুভূত হয় যে, আমি এত ভারী বোঝা কখনও বহন করিনি। অতঃপর অহী সরে যাওয়ার পর তিনি **أَجْرًا عَظِيمًا** পর্যন্ত আয়াত লিখিয়ে নেন। আমি ওটা কাঁধের অস্ত্রিং উপর লিখে লই।

অন্য একটি হাদীসে নিম্নের শব্দগুলো রয়েছেঃ ‘তখনও ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর কথাগুলো শেষ হয়নি এর মধ্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর উপর অহী অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়ে যায়।’

হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেন, ‘ঐ দৃশ্য এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে, আমি যেন দেখছি। পরে অবতীর্ণ এ শব্দগুলো আমি পূর্ব লিখার সঙ্গে সংযোগ করে দেই।

হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াত দ্বারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং যুদ্ধে অনুপস্থিতদেরকে বুঝান হয়েছে। বদরের যুদ্ধের সময় হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) এবং হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা দু’জন তো অঙ্ক। আমাদের জন্যে অবকাশ রয়েছে কি?’ তখন তাঁদেকে কুরআন কারীমের এ আয়াতের মাধ্যমে ‘অবকাশ দেয়া হয়। সুতরাং মুজাহিদগণকে যে উপবিষ্টদের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন ঐসব লোক যাঁরা সুস্থ ও সবল। প্রথমে মুজাহিদগণকে সাধারণভাবে উপবিষ্টদের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। অতঃপর *غَيْرُ اُولِيِ الْضَّرَرِ*-এ শব্দগুলো অবতীর্ণ করতঃ যাঁদের শরীয়ত সমর্থিত ওয়র রয়েছে, তাঁদেরকে সাধারণ উপবিষ্টগণ হতে পৃথক করা হয়। যেমন অঙ্ক, খেঁড়া, ঝঁঝ ইত্যাদি। এসব লোক মুজাহিদগণেরই শ্রেণীভুক্ত। অতঃপর মুজাহিদগণের যে মর্যাদা বর্ণনা করেছেন ওটাও ঐসব লোকের উপর, যাঁরা বিনা কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন না। যেমন হ্যরত ইবনে আববাস- (রাঃ)-এর তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা হওয়াই উচিতও বটে।

সহীহ বুখারী শরীফে হ্যরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘মদীনায় এমন কতক লোকও রয়েছে যে, তোমরা যে যুদ্ধের সফর কর এবং যে জঙ্গল অতিক্রম কর, তারা পুণ্যে তোমাদের সমান। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ‘যদিও তাঁরা মদীনাতেই অবস্থান করেন?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘হ্যাঁ, কেননা ওয়র তাদেরকে বাধা দিয়ে রেখেছেঃ’ অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘তোমরা যা খরচ কর তার পুণ্য তোমরাও যেমন পাও, তারাও তেমনই পেয়ে থাকে।’ এ ভাবার্থকেই একজন কবি নিম্নের কবিতায় বর্ণনা করেছেনঃ

بَأَرْجِلِينَ إِلَى الْبَيْتِ الْعُتِيقِ لَقَدْ \* سِرْتُمْ جُسْوَمًا وَسِرْنَا نَحْنُ أَرْوَاحًا  
إِنَّا أَقْمَنَا عَلَى عَذَّرٍ وَعَنْ قَدْرٍ \* وَمَنْ أَقَامَ عَلَى عَذَّرٍ فَقَدْ رَاحَ

অর্থাৎ ‘হে আল্লাহর ঘরের দিকে হজ্জ যাত্রীগণ! তোমরা যদিও সশরীরে এই দিকে চলেছো, কিন্তু আমরা ঝুঁতু গতিতে এই দিকে চলেছি। জেনে রেখো যে, শক্তিশীলতা ও ওয়র আমাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে এবং এটা স্পষ্ট কথা যে, ওয়রের কারণে বাড়িতে অবস্থানকারী যাত্রীদের অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।’

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন-‘সকলকেই আল্লাহ তা‘আলা কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রূতি দান করেছেন।’ এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, জিহাদ ফরযে আইন নয়, বরং ফরযে কিফায়া। তারপরে ইরশাদ হচ্ছে-‘বাড়িতে উপবিষ্টদের উপর মুজাহিদগণের বড়ই মর্যাদা রয়েছে।’ অতঃপর আল্লাহ পাক তাদের উচ্চ পদ-মর্যাদা, তাদের পাপ মার্জনা করণ এবং তাদের উপর যে করুণা ও অনুগ্রহ রয়েছে তা বর্ণনা করেছেন। তারপর স্বীয় সাধারণ ক্ষমা ও সাধারণ দয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ জান্নাতে একশ দরজা রয়েছে। যেগুলো আল্লাহ তা‘আলা তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং প্রত্যেক দরজার মধ্যে এ পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে যে পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে আসমান ও যমীনের মধ্যে।’ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তৌর চালনা করে সে জান্নাতের দরজা লাভ করে।’ এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেনঃ ‘দরজা কি?’ তিনি বলেনঃ “ওটা তোমাদের এখানকার ঘরের দরজার সমান নয় বরং দু’ দরজার মধ্যে শত বছরের দূরত্ব রয়েছে।”

১৭। নিচয়ই যারা স্বীয় জীবনের  
প্রতি অভ্যাচার করেছিল-  
ক্ষেরেশতা তাদের প্রাণ হরণ  
করে বলবে, তোমরা কি  
অবস্থায় ছিলে? তারা বলবে,  
আমরা দুনিয়ায় অসহায়  
ছিলাম; তারা বলবে, আল্লাহর

۹۷- إِنَّ الَّذِينَ تَوْفَّهُمُ الْمَلِكَةُ  
ظَالِمِيَ اَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمْ  
كُنْتُمْ قَالُوا كَنَا مُسْتَضْعَفِينَ  
فِي الارضِ قَالُوا الْمُكْرَمُونَ

পৃথিবী কি প্রশ়ঙ্গ ছিল না যে,  
তন্মধ্যে তোমরা হিজরত  
করতে? অতএব ওদেরই  
বাসস্থান জাহন্নাম এবং ওটা  
নিকৃষ্ট গতব্য স্থান।

১৮। কিন্তু পুরুষ, নারী এবং  
শিশুগণের মধ্যে অসহায়তা  
বশতঃ যারা কোন উপায়  
করতে পারে না অথবা কোন  
পথ প্রাপ্ত হয় না।

১৯। ফলতঃ তাদেরই আশা  
আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে  
ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ  
মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

১০০। আর যে কেউ আল্লাহর  
পথে দেশত্যাগ করেছে সে  
পৃথিবীতে বহু প্রশ়ঙ্গ স্থান ও  
স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হবে, এবং যে  
কেউ গৃহ হতে বহিগত হয়ে  
আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে  
দেশ ত্যাগ করে- তৎপর সে  
মৃত্যু মুখে পতিত হয়- তবে  
নিচয়ই এর প্রতিদান আল্লাহর  
উপর ন্যস্ত রয়েছে; এবং  
আল্লাহ ক্ষমাশীল, কর্মণাময়।

أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَتَهَا جَرُوا  
فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا وَهُمْ جَهَنَّمُ  
وَسَاءُتْ مَصِيرًا

۹۸- إِلَّا الْمُسْتَضْعَفُونَ مِنَ  
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ لَا  
يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ  
سَبِيلًا

۹۹- فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ  
يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا  
غَفُورًا

۱۰۰- وَمَنْ يَهَا جِرْ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا  
كَثِيرًا وَسَعْةً وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ  
بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
ثُمَّ يَدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ  
أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَّحِيمًا

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আল-আসওয়াদ (রঃ) বলেন, ‘মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে যে সেনাবাহিনী গঠন করা হয়েছিল তাতে আমারও নাম ছিল। আমি তখন হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর গোলাম হ্যরত ইকরামা (রঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতঃ এ কথাটি তাঁকে বলি। তিনি এতে আমাকে অংশগ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন এবং বলেন, ‘আমি হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে যেসব মুসলমান মুশরিকদের সঙ্গে ছিল এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছিল, মাঝে মাঝে এমনও হতো যে, তাদের কেউ কেউ মুসলমানদেরই তীরের আঘাতে নিহত হতো বা তাদেরই তরবারী দ্বারা তাদেরকে হত্যা করা হতো। তখন আল্লাহ তা‘আলা<sup>رَبُّ الْعَالَمِينَ</sup> - এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এরূপ লোক যারা তাদের ঈমান গোপন রেখেছিল, বদরের যুদ্ধে যখন তারা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় তখন মুসলমানদের হাতে তাদের কয়েকজন লোক মারা যায়। ফলে মুসলমানেরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বলেঃ ‘আফসোস! এরা তো আমাদের ভাই ছিল, অথচ এরা আমাদেরই হাতে মারা গেল।’ তারা তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর অবশিষ্ট মুসলমানদের নিকট এ আয়াতটি লিখেন যে, তাদের কোন ওয়র ছিল না। তখন তারা বের হয় এবং তাদের সাথে মুশরিকরা মিলিত হয় ও তাদেরকে নিরাপত্তা দান করে। সে সময় মুশরিকদের সঙ্গে বলেঃ (২৪: ৮) - এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হ্যরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি কুরাইশের ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা ইসলামের কালেমা পাঠ করেছিল এবং মক্কাতেই ছিল। তাদের মধ্যে ছিল আলী ইবনে উমাইয়া ইবনে খালাফ, আবু কায়েস ইবনে ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা, আবু মানসুর ইবনে হাজাজ এবং হারেস ইবনে জামআ’।

হ্যরত যহুক (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ঐ মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হিজরতের পরেও মক্কায় রয়ে গিয়েছিল। অতঃপর বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সঙ্গে এসেছিল। তাদের কয়েকজন যুদ্ধক্ষেত্রে মারাও যায়। ভাবার্থ এই যে, আয়াতের হৃকুম হচ্ছে সাধারণ। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্যেই এ হৃকুম প্রযোজ্য যে হিজরত করতে সক্ষম অথচ মুশরিকদের মধ্যে পড়ে থাকে এবং দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকে না। সে আল্লাহ তা‘আলার নিকট

অত্যাচারী। এ আয়াতের ভাব হিসেবে এবং মুসলমানদের ইজমা হিসেবেও সে হারাম কার্যে লিখ হওয়ার দোষে দোষী। এ আয়াতে হিজরত করা ছেড়ে দেয়াকে অত্যাচার বলা হয়েছে। এ প্রকারের লোকদেরকে তাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেনঃ ‘তোমরা এখানে পড়ে রয়েছো কেন? কেন তোমরা হিজরত করনি?’ তারা উত্তর দেয়, “আমরা নিজেদের শহর ছেড়ে অন্য কোন শহরে চলে যেতে সক্ষম হইনি।” তাদের এ কথার উত্তরে ফেরেশতাগণ বলেন-‘আল্লাহ তা’আলার পৃথিবী কি প্রশংস্ত ছিল না?’

মুসনাদ-ই-আবু দাউদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি মুশরিকের সাথে মিলিত হয় এবং তার সাথেই বাস করে সে ওর মতই।’ হ্যরত সুন্দী (রঃ) বলেন যে, যখন হ্যরত আব্বাস (রাঃ), আকীল ও নাওফিলকে বন্দী করা হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আব্বাস (রাঃ)-কে বলেনঃ ‘আপনি আপনার নিজের ও আপনার ভাতুপ্ত্রের মুক্তি পণ প্রদান করুন।’ তখন হ্যরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা কি আপনার কিবলার দিকে নামায পড়তাম না এবং আমরা কি কালেমা-ই-শাহাদাত পাঠ করতাম না?’ তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘হে আব্বাস (রাঃ)! আপনারা তর্কতো উথাপন করেছেন, কিন্তু আপনারা পরাজিত হয়ে যাবেন। শুনুন, আল্লাহ তা’আলা বলে-**أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً** অর্থাৎ ‘আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশংস্ত ছিল না?’

এরপর যে লোকদের হিজরত পরিত্যাগের উপর ভর্তসনা নেই তাদের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যারা মুশরিকদের হাত হতে ছুটতে পারে না বা ছুটতে পারলেও হয়তো পথ চেনা নেই, তাদেরকে আল্লাহ পাক ক্ষমা করবেন। **عَسِي** শব্দটি আল্লাহ তা’আলার কালামে নিশ্চয়তা বোধক হয়ে থাকে। আল্লাহ তা’আলা মার্জনাকারী ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল। হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইশার নামাযে **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** বলার পর সিজদায় যাওয়ার পূর্বে দু’আ করেছেনঃ ‘হে আল্লাহ! আইয়াশ ইবনে রাবীআকে, সালাম ইবনে হিশামকে, ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে এবং সমস্ত অসহায় ও শক্তিহীন মুসলমানকে কাফিরদের ছোবল হতে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! ‘মুয়্যর’ গোত্রের উপর আপনার কঠিন শাস্তি অবর্তীণ করুন।’ হে আল্লাহ! তাদের উপর আপনি এমন দুর্ভিক্ষ নায়িল করুন যেমন দুর্ভিক্ষ হ্যরত ইউসুফ (আঃ)-এর যামানায় এসেছিল।’

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সালাম ফেরানোর পর কিবলাহ মুখী হয়েই হাত উঠিয়ে দু'আ করতেনঃ ‘হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে, আইয়াশ ইবনে আবু রাবীআকে সালমা ইবনে হিশামকে এবং অন্যান্য সমস্ত শক্তিহীন মুসলমানকে কফিরদের হাত হতে রক্ষা করুন, যারা না পারে কোন উপায় করতে এবং না পায় কোন পথ।’

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যোহরের নামাযের পরে উপরোক্ত প্রার্থনা করতেন। এ হাদীসটি বিশুদ্ধ, এ সনদ ছাড়া অন্যন্য সনদেও এটা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, ‘আমি এবং আমার মাতা ঐসব দুর্বল নারী ও শক্তিহীন শিশুদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাদের বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ওয়র বিশিষ্টদের মধ্যে গণ্য করেছেন।’ হিজরত করার কাজে উদ্বৃদ্ধ করতে এবং মুশরিকদের হতে পৃথক থাকার হিদায়াত করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আল্লাহর পথে হিজরতকারী যেন নিরাশ না হয়। তারা যেখানেই যাবে তিনি তাদের আশ্রয় লাভের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন এবং তারা শাস্তিতে তথায় বসবাস করতে পারবে।<sup>مرأغم</sup> শব্দের একটি অর্থ এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাওয়াও বটে। হযরত মুজাহিদ বলেন যে, তারা দুঃখ কষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার বহু পক্ষে যাবে। ওর বহু আসবাবপত্র সে লাভ করবে। সে শক্তিদের অভ্যাচার হতেও রক্ষা পাবে এবং তার আহার্যেরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ভাস্তির পথের স্থলে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে এবং দারিদ্র ধনশীলতায় পরিবর্তিত হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘যে ব্যক্তি হিজরতের উদ্দেশ্যে বাঢ়ি হতে বহিগত হয় কিন্তু গন্তব্য স্থানে পৌছার পূর্বেই পথে তার মৃত্যু এসে যায় সেও হিজরতের পূর্ণ পুণ্য প্রাপ্ত হবে।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘প্রত্যেক কার্যের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে ওটাই রয়েছে যার সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর উদ্দেশ্যে, তার হিজরত হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনন্দের কারণ। আর যার হিজরত হয় দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে বা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্যে, সে প্রকৃত হিজরতের পুণ্য প্রাপ্ত হবে না। বরং হিজরত ঐ দিকেই মনে করা হবে।’ এ হাদীসটি সাধারণ। হিজরত ও অন্যান্য সমস্ত আয়লাই এর অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে যে নিরানবইটি লোককে হত্যা করে। অতঃপর একজন আবেদকে হত্যা করতঃ একশ পূর্ণ করে দেয়। তারপর তার তাওবা গৃহীত হবে কি-না তা সে একজন আলেমকে জিজেস করে। আলেম তাকে বলেনঃ তোমার তাওবা ও তোমার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নেই। তুমি তোমার গ্রাম হতে হিজরত করে অমুক শহরে চলে যাও যেখানে আল্লাহ তা'আলা'র আবেদগণ বাস করেন। অতএব সে হিজরতের উদ্দেশ্যে ঐ শহরের দিকে রওয়ানা হয়। কিন্তু পথেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। এখন করণা ও শাস্তির ফেরেশতাদের মধ্যে তার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয়। করণার ফেরেশতাগণ বলেন যে, এ ব্যক্তি হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিল। পক্ষান্তরে শাস্তির ফেরেশতাগণ বলেন যে, তথায় পৌছতে তো পারেনি। অতঃপর তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হয় যে, এ দিকের এবং ঐ দিকের ভূমি মাপ করা হোক। যে গ্রাম সেখান হতে নিকটবর্তী হবে সে গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গেই তাকে মিলিত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা' যমীনকে নির্দেশ দেন যে, ওটা যেন খারাপ গ্রাম হতে দূরবর্তী হয়ে যায় এবং ভাল গ্রামের নিকটবর্তী হয়। তুমি মাপা হলে দেখা যায় যে, একত্বাদীদের গ্রামটি অর্ধহাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়েছে। ফলে তাকে করণার ফেরেশতাগণ নিয়ে যান।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, মৃত্যুর সময় সে সৎলোকদের গ্রামের দিকে বুকের ভরে এগিয়ে যাচ্ছিল।

মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আতীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বাড়ি হতে বের হয়, তারপর তিনি বলেনঃ আল্লাহর পথের মুজাহিদগণ কোথায়ঃ অতঃপর সে সোয়ারী হতে পড়ে মারা যায়, ওর পুণ্যদান আল্লাহ পাকের জিম্মায় চয়ে যায়। অথবা কোন জন্তু তাকে কামড়িয়ে নেয় ফলে সে মারা যায়, ওর পুণ্যদান আল্লাহ তা'আলা'র দায়িত্বে রয়েছে। কিংবা সে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে, তখনও জিহাদের পুণ্যদান আল্লাহ তা'আলা'র জিম্মায় রয়েছে।' (বর্ণনাকারী বলেন যে, স্বাভাবিক মৃত্যুবরণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন এক শব্দ ব্যবহার করেন) আল্লাহর শপথ! আমি এরপ শব্দ রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর পূর্বে কখনও কোন আরববাসীর মুখে শুনিনি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলেনঃ 'যে স্থীয় স্থানে মারা যায় সেও জান্মাতের অধিকারী হয়ে যায়।'

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে, হ্যরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) বলেন, হ্যরত খালিদ ইবনে হিয়াম (রাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। পথে তাঁকে একটি সর্পে দৎশন করে এবং তাতেই তিনি মারা যান। তাঁর ব্যাপারেই এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়। আমি আবিসিনিয়ায় পৌছেই শিয়েছিলাম এবং সংবাদ পেয়েছিলাম যে, হ্যরত খালিদ ইবনে হিয়ামও (রাঃ) হিজরত করে আসছেন। সুতরাং আমি তাঁর আগমনের অপেক্ষা করছিলাম। আমি জানতাম যে, বানু আসাদ গোত্রের তিনি ছাড়া আর কেউ হিজরত করে আসছে না এবং কমবেশী যত মুহাজির ছিলেন তাঁদের সবারই সাথে তাঁদের আত্মীয়-ব্রজন ছিলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে কেউ ছিলেন না। তাই আমি উদ্দেশ্যের সাথে হ্যরত খালিদ (রাঃ)-এর অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমি তাঁর শাহাদাতের সংবাদ প্রাপ্ত হই। এতে আমার বড়ই দুঃখ হয়। এ হাদীসটি অত্যন্ত গরীব। এটা গরীব হওয়ার এও একটি কারণ যে, এটা হচ্ছে মক্কার ঘটনা, আর এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয় মদীনায়। কিন্তু খুব সম্ভব বর্ণনাকারীর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আয়াতটির হৃকুম সাধারণ, যদিও শানে নয়। এটা না হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হ্যরত জুমরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হিজরত করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পৌছার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিকট পৌছার পূর্বে পথে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর ব্যাপারে এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, হ্যরত আবু যামীরা ইবনে আয়িস আয়্যারকী (রাঃ) বলেনঃ যখন *إِلَّا الْمُسْتَضْعِفُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَالسَّيَاءِ وَالْوُلْدَانِ*-এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয় তখন আমি বলি যে, আমি ধনীও বটে এবং আমার উপায়ও রয়েছে কাজেই আমাকে হিজরত করতেই হবে। অতঃপর তিনি হিজরত করতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট পৌছার উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করেন। তিনি ‘তানসেইম’ নামক স্থানে পৌছে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর সম্বন্ধে এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়।

‘তাবরানীর হাদীস গ্রন্থে রয়েছে, হ্যরত আবু মালিক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘যে ব্যক্তি আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার অঙ্গীকারকে সত্য জেনে এবং আমার রাসূলগণের উপর বিশ্বাস রেখে আমার পথে যুদ্ধের জন্য বের হয়, আল্লাহর জিন্নায় এটা রয়েছে যে, তিনি তাকে সৈন্যদের সাথে মৃত্যু দান করে জান্নাতে

প্রবিষ্ট করবেন, অথবা সে আল্লাহর দায়িত্বে পুণ্য, গনীমত এবং অনুগ্রহসহ ফিরে আসবে। আর যদি সে স্বাভাবিকভাবে মারা যায় বা নিহত হয় কিংবা ঘোড়া বা উট হতে পড়ে গিয়ে মারা যায় অথবা কোন বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে মারা যায় বা স্বীয় বিছানায় মারা যায় তবে সে শহীদ হবে।'

সুনান-ই-আবি দাউদে ‘তার জন্যে জান্নাত রয়েছে’ এটুকু বেশী আছে। এর কতগুলো সুনান-ই-আবি দাউদে নেই। হাফিয় আবু ইয়ালা (১৪)-এর মুসনাদে হ্যরত আবু হুরাইরা (১৪) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (১৪) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি হজ্রের উদ্দেশ্যে বের হয়, অতঃপর মারা যায়, কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্যে হজ্র করার পুণ্য লিখা হয়। আর যে উমরার উদ্দেশ্যে বের হয় এবং মারা যায় তার জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত উমরাকারীর পুণ্য লিখা হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের হয়, অতঃপর তার জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত গায়ীর পুণ্য লিখা হয়।’ এ হাদীসটিও গায়ীব।

١٠١- وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ  
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ  
تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفْتُمْ  
أَنْ يَفْتَنُوكُمُ الظَّالِمُونَ كَفَرُوا إِنَّ  
الْكُفَّارِينَ كَانُوا لَكُمْ عُدُوًّا  
مُّبِينًا

ଇରଶାଦ ହଚ୍ଛେ-‘ଯଥନ ତୋମରା ଭୁ-ପୃଷ୍ଠେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କର’ ଅର୍ଥାଏ ଶହରମୂହେର ସଫରେ  
ବେର ହୋ । ଯେମନ ଅନ୍ୟ ଜାୟଗାୟ ଆଲ୍ଲାହ ତା‘ଆଲା ବଲେନଃ

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضىٌ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ  
يَتَغَوَّلُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ -

অর্থাৎ ‘জেনে রেখো যে, সত্ত্বরই তোমাদের মধ্যে ঝুঁগীও হবে এবং অন্যান্য এমন লোকও হবে যারা আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানে ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করবে।’ (৭৩: ২০) তবে সে সময় নামায সংক্ষেপ করায় তোমাদের কোন অপরাধ

নেই। অর্থাৎ চার রাকআতের স্থলে দু'রাকআত, যেমন জমহুর এ আয়াত দ্বারা এটাই বুঝেছেন, যদিও তাঁদের মধ্যে কতক মাসআলায় মতভেদ রয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, সালাত সংক্ষেপ করার জন্য আনুগত্যের সফর হওয়া শর্ত। যেমন জিহাদের জন্য, হাজ বা উমরার জন্য, বিদ্যা অনুসন্ধানের জন্য এবং যিয়ারত ইত্যাদির জন্য সফর করা। ইব্ন উমার (রাঃ), আতা' (রঃ) এবং ইয়াহইয়ারও (রঃ) উক্তি এটাই। একটি বর্ণনা হিসাবে ইমাম মালিকেরও (রঃ) এটাই উক্তি। কেননা এরপরে ঘোষণা রয়েছে : ‘যদি তোমরা আশংকা কর যে, অবিশ্বাসীরা তোমাদেরকে বিব্রত করবে।’ কারও কারও মতে এ শর্ত আরোপের কোনই প্রয়োজন নেই যে, এ সফর আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে হতে হবে, বরং প্রত্যেক বৈধ সফরেই সালাত সংক্ষেপ করা যায়। যেমন মৃত জন্মুর মাংস ভক্ষণের অনুমতি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাল্ল ওয়া তা'আলা বলেন :

**فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَةٍ غَيْرَ مُتَجَازِفٌ لِّإِنْسَمِ**

অর্থাৎ ‘যে পাপাসক্তি ব্যতীত ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়বে (তার জন্যে মৃত জন্মুর গোশ্ত ভক্ষণ বৈধ)।’ (৫ঃ ৩) হ্যাঁ তবে শর্ত এই যে, সেটা যেন পাপ কার্যের উদ্দেশ্যে সফর না হয়। ইমাম শাফিউ (রঃ), ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) প্রমুখ ইমামগণের এটাই উক্তি।

হাদীসে রয়েছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করতঃ বলে, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি একজন ব্যবসায়ী লোক। ব্যবসা উপলক্ষে আমি সমুদ্র ভ্রমণ করে থাকি।’ তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে দু' রাকআত নামায পড়ার নির্দেশ দেন। এ হাদীসটি মুরসাল। কোন কোন লোকের মাযহাব এই যে, প্রত্যেক সফরেই নামায কসর করতে হবে। সফর হয় বৈধই হোক বা অবৈধই হোক। এমনকি, যদি কেউ ডাকাতি বা লুঠতরাজি করার উদ্দেশ্যেও সফর করে সেখানেও নামাযকে ‘কসর’ করার অনুমতি রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ), সাওরী (রঃ) এবং দাউদেরও (রঃ) এটাই উক্তি যে, আয়াতটি সাধারণ। কিন্তু এ উক্তি জমহুরের উক্তির বিপরীত। কাফিরদের হতে ভয় করার যে শর্ত লাগানো হয়েছে তা অধিক প্রচলনের কারণেই লাগানো হয়েছে। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যেহেতু অবস্থা প্রায় একপাই ছিল সেহেতু আয়াতের মধ্যেও ওটা বর্ণনা করা হয়েছে। হিজরতের পর মুসলমানদেরকে যেসব সফরে যেতে হয়েছিল তার সবগুলোই ছিল সন্ত্রাসের সফর। প্রতি পদে

পদে শক্তির ভয় ছিল। এমনকি মুসলমানগণ জিহাদ ছাড়া এবং বিশেষ কোন সেনাবাহিনীর সঙ্গ ছাড়া সফরের জন্যে বের হতেই পারতেন না। আর নিয়ম আছে যে, অধিক হিসেবে যে কথা বলা হয় তার বোধগম্য ধর্তব্য হয় না। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে নির্লজ্জতার কার্যে বাধ্য করো না যদি তারা পবিত্র থাকতে ইচ্ছে করে।’ অন্য জায়গায় রয়েছেঃ ‘তোমাদের যে স্ত্রীদের সাথে তোমরা সহবাস করছো তাদের ঐ মেয়েগুলোও তোমাদের জন্য হারাম যাবা তোমাদের নিকট প্রতিপালিতা হচ্ছে।’ অতএব এ আয়াত দু’টিতে যেমন শর্তের বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু ওর হওয়ার উপরই হুকুম নির্ভর করে না, বরং এ শর্ত ছাড়াও ওটাই হুকুম। অর্থাৎ নির্লজ্জতার কার্যে দাসীদেরকে বাধ্য করা হারাম, তারা পবিত্র থাকার ইচ্ছে করুক আর নাই করুক। অনুরূপভাবে ঐ স্ত্রীর কন্যা তার স্বামীর পক্ষে হারাম যে স্ত্রীর সাথে স্বামী সহবাস করেছে, তার কন্যা তার স্বামীর নিকট প্রতিপালিতা হোক আর নাই হোক। অথচ কুরআন কারীমের মধ্যে দু’জায়গায় এ শর্ত রয়েছে। তাহলে এ দু’ জায়গায় যেমন এসব শর্ত ছাড়াও এ হুকুম, অন্দর এখানেও যদিও তয় না থাকে তবুও শুধু সফরের কারণেই নামাযকে ‘কসর’ করা বৈধ।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, হ্যরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রাঃ) হ্যরত উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, ‘নামায হালকা করার নির্দেশ তো ভয়ের অবস্থায় আর এখন তো নিরাপত্তা রয়েছে (সুতরাং এখন নির্দেশ কি)?’ তখন হ্যরত উমার (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ এ প্রশ্নাই আমিও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে করেছিলাম। তিনি বলেছিলেনঃ ‘এটা আল্লাহ তা'আলার একটা সাদকা যা তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন, সুতরাং তোমরা তা গ্রহণ কর।’ সহীহ মুসলিম, সুনান ইত্যাদির মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে। বর্ণনাটি সম্পূর্ণই সঠিক।

হ্যরত আবু হানযালা খুদামা (রাঃ) হ্যরত উমার (রাঃ)-কে সফরের নামাযের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ‘দু’রাকআত’। তিনি তখন বলেন, কুরআন পাকে তো ভয়ের অবস্থায় দু’রাকআতের কথা রয়েছে। আর এখন তো পূর্ণ নিরাপত্তা বিরাজ করছেঃ’ হ্যরত উমার (রাঃ) তখন বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এটাই সুন্নাত’। (ইবনে আবি শাইবা) অন্য এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ ‘আকাশ থেকে তো এ অবকাশ অবতীর্ণ হয়েছে। এখন তোমার ইচ্ছে হলে তা ফিরিয়ে দাও।’

হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) বলেন, ‘মক্কা ও মদীনার মধ্যে নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে দু’রাকআত নামায পড়েছি।’ (সুনান-ই-নাসাই) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনা হতে মক্কার পথে রওয়ানা হয়েছেন, তখন সেখানে আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্য কোন ভয় ছিল না। তখনও তিনি দু’রাকআত নামায আদায় করতেন।

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, মক্কা হতে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথেও তিনি দু’রাকআতই নামায আদায় করেছেন এবং সে সফরে তিনি মকায় দশ দিন অবস্থান করেছিলেন।

মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত হারেসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘মিনার মাঠে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে যোহর ও আসরের নামায দু’রাকআত পড়েছি, অথচ আমরা সংখ্যায় অনেক ছিলাম এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় ছিলাম।’ সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে, হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে, হ্যরত উমার (রাঃ)-এর সঙ্গে এবং হ্যরত উসমান (রাঃ)-এর সঙ্গে (সফরে) দু’রাকআত নামায পড়েছি। কিন্তু এখন হ্যরত উসমান (রাঃ) স্বীয় খিলাফতের শেষ যুগে পূর্ণ পড়তে আরম্ভ করেছেন।’

সহীহ বুখারী শরীফের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট যখন হ্যরত উসমান (রাঃ)-এর চার রাকআত নামায পড়ার কথা বর্ণিত হয় তখন তিনি ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ পাঠ করেন এবং বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে মিনায় দু’রাকআত নামায পড়েছি এবং হ্যরত আবু বকর (রাঃ) ও হ্যরত উমার (রাঃ)-এর সঙ্গেও পড়েছি। সুতরাং যদি আমার ভাগ্যে এ চার রাকআতের পরিবর্তে গৃহীত দু’রাকআতই পড়তো! অতএব উল্লিখিত হাদীসগুলো এ কথার উপর স্পষ্টভাবে দলীল যে, সফরে নামায ‘কসর’ করার জন্যে ভয়ের অবস্থা হওয়া শর্ত নয়, বরং সম্পূর্ণ নিরাপদ সফরেও দু’রাকআত আদায় করা যায়। এ জন্যেই উলামা-ই-কিরাম বলেন যে, এখানে ভাবার্থ হচ্ছে ‘কাইফিয়াত’ অর্থাৎ কিরআত, দাঁড়ান, ঝুকু, সিজদাহ ইত্যাদির মধ্যে কসর বা সংক্ষেপ করা, ‘কামইয়াত’ অর্থাৎ রাকআতের সংখ্যায় সংক্ষেপ করা নয়। যহুক (রঃ), মুজাহিদ (রঃ) এবং সুন্দি (রঃ)-এর এটাই উক্তি। যেমন পরে আসছে। এর একটি দলীল হচ্ছে ইমাম মালিক (রঃ)-এর বর্ণনাকৃত নিম্নের হাদীসটিঃ হ্যরত

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘নামায দু’ দু’ রাকআত করেই বাড়ীতে ও সফরে ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর সফরে তো দু’ রাকআতই থেকে যায়। কিন্তু বাড়ীতে অবস্থানের সময় আরও দু’ রাকআত বাড়িয়ে দেয়া হয়।’ সুতরাং আলেমদের এ দলটি বলেন যে, প্রকৃত নামায ছিল দু’ রাকআত, তাহলে এ আয়াতে কসরের অর্থ ‘কামইয়াত’ অর্থাৎ রাকাতের সংখ্যায় কম হওয়া কিরূপে হতে পারে? এই উক্তির স্বপক্ষে খুব বড় শক্তি নিম্নের হাদীস দ্বারা পাওয়া যাচ্ছে:

মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘সফরে নামায হচ্ছে দু’রাকআত, ঈদুল আযহার নামায দু’রাকআত, ঈদুল ফিৎরের নামায দু’রাকআত এবং জুমার নামায দু’রাকআত, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ভাষায় এ হচ্ছে পূর্ণ নামায, কসর নয়।’ এ হাদীসটি সুনান-ই-নাসাই, সুনান-ই-ইবনে মাজাহ এবং সহীহ ইবনে হিবানেও রয়েছে। এর সনদ মুসলিমের শর্তের উপরে রয়েছে। এর একজন বর্ণনাকারী ইবনে আবি লাইলা (রঃ)-এর হ্যরত উমার (রাঃ) হতে শ্রবণ করা সাধ্যস্ত আছে। যেমন ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থ ‘সহীহ’-এর ভূমিকার মধ্যে লিখেছেন। স্বয়ং এ বর্ণনায় এবং এ ছাড়া অন্যান্য বর্ণনার মধ্যেও স্পষ্টভাবে এটা বিদ্যমান রয়েছে। আর এটা ইনশাআল্লাহ সঠিকও বটে, যদিও ইয়াহ্বেয়া ইবনে মুস্তেন (রঃ), ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাই (রঃ) বলেন যে, ইবনে আবি লাইলা (রঃ) এটা হ্যরত উমার (রাঃ) হতে শুনেননি। কিন্তু এটা মেনে নিলেও এ সনদে কোন ক্রটি থাকে না। কেননা, অন্য কোন পক্ষায় হ্যরত ইবনে আবি লাইলার উপরে সিকাহ নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন এবং তাঁর হ্যরত উমার (রাঃ) হতে শ্রবণ বর্ণিত আছে। আর সুনান-ই-ইবনে মাজায ইবনে আবি লাইলা (রঃ)-এর হ্যরত কাব ইবনে আজরা হতে এবং তাঁর হ্যরত উমার (রাঃ) হতে রেওয়ায়াতও বর্ণিত আছে। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে অববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তা’আলা তোমাদের নবী (সঃ)-এর ভাষায় তোমাদের উপর নামায ফরয করেছেন বাড়ীতে অবস্থানের সময় চার রাকআত, সফরে দু’ রাকআত এবং ভয়ের অবস্থায় এক রাকআত। অতএব বাড়ীতে অবস্থানের সময় এর পূর্বে ও পরে যেমনিভাবে নামায পড়া হতো তেমনিভাবে সফরেও পড়া হবে। এ বর্ণনায় এবং উপরে হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় যে রয়েছে, ‘আল্লাহ তা’আলা বাড়ীতে অবস্থানের সময়ও দু’রাকআতই ফরয করেছিলেন’ এ দু’টো

বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য কিছুই নেই। কেননা, মূল তো দু'রাকআতই ছিল পরে আরও দু'রাকআত বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তবে এখন বলা যেতে পারে যে, বাড়ীতে অবস্থানের অবস্থায় ফরয চার রাকআতই বটে, যেমন হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। মোটকথা এ দু'টি বর্ণনা দ্বারা জানা গেল যে, সফরে নামায দু'রাকআতই বটে এবং এটাই পূর্ণ নামায, অসম্পূর্ণ নামায নয়, আর হ্যরত উমার (রাঃ)-এর বর্ণনা দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হয়েছে। তাহলে 'কসর' বা নামায সংক্ষেপ করণের ভাবার্থ হচ্ছে 'কসর-ই-কাফিয়াত' অর্থাৎ অবস্থার দিক দিয়ে সংক্ষেপণ, যেমন- 'সলাতুল খাওফ' বা ভয়ের সময়ের নামাযে সংক্ষেপ করা হয়। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেন-'যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে বিব্রত করবে।' আর এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এর পরবর্তী আয়াতে বলেনঃ

وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاقْرَأْ مَتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ

অর্থাৎ 'হে নবী সঃ) তুমি যখন তাদের মধ্যে থাক তখন তাদের জন্যে নামায প্রতিষ্ঠিত কর।' অতঃপর নামায সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে এর নিয়মাবলীও বর্ণনা করেছেন। ইমামুল মুহাদ্দেসিন হ্যরত ইমাম বুখারী (রঃ) পর্যন্ত লিখার পর আরম্ভ করেছেন। ইমামুল মুহাদ্দেসিন হ্যরত ইমাম বুখারী (রঃ) কে কিন্তু চোরার পর্যন্ত লিখার পর আরম্ভ করেছেন। হ্যরত যহুদাক পর্যন্ত লিখার পর আরম্ভ করেছেন। হ্যরত যহুদাক (রঃ)-এর তাফসীরে বলেন যে, এটা হচ্ছে যুদ্ধের সময়, সে সময় মানুষ সোয়ারীর উপর দু' তাকবীরে নামায পড়ে নেবে, তার মুখ যে দিকেই হোক না কেন।

হ্যরত সুন্দী (রঃ) বলেন, 'যখন তুমি সফরে দু' রাকআত নামায পড়ে নেবে তখন তোমার এ 'কসর' পুরো নামাযই হয়ে গেল। হ্যাঁ, তবে যদি ভয় থাকে যে, কাফিররা বিব্রত করবে তবে 'কসর' এক রাকআতই পড়তে হবে। ভয়ের সময় ছাড় এক রাকআত 'কসর' হালাল নয়।'

হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এ আয়াত দ্বারা এই দিনকে বুঝান হয়েছে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীগণসহ 'আসফান' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং মুশরিকরা ছিল 'যজনান' নামক স্থানে। একদল অপর দলের উপর আক্রমণের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। এদিকে যোহরের নামাযের সময় হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণসহ পূর্ব নিয়ম অনুযায়ী পূর্ণ চার

রাকআতই আদায় করেন। এদিকে মুশরিকরা মুসলমানদের আসবাবপত্র লুটে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। ইবনে জারীর (রঃ) এটাকে মুজাহিদ (রঃ), সুন্দী (রঃ), জাবির (রঃ) এবং হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাই অবলম্বন করেছেন এবং এটাকেই সঠিকও বলেছেন। হ্যরত খালিদ ইবনে উসায়েদ (রঃ) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-কে বলেন, ‘আমরা ভয়ের নামাযের কসরের হুকুম তো আল্লাহ তা‘আলার কিতাবের মধ্যে পাচ্ছি, কিন্তু মুসাফিরের নামাযের কসরের হুকুম তো আল্লাহ পাকের কিতাবে পাওয়া যায় না।’ হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) উভয়ে বলেনঃ ‘আমরা আমাদের নবী (সঃ)-কে সফরের নামায কসর করতে দেখেছি এবং আমরাও ওটার উপর আমল করেছি।’

লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, হ্যরত খালিদ ইবনে উসায়েদ (রঃ) কসরের প্রয়োগ ভয়ের নামাযের উপর করলেন এবং আয়াতের ভাবার্থ ভয়ের নামাযই নিলেন, আর মুসাফিরের নামাযকে ওর অন্তর্ভুক্ত করলেন না। আবার হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) ওটা সমর্থনও করলেন। এ আয়াত দ্বারা তিনি মুসাফিরের নামাযের কসরের বর্ণনা না দিয়ে বরং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাজকে তাঁর জন্যে সনদ করলেন। এর চেয়েও স্পষ্ট হচ্ছে ইবনে জারীর (রঃ)-এর বর্ণনাটি। ওতে রয়েছে যে, হ্যরত সাম্মাক (রঃ) তাঁকে সফরের নামাযের মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ ‘সফরের নামায দু’রাকআত এবং এ দু’রাকআতই হচ্ছে সফরের পূর্ণ নামায, কসর নয়। কসর তো রয়েছে ভয়ের নামাযে।’ ইমাম একটি দলকে এক রাকআত নামায পড়াবেন, অন্য দলটি শক্রদের সম্মুখে থাকবে। অতঃপর এ দলটি শক্রদের সামনে চলে যাবে এবং ঐ দলটি চলে আসবে। এ দলটিকে ইমাম সাহেব এক রাকআত নামায পড়াবেন। তাহলে ইমামের দু’রাকআত হবে এবং দল দু’টির এক রাকআত করে হবে।

১০২। এবং যখন তুমি তাদের  
মধ্যে থাক, তখন তাদের  
জন্যে নামায প্রতিষ্ঠিত কর,  
যেন তাদের একদল তোমার  
সাথে দণ্ডযমান হয় এবং  
স্ব-স্ব অন্তর ঘৃণ করে;  
অতঃপর যখন সিজদাহ-

— ১০২ —  
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقْمَتْ  
لَهُمُ الْصَّلَاةُ فَلْتَقْمِمْ طَابِفَةً  
مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا  
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا

সম্পন্ন করে তখন যেন তারা  
তোমার পশ্চাদ্বর্তী হয়; এবং  
অন্য দল যারা নামায পড়েনি  
তারা যেন অগ্রসর হয়ে  
তোমার সাথে নামায পড়ে  
এবং স্ব-স্ব আজ্ঞারক্ষিকা ও অস্ত্র  
গ্রহণ করে এবং অবিশ্বাসীরা  
ইচ্ছে করে যে, তোমরা স্বীয়  
অস্ত্র-শস্ত্র ও দ্রব্য সম্ভার সম্বন্ধে  
অসতর্ক হলেই তারা  
একযোগে তোমাদের উপর  
নিপত্তি হয়; এবং তাতে  
তোমাদের অপরাধ নেই- যদি  
তোমরা বৃষ্টিপাতে বিব্রত হয়ে  
অথবা পীড়িত অবস্থায় স্ব-স্ব  
অস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং স্বীয়  
আজ্ঞারক্ষিকা সঙ্গে গ্রহণ কর;  
এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ  
অবিশ্বাসীদের জন্যে  
অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত  
করেছেন।

فَلِيَكُونُوا مِنْ وَرَاءِكُمْ وَلَتَأْتِ  
طَّائِفَةٌ أَخْرَى لَمْ يُصَلِّوَا  
فَلِيُصَلِّوَا مَعَكُمْ وَلَيَاخْذُوا  
حِذْرَهُمْ وَاسْلِحْتَهُمْ وَدَالِّيْنَ  
كَفَرُوا لَوْ تَغْفِلُونَ عَنْ  
أَسْلِحْتِكُمْ وَأَمْتَعْتِكُمْ  
فَيُمْلِئُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةً  
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ  
بِكُمْ أَذْيَ مِنْ مَطْرٍ أَوْ كُنْتُمْ  
مَرْضَى أَنْ تَضْعُوا أَسْلِحْتَكُمْ  
وَخُذُّوَا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعْدَ  
لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مَهِينًا

ভয়ের নামায কয়েক প্রকার এবং এর কয়েকটি অবস্থা আছে। কখনও এমন  
হয় যে, শক্ররা কিবলার দিকে রয়েছে। কখনও তারা অন্য দিকে হয়। আবার  
নামাযও কখনও চার রাকআতের হয়। কখনও তিন রাকআতের হয়, যেমন  
মাগরিব। কখনও আবার দু'রাকআতের হয়, যেমন ফজর ও সফরের নামায।  
কখনও জামাআতের সাথে পড়া সম্ভব হয়, আবার কখনও শক্ররা এত মুখোমুখী  
হয়ে থাকে যে, জামাআতের সাথে নামায পড়া সম্ভবই হয় না। বরং পৃথক  
পৃথকভাবে কিবলার দিকে মুখ করে বা অন্য দিকে মুখ করে, পায়ে হেঁটে হেঁটে

বা সোয়ারীর উপরে, যেভাবেই সম্ভব হয় পড়ে নেয়া হয়। বরং এমনও হয় এবং ওটা জায়েয়ও বটে যে, শক্রদের উপর আক্রমণ চালাতেই থাকা হয়, তাদেরকে প্রতিরোধও করা হয়, আবার নামাযও আদায় করে যাওয়া হয়। আলেমগণ শুধু এক রাকআত নামায পড়ারও ফতওয়া দিয়েছেন। তাঁদের দলীল হচ্ছে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রাঃ)-এর হাদীসটি যা এর পূর্ববর্তী আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। আতা' (রঃ), জাবির (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), কাতাদাহ (রঃ), হাম্মাদ (রঃ), তাউস (রঃ), যহুক (রঃ), মুহাম্মদ নাসর আল মার্কী (রঃ) এবং ইবনে হাযামেরও (রঃ) এটাই ফতওয়া। এ অবস্থায় যোহরের নামাযে এক রাকআতই রয়ে যায়।

হ্যরত ইসহাক ইবনে রাহউয়াই (রঃ) বলেন যে, একপ দৌড়াদৌড়ির সময় এক রাকআতই যথেষ্ট। ইশারা করেই পড়বে। যদি এটাও সম্ভব না হয় তবে একটা সিজদাহ করবে। এটাও অল্লাহর যিকির। অন্যেরা বলেন যে, শুধু একটি তাকবীরই যথেষ্ট। কিন্তু এটাও হতে পরে যে, একটি সিজদা ও একটি তাকবীরের ভাবার্থ হচ্ছে এক রাকআত নামায। এটা হচ্ছে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের ফতওয়া। হ্যরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ), হ্যরত কা'ব (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণেরও এটাই উক্তি। কিন্তু যেসব লোক শুধু একটি তাকবীরের কথা বলেছেন তাঁরা ওটাকে পূর্ণ রাকআতের উপর প্রয়োগ করেন না, বরং ভাবার্থ তাকবীরই নিয়ে থাকেন। যেমন এটা হচ্ছে ইসহাক ইবনে রাহউয়াইর মাযহাব। আমীর আবদুল ওয়াহহাব ইবনে বাখত মাক্কীও (রঃ) ঐ দিকেই গিয়েছেন। এমনকি তিনি বলেন যে, যদি একটি তাকবীরের উপরও সম্ভব না হয় তবে স্বীয় নাফসের মধ্যেও ওটা ছেড়ে দেবে না। অর্থাৎ শুধু নিয়ত করে নেবে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন।

কোন কোন আলেম একপ বিশেষ সময়ে নামাযকে বিলম্বে পড়ারও অবকাশ দিয়েছেন। তাঁদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) পরিখার যুক্তে সূর্যাস্তের পর যোহর ও আসরের নামায আদায় করেছেন। তার পরে মাগরিব ও ইশার নামায পড়েছেন। এর পরে বানু কুরাইয়ার যুক্তে যাঁদেরকে প্রেরণ করেছিলেন তাঁদেরকে তিনি খুব জোর দিয়ে বলেছিলেনঃ ‘তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বানু কুরাইয়াদের নিকট পৌছার পূর্বে আসরের নামায না পড়ে।’ ঐ লোকগুলো পথে থাকতেই আসরের সময় হয়ে যায়। তখন কেউ কেউ বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর

আমাদেরকে এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল শুধু এই যে, আমরা যেন তাড়াতাড়ি বানু কুরাইয়ার নিকট পৌছে যাই, তাঁর উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, পথে আসরের সময় হয়ে গেলেও আমরা নামায পড়বো না।' সুতরাং পথেই তাঁরা নামায আদায় করে নেন। অন্যেরা বানু কুরাইয়ার নিকট পৌঁছার পর আসরের নামায আদায় করেন। সে সময় সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। নবী (সঃ)-এর সামনে ওটা বর্ণনা করা হলে কোন দলকেই ধর্মক দিলেন না। আমরা কিতাবুস সীরাতে এর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তথায় আমরা এটা প্রমাণ করেছি যে, ঐদলটিই বেশী সঠিক কাজ করেছিলেন যাঁরা সময়মত নামায আদায় করেছিলেন। তবে দ্বিতীয় দলটির ওয়াজ শরীয়ত সমর্থিত ওয়াজই ছিল। উদ্দেশ্যে এই যে, এই দলটি জিহাদের স্থলে শক্রদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের দুর্গের উপর আক্রমণ অব্যাহত রেখে নামায বিলম্বে আদায় করেন। শক্রদের এই দলটি ছিল অভিশপ্ত ইয়াহুদীর দল। তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং সন্দিক শর্তের বিপরীত কাজ করেছিল। কিন্তু জমহুর বলেন যে, খাওফের নামাযের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এসব রহিত হয়ে যায়। এটা ছিল এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। খাওফের নামাযের নির্দেশ জারী হওয়ার পর জিহাদের সময় নামাযকে বিলম্বে পড়ার বৈধতা আর নেই। হ্যরত আবু সাউদ (রঃ)-এর রিওয়ায়েত দ্বারাও এটাই প্রকাশিত হয়েছে, ইমাম শাফিউ (রঃ) যা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফে *بَابُ الْصَّلَاةِ عِنْدَ مَنَاهِضَةِ الْحُصُونَ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ* এ অধ্যায়ে রয়েছে যে, আওয়ায়ী (রঃ) বলেনঃ 'যদি বিজয়ের প্রস্তুতি নেয়া হয় ও জামাআতের সঙ্গে নামায পড়া সম্ভবপর না হয় তবে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় নামায পৃথক পৃথকভাবে ইশারার মাধ্যমে আদায় করবে। যদি ওটাও সম্ভব না হয় তবে বিলম্ব করবে যে পর্যন্ত না যুদ্ধ শেষ হয় অথবা নিরাপত্তা লাভ হয়। অতঃপর দু'রাকআত পড়ে নেবে। কিন্তু যদি নিরাপত্তা লাভ না হয় তবে এক রাকআত আদায় করতে হবে। শুধু তাকবীর পাঠ যথেষ্ট নয়। যদি এ অবস্থাই হয় তবে নামায বিলম্বে পড়তে হবে, যে পর্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তা না আসে।' হ্যরত মাকহুলেরও (রঃ) এটাই উক্তি।

হ্যরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেনঃ 'তিসতার দুর্গের অবরোধের সময় আমি বিদ্যমান ছিলাম। সুবেহ-সাদিকের সময় ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়। আমরা ফজরের নামায পড়তে পারিনি, বরং যুদ্ধেই লিঙ্গ ছিলাম। যখন আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুর্গের উপর বিজয় দান করেন তখন সূর্য উপরে উঠে যাওয়ার

পর আমরা ফজরের নামায আদায় করি। ঐ যুদ্ধে আমাদের ইমাম ছিলেন হ্যরত আবু মূসা (রাঃ')। হ্যরত আনাস (রাঃ) বলেন, ‘ঐ নামাযের বিনিময়ে সারা দুনিয়া এবং ওর সমুদয় জিনিসও আমাকে খুশি করতে পারে না।’

এরপর ইমাম বুখারী (রঃ) পরিখার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায বিলম্বে পড়ার বর্ণনা দেন। তারপর তিনি বানু কুরাইয়া যুক্ত ঘটনাটি এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্ন উক্তিটি আনয়ন করেনঃ ‘তোমরা বানু কুরাইয়ার নিকট পৌছার পূর্বে আসরের নামায আদায় করবে না।’ সম্বরতঃ ইমাম বুখারী (রঃ) এটাই পছন্দ করেন যে, একপ তুমুল যুদ্ধে, ভয়াবহ বিপদ এবং আসন্ন বিজয়ের সময় নামায বিলম্বে আদায় করলে কোন দোষ নেই।

হ্যরত আবু মূসা (রাঃ)-এর নেতৃত্বে তিসতার দুর্গ বিজিত হওয়ার ঘটনাটি হ্যরত উমার ফারুক (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে সংঘটিত হয়। হ্যরত উমার (রাঃ) বা অন্য কোন সাহাবী যে এর প্রতিবাদ করেছেন একপ কোন বর্ণনা নকল করা হয়নি। এসব লোক একথাও বলেন যে, পরিখার যুদ্ধের সময়ও ‘খাওফের’ নামাযের আয়াতগুলো বিদ্যমান ছিল। কেননা, আয়াতগুলো ‘যাতুর রিকা’ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। আর এটা হচ্ছে পরিখার যুদ্ধের পূর্বের যুদ্ধ। এর উপর ‘সিয়ার’ ও ‘মাগায়ীর’ জামহুর-ই-উলামা একমত।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ), ওয়াকেদী (রঃ), ওয়াকেদীর লেখক মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (রঃ) এবং খলীফা ইবনে খাইয়াত (রঃ) প্রমুখ মনীষীগণেরও এটাই উক্তি। তবে ইমাম বুখারী (রঃ) এবং আরও কয়েকজন মনীষীর উক্তি এই যে, ‘যাতুর রিকা’র যুদ্ধ পরিখার যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিল। এর প্রমাণ হচ্ছে হ্যরত আবু মূসা (রাঃ)-এর হাদীসটি এবং স্বয়ং তিনি খাইবারেই এসেছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। কিন্তু সব চাইতে বিশ্বাকর কথা এই যে, আল মুয়ানী (রঃ), কায়ী আবু ইউসুফ (রঃ) এবং ইবরাহীম ইবনে ইসমাইল ইবনে ‘আলিয়া (রঃ) বলেন যে, ‘সলাতুল খওফ’ (ভয়ের নামায) মানসুখ হয়ে গেছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) পরিখার যুদ্ধে নামায বিলম্বে পড়েছেন। এ উক্তি সম্পূর্ণ গারীব। যেহেতু পরিখার যুদ্ধের পরবর্তী ‘সলাতুল খওফের’ হাদীসগুলো এ নামায রহিত না হওয়ার প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। ঐ দিনে নামায বিলম্বে আদায় করাকে মাকহুল (রঃ) এবং আওয়ায়ী (রঃ)-এর উক্তির উপর মাহমুল করাই যুক্তিসঙ্গত হবে। অর্থাৎ তাঁদের ঐ উক্তিটি যা তাঁরা সহীহ বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন তা এই যে, আসন্ন বিজয়ের সময় নামায আদায় করা অসম্ভব হলে নামায বিলম্বে আদায় করা বৈধ।

আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেন-‘যখন তুমি তাদের মধ্যে থাক তখন তাদের জন্যে নামায প্রতিষ্ঠিত কর।’ অর্থাৎ যখন তুমি ভয়ের নামাযে ইমাম হয়ে নামায পড়াবে। এটা প্রথম অবস্থার সময় নয়। কেননা, সে সময় তো মাত্র এক রাকআত নামায পড়তে হবে এবং ওটাও আবার পৃথক পৃথকভাবে হেঁটে হেঁটে, সোয়ারীর উপরে, কিবলার দিকে মুখ করে বা না করে, বরং যে দিকে মুখ করে পড়া সম্ব সে দিকেই পড়তে হবে। যেমন এর হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এখন ইমাম ও জামাআতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এ আয়াতটি জামাআত ওয়াজিব হওয়ার প্রকৃষ্ট ও দৃঢ় দলীল। জামায়াতের কারণেই এত বড় সুবিধে দান করা হয়েছে। জামাআত ওয়াজিব না হলে এটা বৈধ করা হতো না। কেউ কেউ আবার এ আয়াত দ্বারা অন্য দলীলও গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন যে, এ সম্বোধন যখন নবী (সঃ)-কে করা হচ্ছে তখন জানা যাচ্ছে যে, ‘সলাতুল খাওফ’-এর হকুম তাঁর পরে রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু এটা খুবই দুর্বল যুক্তি। এ যুক্তি ঐ রকমই যেমন যুক্তি ঐ লোকদের ছিল যারা খোলাফায়ে রাশেদীনকে যাকাত প্রদানে বিরত হয়েছিল এবং তারা কুরআন পাকের নিম্নে আয়াতটিকে দলীল রূপে পেশ করেছিলঃ

خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَطْهِيرُهُمْ وَتُرْكِبُهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَوةَكَ سَكْنٌ لَهُمْ

অর্থাৎ ‘হে নবী (সঃ)! তুমি তাদের মাল হতে যাকাত গ্রহণ কর যদ্বারা তুমি তাদেরকে পাক-পবিত্র করবে এবং তুমি তাদের জন্যে করুণার প্রার্থনা জানাও, নিশ্চয়ই তোমার প্রার্থনা তাদের জন্যে শান্তির কারণ হবে।’ (৯: ১০৩) এ আয়াতকে কেন্দ্র করেই তারা বলেছিলঃ ‘আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরে আর কাউকেও যাকাতের মাল প্রদান করবো না, বরং স্বহস্তে যাকে চাইবো তাকেই দেবো। আর শুধু তাকেই দেবো যার প্রার্থনা আমাদের জন্যে শান্তির কারণ হবে।’ কিন্তু ওটা তাদের বাজে যুক্তি ছিল। এ কারণেই সাহাবীগণ তাদের যুক্তি অগ্রাহ্য করেন এবং তাদেরকে যাকাত প্রদানে বাধ্য করেন। আর তাদের মধ্যে যারা এর পরেও যাকাত প্রদানে বিরত থাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

এখন আমরা এ আয়াতটির ‘সিফাত’ বর্ণনা করার পূর্বে তার শান-ই-নয়ল বর্ণনা করছি। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, বানু নাজারের একটি গোত্র রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা তো প্রায়ই ভূ-পৃষ্ঠে পর্যটন করে থাকি। অতএব আমরা নামায কিরূপে আদায় করবো?’ তখন আল্লাহ তা‘আলা ‘**وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ**’ অর্থাৎ ‘যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে পর্যটন কর তখন তোমরা নামায ‘কসর’ (সংক্ষেপ) করলে তোমাদের কোন দোষ নেই’-এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অতঃপর বছর ধরে আর কোন অহী অবতীর্ণ হয়নি।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক ঘুঁড়ে ছিলেন। তথায় তিনি যোহরের নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে যান। মুশরিকরা তখন পরম্পর বলাবলি করে, ‘খুব ভাল সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি মুসলমানদেরকে তাদের এ নামাযের অবস্থায় একযোগে অকস্মাত আক্রমণ করতে পারতাম।’ একথা শুনে অপর একজন বলে, ‘এ সুযোগ তো তোমরা আবার পাবে। ক্ষণেক পঁরেই তো তারা অপর একটি নামাযের (আসরের) জন্যে দাঁড়াবে।’ কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা আসরের নামাযের পূর্বেই এবং যোহরের পরে ‘**إِنْ حَفْتُمْ أَنْ يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا**’ হতে পূর্ণ দু’টি আয়াত অবতীর্ণ করেন। ফলে কাফিররা বিফল মনোরথ হয়। এ বর্ণনাটি অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল হলেও ওকে দৃঢ়কারী অন্যান্য বর্ণনাও রয়েছে। হ্যরত আবু আইয়াশ (রাঃ) বলেন, ‘আসফান’ নামক স্থানে আমরা নবী করীম (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। হ্যরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) সে সময় কুফুরীর অবস্থায় ছিলেন এবং তিনি ছিলেন মুশরিক সেনাবাহিনীর সেনাপতি। মুশরিকরা আমাদের সামনে কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে আমরা যোহরের নামায আদায় করি। মুশরিকরা তখন পরম্পর বলাবলি করেঃ ‘আমরা তো সুযোগ ছেড়ে দিলাম। সময় এমন ছিল যে, তারা নামাযে লিঙ্গ ছিল, এ অবস্থায় আমরা তাদেরকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করতাম।’ তখন তাদের কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি বললো, ‘ভাল, কোন অসুবিধে নেই। এরপরে আর একটা নামাযের সময় আসছে এবং সে সময় নামায তাদের নিকট তাদের পুত্র ও স্ত্রীয় প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়।’ অতঃপর যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহ তা‘আলার হৃকুমে হ্যরত জিবরাইল (আঃ)-এ ‘**وَإِذَا كُنْتُمْ فَيْهِمْ فَاقْمِتُ لَهُمُ الصَّلَاةَ**’ আয়াতটি নিয়ে অবতীর্ণ হন। ফলে আসরের নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে অন্ত্র গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। আমরা তখন অন্ত্র গ্রহণ করতঃ তাঁর

পিছনে দু'টি সারি হয়ে দাঁড়িয়ে যাই। অতঃপর তিনি 'রুকু' করলে আমরা সবাই 'রুকু' করি। তারপর নবী (সঃ) সিজদা করেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর পিছনের প্রথম সারির লোকেরাও সিজদা করে এবং অন্য সারির লোকেরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। তারপর যখন এ লোকগুলো সিজদাকার্য সমাপ্ত করে দাঁড়িয়ে যায় তখন দ্বিতীয় সারির লোকগুলো সিজদায় চলে যায়। যখন এ দু'টি সারির লোকেরই সিজদা করা হয়ে যায় তখন প্রথম সারির লোকগুলো দ্বিতীয় সারির লোকদের স্থানে চলে যায়, আর দ্বিতীয় সারির লোকেরা প্রথম সারির লোকদের স্থানে চলে আসে। এরপর কিয়াম, 'রুকু' এবং কাওমা সবই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গেই আদায় করে। তারপর যখন তিনি সিজদায় যান তখন প্রথম সারির লোকেরা তাঁর সাথে সিজদা করে এবং দ্বিতীয় সারির লোকেরা দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে থাকে। যখন প্রথম সারির লোকেরা সিজদা সেরে আত্মাহিয়াতে বসে পড়ে তখন দ্বিতীয় সারির লোকগুলো সিজদায় যায় এবং আত্মাহিয়াতে সবাই এক সঙ্গে হয়ে যায় এবং সালামও সকলেই নবী (সঃ)-এর সঙ্গে এক সাথেই ফিরায়।

'সালাতুল খাওফ' (ভয়ের নামায) রাসূলুল্লাহ (সঃ) একবার প্রথমে এ 'আসফান' নামক স্থানে পড়েন এবং দ্বিতীয়বার বানু সালিমের ভূমিতে পড়েন।' এ হাদীসটি মুসনাদ-ই-আহমাদ, সুনান-ই-আবি দাউদ এবং সুনান-ই-নাসাইর মধ্যেও রয়েছে। এর ইসনাদ বিশুদ্ধ এবং এর 'শাহেদ'ও অনেক রয়েছে।

সহীহ বুখারীর মধ্যেও এ বর্ণনাটি সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে এবং তাতে আছে যে, হ্যরত ইবনে আকবাস (রাঃ) বলেন, 'নবী (সঃ) নামাযে দাঁড়িয়ে গেলে লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যায়। তিনি তাকবীর বললে তারাও তাকবীর বলে। তিনি 'রুকু' করলে লোকেরাও তাঁর সাথে 'রুকু' করে। অতঃপর তিনি সিজদা করলে তারাও তাঁর সাথে সিজদা করে। তারপর তিনি দ্বিতীয় রাকআতের জন্যে দাঁড়িয়ে যান। তাঁর সাথে তারাও দাঁড়িয়ে যান যারা তাঁর সাথে সিজদা করেছিল এবং তারপরে তারা তাদের ভাইদেরকে পাহারা দিতে থাকে। অতঃপর দ্বিতীয় দল চলে আসে তারা তাঁর সাথে 'রুকু' ও সিজদা করে। লোকেরা সবাই নামাযের মধ্যেই ছিল বটে, কিন্তু একে অপরকে পাহারাও দিচ্ছিল।'

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, হ্যরত সুলাইমান ইবনে কায়েস ইয়াসকারী (রঃ) হ্যরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'নামায 'কসর' করার হুকুম কখন অবতীর্ণ হয়েছে?' তখন তিনি বলেন,

‘কুরাইশদের একটি যাত্রী দল সিরিয়া হতে আসছিল। আমরা তাদের দিকে গমন করি। আমরা ‘নাখল’ নামক স্থানে পৌছলে একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পৌছে যায় এবং তাঁকে বলে, ‘হে মুহাম্মাদ ! আপনি কি আমাকে ভয় করেন না?’ তিনি বলেনঃ ‘না।’ সে বলেঃ ‘আপনাকে আমা হতে কে বাঁচাতে পারে?’ তিনি বলেনঃ ‘আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে নেবেন।’ অতঃপর তিনি তরবারী বের করে তাকে ধর্মক দেন ও ভয় প্রদর্শন করেন। তারপর তিনি তথা হতে প্রস্থানের নির্দেশ দেন এবং অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চলতে আরম্ভ করেন। অতঃপর আয়ান দেয়া হয় এবং সাহাবীগণ দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে যান। একদল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে নামায আদায় করছিলেন এবং অন্য দল পাহারা দিছিলেন। যে দলটি তাঁর সাথে মিলিত ছিলেন তাঁরা তাঁর সাথে দু’রাকআত পড়ে নেন। অতঃপর পিছনে সরে গিয়ে অন্য দলটির স্থানে চলে যান এবং ঐদলটি তখন সম্মুখে অগ্রসর হয়ে প্রথম দলটির স্থানে দাঁড়িয়ে যান। তাঁদেরকেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) দু’রাকআত পড়িয়ে দেন এবং সালাম ফেরান। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চার রাকআত হয় এবং ঐ দু’দলের-দু’রাকআত করে হয়, আর আল্লাহ তা’আলা নামায সংক্ষেপ করার ও অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে রাখার হুকুম নায়িল করেন।’

মুসনাদ-ই-আহমাদের এ হাদীসেই রয়েছে যে, যে লোকটি তরবারী নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আক্রমণে উদ্যত হয়েছিল সে শক্রগোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তার নাম ছিল গারাস ইবনে হারিস। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তা’আলার নাম উচ্চারণ করেন তখন তার হাত হতে তরবারী পড়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) সে তরবারী উঠিয়ে নেন। অতঃপর তাকে বলেনঃ ‘এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে?’ সে তখন ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, ‘আপনি আমার প্রতি সদয় হোন।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বলেনঃ ‘তুমি কি সাক্ষ্য দিছ যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ মাঝে নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল?’ সে বলেঃ ‘না, তবে আমি এটা স্বীকার করছি যে, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করবো না এবং যারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তাদেরও সহযোগিতা করবো না।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ছেড়ে দেন। সে নিজের লোকদের নিকট গিয়ে বলে, ‘আমি দুনিয়ার সর্বোত্তম লোকের নিকট হতে তোমাদের নিকট এসেছি।’ অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, ইয়ায়ীদ আল ফাকীর (রঃ) হযরত জাবীর (রাঃ)-কে জিজেস করেনঃ ‘সফরে যে দু’রাকআত নামায রয়েছে ওটা কি ‘কসর’? তিনি উত্তরে বলেনঃ ওটা

পূর্ণ নামায। ‘কসর’ তো জিহাদের সময় মাত্র এক রাকআত।’ অতঃপর তিনি এভাবেই ‘সলাতুল খাওফ’-এরও বর্ণনা দেন। তাতে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সালামের সাথে পিছনের লোকগুলোও সালাম ফেরান, আর ঐ লোকগুলোও সালাম ফেরান। তাতে উভয় অংশের সৈন্যদের সাথে এক রাকআত করে নামায পড়ার বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং সকলেরই এক রাকআত করে হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দু’রাকআত হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, একটি দল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে নামায পড়েছিলেন এবং অন্য দল শক্রুর সম্মুখে ছিলেন। এক রাকআতের পর তাঁর পিছনের লোকগুলো ঐ দলের স্থানে চলে যান এবং তাঁরা এখানে চলে আসেন। এ হাদীসটি বহু পুস্তকে বহু সনদসহ হ্যরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে। আর যে হাদীসটি হ্যরত সালিম (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন তাতে এও রয়েছে যে, পরে সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে নিজে নিজে এক রাকআত করে আদায় করে নেন। ঐ হাদীসটিরও বহু সনদ ও বহু শব্দ রয়েছে। হাফিয় আবু বকর ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) এ সমস্তই জমা করেছেন এবং ঐ রকমই ইবনে জারীরও (রঃ) জমা করেছেন। এটা আমরা ইন্শাআল্লাহ কিতাবুল আহকামিল কাবীরে লিখবো।

কারও কারও মতে ভয়ের নামাযে অন্ত সঙ্গে রাখার নির্দেশ বাধ্যাতামূলক। কেননা, আয়াতের প্রকাশ্য শব্দগুলো দ্বারা এটাই বুঝা যায়। ইমাম শাফিউরও (রঃ) এটাই উক্তি। এ আয়াতেরই পরবর্তী বাক্য এ উক্তির অনুকূলে রয়েছে। তথায় বলা হয়েছে—‘যদি তোমরা বৃষ্টিপাতে বিব্রত হয়ে অথবা পীড়িত অবস্থায় অন্ত-শন্ত্র পরিত্যাগ কর তবে এতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই।’

তারপর বলা হচ্ছে—‘তোমরা স্বীয় আত্মরক্ষিকা সঙ্গে গ্রহণ কর।’ অর্থাৎ এমন প্রস্তুত থাক যে, সময় আসলেই যেন বিনা কষ্ট ও অসুবিধেতেই অন্ত-শন্ত্র সজ্জিত হতে পার। আল্লাহ তা’আলা কাফিরদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

১০৩। অনন্তর যখন তোমরা

নামায সম্পন্ন কর তখন

দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট এবং

এলায়িত অবস্থায় আল্লাহকে

স্মরণ কর; অতঃপর যখন

১.৩ - فِإِذَا قَضَيْتُم الصَّلَاةَ

فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيمًا وَقَعُودًا

وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فِإِذَا اطْمَانْتُم

তোমরা নিরাপদ হও তখন  
নামায প্রতিষ্ঠিত কর; নিচয়ই  
নামায বিশ্বাসীগণের উপর  
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য  
নির্ধারিত।

فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ  
كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا  
مَوْقُوتًا

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে নির্দেশ দিচ্ছেন-'সলাতুল খাওফ' বা ভয়ের সময়ের নামাযের পর তোমরা খুব বেশী করে আল্লাহ তা'আলা যিকির করবে, যদিও তাঁর যিকিরের নির্দেশ এবং ওর গুরুত্ব অন্য নামাযের পরেও এমন কি সব সময়ের জন্যেই রয়েছে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে এজন্যেই বর্ণনা করেছেন যে, এখানে তিনি বান্দাহকে খুব বড় অবকাশ দান করেছেন। তিনি নামায হালকা করে দিয়েছেন। তাছাড়া নামাযের অবস্থায় এদিক ওদিকে সরে যাওয়া এবং যাতায়াত করা উপযোগীতা অনুযায়ী বৈধ করেছেন। যেমন তিনি মর্যাদাসম্পন্ন মাসগুলো সম্পর্কে বলেছেন-

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ

অর্থাৎ 'তোমরা ঐ গুলোর ব্যাপারে তোমাদের নাফসের উপর অত্যাচার করো না।' (১: ৩৬) যদিও অন্যান্য মাসেও অত্যাচার নিষিদ্ধ তথাপি এ পবিত্র মাসগুলোর মধ্যে ওর থেকে বিরত থাকার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই এখানে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, সব সময়ই আল্লাহ তা'আলার যিকির করতে থাক এবং যখন শান্তি এসে যাবে, কোন ভয় ও সন্ত্রাস থাকবে না তখন নিয়মিতভাবে বিনয়ের সাথে নামাযের রুক্নগুলো শরীয়ত মুতাবিক আদায় কর। এ নামায তোমাদের উপর নির্ধারিত সময়েই ফরযে আইন করে দেয়া হয়েছে।

হজ্রের সময় যেমন নির্ধারিত রয়েছে, তদুপ নামাযের সময়ও নির্ধারিত রয়েছে। প্রথম সময়ের পরে দ্বিতীয় সময় এবং দ্বিতীয় সময়ের পরে তৃতীয় সময়।

## ১০৪। এবং সেই সম্প্রদায়ের

অনুসরণ শৈথিল্য করো না  
যদি তোমরা কষ্ট পেয়ে থাক  
তবে তারাও তোমাদের

١٤- وَلَا تَهْنُوا فِي ابْتِغَاءِ  
الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَالْمُونَ

অনুরূপ কষ্ট ভোগ করেছে;  
এবং তৎসহ আল্লাহ হতে  
তোমাদের যে ভরসা আছে,  
তাদের সে ভরসা নেই; এবং  
আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

فَإِنَّهُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ كَمَا تَأْلَمُونَ  
وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ  
وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمًا

(১৫)  
১৬

এরপর বলা হয়েছে যে, তোমরা শক্রদের অনুসন্ধানের ব্যাপারে ভীরুতা প্রদর্শন করো না। চাতুরীর সাথে গোপনীয় জায়গায় বসে থেকে তাদের খবরাখরব নিতে থাকো। তোমরা যদি নিহত বা আহত হও অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাক তবে তোমাদের শক্রগণও তো ঐরূপ হয়ে থাকে। এ বিষয়টিকেই নিম্নের শব্দগুলোর দ্বারাও বর্ণনা করা হয়েছেঃ

إِنْ يَمْسِسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمُ قَرْحٌ مِثْلُهِ

অর্থাৎ ‘তোমাদেরকে যদি কষ্ট পৌছে থাকে তবে ঐরূপ কষ্ট তো ঐ সম্প্রদায়কেও স্পর্শ করেছিল।’ (৩: ১৪০) তাহলে বিপদ ও কষ্টে পতিত হওয়ার ব্যাপারে তোমরা ও কাফিরেরা সমান। তবে হ্যাঁ, তোমাদের এবং ওদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য এই যে, আল্লাহ তা‘আলার নিকট তোমরা ঐসব আশা করে থাকো যেসব আশা তারা করে না। তোমরা এর পুণ্য ও প্রতিদানও পাবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে সাহায্যও করা হবে। যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলাই এর অঙ্গীকার করেছেন। তাঁর অঙ্গীকার টলতে পারে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের তুলনায় তোমাদের মধ্যেই তো বেশী কর্মচাক্ষণ্য ও উদ্যোগ থাকা উচিত। তোমাদের অন্তরেই খুব বেশী জিহাদের উদ্যম থাকা দরকার। পূর্ণ উদ্দীপনার সাথে তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলার কালেমাকে প্রতিষ্ঠিত, ছড়ানো এবং সুউচ্চ করার ব্যাপারে তোমাদের অন্তরে সদা-সর্বদা শিহরণ ও উত্তেজনা জেগে উঠা উচিত। আল্লাহ তা‘আলা যা কিছু ভাগ্যে লিখে দেন, যা কিছু ফায়সালা করেন, যত কিছু চালু করেন, যে শরীয়ত তিনি নির্ধারণ করেন এবং যে কাজই করেন সব কিছুর ব্যাপারেই তিনি মহাজ্ঞানী ও চরম বিজ্ঞানময়। সর্বাবস্থাতেই তিনি মহা প্রশংসিত।

১০৫। নিশ্চয়ই আমি তোমার  
প্রতি সত্যসহ গন্ত অবতীর্ণ  
করেছি যেন তুমি তদনুযায়ী  
মানবদেরকে আদেশ প্রদান  
কর-যা আল্লাহ তোমাকে  
শিক্ষা দান করেছেন এবং  
তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে  
বিতর্ককারী হয়ে না ।

১০৬। এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা  
প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ  
ক্ষমাশীল করুণাময় ।

১০৭। এবং যারা স্বীয় জীবনের  
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে  
তুমি তাদের পক্ষে বিতর্ক করো  
না; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ  
বিশ্বাসঘাতক পাপীকে  
ভালবাসেন না ।

১০৮। তারা মানব হতে  
আত্মগোপন করে, কিন্তু আল্লাহ  
হতে গোপন করতে পারে না;  
এবং তিনি তাদের সঙ্গে  
থাকেন- যখন তারা রজনীতে  
তাঁর অপ্রিয় বাক্যে পরামর্শ  
করে; এবং তারা যা করছে  
আল্লাহ তার পরিবেষ্টনকারী ।

১০৫- إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ  
بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ  
بِمَا أَرَيْكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ  
لِلْخَابِرِينَ خَصِيمًا ۝

১০৬- وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

১০৭- وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ  
يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ۝

১০৮- يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ  
وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ  
مَعْهُمْ إِذَا بَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضِي  
مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا  
يَعْمَلُونَ مَحِيطًا ۝

১০৯। সাবধান- তোমরাই এ<sup>١</sup>  
লোক, যারা ওদের পক্ষ হতে  
পার্থিব জীবন সম্বন্ধে বিতর্ক  
করছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন  
তাদের পক্ষ হতে কে আল্লাহর  
সাথে বিতর্ক করবে এবং কে  
তাদের কার্য সম্পদানকারী  
হবে?

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্মোধন করে বলেন-‘হে নবী (সঃ)!  
আমি তোমার উপর যে কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছি তার আদি হতে অন্ত  
পর্যন্ত সবই সত্য। ওর খবর সত্য এবং ওর নির্দেশ সত্য।’ তারপরে বলা  
হচ্ছে-‘যেন তুমি জনগণের মধ্যে এই ন্যায় বিচার করতে পার যা“আল্লাহ  
তোমাকে শিখিয়েছেন।’

কোন কোন নীতিশাস্ত্রবিদ এর দ্বারা দলীল নিয়েছেন যে, নবী (সঃ)-কে  
ইজতিহাদ দ্বারা ফায়সালা করার অধিকার দেয়া হয়েছিল। এর দলীল ঐ  
হাদীসটিও বটে যা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)  
তাঁর দরজার উপর বিবাদে লিঙ্গ দু'ব্যক্তির কঠিন্তর শুনে বলেনঃ ‘জেনে রেখো  
যে, আমি একজন মানুষ। যা শুনি সে অনুযায়ী ফায়সালা করে থাকি। খুব সম্ভব  
যে, এক ব্যক্তি খুব যুক্তিবাদী এবং বাকপটু, আমি তার কথা সঠিক মনে করে  
হয়তো তার অনুকূলেই মীমাংসা করে দেবো, কিন্তু যার অনুকূলে মীমাংসা  
করবো সে হয়তো প্রকৃত হকদার নয়। সে যেন এটা বুঝে নেয় যে, ওটা তার  
জন্যে জাহান্নামের আগুনের একটি খণ্ড। এখন তার অধিকার রয়েছে যে, হয় সে  
তা গ্রহণ করবে, না হয় ছেড়ে দেবে।’

মুসলিম-ই-আহমাদে রয়েছে যে, দু'জন আনসারী একটা উত্তরাধিকারের  
ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট মামলা নিয়ে উপস্থিত হন। তাদের কারো  
কোন প্রমাণ ছিল না। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের নিকট উপরোক্ত  
হাদীসটিই বর্ণনা করেন এবং বলেনঃ “কেউ যেন আমার ফায়সালার উপর ভিত্তি  
করে তার ভাই-এর সামান্য হকও গ্রহণ না করে। যদি এরূপ করে তবে  
কিয়ামতের দিন সে স্বীয় কঙ্কে জাহান্নামের আগুন বুবিয়ে নিয়ে আসবে।” তখন

١٠٩ - هَنْتُمْ هُؤلَاءِ جَادِلُتُمْ  
عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ  
يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يوْمَ الْقِيَامَةِ  
أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًاً

ঐ দু'জন মনীষী ক্রন্দনে ফেটে পড়েন এবং প্রত্যেকেই বলেনঃ ‘আমার নিজের হক ও আমি আমার ভাইকে দিয়ে দিচ্ছি।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁদেরকে বলেনঃ “তোমরা যখন একথাই বলছো তখন যাও এবং তোমাদের বিবেচনায় যতদূর সম্ভব হয় ঠিকভাবে অংশ ফেলে দাও। তারপর নির্বাচনের গুটিকা নিক্ষেপ করতঃ নিজ নিজ অংশ নিয়ে নাও। অতঃপর প্রত্যেকেই স্বীয় ভাতার অনিচ্ছাকৃতভাবে গৃহীত হক ক্ষমা করে দাও।”

সুনান-ই-আবি দাউদের মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে। তাতে এ শব্দগুলোও রয়েছেঃ “আমি তোমাদের মধ্যে স্বীয় বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী ঐ সব বিষয়ে ফায়সালা করে থাকি যেসব বিষয়ে কোন অহী অবতীর্ণ হয় না।”

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, আনসারদের একটি দল এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। তথায় এক ব্যক্তির একটি বর্ম ছুরি হয়ে যায়। লোকটি ধারণা করেন যে, তা'মা ইবনে উবাইরিক বর্মটি ছুরি করেছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে ঘটনাটি পেশ করা হয়। চোরটি ঐ বর্ম এক ব্যক্তির ঘরে তার অজান্তে ফেলে দেয় এবং স্বীয় গোত্রীয় লোকদেরকে বলেঃ “আমি বর্মটি অমুকের ঘরে ফেলে দিয়েছি। তোমরা তার নিকটে তা পাবে।” তার গোত্রীয় লোকগুলো তখন নবী (সঃ)-এর নিকট গমন করে বলে, “হে আল্লাহর নবী (সঃ)! আমাদের সঙ্গী তো চোর নয় বরং চোর হচ্ছে অমুক ব্যক্তি। আমরা অনুসন্ধান নিয়ে জেনেছি যে, বর্মটি তার ঘরেই বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং আপনি জন সম্মুখে আমাদের সঙ্গীটির নির্দোষিতা ঘোষণা করতঃ তাকে রক্ষা করুন। নচেৎ ভয় আছে যে, সে ধ্বংস হয়ে যায় না কি!” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন দাঁড়িয়ে জনগণের সামনে তাকে দোষমুক্ত বলে ঘোষণা করেন। তখন উপরোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। আর যে লোকগুলো যিথ্যা গোপন রেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসেছিল তাদের ব্যাপারে মুসলিম মানুষের পক্ষে একটি অবিষ্মান হতে দুটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَنْ يَكُسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِينَا فَقِدَ احْتَمَلَ بِهَتَانَا وَإِثْمًا مِّنِّنَا

অর্থাৎ ‘যে কেউ অপরাধ অথবা পাপ অর্জন করে, তৎপর ওর অপবাদ কোন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে, তবে সে নিজেই সেই অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপ বহন করবে।’ এর দ্বারাও এ লোকগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ চোর এবং চোরের পক্ষ হতে বিতর্ককারীদের ব্যাপারেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এ বর্ণনাটি গারীব ও দুর্বল।

কোন কোন মনীষী হতে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি বানূ উবাইরিকের চোরের সম্বন্ধে অবর্তীর্ণ হয়। এ ঘটনাটি জামিউত তিরমিয়ীর কিতাবুত তাফসীরের মধ্যে হ্যরত কাতাদাহ ইবনে নোমান (রাঃ)-এর ভাষায় সুদীর্ঘভাবে বর্ণিত আছে। হ্যরত কাতাদাহ ইবনে নোমান (রাঃ) বলেনঃ ‘আমার গোত্রের মধ্যে বাশার, বাশীর ও মুবাশশার নামক তিনজন লোক ছিল যাদেরকে বানূ উবাইরিক বলা হতো। বাশীর ছিল একজন মুনাফিক। সে কবিতা রচনা করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণের দুর্নাম করতো। অতঃপর সে কোন একজন আরবীর দিকে ঐ কবিতার সম্বন্ধ লাগিয়ে দিয়ে বেশ আগ্রহ সহকারে পাঠ করতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ জানতেন যে, এ খাবীসই হচ্ছে এ কবিতাগুলোর রচয়িতা। এ লোকগুলো অজ্ঞতার যুগ হতেই ছিল দরিদ্র ও অভাবী। মদীনার লোকদের সাধারণ খাবার ছিল যব ও খেজুর। তবে ধনী লোকেরা সিরিয়া হতে আগত যাত্রীদের নিকট হতে ময়দা ক্রয় করতো যা তারা নিজেদের জন্যে নির্দিষ্ট করে নিতো। বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা সাধারণতঃ যব ও খেজুরই ভক্ষণ করতো। আমার চাচা ‘রিফাআ’ ইবনে যায়েদও (রাঃ) সিরিয়া হতে আগত যাত্রীদলের নিকট হতে এক বোৰা ময়দা ক্রয় করেন এবং তাঁ তাঁর এক কক্ষে রেখে দেন যেখানে অস্ত্র শস্ত্র, লৌহবর্ম এবং তরবারী ইত্যাদিও রক্ষিত ছিল। রাত্রে চোরেরা নীচ দিয়ে সিঁদ কেটে ময়দাও বের করে নেয় এবং অস্ত্র-শস্ত্রগুলোও উঠিয়ে নেয়। সকালে আমার চাচা আমার নিকট এসে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে। তখন আমরা অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারি যে, আজ রাত্রে বানূ উবাইরিকের ঘরে আগুন জলছিল এবং তারা কিছু খাদ্য রাখা করছিল। আমাদেরকে বলা হয়ঃ ‘সম্ভবতঃ আপনাদের বাড়ী হতেই তারা খাদ্য চুরি করে এনেছিল।’ এর পূর্বে আমরা যখন আমাদের পরিবারের লোকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম তখন ঐ গোত্রের লোকেরা আমাদেরকে বলেছিল, ‘তোমাদের চোর হচ্ছে লাবীদ ইবনে সহল।’ আমরা জানতাম যে, একাজ লাবীদের নয়, সে ছিল একজন বিশ্বস্ত খাঁটি মুসলমান। হ্যরত লাবীদ (রাঃ) এ সংবাদ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তরবারী নিয়ে বানূ উবাইরিকের নিকট এসে বলেনঃ ‘তোমরা আমার চুরি সাব্যস্ত কর, নতুবা তোমাদেরকে হত্যা করে দেবো।’ তখন তারা তাঁর নির্দোষিতা স্বীকার করে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। আমরা পূর্ণ তদন্তের পর বুঝতে পারি যে, বানূ উবাইরিকই চুরি করেছে। আমার চাচা আমাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে তুমি তাঁকে

সংবাদটা দিয়ে 'এসো।' আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করি এবং একথাও বলি যে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আমাদেরকে অন্ত-শন্ত্রগুলো আদায় করে দিন। খাদ্য ফিরিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে সাম্ভূত্বা দিয়ে বলেনঃ 'আচ্ছা, আমি তদন্ত করে দেখছি।'

বানু উবাইরিকের নিকট এ সংবাদ পৌছলে তাঁরা হ্যরত উসায়েদ ইব্নে উরওয়া (রাঃ) নামক এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট প্রেরণ করে। তিনি এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এতো জুলুম হচ্ছে, বানু উবাইরিক তো সৎ ও ইসলামপন্থী লোক। তাদের উপর কাতাদাহ ইব্নে নোমান (রাঃ) ও তাঁর চাচা চুরির অপবাদ দিচ্ছেন!' অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বলেনঃ 'তুমি তো এটা ভাল কাজ করছো না যে, দ্বীনদার ও ভাল লোকদের উপর চুরির অপবাদ দিচ্ছ, অথচ তোমার নিকট কোন প্রমাণও নেই।' আমি নিরুত্তর হয়ে চলে আসি এবং মনে মনে খুব লজ্জিত ও হতবুদ্ধি হয়ে 'পড়ি। আমার ধারণা হয় যে, ঐ মাল সম্বন্ধে যদি নীরব থাকতাম এবং নবী (সঃ)-এর সঙ্গে কোন আলোচনাই না করতাম তাহলেই ভাল হতো। এমন সময় আমার চাচা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি করে আসলে?' আমি তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করি। শুনে তিনি বলেন, 'আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করছি।' তিনি চলে যাওয়ার পর পরই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর এ আয়াতগুলো অবর্তীর্ণ হয়। সূতরাঃ *خَنِينْ* দ্বারা বানু উবাইরিককেই বুঝানো হয়েছে। হ্যরত কাতাদাহ (রাঃ)-কে তিনি যে কথা বলেছিলেন তার জন্যে তাঁকে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয় এবং এ কথাও বলা হয় যে, এলোকগুলো যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন। *إِنَّمَا* হতে *وَمَنْ يَكْسِبْ إِنَّمَا* *يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ* *فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا* *عَظِيمًا* হতে *وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ* *مِمِّنَا* পর্যন্ত এবং পর্যন্ত আয়াতগুলো অবর্তীর্ণ করেন। এগুলো হ্যরত লাবীদ (রাঃ)-এর ব্যাপারেই অবর্তীর্ণ হয়। কেননা, বানু উবাইরিক তাঁর উপর চুরির অপবাদ দিয়েছিল, অথচ তিনি ওটা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। এ আয়াতগুলো অবর্তীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বানু উবাইরিকের নিকট হতে আমাদের অন্ত-শন্ত্রগুলো আদায় করে দেন। আমি ঐগুলো নিয়ে আমার চাচার নিকট গমন করি। তিনি এত বৃদ্ধ ছিলেন যে, চোখেও কম দেখতেন। তিনি আমাকে বলেন, 'হে আমার ভাতুপুত্র! এ অন্তর্গুলো তুমি আল্লাহ তা'আলার নামে দান করে দাও।' এতদিন পর্যন্ত

আমার চাচার প্রতি আমার কিছুটা বদ ধারণা ছিল যে, তিনি অন্তরের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করেননি। কিন্তু এ ঘটনাটি আমার অন্তর হতে এ কু-ধারণা দূর করে দেয়। তখন আমি তাঁকে খাঁটি মুসলমানরূপে স্বীকার করে নেই। বাশীর এ আয়াতগুলো শুনে মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়ে যায় এবং সালাফা বিনতে সাদ ইবনে সুমিয়ার নিকটে অবস্থান করে। তারই ব্যাপারে *فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّاً بَعِيْدًا* হতে *وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ* পর্যন্ত পরবর্তী আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

হ্যরত হাসসান (রাঃ) স্বীয় কবিতার মাধ্যমে বাশীরের এ জগন্য কার্যের নিন্দে করেন। এ কবিতাগুলো শুনে সালাফা নাম্বী স্বীলোকটি খুবই লজিতা হয় এবং বাশীরের সমস্ত আসবাবপত্র মস্তকে বহন করে নিয়ে গিয়ে ‘আবতাহ’ নামক মাঠে নিষ্কেপ করে এবং তাকে বলে, তুমি কোন মঙ্গল নিয়ে আমার নিকট আসনি, বরং হ্যরত হাসসান (রাঃ)-এর কবিতাগুলো নিয়ে এসেছো। আমি তোমাকে আমার নিকট স্থান দেবো না। এ বর্ণনা বহু কিতাবে বহু সনদে দীর্ঘাকারে ও সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত আছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ মুনাফিকদের জ্ঞানের স্বল্পতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা তাদের মন্দ কার্যাবলী জনগণের নিকট গোপন করছে বটে কিন্তু এতে লাভ কি? তারা সেটা আল্লাহ তা'আলা হতে গোপন করতে পারবে না। অতঃপর তাদেরকে সম্মোধন করে বলেন—‘মানলাম যে, এভাবে তোমাদের কার্যকলাপ গোপন করতঃ তোমরা পৃথিবীর বিচারকদের নিকট হতে বেঁচে গেলে, কেননা তারা বাহ্যিকের উপর ফায়সালা দিয়ে থাকে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তোমরা সেই আল্লাহ তা'আলার সামনে কি উত্তর দেবে যিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই জানেন? তথায় তোমরা তোমাদের মিথ্যা দাবীকে সত্যরূপে প্রমাণ করার জন্যে কাকে উকিল করে পাঠাবে? মোটকথা সে দিন তোমাদের কোন কৌশলই ফলদায়ক হবে না।’

১১০। এবং যে কেউ দুষ্কর্ম করে  
অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি  
অত্যাচার করে পরে আল্লাহর  
নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়,  
সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল,  
করুণাময় প্রাণ্ত হবে।

— ১১. —  
*وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا وَّ*  
*يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ*  
*بِحِجْرِ اللَّهِ غَفُورًا رَّحِيمًا*

১১১। এবং যে কেউ পাপ অর্জন করে, বস্তুতঃ সে স্বীয় আত্মার প্রতিই এর প্রতিক্রিয়া পৌছিয়ে থাকে এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

১১২। আর যে কেউ অপরাধ অথবা পাপ অর্জন করে, তৎপরে ওটা নিরপরাধের প্রতি আরোপ করে, তবে সে নিজেই সে অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপ বহন করবে।

১১৩। আর যদি তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হতো, তবে তাদের একদল তোমাকে পথভ্রান্ত করতে ইচ্ছুক হয়েছিল, এবং তারা নিজেদেরকে ছাড়া বিপদগামী করেনি আর তারা তোমাকে কোন বিষয়ে ক্লেশ দিতে পারবে না; এবং আল্লাহ তোমার প্রতি গ্রহ ও বিজ্ঞান অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না, তিনি তাই তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন; এবং তোমার প্রতি আল্লাহর অসীম করুণা রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা এখানে স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, কেউ কোন পাপকার্য সম্পাদনের পর তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা

۱۱۱- وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا<sup>لُو</sup>  
يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ  
عَلِيهِ مَا حَكِيمًا

۱۱۲- وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ  
إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِئَةً فَقَدْ<sup>۱۴</sup>  
احْتَمَلَ بَهْتَانًا وَإِثْمًا مِّنْ<sup>۱۵</sup>

۱۱۳- وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ  
وَرَحْمَتُهُ لَهُمْ طَاغِيَةٌ مِّنْهُمْ  
أَنْ يُضْلُوكُ وَمَا يُضْلُونَ إِلَّا  
أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَضُرُونَكَ مِنْ  
شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَبَ  
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ  
تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ  
عَظِيمًا

দয়া করে তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হন। যে ব্যক্তি পাপ করার পর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে, আল্লাহ পাক তাকে স্বীয় অনুগ্রহ ও সীমাহীন করুণা দ্বারা ঢেকে নেন এবং তার ছোট ও বড় গুনাহ ক্ষমা করে দেন। যদিও সে পাপ আকাশ, যমীন ও পর্বত থেকেও বড় হয়।

বানী ইসরাইলের মধ্য যখন কেউ কোন পাপ করতো তখন তার দরজার উপর কুদরতী অক্ষরে ওর কাফ্ফারা লিখা হয়ে যেতো। সে কাফ্ফারা তাকে আদায় করতে হতো। তাদের কাপড়ে প্রস্তাব লেগে গেলে তাদের উপর ঐ পরিমাণ কাপড় কেটে নেয়ার নির্দেশ ছিল। আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মতের উপর এ সহজ ব্যবস্থা রেখেছেন যে, ঐ কাপড় পানি দ্বারা ধোত করলেই পবিত্র হয়ে যাবে এবং পাপের জন্য তাওবা করলেই তা মাফ হয়ে যাবে।

একটি স্ত্রীলোক হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফালকে একটি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ফত্উয়া জিজ্ঞেস করে যে ব্যভিচার করেছিল এবং ওর ফলে একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, তাকে সে হত্যা করে ফেলেছে। হ্যরত মুগাফফাল (রাঃ) তখন বলেন যে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহানাম। তখন স্ত্রীলোকটি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যায়। হ্যরত মুগাফফাল তখন তাকে ডেকে *وَمِنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ* *يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجْعَلُ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا*-এ আয়াতটি পড়ে শুনিয়ে দেন। অর্থাৎ ‘যে কেউ দুষ্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করার পর আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয় সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় প্রাণ্ড হবে।’ তখন স্ত্রীলোকটি চোখের অঞ্চল মুছে ফেলে এবং তথা হতে ফিরে যায়।

মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে মুসলমান কোন পাপ করার পর অযু করে দু'রাকআত নামায আদায় করতঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপ মার্জনা করে থাকেন। অতঃপর তিনি *وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجْشَعَ اللَّهُ* (৩৪: ১৩৫)-এ আয়াতটি পাঠ করেন।’ আমরা ‘মুসনাদ-ই-আবু বকর’-এ এর পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছি এবং কিছু বর্ণনা সূরাঃ আলে ইমরানের তাফসীরে দেয়া হয়েছে।

হ্যরত আবু দারদা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি মাঝে মাঝে মজলিস হতে উঠে নিজের কোন কাজের জন্য যেতেন এবং ফিরে আসার ইচ্ছে থাকলে জুতা বা কাপড় কিছু না কিছু অবশ্যই ছেড়ে যেতেন।

সূরাঃ নিসা ৪

একদা তিনি স্বীয় জুতা রেখে এক বরতন পানি নিয়ে গমন করেন। আমিও  
তাঁর পিছনে চলতে থাকি। কিছু দূর গিয়ে তিনি হাজত পুরো না করেই ফিরে  
আসেন এবং বলেনঃ ‘আমার প্রভুর পক্ষ হতে আমার নিকট একজন আগস্তুক  
এসেছিলেন এবং তিনি আমাকে এ পয়গাম দিয়ে গেলেন যে, ‘<sup>وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا</sup>  
<sup>بِظَلَمٍ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بِعِذْلَةِ اللَّهِ غَفُورًا رَحِيمًا</sup>’  
অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি কোন দুষ্কার্য  
করে বা স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচার করে অতঃপর আল্লাহ তা‘আলার নিকট  
ক্ষমা প্রার্থী হয় সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় ঝরপে প্রাণ্ড হবে। আমি  
আমার সাহাবীগণকে এ সুসংবাদ দেয়ার জন্যে রাস্তা হতেই ফিরে আসছি।’  
কেননা এর পূর্বে <sup>وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا بِجَزْبِهِ</sup> অর্থাৎ ‘যে খারাপ কাজ করবে তাকে  
তার পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে।’ (৪: ১২৩) এ আয়াতটি অবর্তীণ হয়েছিল এবং  
ফলে ওটা সাহাবীগণের নিকট খুব কঠিন বলে মনে হয়েছিল। আমি বলি, হে  
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি সে ব্যভিচার করে এবং ছুরি করে, অতঃপর ক্ষমা  
প্রার্থনা করে তবুও কি আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করবেনঃ তিনি বলেনঃ  
‘হ্যাঁ।’ আমি দ্বিতীয়বার এ কথাই বলি। তিনি বলেনঃ ‘হ্যাঁ। তৃতীয়বারও ঐ  
কথাই আমি বলি। তখন তিনি বলেনঃ ‘যদিও সে ব্যভিচার করে ও ছুরি করে  
অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবুও আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করবেন। যদিও  
আবুদ্বারদার নাক ধূলায় ধূসরিত হয়।’ এরপর যখনই হ্যরত আবুদ্বারদা (রাঃ)  
হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখনই স্বীয় নাকের উপর হাত মেরে বলতেন।  
হাদীসটির ইসনাদ দুর্বল এবং এটা গারীবও বটে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন- যে কেউ পাপ অর্জন করে সে নিজের উপরই এর প্রতিক্রিয়া পৌছিয়ে থাকে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ﴿وَلَا تَزِرْ وَازِرٌ أَخْرِيَ﴾<sup>۱</sup> “কেউ কারো বোঝা বহন করবে না।” (৬৪: ১৬৫) অর্থাৎ একে অপরের কোন উপকার করতে পারবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। তার কর্মের ফল অন্য কেউ ভোগ করবে না। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ﴿كَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيمًا﴾<sup>۲</sup> ‘তিনি মহাজ্ঞানী; বিজ্ঞানময়।’ তাঁর জ্ঞান, তাঁর নিপুণতা, তাঁর ন্যায়নীতি এবং তাঁর করুণা এর উল্টো যে, একের পাপের কারণে তিনি অপরকে ধরবেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন- যে কেউ অপরাধ অথবা পাপ অর্জন করে, তৎপর নিরপরাধের প্রতি দোষারোপ করে, সে নিজেই সেই অপরাধ ও প্রকাশ্য পাপ বহন করবে। যেমন বানু উবাইরিক হযরত লাবিদ ইবনে সহল (রাঃ)-এর

নাম করেছিল- যে ঘটনাটি এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অথবা এর দ্বারা যায়েদ ইব্নে সামীনকে বুঝানো হয়েছে, যেমন এটা কোন কোন মুফাস্সীরের ধারণা যে, ঐ ইয়াহুদীর গোত্র একজন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর চুরির অপবাদ দিয়েছিল, অথচ স্বয়ং তাদের লোকই ছিল বিশ্বাসঘাতক ও অত্যাচারী। আয়াতটি শান-ই-ন্যুল হিসেবে বিশিষ্ট হলেও হ্কুমের দিক দিয়ে এটা সাধারণ, যে কেউই এ কাজ করবে সেই আল্লাহ তা'আলার শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। এর পরবর্তী **وَلَوْ لَا فَضْلٌ لِّلَّهِ عَلَيْكَ**-এ আয়াতের সম্পর্কও এ ঘটনার সঙ্গেই রয়েছে। অর্থাৎ উসাইদ ইব্নে উরওয়া এবং তার সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে বানু উবাইরিকের চোরকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রকৃত রহস্য হতে সরিয়ে দেয়ার সমষ্ট কার্যপ্রণালীই শেষ করে ফেলেছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ হচ্ছেন তাঁর প্রকৃত রক্ষক। তাই তিনি স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে এ বিপজ্জনক অবস্থায় বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষপাতি করার দোষ হতে বাঁচিয়ে নেন এবং প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করে দেন।

খানে ‘কিতাব’ শব্দ দ্বারা কুরআন কারীমকে বুঝানো হয়েছে এবং **حُكْمَتْ** শব্দ দ্বারা সুন্নাহকে বুঝানো হয়েছে। অহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যা জানতেন না, আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তাঁকে তা জানিয়ে দেন। তাই তিনি বলেন, **وَعِلْمُكَ مَالِمٌ تَكُنْ تَعْلِمُ** ‘অর্থাৎ তিনি তোমাকে তা শিখিয়ে দিয়েছেন যা তুমি জানতে না।’ যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ **وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ نَّفْسِنَا** (৪২: ৫২) হতে সূরার শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

(৪: ৮৬) **وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا**—**إِنَّ الْكِتَبَ الْأَرْحَمَةَ مِنْ رِبِّكَ**— এজনে এখানেও বলেছেন— ‘তোমার প্রতি আল্লাহর অসীম করুণা রয়েছে।’

## ১১৪। সাধারণ লোকের

অধিকাংশ শুণ্ঠ পরামর্শে কোন মঙ্গল নিহিত থাকে না, হ্যাঁ, তবে যে ব্যক্তি এরূপ যে দান অথবা কোন সৎ কাজ কিংবা লোকের মধ্যে পরম্পর সঙ্গি

— ১১৪ —  
**لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ**  
**نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ امْرَأٍ صَدَقَهُ أَوْ**  
**مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٌ بَيْنَ النَّاسِ**

করে দেবার উৎসাহ প্রদান  
করে, এবং যে আল্লাহর  
প্রসন্নতা সন্ধানের জন্যে ঐরূপ  
করে, আমি তাকে মহান  
বিনিময় প্রদান করবো।

১১৫। আর সুপথ প্রকাশিত  
হওয়ার পর যে রাসূলের  
বিরুদ্ধাচরণ করে এবং  
বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথে  
অনুগামী হয়, তবে সে যাতে  
অভিনিবিষ্ট- আমি তাকে  
তাতেই প্রত্যাবর্তিত করবো ও  
তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ  
করবো; এবং ওটা নিকৃষ্টতর  
প্রত্যাবর্তন স্থল।

জনগণের অধিকাংশ কথাই অঙ্গলজনক হয়। তবে কতক লোক এমনও  
আছে যে, তারা মানুষকে দান খয়রাত করার, সৎকার্য সাধনের এবং পরম্পর  
মিলেমিশে থাকার উৎসাহ দিয়ে থাকে। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এ  
রয়েছে, হ্যরত যায়েদ ইবনে হুনায়েশ (রঃ) বলেন, ‘হ্যরত সুফইয়ান সাওয়ারী  
(রঃ) রোগ শয্যায় শায়িত হলে আমরা তাঁকে দেখতে যাই। আমাদের সঙ্গে  
হ্যরত সাঈদ ইবনে হাস্সানও (রঃ) ছিলেন। হ্যরত সুফইয়ান সাওয়ারী (রঃ)  
হ্যরত সাঈদ (রঃ)-কে বলেন, ‘হে সাঈদ (রাঃ)! আপনি উষ্মে সালেহ হতে  
যে হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন তা আজকে আবার বর্ণনা করুন।’ হ্যরত সাঈদ  
ইবনে হাস্সান (রঃ) বর্ণনা করতঃ বলেন যে, রাসূলল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ  
‘মানুষের সমস্ত কথাই তার জন্যে অঙ্গল আনয়ন করে, তবে যদি সে আল্লাহর,  
যিকির, মানুষকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে (তবে  
সেটা অঙ্গলজনক)’। তখন হ্যরত সুফইয়ান সাওয়ারী (রঃ) বলেন, ‘এ বিষয়টিই

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَبْتِغَا  
مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسُوفَ نُؤْتِيهِ  
أَجْرًا عَظِيمًا

١١٥ - وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ  
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبَعَ  
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا  
تُولِي وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاعَةً  
مَصِيرًا

(১৪)

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلِكَةُ صَفًا । - أَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الْأَرْضِ  
وَالْعَصْرَانَ الْإِنْسَانَ لِفِي لَمَّا كَانَ مُخْسِرٌ ( ১০৩ : ১-২ ) - أَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الْأَرْضِ  
وَالْعَصْرَانَ الْإِنْسَانَ لِفِي لَمَّا كَانَ مُخْسِرٌ ( ৭৮ : ৩৮ ) - أَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الْأَرْضِ  
وَالْعَصْرَانَ الْإِنْسَانَ لِفِي لَمَّا كَانَ مُخْسِرٌ ( ১০৩ : ১-২ ) - أَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الْأَرْضِ

মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ ‘জনগণের মধ্যে মিলজুল এবং সঙ্গি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি ভাল কথা বলে বা এদিক হতে ওদিকে এ প্রকারের আলাপ আলোচনা করে সে মিথ্যাবাদী নয়।’ হ্যরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রাঃ) বলেন, ‘তিনি জায়গায় আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একুপ কথা বলার অনুমতি দিতে শুনেছি। (১) যুক্তে, (২) জনগণের মধ্যে সঙ্গি স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং (৩) স্বামীর একুপ কথা বলা স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর একুপ কথা বলা স্বামীকে।’ উম্মে কুলসুমের (রাঃ) রিওয়ায়েতে রাসূল (সঃ) হিজরাতকারীগণ এবং বাইআত গ্রহণকারীগণকে বলেনঃ ‘আমি কি তোমাদেরকে এমন এক কাজের কথা বলে দেবনা যা নামায এবং রোয়া অপেক্ষাও উত্তম? সাহাবীগণ বলেন, ‘হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি বলুন।’ তখন তিনি বলেনঃ ‘জনগণের মধ্যে সঙ্গি স্থাপন করা এবং তাদের পরস্পরের বিবাদ মিটিয়ে দেয়া।’ (সুনান-ই-আবি দাউদ ইত্যাদি)

মুসনাদ-ই-বায়্যায়ে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আবু আইউব (রাঃ)-কে বলেনঃ ‘এসো, আমি তোমাকে একটি ব্যবসায়ের কথা বলে দেই। লোকেরা যখন বিবাদে লিঙ্গ হয় তখন তুমি তাদের মধ্যে সঙ্গি করিয়ে দাও, যখন একজন অপরজন হতে সরে থাকে তখন তুমি তাদেরকে একত্রিত করে দাও।’

আল্লাহ তা‘আলার বলেন— যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রসন্নতা সক্রান্তের জন্যে ঐকুপ করে, আমি তাকে মহান বিনিময় প্রদান করবো। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শরীয়তের বিপরীত পথে চলে, শরীয়ত হয় এক দিকে এবং তার পথ হয় অন্যদিকে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক দিকে চলার নির্দেশ দেন এবং সে অন্যদিকে চলে, অথচ সত্য তার নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, সে দলীল প্রমাণাদি দেখেছে। তথাপি সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করতঃ মুসলমানদের সরল ও পরিষ্কার পথ হতে সরে পড়েছে, সুতরাং আমিও তাকে ঐ বক্র ও খারাপ পথেই ফিরিয়ে দেব। ঐ খারাপ পথই তখন তার নিকট ভাল বলে মনে হবে, অতঃপর সে জাহানামে গিয়ে পৌছে যাবে।

মুসলমানদের পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ অনুসন্ধান করাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করা। কিন্তু কখনও হয় তো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্পষ্ট কথারই উল্টো হয়, আবার কখনও কখনও ঐ জিনিসের বিপরীত হয় যার উপর মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত সবাই একমত রয়েছে। তাদের ভদ্রতা ও নম্রতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভুল হতে রক্ষা করেছেন। এ ব্যাপারে বহু হাদীসও রয়েছে এবং উসূলের হাদীসগুলোতে আমরা ওর বিরাট অংশ বর্ণনাও করেছি।

ইমাম শাফিউ (রঃ) চিন্তা ও গবেষণার পর এ আয়াত হতেই উম্মতের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটাই এ ব্যাপারে উভয় ও দৃঢ়তার জিনিস। তবে অন্য কয়েকজন ইমাম এ যুক্তিকে কঠিন ও আয়াত হতে দূরে বলেছেন। মোটকথা যারা মুমিনদের পথ হতে সরে পড়ে তাদের রজ্জুকে আল্লাহ তা'আলা চিল দিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেনঃ

فَذُرْنِي وَمَنْ يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنْسَتِرِ جَهَنَّمَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ -

অর্থাৎ ‘তুমি আমাকে ও যে এ কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাকে ছেড়ে দাও, সত্ত্বরই আমি এমনভাবে ধরবো যে, সে জানতেই পারবে না।’ (৬৪: ৪৪) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَلِمَا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

অর্থাৎ ‘যখন তারা বাঁকা হয়ে গেল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন।’ (৬১: ৫) আর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَنَذِرُهُمْ فِي طَغْيَانِهِمْ بِعَمَّهُونَ -

অর্থাৎ ‘আমি তাদেরকে তাদের বিরুদ্ধাচরণে ছেড়ে দিচ্ছি, তন্মধ্যে তারা অন্তরকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষে তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল জাহান্নামই হবে।’ (৬: ১১০) যেমন এক জায়গায় রয়েছে—

اَخْشِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ اَزْوَاجَهُمْ

অর্থাৎ “একত্রিত কর গোনাহগারদেরকে এবং তাদের দোসরদেরকে।” (৩৭: ২২) আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—

وَرَا الْمَجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُوا اِنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا -

অর্থাৎ ‘আগুন দেখে অত্যাচারীরা জেনে নেবে যে, তাদেরকে আগুনে নিষ্কিঞ্চ হতে হবে এবং তারা পলায়নের কোন স্থান পাবে না।’ (১৮: ৫৩)

সূরাঃ নিসা ৪

১১৬। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে  
অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা  
করেন না এবং এতদ্যুতীত  
তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করে  
থাকেন; এবং যে আল্লাহর  
সাথে অংশীস্থাপন করে তবে  
সে নিশ্চয়ই সুদূর বিপথে  
বিভ্রান্ত হয়েছে।

১১৭। তারা তাঁকে পরিত্যাগ  
করে তৎপরিবর্তে নারী  
প্রতিমাপুঞ্জকেই আহ্বান করে  
এবং তারা বিদ্রোহী শয়তানকে  
ব্যতীত আহ্বান করে না।

১১৮। আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত  
করেছেন এবং সে বলেছিল  
যে, আমি অবশ্যই তোমার  
সেবকবৃন্দ হতে এক নির্দিষ্ট  
অংশ গ্রহণ করবো।

১১৯। এবং নিশ্চয়ই আমি  
তাদেরকে পথভ্রান্ত করবো  
এবং তাদেরকে আদেশ  
করবো—যেন তারা পশুর কর্ণ  
ছেদন করে এবং তাদেরকে  
আদেশ করবো—যেন তারা  
আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করে  
এবং যে আল্লাহকে পরিত্যাগ  
করে শয়তানকে বশুরূপে  
গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে  
প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত  
হবে।

১১৬- إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ  
بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ  
يَسْأَءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ  
ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

১১৭- إِن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا  
إِنَّمَا يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا  
مَرِيدًا ۝

১১৮- لَعْنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخِذْ  
مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝

১১৯- وَلَا ضَلَّنَاهُمْ وَلَا مِنْهُمْ  
وَلَا مَرْنَاهُمْ فَلَيَبْتَكِنْ أَذَانَ  
الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَاهُمْ فَلَيُغِيْرُنَ  
خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَخِذُ الشَّيْطَانَ  
وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ  
خُسْرَانًا مُبِينًا ۝

১২০। তিনি তাদেরকে প্রতিশ্রুতি  
দেন ও আশ্বাস দান করেন  
এবং শয়তান প্রতারণা ব্যতীত  
তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান  
করে না।

১২১। তাদেরই বাসস্থান  
জাহানাম এবং তথা হতে তারা  
কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।

১২২। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন  
করেছে ও সৎকার্য করে, আমি  
তাদেরকে জান্মাতে প্রবিষ্ট  
করবো যার নিষ্ঠে  
স্ন্যোতব্বিনীসমূহ প্রবাহিতা,  
তন্মধ্যে তারা চিরকাল  
অবস্থান করবে, আল্লাহর  
প্রতিশ্রুতি সত্য; এবং কে  
আল্লাহ অপেক্ষা বাকে  
অধিকতর সত্যপরায়ণ?

এ সূরার প্রথম দিকে আমরা -  
আয়াতটির তাফসীর করেছি এবং তথায় এ আয়াতের সাথে সম্পর্কিত হাদীসগুলোও বর্ণনা  
করেছি। জামেউত তিরমিয়ীতে রয়েছে, হযরত আলী (রাঃ) বলতেনঃ ‘কুরআন  
কারীমের অন্য কোন আয়াত আমার নিকট এ আয়াত অপেক্ষা প্রিয় নেই।  
দুনিয়া ও আখিরাত মুশরিকদের হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তারা সত্য পথ হতে  
দূরে সরে পড়ছে। তারা নিজেদের জীবনকে ও উভয় জগতকে ধ্বংস করে  
দিচ্ছে। এ মুশরিকরা নারীদের পৃজারী।

মুসনাদ-ই- ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে, হযরত কাব (রাঃ) বলেন যে,  
প্রত্যেক প্রতিমার সাথে একটি মহিলা জিন রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ)  
বলেন যে, *إِنَّ شَدِّيْرَ بَوْلَةَ* তাবার্থ হচ্ছে মৃতি। এটা অন্যান্য মুফাস্সিরগণেরও উক্তি।

١٢٠- يَعِدُهُمْ وَيَمْنِيْهُمْ وَمَا  
يَعِدُهُمُ الشَّيْطَنُ إِلَّا غَرْوَرًا

١٢١- أُولَئِكَ مَا وَهُمْ جَهَنَّمُ  
وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِিসًا

١٢٢- وَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا  
الصِّلْحَاتِ سَنَدِخِلُهُمْ جَنَّتِ  
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ  
خَلِدِيْنَ فِيهَا أَبْدًا وَعَدَ اللَّهُ  
حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ  
قِيلَّا

হ্যরত যহুক (রঃ) বলেন যে, মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে পূজা করতো এবং তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার মেয়ে বলে বিশ্বাস করতো ও বলতোঃ ‘তাদের ইবাদত দ্বারা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ।’ তারা নারীদের আকারে ফেরেশতাদের ছবি প্রতিষ্ঠিত করতো। অতঃপর অন্ধভাবে তাদের ইবাদত করতো এবং বলতো যে, এগুলো হচ্ছে ফেরেশতাদের ছবি, তারা আল্লাহর কন্যা। এ তাফসীর أَفَرَأَيْتُ اللَّهَ وَالْعَزِيزُ (৫৩: ১৯) -এ আয়াতের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বেশ মিলে যায়। তথায় তাদের মৃত্তিগুলোর নাম নিয়ে নিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ‘তাদের কি সুন্দর বিচার যে, ছেলেগুলো হচ্ছে তাদের এবং মেয়েগুলো আমার!’ আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

**وَجَعَلُوا الْمَلِكَةَ الدِّينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا ثَ**

অর্থাৎ ‘তারা আল্লাহর দাস ফেরেশতাদেরকে মহিলা মনে করে নিয়েছে।’ (৪৩: ১৯) আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

**وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا**

অর্থাৎ ‘তারা আল্লাহ ও জিনদের মধ্যে বংশ সম্পর্ক স্থাপন করেছে।’ (৩৭: ১৫৮)

হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) বলেন যে<sup>১</sup>-এর অর্থ হচ্ছে মৃত। হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, আত্মাইন প্রত্যেক জিনিসই <sup>২</sup>সেটা শুষ্ক কাঠই হোক বা পাথরই হোক। কিন্তু এ উক্তি দুর্বল।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানেরই পূজারী। কেননা, সে-ই তাকে এ পথে চালিত করেছে এবং আসলে তাকেই সে মানছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

**الْمَّاعِدُ إِلَيْكُمْ يَبْرِئُنِي أَدْمَ الْأَلَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ**

অর্থাৎ ‘হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের কাছে অঙ্গীকার নেইনি যে, তোমরা শয়তানের পূজা করবে না?’ (৩৬: ৬০) এ কারণেই কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ স্পষ্টভাবে বলে দেবেনঃ ‘আমাদেরকে ইবাদত করার দাবীদারেরা প্রকৃতপক্ষে শয়তানেরই ইবাদত করতো, তাদের অধিকাংশই তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।’ শয়তানকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা হতে দূর করে দিয়েছিলেন। তাই সেও প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, আল্লাহ তা'আলার বহুসংখ্যক বান্দাকে সে পথভূষ্ট করে ফেলবে। হ্যরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন- অর্থাৎ প্রতি

হাজারে নয়শ নিরানবই জনকে সে নিজের সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। একজন মাত্র অবশিষ্ট থাকবে যে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে। সে বলেছিল, ‘আমি মানুষকে সত্যপথ হতে ভট্ট করবো, তাকে আমি এমন আশা দিতে থাকবো যে, সে তাওবা করা ছেড়ে দেবে, স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে এবং মরণকে ভুলে যাবে। ফলে সে আখেরাত হতে বহু দূরে সরে পড়বে। তাদের দ্বারা আমি জন্মুর কান কাটিয়ে নিয়ে ছিদ্র করিয়ে দেবো এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার জন্যে তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকবো। আল্লাহর তৈরী করা আকৃতি নষ্ট করার কার্যে তাদের উৎসাহিত করবো। যেমন অগুকোষ কর্তিত করা। একটি হাদীসে এটার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। চেহারার উপর উচ্চী করা এবং উচ্চী করিয়ে নেয়া এও একটি অর্থ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে এটা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে এবং যে এরূপ উচ্চী করিয়ে নেয় তাকে অভিসম্পাত করা হয়েছে।

সহীহ সনদে হয়রত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করতঃ সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যারা উচ্চী করে ও করিয়ে নেয়, কপালের চুল তুলে ও তুলিয়ে নেয় এবং দাঁতে বিস্তৃতি সাধন করে, তাদের উপর অভিসম্পাত রয়েছে। আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করবো না কেন যাদের উপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) অভিসম্পাত করেছেন এবং যা আল্লাহ তা‘আলার কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে?’ অতঃপর তিনি **وَمَا أتَكُم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ** -এ আয়াতটি পাঠ করেন। অর্থাৎ ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা হতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক।’ (৫৯: ৭) কোন কোন ব্যাখ্যাদাতার মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে আল্লাহর দিনকে পরিবর্তিত করা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে-

**فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حِنْفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تُبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ**

অর্থাৎ ‘তুমি তোমার মুখমণ্ডলকে আল্লাহর একমুখী ধর্মের প্রতি প্রতিষ্ঠিত রাখ, এটা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি যার উপর তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই।’ (৩০: ৩০) এ পরের বাক্যটিকে যখন আদেশবাচক ক্রিয়া অর্থে নেয়া হবে তখন এ তাফসীর ঠিকই হবে। অর্থাৎ আল্লাহর প্রকৃতিকে পরিবর্তন করো না। মানুষকে তিনি যে প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন ওর উপরেই থাকতে দাও।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হয়রত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘প্রত্যেক শিশু প্রকৃতির উপরই জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার বাপ-মা তাকে ইয়াতুন্নী করে, খ্রীষ্টান করে বা মাজুসী করে। যেমন ছাগলের নিখুঁত বাচ্চা সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হয়ে থাকে কিন্তু মানুষেরাই তার কান ইত্যাদি কেটে নিয়ে তাকে দোষমুক্ত করে থাকে।’

সহীহ মুসলিমে হয়রত আইয়ায ইব্নে হামাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন- আমি আমার বান্দাকে এক মুখী দ্বীনের উপর সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তান এসে তাকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতঃপর আমি আমার বৈধকে তাদের উপর অবৈধ করেছি।’

শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে, যে ক্ষতির আর পূরণ নেই। কেননা, শয়তান তাকে ধোঁকা দিতে রয়েছে, শয়তান তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার মুক্তি ও মঙ্গল ঐ ভুল পথেই রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সে বড় প্রতারক, সে স্পষ্টভাবে তাকে ধোঁকা দিচ্ছে। যেমন কিয়ামতের দিন শয়তান পরিষ্কার ভাষায় মানুষকে বলবে, ‘আল্লাহ তা‘আলার ওয়াদা সত্য ছিল। আর আমি তো ওয়াদা ভঙ্গকারী। তোমাদের উপর আমার কোন জোর ছিল না। আমার আহ্বান শুনামাত্রই তোমরা নির্বাধের মত কেন তাতে সাড়া দিয়েছিলে? এখন আমাকে ভর্তসনা করছো কেন? বরং তোমরা নিজেকেই ভর্তসনা কর।’ শয়তানের অঙ্গীকারকে সঠিক জ্ঞানকারী, তার প্রদত্ত আশা পূর্ণ হওয়ার ধারণাকারী জাহানামেই পৌছে যাবে, যেখান হতে পলায়ন করা অসম্ভব।

ঐ হতভাগাদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা‘আলা এখন সৎ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন-‘যে আমাকে অন্তরে বিশ্বাস করে এবং শরীরের দ্বারা আমার আনুগত্য স্বীকার করে, আমার নির্দেশাবলীর উপর আমল করে, আমি যা নিষেধ করেছি সেটা হতে বিরত থাকে, তাকে আমি আমার নিয়ামত দান করবো এবং তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবো। ঐ জান্নাতের নদীগুলো তাদের ইচ্ছেমত বইতে থাকবে, সেখানে না আছে ধৰ্ষণ না আছে মৃত্যু এবং না আছে কোন ক্ষয়ক্ষতির সংভাবনা। আল্লাহ তা‘আলার এ অঙ্গীকার অটল ও সম্পূর্ণ সত্য। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা’বুদ নেই এবং তিনি ছাড়া কেউ পালনকর্তা ও নেই।’

রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় ভাষণে বলতেনঃ ‘সবচেয়ে সত্য কথা হচ্ছে আল্লাহর কথা এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রদর্শিত পথ। আর সমস্ত কাজের মধ্যে জগন্যতম কাজ হচ্ছে দ্বিনের মধ্যে নতুন জিনিস আনয়ন করা এবং প্রত্যেক এ নতুন জিনিসই হচ্ছে বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআতই হচ্ছে পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহানামে নিয়ে যাবে।’

### ১২৩। না তোমাদের বৃথা আশায়

কাজ হবে এবং না আহলে কিতাবের বৃথা আশায়; যে অসৎ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে এবং সে আল্লাহর পরিবর্তে কাউকেও বক্স অথবা সাহায্যকারী প্রাণ হবে না।

### ১২৪। পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে সৎকার্য করে এবং সে বিশ্বাসীও হয় তবে তারাই জাহানে প্রবেশ করবে এবং তারা খর্জুর কণা পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না।

### ১২৫। আর যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে স্বীয় আনন সমর্পণ করেছে ও সৎকার্য করে এবং ইবরাহীমের সুদৃঢ় ভাবে ধর্মের অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা কার ধর্ম উৎকৃষ্ট? এবং আল্লাহ ইবরাহীমকে স্বীয় বক্সুরপে গ্রহণ করেছিলেন।

لَيْسَ بِأَمَانِكُمْ وَلَا  
أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَبِ مِنْ يَعْمَلُ  
سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ  
دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ  
الصِّلْحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَى  
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ  
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝

وَمَنْ أَحْسَنْ دِينًا مِّمْنَ  
أَسْلَمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ  
وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حِنْيَفًا  
وَاتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝

১২৬। এবং নভোমগুলে যা কিছু  
ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে তা  
আল্লাহরই জন্যে এবং আল্লাহ  
সর্ব বিষয়ে পরিবেষ্টনকারী ।

١٢٦- وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ  
بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

(১৮)  
(১)

হ্যরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, ‘আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয় যে, আহলে কিতাব ও মুসলমানদের মধ্যে তর্ক হয়- আহলে কিতাব এই বলে মুসলমানদের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছিল যে, তাদের নবী (আঃ) মুসলমানদের নবী (সঃ)-এর পূর্বে দুনিয়ার বুকে আগমন করেছিলেন এবং তাদের কিতাবও মুসলমানদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল । অপরপক্ষে মুসলমানেরা বলছিল যে, তাদের নবী (সঃ) সর্বশেষ নবী এবং তাদের কিতাবও পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের ফায়সালাকারী । সে সময় এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় । এতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপর মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয় ।

হ্যরত মুহাজিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আরবের লোকেরা বলেছিল, ‘আমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করা হবে না এবং আমাদের শান্তি ও হবে না ।’ ইয়াহুদীরা বলেছিল, ‘জান্নাতে শুধুমাত্র আমরাই যাবো ।’ খ্রীষ্টানেরাও অনুরূপ কথা বলেছিল । আর তারা এ কথাও বলেছিল যে, তাদেরকে শুধু কিছুদিন জাহানামের শান্তি ভোগ করতে হবে । আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, শুধু মুখের কথা ও দাবীর দ্বারা সত্য প্রকাশিত হয় না । বরং ঈমানদার হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার অন্তর পরিষ্কার হয়, আমল তার সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত দলীল তার হাতে থাকে । হে মুশরিকের দল! তোমাদের মনের বাসনা ও অসার দাবীর কোন মূল্য নেই এবং আহলে কিতাবের উচ্চাকাঞ্চা এবং বড় বড় বুলিও মুক্তির মাপকাঠি নয় । বরং মুক্তির মাপকাঠি হচ্ছে মহান আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন ও রাসূলগণের আনুগত্য স্বীকার । মন্দ কার্যকারীদের সঙ্গে কি এমন সম্বন্ধ রয়েছে যে, যার কারণে তাদেরকে তাদের মন্দ কার্যের প্রতিদান দেয়া হবে না? বরং কিয়ামতের দিন ভাল-মন্দ যে যা করেছে তিল পরিমাণ হলেও তার চোখের সামনে তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে ।

এ আয়াতটি সাহাবীগণের সামনে খুবই কঠিন ঠেকেছিল । হ্যরত আবু বকর (রাঃ) বলেছিলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! অণুপরিমাণ কার্যেরও যখন

প্রতিদান দেয়া হবে তখন মুক্তি কিরণে পাওয়া যাবে?’ তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘প্রত্যেক মন্দ কার্যকারী দুনিয়াতেই প্রতিদান পাবে।’

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এ রয়েছে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) স্বীয় গোলামকে বলেনঃ ‘সাবধান! যেখানে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-কে শূলী দেয়া হয়েছে সেখান দিয়ে গমন করো না।’ কিন্তু গোলাম তাঁর এ কথা ভুলে যায় এবং হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর দৃষ্টি হ্যরত ইবনে যুবায়েরের উপর নিপতিত হলে তিনি বলেন, ‘আল্লাহর শপথ! যতটুকু আমার জানা আছে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি রোযাদার, নামাযী ও আজীয়তার সম্পর্ক যুক্তকারী ছিলে। আমি আশা রাখি যে, যেটুকু মন্দকাজ তোমার দ্বারা সাধিত হয়েছে তার প্রতিশোধ দুনিয়াতেই হয়ে গেল। এরপর আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে আর শাস্তি দেবেন না।’ অতঃপর তিনি হ্যরত মুজাহিদ (রঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, হ্যরত আবু বকর (রাঃ) হতে আমি শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি মন্দকার্য করে তার প্রতিদান সে দুনিয়াতেই পেয়ে যায়।’

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) হ্যরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)-কে শূলে দেখে বলেন, ‘হে আবু হাবীব! আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন। আমি তোমার পিতার মুখেই এ হাদীসটি শুনেছি।’

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এ রয়েছে যে, হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর বিদ্যামানতায় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আয়াতটি তাঁকে পাঠ করে শুনিয়ে দেন তখন তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন যে, প্রত্যেক আমলের যখন প্রতিদান দেয়া হবে তখন মুক্তিপ্রাপ্তি খুব কঠিন হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ ‘হে আবু বকর (রাঃ)! জেনে রেখ যে, তোমার সঙ্গীদেরকে অর্থাৎ মুমিনদেরকে তো দুনিয়াতেই তাদের কার্যের প্রতিদান দেয়া হবে এবং এ বিপদসমূহের কারণেই তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। কিয়ামতের দিন তোমরা পবিত্র হয়ে উঠবে। হ্যাঁ, তবে অন্য লোক যারা রয়েছে তাদের পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে যাবে এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।’ এ হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ীও (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এর বর্ণনাকারী মূসা ইবনে উবাইদাহ দুর্বল এবং অপর বর্ণনাকারী মাওলা ইবনে সিবা অজ্ঞাত। বছ পস্ত্রায় এর মর্মকথা বর্ণিত হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ

আয়াতটি আমাদের উপর খুব ভারী বোধ হচ্ছে।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'মুমিনের এ প্রতিদান ওটাই যা দুনিয়াতেই তার উপর বিপদ-আপদের আকারে আপত্তি হয়।' আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ 'এমন কি একজন মুমিন হয় তো তার জামার পকেটে কিছু টাকা রাখলো, তারপর প্রয়োজনের সময় ক্ষণিকের জন্যে সে সেই টাকা পেলো না, এরপর আবার পকেটে হাত দিতেই টাকা বেরিয়ে আসে। এই যে কিছুক্ষণ সে টাকাটা পেলো না যার দরুণ মনে কিছুটা কষ্ট পেলো, এর ফলেও তার পাপ মার্জনা করা হয় এবং এটাও তার মন্দ কার্যের প্রতিদান হয়ে যায়। দুনিয়ার এসব বিপদ তাকে এমন খাঁটি ও পবিত্র করে দেয় যে, কিয়ামতের কোন বোৰ্ডা তার উপরে থাকে না। যেমন সোনা আগুনে দিলে খাঁটি হয়ে বেরিয়ে আসে, অদ্রপ সেও দুনিয়ায় পাক সাফ হয়ে আল্লাহ তা'আলা'র নিকট গমন করে।' তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেনঃ 'মুমিনকে প্রত্যেক জিনিসেই পুণ্য দেয়া হয়, এমনকি মৃত্যুর যন্ত্রণায়ও পুণ্য দেয়া হয়।'

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যখন বান্দার পাপ খুব বেশী হয়ে যায় এবং সে পাপসমূহ দূর করার মত অধিক সৎ আমল থাকে না তখন আল্লাহ তা'আলা তার উপর কোন দুঃখ নায়িল করেন যার ফলে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়।'

হ্যরত সাঈদ ইবনে মানসূর (রঃ) বলেন যে, যখন উপরোক্ত আয়াতটি সাহাবীগণের উপর ভারী বোধ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বলেনঃ 'তোমরা ঠিকভাবে এবং মিলেমিশে থাক, মুসলমানের প্রত্যেক বিপদই হচ্ছে তার পাপের প্রায়শিত। এমনকি কঁটা লাগলেও (ঐ কারণে গুনাহ মাফ হয়ে থাকে)।'

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, সাহাবীগণ রোদন করছিলেন এবং তাঁরা খুবই চিন্তিত ছিলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে এ কথা বলেছিলেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা আমাদের এ রোগে কি পাবো?' তিনি বলেনঃ 'এর ফলে তোমাদের পাপের প্রায়শিত হয়ে যাবে।' একথা শুনে হ্যরত কা'ব ইবনে আজরা (রাঃ) প্রার্থনা করেন, 'হে আল্লাহ! মৃত্যু পর্যন্ত যেন জুর আমা হতে প্রথক না হয়। কিন্তু যেন আমি হজ্র, উমরা, জিহাদ এবং জামাআতে নামায পড়া হতে বঞ্চিত না হই।' তাঁর এ প্রার্থনা গৃহীত হয়, তাঁর শরীরে হাত লাগালে জুর অনুভূত হতো। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়ঃ ‘প্রত্যেকে মন্দ কার্যেরই কি প্রতিদান দেয়া হবে?’ তিনি উত্তরে বলেনঃ হ্যাঁ, ঐ রকমই এবং অতটুকুই কিন্তু প্রত্যেক সৎ কার্যের প্রতিদান দশগুণ করে দেয়া হয়। সুতরাং সে ধৰ্ষণ হয়ে গেল যার এক দশ হতে বেড়ে গেল (অর্থাৎ পাপের প্রতিদান সমান সমান এবং পুণ্যের প্রতিদান দশগুণ হওয়া সত্ত্বেও পাপ বেশী থেকে গেল)। (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই)

হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, **مَنْ يَعْصِمْ سُوْمَا بِهِ جَزِيْرَةٍ**—এর দ্বারা কাফিরকে বুঝান হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে:

**وَهُلْ نَجْزِيْرَةً إِلَّا الْكُفُورُ**

অর্থাৎ ‘আমি একমাত্র কাফিরদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকি।’ (৩৪:১৭)

হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) ও হ্যরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন যে, এখানে মন্দ কার্যের ভাবার্থ হচ্ছে ‘শিরুক’। এরপর বলা হচ্ছে—‘এ ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে কোন বক্তু ও সাহায্যকারী পাবে না।’ হ্যাঁ, যদি সে তাওবা করে তাহলে সেটা অন্য কথা।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেনঃ সঠিক কথা এই যে, প্রত্যেক মন্দ কাজই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা জানা যাচ্ছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মন্দকার্যের শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পর এখন সৎ কার্যের প্রতিদানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। মন্দকাজের শাস্তি হয়তো দুনিয়াতেই দেয়া হয় এবং এটাই বাস্তার জন্যে উত্তম, অথবা পরকালে দেয়া হয়। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এটা হতে **রَبِّ** করুন। আমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে উভয় জগতে নিরাপত্তা দান করেন এবং আমাদেরকে যেন তিনি দয়া ও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন। আমাদেরকে যেন তিনি ধরপাকড় ও অসন্তুষ্টি হতে রক্ষা করেন।

সৎকার্যাবলী আল্লাহ তা‘আলা পছন্দ করে থাকেন এবং স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণা দ্বারা তা গ্রহণ করে থাকেন। কোন নর বা নারীর সৎকার্য তিনি নষ্ট করেন না। তবে শর্ত এই যে, হতে হবে মুসমলান। এ সংলোকদেরকে তিনি স্বীয় জান্নাতে প্রবিষ্ট করেন। তাদের পুণ্য তিনি যোটেই কম হতে দেবেন না। **فَبَرَّ** বলা হয় খেজুরের আঁটির উপরিভাগের পাতলা আঁশকে। **فَتَبَلِّ** বলা হয় খেজুরের আঁটির

মধ্যস্থলের হালকা ছালকে । এ দু'টো থাকে খেজুরের আঁটির মধ্যে । আর **قطمير** বলা হয় এই আঁটির উপরের আবরণকে । কুরআন কারীমের মধ্যে এরূপ স্থলে এ তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-ওর চেয়ে উত্তম ধর্মের লোক আর কে হতে পারে যে স্বীয় আনন আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে? ঈমানদারী ও সৎ নিয়তে তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী তাঁর নির্দেশাবলী পালন করে এবং সে সৎকর্মশীলও হয় । অর্থাৎ সে শরীয়তের অনুসারী, সত্যধর্ম ও সুপথের পথিক এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসের উপর আমলকারী ।

প্রত্যেক ভাল কাজ গ্রহণীয় হওয়ার জন্যে এ দু'টি শর্ত রয়েছে । অর্থাৎ আন্তরিকতা ও অহী অনুযায়ী হওয়া । **خلوص** বা আন্তরিকতার ভাবার্থ এই যে, উদ্দেশ্য হবে শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন । আর সঠিক হওয়ার অর্থ এই যে, সেটা হবে শরীয়ত অনুযায়ী । সুতরাং বাহির তো কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী হওয়ার মাধ্যমে ঠিক হয়ে যায় । আর তেতর সুসজ্জিত হয় সৎ নিয়তের দ্বারা । যদি এ দু'টির মধ্যে মাত্র একটি না থাকে তবে আমল নষ্ট হয়ে যাবে । আন্তরিকতা না থাকলে কপটতা চলে আসে । তখন মানুষের সন্তুষ্টি ও তাদেরকে দেখানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে । কাজেই সেই অবস্থায় আমল গ্রহণযোগ্য হয় না ।

সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ না হলে পথভ্রষ্টতা এবং অজ্ঞতা একত্রিত হয়ে যায়, ফলে তখনও আমল গ্রহণযোগ্যরূপে বিবেচিত হয় না । যেহেতু মুমিনের আমল লোক দেখানো হতে এবং শরীয়তের বিপরীত হওয়া থেকে মুক্ত হয় সেহেতু তার কাজ সর্বাপেক্ষা উত্তম কাজ হয়ে থাকে । ঐ কাজেই আল্লাহ তা'আলা এর পরেই বলেন-‘তারা ইবরাহীম (আঃ)-এর সুদৃঢ় ধর্মের অনুকরণ করে থাকে ।’ অর্থাৎ তারা হ্যরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন তাঁদের সকলের ধর্মের অনুসরণ করে থাকে । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে-

إِنَّ أُولَئِنَّا النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ يُمَلِّئُونَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوا هَذَا النَّبِيُّ

অর্থাৎ ‘ইবরাহীমের বেশী নিকটতম তারাই যারা তার অনুসারী এবং এ নবী (সঃ) ।’ (৩: ৬৮) আর এক আয়াতে রয়েছে-

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ -

অর্থাৎ ‘হে নবী (সঃ)! আমি তোমার নিকট অহী করেছি যে, তুমি ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ কর এবং সে মুশরিকদের অন্তর্গত ছিল না।’ (১৬: ১২৩)

‘**حَنِيفٌ**’ বলা হয় স্বেচ্ছায় শির্ক হতে অসন্তোষ প্রকাশকারীকে ও পূর্ণভাবে সত্যের দিকে মন সংযোগকারীকে, যাকে কোন বাধাদানকারী বাধা দিতে পারে না এবং দূরকারী দূর করতে পারে না।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আনুগত্য স্বীকারের প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্যে এবং তৎপ্রতি উদ্বৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি আল্লাহর বন্ধু। অর্থাৎ বান্দা উন্নতি করতে করতে যে উচ্চতম পদ সোপান পর্যন্ত পৌছতে পারে, হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) সে সোপান পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলেন। বন্ধুত্বের দরজা অপেক্ষা বড় দরজা আর নেই। এটা হচ্ছে প্রেমের উচ্চতম স্থান। হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) ঐ স্থান পর্যন্ত পৌছেছিলেন। এর কারণ ছিল তাঁর পূর্ণ আনুগত্য। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾<sup>১</sup> অর্থাৎ ‘সেই ইবরাহীম যে পুরোপুরি আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করেছিল।’ (৫০: ৩৭) অর্থাৎ হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশাবলী সম্মতিচিত্তে পালন করেছিলেন। কখনও তিনি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করেননি। তাঁর ইবাদতে তিনি কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেননি। কোন কিছু তাঁকে তাঁর ইবাদত হতে বিরত রাখতে পারেনি।

আর একটি আয়াতে আছে **وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ بِكَلِمَتٍ فَاتَّمَهُنَّ**<sup>২</sup> অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীমকে কতগুলো কথা দ্বারা পরীক্ষা করেন, তখন সে ঐগুলো পূর্ণ করে।’ (২: ১২৪) আল্লাহ তা‘আলা আর এক জায়গায় বলেন—

**إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ -**

অর্থাৎ ‘ইবরাহীম (আঃ) ছিল একাগ্রচিত্তে আল্লাহর নির্দেশাবলী পালনকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।’ (১৬: ১২০)

সহীহ বুখারী শরীফে হ্যরত আমর ইবনে মাইমুন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত মু‘আয (রাঃ) ইয়ামনে ফজরের নামাযে যখন **وَاتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا**<sup>৩</sup> এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন একটি লোক বলেন-

**لَقَدْ قَرَأَ عَيْنَ أَمِ إِبْرَاهِيمَ**

অর্থাৎ ‘হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মায়ের চক্ষু ঠাণ্ডা হলো।’

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে, হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) ‘খালীলুল্লাহ’ উপাধি হওয়ার কারণ এই যে, একবার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি মিসরে বা মুসিলে তাঁর এক বন্ধুর নিকট হতে কিছু খাদ্য-শস্য আনার উদ্দেশ্যে গমন করেন। কিন্তু তথায় কিছু না পেয়ে শূন্য হস্তে ফিরে আসছিলেন। স্বীয় গ্রামের নিকটবর্তী হলে তাঁর খেয়াল হয় যে, এ বালুর ঢিবি হতে কিছু বালু বস্তায় ভর্তি করা হোক এবং এটা বাড়ী নিয়ে গিয়ে পরিবারকে কিছুটা সান্ত্বনা দেয়া যাবে। এভাবে তিনি বস্তায় বালু ভরে নেন এবং সোয়ারীর উপর উঠিয়ে নিয়ে বাড়ী মুখে রওয়ানা হন। মহান আল্লাহর কুদরতে সে বালু প্রকৃত আটা হয়ে যায়। তিনি বাড়ীতে পৌঁছে বস্তা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর পরিবারের লোকেরা বস্তা খুলে দেখে যে, সেটা উত্তম আটায় পূর্ণ রয়েছে। আটা খামীর করে ঝুঁটি পাকান হয়। তিনি জগ্নিত হয়ে পরিবারের লোককে আনন্দিত দেখতে পান এবং ঝুঁটি ও প্রস্তুত দেখেন। তখন তিনি বিস্মিতভাবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘যে আটা দিয়ে তোমরা ঝুঁটি তৈরী করলে তা পেলে কোথায়?’ তারা উত্তরে বলেঃ ‘আপনি তো আপনার বন্ধুর নিকট হত্তে নিয়ে এসেছেন।’ এখন তিনি ব্যাপারটা বুঝে ফেলেন এবং তাদেরকে বলেনঃ ‘হ্যাঁ, এটা আমি আমার বন্ধু মহান সম্মানিত আল্লাহর নিকট হতে এনেছি।’ সুতরাং আল্লাহ তা‘আলাও তাঁকে স্বীয় বন্ধুরপে গ্রহণ করেন। আর তাঁকে খালীলুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করেনঃ কিন্তু এ ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। খুব বেশী বললে এটাই বলা যাবে যে, এটা বানী ইসরাইলের বর্ণনা, যাকে আমরা সত্যও বলতে পারি না এবং মিথ্যাও বলতে পারি না। তাঁকে আল্লাহর বন্ধু বলার প্রকৃত কারণ এই যে, তাঁর অন্তরে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি সীমাহীন ভালবাসা ছিল। আর ছিল তাঁর প্রতি তাঁর পূর্ণ আনুগত্য। তিনি স্বীয় ইবাদত দ্বারা আল্লাহ তা‘আলাকে সম্মুক্ত করেছিলেন। নবীও (সঃ) তাঁর বিদায় ভাষণে বলেছিলেনঃ ‘হে জনমগ্নলি! দুনিয়াবাসীদের মধ্যে যদি আমি কাউকে বন্ধুরপে গ্রহণকারী হতাম তবে আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা (রাঃ)-কে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তোমাদের সঙ্গী (আমি) হচ্ছেন আল্লাহ তা‘আলার বন্ধু।’ (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা যেমন হ্যরত ইবরাহীমকে স্বীয় বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তদ্বপ তিনি আমাকেও তাঁর বন্ধুরপে গ্রহণ করেছেন।’

হ্যরত আবু বকর ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ ‘একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ তাঁর অপেক্ষায় বসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলছিল। কেউ বলছিলেনঃ ‘চমকপ্রদ কথা এই যে, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মাখলুকের মধ্যে হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।’ অন্য একজন বলেনঃ ‘এর চেয়েও বড় মেহেরবানী এই যে, হ্যরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে তিনি স্বয়ং কথা বলেছেন এবং তাঁর কালিমুল্লাহ বানিয়েছেন।’ অপর একজন বলেনঃ ‘হ্যরত ঈসা (আঃ) তো হচ্ছেন আল্লাহর রূহ এবং তাঁর কালেমা।’ আর একজন বলেনঃ ‘হ্যরত আদম (আঃ) হচ্ছেন সাফীউল্লাহ এবং আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দা।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বাইরে এসে বলেনঃ ‘আমি তোমাদের কথা শুনেছি। নিশ্চয়ই তোমাদের কথা সত্য। হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) হচ্ছেন খালীলুল্লাহ, হ্যরত মূসা (আঃ) হচ্ছেন কালীমুল্লাহ, হ্যরত ঈসা (আঃ) হচ্ছেন রূহুল্লাহ ও কালেমাতুল্লাহ এবং হ্যরত আদম (আঃ) হচ্ছেন সাফীউল্লাহ। এ রকমই হ্যরত মুহাম্মাদ (সঃ) বটে। জেনে রেখো আমি একটি ঘটনা বর্ণনা করছি, এটা কিন্তু অহংকার হিসেবে নয়। আমি বলছি যে, আমি হাবীবুল্লাহ। আমি হচ্ছি সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গৃহীত হবে। আমিই প্রথম জান্নাতের দরজায় করাঘাতকারী। আল্লাহ তা‘আলা আমার জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে দেবেন এবং আমাকেও ওর ভেতরে প্রবিষ্ট করবেন। আর আমার সঙ্গে থাকবে দরিদ্র মুমিন লোকেরা। কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত লোক অপেক্ষা বেশী সম্মানিত হবো আমিই। এটা গৌরবের বশবর্তী হয়ে বলছি না, বরং ঘটনা অবহিত করার জন্য তোমাদেরকে বলছি।’ এ সনদে এ হাদীসটি গারীব বটে, কিন্তু এর সত্যতার কতক প্রমাণও বিদ্যমান রয়েছে।

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ ‘তোমরা কি এতে বিশ্বয় বোধ করছো যে, বন্ধুত্ব ছিল হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে, কালাম ছিল হ্যরত মূসা (আঃ)-এর জন্যে এবং দর্শন ছিল হ্যরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ)-এর জন্যে। (মুসতাদরিক-ই-হাকীম) এ রকমই বর্ণনা হ্যরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে এবং আরও বহু সাহাবী ও তাবেঙ্গ হতেও বর্ণিত আছে। তাছাড়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু শুরুজন হতেও বর্ণিত আছে।

মুস্নাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে, হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি অতিথিদেরকে সঙ্গে নিয়ে খেতেন। একদিন তিনি

অতিথির খোঁজে বের হন। কিন্তু কোন অতিথি না পেয়ে ফিরে আসেন। বাড়িতে প্রবেশ করে দেখেন যে, একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘হে আল্লাহর বান্দা! আপনাকে আমার বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি দিল কে?’ লোকটি উত্তরে বলেনঃ ‘এ বাড়ীর প্রকৃত মালিক আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।’ তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ ‘আপনি কে?’ তিনি বলেনঃ ‘আমি মৃত্যুর ফেরেশতা, আমাকে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর এক বান্দার নিকট এজন্যে পাঠিয়েছেন যে, তিনি তাঁকে স্থীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন, আমি যেন তাঁকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দেই।’ এ কথা শুনে হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁকে বলেনঃ ‘তাহলে আমাকে বলুন তো, সে মহা পুরুষ কে? আল্লাহর শপথ! তিনি এ দুনিয়ার কোন দূর প্রান্তে থাকলেও আমি গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবো এবং আমার অবশিষ্ট জীবন তাঁর পদচুম্বনে কাটিয়ে দেবো।’ এটা শুনে মৃত্যুর ফেরেশতা বলেনঃ ‘ঐ ব্যক্তি আপনিই।’ তিনি আবার জিজ্ঞেস করেনঃ ‘সত্যিই কি আমি?’ ফেরেশতা বলেনঃ ‘হ্যাঁ, আপনিই।’ হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) পুনরায় ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘তাহলে আপনি এ কথাও বলুন তো, কিসের উপর ভিত্তি করে এবং কোন কার্যের বিনিময়ে তিনি আমাকে বন্ধু হিসেবে মনোনীত করেছেন?’ ফেরেশতা উত্তরে বলেনঃ ‘কারণ এই যে, আপনি সকলকে দিতে থাকেন, কিন্তু আপনি কারও নিকট কিছু যাঞ্চাঁ করেন না।’

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন হতে আল্লাহ তা‘আলা হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-কে ‘খালীলুল্লাহ’ এ বিশিষ্ট উপাধিতে ভূষিত করেন তখন হতে তাঁর অন্তরে আল্লাহর ভয় এতো বেশী জমে উঠেছিল যে, তাঁর অন্তরের কম্পনের শব্দ দূর হতে এমনিভাবেই শুনা যেতো যেমনিভাবে মহাশূন্যে পাখীর উড়ে যাওয়ার শব্দ শুনা যায়।

সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সম্বন্ধেও এসেছে যে, যে সময় আল্লাহ তা‘আলার ভয় তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতো তখন তাঁর কান্নার শব্দ, যা তিনি দমন করে রাখতেন, দূরবর্তী ও পার্শ্ববর্তী লোকেরা এমনিভাবেই শুনতে পেতো যেমনিভাবে কোন হাঁড়ির মধ্যে পানি টগবগ করে ফুটলে তা শুনা যায়।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন-আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর অধিকারে রয়েছে এবং সবাই তাঁর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ আছে। সবই তাঁর সৃষ্টি। তথায় তিনি যখন যা করার ইচ্ছে করেন, বিনা বাধা-বিপত্তিতে তাই করে থাকেন। কারও সাথে পরামর্শ করার তাঁর প্রয়োজন হয় না। এমন কেউ

নেই যে তাকে তাঁর ইচ্ছে হতে ফিরিয়ে দিতে পারে। কেউ তাঁর আদেশের সামনে প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়াতে পারে না। তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ন্যায় বিচারক, মহা বিজ্ঞানময়, সূক্ষ্মদর্শী ও পরম দয়ালু। তিনি এক। কারও মুখাপেক্ষী তিনি নন। কোন লুকায়িত জিনিস, স্কুদ্র হতে স্কুদ্রতম জিনিস এবং বহু দূরের জিনিস তাঁর নিকট গুপ্ত নেই। যা কিছু আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে তার সবই তাঁর নিকট প্রকাশমান।

১২৭। এবং তারা তোমার নিকট  
নারীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা  
জিজ্ঞেস করেছে; তুমি বল-  
আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের  
সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করেছেন  
এবং পিতৃহীনা নারীদের  
সম্বন্ধে তোমাদের প্রতি গ্রস্ত  
হতে পাঠ করা হয়েছে যে,  
তাদের জন্যে যা বিধিবন্ধ  
হয়েছে তা তোমরা প্রদান কর  
না এবং তাদেরকে বিয়ে  
করতে বাসনা কর; এবং  
শিশুগণের মধ্যে দুর্বলদের ও  
পিতৃহীনদের প্রতি সুবিচার  
প্রতিষ্ঠা কর, এবং তোমরা যে  
সৎকার্য কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ  
তদ্বিষয়ে খুব জানেন।

সহীহ বুখারী শরীফে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, এ আয়াতে ঐ লোককে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে কোন পিতৃহীনা বালিকাকে লালন-পালন করে যার অভিভাবক উত্তরাধিকারী সে নিজেই এবং সে তার মালে অংশীদার হয়ে গেছে। এখন সে ঐ মেয়েটিকে নিজে বিয়ে করার ইচ্ছে করে বলে তাকে অন্য জায়গায় বিয়ে করতে বাধা প্রদান করে। এরপে লোকের সম্বন্ধেই এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়।

۱۲۷ - وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ  
قُلِ اللَّهُ يَفْتِيْكُمْ فِي هِنَّ وَمَا  
يَتْلِي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَبِ فِي  
يَتَمَّى النِّسَاءُ إِلَّا لَأَ  
تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ  
وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ  
وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ  
وَانْ تَقُومُوا لِلْيَتَمَّى بِالْقِسْطِ  
وَمَا تَفْعِلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِهِ عَلِيمًا

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন জনগণ পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ঐ পিতৃহীন মেয়েদের সমন্বে জিজ্ঞেসা করে তখন আল্লাহ তা'আলা<sup>۱</sup> - وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، الْخَ - এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ (১) কৃতি<sup>۲</sup> - وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَبِ (১) - এ আয়াতে যা বলা হয়েছে এর দ্বারা ১<sup>۳</sup> ইতিমি<sup>۴</sup> খ<sup>۵</sup> (৪: ৩)-এ প্রথম আয়াতটিকে বুঝানো হয়েছে।' হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, পিতৃহীনা মেয়েদের অভিভাবক উজ্জ্বরাধিকারীগণ যখন ঐ মেয়েদের নিকট সম্পদ কম পেতো এবং তারা সুন্দরী না হতো তখন তারা তাদেরকে বিয়ে করা হতে বিরত থাকতো। আর তাদের মাল-ধন বেশী থাকলে এবং তারা সুন্দরী হলে তাদেরকে বিয়ে করতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করতো। কিন্তু তাদের অন্য কোন অভিভাবক থাকতো না বলে ঐ অবস্থাতেও তাদেরকে তাদের মোহর ও অন্যান্য প্রাপ্য কম দিতো। তাই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন যে, পিতৃহীনা বালিকাদেরকে তাদের মোহর ও অন্যান্য প্রাপ্য পুরোপুরি দেয়া ছাড়া বিয়ে করার অনুমতি নেই। উদ্দেশ্য এই যে, একপ পিতৃহীনা বালিকা, যাকে বিয়ে করা তার অভিভাবকের জন্যে বৈধ, তাকে তার সেই অভিভাবক বিয়ে করতে পারে। কিন্তু শর্ত এই যে, ঐ মেয়েটির বংশের অন্যান্য মেয়েরা তাদের বিয়েতে যে মোহর পেয়েছে সেই মোহর তাকেও দিতে হবে। যদি তা না দেয় তবে তার উচিত যে, সে যেন তাকে বিয়ে না করে।

এ সূরার প্রথমকার এ বিষয়ের আয়াতের ভাবার্থ এটাই। কখনও এমনও হয় যে, এ পিতৃহীনা বালিকার সেই অভিভাবক যার সাথে তার বিবাহ বৈধ, সে যে কোন কারণেই হোক তাকে বিয়ে করতে চায় না। কিন্তু সে ভয় করে যে, যদি অন্য জায়গায় মেয়েটির বিয়ে দেয়া হয় তবে তার যে মালে তার অংশ রয়েছে তা হাতছাড়া হয়ে যাবে, এ জন্যে সে মেয়েটিকে অন্য জায়গায় বিয়ে করতে বাধা দেয়। এ আয়াতে এ জন্য কাজ হতে নিষেধ করা হয়েছে।

এও বর্ণিত আছে যে, অঙ্গতার যুগে এ প্রথা ছিল-পিতৃহীনা বালিকার অভিভাবক যখন মেয়েটিকে তার অভিভাবকক্তৃ নিয়ে নিতো তখন সে তার উপরে একটা কাপড় ফেলে দিতো। তখন আর তাকে বিয়ে করার কারও কোন ক্ষমতা থাকতো না। এখন যদি সে সুশ্রী হতো তবে সে তাকে বিয়ে করে নিতো এবং তার মালও গলাধঃকরণ করতো। আর যদি সে বিশ্রী হতো, কিন্তু তার বহু মাল থাকতো তবে সে তাকে নিজেও বিয়ে করতো না এবং অন্য জায়গায় বিয়ে

করতেও তাকে বাধা দিতো । ফলে মেয়েটি ঐ অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করতো এবং ঐ লোকটি তার মাল হস্তগত করতো । এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ কাজে চরমভাবে বাধা দিয়েছেন ।

হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) হতে এর সাথে সাথে এটাও বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতা যুগের লোকেরা ছোট ছেলেদেরকে এবং বড় মেয়েদেরকে উত্তরাধিকার হতে বাধিত করতো । কুরআন কারীমে এ কু-প্রথার মূলেও কুঠারাঘাত করা হয়েছে । প্রত্যেককেই অংশ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । বলা হয়েছে, ‘ছেলে এবং মেয়ে ছোটই হোক বা বড়ই হোক তাদেরকে অংশ প্রদান কর তবে মেয়েকে অর্ধেক ও ছেলেকে পূর্ণ দাও’ । অর্থাৎ একটি ছেলেকে দু'টি মেয়ের সমান অংশ প্রদান কর । আর পিতৃহীনা মেয়েদের প্রতি ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন । বলা হয়েছে—‘যখন তোমরা সৌন্দর্য ও মালের অধিকারিণী পিতৃহীনা মেয়েদেরকে নিজেই বিয়ে করবে তখন যাদের মাল ও সৌন্দর্য কম আছে তাদেরকেও বিয়ে কর ।’

তারপর বলা হচ্ছে—তোমাদের সমুদয় কার্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত আছেন । সুতরাং তোমাদের ভাল কাজ এবং আল্লাহ তা'আলা'র আদেশ ও নির্ষেধ মেনে চলে ভাল প্রতিদান গ্রহণ করা উচিত ।

১২৮ । যদি কোন স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর অসদাচরণ ও উপেক্ষার আশংকা করে, তবে তারা পরম্পর কোন সুমীমাংসায় সশ্চিলিত হলে তাদের উভয়ের কোন অপরাধ নেই এবং মীমাংসাই কল্যাণকর; এবং জীবগণের সম্মুখে প্রলোভন বিদ্যামান রয়েছে এবং যদি তোমরা সৎ ব্যবহার কর ও সংযমী হও তবে তোমরা যা করছো তদ্বিষয়ে আল্লাহ অভিজ্ঞ ।

١٢٨- وَإِنْ امْرَأً خَافَتْ مِنْ  
بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا  
جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلِحَا  
بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ  
وَاحْضِرُوكُلَّ الْأَنفُسِ الشَّجَرَ وَإِنْ  
مُحَسِّنُوا وَتَقْوَى فِيَانَ اللَّهِ  
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ॥

১২৯। তোমরা কখনও স্ত্রীগণের  
মধ্যে সুবিচার করতে পারবে  
না যদিও তোমরা কামনা কর,  
সুতরাং তোমরা কোন এক  
জনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে  
পড়ো না ও অপরজনকে  
ঝুলান অবস্থায় রেখো না  
এবং যদি তোমরা সশিলিত ও  
সংযমী হও তবে নিশ্চয়ই  
আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল,  
করুণাময় ।

১৩০। এবং যদি তারা উভয়ে  
বিচ্ছিন্ন হয়, তবে আল্লাহ স্বীয়  
প্রাচুর্য হতে তাদের প্রত্যেককে  
সম্পদশালী করবেন এবং  
আল্লাহ সুপ্রশংস্ত মহাজ্ঞানী ।

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর অবস্থাসমূহ এবং তাদের নির্দেশাবলীর নির্দেশ  
দিচ্ছেন। স্বামীরা কখনও কখনও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে। তারা কখনও  
স্ত্রীদেরকে চায়, আবার কখনও পৃথক করে দেয়। সুতরাং যখন স্ত্রী তার স্বামীর  
অসন্তুষ্টির মনোভাব বুঝতে পারবে তখন যদি সে তাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে  
তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেয় তবে তা সে করতে পারে। যেমন  
সে তার খাদ্য ও বস্ত্র ছেড়ে দেয় বা রাত্রি যাপনের হক ছেড়ে দেয় তবে উভয়ের  
জন্যে এটা বৈধ। অতঃপর ওরই প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন যে, সন্ধিই উত্তম ।

হ্যরত সাওদা বিনতে যামআ' (রাঃ) যখন খুবই বৃদ্ধা হয়ে যান এবং বুঝতে  
পারেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে পৃথক করে দেয়ার ইচ্ছে রাখেন তখন তিনি  
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ 'আমি আমার পালার হক হ্যরত আয়েশা  
(রাঃ)-কে দিয়ে দিলাম।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটা স্বীকার করে নেন এবং এর  
উপরেই সন্ধি হয়ে যায় ।

١٢٩- وَلَنْ تَسْتَطِعُوا إِنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ  
حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِأُوكُلَّ  
الْمُمْلِلِ فَتَذَرُّهَا كَالْمُعْلَقَةِ  
وَإِنْ تُصْلِحُوهَا وَتَتَقَوَّمَا فِيَنَ اللَّهِ  
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ॥

১৩. - وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِي اللَّهُ كُلَّا  
مِنْ سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا  
حَكِيمًا ॥

সুনান-ই-আবি দাউদে রয়েছে যে, ঐ ব্যাপারেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন, ‘স্বামী-স্ত্রী কোন কথার উপর একমত হলে তা বৈধ।’ তিনি আরও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্দোকালের সময় তাঁর নয়জন স্ত্রী বিদ্যমান ছিলেন যাঁদের মধ্যে আটজনকে তিনি পালা (রাত্রি যাপনের পালা) বন্টন করে দিয়েছিলেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, সাওদা (রাঃ)-এর (রাত্রি যাপনের) পালার দিনটি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রদান করতেন। হ্যরত উরওয়া (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, হ্যরত সাওদা (রাঃ) বৃক্ষ বয়সে যখন বুঝতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে পরিত্যাগ করার ইচ্ছে করেছেন তখন তিনি চিন্তা করেন যে, হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর গাঢ় ভালবাসা রয়েছে। কাজেই যদি তিনি (সাওদা রাঃ) তাঁর (রাত্রি যাপনের) পালা হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-কে দিয়ে দেন তবে যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সম্মত হয়ে যাবেন এতে বিশ্বয়ের কি আছে? এবং তিনি তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী হয়েই থেকে যাবেন। হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাত্রি যাপনের ব্যাপারে সমস্ত স্ত্রীকে সমান অধিকার দিয়ে রেখেছিলেন। সাধারণতঃ প্রত্যহ তিনি সকল স্ত্রীর নিকটে যেতেন, পার্শ্ব বসতেন, গল্প করতেন, কিন্তু স্পর্শ করতেন না। অবশ্যে যাঁর পালা থাকতো তাঁর ওখানেই রাত্রি যাপন করতেন।’ তারপরে তিনি হ্যরত সাওদা (রাঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করেন, যা উপরে বর্ণিত হলো। (সুনান-ই-আবি দাউদ)

মুজাম-ই-আবুল আবাসের একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত সাওদা (রাঃ)-এর নিকট তালাকের সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। তিনি হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট বসেছিলেন। হ্যুর তথায় আগমন করলে হ্যরত সাওদা (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ ‘যে আল্লাহ আপনার উপর স্বীয় বাণী অবতীর্ণ করেছেন এবং স্বীয় মাখলুকের মধ্যে আপনাকে স্বীয় মনোনীত বান্দা করেছেন তাঁর শপথ! আপনি আমাকে ফিরিয়ে নিন। আমার বয়স খুব বেশী হয়ে গেছে। পুরুষের প্রতি আমার আর কোন আস্তি নেই। কিন্তু আমার বাসনা এই যে, আমাকে যেন কিয়ামতের দিন আপনার স্ত্রীদের মধ্যে উঠান হয়।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এতে সম্মত হন এবং তাঁকে ফিরিয়ে নেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আমার পালার দিন ও রাত্রি আপনার প্রিয় পত্নী হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-কে দান করে দিলাম।

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছেঃ এর ভাবার্থ এই যে, কোন বৃদ্ধা স্ত্রী হয়তো তার স্বামীকে দেখে যে, সে তাকে ভালবাসে না বরং পৃথক করে দিতে চায়, তখন সে তাকে বলেঃ ‘আমি আমার অধিকার ছেড়ে দিচ্ছি, সুতরাং তুমি আমাকে পৃথক করো না।’

এ আয়াতটি দু'জনকেই এ কাজের অনুমতি দিচ্ছে। ঐ সময়েও এ অবস্থা যখন কারো দু'টি স্ত্রী থাকবে এবং একটিকে সে তার বার্ধক্যের কারণে বা সে বিশ্রী হওয়ার কারণে তার সাথে ভালবাসা রাখবে না এবং ফলে তাকে তালাক দিয়ে দেয়ার ইচ্ছে করবে, কিন্তু ঐ স্ত্রী যে কোন কারণেই তার ঐ স্বামীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে চাহিবে ও পৃথক হয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করবে তখন তার এ অধিকার থাকবে যে, তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেবে এবং স্বামী তাতে সমত হয়ে তাকে তালাক দেয়া হতে বিরত থাকবে।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি হ্যরত উমার (রাঃ)-কে একটি প্রশ্ন করে। হ্যরত উমার (রাঃ) সেটা অপছন্দ করেন এবং তাকে চাবুক মেরে দেন। এরপর আর একটি লোক এ আয়াত সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করে। তখন তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, এটা জিজ্ঞাস্য বিষয়ই বটে। এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঐ অবস্থা যেমন একটি লোকের একটি স্ত্রী রয়েছে, কিন্তু সে বৃদ্ধা হয়ে গেছে। তার আর ছেলে মেয়ে হয় না। তখন তার স্বামী একটি যুবতী নারীকে বিয়ে করে। এখন এ বৃদ্ধা স্ত্রী এবং তাঁর স্বামী যে কোন জিনিসের উপর একমত হয়ে গেলে সেটা বৈধ।

হ্যরত আলী (রাঃ) এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেনঃ “এর দ্বারা ঐ স্ত্রীকে বুরান হয়েছে, যে তার বার্ধক্যের কারণে বা বিশ্রী হওয়ার কারণে অথবা দুচরিত্রার কারণে কিংবা অপরিচ্ছন্নতার কারণে তার স্বামীর নিকট দৃষ্টিকু হয়ে গেছে, কিন্তু সে কামনা করে যে, তার স্বামী যেন তালাক না দেয়। এ অবস্থায় যদি সে তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দিয়ে তার স্বামীর সাথে সঙ্গ করে নেয় তবে তা করতে পারে।”

পূর্ববর্তী মনীষীগণ ও ইমামগণ হতে বরাবরই এ তাফসীরই বর্ণিত আছে। এমনকি প্রায় সবাই এর উপর একমত এবং আমার ধারণায় তো এর বিরোধী কেউ নেই। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মুহাম্মাদ ইব্নে মুসলিম (রাঃ)-এর কন্যা হ্যরত রাফে' ইব্নে খুদায়েজ (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। বার্ধক্যের কারণে বা অন্য কোন কারণে তার প্রতি তাঁর স্বামীর আকর্ষণ ছিল না। এমনকি তিনি তাঁকে তালাক দেয়ার ইচ্ছে করেন। তখন তিনি স্বীয় স্বামীকে বলেনঃ “আমাকে তালাক না দিয়ে বরং আপনি আমার নিকট যা চাইবেন আমি তাই দিতে সমত রয়েছি।” সে সময় **وَإِنْ اُمْرَأً خَافَتْ مِنْ عَلِهَا نُشُرًا أَوْ اعْرَاضًا** -এ আয়াতটি অবর্তী হয়। এ আয়াতটিয়ে ঐ স্ত্রীলোকটির বর্ণনা রয়েছে যার উপর তার স্বামীর মন চটে গেছে। তার স্বামীর উচিত যে, সে যেন তার ঐ স্ত্রীকে বলে দেয়—“তুমি ইচ্ছে করলে আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দেবো। আর যদি তুমি আমার স্ত্রী হয়েই থাকতে চাও তবে আমি মাল বন্টনে এবং পালা বন্টনে তোমার উপর অন্যান্য স্ত্রীদেরকে প্রাধান্য দেবো।” তখন ঐ স্ত্রীর যে কোন একটিকে মেনে নেয়ার অধিকার রয়েছে। সে যদি দ্বিতীয় কথাটি মেনে নেয় তবে তাকে রাত্রি যাপনের পালা না দেয়া স্বামীর জন্যে বৈধ।

আর যে মোহর ইত্যাদি সে স্বামীর জন্যে ছেড়ে দিয়েছে সেটা নিজস্ব সম্পদ কাপে গ্রহণ করাও তার স্বামীর জন্য বৈধ।

হ্যরত রাফে' ইব্নে খুদায়েজ আনসারী (রাঃ)-এর স্ত্রী যখন বৃদ্ধা হয়ে যান তখন তিনি এক নব যুবতীকে বিয়ে করেন। অতঃপর তিনি ঐ নব বিবাহিতা স্ত্রীকে পূর্বের স্ত্রীর উপর গুরুত্ব দিতে থাকেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁর পূর্ব স্ত্রী তালাক যাঞ্চগা করেন। হ্যরত রাফে' (রাঃ) তাকে তালাক দিয়ে দেন। কিন্তু ইন্দিত শেষ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে তাকে ফিরিয়ে নেন। কিন্তু এবারেও ঐ একই অবস্থা হয় যে তিনি যুবতী স্ত্রীর প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। পূর্ব স্ত্রী আবার তালাক প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁকে এবারও তালাক দিয়ে দেন। কিন্তু পুনরায় ফিরিয়ে নেন। এবারও অনুরূপ অবস্থাই ঘটে। অতঃপর ঐ স্ত্রী কসম দিয়ে তালাক প্রার্থনা করে। তখন তিনি তাঁর ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীকে বলেনঃ “চিন্তা করে দেখো, এটা কিন্তু শেষ তালাক। যদি তুমি চাও তবে আমি তালাক দিয়ে দেই, নতুবা এ অবস্থায় থাকাই স্বীকার করে নাও।” সুতরাং তিনি স্বীয় অধিকার ছেড়ে দিয়ে ঐভাবেই বাস করতে থাকেন। **(وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)** অর্থাৎ সক্রিয় কল্যাণকর-এর একটি অর্থ নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছেঃ স্বামীর তার স্ত্রীকে এ অধিকার দেয়া—সে ইচ্ছে করলে ঐভাবেই থাকবে যে, সে অন্য স্ত্রীর সমান অধিকার লাভ করবে না বা তালাক গ্রহণ করবে। এটা ওর চেয়ে উত্তম যে, সে তার স্ত্রীকে কিছু না বলেই অন্য স্ত্রীকে তার উপর প্রাধান্য দেয়। কিন্তু এর চেয়ে উত্তম ভাবার্থ হচ্ছে

এই যে, স্ত্রী তার আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেবে এবং ফলে স্বামী তাকে তালাক দেবে না, বরং পরম্পর মিলেমিশে থাকবে। এটা তালাক দেয়া ও নেয়া অপেক্ষা উত্তম। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত সাওদা বিনতে জামাআ' (রাঃ)-কে স্বীয় স্ত্রী রূপেই রেখে দেন এবং তিনি তাঁর হক হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-কে দান করে দেন। তার এ কার্যের মধ্যে তাঁর উচ্চতের জন্যে সুন্দর নমুনা রয়েছে যে, মনোমালিন্যের অবস্থাতেও তালাকের প্রশ্ন উঠবে না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নিকট বিছেদ হতে সম্ভিত উত্তম সেহেতু বলেছেন যে, সম্ভিই কল্যাণকর। এমন কি সুনান-ই-ইবনে মাজাহ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে অপচন্দনীয় হালাল হচ্ছে তালাক।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমাদের অনুগ্রহ ও তাকওয়া প্রদর্শন করা অর্থাৎ স্ত্রীর অন্যায়কে ক্ষমা এবং তাকে অপচন্দ করা সত্ত্বেও তার পূর্ণ প্রাপ্য দিয়ে দেয়া এবং পালা ও লেন-দেনের ব্যাপারে সমতা রক্ষা খুবই উত্তম কাজ, যা আল্লাহ তা'আলা খুব ভালই জানেন। আর এর বিনিময়ে দেবেন তিনি উত্তম প্রতিদান।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে-তোমরা যদিও কামনা কর যে, তোমাদের কয়েকটি স্ত্রীর মধ্যে সর্বপ্রকারের ন্যায় ও সমতা বজায় রাখবে, তবুও তোমরা তা পারবে না। কেননা, তোমরা হয়তো একটি একটি করে রাত্রির পালা করে দিতে পার, কিন্তু প্রেম, চাহিদা, সঙ্গম ইত্যাদির সমতা কি রূপে রক্ষা করবে?

ইবনে মুলাইকা (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। এজন্যেই হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় স্ত্রীগণের মধ্যে সঠিকভাবে সমতা রক্ষা করে চলতেন। তথাপি তিনি আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ প্রার্থনা করতেনঃ “হে প্রভু! এটা ঐ বন্টন যা আমার অধিকারে রয়েছে। এখন যেটা আমার অধিকারের বাইরে অর্থাৎ আন্তরিক সম্পর্ক, সে ব্যাপারে আপনি তিরক্ষার করবেন না।” (সুনান-ই-আবি দাউদ) এর ইসনাদ বিশুদ্ধ, কিন্তু ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) বলেন যে, অন্য সনদে এটা মুরসাল রূপেও বর্ণিত আছে এবং ওটাই অধিকতর বিশুদ্ধ।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন- একদিকে সম্পূর্ণরূপে আসক্ত হয়ে পড়ো না যার ফলে অপর স্ত্রী দোদুল্যমান অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। কেননা সে সময় তার

স্বামী থেকেও না থাকা হবে। তুমি তার থেকে সরে থাকবে অথচ সে তোমার পত্নীত্বের বন্ধনেই আবদ্ধ থাকবে। না তুমি তাকে তালাক দেবে যে, সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে, না তুমি তার সে হক আদায় করবে যে হক প্রত্যেক স্ত্রীর তার স্বামীর উপর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “যার দু’টি স্ত্রী রয়েছে, কিন্তু একজনের দিকেই সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়েছে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার শরীরের অর্ধাংশ গোশ্ত খসে পড়বে।” (মুসনাদ-ই-আহমদ ইত্যাদি) ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি মারফত পস্তায় হাদ্দামের হাদীস ছাড়া জানা যায় না।

এরপর আল্লাহ তা’আলা বলেন-তোমরা যদি তোমাদের কার্যের সংশোধন করে নাও এবং যতদূর তোমাদের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় ও সমতা রক্ষা কর ও সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চল তবে যদি কোন সময় কারও দিকে কিছু আসঙ্গ হয়েই পড়, সেটা তিনি ক্ষমা করে দেবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা’আলা তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, যদি স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়েই যায় তবে আল্লাহ তা’আলা একজনকে অপরজন হতে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন। স্বামীকে তিনি এ স্ত্রী অপেক্ষা ভাল স্ত্রী দান করবেন এবং স্ত্রীকেও তিনি এ স্বামী অপেক্ষা ভাল স্বামী দান করবেন।

আল্লাহর অনুগ্রহ বড়ই প্রশংসন্ত, তিনি খুবই অনুগ্রহশীল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানময়ও বটে। তাঁর সমস্ত কাজ এবং সমস্ত শরীয়ত পূর্ণ জ্ঞান ও নেপুণ্যে ভরপুর।

### ১৩১। নভোমগুলে যা কিছু রয়েছে

ও ভূমগুলে যা কিছু রয়েছে তা  
আল্লাহরই জন্যে; এবং  
নিচয়ই তোমাদের পূর্বে  
যাদেরকে গ্রহ প্রদত্ত  
হয়েছিল- আমি তাদেরকে ও  
তোমাদেরকে চরম আদেশ  
করেছিলাম যে, তোমরা  
আল্লাহকে ভয় কর, এবং যদি  
অবিশ্বাস কর তবে নিচয়ই

۱۳۱- وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّنَّا  
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
وَإِيمَانَهُمْ بِمَا رَأَيُوكُمْ  
تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي

নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে ও  
ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে তা  
আল্লাহরই; এবং আল্লাহ মহা  
সম্পদশালী, প্রশংসিত।

১৩২। এবং আকাশসমূহে যা  
কিছু রয়েছে ও পৃথিবীতে যা  
কিছু আছে তা আল্লাহরই;  
এবং আল্লাহরই কার্য সম্পাদনে  
যথেষ্ট।

১৩৩। যদি তিনি ইচ্ছে করেন  
তবে হে লোক সকল!  
তোমাদেরকে বিগত করে  
অন্যদেরকে আনয়ন করবেন  
এবং আল্লাহ এর উপর  
শক্তিমান।

১৩৪। যে ইহলোকের প্রতিদান  
আকাঞ্চা করে তবে আল্লাহর  
নিকট ইহলোক ও পরলোকের  
প্রতিদান রয়েছে; এবং আল্লাহ  
শ্রবণকারী পরিদর্শক।

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর একমাত্র অধিকারী  
তিনিই। তিনি বলেন-যে নির্দেশাবলী তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা  
আল্লাহকে ভয় করবে, তাঁর একত্বে বিশ্বাস করবে, তাঁর ইবাদত করবে এবং  
তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না, এ নির্দেশাবলীই তোমাদের পূর্বে  
আহলে কিতাবকেও দেয়া হয়েছিল। আর যদি তোমরা অস্থীকার কর তবে তাঁর  
কি ক্ষতি করতে পারবে? তিনি তো একাই আকাশ ও পৃথিবীর মালিক। যেমন  
হ্যরত মুসা (আঃ) স্বীয় গোত্রের লোককে বলেছিলেনঃ যদি তোমরা ও সারা

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۝

۱۳۲ ۱۱ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا  
فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ  
وَكَيْلًا ۝

۱۳۳ -إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبُكُمْ أَيْهَا  
النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ  
اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ۝

۱۳۴ مَنْ كَانَ يُرِيدُ شَوَابَ  
الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ شَوَابٌ  
الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ وَكَانَ اللَّهُ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

(১৬)  
(১৭)

সূরাঃ নিসা ৪

জগতের লোক আল্লাহকে অস্বীকার কর তবুও তিনি তোমাদের হতে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী এবং প্রশংসার যোগ্য। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন-

فَكَفَرُوا وَتَوْلَوَا وَاسْتَغْفِنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

অর্থাৎ ‘তারা অস্বীকার করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, আল্লাহ তাদের হতে অমুখাপেক্ষী হয়েছিলেন, তিনি বড়ই অমুখাপেক্ষী এবং প্রশংসিত।’ (৬৪:১৬)

বলা হচ্ছে-তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিসের মালিক ও তিনি প্রত্যেকের সমস্ত কার্যের উপর সাক্ষী। কোন কিছুই তাঁর অজানা নেই। তিনি এ ক্ষমতাও রাখেন যে, তোমরা যদি তাঁর অবাধ্যাচরণ কর তবে তিনি তোমাদেরকে ধ্রংস করে তোমাদের স্থলে অন্য মাখলুক আনয়ন করবেন।

যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে-

وَإِن تَولُوا يَسْتَبِدُّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

অর্থাৎ ‘যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য সম্প্রদায়কে আনয়ন করবেন যারা তোমাদের মত হবে না।’ (৪:১৩৮) পূর্ব যুগের কোন একজন মনীষী বলেনঃ ‘তোমরা এ আয়াতটি সম্বন্ধে গবেষণা কর যে, পাপী বান্দারা আল্লাহ তা‘আলার নিকট কত তুচ্ছ?’

এ আয়াতে এটাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলার নিকট এ কাজ মোটেই কঠিন নয়! অতঃপর তিনি বলেন-হে ঐ ব্যক্তি! যার মনোবাসনা ও চেষ্টা একমাত্র দুনিয়ার জন্যে সে যেন জেনে নেয় যে, দুনিয়া ও আধ্যাতলের সমস্ত ঘঙ্গল আল্লাহ তা‘আলার অধিকারেই রয়েছে। সুতরাং যখন তুমি তাঁর নিকট দুঁটোই যাঞ্চগ করবে তখন তিনি তোমাদেরকে দুঁটোই দান করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন এবং পরিত্পত্তি করবেন। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رِبِّنَا أَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ\*  
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رِبِّنَا أَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَنَا عَذَابَ  
النَّارِ\* اُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا

অর্থাৎ ‘মানুষের মধ্যে এমনও রয়েছে যে বলে- হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে আপনি দুনিয়া দান করুন, তাদের জন্য পরকালের কোনই অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে এমনও রয়েছে যে বলে- হে আমাদের প্রভু!

সূরাঃ নিসা ৪

আমাদেরকে দুনিয়ায় মঙ্গল দান করুন এবং পরকালেও মঙ্গল দান করুন এবং আমাদেরকে জাহানামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। এদের জন্যে ঐ অংশ রয়েছে যা তারা অর্জন করেছে।' (২৪: ২০০-২০২) আর এক আয়াতে আছে-

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَثًا لَاخِرَةٍ نِزَدَ لَهُ فِي حَرْثِهِ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি পরকালের ক্ষেত্রের আকাঞ্চ্ছা করে আমি তার ক্ষেত্র বৃক্ষ করে দেবো।' (৪২: ২০) অন্য স্থানে রয়েছে-

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نَرِيدُ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি দুনিয়া যাঞ্চ্ছা করে, তখন আমি যাকে চাই ও যত চাই দুনিয়ায় প্রদান করে থাকি।' (১৭: ১৮)

ইমাম ইবনে জারীর (রহঃ)-এ আয়াতের ভাবার্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, মুনাফিকরা দুনিয়া অনুসন্ধানে ঈমান কবূল করেছিল, তারা দুনিয়া পেয়ে যায় বটে, অর্থাৎ মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধলক্ষ মালে অংশীদার হয়ে যায়, কিন্তু পরকালে তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট যা তৈরী রয়েছে তা সেখানে তারা পেয়ে যাবে। অর্থাৎ জাহানামের অগ্নি ও তথাকার বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। সুতরাং উক্ত ইমাম সাহেবের মতে এ আয়াতটি **مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرَبَّنَتْهَا** (১১: ১৫) -এ আয়াতটির মতই। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ আয়াতের অর্থ তো বাহ্যতঃ এটাই, কিন্তু প্রথম আয়াতটিকেও এ অর্থে নেয়ার ব্যাপারে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। কেননা, এ আয়াতের শব্দগুলো তো স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, দুনিয়া ও আধিরাতের মঙ্গল দান আল্লাহর হাতেই রয়েছে, কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন তার জীবনটা একটি জিনিসের অনুসন্ধানেই শেষ করে না দেয়। বরং সে যেন দুঁটো জিনিসই লাভ করার জন্যে সচেষ্ট হয়।

বলা হচ্ছে-যে তোমাদেরকে দুনিয়া দিচ্ছেন, আধিরাতের অধিকারীও তিনিই। এটা বড়ই কাপুরুষতার পরিচয় যে, তোমরা তোমাদের চক্ষু বন্ধ করে নেবে এবং অধিক প্রদানকারীর নিকট অল্প যাঞ্চ্ছা করবে। না, না বরং তোমরা ইহকাল ও পরকালের বড় বড় কাজ ও উভয় উদ্দেশ্য লাভের চেষ্টা কর। স্বীয় লক্ষ্যস্থল শুধু দুনিয়াকে বানিয়ে নিও না, বরং উচ্চাকাঞ্চ্ছার দ্বারা দৃষ্টি প্রসারিত করতঃ উভয় জগতে শাস্তি লাভের চেষ্টা কর। মনে রেখ যে, উভয় জগতেরই মালিক তিনিই। প্রত্যেক লাভ ও ক্ষতি তাঁরই হাতে রয়েছে। এমন কেউ নেই

যে, তাঁর অংশীদার হতে পারে কিংবা তাঁর কার্যে হস্তক্ষেপ করতে পারে। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য তিনিই বন্টন করেছেন। ধন ভাণ্ডারের চাবিগুলো তিনি স্বীয় হস্তে রেখেছেন। তিনি প্রত্যেক হকদারকেই চেনেন এবং যে যার হকদার তিনি তাকে তাই পৌছিয়ে থাকেন। তোমাদের তো এটা চিন্তা করা উচিত যে, যিন্মি তোমাদেরকে দেখবার শুনবার ক্ষমতা দান করেছেন, তাঁর দর্শন ও শ্রবণ কেমন হতে পারে।

১৩৫। হে মুমিনগণ! তোমরা

আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য  
দানকারী, সুবিচার প্রতিষ্ঠাতা  
হও- এবং যদিও এটা  
তোমাদের নিজের অধিবা  
পিতা-মাতা ও আজীয়-  
স্বজনের প্রতিকূল হয়, যদি সে  
সম্পদশালী বা দরিদ্র হয়,  
তবে আল্লাহই তাদের জন্যে  
যথেষ্ট; অতএব, সুবিচারে স্বীয়  
প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না,  
এবং যদি তোমরা বর্ণনায়  
বক্রতা অবলম্বন কর বা  
পশ্চাত্পদ হও, তবে নিচয়ই  
আল্লাহ তা'আলা তোমাদের  
সমস্ত কর্মের পূর্ণ সংবাদ  
রাখেন।

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন ন্যায়ের উপর  
দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সেটা থেকে যেন এক ইঞ্চিৎ পরিমাণও এদিক ওদিক  
সরে না পড়ে। একুশ যেন না হয় যে তারা কারও ভয়ে, কোন লোভে, কারও  
তোষামোদে, কারও প্রতি দয়া দেখিয়ে এবং কারও সুপারিশে ইনসাফকে ছেড়ে  
দেয়। তারা সশ্মিলিতভাবে যেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করে। এ ব্যাপারে যেন তারা  
একে অপরের সহযোগিতা করতঃ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে ন্যায় বিচার  
কায়েম করে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে- **وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ**

**- ১৩৫ -**  
يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوا  
قُوْمٰيْنِ بِالْقِسْطِ شَهَادَةَ لِلَّهِ  
وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ  
وَالاَقْرَبِيْنِ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ  
فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا  
تَتَبَعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ  
تَلَوُا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

অর্থাৎ ‘আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমরা সাক্ষ্য প্রদান কর’। (৬৫ঃ ২) সাক্ষ্য আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হলেই তা হবে সম্পূর্ণ সঠিক, ন্যায় ভিত্তিক ও সত্য। তাতে থাকবে না কোন পরিবর্তন ও গোপন করার প্রবণতা। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘**وَلُوْلَى انفُسِكُمْ** অর্থাৎ তোমরা স্পষ্ট ও সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর যদিও তা তোমাদের নিজেদের প্রতিকূল হয়। তোমরা সত্য কথা বলা হতে বিরত হয়ো না এবং বিশ্বাস রেখো যে, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় অনুগত দাসদের মুক্তির বহু উপায় বের করে থাকেন। তোমাদের মুক্তি যে মিথ্যা সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করে এমন কোন কথা নয়।

তারপর বলা হচ্ছে— **أَوَالْوَالِدَيْنِ وَالآقْرَبَيْنِ**— অর্থাৎ যদিও সত্য সাক্ষ্য পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে হয় তথাপি তোমরা সত্য সাক্ষ্য প্রদান হতে হাত মুখ ফিরিয়ে নিও না। কেননা, সত্য প্রত্যেকের উপর বিচারক। সাক্ষ্য প্রদানের সময় ধনীর প্রতি কোন লক্ষ্য রেখো না বা গরীবের উপরও দয়া প্রদর্শন করো না। তাদের মঙ্গলের বিবেচনা তোমাদের অপেক্ষা তাঁরই বেশী রয়েছে। তোমরা সর্বাবস্থায় সত্য সাক্ষ্যই প্রদান কর। চিন্তা করো, কারও ক্ষতি করতে গিয়ে নিজেরই ক্ষতি সাধন করো না, প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কারও প্রতি শক্রতা করতঃ ন্যায় ও সাম্য হাত ছাড়া করো না। সদা-সর্বদা ন্যায়ের উপর অটল থাক। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেনঃ

**وَلَا يَجِرْ مِنْكُمْ شَنَانٌ قَوْمٌ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى**

অর্থাৎ “কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শক্রতা যেন তোমাদেরকে অন্যায় করতে উভেজিত না করে, তোমরা সুবিচার করতে থাক, এটাই হচ্ছে মুক্তাকী হওয়ার খুবই নিকটবর্তী।” (৫: ৮)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে রাওয়াহা (রাঃ)-কে যখন খাইবারবাসীদের ক্ষেত্র ও শস্য পরিমাপের জন্যে প্রেরণ করেন তখন খাইবারবাসী তাঁকে এ জন্যে ঘৃষ প্রদান করতে চায় যে, তিনি যেন পরিমাণ কম বলেন। তখন তিনি তাদেরকে বলেনঃ “তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহর শপথ! সমস্ত মাখলুকের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়, পক্ষান্তরে তোমরা আমার নিকট কুকুর ও শূকর হতেও জঘন্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রেমে পড়ে বা তোমাদের শক্রতাকে সামনে রেখে আমি যে সুবিচার হতে সরে পড়বো ও তোমাদের প্রতি অন্যায় করবো,

এটা সম্ভব নয়।” একথা শুনে তারা বলে, “এর দ্বারাই তো আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।” এ পূর্ণ হাদীসটি সূরা-ই-মায়েদার তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন-তোমরা যদি সাক্ষ্য পরিবর্তন আনয়ন কর, মিথ্যা কথা দ্বারা কার্য সাধন কর, প্রকৃত ঘটনার বিপরীত সাক্ষ্য দান কর, জিহ্বা বাঁকা করে পেঁচযুক্ত কথা বলে ঘটনা কম-বেশী কর, কিছু গোপন কর ও কিছু প্রকাশ কর তবে জেনে রেখো যে সর্বজ্ঞ মহাবিচারক আল্লাহ তা'আলার সামনে কোন কৌশলে কাজ দেবে না। সেখানে গিয়ে এর প্রতিদান পাবে এবং শাস্তি ভোগ করবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘোষণা করেনঃ ‘সর্বোত্তম সাক্ষী হচ্ছে এ ব্যক্তি যে জিজ্ঞাসার পূর্বেই সত্য সাক্ষ্য প্রদান করে।’

### ১৩৬। হে মুমিনগণ! তোমরা

বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর  
প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি  
এবং এ কিতাবের প্রতি যা  
তিনি তাঁর রাসূলের উপর  
অবতীর্ণ করেছেন এবং এই  
কিতাবের প্রতি যা পূর্বে  
অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং যে  
কেউ আল্লাহ, তদীয়  
ফেরেশতাসমূহ, তাঁর  
কিতাবসমূহ তাঁর রাসূলগণ  
এবং পরকাল সম্বন্ধে অবিশ্বাস  
করে, তবে নিশ্চয়ই সে সুদূর  
বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে।

মুমিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ঈমানের মধ্যে পূর্ণরূপে  
প্রবেশ করে। সমস্ত আদেশ ও নিষেধ, সমস্ত শরীয়ত এবং ঈমানের সমুদয়  
শাখাকে যেন মেনে নেয়। এতে তাহসীলে হাসিল নেই, বরং রয়েছে তাকমীলে  
কামেল। অর্থাৎ যদি তারা ঈমান এনে থাকে তবে তার উপরেই যেন প্রতিষ্ঠিত  
থাকে। যদি তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে তবে তিনি তাদেরকে

١٣٦ - يَا يَهُا الَّذِينَ آمَنُوا  
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِي  
نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ  
الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ  
يَكْفِرُ بِاللَّهِ وَمَلِكِتِهِ وَكِتَبِهِ  
وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ  
ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

আরও যত কিছুর উপর বিশ্বাস রাখতে বলেছেন ঐ সব কিছুর উপর যেন বিশ্বাস রাখে। প্রত্যেক মুসলমানের **الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ** “আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন”-এ প্রার্থনার ভাবার্থ এটাই। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি সরল সঠিক পথে চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, ওর উপরেই আমাদেরকে অটল রাখুন এবং আমাদের হিদায়াতকে দিনের পর দিন বৃদ্ধি করতে থাকুন। অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে স্বীয় সত্ত্বার উপর এবং স্বীয় রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

بِإِيمَانٍ مِّنَ الَّذِينَ أَمْنَى اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمْنُوا بِرَسُولِهِ

অর্থাৎ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।’ (৫৭: ২৮)

এ কিতাবের ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন এবং **وَالْكِتَابُ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ** এ কিতাবের ভাবার্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী নবীদের উপর অবতারিত কিতাবসমূহ। কুরআন কারীমের জন্য ‘নায়্যালা’ এবং অন্যান্য কিতাবের জন্যে ‘আন্যালা’ ক্রিয়া ব্যবহার করার কারণ এই যে, কুরআন কারীম মাঝে মাঝে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য কিতাবসমূহ সমস্তই একই সাথে অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-যে কেউ আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলগণকে এবং পরকালকে অস্বীকার করেছে সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ হিদায়াতের পথ হতে সরে বহু দূরে গিয়ে পড়েছে। সুতরাং তাদের সুপথ প্রাপ্তির আশা সুদূর পরাহত।

১৩৭। নিচ্যই যারা বিশ্বাস করে

তৎপর অবিশ্বাসী হয়, পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন করে অবিশ্বাস করে, অনন্তর অবিশ্বাসে পরিবর্ধিত হয়, তবে আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না।

- ১৩৭ -  
إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَى ثُمَّ كَفَرُوا  
وَإِنَّمَا دُرْدِنَ وَمَدْرِدَ وَ  
ثُمَّ أَمْنَوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا  
كُفْرًا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيغْفِرُ لَهُمْ  
وَلَا لِيَهْدِيهِمْ سِبِّلًا

১৩৮। কপটদেরকে সুসংবাদ দাও  
যে, তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক  
শাস্তি রয়েছে।

١٣٨ - بِشِرِ الْمُنْفِقِينَ بَيْان لَهُمْ  
عَذَابًا أَلِيمًا

১৩৯। যারা মুমিনদেরকে  
পরিত্যাগ করে কাফিরদের  
বঙ্গুরপে গ্রহণ করে তারা কি  
তাদের নিকট সম্মান  
অনুসঙ্গান করে? কিন্তু  
যাবতীয় সম্মানই আল্লাহর।

١٣٩ - إِلَّاَذِينَ يَتَخَذُونَ الْكُفَّارِينَ  
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ  
أَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ  
الْعِزَّةَ لِلَّهِ جِمِيعًا

১৪০। এবং নিচয়ই তিনি  
তোমাদের প্রস্তুত মধ্যে অবতারণ  
করেছেন যে, যখন তোমরা  
আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি  
অবিশ্বাস করতে এবং তার  
প্রতি উপহাস করতে শ্রবণ  
কর, তখন তাদের সাথে  
উপবেশন করো না—যে পর্যন্ত  
না তারা অন্য কথার  
আলোচনা করে, অন্যথা  
তোমরাও তাদের সদৃশ হয়ে  
যাবে, নিচয়ই আল্লাহ সে  
সমস্ত মুনাফিক ও  
কাফিরদেরকে জাহানামে  
একত্রিত করবেন।

١٤٠ - وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي  
الْكِتَابِ أَنِّإِذَا سَمِعْتُمْ أَيْتَ  
اللَّهِ يُكَفِّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزِئُ بِهَا  
فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى  
يَخْوُضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ  
إِنَّكُمْ إِذَا مُّسْتَهْزِئُمُمْ إِنَّ اللَّهَ  
جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكُفَّارِينَ  
فِي جَهَنَّمَ جِمِيعًا

ইরশাদ হচ্ছে—‘যে ঈমান আনয়নের পর পুনরায় ধর্মত্যাগী হয়ে যায়, অতঃপর  
আবার মুমিন হয়ে পুনরায় কাফির হয়ে যায়, তারপর কুফরীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত  
থাকে এবং ঐ অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে, তার প্রার্থনা গৃহীত হবে না, তার

ক্ষমার ও মুক্তির কোন আশা নেই এবং তাকে আল্লাহ তা'আলা সরল সঠিক' পথে আনয়ন করবেন না।' হ্যরত আলী (রাঃ) এ আয়াতটি পাঠ করে বলতেনঃ 'ধর্মত্যাগীকে তিনবার বলা হবে- 'তাওবা করে নাও?' এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-এ মুনাফিকদের অবস্থা এই যে, শেষে তাদের অন্তরে মোহর লেগে যায়। তাই, তারা মুনিমদের ছেড়ে কাফিরদেকে বন্ধুরপে গ্রহণ করে। এদিকে বাহ্যতঃ মুমিনদের সাথে মিলেমিশে থাকে আর ওদিকে কাফিরদের নিকট বসে তাদের সামনে মুমিনদের সম্পর্কে উপহাসমূলক কথা বলে বেশ আনন্দ উপভোগ করে। তাদেরকে বলে-'আমরা মুসলমানদেরকে বোকা বানিয়ে দিয়েছি। আসলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি।'

সুতরাঃ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাদের সামনে পেশ করতঃ তাতে তাদের অকৃতকার্যতার কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন-'তোমরা চাও যে, কাফিরদের নিকট যেন তোমাদের সম্মান লাভ হয়। কিন্তু তোমাদের ধারণা মোটেই ঠিক নয়। তারা তোমাদের সাথে প্রতারণা করছে। জেনে রেখো যে, সম্মানের মালিক হচ্ছেন এক এবং অংশীবিহীন আল্লাহ তা'আলা। তিনি যাকে ইচ্ছে করেন, সম্মান দান করেন।' যেমন তিনি অন্য আয়াতে বলেনঃ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جُمِيعًا

অর্থাৎ 'যে সম্মান যাঞ্ছা করে তবে সমস্ত সম্মান আল্লাহরই জন্যে।' (৩৫:১০) আর একটি আয়াতে রয়েছে-

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِكُنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ -

অর্থাৎ 'সম্মান আল্লাহর জন্যে, তাঁর রাসূলের জন্যে এবং মুমিনদের জন্যে, কিন্তু মুনাফিকরা জানে না।' (৬৩: ৮) ভাবার্থ এই যে, হে মুনাফিকের দল! যদি তোমরা প্রকৃত সম্মান পেতে চাও তবে আল্লাহর সৎ বান্দাদের সাথে মিলিত হও, তাঁর ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড় এবং তাঁর নিকট সম্মান যাঞ্ছা কর তাহলেই তিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান দান করবেন।

মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত আবু রাইহানা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি অহংকারের বশবর্তী হয়ে স্বীয় মর্যাদা প্রকাশের উদ্দেশ্যে স্বীয় বংশের সংযোগ তার কাফির বাপ-দাদার সঙ্গে জুড়ে দেয় এবং নবম পর্যন্ত পৌছে যায়, সেও তাদের সঙ্গে দশম জাহান্নামী।' এরপর আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে বলেন-'আমি যখন

তোমাদেরকে নিষেধ করেছি যে, যে মজলিসে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং ওগুলোকে উপহাস করে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, তোমরা সে মজলিসে বসো না। এরপরেও তোমরা ঐ রূপ মজলিসে অংশগ্রহণ কর তবে তোমাদেরকেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করা হবে এবং তাদের পাপে তোমরাও অংশীদার হবে।' যেমন একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যে দন্তরখানায় মদ্যপান করা হচ্ছে তার উপর কোন এমন এক ব্যক্তির উপবেশন করা উচিত নয়, যে আল্লাহর উপর ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করে থাকে।' এ আয়াতে যে নিষেধাজ্ঞার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে মুক্তায় অবতীর্ণ সূরা-ই-আনআমের এ আয়াতটি-

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخْوُضُونَ فِي أَيْتِنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ

অর্থাৎ 'যখন তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা আমার নির্দেশাবলী সম্বন্ধে বিতর্ক করছে, তখন তুমি তাদের দিক হতে বিমুখ হও।' (৬ঃ ৬৮)

হ্যরত মুকাতিল ইবনে হিব্রান (রঃ) বলেনঃ এ আয়াতের  
انكِمْ إِذَا مِثْلَهُمْ  
-এ ঘোষণাটি আল্লাহ তা'আলার মুনাফিকদের উপর দিক হতে রহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ 'মুনাফিকদের উপর তাদের (মুনাফিকদের) হিসেবের কোন বোঝা নেই, কিন্তু রয়েছে শুধু উপদেশ যে হয় তো তারা বেঁচে যাবে।' (৬ঃ ৬৯)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন-'আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরকে জাহানামে একত্রিত করবেন।' অর্থাৎ যেমন এ মুনাফিকেরা এখানে ঐ কাফিরদের কুফরীতে অংশীদার রয়েছে, তেমনই কিয়ামতের দিন চিরস্থায়ী ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে, কয়েদখানার লৌহ শৃঙ্খলে, গরম পানি ও রক্ত-পুঁজ পানে তাদের সঙ্গেই থাকবে এবং তাদের সকলকেই একই সাথে চিরস্থায়ী শাস্তির ঘোষণা শুনিয়ে দেয়া হবে।

### ১৪১। যারা তোমাদের সম্বন্ধে

প্রতীক্ষা করছে; এবং যদি

তোমরা আল্লাহ হতে জয়লাভ

কর তবে তারা বলে- আমরা

কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম  
না? এবং যদি ওটা

-الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ

كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنْ اللَّهِ قَالُوا

الَّمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ

অবিশ্বাসীদের ভাগ্যে ঘটে  
তবে বলে- আমরা কি  
তোমাদের নেতৃত্ব করিনি এবং  
বিশ্বাসীগণ হতে তোমাদেরকে  
রক্ষা করিনি? অনন্তর আল্লাহ  
উখান দিবসে তোমাদের মধ্যে  
বিচার করবেন; এবং কখনও  
আল্লাহ মুমিনদের প্রতিপক্ষে  
কাফিররেদকে বিজয়ী করবেন  
না।

لِّكُفَّارِينَ نَصِيبٌ قَالُوا إِنَّمَا  
نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ  
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ بِحُكْمِ  
بَيْنِكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ  
لِلْكُفَّارِ إِلَيْهِمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
سَبِيلًا ۝

এখানে মুনাফিকদের মন্দ অন্তরের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা সব সময়  
মুসলমানদের ধ্রংস ও অবনতির অনুসন্ধানে লেগে থাকে। কোন জিহাদে  
মুসলমানদের বিজয় লাভ ঘটলে তারা নিজেদেরকে মুসলমানদের বন্ধুরূপে  
পরিচিত করার উদ্দেশ্যে তাদের নিকট এসে বলেঃ ‘আমরা কি তোমাদের সঙ্গে  
ছিলাম না?’ পক্ষান্তরে যদি কোন কোন সময় মুসলমানদেরকে পরীক্ষা করার  
উদ্দেশ্যে তাদের উপর আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদেরকে জয়যুক্ত করেন তবে তারা  
তাদের দিকে দ্রুত বেগে ধাবিত হয়ে বলেঃ ‘আমরা তো গোপনে তোমাদেরকেই  
সাহায্য করেছি এবং সর্বদা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেছি। এটা ছিল  
আমাদের একটা কৌশল যার বলে আজ তোমরা বিজয় লাভ করলে।’ এটা  
হচ্ছে তাদের কাজ যে, তারা দুঁনোকায় পা দিয়ে থাকে। যদিও তারা তাদের এ  
কৌশলকে নিজেদের পক্ষে গৌরবের কারণ মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা  
তাদের বেঙ্গমানির পরিচায়ক। কাঁচা রং কয়দিন থাকবে? গাজরের বাঁশী কয়দিন  
বাজবে? কাগজের নৌকাই বা কয়দিন চলবে? এমনই সময় আসছে যে, তারা  
তাদের কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত হবে। স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে তারা আফসোস  
করবে। স্বীয় লজ্জাজনক কাজের কারণে কেঁদে কেঁদে চক্ষু ভাসাবে। তারা  
আল্লাহ তা‘আলার সত্য মীমাংসা মেনে নিতে বাধ্য হবে এবং সমস্ত মঙ্গল হতে  
নিরাশ হয়ে যাবে। সেদিন তাদের ভুল ভেঙ্গে যাবে। তাদের গোপনীয়তা সেদিন  
প্রকাশ পেয়ে যাবে। সমস্ত রহস্য সেদিন উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে। তাদের জঘন্য  
কাজ অত্যন্ত ভয়াবহ আকারে সামনে এসে হায়ির হবে এবং তারা আল্লাহ  
তা‘আলার ভীষণ শাস্তির শিকারে পরিণত হয়ে যাবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-'আল্লাহ তা'আলা কখনও মুমিনদের বিপক্ষে কাফিরদেরকে বিজয়ী করবেন না।' এক ব্যক্তি হয়রত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি এ বাক্যটিকে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে মিলিয়ে পাঠ করেন। ভাবার্থ ছিল এই যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর কাফিরদেরকে বিজয়ী করবেন না। এও বর্ণিত আছে যে, سَبِيلُ شَدِّهِ ভাবার্থ হচ্ছে প্রমাণ। কিন্তু তথাপি এর প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য হওয়াতেও কোন অসুবিধে নেই। অর্থাৎ এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা এখন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত এমন কোন সময় আনয়ন করবেন যখন কাফিররা মুসলমানদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেয়ার মত শক্তি অর্জন করতে পারবে। পৃথিবীতে কোন সময় হয়তো তারা বিজয়ী হয়ে যায় সেটা অন্য কথা। কিন্তু পরিণামে জয় মুসলমানদেরই দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّا لَنَنْصُرُ رَسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে এবং মুমিনগণকে ইহলৌকিক জগতে অবশ্যই সাহায্য করবো।' (৪০: ৫১) এ অর্থের মধ্যে একটা সৌন্দর্য এই রয়েছে যে, মুনাফিকরা ঐ সময়ে আগমনের জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল যে সময়ে তারা মুসলমানদের ধ্বংস কামনা করছিল। তাতে তাদেরকে নিরাশ করে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে তিনি মুসলমানদের উপর এমনভাবে বিজয়ী করবেন না, যার ফলে তারা আনন্দে আস্থারা হয়ে যাবে। তারা যে ভয়ে মুসলমানদের সাথে প্রকাশ্যভাবে ঘৰ্ষণে পারছিল না সেই ভয়কেও তিনি দূর করে দিয়ে বলেন যে, মুসলমানেরা যে ভৃ-পৃষ্ঠ হতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এটা যেন তারা মনে না করে। এ ভাবার্থকেই তিনি فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ أَخْ (৫: ৫২)-এ আয়াতে পরিষ্কার করেছেন।

উপরোক্ত আয়াত-ই-কারীমা দ্বারা উলামা-ই-কিরাম যুক্তি নিয়েছেন যে, মুসলমান দাসকে কাফিরদের হাতে বিক্রী করা বৈধ নয়। কেননা, ঐ অবস্থায় কাফিরদেকে মুসলমানের উপর বিজয়ী করে দেয়া হয় এবং এতে মুসলমানের হীনতা প্রকাশ পায়। যাঁরা একে জায়েয় রেখেছেন তাঁরা তাকে নির্দেশ দেন যে, সে যেন তৎক্ষণাত তার উপর হতে স্বীয় অধিকার নষ্ট করে দেয়।

১৪২। নিক্ষয়ই মুনাফিকরা  
আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে  
এবং তিনিও তাদেকে ঐ  
প্রতারণা প্রত্যর্পণ করছেন;  
এবং যখন তারা নামাযের  
জন্যে দণ্ডয়মান হয় তখন  
লোকদেরকে দেখাবার জন্যে  
আলস্যভরে দণ্ডয়মান হয়ে  
থাকে এবং আল্লাহকে খুব  
কমই স্মরণ করে থাকে।

১৪৩। যারা এর মধ্যে  
সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান  
রয়েছে তারা এদিকেও নয়  
ওদিকেও নয়; এবং আল্লাহ  
যাকে পথভ্রান্ত করেছেন  
বস্তুতঃ তুমি তার জন্যে  
কোনই পথ পাবে না।

١٤٢ - إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يَخْدِعُونَ  
الله وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا  
إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ  
وَيَرَوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ  
الله إِلَّا قَلِيلًاٰ

١٤٣ - مَذَبِّحُينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا  
إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ  
وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَهُ  
سَبِيلًاٰ

সূরা-ই-বাকারার প্রথমেও (২৪: ৯) -এ আয়াতটির  
তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। এখানেও বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এ নির্বোধ মুনাফিকরা  
আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতারণা করতে রয়েছে, অথচ তিনি তাদের অন্তরের  
সমস্ত কথা সম্যক অবগত রয়েছেন। স্বল্প বুদ্ধির কারণে এ মুনাফিকরা মনে করে  
নিয়েছে যে, তাদের কপটতা যেমন দুনিয়ায় চলছে এবং মুসলমানদের মধ্যে  
চলছে, তদ্দুপ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সমীপেও চলবে। যেমন  
কুরআন পাকে রয়েছে-কিয়ামতের দিনেও এরা আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে শপথ  
করে বলবে যে, তারা সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেমন আজ তারা  
তোমাদের সামনে শপথ করে বলছে। কিন্তু সেই সর্বজ্ঞতা আল্লাহর সামনে  
তাদের এ বাজে শপথে কোনই কাজ দেবে না। আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে  
প্রতারণা প্রত্যর্পণকারী। তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। তাই তারা আজ  
বেড়ে চলেছে ও ফুলে উঠেছে এবং এটাকে তাদের জন্যে মঙ্গলজনক মনে  
করেছে।

কিয়ামতের দিনেও তাদের অবস্থা এমনই হবে। তারা মুসলমানদের আলোকের উপর নির্ভর করে থাকবে। মুসলমানেরা সামনে এগিয়ে যাবে। এ মুনাফিকরা তখন তাদেরকে ডাক দিয়ে বলবে-'তোমরা থাম, আমরা তোমাদের আলোকের সাহায্যে চলতে থাকি।' মুসলমানেরা তখন উত্তর দেবে-'তোমরা পিছনে ফিরে যাও এবং আলো অনুসন্ধান কর।' তারা পিছনে ফিরবে এমন সময় তাদের মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে। মুসলমানদের দিকে থাকবে করুণা এবং তাদের দিকে থাকবে দুঃখ ও বেদন।

হাদীস শরীফে রয়েছে, যে ব্যক্তি শুনাবে আল্লাহ তা'আলা সেটা শুনিয়ে দেবেন এবং যে রিয়াকারী করবে আল্লাহ তা'আলা সেটা দেখিয়ে দেবেন। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, ঐ মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোকও হবে যাদের সম্পর্কে বাহ্যতঃ লোকের সামনে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেবেন। ফেরেশতাগণ তখন তাদেরকে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিষ্কেপ করবেন। আল্লাহ পাক আমাদেকে ওটা হতে রক্ষা করুন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-'যখন তারা নামাযের জন্যে দণ্ডযামান হয় তখন তারা শৈথিল্যের সাথে দণ্ডযামান হয়।' অর্থাৎ নামাযের মত উত্তম ইবাদত তারা একাগ্রচিত্তে ও আন্তরিকতার সাথে আদায় করে না। কেননা সত্য নিয়ত, উত্তম আমল, প্রকৃত ঈমান এবং সত্য বিশ্বাস তাদের মধ্যে মোটেই নেই। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) পরিশ্রান্ত দেহে ছট্টফট করা অবস্থায় নামায পড়াকে মাকরহ মনে করতেন এবং বলতেনঃ 'মানুষের উচিত যে, সে যেন পূর্ণ আগ্রহ ও একাগ্রতার সাথে নামাযে দণ্ডযামান হয় এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তার কথার উপর আল্লাহর কান রয়েছে। তিনি তার আকাঞ্চ্ছা পুরো করার জন্যে সদা প্রস্তুত রয়েছেন। এ তো হলো মুনাফিকদের বাহ্যিক অবস্থা যে তারা পরিশ্রান্ত দেহে ও সংকীর্ণ অন্তরে বেগার পরিশোধের নামাযের জন্যে আগমন করে। আর তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই যে, আন্তরিকতা হতে বহু দূরে রয়েছে। তারা প্রত্বুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। তারা শুধু মানুষের মধ্যে নামাযী রূপে পরিচিত হবার জন্যে এবং নিজেদের ঈমান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে নামায পড়ে থাকে। তাহলে এ অস্ত্রিচিত্ত মানুষেরা নামাযে কি পাবে? এ কারণেই তারা ঐ নামাযে অনুপস্থিত থাকে যে নামাযে মানুষ একে অপরকে দেখতে কম পায়। যেমন ইশা ও ফজরের নামায।'

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘মুনাফিকদের উপর সবচেয়ে ভারী নামায হচ্ছে ইশা ও ফজরের নামায। যদি তারা এ নামাযের ফয়েলতের কথা অন্তরে বিশ্বাস করতো তবে জানুর ভরে চলে হলেও অবশ্যই এ নামাযে হাযির হতো। কাজেই আমি তখন ইচ্ছে করি যে, তাকবীর বলিয়ে দিয়ে কাউকে ইমামতির স্থানে দাঁড় করতঃ নামায আরম্ভ করিয়ে দেই, অতঃপর আমি গিয়ে লোকদেরকে বলি যে তারা যেন জালানী কাষ্ঠ নিয়ে এসে ঐ লোকদের বাড়ীর চতুর্দিকে রেখে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং তাদের ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দেয় যারা জামাআতে হাজির হয় না।’ অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আল্লাহর শপথ! যদি তাদের একটি চর্বিযুক্ত অস্ত্র বা দু’টি উভয় (পশ্চাদির) খুর পাওয়ার আশা থাকতো তবে তারা দৌড়ে চলে আসতো। কিন্তু তাদের নিকট আখিরাতের এবং আল্লাহ প্রদত্ত পুণ্যের ওর সমানও মর্যাদা নেই। বাড়ীতে যেসব স্ত্রীলোক ও শিশু অবস্থান করে তাদের খেয়াল যদি আমার না থাকতো তবে অবশ্যই আমি তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিতাম।’

মুসনাদ-ই-আবি ইয়ালায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি লোকদের উপস্থিতির সময় তো নামাযকে সুন্দরভাবে থেমে থেমে আদায় করে কিন্তু যখন কেউ থাকে না তখন যেন-তেনভাবে পড়ে নেয়, সে ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় প্রভুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে।’

আল্লাহর তা’আলা বলেন-‘তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে।’ অর্থাৎ নামাযে তাদের মোটেই মন বসে না। তারা যে কথা বলে তা নিজেই বুঝে না বরং তারা উদাসীনভাবে নামায পড়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ওটা মুনাফিকের নামায যে ব্যক্তি বসে বসে সূর্যের দিকে তাকাতে রয়েছে, অবশেষে ওটা অন্তমিত হতে চলেছে এবং শয়তানের শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে হয়ে গেছে সে সময় সে উঠে পড়ে এবং তাড়াতাড়ি চার রাকআত নামায আদায় করে নেয় যার মধ্যে আল্লাহর যিকির নামেমাত্র করে থাকে।’ (সহীহ মুসলিম ইত্যাদি) এ মুনাফিক সদা স্তুতি ও হতত্ত্ব অবস্থায় কালাতিপাত করে। ঈমান ও কুফরীর মধ্যে তাদের মন অস্ত্রির থাকে। তারা না স্পষ্টভাবে মুসলমানদের সঙ্গী, না সম্পূর্ণরূপে কাফিরদের সাথী। কখনও ঈমানের জ্যোতি অন্তরে পরিস্কুট হয়ে উঠলে তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতে থাকে। আবার কখনও কুফরীর অন্ধকার তাদের উপর জয়যুক্ত হলে তারা ঈমান হতে দূরে সরে পড়ে। না তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের দিকে রয়েছে, না ইয়াহুদীদের পক্ষে রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘মুনাফিকের অবস্থা হচ্ছে দু’টি পালের মধ্যস্থিত ছাগলের অবস্থার ন্যায় যা ভ্যা-ভ্যা করতে করতে কখনও এ পালের দিকে দৌড় দেয় এবং কখনও ঐপালের দিকে দৌড় দেয়। সে এখনও স্থির সিন্ধান্তে পৌছতে পারেনি যে, এর পিছনে যাবে কি ওর পিছনে যাবে।’ একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এ অর্থের হাদীসটি হ্যরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রাঃ) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর উপস্থিতিতে শব্দের কিছু হেরফের করে বর্ণনা করলে তিনি নিজ কানে শুনা শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করতঃ বলেন যে, সেরূপ নয়, বরং প্রকৃত হাদীস হচ্ছে এরূপ।’ এতে হ্যরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রাঃ) অসন্তুষ্ট হন।

‘মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, মুমিন, কাফির এবং মুনাফিকের উপমা হচ্ছে এই তিনটি লোকের ন্যায় যারা একটি নদীর তীরে উপস্থিত হয়েছে। একজন তীরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, দ্বিতীয়জন নদী অতিক্রম করতঃ গন্তব্যস্থানে পৌছে গেছে এবং তৃতীয় ব্যক্তি নদীতে নেমে পড়েছে। যখন সে নদীর মধ্যস্থলে পৌছেছে তখন এ তীরের লোকটি তাকে ডাক দিয়ে বলছে- ‘ধ্রংস হতে কোথায় চলেছো এ তীরে ফিরে এসো।’ আবার এই তীরের লোকটি তাকে ডাক দিয়ে বলছে- ‘এ তীরে চলে এসো, মুক্তি পেয়ে যাবে এবং আমার মত গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারবে, অর্ধেক পথতো অতিক্রম করেই ফেলেছো।’ এখন সে কিংকর্তব্যবিমুক্ত হয়ে একবার এদিকে দেখে এবং একবার ওদিকে দেখে। এ দোদুল্যমান অবস্থায় সে রয়েছে এমন সময় একটি বিরাট তরঙ্গ এসে তাকে ভাসিয়ে নেয় এবং অবশেষে সে নদীতে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারিয়ে ফেলে। অতএব নদী অতিক্রমকারী হচ্ছে মুসলমান, তীরে দণ্ডয়মান ব্যক্তি হচ্ছে কাফির এবং ডুবে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, মুনাফিকের উপমা হচ্ছে এই ছাগলটির ন্যায় যে একটি সবুজ শ্যামল পাহাড়ের উপর গুটিকয়েক ছাগল দেখে তথায় আসে এবং শুঁকে চলে যায়। তারপরে আর একটি পাহাড়ের উপর উঠে এবং শুঁকে চলে আসে।

এরপর আল্লাহ তা’আলা বলেন-‘আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেছেন, তার পথ প্রদর্শক আর কে আছে?’ আল্লাহ তা’আলা মুনাফিকদেরকে তাদের জঘন্য কার্যের কারণে সঠিক পথ হতে ধাক্কা দিয়ে দূরে নিষ্কেপ করেছেন। এখন আর কেউ তাকে সঠিক পথের উপর আনতেও পারবে না এবং তার মুক্তির ব্যবস্থাও করতে পারবে না। আল্লাহ তা’আলার ইচ্ছের বিপরীত কাজ কেউ করতে পারবে না। তিনি সকলেরই শাসনকর্তা। তাঁর উপর কারও শাসন ক্ষমতা নেই।

১৪৪। হে মুমিনগণ! তোমরা  
মুমিনদেরকে ছেড়ে  
কাফিরদেরকে বক্ষুরূপে ঘৃণ  
করো না, তোমরা কি  
আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে  
স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?

١٤٤- يَا يَهُوَ اَلَّذِينَ امْنَوْا لَا  
تَخِذُوا الْكُفَّارِنَ اُولِيَاءَ مِنْ  
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اتَّرِيدُونَ اَنْ  
تَجْعَلُوْلِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا

১৪৫। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা  
জাহানামের নিম্নতম স্তরে  
অবস্থিত এবং তুমি কখনও  
তাদের জন্যে সাহায্যকারী  
পাবে না।

١٤٥- إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ  
الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَرْجِعَ  
لَهُمْ تَصِيرَانِ

১৪৬। কিন্তু যারা ক্ষমা প্রার্থনা  
করে ও সংশোধিত হয় এবং  
আল্লাহকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ  
করে ও আল্লাহর ধর্মে বিশুদ্ধ  
হয়, ফলতঃ তারাই মুমিনদের  
সঙ্গী এবং অচিরে আল্লাহ  
মুমিনদেরকে উত্তম প্রতিদান  
প্রদান করবেন।

١٤٦- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا  
وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا  
دِينَهُمْ لِلَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُؤْمِنِينَ وَسَعْوَدَ يُؤْتِ اللَّهُ  
الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

১৪৭। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও ও  
বিশ্বাস স্থাপন কর তবে  
আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি  
প্রদান করে কি করবেন? এবং  
আল্লাহ শুণগ্রাহী মহাজ্ঞানী।

١٤٧- مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ  
شَكَرْتُمْ وَامْسَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ  
شَاكِرًا عَلَيْمًا

কাফিরদের সাথে বক্ষুত্ত স্থাপন করতে, তাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা  
রাখতে, তাদের সাথে সর্বদা উঠাবসা করতে, মুসলমানদের গুপ্তকথা তাদের  
নিকট প্রকাশ করতে এবং তাদের সাথে গোপন সম্পর্ক বজায় রাখতে আল্লাহ  
তা'আলা মুসলমানদেরকে নিষেধ করছেন। অন্য আয়াতে আছে-

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارِ إِلَيْهِ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعُلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَقَرَّبُوا مِنْهُمْ تَقْرَبَةً وَيَعْلَمُ رَبُّكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ

অর্থাৎ 'মুমিনগণ' যেন মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে, আর যে ব্যক্তি এরূপ করে সে আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন মঙ্গলের অধিকারী নয়। হ্যাঁ, তবে যদি আত্মরক্ষার জন্যে বাহ্যিক ভালবাসা রাখ সেটা অন্য কথা এবং আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ হতে ভয় প্রদর্শন করছেন।' (৩: ২৮) অর্থাৎ তোমরা যদি তাঁর অবাধ্য হও তবে তোমাদের তাঁর হতে ভীত হওয়া উচিত। 'মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে' হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস রাওয়ানা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ কুরআন কারীমের মধ্যে যেখানেই এরূপ ইবাদতের মধ্যে **سُلْطَان** শব্দ রয়েছে তথায় তার ভাবার্থ হচ্ছে দলীল। অর্থাৎ তোমরা যদি মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে তোমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর তবে তোমাদের ঐ কাজ তোমাদের উপর ঐ বিষয়ের দলীল হয়ে যাবে যে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। পূর্বযুগীয় কয়েকজন মুফাসিসির এ আয়াতের এ তাফসীরই করেছেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের পরিণাম বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের কঠিন কুফরীর কারণে জাহান্নামের একেবারে নিম্নতরে প্রবেশ করবে। **‘دُرِّ** শব্দটি হচ্ছে **دُرِّ** শব্দের বিপরীত। জান্নাতের দরজা রয়েছে একটির উপর আরেকটি। পক্ষান্তরে জাহান্নামের 'দারক' রয়েছে একটির নীচে অপরটি। হ্যরত আবু উরাইরা (রাঃ) বলেন যে, মুনাফিকদেরকে আগনের বাঁকে পুরে জাহান্নামে নিষ্কেপ করা হবে এবং তারা ওর মধ্যে জুলতে পুড়তে থাকবে। হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এ বাক্সটি হবে শোহার, যাতে আগন দেয়া মাত্রাই আগন হয়ে যাবে এবং তার চার দিক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। কেউ এমন হবে না যে তাকে কোন প্রকারের সাহায্য করতে পারে বা তাকে জাহান্নাম হতে বের করতে পারে অথবা শাস্তি কিছু কম করাতে পারে। তবে হ্যাঁ, তাদের মধ্যে যারা তাওবা করবে, লজ্জিত হবে এবং ঐ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, অতঃপর সংশোধিত হয়ে যাবে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সৎকার্য সম্পাদন করবে, রিয়াকে আন্তরিকতার সাথে পরিহার করবে এবং আল্লাহ তা'আলার দৈনিকে দৃঢ়রূপে ধারণ করবে, তিনি তাদের তাওবা কবুল করবেন, তাদেরকে খাঁটি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং উভয় পুণ্যের

অধিকারী করবেন। মুসলিম-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘তোমরা তোমাদের দ্বীনকে খাঁটি কর তবে অল্প আমলই তোমাদের জন্যে যথেষ্ট হবে।’

এরপর ইরশাদ হচ্ছে—‘আল্লাহ তা‘আলা হচ্ছেন বেনিয়ায, তিনি বান্দাদেরকে শাস্তি দিতে চান না। হ্যাঁ, তবে যদি সে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে পাপ কার্য করতে থাকে তবে অবশ্যই শাস্তি প্রাপ্ত হবে।’ তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন—‘যদি তোমরা তোমাদের আমল সুন্দর করে নাও এবং আল্লাহইর উপর ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর উপর অন্তরের সাথে বিশ্বাস স্থাপন কর তবে কোন কারণ নেই যে, আল্লাহই তা‘আলা তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। তিনিতো ছোট ছোট পুণ্যের বেশ মর্যাদা দিয়ে থাকেন। যে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি তাকে সম্মান দিয়ে থাকেন। তিনি পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। কার আমল যে খাঁটি ও ধ্রহণযোগ্য তা তিনি ভালই জানেন। কার অন্তরে যে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে এবং কার অন্তর যে ঈমান শূন্য তিনি সেটাও জানেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন।’ (পঞ্চম পারা সমাপ্ত)

১৪৮। আল্লাহ কারো অত্যাচারিত

হওয়া ব্যতীত অধিয় বাক্য  
প্রকাশ করা ভালবাসেন না;  
এবং আল্লাহ শ্রবণকারী,  
মহাজ্ঞানী।

১৪৯। যদি তোমরা সৎকার্য  
প্রকাশ কর বা পোগন কর  
কিংবা অসম্বিষয় ক্ষমা কর,  
তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ  
ক্ষমাদানকারী, সর্বশক্তিমান।

— ১৪৮ —  
لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَنْحُورُ  
بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ  
مُّلْمِنٌ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

— ১৪৯ —  
إِنْ تَبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ  
أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا

হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, কোন মুসলিমানের জন্য বদ দু‘আ করা বৈধ নয়। তবে যার উপর অত্যাচার করা হবে সে অত্যাচারীর জন্যে বদ দু‘আ করতে পারে। কিন্তু সেও যদি ধৈর্যধারণ করে তবে ফয়লত তাতেই রয়েছে। সুনান-ই-আবি দাউদে রয়েছে যে, হ্যরত

আয়েশা (রাঃ)-এর কোন জিনিস ছুরি যায়। তখন তিনি চোরের জন্যে বদ দু'আ করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটা শুনে বলেনঃ ‘তার বোৰা হালকা করছো কেন?’ হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, তার জন্যে বদ দু'আ করা উচিত নয়, বরং নিম্নের দু'আটি পাঠ করা উচিতঃ

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِ وَأَسْتَرْجِ حَقِّي مِنْهُ

অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তার উপর সাহায্য করুন এবং তার নিকট হতে আমার প্রাপ্য বের করে দিন।’ এ মনীষী হতেই বর্ণিত আছে যে, অত্যাচারীর জন্যে বদ দু'আ করার অনুমতি যদিও অত্যাচারিত ব্যক্তির রয়েছে, কিন্তু সেটা যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়, সেদিকে তাকে লঙ্ঘ্য রাখতে হবে।

হ্যরত আবদুল করিম ইব্নে মালিক জায়ারী (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, যে ব্যক্তি গালি দেবে অর্থাৎ মন বলবে তাকে মন বলা যাবে, কিন্তু কেউ অপবাদ দিলে তাকে অপবাদ দেয়া যাবে না। অন্য একটি আয়াতে রয়েছেঃ

وَلَمَّا انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَوْلِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ

অর্থাৎ ‘যে অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারী হতে তার অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের উপর কোন জবাবদিহী নেই।’ (৪২ঃ ৪১) সুনান-ই-আবি দাউদে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘দু’জন গালিদাতা যা বলে ওর শাস্তি তার উপর রয়েছে যে প্রথমে গালি দিয়েছে যে পর্যন্ত না অত্যাচারিত ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে।’

হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ ‘যদি কোন ব্যক্তি কারও নিকট অতিথি হিসেবে আগমন করে এবং অতিথি সেবক তার আতিথেয়তার হক আদায় না করে তবে অতিথি সেবকের দুর্নাম করতে পারে যে পর্যন্ত না সে জিয়াফতের হক আদায় করে।’ সুনান-ই-আবি দাউদ, সুনান-ই-ইবনে মাজা প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আমাদেরকে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে থাকেন। কোন কোন সময় এমনও হয় যে, তথাকার লোক আমাদের মেহমানদারী করে না। এতে আপনার অভিমত কি?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁদেরকে বলেনঃ ‘যখন তোমরা কোন সম্প্রদায়ের নিকট গমন করবে তখন যদি তারা মেহমানের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে তোমরা তা কবূল করবে। আর যদি তারা তা না করে তবে তোমরা তাদের সাধ্য অনুপাতে তাদের নিকট হতে অতিথির উপযুক্ত প্রাপ্য আদায় করবে।’

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে মুসলমান কোন এক লোকের বাড়ীতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়, রাত্রি অতিবাহিত হয়ে যায় অথচ তারা তার আতিথের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, সে সময় প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য হবে ঐ ব্যক্তির মাল হতে ও ক্ষেত হতে ঐ রাত্রির মেহমানদারীর জিনিস আদায় করে দিয়ে অতিথিকে সাহায্য করা।’ অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘জিয়াফতের রাত্রি প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। যদি কোন মুসাফির সকাল পর্যন্ত বাস্তিত থাকে, তবে এটা ঐ মেজবানের দায়িত্বে কর্জ রূপে থাকবে, এখন সে তা আদায় করুনক বা ছেড়ে দিক।’ এসব হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল প্রমুখ মনীষীর মাযহাব এই যে, নিম্নরূপ ওয়াজিব।

সুনান-ই-আবি দাউদ প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার প্রতিবেশী আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বলেনঃ ‘তুমি এক কাজ কর, তোমার বাড়ীর সমস্ত আসবাবপত্র বাইরে এনে রেখে দাও।’ লোকটি ঐ কাজই করে এবং সমস্ত আসবাবপত্র রাস্তার উপর রেখে বসে পড়ে। রাস্তা দিয়ে যেই গমন করে সেই তাকে জিজেস করে-ব্যাপার কি? সে বলে, ‘আমার প্রতিবেশী আমাকে জ্বালাতন করছে। আমি অধৈর্য হয়ে এখানে চলে এসেছি।’ সবাই তখন তার প্রতিবেশীকে ভাল-মন্দ বলতে থাকে। কেউ বলে যে, তার উপর আল্লাহ তা‘আলার ক্রেতু বর্ষিত হোক। কেউ বলে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে ধ্বংস করুন, তার প্রতিবেশী যখন এভাবে অপমানিত হওয়ার কথা জানতে পারে, তখন সে অনুরোধ করে তাকে বাড়ী নিয়ে যায় এবং বলে-‘আল্লাহর শপথ! এখন আর মৃত্যু পর্যন্ত আপনার প্রতি কোন অত্যাচার করবো না।’

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে-‘হে লোক সকল! যদি তোমরা কোন সৎ কার্য প্রকাশ কর বা গোপন কর, কিংবা তোমার উপর কেউ হয়তো অত্যাচার করেছে, তাকে তুমি ক্ষমা কর তবে আল্লাহ তা‘আলার নিকট তোমার জন্যে রয়েছে বড় পুণ্য ও মহা প্রতিদান। তিনি নিজেও ক্ষমাকারী এবং বান্দার মধ্যেও তিনি এ অভ্যাস পছন্দ করেন। প্রতিশোধ নেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করে থাকেন।’ একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা‘আলার তাসবীহ পাঠ করে থাকেন। কেউ বলেন-

سُبْحَانَكَ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি যে, আপনি জানা সত্ত্বেও সহনশীলতা প্রদর্শন করছেন।' আবার কেউ কেউ বলেন-

سُبْحَانَكَ عَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قَدْرِتِكَ

অর্থাৎ 'হে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমকারী প্রভু! সমস্ত পবিত্রতা আপনার সত্ত্বার জন্যই উপযুক্ত।'

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, সাদকা ও খায়রাতের কারণে কারও মাল কমে যায় না। ক্ষমা ও মাফ করে দেয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা সম্মান বৃদ্ধি করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে বিনয় ও ন্যূনতা প্রকাশ করে, আল্লাহ তা'আলা তার সম্মান ও মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেন।

১৫০। নিচয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছে করে এবং বলে যে, আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি ও কতিপয়কে অবিশ্বাস করি, এবং তারা এ মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে ইচ্ছে করে।

১৫১। ওরাই প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাসী, এবং আমি অবিশ্বাসীদের জন্যে অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

۱۵۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَرِيدُونَ أَنْ يُفْرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نَؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيَرِيدُونَ أَنْ يَتَخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَيِّلًا

۱۵۱۔ اُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُ هُمْ حَقًا وَاعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِ بِعَذَابٍ مُهِينًا

১৫২। এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর  
রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস  
স্থাপন করে এবং তাদের মধ্যে  
কোন পার্থক্য করে না-আল্লাহ  
তাদেরকেই তাদের প্রতিদান  
প্রদান করবেন এবং আল্লাহ  
ক্ষমাশীল, করুণাময় ।

١٥٢- وَالَّذِينَ امْنَوْا بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَلَمْ يُفْرِقُوا بَيْنَ أَحَدٍ  
مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتَيْهُمْ  
أَجْوَرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَحِيمًا ۝ ۱۵۲

এ আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে যে, মাত্র একজন নবীকেও যে মানে না সেও  
কাফির। ইয়াহুদীরা হ্যরত ঈসা (আঃ) ও হ্যরত মুহাম্মাদ (সঃ) ছাড়া অন্যান্য  
সমস্ত নবীকেই মানতো। শ্রীষ্টানেরা শুধুমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হ্যরত  
মুহাম্মাদ (সঃ) ছাড়া সমস্ত নবীকেই বিশ্বাস করতো। সামেরীরা হ্যরত ইউশা’  
(আঃ)-এর পরে অন্য কোন নবী (আঃ)-কে স্বীকার করতো না। হ্যরত ইউশা’  
(আঃ) হ্যরত মূসা ইবনে ইমরান (আঃ)-এর খলীফা ছিলেন। মাজুসীদের  
সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের নবী যারাদাশ্তকে স্বীকার করতো! কিন্তু  
তারা যখন তাঁর শরীয়তকে অস্বীকার করে তখন আল্লাহ তা’আলা তাদের  
শরীয়তকে উঠিয়ে নেন। আল্লাহ তা’আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন। সুতরাং এ  
লোকগুলো যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে প্রভেদ আনয়ন করতো অর্থাৎ  
কোন নবীকে মানতো ও কোন নবীকে মানতো না, তা যে, আল্লাহ প্রদত্ত  
দলীলের উপর ভিত্তি করে তা নয়। বরং শুধুমাত্র মনের ইচ্ছা, অত্যন্ত গৌড়ামি  
এবং পূর্ব পুরুষের কথার উপর অন্ধ বিশ্বাসের কারণেই তারা একুপ করতো।  
এর দ্বারা এটাও জানা গেল যে, যে ব্যক্তি মাত্র একজন নবীকে মানে না সে  
আল্লাহ তা’আলার নিকট সমস্ত নবীকেই অস্বীকারকারী। সুতরাং তারা  
নিঃসন্দেহেই কাফির। প্রকৃতপক্ষে ‘শারঙ্গ’ ঈমান তাদের কারও উপরেই নেই,  
বরং রয়েছে শুধু গৌড়ামি ও প্রবৃত্তির ঈমান। আর একুপ ঈমান মোটেই  
গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব এ কাফিরদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি রয়েছে।  
কেননা, যাঁদের উপর ঈমান না এনে তাঁদের মর্যাদার হানি করেছে তার প্রতিফল  
এটাই যে, তাদেরকে লাঞ্ছনাজনক শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তারা যে  
তাদের উপর ঈমান আনছে না তা তাদের চিন্তা-শক্তির অভাবের কারণেই হোক

বা সত্য প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর ইহলৌকিক কোন স্বার্থের কারণেই হোক, যেমন ইয়াহুদী আলেমদের রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ব্যাপারে এ অভ্যাস ছিল যে, তারা একমাত্র হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর নবুওয়াতকে অঙ্গীকার করেছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও শক্রতার কাজে উঠে পড়ে লেগেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত করেন এবং পরকালেও রয়েছে তাদের জন্যে অপমানকর শাস্তি।

অতঃপর মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উচ্চতের প্রশংসা করা হচ্ছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতঃ সমস্ত নবীকেই বিশ্বাস করে এবং তাদের মধ্যে কোন ভিন্নতা সৃষ্টি করে না। আল্লাহ তা'আলার শেষ গ্রন্থ কুরআন কারীমের উপর ঈমান এনে অন্যান্য সমস্ত আসমানী কিতাবকেও তারা বিশ্বাস করে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা رَبُّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِنْ إِنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كُلُّ أَمْنَ بِاللَّهِ (২৪: ২৮৫)-এ আয়াতে বলেছেন। এরপর তাদের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি তাদেরকে তাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়নের কারণে সত্ত্বরই প্রতিদান প্রদান করবেন। তারা যদি কোন পাপকার্যও করে বসে তবুও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের উপর স্বীয় করুণা বর্ষণ করবেন। কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১৫৩। আহলে কিতাব তোমাকে  
জিজ্ঞেস করছে যে, তুমি  
তাদের প্রতি আকাশ হতে  
কোন গ্রন্থ নাখিল কর-পরন্তু  
তারা মূসাকে এটা অংপক্ষাও  
বৃহত্তর প্রশ্ন করেছিল, বরং  
তারা বলেছিল যে, আল্লাহকে  
প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন কর;  
অনন্তর তাদের অবাধ্যতার  
জন্যে বিদ্যুৎ তাদেরকে  
আক্রমণ করেছিল, তৎপর  
তাদের নিকট নির্দর্শনাবলী  
আসবার পর তারা গো-বৎস

- ১৫৩ -  
يَسْئَلُكَ أهْلُ الْكِتَبِ أَنَّ  
تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنْ  
السَّمَاءِ فَقَدْ سَالَوا مُوسَى  
أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا  
اللَّهَ جَهَرَةً فَاخْذُتْهُمُ الصِّعْدَةَ  
بِظُلْمٍ هُمْ شَمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ  
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءُتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ

গ্রহণ করেছিল কিন্তু ওটাও  
আমি ক্ষমা করেছিলাম, এবং  
মূসাকে প্রকাশ্য প্রভাব প্রদান  
করেছিলাম।

فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَاتَّبَعَ  
مُوسَى سُلْطَنًا مِنْ بَيْنَ

১৫৪। এবং আমি তাদের  
প্রতিশ্রূতির জন্যে তাদের  
উপর ত্রুপর্বত সমুচ্ছ  
করেছিলাম এবং তাদেরকে  
বলেছিলাম যে, “সিজদা”  
করতে করতে ঘরে প্রবেশ কর  
এবং তাদেরকে আরও  
বলেছিলাম যে, শনিবারের  
সীমা অতিক্রম করো না এবং  
তাদের নিকট কঠোর  
প্রতিশ্রূতি গ্রহণ করেছিলাম।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ  
بِمِثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ أَدْخُلُوا  
الْبَابَ سُجْدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا  
تَعْدُوا فِي السَّبِيلِ وَأَخْذُنَا  
مِنْهُمْ مِثَاقًا غَلِيظًا

ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিল- হযরত মূসা (আঃ) যেমন  
তাওরাত একই সাথে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে  
এনেছিলেন, তদ্দুপ আপনি পূর্ণভাবে লিখিত কোন আসমানী কিতাব আনয়ন  
করুন। এও বর্ণিত আছে যে, তারা বলেছিল-আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট  
হতে আমাদের নামে এমন পত্র আনয়ন করুন যাতে আপনাকে নবীরূপে মেনে  
নেয়ার নির্দেশ থাকে। এরূপ প্রশ্ন তারা বিদ্রূপ, অবাধ্যতা এবং কুফরীর  
উদ্দেশ্যেই করেছিল। যেমন মক্কাবাসীও তাঁকে অনুরূপ এক প্রশ্ন করেছিল যা  
সূরা-ই-সুবহানে উল্লিখিত আছে। তারা বলেছিল-‘যে পর্যন্ত আরব ভূমির উপর  
আপনি নদী প্রবাহিত করে তাকে সবুজ শ্যামল প্রান্তরে পরিণত না করবেন সে  
পর্যন্ত আমরা আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবো না’।

সুতরাং আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন-তাদের এ অবাধ্যতা  
এবং বাজে প্রশ্নের কারণে আপনি মোটেই দুঃখিত হবেন না। তাদের এটা  
পুরাতন অভ্যাস। তারা হযরত মূসা (আঃ)-কে এর চেয়েও জঘন্যতর প্রশ্ন  
করেছিল। তারা তাঁকে বলেছিল-আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন কর। এ  
অহংকার, অবাধ্যতা এবং বাজে প্রশ্নের প্রতিফলও তাদেরকে ভোগ করতে

হয়েছে। অর্থাৎ আকাশের বিদ্যুৎ তাদের উপর পতিত হয়েছিল। যেমন সূরা-ই-বাকারায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তথায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهَرًا فَاخْذُتُمُ الصُّعْقَةَ  
وَأَنْتُمْ تَنْظَرُونَ - ثُمَّ بَعْدِ مُوتِكُمْ لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ -

অর্থাৎ “এবং যখন তোমরা বলেছিলে-হে মূসা, আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করবো না। তখন বিদ্যুৎ তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল ও তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে। তৎপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে সংজ্ঞীবিত করেছিলাম-যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।” (২: ৫৫-৫৬)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-‘বড় বড় নির্দেশনাবলী প্রত্যক্ষ করার পরেও তারা গো বৎসের পূজো আরম্ভ করে দেয়।’ মিসরে তাদের শক্র ফিরআউনের হ্যরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবিলায় ডুবে মরা, তার সমস্ত সৈন্যের দুর্ভাগ্যের মৃত্যুবরণ করা, তাদের সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সমুদ্র অতিক্রম করে যাওয়া, এ সবগুলোই তাদের চোখের সামনে সংঘটিত হয়েছে। তথাপি সেখান হতে কিছু দূর গিয়েই তারা মূর্তি পূজকদেরকে মূর্তিপূজো করতে দেখে স্বীয় নবী (আঃ)-কে বলে-‘আমাদের জন্যও একুপ একটি মা'বুদ বানিয়ে দাও।’ এর পূর্ণ বিবরণ সূরা-ই-আ'রাফ এবং সূরা-ই-ত্বাহার মধ্যেও রয়েছে।

অতঃপর হ্যরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন এবং তাদের তাওবা কবুল হওয়ার পক্ষা এই বলে দেয়া হয় যে, যারা গো-বৎসের পূজো করেনি তারা পূজোকারীদেরকে হত্যা করবে। যখন হত্যাকার্য আরম্ভ হয়ে যায় তখন আল্লাহ পাক তাদের তাওবা কবুল করলেন এবং মৃতদেরকেও জীবিত করে দেন। তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন-ওটাকেও আমি ক্ষমা করে দিয়েছি এবং এ মহা পাপকেও আমি মাফ করেছি। আর হ্যরত মূসা (আঃ)-কে প্রকাশ্য প্রভাব প্রদান করেছি।

যখন তারা তাওবাতের নির্দেশাবলী মান্য করতে অস্বীকার করে এবং হ্যরত মূসা (আঃ)-এর আনুগত্য স্বীকারে অসম্মত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মাথার উপর তূর পাহাড়কে সমুচ্ছ করেন এবং তাদেরকে বলেন-‘তোমরা এখন আমার আহকাম মানবে কি-না বল? নতুবা এ পর্বতকে আমি তোমাদের

উপর নিষ্কেপ করবো।' তখন তারা সবাই সিজদায় পড়ে গিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে এবং নির্দেশাবলী মেনে নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। তাদের অন্তরে এত ভয় হয়েছিল যে, সিজদার মধ্যেও তারা আড় চোখে উপরের দিকে দেখে যে, না জানি পর্বত তাদের উপর পড়ে যায় এবং তারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে যায়। অতঃপর পর্বত সরিয়ে দেয়া হয়।

এরপর তাদের অন্য অবাধ্যতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা কথা ও কাজ দুঁটোই পরিবর্তন করেছিল। তাদেরকে বলা হয়েছিল-'তোমরা সিজদা করতে করতে বায়তুল মুকাদ্দাসের দরজায় প্রবেশ কর এবং حِجْرَة বল।' অর্থাৎ তোমরা বল হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পাপ মার্জনা করুন। আমরা আপনার পথে জিহাদ করা হতে বিরত রয়েছি, যার শাস্তি স্বরূপ আমরা 'তিহ' প্রাপ্তরে হতবুদ্ধি হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ঘুরে বেরিয়েছি। কিন্তু এখানেও তাদের হঠকারিতা প্রকাশ পেয়েছে। তারা হাঁটুর ভরে চলতে চলতে বায়তুল মুকাদ্দাসের দরজায় পৌছে এবং حِجْرَةٍ شِعْرَةٍ বলে। অর্থাৎ 'আমাদেরকে চুলের মধ্যে' গম দান করুন। তাদের আরও দুষ্টামি এই যে, শনিবারের মর্যাদা রক্ষার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ওর বিরুদ্ধাচরণেও তারা প্রস্তুত হয়ে যায় এবং কৌশল করে পাপকার্যে লিঙ্গ হয়ে পড়ে। যেমন সূরা-ই-আ'রাফের سُرَا-ই-সুবহানের মর্যাদা রক্ষার উপর অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। এ পূর্ণ হাদীসটি ১০১-এ আয়াতের তাফসীরে (১০১-১০৮) وَسَلَّمُوا عَنِ الْقَرْبَةِ التَّيْ كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرِ -এ আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

একটি হাদীসেও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের নিকট বিশেষ করে শনিবারের মর্যাদা রক্ষার উপর অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। এ পূর্ণ হাদীসটি ১০১-এ আয়াতের তাফসীরে (১০১-১০৮) وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ ابْيَتِ بَيْنَتٍ -এ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে।

## ১৫৫। কিন্তু তাদের প্রতিশ্রূতি

তঙ্গ এবং আল্লাহর নির্দশনাবলীর প্রতি তাদের অবিশ্বাস ও তাদের অন্যায়ভাবে নবীগণ হত্যা এবং তাদের উক্তির দরুন যে,

۱۵۵- فِيمَا نَقْضِهِمْ مِمِشَاقِهِمْ  
وَكُفَّرُهُمْ بِأَبْيَاتِ اللَّهِ وَقُتِلُّهُمْ  
الْأَنْيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقُولُّهُمْ

আমাদের অন্তরসমূহ আবৃত;  
হ্যাঁ- তাদের অবিশ্বাস হেতু  
আল্লাহ ওর উপর মোহর  
অঙ্কিত করেছেন, এ কারণে  
তারা অল্ল সংখ্যক ব্যতীত  
বিশ্বাস করে না ।

১৫৬। এবং তাদের অবিশ্বাস ও  
মারইয়ামের প্রতি তাদের  
ভয়ানক অপবাদের জন্যে ।

১৫৭। এবং আল্লাহ প্রেরিত  
মারইয়াম নক্কন ঈসাকে  
আমরা হত্যা করেছি একথা  
বলার জন্যে; এবং তারা তাকে  
হত্যা করেনি ও তাকে  
ক্রুশবিন্দ করেনি, এবং  
তাদেরকেই সংশয়াবিষ্ট করা  
হয়েছিল; এবং নিচয়ই যারা  
তাতে মতবিরোধ করেছিল,  
অবশ্য তারাই তদ্বিষয়ে  
সন্দেহাচ্ছন্ন ছিল, কল্পনায়  
অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে  
তাদের কোন জ্ঞান ছিল না  
এবং তারা প্রকৃতপক্ষে তাকে  
হত্যা করেনি ।

১৫৮। পরন্তু আল্লাহ তাকে  
নিজের দিকে উঠিয়ে  
নিয়েছেন, এবং আল্লাহ  
পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী ।

قُلْوَيْنَا غَلَفٌ بِلِ طَبَعَ اللَّهُ  
عَلَيْهَا بِكُفَرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ  
إِلَّا قَلِيلًا ۝

১৫৬- وَبِكُفَرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ  
مَرِيمَ بِهَتَانًا عَظِيمًا ۝

১৫৭- وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَاتَلْنَا  
الْمَسِيحَ عِيسَىً ابْنَ مَرِيمَ  
رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَاتَلُوهُ وَمَا  
صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شَبِهَ لَهُمْ وَإِنَّ  
الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شِكْ  
مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا  
إِتَابَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَاتَلُوهُ يَقِيْنًا ۝

১৫৮- بِلِ رَفِعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ

الله عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

১৫৯। এবং আহলে কিতাবের  
মধ্যে এমন কেউ নেই যে,  
তার মৃত্যুর পূর্বে ব্যক্তিত এটা  
বিশ্বাস করবে; এবং উত্থান  
দিবসে সে তাদের উপর  
সাক্ষ্য দান করবে।

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ إِلَّا  
لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ  
الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝

আহলে কিতাবের ঐ পাপসমূহের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যার কারণে তারা আল্লাহ তা'আলার করুণা হতে দূরে নিষ্ক্রিয় হয়েছে। অভিশপ্ত জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। প্রথম হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিল তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ অর্থাত্ হজ্জত, দলীল এবং নবীদের মুজিয়াকে অঙ্গীকার করে। তৃতীয় হচ্ছে এই যে, তারা বিনা কারণে অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করে। আল্লাহ পাকের রাসূলগণের একটি বিরাট দল 'তাদের হাতে নিহত হন। চতুর্থ এই যে, তারা বলে- আমাদের অন্তর গিলাফের অর্থাত্ পর্দার মধ্যে রয়েছে। যেমন মুশরিকরা বলেছিলঃ

وَقَالُوا قَلُوبُنَا فِي أَكْنَةٍ مِّمَّا تَدْعُنَا إِلَيْهِ

অর্থাত্ তারা বলেছিল- “হে নবী (সঃ)! আপনি আমাদেরকে যেদিকে আহ্বান করছেন তা হতে আমাদের অন্তর পর্দার মধ্যে রয়েছে।” (৪১: ৫) আবার এও বলা হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে- ‘আমাদের অন্তর হচ্ছে জ্ঞান ও বিদ্যার পাত্র। সেই পাত্র জ্ঞানে পরিপূর্ণ রয়েছে।’

সূরা-ই-বাকারার মধ্যেও এর দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথাকে খণ্ডন করে বলেনঃ এটা নয় বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। প্রথম তাফসীরের ভিত্তিতে ভাবার্থ হবে- তারা ওয়র পেশ করে বলেছিল, আমাদের অন্তরের উপর পর্দা পড়ে গেছে বলে আমরা নবী (আঃ)-এর কথাগুলো মনে রাখতে পারি না। তখন আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেন-‘এরূপ নয়, বরং তোমাদের কুফরীর কারণে তোমাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে।’ দ্বিতীয় তাফসীরের ভিত্তিতে তো ভাবার্থ সবদিক দিয়েই স্পষ্ট। সূরা-ই-বাকারার তাফসীরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সুতরাং পরিণাম হিসেবে বলা হয়েছে যে, এখন তাদের অন্তর কুফরী, অবাধ্যতা এবং ঈমানের স্বল্পতার উপরেই থাকবে।

অতঃপর তাদের পঞ্চম বড় অপরাধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা সতীসাঙ্কী নারী হ্যরত মারইয়াম (আঃ)-এর উপরও ব্যভিচারের জঘন্যতম অপবাদ দেয় এবং তারা একথা বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি যে, এ ব্যভিচারের মাধ্যমেই হ্যরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ আবার আর এক পা অগ্রসর হয়ে বলে যে, এ ব্যভিচার ঝুঁতু অবস্থায় হয়েছিল। তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত বর্ষিত হোক যে, তাঁর গৃহীত বান্দাও তাদের কু-কথা হতে রক্ষা পাননি। তাদের ষষ্ঠ অপরাধ এই যে, তারা বিন্দুপ করে এবং গৌরব বোধ করে বলেছিল, ‘আমরা হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছি।’ যেমন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে উপহাস করে বলেছিল—“হে ঐ ব্যক্তি! যার উপর কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে, তুমি তো পাগল।”

পূর্ণ ঘটনা এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে নবীরূপে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে বড় বড় মুজিয়া প্রদান করেন, যেমন জন্মাঙ্ককে চক্ষুদান করা, শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দেয়া, মৃতকে জীবিত করা, মাটি দ্বারা পাখি তৈরী করে তার ভিতর ফুঁক দিয়ে তাকে জীবন্ত পাখি করে উড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি। তখন ইয়াহুন্দীরা অত্যন্ত কৃপিত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগে ঘায় ও সর্ব প্রকারের কষ্ট দিতে আরম্ভ করে। তারা তাঁর জীবন দুর্বিসহ করে তুলে। কোন গ্রামে কদিন ধরে নিরাপদে অবস্থানও তাঁর ভাগ্যে জুটেনি। সারা জীবন তিনি মায়ের সঙ্গে জঙ্গলে ও প্রান্তরে ভ্রমণের অবস্থায় কাটিয়ে দেন। সে অবস্থাতেও তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি। সে যুগের দামেক্ষের বাদশাহৰ নিকট তিনি গমন করেন। সে বাদশাহ ছিল তারকা পূজক। সে সময় ঐ মাযহাবের লোককে ‘ইউনান’ বলা হতো। ইয়াহুন্দীরা এখানে এসে হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে বাদশাহকে উত্তেজিত করে। তারা বলে, ‘এ লোকটি বড়ই বিবাদী। সে জনগণকে বিপথে চালিত করছে। প্রত্যহ নতুন নতুন গওগোল সৃষ্টি করছে ও শান্তি ভঙ্গ করছে। সে জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করছে।’

বাদশাহ বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থানরত স্বীয় শাসনকর্তার নিকট নির্দেশনামা প্রেরণ করে যে, সে যেন হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে ঘ্রেফতার করতঃ শূলে চড়িয়ে দেয় এবং তাঁর মস্তকোপরি কাঁটার মুকুট পরিয়ে দেয় এবং এভাবে জনগণকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করে। বাদশাহ এ নির্দেশনামা পাঠ করে ঐ শাসনকর্তা ইয়াহুন্দীদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ ঘরটি অবরোধ করে যেখানে হ্যরত

ঈসা (আঃ) অবস্থান করছিলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে বারোজন বা তেরোজন অথবা খুব বেশী হলে সতেরোজন লোক ছিল। শুক্রবার আসরের পর তারা ঐ ঘটটি অবরোধ করে এবং শনিবারের রাত পর্যন্ত অবরোধ স্থায়ী থাকে। যখন ঈসা (আঃ) অনুভব করেন যে, এখন হয় তারাই জোর করে ঘরে প্রবেশ করতঃ তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে, না হয় তাঁকেই বাইরে যেতে হবে। তাই তিনি স্বীয় সহচরদেরকে বলেনঃ “তোমাদের মধ্যে কে এটা পছন্দ করবে যে, তার উপর আমার সদ্শ আনয়ন করা হবে অর্থাৎ তার আকার আমার আকারের মত হয়ে যাবে, অতঃপর সে তাদের হাতে গ্রেফতার হবে এবং আল্লাহ পাক আমাকে মুক্তি দেবেন? আমি তার জন্যে জান্নাতের জামিন হচ্ছি।” এ কথা শুনে এক নব্য যুবক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ “আমি এতে সম্মত আছি।” কিন্তু ঈসা (আঃ) তাঁকে এর যোগ্য মনে না করে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও একথাই বলেন। কিন্তু প্রত্যেকবার তিনিই প্রস্তুত হয়ে যান। তখন হ্যরত ঈসাও (আঃ) মেনে নেন এবং দেখতে না দেখতেই আল্লাহ তা'আলার হৃকুমে তাঁর আকার পরিবর্তিত হয়, আর মনে হয় যে, তিনিই হ্যরত ঈসা (আঃ)। সে সময় হাদের এক দিকে একটি ছিদ্র প্রকাশিত হয় এবং হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর উপর তন্দুর ন্যায় অবস্থা হেয়ে যায়। ঐ অবস্থাতেই তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

অর্থাৎ ‘যখন আল্লাহ তা'আলা বলেন- হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে গ্রহণকারী এবং আমার নিকট উত্তোলনকারী।’ (৩: ৫৫)

হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পর এ লোকগুলো ঘর হতে বেরিয়ে আসে। যে মহান সাহাবীকে হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর আকারবিশিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল তাঁকেই ঈসা (আঃ) মনে করে ইয়াহুন্দীদের দলটি ধরে নেয় এবং রাতারাতিই তাঁকে শূলের উপর ঢাকিয়ে দিয়ে তাঁর মাথার উপর কঁটার মুকুট পরিয়ে দেয়। তখন ইয়াহুন্দীরা আনন্দে আঘাতারা হয়ে পড়ে যে, তারা হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করে ফেলেছে। সবচেয়ে বিশ্বয়কর ব্যাপার এই যে, শ্রীষ্টানন্দের একটি নির্বোধ দলও ইয়াহুন্দীদের সুরে সুর মিলিয়ে দেয়। শুধুমাত্র যারা হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে এ ঘরে উপস্থিত ছিল এবং যারা নিশ্চিতরূপে জানতো যে, তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, আর ইনি হচ্ছেন অমুক ব্যক্তি যিনি প্রতারণায় তাঁর স্থানে শহীদ হয়েছেন, তারা ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত শ্রীষ্টানই

ইয়াহুদীদের মতই আলাপ আলোচনা করতে থাকে। এমন কি তারা একথাও বানিয়ে নেয় যে, হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা হ্যরত মারইয়াম (আঃ) শূলের নীচে বসে ক্রন্দন করছিলেন। তারা একথাও বলে যে, হ্যরত মারইয়াম (আঃ) সে সময় স্বীয় পুত্রের সঙ্গে কিছু কথাবার্তাও বলেছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর বান্দাদের উপর পরীক্ষা যা তাঁর পূর্ণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ অপপ্রচারকে প্রকাশ করে দিয়ে প্রকৃত অবস্থা সম্বলে স্বীয় বান্দাদেরকে অবহিত করেন। এবং স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও বড় মর্যাদাসম্পন্ন নবী (সঃ)-এর মাধ্যমে তাঁর পবিত্র ও সত্য কালামে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে না কেউ হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছে, না তাকে শূলে দিয়েছে। বরং যে ব্যক্তির আকার তাঁরই আকারের ন্যায় করে দেয়া হয়েছিল তাঁকেই তারা হ্যরত ঈসা (আঃ) মনে করে শূলে দিয়েছিল। “যেসব ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর নিহত হওয়ার কথা বলে থাকে তারা সন্দেহ ও ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তাদের নিকট না আছে কোন দলীল, না তাদের আছে সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান। কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত তাদের এ বিষয়ে কোনই জ্ঞান নেই। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা এরই সাথে আবার বলে দিয়েছেন যে, হ্যরত ঈসা রহমান্নাহ (আঃ)-কে কেউ যে হত্যা করেনি এটা নিশ্চিত স্বরূপ কথা। বরং প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাঁকে নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।

হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নিতে ইচ্ছে করেন তখন তিনি বাড়িতে আসেন। সে সময় ঘরে বারোজন সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁর চুল হতে পানির ফেঁটা ঝরে ঝরে পড়ছিলো। তিনি তাঁর সহচরদেরকে বলেনঃ ‘তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে যারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে কিন্তু বারো বার আমার সঙ্গে কুফরী করবে।’ অতঃপর তিনি বলেনঃ ‘তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে পছন্দ করে যে, আমার মত তার আকার করে দেয়া হবে এবং আমার শূলে তাকে হত্যা করা হবে এবং জান্নাতে সে আমার বন্ধু হবে।’

এ বর্ণনায় এও আছে যে, হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কেউ কেউ তাঁর সাথে বারো বার কুফরী করে। অতঃপর তাদের তিনটি দল হয়ে যায়। (১) ইয়াকুবিয়্যাহ, (২) নাসতুরিয়াহ এবং (৩) মুসলমান। ইয়াকুবিয়্যাহ

তো বলতে থাকে—‘স্বয়ং আল্লাহ আমাদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। যতোদিন থাকার তাঁর ইচ্ছে ছিল ততোদিন ছিলেন। অতঃপর আকাশে উঠে গেছেন।’ নাসতুরিয়্যাহ বলে—‘আল্লাহর পুত্র আমাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁকে কিছুকাল আমাদের মধ্যে রাখার পর তিনি তাঁকে নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।’ মুসলমানদের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহর বান্দা ও রাসূল তাদের মধ্যে ছিলেন। যতোদিন রাখার ইচ্ছা ততোদিন তাদের মধ্যে রেখেছেন। অতঃপর নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।

পূর্ববর্তী দু'দলের প্রভাব খুব বেশী হয় এবং তারা তৃতীয় সত্য ও ভাল দলটিকে পিষ্ট ও দলিত করতে থাকে। সুতরাং তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা শেষ নবী হ্যরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে প্রেরণ করতঃ ইসলামকে জয়যুক্ত করেন। এর ইসনাদ সম্পূর্ণ সঠিক এবং সুনান-ই-নাসাঈতে হ্যরত আবু মু'আবিয়া (রঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। অনুরূপভাবে পূর্বযুগীয় বহু মনীষীরও এটা উক্তি রয়েছে। হ্যরত অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) বলেন যে, সে সময় শাহী সৈন্য ও ইয়াহুদীরা হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর উপর আক্রমণ চালায় ও তাঁকে অবরোধ করে। সে সময় তাঁর সঙ্গে তাঁর সতেরোজন সহচর ছিলেন। ঐ লোকগুলো দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে দেখে যে সমস্ত লোকই হচ্ছে হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর আকার বিশিষ্ট। ওরা তখন তাঁদেরকে বলেঃ ‘তোমাদের মধ্যে যিনি প্রকৃত ঈসা তাঁকে আমাদের হাতে সমর্পণ কর, নতুনা তোমাদের সকলকেই হত্যা করে ফেলবো।’

তখন হ্যরত ঈসা (আঃ) স্বীয় সহচরবৃন্দকে বলেনঃ “তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে জান্নাতে আমার বস্তু হতে ইচ্ছে করে এবং তার বিনিময়ে আমার শূলে শূলে চড়া স্বীকার করে নেয়।” একথা শুনে একজন সাহাবী প্রস্তুত হয়ে যান এবং বলেনঃ “আমিই ঈসা।” সুতরাং ধর্মের শক্ররা তাঁকে প্রেফতার করতঃ হত্যা করে শূলে চড়িয়ে দেয় এবং প্রফুল্লচিত্তে বলে, “আমরা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছি।” অথচ প্রকৃতপক্ষে একপ হয়নি, বরং তারা প্রতারিত হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা সেই সময় স্বীয় নবী (আঃ)-কে নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর অন্তরে এ বিশ্বাস জাগ্রত করেন যে, তাঁকে দুনিয়া হতে ফিরে আসতে হবে তখন সেটা তাঁর নিকট খুবই কঠিন ঠেকে এবং মৃত্যুর ভয়ে তিনি

অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। তাই তিনি স্বীয় সহচরগণকে জিয়াফত দান করেন। খানা তৈরী করেন এবং সকলকে বলে দেন-‘আজ রাতে তোমরা সবাই আমার বাড়ীতে অবশ্যই আসবে, তোমাদের সাথে আমার জরুরী কথা আছে।’ তাঁর সহচরগণ উপস্থিত হলে তিনি স্বহস্তে তাদেরকে ভোজন করান। সমস্ত কাজ-কর্ম তিনি নিজেই করতে থাকেন। তাঁদের খাওয়া শেষ হলে তিনি স্বহস্তে তাঁদের হাত ধৌত করিয়ে দেন এবং নিজের কাপড় দিয়ে তাঁদের হাত মুছিয়ে দেন। এটা তাঁর সাহাবীদের নিকট ভাল মনে হয় না। তখন তিনি তাঁদেরকে বলেনঃ “আজকে যদি তোমাদের মধ্যে কেউ আমার কাজে বাধা দান করে তবে তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমিও তার নই এবং সেও আমার নয়।” একথা শুনে তাঁরা নীরব হয়ে যান।

অতঃপর যখন তিনি ঐ সম্মানজনক কাজ হতে অবসর গ্রহণ করেন তখন সহচরগণকে সম্মোধন করে বলেনঃ “দেখ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি, তথাপি আমি স্বহস্তে তোমাদের খিদমত করেছি যেন তোমরা আমার এ সুন্নাতের অনুসারী হয়ে যাও। সাবধান! তোমাদের কেউ যেন নিজেকে স্বীয় মুসলমান ভাই হতে উত্তম মনে না করে। বরং বড়ো যেন ছোটদের সেবা করে যেমন স্বয়ং আমি তোমাদের খিদমত করলাম। যাক, তোমাদের সঙ্গে আমার বিশেষ এক কাজ ছিল যার জন্যে আমি তোমাদেরকে ডেকেছি। তা হচ্ছে এই যে, তোমরা আজ রাতে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমার জন্যে প্রার্থনা কর যেন আমার প্রভু আমার মৃত্যুর সময় পিছিয়ে দেন।”

অতএব, তাঁরা প্রার্থনা করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বিনয় প্রকাশের সময়ের পূর্বেই তাঁদেরকে ঘূম এমনভাবে চেপে বসে যে, তাঁদের মুখ দিয়ে একটি শব্দ বের হওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি তাদেরকে জাগ্রত করতে থাকেন ও বলেনঃ “তোমাদের হলো কি যে এক রাতও তোমরা জেগে থাকতে পারছো না?” সকলেই তখন উত্তরে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (আঃ)! আমরা নিজেরাই তো হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি যে, এটা হচ্ছে কি? এক রাতই নয়, বরং ক্রমাগত ক’রাত জেগে থাকারও আমাদের অভ্যাস আছে। কিন্তু আল্লাহ তা’আলাই জানেন আজ আমাদেরকে ঘূম ঘিরে নেয়ার কারণ কি? প্রার্থনা ও আমাদের মধ্যে কোন ‘কুদরতী’ বাধার সৃষ্টি হয়েছে।” তখন তিনি বলেনঃ “তাহলে রাখাল থাকবে না এবং ছাগলগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে।”

মোটকথা, তিনি ইশারা-ইঙ্গিতে স্বীয় অবস্থা প্রকাশ করতে থাকেন। তারপরে তিনি বলেনঃ “দেখ, তোমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি সকালে মোরগ ডাক দেয়ার পূর্বে আমার সাথে তিনবার কুফরী করবে এবং তোমাদের মধ্যে একটি লোক গুটিকয়েক রৌপ্য-মুদ্রার বিনিময়ে আমাকে বিক্রি করতঃ আমার মূল্য ভক্ষণ করবে।” তখন এ লোকগুলো এখান থেকে বেরিয়ে পড়ে এদিক ওদিক চলে যান। ইয়াহুদীরা তাদের অনুসন্ধানে লেগে ছিল। তারা শামউন নামে হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর একজন সহচরকে চিনে নিয়ে ধরে ফেলে এবং বলে যে, এও তার একজন সঙ্গী। কিন্তু শামউন বলে-এটা ভুল কথা, আমি তাঁর সঙ্গী নই। তারা তার কথা বিশ্বাস করে তাকে ছেড়ে দেয়। কিছু দূরে এগিয়ে গিয়ে সে অন্য দলের হাতে ধরা পড়ে যায় এবং সেখানে ঐভাবেই অস্থীকার করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। এমন সময় মোরগ ডাক দেয়। তখন সে অনুত্তাপ করতে থাকে এবং অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ে।

সকালে হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর একজন সহচর ইয়াহুদীদের নিকটে গিয়ে বলেঃ “আমি যদি তোমাদেরকে হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর ঠিকানা বলে দেই তবে তোমরা আমাকে কি দেবে?” তারা বলেঃ “ত্রিশটি রৌপ্য-মুদ্রা দেবো।” সুতরাং সে সেই মুদ্রা গ্রহণ করে ও হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর ঠিকানা তাদেরকে বলে দেয়। তখন তারা তাঁকে প্রেফতার করে নেয় এবং রশি দ্বারা বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যায় ও বিন্দুপ করে বলে-“আপনিতো মৃতকে জীবিত করতেন, জীৱনদেরকে তাড়িয়ে দিতেন, পাগলকে ভাল করতেন। কিন্তু এখন ব্যাপার কি যে, নিজেকেই বাঁচাতে পারছেন না? রজ্জুকেই ছিঁড়ে ফেলতে পারছেন না? ধিক আপনাকে।” এসব কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল এবং তাঁর দিকে কটক নিষ্কেপ করছিল। এরপ নির্দয়ভাবে টেনে এনে যখন শূলের কাঠের নিকট নিয়ে আসে এবং শূলের উপর চড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছে করে সে সময় আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (আঃ)-কে নিজের কাছে উঠিয়ে নেন এবং তারা তাঁরই আকারের সাদৃশ্যযুক্ত একজন লোককে শূলের উপর উঠিয়ে দেয়।

অতঃপর সাতদিন পরে হ্যরত মারইয়াম (আঃ) এবং যে স্ত্রীলোকটিকে হ্যরত ঈসা (আঃ) জীৱন হতে রক্ষা করেছিলেন তথায় আগমন করেন ও ক্রন্দন করতে থাকেন। তখন হ্যরত ঈসা (আঃ) তথায় আগমন করতঃ বলেনঃ “আপনারা কাঁদছেন কেন? আমাকে তো আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন এবং আমার নিকট তাদের কষ্ট পৌছেনি। বরং তাদেরকে সংশয়াবিষ্ট

করা হয়েছে। আমার সহচরদেরকে সংবাদ দিন যে, তারা যেন অমুক স্থানে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে।” এই শুভ সংবাদ পেয়ে এ এগারজন লোক সবাই তথায় উপস্থিত হন। যে সহচর তাঁকে বিক্রি করেছিল, তাকে তথায় দেখতে পেলেন না। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, সে অত্যন্ত লাজিত ও অনুতপ্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছে। তিনি বলেনঃ ‘যদি সে তাওবা করতো তবে আল্লাহ তা‘আলা তার তাওবা কবুল করতেন।’

অতঃপর তিনি তাঁদেরকে বলেনঃ “যে শিশুটি তোমাদের সঙ্গে রয়েছে, তার নাম ইয়াহুইয়া। সে এখন তোমাদের সঙ্গী। জেনে রেখো, সকালে তোমাদের ভাষা পরিবর্তন করে দেয়া হবে। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের ভাষা বলতে পারবে। সুতরাং তাদের উচিত যে তারা যেন স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের নিকটে গিয়ে তাদের নিকট আমার দাওয়াত পৌছে দেয় এবং আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করে।” এ ঘটনাটি অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ। ইবনে ইসহাক (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, বানী ইসরাইলের যে বাদশাহ হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার জন্যে স্বীয় সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেছিল তার নাম ছিল দাউদ। সে সময় হ্যরত ঈসা (আঃ) অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন। কোন ব্যক্তিই স্বীয় মৃত্যুতে এত বেশী উদ্বিগ্ন ও হা-হ্তাশকারী নেই যে হা-হ্তাশ তিনি সে সময় করেছিলেন। এমন কি তিনি বলেনঃ “হে আল্লাহ! কারও মাধ্যমে যদি আপনি আমার মৃত্যুকে সরিয়ে দেন তবে খুবই ভাল হয়।” তাঁর এত ভয় হয় যে, ভয়ের কারণে তাঁর শরীর দিয়ে রক্ত ফুটে বের হয়। সে সময় সে ঘরে তাঁর সাথে তাঁর বারোজন সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁদের নাম নিম্নে দেয়া হলোঃ (১) ফারতুস, (২) ইয়াকুবাস, (৩) অয়লা ওয়ানাখ্স (ইয়াকুবের ভাই), (৪) আনদ্রা ইয়াস, (৫) ফাইলাসা ইবনে ইয়ালামা, (৬) মুনতা, (৭) তৃমাস, (৮) ইয়াকুব ইবনে হালকা, (৯) নাদ, (১০) আসীস, (১১) কাতাবিয়া এবং (১২) লাইউদাসরাক রিয়াইউতা। কেউ কেউ বলেন যে, তাঁরা ছিলেন তেরোজন। আর একজনের নাম ছিল সারজাস। তিনিই হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর শুভ সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর হালে শূলবিন্দু হতে সম্মত হয়েছিলেন।

যখন হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং অবশিষ্ট লোক ইয়াহুদীদের হাতে বন্দী হন তখন তাঁদেরকে গণনা করা হলে দেখা যায় যে, একজন কম হচ্ছেন। তখন তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ঐদলটি যখন হ্যরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সহচরদের উপর আক্রমণ চালায় ও তাঁদেরকে

গ্রেফতার করার ইচ্ছে করে তখন তারা হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে চিনতে পারেনি। সে সময় লাইউদাসরাকরিয়াইউতা ইয়াহুদীদের নিকট হতে ত্রিশটি রৌপ্য-মুদ্রা গ্রহণ করতঃ তাদেরকে বলেছিল, আমি সর্বপ্রথমে যাচ্ছি। গিয়ে যে লোকটিকে আমি চুম্বন দান করবো, তোমরা বুঝে নেবে, উনিই হ্যরত ঈসা (আঃ)।

অতঃপর যখন এ লোকটি ভেতরে প্রবেশ করে তখন আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে উঠিয়ে নিয়ে ছিলেন এবং হ্যরত সারজাসকে তাঁর আকার বিশিষ্ট করে দেয়া হয়। ঐ লোকটি গিয়ে চুক্তি অনুযায়ী তাঁকেই চুম্বন দেয়। সুতরাং হ্যরত সারজাসকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। এ পাপকার্য সাধনের পর সে বড়ই লজ্জিত ও অনুতঙ্গ হয় এবং স্থীয় গলদেশে রশি লাগিয়ে ফাঁসির উপর ঝুলে যায়। এভাবে সে খ্রীষ্টানদের মধ্যে অভিশঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়। কেউ কেউ বলেন যে, তার নাম লাইউদাসরাকরিয়াইউতা। যখনই সে হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে চিনিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ঐ ঘরে প্রবেশ করে তখনই হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং স্বয়ং তারই আকার হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর মত হয়ে যায়। কাজেই লোকেরা তাঁকেই ধরে নেয়। সে বহুবার চীৎকার করে বলে- আমি হ্যরত ঈসা (আঃ) নই। আমি তো তোমাদের সঙ্গী। আমিইতো হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে চিনিয়েছিলাম। কিন্তু তা শুনবে কেঁ শেষে তাঁকেই শূলে বিন্দু করা হয়। এখন আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর আকারের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত শূলবিন্দু ব্যক্তি মুমিন সারজাস ছিলেন, না মুনাফিক সহচর লাইউদাসরাকরিয়াইউতা ছিল। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর সাদৃশ্য যার উপর আনয়ন করা হয়েছিল তাঁকেই ইয়াহুদীরা শূলবিন্দু করেছিল এবং হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা জীবিত আকাশে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, হ্যরত ঈসার আকারের সাদৃশ্য তাঁর সমস্ত সঙ্গীর উপরই আনয়ন করা হয়েছিল।

এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের উপর সাক্ষী হবেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, 'এ আয়াতের তাফসীরে কয়েকটি উক্তি আছে। প্রথমতঃ এই যে, হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ যখন তিনি দাজ্জালকে হত্যা করার জন্যে দ্বিতীয়বার ভূপৃষ্ঠে

আগমন করবেন তখন সমস্ত মায়হাব উঠে যাবে। শুধুমাত্র ইসলাম ধর্ম অবশিষ্ট থাকবে, যা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সুদৃঢ় ধর্ম।

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে <sup>مُوْتَهِّم</sup>-এর ভাবার্থ হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু। হ্যরত আবু মালিক (রঃ) বলেন যে, যখন হ্যরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন তখন সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করবে। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে যে, বিশেষ করে ইয়াহুদী একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে নাজাসী এবং তাঁর সঙ্গী। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর শপথ! হ্যরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট জীবিত বিদ্যমান রয়েছেন। যখন তিনি ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করবেন তখন একজনও এমন আহলে কিতাব অবশিষ্ট থাকবে না যে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তাঁকে এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ “আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং কিয়ামতের পূর্বে তাঁকে পুনরায় পৃথিবীতে এ হিসেবে প্রেরণ করবেন যে, ভালমন্দ সবাই তাঁর উপরে ঈমান আনয়ন করবে। হ্যরত কাতাদাহ (রঃ), হ্যরত আবদুর রহমান (রঃ) প্রমুখ মুফাস্সিরগণের সিদ্ধান্ত এটা এবং এটাই সঠিক উক্তি। এ তাফসীর হচ্ছে সম্পূর্ণ সঠিক তাফসীর।

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, প্রত্যেক আহলে কিতাব স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। কেননা, মৃত্যুর সময় সত্য ও মিথ্যা প্রত্যেকের উপর প্রকাশিত হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক আহলে কিতাব এ নশ্বর জগত হতে বিদ্যায় ঘৃহণের সময় হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর সত্যতা স্বীকার করবে। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কোন কিতাবী মারা যায় না যে পর্যন্ত না সে হ্যরত ঈসা (আঃ) -এর উপর ঈমান আনয়ন করে। হ্যরত মুজাহিদেরও (রাঃ) এটাই উক্তি। এমন কি হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে তা এতদ্বারা পর্যন্ত বর্ণিত আছে যে, যদি কোন আহলে কিতাবের গর্দান তরবারী দ্বারা উড়িয়ে দেয়া হয় তথাপি তার আত্মা বের হয় না যে পর্যন্ত না সে হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনে এবং এটা বলে দেয় যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও তাঁর রাসূল। হ্যরত উবাই (রাঃ)-এর পঠনে <sup>قُبْلَ مُوْتَهِّم</sup> রয়েছে। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ ‘মনে করুন কেউ হ্যতো দেয়াল হতে পড়ে মারা গেল। তখন সে কি করে ঈমান আনতে পারেঃ’

তিনি উত্তরে বলেনঃ “সে ঐ মধ্যবর্তী দূরত্বের মধ্যেই ঈমান আনতে পারে।” ইকরামা (রঃ), মুহম্মদ ইবনে সীরিন (রঃ), যহুক (রঃ), ঝুয়াইবির (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

তৃতীয় উক্তি এই যে, আহলে কিতাবের মধ্যে কেউ এমন নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে হ্যরত মুহম্মদ (সঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না। ইকরামা (রঃ) একথাই বলেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেনঃ এসব উক্তির মধ্যে অধিকতর সঠিক উক্তি হচ্ছে প্রথম উক্তিটি। তা এই যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হ্যরত ঈসা (আঃ) যখন আকাশ হতে অবতরণ করবেন, কোন আহলে কিতাবই ঐ সময় তাঁর উপর ঈমান আনা ছাড়া থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর এই উক্তিটি সঠিকতম উক্তি। কেননা, এখানকার আয়াতগুলো দ্বারা স্পষ্টভাবে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ইয়াহুদীদের “আমরা হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছি ও শূলে দিয়েছি” এ দাবীর অসারতা প্রমাণিত করা।

সহীহ মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে রয়েছে যে, হ্যরত ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করবেন, ক্রুশকে ভেঙ্গে দেবেন, শূকরকে হত্যা করবেন এবং তিনি জিযিয়া কর গ্রহণ করবেন না। তিনি ঘোষণা করবেন- ‘হয় তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, না হয় তরবারীর সম্মুখীন হও।’ সুতরাং এ আয়াতে সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করবেন। একজনও এমন থাকবে না যে ইসলাম গ্রহণ হতে বিরত থাকবে বা কাউকে বিরত রাখবে। অতএব, যাকে এ পথভঙ্গ ইয়াহুদ ও নির্বোধ খ্রীষ্টানেরা মৃত মনে করে থাকে এবং বিশ্বাস রাখে যে, তাঁকে শূলবিন্ধ করা হয়েছিল, তারা তাঁর প্রকৃত মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং যে কাজ তারা তাঁর সামনে করেছে বা করবে, তিনি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে তার সাক্ষ্য প্রদান করবেন। অর্থাৎ তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পূর্বের জীবনে তাদেরকে তিনি যেসব কাজ করতে দেখেছেন এবং দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে অবতরণের পর সেই শেষ জীবনে তারা তাঁর সামনে যা কিছু করবে, কিয়ামতের দিন ঐ সমস্তই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠবে এবং তিনি আল্লাহ পাকের সামনে ওগুলো পেশ করবেন। হ্যাঁ, তবে এ আয়াতের তাফসীরে অন্য যে দু'টি উক্তি বর্ণিত হয়েছে, ঘটনা হিসেবে সে দু'টোও সম্পূর্ণ সত্য। মৃত্যুর ফেরেশতা এসে যাওয়ার পর আখেরাতের অবস্থা তার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তি

সত্যকে সত্যরূপেই অনুধাবন করে থাকে। কিন্তু সে সময়ের ঈমান তার কোন উপকারে আসে না। এ সূরারই প্রথমদিকে রয়েছে-

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّبُّا<sup>١</sup> حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَهْدَمُ الْمَوْتُ قَالَ  
إِنِّي تَبَتَّثُ الثَّنَاءُ<sup>٢</sup>

অর্থাৎ ‘যারা অসৎ কাজ করতে থাকে, অবশ্যে যখন তাদের কারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে-আমি এখন তাওবা করলাম, তার তাওবা গৃহীত হবে না।’ (৪: ১৮) আর এক জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

فَلَمَّا رَأَوْا بَاسِنًا<sup>١</sup> قَالُوا امْنَا<sup>٢</sup> بِاللَّهِ وَحْدَهُ<sup>٣</sup>

অর্থাৎ ‘যখন তারা আমার শান্তি অবলোকন করে তখন বলে-আমি এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।’ (৪০: ৮৪) তাদেরও সেই ঈমানে কোন উপকার হবে না।

অতএব এ দু’টি আয়াতকে সামনে রেখে আমরা বলি যে, ইমাম ইবনে জারীর শেষের উক্তি দু’টিকে যে খণ্ডন করেছেন, এটা তিনি ঠিক করেননি। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে, এ আয়াতের তাফসীরে যদি এ উক্তিদ্বয়কে সঠিক মেনে নেয়া হয় তবে সেই ইয়াহুদী বা শ্রীষ্টানদের আজ্ঞীয়-স্বজন তার উত্তরাধিকারী না হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেননা, সে তো তখন হ্যরত ঈসা (আঃ) ও হ্যরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর ঈমান এনে মারা গেল, অথচ তার উত্তরাধিকারীগণ হচ্ছে ইয়াহুদী ও শ্রীষ্টান। আর মুসলমানের উত্তরাধিকারী কফিরগণ হতে পারে না। কিন্তু আমরা বলি যে, এটা ঐ সময় প্রযোজ্য যখন সে এমন সময়ে ঈমান আনবে যে সময়ের ঈমান আল্লাহ তা‘আলার নিকট গৃহীত হয়। কিন্তু সে সময়ের ঈমান আনয়ন নয় যা একেবারে বৃথা যায়। হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ)-এর উক্তির উপর গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, দেয়াল হতে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণকারী, হিংস্র জন্মের মুখে পড়ে মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তি এবং তরবারির আঘাতে নিহত ব্যক্তিও বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে।

আর এটা স্পষ্টকথা যে, একুশ অবস্থায় ঈমান আনয়ন মোটেই কোন উপকারে আসতে পারে না, যেমন কুরআন কারীমে উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে এটাই প্রকাশ পাচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। আমার ধারণায় তো এ কথা খুব পরিষ্কার যে, এ আয়াতের তাফসীরের পরবর্তী উক্তিদ্বয়কেও

বিশ্বাসযোগ্যরূপে মেনে নিতে কোনই অসুবিধে নেই। ও দু'টোও স্ব-স্ব স্থানে ঠিকই আছে। কিন্তু হ্যাঁ, আয়াতের প্রকাশ্য ভাবার্থতো সেটাই যা প্রথম উক্তি। তাহলে ভাবার্থ এই যে, হ্যরত ইসা (আঃ) আকাশে বিদ্যমান রয়েছেন। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান উভয় জাতিকেই মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা করবেন। আর যে ‘ইফরাত’ ও ‘তাফরীত’<sup>১</sup> তারা করেছিল তাকেও তিনি বাতিল বলবেন। একদিকে রয়েছে অভিশপ্ত ইয়াহুদী দল যারা তাঁকে তাঁর প্রকৃত মর্যাদা হতে বহু নীচে নামিয়ে দিয়েছিল এবং তাঁর সম্পর্কে এমন জগন্য উক্তি করেছিল যে, যা শুনতে ভাল মানুষ ঘৃণাবোধ করেন। অপরদিকে ছিল খ্রীষ্টান জাতি, যারা তাঁর মর্যাদা এত বেশী বাড়িয়ে দিয়েছিল যে, যা তাঁর মধ্যে ছিল না তাই তারা তাঁর মধ্যে আনয়ন করেছিল এবং তাঁকে নবুওয়াতের পর্যায় হতে প্রভুত্বের পর্যায়ে পৌছিয়ে দিয়েছিল। যা হতে মহান আল্লাহর সত্তা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

এখন ঐ সব হাদীসের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যেগুলোর মধ্যে রয়েছে যে, হ্যরত ইসা (আঃ) শেষ যুগে কিয়ামতের পূর্বে আকাশ হতে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং অংশীবিহীন এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে মানুষকে আহবান করবেন। ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থ ‘সহীহের’ -**كَتَابٌ ذُكْرٌ لِّأَنْبِيَاٰ**- এর মধ্যে এ হাদীসটি এনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাঁর শপথ! অতিসত্ত্বরই তোমাদের মধ্যে ইবনে মারইয়াম (আঃ) অবর্তীর্ণ হবেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে ত্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন এবং জিয়িয়া কর উঠিয়ে দেবেন। সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণ করতে কেউ সম্ভত হবে না। একটি সিজদা করে নেয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার সমুদয় জিনিস হতে প্রিয়তর হবে।’ অতঃপর হাদীসটির বর্ণনাকারী হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ ‘তোমরা ইচ্ছে করলে **لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**’  
-**وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا**- এ আয়াতটি পাঠ কর।

অর্থাৎ আহলে কিতাবের মধ্যে প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে তার উপর (ইসা আঃ -এর উপর) অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সে কিয়ামতের দিন তাদের উপর সাক্ষী হবে। সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। অন্য সনদে এ বর্ণনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে, তাতে এও আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘সে সময় সিজদাহ শুধু বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্যেই

১. খুবই বাড়িয়ে দেয়াকে ‘ইফরাত’ এবং খুবই নীচে নামিয়ে দেয়াকে ‘তাফরীত’ বলে।

হবে।' তারপর হ্যরত আবু হৱাইরা (রাঃ) বলেনঃ 'তোমরা ইচ্ছে করলে পাঠ কর-

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ إِلَّا لِيُؤْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ  
بَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا -

তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ 'হ্যরত ঈসা ইবনে মারহিয়াম (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে।' অতঃপর হ্যরত আবু হৱাইরা (রাঃ) তিনবার এর পুনরাবৃত্তি করেন।

মুসনাদ-ই-আহমাদের হাদীসে রয়েছে যে, হ্যরত ঈসা (আঃ) 'ফাজেরাওহা' প্রান্তরে হজ্জের উপর বা উমরার উপর অথবা হজ্জ ও উমরা দু'টোর উপরই লাবায়েক বলবেন। এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদের অন্য হাদীসে রয়েছে যে, হ্যরত ইবনে মারহিয়াম অবতরণ করবেন, শুকরকে হত্যা করবেন, ত্রুশকে নিশ্চিহ্ন করবেন, নামায জামাআতের সঙ্গে হবে এবং আল্লাহ তা'আলার পথে সম্পদ এত বেশী প্রদান করা হবে যে, কোন গ্রহণকারী পাওয়া যাবে না। তিনি খাজনা ছেড়ে দেবেন, রওহায় গমন করবেন এবং তথা হতে হজ্জ বা উমরা পালন করবেন অথবা একই সাথে দু'টোই করবেন।

অতঃপর হ্যরত আবু হৱাইরা (রাঃ) উপরোক্ত আয়াতটি পাট করেন। কিন্তু তাঁর ছাত্র হ্যরত হানযালা (রঃ)-এর ধারণা এই যে, হ্যরত আবু হৱাইরা (রাঃ) বলেনঃ "হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর ইস্তিকালের পূর্বে আহলে কিতাব তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।" হ্যরত হানযালা (রঃ) বলেনঃ "আমার জানা নেই যে, এগুলো হাদীসেরই শব্দ, না হ্যরত আবু হৱাইরা (রাঃ)-এর নিজের কথা।" সহীহ বুখারীর মধ্যে হ্যরত আবু হৱাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঐ সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন হ্যরত ঈসা (আঃ) তোমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হবেন এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য হতেই হবে?"

সুনান-ই-আবি দাউদ, মুসনাদ-ই-আহমাদ প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ নবীগণ (আঃ) সবাই বৈমাত্রেয় ভাই, তাঁদের মা বিভিন্ন বটে, কিন্তু ধর্ম একই। হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর বেশী নিকটবর্তী আমিই। কেননা, তাঁর ও আমার মধ্যে কোন নবী নেই। তিনি অবতীর্ণ হবেন, তোমরা তাঁকে চিনে নাও। তিনি হবেন মধ্যম দেহ বিশিষ্ট ও শ্঵েত রক্তিম বর্ণের। তিনি দু'টি

মিসরীয় কাপড় পরিহিত থাকবেন। তাঁর মন্তক হতে পানির ফোটা ঝরে ঝরে পড়বে যদিও পানিতে সিঞ্চ হবেন না। তিনি ত্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন, জিয়া কর গ্রহণ করবেন না এবং মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। তাঁর যুগে সমস্ত ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। শুধু ইসলাম ধর্মই থাকবে। তাঁর যুগে আল্লাহ আ'আলা মাসীহ দাজালকে ধ্রংস করবেন। অতঃপর সারা জগতে নিরাপত্তা বিরাজ করবে। এমনকি কৃষ্ণ সর্প উটের সঙ্গে, চিতা ব্যাষ্ট্র গাভীর সঙ্গে এবং নেকড়ে বাঘ ছাগলের সঙ্গে চরে বেড়াবে। শিশুরা সাপের সাথে খেলা করবে। তারা তাদের কোন ক্ষতি করবে না। তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন এবং মুসলমানেরা তার জানায়ার নামায পড়াবে।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের এ বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি ইসলামের জন্যে লোকের সঙ্গে জিহাদ করবেন। এ হাদীসের একটি অংশ সহীহ বুখারীর মধ্যেও রয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ, “দুনিয়া ও আখিরাতে হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর বেশী নিকটবর্তী আমিই।” সহীহ মুসলিমে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত রোমকগণ ‘আ’মাক’ বা ‘দাবিকে’ অবতরণ না করবে এবং তাদের মোকাবিলায় মদীনা হতে মুসলিম সেনাবাহিনী গমন না করবে। সে সময় ঐ মুসলমানেরা সারা দুনিয়ার লোকের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়পাত্র হবে।

যখন তারা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে যাবে তখন রোমকগণ তাদেরকে বলবে- ‘আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইনে। আমাদের মধ্য হতে যারা ধর্মান্তরিত হয়ে তোমাদের নিকট চলে এসেছে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই। তোমরা তাদের মধ্য হতে সরে যাও।’ তখন মুসলমানেরা বলবে- আল্লাহর শপথ! এটা কখনও হতে পারে না যে, আমরা আমাদের দুর্বল ভাইদেরকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করে দেবো। অতঃপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। ঐ মুসলিম সেনাবাহিনীর এক ত্তীয়াংশ পরাজিত হয়ে পলায়ন করবে। তাদের তাওবা আল্লাহ তা'আলার কখনও গ্রহণ করবেন না। এক ত্তীয়াংশ শহীদ হয়ে যাবে। তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে উত্তম শহীদ। কিন্তু শেষ ত্তীয়াংশ রোমকদের উপর জয়লাভ করবে। এরপর তারা আর কোন হাঙ্গামায় পতিত হবে না।

তারা (মুসলমানেরা) কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করবে। তারা যায়তুন বৃক্ষের উপর নিজেদের তরবারী ঝুলিয়ে রেখে যুদ্ধলক্ষ মাল বন্টন করতে থাকবে। এমন সময় শয়তান চীৎকার করে বলবেং “তোমাদের স্তানদের মধ্য দাজ্জাল এসে গেছে।” তারা এ মিথ্যা কথাকে সত্য মনে করে এখান হতে বেরিয়ে সিরিয়ায় পৌছে শক্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বৃহৎ ঠিক করতে থাকবে? এমন সময় অন্যদিকে নামাযের ইকামত হবে এবং হ্যরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) অবর্তীর্ণ হয়ে তাদের ইমামতি করবেন। শক্র বাহিনী যখন মুসলমানদেরকে দেখবে তখন তারা গলে যাবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। যদি হ্যরত ঈসা (আঃ) তাদেরকে ছেড়েও দেন তবুও তারা গলে গলেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতে তাদেরকে হত্যা করাবেন এবং হ্যরত ঈসা (আঃ) স্বীয় বর্ণার রক্ত তাদেরকে দেখাবেন।

মুসনাদ-ই-আহমাদ, ও সুনান-ই-ইবনে মাজায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মিরাজের রাত্রে আমি হররত ইবরাহীম (আঃ), হ্যরত মূসা (আঃ) এবং হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তারা পরম্পরের মধ্যে কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন। হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ ‘এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই।’ হ্যরত মূসা (আঃ)-ও একপাই বলেন। কিন্তু হ্যরত ঈসা (আঃ) বলেনঃ “এর সঠিক জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারও নেই। হ্যাঁ, তবে আমার প্রভু আমার নিকট যে অঙ্গীকার করেছেন তা এই যে, দাজ্জাল বের হবে। দু'টি দল তার সঙ্গী হবে। সে আমাকে দেখে এমনভাবে গলে যাবে যেমনভাবে সীসা গলে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্রংস করে দেবেন। এমন কি পাথর ও গাছ বলবে-হে মুসলমান! এখানে আমার পিছনে একটি কাফির আছে, তাকে হত্যা কর। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে ধ্রংস করবেন এবং মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে নিজ নিজ গ্রাম ও শহরে ফিরে যাবে। তারপরে ইয়াজুয় ও মাজুয় বের হবে এবং চতুর্দিক হতে তারা আক্রমণ চালাবে। সমস্ত শহরকে তারা ধ্রংস করবে। যেসব স্থান তারা অতিক্রম করবে ঐ সবই ধ্রংস করে দেবে। যে পানির পার্শ্ব দিয়ে তারা গমন করবে তার সবই পান করে নেবে। গোকেরা পুনরায় আমার নিকট ফিরে আসবে। আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবো। তিনি তখন তাদের সকলকেই একই সাথে ধ্রংস করে দেবেন। কিন্তু তাদের মৃত দেহের দুর্গন্ধকে বাতাস দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়বে। ফলে চতুর্দিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। অতঃপর

এত বেশী বৃষ্টি বর্ষিত হবে যে, এই সমস্ত স্মৃতদেহকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। সে সময় কিয়ামতের সংঘটন এত নিকটবর্তী হবে যেমন পূর্ণ গর্ভবতী নারীর অবস্থা হয়ে থাকে যে, সকালে হবে কি সন্ধ্যায় হবে বা দিনে হবে কি রাত্রে হবে তা তার বাড়ীর লোকেরা জানতে পারে না।”

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হ্যরত আবু নাফরা (রাঃ) বলেনঃ “আমরা জুমআর দিন হ্যরত উসমান ইবনে আবুল আস (রাঃ)-এর নিকট আগমন করি, আমার লিখিত কুরআন কারীমকে তাঁর পঠনের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়াই আমার তাঁর নিকট আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। জুমআর নামাযের সময় হলে তিনি আমাদেরকে বলেনঃ “গোলস করুন।” তারপর তিনি সুগন্ধি নিয়ে আসেন। আমরা সুগন্ধি মেখে মসজিদে হাযির হই এবং একটি লোকের পার্শ্বে বসে পড়ি। এ লোকটি দাজ্জালের হাদীস বর্ণনা করছিলেন। অতঃপর হ্যরত উসমান ইবনে আবুল আস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মুসলমানদের তিনটি শহর হবে, একটি হবে দু'টি সমুদ্রের মিলিত হওয়ার জায়গায়, দ্বিতীয়টি হবে হীরায় এবং তৃতীয়টি হবে সিরিয়ায়।

তারপর মানুষ তিনটি সন্তাসের সম্মুখীন হবে। অতঃপর দাজ্জাল বহিগত হবে। তারা প্রথম শহরটিতে যাবে। তথাকার লোক তিনি অংশে বিভক্ত হবে। এক অংশ বলবে— আমরা তাদের মোকাবিলা করবো এবং কি সংঘটিত হয় তা দেখবো। দ্বিতীয় দলটি গ্রামের লোকের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাবে এবং তৃতীয় দল তাদের নিকটবর্তী শহরে চলে যাবে। দাজ্জালের সঙ্গে সক্তর হাজার লোক থাকবে। তাদের মাথায় মুকুট থাকবে। তাদের অধিকাংশই হবে ইয়াতুনী ও স্ত্রীলোক। এখানকার মুসলমানগণ একটি ঘাঁটিতে অবরুদ্ধ হবে।

তাদের গৃহপালিত পশুগুলো মাঠে চরতে গিয়েছিল ঐগুলোও ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং তাদের বিপদ খুব বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। ক্ষুধার তাড়নায় তাদের অবস্থা অত্যন্ত সংকটময় হয়ে পড়বে। এমনকি তারা তাদের কামানের তারগুলো পুড়িয়ে পুড়িয়ে খেতে থাকবে। এরপ সংকটময় অবস্থায় সমুদ্রের মধ্য হতে তাদের কানে শব্দ আসবে— হে লোক সকল! তোমাদের জন্যে সাহায্য এসে গেছে। এ শব্দ শুনে লোকগুলো খুব খুশী হবে। কেননা, তারা বুঝতে পারবে যে, এটা কোন পরিত্পুর ব্যক্তির কথা।

ঠিক ফজরের নামাযের সময় দ্বিসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) অবতীর্ণ হবেন। মুসলমাদের আমীর তাঁকে বলবেন— ‘হে রহম্মাহ (আঃ)! আগে বাড়ুন এবং

নামায পড়িয়ে দিন।' কিন্তু তিনি বলবেনঃ 'এ উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক কিছু সংখ্যক লোকের আমীর রয়েছে। সুতরাং এ দলের আমীরই তাদের নামাযের ইমাম হবে।' অতএব, তাদের আমীরই ইমাম হয়ে নামায পড়াবেন। নামায শেষ করেই হ্যরত ঈসা (আঃ) বর্ণ হাতে নিয়ে মাসীহ দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবেন। দাজ্জাল তাঁকে দেখামাত্রই সীসার মত গলতে থাকবে। তিনি তার বক্ষে আঘাত করবেন। ঐ আঘাতেই সে ধ্রংস হয়ে যাবে এবং তার সঙ্গীরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করবে। কিন্তু কোন স্থানেই তারা নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে না। এমনকি তারা যদি কোন গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে তবে সেই গাছও বলবে-'হে মুমিন! একটি কাফির আমার নিকট লুকিয়ে রয়েছে।' এ কথা পাথরও বলবে।

সুনান-ই-ইবনে মাজায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর এক ভাষণের কম বেশী অংশ দাজ্জালের ঘটনা বর্ণনায় এবং সে দাজ্জাল হতে ভয় প্রদর্শনেই কাটিয়ে দেন। সে ভাষণে তিনি একথাও বলেনঃ দুনিয়ার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এর অপেক্ষা বড় হাঙ্গামা আর নেই। সমস্ত নবী (আঃ) নিজ নিজ উম্মতকে সতর্ক করে গেছেন। আমি সর্বশেষ নবী এবং তোমরা সর্বশেষ উম্মত। সে নিশ্চিতরূপে তোমাদের মধ্যেই আসবে। যদি আমার জীবন্দশায় সে এসে পড়ে তবে তো আমি তাকে বাধা দান করবো। আর যদি আমার পরে আসে তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আক্রমণ হতে নিজেকে বাঁচাতে হবে। আমি আল্লাহ তা'আলাকেই প্রত্যেক মুসলমানের অভিভাবক করে যাচ্ছি। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে বের হবে। সে ডান ও বামে খুব ঘুরা-ফেরা করবে। হে জনমণ্ডলী ও হে আল্লাহর বান্দাগণ! দেখ, তোমরা অটল থাকবে। জেনে রেখো, আমি তোমাদেরকে তার এমন পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছি যা অন্য কোন নবী স্বীয় উম্মতকে জানিয়ে যাননি। সে প্রথমতঃ দাবী করবে-'আমি নবী।' সুতরাং তোমরা স্মরণ রেখো যে, আমার পরে কোন নবী নেই। অতঃপর এর চেয়েও বেড়ে গিয়ে বলবে-'আমি আল্লাহ।' অতএব তথায় তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহকে এই চোখে কেউ দেখতে পারে না। মৃত্যুর পর তথায় তাঁর দর্শন লাভ ঘটতে পারে। আরও স্মরণ রেখো যে, সে এক চক্ষু বিশিষ্ট হবে এবং তোমাদের প্রভু এক চক্ষু বিশিষ্ট নন। তার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে 'কাফির' লিখিত থাকবে যা প্রত্যেক শিক্ষিত অশিক্ষিত মোটকথা প্রত্যেক ঈমানদারই পড়তে পারবে।

তার সাথে আগুন থাকবে ও বাগান থাকবে। তার আগুন হবে আসলে জান্নাত এবং বাগানটি হবে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম। তোমাদের মধ্যে যাকে সে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে সে যেন আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সূরা-ই-কাহাফের প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে। ঐ আগুন তার জন্যে ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে। যেমন হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর নমরাদের আগুন শান্তিদায়ক হয়েছিল। তার এক হাঙ্গামা এও হবে যে, সে এক বেদুঈনকে বলবে-'আমি যদি তোমার মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করতে পারি তবে কি তুমি আমাকে প্রভু বলে স্বীকার করবে?' এমন সময়ে দু'জন শয়তান তার পিতা-মাতার আকারে প্রকাশিত হবে এবং তাকে বলবে-'বৎস! এটাই তোমার প্রভু। সুতরাং তাকে মেনে নাও।'

তার আর একটা ফির্তনা এও হবে যে, তাকে একটি লোকের উপর জয়যুক্ত করা হবে। সে তাকে করাত দ্বারা ফেড়ে দু'টুকরো করে দেবে। তারপর সে জনগণকে বলবেঃ আমার এ বান্দাকে তোমরা দেখ, এখন আমি তাকে জীবিত করবো। কিন্তু সে পুনরায় এ কথাই বলবে যে, তার প্রভু আমি ছাড়া অন্য কেউ। অতঃপর এ দু' দুর্বৃত্ত তাকে উঠা-বসা করাবে এবং বলবেঃ 'তোমার প্রভু কে?' সে উভরে বলবেঃ 'আমার প্রভু আল্লাহ' এবং তুমি তার শক্র দাঙ্গাল। আল্লাহর শপথ! এখন তো আমার পূর্বাপেক্ষাও বেশী বিশ্বাস হয়েছে।' অন্য সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'এ মুমিন ব্যক্তি আমার উচ্চতের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ শ্রেণীর জান্নাতের অধিকারী হবে।' হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এ হাদীসটি শুনে আমাদের ধারণা হয় যে, এ লোকটি হ্যরত উমার ইব্নে খাতাবই (রাঃ) হবেন, তাঁর শাহাদাত লাভ পর্যন্ত আমাদের ধারণা এটাই ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ তার একটি হাঙ্গামা এও হবে যে, সে আকাশকে পানি বর্ষণ করার নির্দেশ দেবে এবং আকাশ হতে পানি বর্ষিত হবে। সে যমীনকে ফসল উৎপাদন করার নির্দেশ দেবে এবং যমীন হতে ফসল উৎপাদিত হবে।

তার আর একটি ফির্তনা এও হবে যে, সে একটি গোত্রের নিকট যাবে এবং তারা তাকে বিশ্বাস করবে না। সে সময়ই তাদের সমস্ত জিনিস ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর সে অন্য গোত্রের নিকট যাবে। তৎক্ষণাত তার হৃকুমে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং যমীনে ফলস উৎপাদিত হবে। তাদের গৃহপালিত পশু পূর্বাপেক্ষা বেশী মোটা-তাজা ও দুঃখবর্তী হয়ে যাবে। তারা মুক্তা ও মদীনা

ছাড়া যমীনের সমস্ত জায়গায় ঘুরে বেড়াবে। যে যখন মদীনামুখী হবে তখন সারা পথে সে তরবারীধারী ফেরেশতাগণকে দেখতে পাবে। সে তখন ‘সানতার’ শেষ প্রান্তে ‘যারীবে আহমারের’ নিকট থেমে যাবে। অতঃপর মদীনায় তিনটি ভূমিকম্প হবে। ফলে মদীনায় যত মুনাফিক নর ও নারী থাকবে সবাই মদীনা হতে বেরিয়ে গিয়ে দাজ্জালের সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে যাবে। এভাবে মদীনা নিজের মধ্য হতে অপবিত্র লোকদেরকে দূর করে দেবে যেমন লোহার ভাটা লোহার মরিচা দূর করে থাকে। সেদিনের নাম হবে ‘ইয়াওমুল খালাস’ (মুক্তির দিন)।

হ্যরত উম্মে শুরায়েক (রাঃ) রাসূলুরলাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সেদিন আরববাসী কোথায় থাকবে?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ ‘প্রথমতঃ তারা থাকবেই খুব কম এবং তাদের অধিকাংশই থাকবে বাইতুল মুকাদ্দাসে। তাদের ইমাম হবে একজন সৎ ব্যক্তি। সে ফজরের নামায পড়াতে থাকবে এমন সময় হ্যরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) অবর্তীর্ণ হবেন। ঐ ইমাম তখন পিছনে সরতে থাকবে যেন ঈসা (আঃ) ইমামতি করেন। কিন্তু তিনি তার কঙ্কে হাত রেখে বলবেনঃ ‘তুমি সামনে এগিয়ে নামায পড়িয়ে দাও, ইকামত তোমার জন্যেই দেয়া হয়েছে।’ সুতরাং তাদের ইমামই নামায পড়িয়ে দেবে। নামায শেষে তিনি বলবেনঃ ‘দরজা খুলে দাও।’ দরজা খুলে দেয়া হবে। এদিকে দাজ্জাল সন্তুর হাজার সৈন্য নিয়ে হাফির হবে। তাদের মন্তকে মুকুট থাকবে এবং তাদের তরবারীর উপর সোনা থাকবে। দাজ্জাল তাঁকে দেখে এমনভাবে গলতে থাকবে যেমনভাবে পানিতে লবণ গলে থাকে। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ পালাতে শুরু করবে। কিন্তু তিনি বলবেনঃ ‘আল্লাহ তা’আলা এটা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, তুমি আমার হাতেই একটা মার থাবে, সুতরাং ওটা হতে রক্ষা পেতে পার না।’ অতএব, তিনি তাকে পূর্ব দরজা লুদ-এর নিকট ধরে নেবেন এবং সেখানেই তাকে হত্যা করে ফেলবেন। তখন ইয়াহুন্দীরা হতবুদ্ধি হয়ে যাবে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করবে। কিন্তু তারা কোথাও মাথা লুকানোর জায়গা পাবে না। প্রত্যেক পাথর, বৃক্ষ, দেয়াল ও জীবজন্তু বলতে থাকবেঃ ‘হে মুসলমান! এখানে ইয়াহুন্দী রয়েছে। এসে তাকে হত্যা কর।’ তবে বাবলা গাছ হচ্ছে ইয়াহুন্দীদের গাছ। সে কিন্তু বলবে না।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “সে চলিশ বছর পর্যন্ত থাকবে। বছর হবে অর্ধ বছরের মত, বছর হবে মাসের মত, মাস হবে জুম‘আর মত এবং শেষ দিনগুলো হবে ‘শারারার’ মত। তোমাদের কোন লোক সকালে শহরের একটি দরজা হতে চলতে আরম্ভ করে দ্বিতীয় দরজায় পৌছতে পারবে ন্য। এমন সময়েই সন্ধ্যা হবে যাবে।” জনগণ জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই ছোট দিনগুলোতে আমরা কিভাবে নামায আদায় করবো?” তিনি বলেনঃ “তোমরা এ দীর্ঘ দিনগুলোতে যেমনভাবে অনুমান করে নামায পড়ছো, তখনও সেভাবেই অনুমান করে নামায পড়বে।”

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তারপর হ্যরত ইসা (আঃ) আমার উম্মতের মধ্যে শাসনকর্তা হবেন, ন্যয়পরায়ণ হবেন, ইমাম হবেন এবং ন্যায় বিচারক হবেন। তিনি ত্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন এবং জিয়িয়া কর উঠিয়ে দেবেন। তিনি সাদকা গ্রহণ করবেন না। সূতরাং ছাগল ও উটের উপর কোন চেষ্টা করা হবে না। হিংসা বিদ্যে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হবে। প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণীর বিমক্রিয়া নষ্ট করে দেয়া হবে। শিশু স্বীয় অঙ্গুলি সাপের মুখে প্রবেশ করাবে। কিন্তু ওটা তার কোন ক্ষতি করবে না। ছেলেরা সিংহের সাথে খেলা করবে, অথচ তাদের কোন বিপদ ঘটবে না। নেকড়ে বাঘ ছাগলের সঙ্গে এমন গলায় গলায় মিলে থাকবে যে, যেন সে পাহারাদার কুকুর। সমগ্র জগৎ ইসলাম ও ন্যায়নীতিতে এমনভাবে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে যেমনভাবে বর্তন পানিতে পরিপূর্ণ হয়। সকলের একই ‘কালেমা’ হয়ে যাবে। আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করা হবে না। যুদ্ধবিশ্বহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। কুরাইশ স্বীয় রাজ্য ছিনিয়ে নেবে। পৃথিবী সাদা চাঁদির ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। হ্যরত আদম (আঃ)-এর বরকতময় যুগের ন্যায় ফসল উৎপাদিত হবে। একটা দলের পরিত্তির জন্যে এক গুচ্ছ আঙ্গুরই যথেষ্ট হবে। এক একটি ডালিম ফল এত বড় হবে যে, একটি দল একটি ডালিম খেয়ে পরিত্পত্তি হয়ে যাবে। বলদ এরূপ মূল্যে পাওয়া যাবে’ (অর্থাৎ বলদের মূল্য খুব বেশী হবে) এবং ঘোড়া কতগুলো দিরহামের বিনিময়েই পাওয়া যাবে।”

জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঘোড়ার মূল্য ত্রাস পাওয়ার কারণ কি?” তিনি বলেনঃ “কেননা, যুদ্ধে ওর সোয়ারী মোটেই নেয়া হবে না।” তাঁরা প্রশ্ন করেনঃ “বলদের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কি?” তিনি বলেনঃ “কেননা, সমগ্র পৃথিবীতে কৃষিকার্য শুরু হয়ে যাবে।” দাঙ্গাল প্রকাশিত

হওয়ার তিন বছর পূর্বেই ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। প্রথম বছরে বৃষ্টির এক তৃতীয়াংশ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে বন্ধ করে দেয়া হবে। তারপরে ভূমির উৎপাদনেরও এক তৃতীয়াংশ কমে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় বছরে আকাশকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, সে যেন বৃষ্টি দুই তৃতীয়াংশ বন্ধ রাখে এবং এ নির্দেশ ভূমিকেও দেয়া হবে যে, সে যেন উৎপাদনের দুই তৃতীয়াংশ কম করে। তৃতীয় বছর আকাশ হতে বৃষ্টির এক ফোটাও বর্ষিত হবে না। অনুরূপভাবে ভূমিতে একটি চারাগাছও জন্ম নেবে না। সমস্ত জীবজগ্ত এ দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে রক্ষা করবেন সেই রক্ষা পাবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ ‘তাহলে সে সময় মানুষ কিরূপে জীবিত থাকবে?’ তিনি বলেনঃ “সে সময় তাদের খাদ্যের স্থলবর্তী হবে তাদের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, আল্লাহ আকবার উচ্চারণ করা, সুবহানাল্লাহ পাঠ করা এবং আলহামদুল্লাহ বলা।” ইমাম ইবনে মাজা (রঃ) বলেন, আমার উস্তাদ তাঁর উস্তাদ হতে শুনেছেন, তিনি বলতেনঃ “এ হাদীসটি এ যোগ্যতা রাখে যে”, শিশুদের শিক্ষক শিশুদেরকেও এটা শিক্ষা দেবেন, এমনকি লিখিয়ে দেবেন, যেন তাদেরও এটা স্মরণ থাকে।” এ হাদীসটি এ সম্বন্ধে গারীব বটে, কিন্তু এর কোন কোন অংশের প্রমাণ স্বরূপ অন্য হাদীসও রয়েছে। এ হাদীসের মতই একটি হাদীস হ্যরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আমরা ওটাও এখানে বর্ণনা করছি।

সহীহ মুসলিম শরীফে হ্যরত নাওয়াস ইবনে শামআন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা সকালে দাজ্জালের বর্ণনা দেন এবং এমনভাবে তাকে উঁচু ও নীচু করেন যে, আমাদের মনে হয় না জানি সে মদীনার খেজুরের বাগানেই বিদ্যমান রয়েছে। অতঃপর আমরা তাঁর নিকট ফিরে আসলে আমাদের চেহারা দেখে আমাদের মনের অবস্থা বুঝে নেন এবং জিজ্ঞেস করেনঃ “ব্যাপার কি?” তখন আমরা তা বর্ণনা করলে তিনি বলেনঃ “তোমাদের উপর দাজ্জালের চেয়েও আর একটা বেশী ভয় রয়েছে। আমার বিদ্যমানতায় যদি সে বের হয় তবে আমি তাকে বুঝে নেবো। কিন্তু যদি আমার পরে সে বের হয় তবে প্রত্যেক মুসলমানকেই তাকে বাধা দিতে হবে। আমি মহান আল্লাহকেই প্রত্যেক মুসলমানের প্রতিনিধি বানিয়ে দিয়েছি। জেনে রেখো, সে যুবক হবে, টেরা চক্ষু বিশিষ্ট হবে। এটুকু বুঝে নাও যে, সে দেখতে অনেকটা আবদুল উয্যা ইবনে কাতনের মত হবে। তোমাদের যে তাকে দেখবে সে যেন সূরা-ই-কাহাফের প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে। সে সিরিয়া ও

ইরাকের মধ্যবর্তী প্রান্ত হতে বের হবে এবং ডানে-বামে ঘুরে বেড়াবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা (ঈমানের উপরে) খুব অটল থাকবে।” আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সে কতদিন অবস্থান করবে। তিনি বললেনঃ “চল্লিশ দিন। এক দিন হবে এক বছরের সমান, এক দিন হবে এক মাসের সমান, একদিন হবে এক জুমআর সমান এবং অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের সাধারণ দিনগুলোর মত হবে।”

অতঃপর আমরা জিজ্ঞেস করি, যে দিনটি এক বছরের সমান হবে সেদিনে কি একদিনের নামায়ই যথেষ্ট হবে? তিনি বলেনঃ ‘না, বরং তোমরা অনুমান করে নেবে।’ আমরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাদের চলন গতি কিরূপ দ্রুত হবে? তিনি বলেনঃ মেঘ যেমন বাতাসে তাঢ়িত হয়ে চলতে থাকে। সে একটি গোত্রকে নিজের দিকে আহ্বান করবে। তারা তাকে মেনে নেবে। তখন তাদের উপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, যমীন হতে ফলস উৎপাদিত হবে এবং তাদের গৃহপালিত পশুগুলো মোটা তাজা হয়ে যাবে ও খুব বেশী দুধ দেবে। সে আর এক সম্প্রদায়ের নিকট যাবে। তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলবে ও অস্বীকার করবে। সে সেখান হতে ফিরে আসবে। তখন তাদের হাতে মাল-ধন কিছুই থাকবে না। সে অনুর্বর ভূমির উপর দাঁড়িয়ে নির্দেশ দেবে, “হে যমীন! তোমার ধনাগারকে বের করে দাও।” তখন যমীনের মধ্য হতে ধন-ভাণ্ডার বেরিয়ে আসবে।

সে তখন মৌমাছির মত ঐ ধনের পিছনে ফিরতে থাকবে। সে একজন নব্য যুবককে আহ্বান করবে এবং তাকে হত্যা করতঃ দু'টুকরো করে এতদূরে নিক্ষেপ করবে যতো দূরে একটি তীর চলে থাকে। তারপরে তাকে ডাক দেবে এবং সে তখন জীবিত হয়ে হাসতে হাসতে তার নিকট চলে আসবে। তখন আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে পাঠিয়ে দেবেন। তিনি দু'টি চাদর পরিহিত হয়ে দু'জন ফেরেশতার ডানার উপর হাত রেখে দামেক্সের পূর্বদিকের সাদা স্তম্ভের নিকট অবতরণ করবেন। যখন তিনি মস্তক ঝুঁকাবেন তখন তাঁর মস্তক হতে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পানি ঝরে পড়বে এবং যখন তিনি মস্তক উত্তোলন করবেন তখন ঐ ফোঁটাগুলো মুক্তার মত গড়িয়ে পড়বে। যে কাফির পর্যন্ত তাঁর শ্বাস পৌছবে, সে মরে যাবে এবং তাঁর শ্বাস ঐ পর্যন্ত পৌছবে যে পর্যন্ত দৃষ্টি পৌছে থাকে।

তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্বাবন করবেন এবং ‘লুদ’ নামক স্থানে তাকে ধরে ফেলে সেখানেই হত্যা করবেন। তারপরে তিনি ঐ লোকদের নিকট আসবেন যারা এ হঙ্গমায় রক্ষা পেয়ে যাবে। তিনি তাদের চেহারায় হাত ফিরিয়ে দেবেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে হ্যরত ইসা (আঃ)-এর নিকট অহী আসবে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে বলবেন-‘আমি আমার এমন বান্দাহদেরকে প্রেরণ করেছি যাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেউই করতে পারবে না। তুমি আমার এ বিশিষ্ট বান্দাহদেরকে তুর পর্বতের নিকট নিয়ে যাও।’ তারপর ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হবে এবং তারা চতুর্দিক হতে লাফাতে লাফাতে চলে আসবে। তাদের প্রথম দলটি ‘বাহীরা-ই-তাবারিয়ায়’ আসবে এবং ওর সমস্ত পানি পান করে নেবে। তাদের পর পরই যখন অন্য দলটি আসবে তখন তারা ওটাকে এমন শুষ্ক অবস্থায় পাবে যে, তারা বলবে, সম্ভবতঃ এখানে কোন সময় পানি ছিল। হ্যরত ইসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনগণ তথায় এমনভাবে অবরুদ্ধ থাকবেন যে, একটি বলদের মাথাও তাঁদের নিকট এমন পছন্দনীয় মনে হবে যেমন আজ তোমাদের নিকট একশটি স্বর্ণমুদ্রা পছন্দনীয়। তখন আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় শক্রদেরকে গলগও রোগে আক্রান্ত করবেন। ফলে তারা সবাই একই সঙ্গে ধৰ্ম হয়ে যাবে।

অতঃপর হ্যরত ইসা (আঃ) স্বীয় সঙ্গীগণসহ যমীনে অবতরণ করবেন। কিন্তু যমীনে অর্ধহাত পরিমাণ জায়গাও এমন পাবেন না যা তাদের মৃতদেহ ও দুর্গন্ধ হতে শূন্য থাকবে। পুনরায় তাঁরা আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা জানাবেন। ফলে আল্লাহ তা‘আলা উটের ঘাড়ের মত এক প্রকার পাখি পাঠিয়ে দেবেন। ঐ পাখিগুলো তাদের সমস্ত মৃতদেহ উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছেমত জায়গায় নিক্ষেপ করবে। অতঃপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। ফলে সমস্ত যমীন হাতের তালুর মত পরিষ্কার পরিষ্কৃত হয়ে যাবে। তারপর যমীনকে শস্য এবং ফল উৎপাদনের ও বরকত ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেয়া হবে। সেদিন একটি ডালিম ফল এক দল লোকের পক্ষে যথেষ্ট হবে। তারা সবাই ওর ছালের নীচে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারবে। একটি উষ্ণীর দুঁষ্ট একটি গোটা সম্প্রদায়ের লোকও পান করে শেষ করতে পারবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা এক মৃদু ও নির্মল বায়ু প্রবাহিত করবেন যা সমস্ত ইমানদার নর ও নারীর বগলের নিম্নদেশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রাণ বায়ুও নির্গত হয়ে যাবে। দুষ্ট ও বেষ্টিমান লোকেরা বেঁচে থাকবে।

তারা গাধার মত পরম্পর ঝগড়া বিবাদে লিঙ্গ থাকবে। তাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে। মুসনাদ-ই-আহ্মাদের মধ্যেও একপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। ওটা আমরা ইনশাআল্লাহ (সূরা-ই-আমিয়ার) **‘هَتَّىٰ إِذَا فُتِّحَتْ بِالْجُرْجُونِ’** (২১: ৯৬) -এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করবো।

সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর নিকট বললেনঃ “আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, আপনি নাকি বলে থাকেন-কিয়ামত অমুক অমুক জায়গা পর্যন্ত পৌছে যাবে, এটা কি ব্যাপার? তিনি তখন ‘সুবহানাল্লাহ’ এবং ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পর বললেনঃ ‘আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে, এখন তোমাকে কোন হাদীস শুনাবো না। আমি তো একথা বলেছিলাম যে, কিছুকাল পরে তোমরা বড় বড় ব্যাপার সংঘটিত হতে দেখবে, যেমন বায়তুল্লাহকে জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং এই হবে, এই হবে ইত্যাদি।’” অতঃপর তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “দাজ্জাল বের হবে এবং আমার উম্মতের মধ্যে চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবস্থান করবে। আমার জানা নেই যে, সেটা চল্লিশ মাস হবে অথবা চল্লিশ বছর হবে।”

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে প্রেরণ করবেন। তাঁর আকৃতি হ্যরত উরওয়া ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মত। তিনি দাজ্জালকে অনুসন্ধান করবেন। তারপর সাত বছর পর্যন্ত মানুষ এমন মিলে মিশে থাকবে যে, দু'জনের মধ্যে মোটেই কোন শক্রতা থাকবে না। অতঃপর সিরিয়ার দিক হতে একটা ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হবে, যা সমস্ত ঈমানদারের মৃত্যু ঘটিয়ে দেবে। যার অন্তরে অণুপরিমাণে সততা বা ঈমান থাকবে, সে পর্বতের গুহায় অবস্থান করলেও মৃত্যুমুখে পতিত হবে। দুষ্ট ও বেঙ্গমান লোকেরাই বেঁচে থাকবে, যারা পাখীর ন্যায় হালকা হবে এবং চতুর্পদ জন্মের ন্যায় মন্তক বিশিষ্ট হবে। ভাল ও মন্দের মধ্যে প্রভেদ করার শক্তি তাদের থাকবে না। শয়তান মানুষের রূপ ধরে তাদের নিকট আগমন করতঃ তাদেরকে মৃত্যি পূজার দিকে আকৃষ্ট করবে। কিন্তু তাদের এ অবস্থা সত্ত্বেও তাদের জন্যে আহার্যের দরজা খোলা থাকবে এবং জীবন খুবই শান্তিতে অতিবাহিত হবে। তারপর শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে। ওর ফলে মানুষ পতিত হতে থাকবে। একটি লোক যে তার উদ্ধৃতগুলোকে পানি পান করাবার জন্যে তাদের চৌবাচ্চা ঠিক করতে থাকবে সেই সর্বপ্রথম শিঙার শব্দ শুনতে পাবে। এর ফলে সে এবং অন্য সমস্ত লোক অচৈতন্য হয়ে পড়বে।

মোটকথা সকলেই ধ্রংস হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা হবে শিশিরের বা ছায়ার মত। তার ফলে দ্বিতীয়বার দেহ সৃষ্টি হবে। তারপর পুনরায় শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন সবাই আবার জীবিত হয়ে উঠবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে—“হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে চল।” আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ﴿وَقُفُوا هُمْ إِنْهُمْ مَسْئُولُونَ﴾<sup>১১১</sup> অর্থাৎ ‘(হে ফেরেশতাগণ) তাদেরকে থামিয়ে দাও, নিশ্চয়ই তারা (প্রশ্ন) জিজ্ঞাসিত হবে।’ (৩৭: ২৪) এরপর বলা হবে—‘জাহানামের অংশ বের করে নাও।’ জিজ্ঞেস করা হবে—‘কতোর মধ্য হতে কতো জনকে?’ উত্তরে বলা হবে—‘প্রতি হাজারে ন’শ নিরানবই জনকে।’ (আল্লাহ) বলবেন—‘এটা এমন দিন যা ছেলেদেরকে ঝুড়ে করে দেবে এবং এটা এমন দিন যাতে পায়ের গোছা খুলে যাবে।’ মুসনাদ-ই-আহমাদে হ্যরত হারেস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আরাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ ইবনে মারইয়াম (আঃ) ‘বাব-ই-লুদের’ নিকট কিংবা ‘লুদের’ পার্শ্বে মাসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন। জামেউত তিরিমিয়ীর মধ্যে বাব-ই-লুদ রয়েছে এবং এ হাদীসটি বিশুদ্ধ। এর পরে ইমাম তিরিমিয়ী (রঃ) আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ)-এর নাম নিয়েছেন যে, তাদের হতেও এ অধ্যায়ের হাদীসগুলো বর্ণিত আছে, যেগুলোর মধ্যে দাজ্জালের হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর হাতে নিহত হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। শুধুমাত্র দাজ্জালের বর্ণনার হাদীসগুলোই তো অসংখ্য রয়েছে, যেগুলো একত্রিত করা খুবই কঠিন।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, আরাফা হতে আসার সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের এক মজলিসের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। সে সময় তথায় কিয়ামত সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। তিনি তখন বলেনঃ “যে পর্যন্ত দশটি ব্যাপার সংঘটিত না হবে সে পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। (১) পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া। (২) ধূয়া নির্গত হওয়া। (৩) ‘দারবাতুল আরয়ের’ বের হওয়া। (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন ঘটা। (৫) ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া। (৬) দাজ্জালের আবির্ভাব। (৭) যমীনের তিন জায়গা ধ্বসে যাওয়া। (৭ক) পূর্বে (৮খ) পশ্চিমে (৯গ) আরব উপনিষদে এবং (১০) আদন হতে একটা আগুন বের হওয়া যা লোকদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় একত্রিত করবে। ওটা (আগুন) রাত্রিও তাদের সাথে অতিবাহিত করবে। যখন দুপুরের সময় তারা বিশ্রাম গ্রহণ করবে তখনও এ আগুন তাদের সঙ্গেই থাকবে।”

উক্ত হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও সুনানের মধ্যে রয়েছে। হ্যরত হ্যাইফা ইবনে উসায়েদ গিফারী (রাঃ) হতেও মাওকুফ রূপে বর্ণিত আছে। অতএব রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ মুতাওয়াতির হাদীসগুলো যা হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ), হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হ্যরত উসমান ইবনে আবুল আস (রাঃ), হ্যরত আবু উমামা (রাঃ), হ্যরত লাওয়াস ইবনে সামাআন (রাঃ), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ), হ্যরত মাজমা' ইবনে জারিয়া (রাঃ), হ্যরত আবু শুরাইহা (রাঃ) এবং হ্যরত হ্যাইফা ইবনে উসায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, হ্যরত ঈসা (আঃ) (আকাশ হতে) অবতরণ করবেন। সাথে সাথে কিভাবে, কোথায় এবং কোন্ সময় তাঁর অবতরণ ঘটবে তাতে এটাও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ ফজরের নামায়ের ইকামতের সময় সিরিয়ার দামেক শহরের পূর্বদিকের স্তম্ভের উপর তিনি অবতরণ করবেন।

সেই যুগে অর্থাৎ ৭৪১ হিঃ সালে ‘জামে’ উমভী’র স্তম্ভটি সাদা পাথরে মজবুত করে বানানো হয়েছে। কেননা, ওটা আগনে দুর্ভীভূত হয়েছিল, যে আগন সম্ভবতঃ অভিশঙ্গ শ্রীষ্টানেরাই লাগিয়েছিল। এতে বিশ্বয়ের কি আছে যে, এটাই হয়তো সেই স্তম্ভ যার উপর হ্যরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন এবং শূকরকে হত্যা করবেন, ত্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন, জিয়িয়া কর উঠিয়ে দেবেন ও ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করবেন না। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ সংবাদ দিয়েছেন ও তাকে সাব্যস্ত করেছেন। এটা এই সময় হবে যখন সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হবে এবং মানুষ যখন হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসরণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। যেমন কুরআন কারীমে উক্ত হয়েছে، *وَإِنَّهُ لِعِلْمٍ لِلسَّاعَةِ* (৪৩: ৬১) এবং একটি পঠনে *لَعْلَم* লা'আলামুন রয়েছে। অর্থাৎ হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ কিয়ামতের (কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার) একটি বড় নির্দর্শন। কেননা, তিনি দাজ্জালের আগমনের পর আগমন করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।

যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধকের তিনি ব্যবস্থা রাখেননি। তাঁর সময়েই ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব ঘটবে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আর বরকতে

ধ্রংস করবেন। ইয়াজুজ ও মাজুজের বের হওয়ার সংবাদ কালাম পাকের মধ্যেও রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

هَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَاجِوْجَ وَمَاجِوْجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ . وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا

অর্থাৎ ‘যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। সত্য প্রতিশ্রূতি নিকটবর্তী হলে কাফেরদের চক্ষু উচ্চে স্থির হয়ে যাবে; ।’(২১: ৯৬-৯৭) অর্থাৎ তাদের বের হওয়াও কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি প্রমাণ।

হ্যরত ইসা (আঃ)-এর বিশেষণঃ পূর্ব বর্ণিত দু'টি হাদীসেও তাঁর বিশেষণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হ্যরত আবু হৱাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘মিরাজের রাত্রে আমি হ্যরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি মধ্যম দেহ ও পরিষ্কার চুল বিশিষ্ট, যেমন শানুআহ গোত্রের লোক হয়ে থাকে। হ্যরত ইসা (আঃ)-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছি। তিনি লাল বর্ণের এবং মধ্যম দেহ বিশিষ্ট। মনে হচ্ছিল যে, যেন তিনি সবেমাত্র গোসল খানা হতে বের হয়ে এলেন। হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-কেও আমি দেখেছি। তিনি একেবারে আমার মতই ছিলেন।

সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “হ্যরত ইসা (আঃ) রক্তিম বর্ণ, কোঁকড়ানো চুল এবং চওড়া বক্ষ বিশিষ্ট ছিলেন। হ্যরত মূসা (আঃ) গোধূম বর্ণ, মোটা দেহ এবং সোজা চুল বিশিষ্ট ছিলেন—যেমন যিতের লোক হয়ে থাকে।” অনুরূপভাবে তিনি দাঙ্গালের শরীরিক গঠনও বর্ণনা করেছেন যে, তার ডান চক্ষু কানা হবে যেন ওটা ফুলা আঙ্গুর। তিনি বলেনঃ কা'বা শরীফের নিকটে আমাকে স্বপ্নে দেখান হয়েছে যে, একজন খুবই গোধূম বর্ণের লোক, যাঁর মাথার চুল তাঁর দু'কাঁধ পর্যন্ত লটকে ছিল এবং চুল ছিল পরিপাটি। তাঁর মস্তক হতে পানির ফেঁটা ঝরে ঝরে পড়ছিল। তিনি দু'ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করি— ইনি কে? তখনই আমাকে বলা হয়—‘ইনি হচ্ছেন হ্যরত মাসীহ ইবনে মারইয়াম (আঃ)।’ তাঁর পিছনে আমি আর একটি লোককে দেখতে পাই যার ডান চক্ষুটি কানা ছিল। ইবনে কাতানের সঙ্গে সে অনেকটা সাদৃশ্যযুক্ত ছিল।

তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো । সেও দু'ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে তাওয়াফ করছিল । আমি জিজ্ঞেস করি-এটা কে? বলা হয়- ‘মাসীহ দাজ্জাল ।’

সহীহ বুখারী শরীফের আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, হ্যরত উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ‘আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত ঈসা (অঃ)-কে লাল বর্ণের বলেননি, বরং গোধূম বর্ণের বলেছেন ।’ পরে উপরে বর্ণিত পূর্ণ হাদীসটি রয়েছে । হ্যরত যুহুরী (রঃ) বলেন যে, ইবনে কাতান খুয়াআহ্ গোত্রের একটি লোক ছিল । সে অজ্ঞতার মুগে মারা গিয়েছিল । পূর্বে ঐ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে যাতে রয়েছে যে, হ্যরত মাসীহ (আঃ) দুনিয়ায় অবতীর্ণ হওয়ার পর এখানে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন । অতঃপর তিনি মারা যাবেন এবং মুসলমানেরা তাঁর জানায়ার নামায পড়বে ।

তবে সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে রয়েছে যে, তিনি এখানে সাত বছর অবস্থান করবেন । তাহলে খুব সম্ভব, যে হাদীসে চল্লিশ বছর অবস্থানের কথা রয়েছে তা ঐ সময় সহই হবে যা তিনি তাঁর আকাশে উঠে যাওয়ার পূর্বে পৃথিবীতে অতিবাহিত করেছিলেন । যে সময় তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল সে সময় তাঁর বয়স ছিল তেক্রিশ বছর । পরে এসে তিনি পৃথিবীতে সাত বছর অবস্থান করবেন । তাহলে পূর্ণ চল্লিশ বছর হয়ে যাবে । আল্লাহ তা'আলাই সব চেয়ে ভাল জানেন । ( ইবনে আসাকের)

কেউ কেউ বলেন যে, যখন তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয় তখন তাঁর বয়স ছিল দেড় বছর । কিন্তু এটা একেবারেই বাজে কথা । তবে হাফিয় আবুল কাসিম (রঃ) স্বীয় ইতিহাসে পূর্ব যুগীয় কোন কোন মনীষী হতে এটাও এনেছেন যে, হ্যরত ঈসা (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কক্ষে তাঁর সাথেই সমাধিস্থ হবেন । সুতরাং এ সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘উত্থান দিবসে সে তাদের উপর সাক্ষ্য দান করবে ।’ অর্থাৎ এ কথার তিনি সাক্ষ্য দান করবেন যে, তিনি আল্লাহর রিসালাত তাঁদের নিকট পৌছিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজেও আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব স্বীকার করেছিলেন । যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরাঃ মায়েদার শেষ দিকে বলেনঃ ﴿عَزِيزٌ هُوَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى ابْنَ مُرِيمٍ، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ﴾ (৫: ১১৬-১১৮) পর্যন্ত ।

সূরাঃ নিসা ৮

১৬০। আমি ইয়াহুদীদের  
অবাধ্যতা হেতু তাদের জন্যে  
যে সমস্ত পবিত্র বস্ত্র ও বৈধ  
ছিল তা তাদের প্রতি অবৈধ  
করেছি এবং যেহেতু তারা  
অনেককে আল্লাহর পথ হতে  
প্রতিরোধ করতো ।

১৬১। এবং তারা সুদ নিষিদ্ধ  
হওয়া সত্ত্বেও ধ্রুণ করতো  
এবং তারা অন্যায়ভাবে  
লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস  
করতো এবং আমি তাদের  
মধ্যস্থ অবিশ্বাসীদের জন্যে  
যত্নগাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে  
রেখেছি ।

১৬২। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা  
জ্ঞানে সুস্থিতিষ্ঠিত এবং  
বিশ্বাসীগণের মধ্যে যারা  
তোমার প্রতি যা অবর্তীণ  
হয়েছে এবং তোমরা পূর্বে যা  
অবর্তীণ হয়েছিল তৎপ্রতি  
বিশ্বস স্থাপন করে এবং যারা  
নামায প্রতিষ্ঠাকারী ও যাকাত  
প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও  
পরকালের প্রতি বিশ্বাস  
স্থাপনকারী, তাদেরকেই আমি  
প্রচুর প্রতিদান প্রাদৰ্শ করবো ।

১৬০- فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا  
حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجْلَتْ  
لَهُمْ وَيُصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
كَثِيرًا ۝

১৬১- وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهَا  
عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِ  
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

১৬২- لِكِنَ الرِّسْخُونَ فِي  
الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ  
يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا  
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقْرِئِينَ  
الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتَوْنَ الزَّكُوْةَ  
وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجْرًا  
عَظِيمًا ۝

এ আয়াতের দু'টি ভাবার্থ হতে পারে। একটি তো এই যে, এটা 'হরমতে কাদরী' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এটা লিখেই রেখেছিলেন যে, এ লোকগুলো স্বীয় গ্রন্থকে পরিবর্তিত করবে এবং বৈধ জিনিসকে নিজেদের উপর অবৈধ করে নেবে। ওটা শুধুমাত্র তাদের কঠোরতার কারণেই ছিল। দ্বিতীয় ভাবার্থ এই যে, এটা ছিল 'শারঙ্গ হুরমাত' অর্থাৎ তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে যে কতক জিনিস তাদের উপর হালাল ছিল তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাদের কিছু অপরাধের কারণে হারাম করে দেয়া হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَّاً لِبْنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ  
قَبْلِ أَنْ تَنْزَلَ التُّورِيهُ

অর্থাৎ “প্রত্যেক খাদ্যই বানী ইসরাইলের জন্যে হালাল ছিল। কিন্তু তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাইল নিজের উপর যা হারাম করে নিয়েছিল তাই তাদের উপর হারাম করা হয়েছিল” (৩৪: ৯৩) এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বানী ইসরাইলের উপর সমস্ত খাদ্যই বৈধ ছিল। কিন্তু হ্যরাত ইসরাইল (আঃ) নিজের উপর উটের গোশত ও দুধ হারাম করেছিলেন। সুতরাং তাওরাতে তাদের জন্য ঐ দু'টো জিনিস হারাম করে দেয়া হয়। যেমন সূরা-ই আনআমে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنْمَ حَرَمَنَا  
عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَابِيَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظِيمٍ ذَلِكَ  
جَزِينَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ -

অর্থাৎ “এবং ইয়াতুন্দীদের জন্যে আমি সমস্ত খুর বিশিষ্ট পশু অবৈধ করেছিলাম এবং ছাগ, গরু ও ওদের চর্বি যা পৃষ্ঠে ও অন্তে সংযুক্ত অথবা অস্থিতে সংলিঙ্গ-তন্ত্যতাত তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম; এভাবে আমি তাদের অবাধ্যতার জন্যে তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করেছিলাম এবং নিশ্চয়ই আমি সত্যপরায়ণ ।” (৬৪: ১৪৬)

সুতরাং এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি, নিজে আল্লাহ তা'আলার পথ হতে সরে যাওয়া ও অপরকে সরিয়ে দেয়া, যা তাদের চিরন্তন অভ্যাস ছিল, রাসূলগণকে হত্যা করা, তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করতঃ সুদ ভক্ষণ করা, অন্যায়ভাবে অপরের মাল আস্তসাং করা, এ সমস্ত কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর

এমন কতগুলো জিনিস হারাম করেন যেগুলো তাদের জন্যে হালাল ছিল। এসব কাফিরদের জন্যে তিনি বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জানে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সত্য ধর্মে পূর্ণ বিশ্বাসী, তারা কুরআন কারীম ও পূর্বের সমস্ত কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে। এ বাক্যটির তাফসীর সূরা-ই-আলে ইমরানের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ), হ্যরত সা'লাবা ইবনে সাঈদ (রাঃ), হ্যরত যায়েদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) এবং হ্যরত উসায়েদ ইবনে উবায়েদ (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অথবাَ<sup>وَالْمُقِيمُونَ الصَّلَاةَ</sup> বাক্যটি সমস্ত ইমামের 'মাসহাফে' ও হ্যরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর মাসহাফে এক্সপ্রেছে। কিন্তু আল্লামা ইবনে জারীর (রঃ)-এর উক্তি অনুসারে হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সহীফায় <sup>وَالْمُقِيمُونَ الصَّلَاةَ</sup> রয়েছে। প্রথম পঠনটিই বিশুদ্ধ। যাঁরা বলেন যে, এটা লিখার ভুল, তাঁরা ভুল বলেছেন। কেউ কেউ তো বলেন যে, এর <sup>وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا</sup>-এর কারণে, যেমন মাধু হচ্ছে হাত নিচু আয়াতে হয়েছে। তাছাড়া আরবাসীর কথা-বার্তায় এবং কবিতায়ও এ নিয়ম বরাবর চালু রয়েছে।

<sup>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</sup> (২৪: ৪)-এ বাক্যের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে। অর্থাৎ তারা ওগুলোর উপরও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করার উপরও তাদের বিশ্বাস রয়েছে। অর্থাৎ তারা নামাযের অপরিহার্যতা ও সত্যতা স্বীকার করে। কিংবা এর ভাবার্থ হচ্ছে ফেরেশতা। অর্থাৎ তাদের কুরআন কারীমের উপর, অন্যান্য আসমানী কিতাবের উপর এবং ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস রয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। কিন্তু এতে বিবেচনার অবকাশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সবেচ্যে ভাল জানেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তারা যাকাত প্রদান করে থাকে'। অর্থাৎ মালের বা জীবনের যাকাত দিয়ে থাকে। ভাবার্থ দু'টোও হতে পারে। আর তারা একমাত্র আল্লাহকেই ইবাদতের যোগ্য মনে করে থাকে এবং তারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের উপরও পূর্ণ বিশ্বাস রাখে যে, সেদিন প্রত্যেক ভাল-মন্দ কার্যের প্রতিদান দেয়া হবে। এ প্রকারের লোককেই আমি মহা প্রতিদান অর্থাৎ জান্নাত প্রদান করবো।

সূরাঃ নিসা ৪

১৬৩। নিশ্চয়ই আমি তোমার  
প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি—যেকুপ  
আমি নৃহ ও তৎপরবর্তী  
নবীগণের প্রতি প্রত্যাদেশ  
করেছিলাম এবং ইবরাহীম,  
ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব  
ও তদ্বংশীয়গণের প্রতি এবং  
ইসা, আইয়ুব, ইউনূস, হারুন  
ও সুলাইমানের প্রতি  
প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং  
আমি দাউদকে যবুর প্রদান  
করেছিলাম।

১৬৪। আর নিশ্চয়ই আমি  
তোমার নিকট পূর্বে বহু  
রাসূলের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছি  
এবং অনেক রাসূল যাদের  
কথা তোমাকে বলিনি; আল্লাহ  
মূসার সহিত প্রত্যক্ষ বাক্যে  
কথা বলেছেন।

১৬৫। আমি সুসংবাদদাতা ও  
ভয় প্রদর্শকরূপে রাসূলগণকে  
থেরণ করেছি যাতে  
রাসূলগণের পরে লোকদের  
মধ্যে আল্লাহ সম্বক্ষে কোন  
বিরোধ না থাকে এবং আল্লাহ  
পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী।

— ۱۶۳ —  
إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا  
أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ  
بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ  
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  
وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُوبَ  
وَوُونَسَ وَهَرُونَ وَسَلِيمَ  
وَاتِّيَّنَا دَاؤِدَ زَيْرَوْا ۝

— ۱۶۴ —  
وَرَسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ  
عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرَسَالَتِ  
نَقْصُصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَمُ اللَّهِ  
مُوسَى تَكْلِيمًا ۝

— ۱۶۵ —  
وَرَسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ  
لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ  
حُجَّةٌ بَعْدِ الرَّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ  
عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) বলেন যে, সাকীন ও আদী ইবনে যায়েদ  
বলেছিল, ‘হে মুহাম্মদ (সঃ)! আমরা স্বীকার করি না যে, হ্যরত মুসা  
(আঃ)-এর পরে আল্লাহ তা‘আলা কোন মানুষের উপর কিছু অবতীর্ণ করেছেন’।  
তখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। মুহাম্মদ ইবনে কা’ব কারায়ী (রঃ) বলেন  
যে, যখন <sup>١٩٠</sup> (وَقُولُّهُمْ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَبِ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ) হতে  
(١٥٦-১৫৩) পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং  
ইয়াতুন্দীদের দুষ্কার্যাবলী তাদের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়, তখন তারা  
স্পষ্টভাবে বলে যে, আল্লাহ তা‘আলা কোন মানুষের উপর নিজের কোন কালাম  
অবতীর্ণই করেননি, না মুসা (আঃ)-এর উপর, না ঈসা (আঃ)-এর উপর, না  
অন্য কোন নবীর উপর। সেই সময় আল্লাহ তা‘আলা এড়ে দের কাছে  
ও মَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقُّ قَدْرِهِ إِذْ - এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। কিন্তু এ  
উক্তিটি সন্দেহযুক্ত। কেননা, সূরা-ই-আনআ’মের এ আয়াতটি ‘মাক্কী’। আর  
সূরা-ই-নিসার উপরোক্ত আয়াতটি ‘মাদানী’ যা তাদের ‘আপনি আকাশ হতে  
কোন কিতাব আনয়ন করুন’ এ কথার খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়। তাদের এ কথার  
উত্তরে বলা হয় যে, তারা হ্যরত মুসাকে এর চেয়েও বড় প্রশংসন করেছিল।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের দোষগুলো বর্ণনা করেন এবং তাদের পূর্বের ও বর্তমানের জঘন্য কার্যাবলী প্রকাশ করেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় বান্দা ও রাসূল হ্যরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন যেমন প্রত্যাদেশ করেছিলেন তিনি অন্যান্য নবীদের উপর। ‘যাবুর’ ঐ আসমানী কিতাবের নাম যা হ্যরত দাউদ (আঃ)-এর উপর নাফিল হয়েছিল। ঐ নবীদের ঘটনা আমরা ইন্শাআল্লাহ সুরা-ই-কাসাসে বর্ণনা করবো।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এ আয়াত অর্থাৎ মাঝী সূরার আয়াতের পূর্বে বহু নবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং বহু নবীর ঘটনা বর্ণিত হয়নি। যে নবীগণের নাম কুরআন কারীমের মধ্যে এসেছে সেগুলো নিম্নরূপঃ

ହୟରତ ଆଦମ (ଆଃ), ହୟରତ ଇନ୍ଦରୀସ (ଆଃ), ହୟରତ ନୂହ (ଆଃ), ହୟରତ ହୁଦ (ଆଃ), ହୟରତ ସାଲିହ (ଆଃ), ହୟରତ ଇବରାହିମ (ଆଃ), ହୟରତ ଲୂତ (ଆଃ), ହୟରତ ଇସମାଈଲ (ଆଃ), ହୟରତ ଇସହାକ (ଆଃ), ହୟରତ ଇୟାକୁବ (ଆଃ), ହୟରତ ଇୟୁସ୍ନୁଫ (ଆଃ), ହୟରତ ଆଇୟୁବ (ଆଃ), ହୟରତ ଶ'ଆଇବ (ଆଃ),

হয়রত মূসা (আঃ), হয়রত হারুন (আঃ), হয়রত ইউনুস (আঃ), হয়রত দাউদ (আঃ), হয়রত সুলাইমান (আঃ), হয়রত ইলিয়াস (আঃ), হয়রত ইয়াসাআ (আঃ), হয়রত যাকারিয়া (আঃ), হয়রত ইয়াহ্বেয়া (আঃ), হয়রত ঈসা (আঃ) ও অধিকাংশ মুফাসিসিরের মতে হয়রত যুলকিফল (আঃ) এবং সর্বশেষ ও নবীগণের নেতা হয়রত মুহাম্মাদ মোস্তাফা (সঃ)।

বহু নবী এমনও রয়েছেন যাঁদের নাম কুরআন কারীমে উল্লিখিত হয়নি। এ কারণেই রাসূল ও নবীগণের সংখ্যায় মতভেদ রয়েছে। এ ব্যাপারে সুপ্রসিদ্ধ হাদীস হচ্ছে হয়রত আবু যার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি। হাদীসটি তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! নবী কতজন? তিনি বলেনঃ “এক লক্ষ চবিশ হাজার।” হয়রত আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূল কতজন? তিনি বলেনঃ “তিনশ তেরোজন। বড় একটি দল।” পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করেন, সর্বপ্রথম কে? তিনি বলেনঃ “হয়রত আদম (আঃ)!” তিনি বলেন, তিনি কি রাসূল ছিলেন? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হ্যায়! আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাঁর মধ্যে ক্রহ ফুঁকে দেন এবং ঠিকঠাক করে দেন।”

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হে আবু যার (রাঃ)! চারজন হচ্ছেন সূরইয়ানী। (১) হয়রত আদম (আঃ), (২) হয়রত শীষ (আঃ), (৩) হয়রত নূহ (আঃ) এবং (৪) হয়রত খানুখ (আঃ) যাঁর প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে ইদরীস (আঃ)। তিনিই সর্বপ্রথম কলম দ্বারা লিখেন। আর চারজন হচ্ছেন আরবী। (১) হয়রত হুদ (আঃ), (২) হয়রত সালিহ (আঃ), (৩) হয়রত গু‘আইব (আঃ) এবং (৪) তোমাদের নবী হয়রত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ)। হে আবু যার (রাঃ)! বানী ইসরাইলের প্রথম নবী হচ্ছেন হয়রত মূসা (আঃ) এবং শেষ নবী হচ্ছেন হয়রত ঈসা (আঃ)। সমস্ত নবীর মধ্যে প্রথম নবী হচ্ছেন হয়রত আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ নবী হচ্ছেন তোমাদের নবী (সঃ)”। এ সুন্দীর্ঘ হাদীসটি হাফিয আবু হাতিম (রঃ) স্বীয় প্রস্তুত ‘আল আনওয়া ওয়াস্তাফাসীমে’ বর্ণনা করেছেন যার উপর তিনি বিশুদ্ধতার চিহ্ন দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত ইমাম আবু ফারাজ ইবনে জাওয়ী ওটাকে সম্পূর্ণরূপে কল্পিত বলেছেন। ইবরাহীম ইবনে হাসিম ওর একজন বর্ণনাকারীকে কল্পনাকারী রূপে সন্দেহ করেছেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, খণ্ডনকারী ইমামগণের মধ্যে অনেকেই এ হাদীসের কারণে

তার সমালোচনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। আর এ হাদীসটি অন্য সনদে হ্যরত আবু উমামা (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে। কিন্তু ওতে মাআন ইবনে রিফাআহ দুর্বল, আলী ইবনে ইয়াযিদও দুর্বল এবং কাসিম ইবনে আবদুর রহমানও দুর্বল।

আবু ইয়ালা (রঃ)-এর হাদীস গঠনে একটি হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আল্লাহ তা'আলা আট হাজার নবী পাঠিয়েছেন। চার হাজার পাঠিয়েছেন বানী ইসরাইলের নিকট এবং চার হাজার পাঠিয়েছেন অবশিষ্ট অন্যান্য লোকদের উপর’। এ হাদীসটিও দুর্বল। এতে যাইদী এবং তার শিক্ষক রূক্ষাশী দু'জনই দুর্বল। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। আবু ইয়ালার আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আমার ভাই আট হাজার নবী অতীত হয়েছেন। তাঁদের পরে হ্যরত ঝিসা (আঃ) এসেছেন এবং তাঁর পরে আমি এসেছি।’ অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আমি আট হাজার নবীর পরে এসেছি, তাঁদের মধ্যে চার হাজার ছিলেন বানী ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত।’ এ হাদীসটি এ সনদে তো গারীব বটেই কিন্তু এর সমস্ত বর্ণনাকারী সুপরিচিত। শুধুমাত্র আহমাদ ইবনে তারিকের সততা বা দৌর্বল্য সম্পর্কে আমার অজানা রয়েছে।

নবীগণের সংখ্যা সম্পর্কে হ্যরত আবু যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত সুন্দীর্ঘ হাদীসটিও এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। হ্যরত আবু যার (রাঃ) বলেনঃ আমি মসজিদে প্রবেশ করি। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) একাকী মসজিদে অবস্থান করছিলেন। আমিও তাঁর পার্শ্বে বসে পড়ি এবং বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি কি আমাকে নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ ‘হ্যাঁ, নামায উত্তম কাজ। তাই, হয় তুমি নামায বেশী করে পড় না হয় কম করে পড়।’ আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন্ আমল উত্তম? তিনি বললেনঃ ‘আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর পথে জিহাদ করা।’ আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন্ মুমিন উত্তম। তিনি বলেনঃ ‘সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তি।’ আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সর্বোত্তম মুসলমান কে? তিনি বলেনঃ ‘যার কথা ও হাত হতে মানুষ নিরাপদে থাকে।’ আমি বলি, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন্ হিজরত উত্তম? তিনি বলেনঃ ‘মন্দকে পরিত্যাগ করা।’ আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন গোলাম আযাদ করা উত্তম? তিনি বলেনঃ ‘যে গোলামের মূল্য বেশী ও তার

মনিবের নিকট বেশী পছন্দীয়।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন্‌  
সাদকা সর্বোত্তম? তিনি বলেনঃ 'অল্ল মালের অধিকারী ব্যক্তির চেষ্টা করা ও  
গোপনে দরিদ্রকে দান করা।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কুরআন  
কারীমের মধ্যে সবচেয়ে বড় মর্যাদাসম্পন্ন আয়াত কোন্টি? তিনি বলেনঃ  
“আয়তুল কুরসী।”

অতঃপর তিনি বলেনঃ 'হে আবু যার (রাঃ)! সাতটি আকাশ কুরসীর তুলনায়  
ঐরূপ যেরূপ কোন মরুপ্তান্তরে একটি বৃত্ত এবং কুরসীর উপর আরশের মর্যাদা  
ঐরূপ যেরূপ প্রশস্ত প্রান্তরের মর্যাদা বৃত্তের উপর।' আমি বলি, হে আল্লাহর  
রাসূল (সঃ)! নবী কতজন? তিনি বলেনঃ 'এক লক্ষ চবিশ হাজার।' আমি  
বলি, তাদের মধ্যে রাসূল কতজন? তিনি বলেনঃ 'তিনশ জন, বড় পবিত্র দল।'  
আমি জিজ্ঞেস করি, সর্বপ্রথম কে? তিনি বলেনঃ 'হ্যরত আদম (আঃ)।' আমি  
বলি, তিনিও কি রাসূল ছিলেন? তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে  
স্বহস্তে সৃষ্টি করতঃ ওর মধ্যে রহু ফুঁকে দেন এবং তাঁকে ঠিকঠাক করেন।'

অতঃপর তিনি বলেনঃ 'জেনে রেখো যে, চারজন হচ্ছেন সুরইয়ানী। (১)  
হ্যরত আদম (আঃ), (২) হ্যরত শীষ (আঃ), (৩) হ্যরত খানুখ (আঃ) তিনিই  
হচ্ছেন হ্যরত ইদরীস (আঃ), যিনি সর্বপ্রথম কলম দ্বারা লিখেছেন এবং (৪)  
হ্যরত নূহ (আঃ)। আর চারজন হচ্ছেন আরবী। (১) হ্যরত হুদ (আঃ), (২)  
হ্যরত শু'আইব (আঃ), (৩) হ্যরত সালিহ (আঃ) এবং (৪) তোমাদের নবী  
হ্যরত মুহাম্মাদ (সঃ)। সর্বপ্রথম রাসূল হচ্ছেন হ্যরত আদম (আঃ) এবং  
সর্বশেষ রাসূল হচ্ছেন হ্যরত মুহাম্মাদ (সঃ)। আমি জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর  
রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তা'আলা কতখানা কিতাব অবর্তীর্ণ করেছেন? তিনি  
বলেনঃ 'একশ চারখানা। হ্যরত শীষ (আঃ)-এর উপর পঞ্চাশ খানা সহীফা,  
হ্যরত খানুখ (আঃ)-এর উপর তিনখানা সহীফা, হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর  
উপর দশখানা সহীফা, হ্যরত মুসা (আঃ) -এর উপর তাওরাতের পূর্বে দশখানা  
সাহীফা ও তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল, ও ফুরকান নাযিল করেন।' আমি বলি, হে  
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাহীফায় কি ছিল? তিনি  
বলেনঃ ওর সম্পূর্ণটাই ছিল নিম্নরূপ-

'হে বিজয়ী বাদশাহ! আমি তোমাকে দুনিয়া জমা করার জন্যে পাঠাইনি,  
বরং এ জন্যে পাঠিয়েছি যে, তুমি অত্যাচারিতের প্রার্থনা আমার সামনে হতে  
সরিয়ে দেবে। যদি তা আমার নিকট পৌছে যায় তবে আমি তা প্রথ্যাত্যান

করবে না।’ তাতে নিম্নরূপ দ্রষ্টান্তও ছিল- জ্ঞানীর এটা অপরিহার্য কর্তব্য যে, সে যেন তার সময় কয়েক ভাগে ভাগ করে। একটি অংশে সে নিজের জীবনের হিসেব গ্রহণ করবে। এক অংশে আল্লাহ তা‘আলার গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা করবে, একাংশে সে পানাহারের চিন্তা করবে। জ্ঞানীর নিজেকে তিনটি জিনিস ছাড়া অন্য কোন জিনিসে লিঙ্গ রাখা উচিত নয়। প্রথম হচ্ছে পরকালের পাথেয়, দ্বিতীয় হচ্ছে জীবিকা লাভ এবং তৃতীয় হচ্ছে বৈধ জিনিসে আনন্দ ও মজা উপভোগ। জ্ঞানীর উচিত যে, সে যেন নিজের সময়কে দেখতে থাকে, স্বীয় কার্যে লেগে থাকে এবং স্বীয় জিহ্বাকে সংযত রাখে। যে ব্যক্তি স্বীয় কথাকে তার কাজের সঙ্গে মিলাতে থাকে সে খুব কম কথা বলবে। তোমরা শুধু ঐ কথাই বল, যাতে তোমাদের উপকার হয়।”

আমি জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হযরত মুসা (আঃ)-এর সাহীফাসমূহে কি ছিল? তিনি বলেনঃ “ওটা শুধু উপদেশে পরিপূর্ণ। যেমন আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখে বিশ্বিত হই যে মৃত্যুকে বিশ্বাস করে অথচ আনন্দে আনন্দহারা হয়ে থাকে। ভাগ্যের উপর বিশ্বাস রাখে অথচ হায় হায় করে। দুনিয়ার অস্থায়িত্ব অবলোকন করে অথচ নিশ্চিন্ত থাকে। কিয়ামতের দিন যে হিসাব দিতে হবে এটা জানে অথচ আমল করে না।”। আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! পূর্ববর্তী নবীদের গ্রন্থসমূহে যা কিছু ছিল ওগুলোর মধ্যে আমাদের গ্রন্থেও কিছু রয়েছে কি? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, হে আবু যার! দেখ আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

قَدْ أَفْلَحَ مِنْ تَرْكِي \* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى \* بَلْ تُؤْثِرُونَ  
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَابْقَى \* إِنَّ هَذَا لِفِي الصُّحْفِ الْأَوَّلِيِّ \*  
صُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى<sup>١</sup>

অর্থাৎ ‘মুক্তি পেয়েছে ঐ ব্যক্তি যে পবিত্র হয়েছে। আর তার প্রভূর নাম স্মরণ করতঃ নামায পড়েছে। বরং তোমরা ইহলৌকিক জীবনের উপর গুরুত্ব দিচ্ছ, অথচ পারলৌকিক জীবন উন্নত ও চিরস্থায়ী। নিচয়ই এটা পূর্ববর্তী সাহীফাগুলোতে রয়েছে। রয়েছে ইবরাহীম ও মূসার সাহীফায়।’ (৮৭৪১৪-১৯)

আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেনঃ “আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহকে ভয় করতে থাক। এটাই হচ্ছে তোমার কার্যের প্রধান অংশ।” আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও কিছু বলুন। তিনি বলেনঃ ‘কুরআন পাঠ ও আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাক।

এটা তোমার জন্যে আকাশসমূহে যিকিরের এবং পৃথিবীতে আলোকের কারণ হবে।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও বলুন। তিনি বলেনঃ 'সাবধান! অতিরিক্তি হাসি হতে বিরত হও। এর ফলে অন্তর মরে যায় এবং চেহারার ঔজ্জল্য দূর হয়ে যায়।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও কিছু বলুন। তিনি বলেনঃ 'জিহাদে লিঙ্গ থাক, আমার উচ্চতের জন্যে এটাই হচ্ছে সংসার ত্যাগ।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও কিছু উপদেশ দিন। তিনি বলেনঃ 'উত্তম কথা বলা ছাড়া মুখ বন্ধ রেখো। এতে শয়তান পলায়ন করে এবং ধর্মীয় কাজে বিশেষ সহায়তা লাভ হয়।'

আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও কিছু বলুন। তিনি বলেনঃ 'তোমা অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের লোকদের দিকে দেখ, তোমা অপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ের লোকদের দিকে দেখো না। এতে তোমার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও বলুন! তিনি বলেনঃ 'দরিদ্রদের প্রতি ভালবাসা রেখো এবং তাদের সাথে উঠাবসা কর। এতে আল্লাহ তা'আলার করুণা তোমার কাছে খুব বড় বলে মনে হবে।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও কিছু বলুন। তিনি বলেনঃ 'আঙীয়দের সাথে মিলিত থাক যদিও তারা মিলিত না হয়।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও কিছু বলুন। তিনি বলেনঃ 'সত্য কথা বলতে থাক যদিও তা কারও কাছে তিক্ত বলে মনে হয়।' আমি তাঁর নিকট আরও উপদেশ যাঞ্চগা করি। তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে ভর্তসনাকারীর ভর্তসনাকে ভয় করো না।' আমি বলি, আরও বলুন। তিনি বলেনঃ 'নিজের দোষ-ক্রটির প্রতি লক্ষ্য কর। অন্যের দোষ-ক্রটির প্রতি লক্ষ্য রাখা হতে বিরত থাক।'

অতঃপর তিনি আমার বক্ষে হাত রেখে বলেনঃ 'হে আবু যার (রাঃ)! তদবীরের মত কোন বুদ্ধিমত্তা নেই, হারাম হতে বিরত থাকার মত কোন তাকওয়া নেই এবং উত্তম চরিত্রের মত কোন বংশ নেই।' মুসনাদ-ই-আহমাদেও এ হাদীসটি কিছু কম-বেশীর সাথে বর্ণিত আছে।

হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) জনগণকে জিজেস করেনঃ 'খারেজীগণও কি দাজ্জালকে স্বীকার করে?' উত্তর আসেঃ 'না।' তিনি তখন বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমি এক হাজার বরং তার চেয়েও বেশী নবীর শেষে এসেছি। প্রত্যেক নবী (আঃ) নিজ নিজ উচ্চতকে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে তার এমন কতগুলো

নির্দশন বর্ণনা করেছেন যেগুলো অন্যান্য নবীদের নিকট বর্ণনা করেননি। জেনে রেখো যে, সে টেরো চক্ষু বিশিষ্ট হবে এবং প্রভু এরূপ হতে পারেন না। তার ডান চক্ষু কানা হবে ও উপর দিকে উঠে থাকবে যেমন চুনকামৃত কোন পরিষ্কার দেয়ালে কোন ফুটা জায়গা থাকে। তার বাম চক্ষুটি উজ্জ্বল তারকার ন্যায় হবে। সে সমস্ত ভাষায় কথা বলবে। তার নিকট সবুজ শ্যামল জাহানাতের ছবি থাকবে যেখানে পানি প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তার নিকট জাহানামেরও ছবি থাকবে। তথায় কালো ধুঁয়া দেখা যাবে।’

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমি এক লক্ষ বরং তার চেয়েও বেশী নবী (আঃ)-এর শেষে আগমন করেছি। আল্লাহ তা‘আলা যত নবী পাঠিয়েছেন প্রত্যেকেই স্বীয় গোত্রকে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন।” তারপরে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘এবং আল্লাহ প্রত্যক্ষ বাকেয় মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন।’ এটা তাঁর একটা বিশেষ গুণ যে, তিনি কালীমুল্লাহ ছিলেন। একটি লোক হ্যরত আবু বকর ইবনে আয়াশ (রঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ ‘একটি লোক এ বাক্যটিকে কেন একটি একটি লোকে কেন কাফির এভাবে পড়ে থাকবে। অর্থাৎ মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন।’ একথা শুনে হ্যরত আবু বকর ইবনে আয়াশ (রঃ) রাগার্বিত হয়ে বলেনঃ ‘কোন কাফির এভাবে পড়ে থাকবে। আমি হ্যরত আমাশ (রঃ) হতে, তিনি ইয়াহইয়া (রঃ) হতে, তিনি আবদুর রহমান (রঃ) হতে, তিনি হ্যরত আলী (রাঃ) হতে এবং হ্যরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে একপই পড়েছেন।’ মোটকথা ঐ লোকটির অর্থ ও শব্দের পরিবর্তন করে দেয়া দেখে তিনি এরূপ রাগার্বিত হন। এতে বিশ্বয়ের কিছু নেই যে, এটা কোন মুতায়েলীই হবে। কেননা, মুতায়েলীদের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ তা‘আলা না হ্যরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে কথা বলছেন না অন্য কারও সঙ্গে কথা বলেছেন। কোন একজন মুতায়েলী কোন একজন মনীষীর নিকট এসে এ আয়াতটিকে এভাবে পাঠ করলে তিনি তাকে মন্দ বলেন। অতঃপর তাকে বলেনঃ ‘তাহলৈ তুমি إِنَّمَا جَاءَ مُوسَى لِوْبِقَاتِنَا وَكَلْمَهُ رَبِّهِ অর্থাৎ ‘এবং যখন মূসা আমার প্রতিশ্রূত সময়ে আগমন করে এবং তার প্রভু তার সাথে কথা বলেন’(৭৪ ১৪৩)-এ আয়াতটিকে কিভাবে অঙ্গীকার করবে? ভাবার্থ এই যে, এখানে এ ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন চলবে না।

‘তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই’-এর একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন আল্লাহ তা‘আলা হ্যরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে কথা বলেন তখন তিনি একটি কৃষ্ণ বর্ণের পিপীলিকার অক্ষকার রাত্রে কোন পরিষ্কার পাথরের উপর চলাও দেখতে পেতেন।” এ হাদীসটি দুর্বল এবং এর ইসনাদও সহীহ নয়। কিন্তু এটা যদি সহীহ ‘মাওকুফ’ হিসেবে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর উক্তি রূপে প্রমাণিত হয় তবে খুব ভাল কথা। ‘মুসতাদরিক-ই-হাকিম’ প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে যে, যখন আল্লাহ তা‘আলা হ্যরত মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেন তখন তিনি পশ্চের চাদর, পায়জামা এবং যবাইহীন গাধার চামড়ার জুতো পরিহিত ছিলেন।

হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা তিন দিনে হ্যরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কথা বলেন যেগুলোর সবই ছিল উপদেশ। অতঃপর হ্যরত মূসা (আঃ)-এর কর্ণে মানুষের কথা প্রবেশ করেনি। কেননা তখন তাঁর কর্ণে ঐ পবিত্র কালামই প্রতিক্রিন্নিত হচ্ছিল। এর ইসনাদও দুর্বল। তাছাড়া এতে ইনকিতা রয়েছে। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে একটি হাদীস রয়েছে যে, হ্যরত জাবির (রাঃ) বলেনঃ ‘তুর দিবসে’ আল্লাহ তা‘আলা হ্যরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে যে কথা বলেছিলেন ওর বিশেষণ ঐদিনের কথার বিশেষণ হতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল যে দিন তিনি তাঁকে আহ্বান করেছিলেন। তখন হ্যরত মূসা (আঃ) এর রহস্য জানতে চাইলে আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “হে মূসা! এ পর্যন্ত তো আমি দশ হাজার ভাষার সমান ক্ষমতায় কথা বলেছি। অথচ আমার সমস্ত ভাষায় কথা বলারই ক্ষমতা রয়েছে, এমন কি এর চেয়েও বেশী ক্ষমতা রয়েছে।”

বানী ইসরাইল হ্যরত মূসা (আঃ)-কে প্রভুর কালামের বিশেষণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ ‘আমি তো কিছুই বলতে পারি না।’ তখন তারা বলেঃ “আচ্ছা, কিছু সাদৃশ্য বর্ণনা করুন।” তিনি বলেনঃ “তোমরা তো বছের শব্দ শুনে থাকবে। ওটা অনেকটা ঐরূপ ছিল কিন্তু বেশী ছিল না।” এর একজন বর্ণনাকারী রূক্ষাশী খুবই দুর্বল। হ্যরত কা‘ব (রঃ) বলেনঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে যখন কথা বলেন তখন তিনি সমস্ত ভাষাতেই কথা বলেন। স্বীয় কথার মধ্যে হ্যরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাককে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘হে আমার প্রভু! এটাই কি আপনার কথা?’ তিনি বলেনঃ ‘না। তুমি আমার কথা সহ্য করতে পারবে না।’ হ্যরত মূসা (আঃ) পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ ‘হে

আমার প্রভু! আপনার মাখলুকের কারও কথার সঙ্গে আপনার কথার সাদৃশ্য আছে কি?’ আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ ‘ভয়ংকর বজ্রধনি ছাড়া আর কিছুরই সাদৃশ্য নেই।’ এ বর্ণনাটি ও ‘মাওকুফ’ এবং এটা স্পষ্ট কথা যে, হযরত কা’ব (রঃ) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ হতে বর্ণনা করতেন, যেসব কিতাবে বানী ইসরাইলের সত্য-মিথ্যা সব ঘটনাই থাকতো।

এরপর বলা হচ্ছে— তারা এমন রাসূল যারা আল্লাহ তা’আলার আনুগত্য স্বীকারকারীদেরকে ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনাকারীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে থাকে এবং তাঁর আদেশ অমান্যকারীদের ও তাঁর রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কারীদেরকে জাহানামের ভয় প্রদর্শন করে থাকে।

অতঃপর আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ ‘আল্লাহ তা’আলা যে স্বীয় গ্রন্থরাজি অবতীর্ণ করেছেন ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং তাদেরকে স্বীয় সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন তা এ জন্যে যে, যেন কারও কোন প্রমাণ এবং ওয়র অবশিষ্ট না থাকে।’ যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে—

وَلَوْ أَنَا أَهْلُكُنَّهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا  
فَتَبَيَّنَ أَيْتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَزَّلْنَا وَنَخْزِي

অর্থাৎ ‘যদি আমি এর পূর্বেই তাদেরকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তবে তারা অবশ্যই বলতো—হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের নিকট রাসূল পাঠাননি কেন? তাহলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শনসমূহকে মেনে নিতাম।’ (২০: ১৩৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তা’আলার মত মর্যাদা বোধ আর কারও নেই। এ জন্যেই তিনি সমস্ত মন্দকে হারাম করেছেন তা প্রকাশ্যই হোক আর গোপনীয়ই হোক এবং এমনও কেউ নেই যার কাছে প্রশংসা আল্লাহ তা’আলা অপেক্ষা বেশী পচন্দনীয় হয়। এ কারণেই তিনি নিজের প্রশংসা নিজেই করেছেন। এমনও কেউ নেই যার নিকট ওয়র আল্লাহ তা’আলা অপেক্ষা বেশী প্রিয় হয়। এ জন্যেই তিনি নবীগণকে সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরপে প্রেরণ করেছেন।” অন্য বর্ণনায় নিম্নের শব্দগুলোও রয়েছে— “এ কারণেই তিনি রাসূল পাঠিয়েছেন ও গ্রন্থাবলী অবতীর্ণ করেছেন।”

সূরাঃ নিসা ৪

১৬৬। কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি  
যা অবতীর্ণ করেছেন,  
তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে  
অবতারণের সাক্ষ্য দান  
করছেন, এবং ফেরেশতাগণও  
সাক্ষ্য প্রদান করছে; এবং  
সাক্ষ্য দানে আল্লাহই যথেষ্ট।

১৬৭। নিচয়ই যারা অবিশ্বাস  
করেছে এবং আল্লাহর পথ  
হতে প্রতিরোধ করছে,  
অবশ্যই তারা সুদূর বিপথে  
বিভ্রান্ত হয়েছে।

১৬৮। নিচয়ই যারা অবিশ্বাসী  
হয়েছে ও অত্যাচার করেছে,  
আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা  
করবেন না এবং তাদেরকে  
সুপথ প্রদর্শন করবেন না।

১৬৯। জাহানামের পথ ব্যতীত,  
তনাধ্যে তারা চিরকাল  
অবস্থান করবে এবং এটা  
আল্লাহর পক্ষে সহজসাধ্য।

১৭০। হে লোক সকল! নিচয়ই  
তোমাদের প্রতিপালকের  
সন্ধান হতে সত্যসহ রাসূল  
আগমন করেছেন, অতএব  
বিশ্বাস স্থাপন কর-তোমাদের

১৬৬- لِكِنَّ اللَّهَ يَشْهُدُ بِمَا  
أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ عِلْمٌ  
وَالْمَلِئَةُ يَشْهُدُونَ وَكَفَى  
بِاللَّهِ شَهِيدًا

১৬৭- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلَّلُوا  
ضَلَالاً بَعِيدًا

১৬৮- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا  
لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيغُفِرَ لَهُمْ وَلَا  
لِيَهُدِيْهِمْ طَرِيقًا

১৬৯- إِلَّا طَرِيقُ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ  
فِيهَا أَبْدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى  
اللَّهِ يَسِيرًا

১৭০- يَا يَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم  
الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ  
فَإِمْنُوا خَيْرُ الْكِبَرَ

কল্যাণ হবে, আর যদি  
অবিশ্বাস কর তবে নভোমগুলে  
ও ভূমগুলে যা কিছু আছে তা  
আল্লাহর এবং আল্লাহ  
মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

تَكُفِّرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ  
عَلِيهِمَا حَكِيمًا

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করা হয়েছে এবং তাঁর নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। এজন্যেই এখানে বলা হচ্ছে-‘হে নবী (সঃ)! গুটিকতক লোক তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছে বটে কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা তোমার রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করছেন।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন-আল্লাহ তোমার উপর কুরআন মাজীদ ও ফুরকান-ই-হামীদ অবর্তীর্ণ করেছেন, যার কাছে বাতিল টিকতে পারে না। এর মধ্যে ঐ সমুদয় জিনিসের জ্ঞান রয়েছে যার উপর তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে অবহিত করতে চান। অর্থাৎ প্রমাণাদি, হিদায়াত, ফুরকান, আল্লাহর সন্তুষ্টির ও অসন্তুষ্টির আহকাম, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংবাদসমূহ এবং আল্লাহ তা‘আলার পবিত্র গুণাবলী। যেগুলো স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা অবহিত না করা পর্যন্ত কোন রাসূল বা কোন নেকট্য লাভকারী ফেরেশতাও জানতে পারেন না! যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছে করেন তদ্যুতীত কেউই তার অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই ধারণা করতে পারে না। (২: ২৫৫) অন্য জায়গায় বলা হয়েছে-

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

অর্থাৎ “তারা তাঁর জ্ঞান আবেষ্টনীর মধ্যে আনতে পারে না।”

হ্যরত আতা ইবনে সায়েব (রঃ) যখন হ্যরত আবু আবদুর রহমান (রঃ)-এর নিকট কুরআন কারীম পাঠ শেষ করেন তখন তিনি তাঁকে বলেনঃ “যে আমলে তোমার চেয়ে বেড়ে যাবে সে ছাড়া আজ তোমার চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই।” অতঃপর তিনি (ازْلَهُ بِعِلْمٍ)-এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ আল্লাহর সাক্ষ্যের সাথে সাথে ফেরেশ্তাগণেরও সাক্ষ্য রয়েছে যে, যা তোমার নিকট এসেছে এবং যে অহী তোমারা উপর অবর্তীর্ণ হয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য।

ইয়াহুদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে বলেনঃ “আল্লাহর শপথ! আমার নিশ্চিত রূপে জানা রয়েছে যে, আমার রিসালাতের অবগতি তোমাদের রয়েছে।” ঐ লোকগুলো ঐ কথা অঙ্গীকার করে। তখন মহাসম্মানিত আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ যেসব লোক কুফরী করতঃ সত্যের অনুসরণে অঙ্গীকৃতি জানিয়েছে, এমনকি অন্য লোকদেরকেও সত্য পথে আসতে বাধা দিয়েছে তারা সঠিক পথ হতে সরে পড়েছে এবং প্রকৃত জিনিস থেকে পৃথক হয়ে গেছে। তারা সুপথকে হারিয়ে ফেলেছে। এসব লোক, যারা আমার নির্দেশনাবলীকে অঙ্গীকার করেছে, আমার কিতাবকে অমান্য করেছে, আমার পথে আসতে মানুষকে বাধা দিয়েছে, আমার নিষিদ্ধ কার্যাবলী করতে রয়েছে এবং আমার নির্দেশনাবলী অমান্য করেছে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করবো না এবং তাদেরকে সুপথ প্রদর্শনও করবো না, বরং তাদেরকে জাহান্নামের পথ প্রদর্শন করবো। তথায় তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

হে লোক সকল! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে স্নাত্য নিয়ে তাঁর রাসূল আগমন করেছেন। তোমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতঃ তাঁর আনুগত্য স্বীকার কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা অঙ্গীকার কর তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মোটেই মুখাপেক্ষী নন। তোমাদের ঈমান আনয়নে তাঁর কোন লাভও নেই এবং তোমাদের অঙ্গীকার করাতে তাঁর কোন ক্ষতিও নেই। নভোমগুল ও ভূমগুলের সমুদয় জিনিস তাঁরই অধিকারে রয়েছে। একথাই হয়রত মুসা (আঃ) তাঁর কওয়কে বলেছিলেনঃ ‘যদি তোমরা এবং সারা জগতের সমস্ত লোকও কাফির হয়ে যায় তবুও মহান আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সারা বিশ্ব হতে অমুখাপেক্ষী; তিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই জানেন কে সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য এবং কে পথব্রষ্ট হওয়ার যোগ্য। তিনি বিজ্ঞানময়। তাঁর কথা, তাঁর কাজ, তাঁর শরীয়ত এবং তাঁর বিধান সবকিছুই নিপুণতাপূর্ণ।’

১৭১। হে আহলে কিতাব!

তোমরা স্বীয় ধর্মে সীমা

অতিক্রম করো না এবং  
আল্লাহর বিরুদ্ধে সত্য ব্যতীত  
বলো না, নিশ্চয়ই মারইয়াম

١٧١ - يَاهْلُ الْكِتَبِ لَا تَغْلُوا

فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَىٰ  
اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ

নদন ঈসা মাসীহ আল্লাহর  
রাসূল ও তাঁর বাণী-যা তিনি  
মারইয়ামের প্রতি সঞ্চারিত  
করেছিলেন এবং তাঁর আদিষ্ট  
আজ্ঞা; অতএব আল্লাহ ও  
তদীয় রাসূলের উপর বিশ্বাস  
স্থাপন কর এবং তিনজন  
বলো না; নিবৃত্ত হও-  
তোমাদের কল্যাণ হবে;  
নিশ্চয়ই একমাত্র আল্লাহই  
মা'বুদ; তিনি কোন সম্ভান  
হওয়া হতে পৃতঃ, মুক্ত;  
নভোমগুলে যা আছে ও  
ভূমগুলে যা আছে তা তাঁরই  
এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে  
যথেষ্ট।

عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ  
وَكَلِمَتُهُ الَّتِي قَالَهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَ  
رُوحٌ مِّنْهُ فَامْنَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَلَا تَقُولُوا ثُلَّةٌ أَنْتُمْ هُوَ خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ  
سَبِّحْنَاهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا  
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবকে বাড়াবাঢ়ি ও সীমা অতিক্রম করতে  
নিষেধ করছেন। খ্রীষ্টানেরা হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে সীমা অতিক্রম  
করেছিল এবং তাঁকে নবুওয়াত হতে বাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে  
দিয়েছিল। তারা তাঁর আনুগত্য ছেড়ে তাঁর ইবাদতে লেগে পড়েছিল, এমনকি  
অন্যান্য মনীষীর ব্যাপারেও তাদের ধারণা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খ্রীষ্টান ধর্মের  
আলেমদেরকেও তারা নিষ্পাপ মনে করতে থাকে এবং এ ধারণা করে নেয়  
যে, ধর্মের আলেমগণ যা কিছু বলেন তা মনে নেয়াই অপরিহার্য কর্তব্য।  
সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল এবং সুপথ-ভাস্তির পথ পরীক্ষা করার কোন অধিকার  
তাদের নেই। যার বর্ণনা কুরআন কারীমের নিম্নের এ আয়াতে রয়েছে-

إِتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ

অর্থাৎ “তারা তাদের আলেমদেরকে ও ধর্ম্যাজকদেরকে তাদের প্রতু বানিয়ে  
নিয়েছিল।”(৯: ৩১)

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘তোমরা আমাকে এমনভাবে বাড়িয়ে দিও না যেমনভাবে খৃষ্টানেরা হ্যরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-কে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি তো একজন দাস মাত্র। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও আল্লাহর রাসূল বলবে।’ এ হাদীসটি সহীহ বুখারী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থেও রয়েছে।

মুসনাদ-ই-আহমাদের অপর একটি হাদীসে রয়েছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! হে আমাদের নেতা ও নেতার ছেলে! হে আমাদের মধ্যে সর্বোক্তম ব্যক্তির ছেলে।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের কথার প্রতি খেয়াল রেখো। দেখ, শয়তান যেন তোমাদেরকে এদিক-ওদিক করে না দেয়। আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (সঃ)। আমি আল্লাহর দাস ও তাঁর রাসূল। আল্লাহর শপথ! আমি চাইনে যে, তোমরা আমাকে আমার মর্যাদা অপেক্ষা বেশী বাড়িয়ে দেবে।”

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ তোমরা আল্লাহ তা‘আলার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিও না। তোমরা তাঁর স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করো না। তিনি ওটা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। ওটা হতে তিনি বহু দূরে ও বহু উচ্চে রয়েছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদায় তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া কেউ মা’বুদ ও প্রভু নেই। হ্যরত মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) আল্লাহ তা‘আলার রাসূল। তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে একজন দাস এবং তাঁর একজন সৃষ্ট ব্যক্তি। তিনি শুধু<sup>কুন্তি</sup> শব্দের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছেন। যে শব্দটি নিয়ে হ্যরত জিবরাইল (আঃ) হ্যরত মারইয়াম (আঃ)-এর নিকট এসেছিনে এবং আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশক্রমে ঐ কালেমা তাঁর মধ্যে ফুঁকে দেন। এর ফলেই হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম হয়। পিতা ছাড়াই একমাত্র এ কালেমার মাধ্যমেই তিনি সৃষ্টি হন বলেই তাঁকে বিশেষভাবে ‘কালেমাতুল্লাহ’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে রয়েছে-

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرِيمٍ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمَّهُ صِدِيقَةٌ  
كَانَا يَأْكَلُونَ الطَّعَامَ -

অর্থাৎ ‘হ্যরত মাসীহ ইবনে মারইয়াম শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূল, তার পূর্বে বহু রাসূল অতীত হয়েছেন, তার মাতা সত্যবাদিনী, তারা দু’জন আহার্য ভোজন করতো।’ (৫: ৭৫) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمُثَلِّ ادْمَ خَلْقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ  
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ -

অর্থাৎ “ঈসার দৃষ্টিভঙ্গ আল্লাহ তা’আলার নিকট আদমের মতই, তাকে তিনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন অতঃপর বলেছেন- হও, আর তেমনই হয়ে গেছে।” (৩: ৫৯) কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে রয়েছে-

وَالَّتِي أَحْصَنْتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا أَيْةً  
لِلْعِلَمِينَ -

অর্থাৎ “যে তার লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করেছে এবং আমি স্বীয় রূহ তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছি এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্বাসীর জন্যে নির্দশন বানিয়েছি।” (২১: ৯১) আর এক আয়াতে রয়েছে-

وَمَرِيمٌ ابْنَتِ عَمْرَنَ التِّي أَحْصَنْتُ فَرْجَهَا

অর্থাৎ “এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম যে তার লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করেছে।” (৬৬: ১২) হ্যরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এ আয়াতে বলা হয়েছে-

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

অর্থাৎ “সে (ঈসা আঃ) একজন দাস ছাড়া কিছুই নয়, আমি তাকে পুরস্কৃত করেছিলাম।” (৪৩: ৫৯) সুতরাং ভাবার্থ এই নয় যে, স্বয়ং আল্লাহর কালেমাই ঈসা (আঃ) হয়ে গেছেন। বরং ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা’আলার কালেমার মাধ্যমে হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম হয়েছে।

সহীহ বুখারী শরীফে হ্যরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছে যে আল্লাহ এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল, ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর কালেমা যা তিনি মারইয়ামের মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলেন ও তিনি তাঁর রূহ এবং আরও সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত ও জাহানাম সত্য, তার আমল যাই হোক না কেন আল্লাহ তা’আলা তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন।” অন্য বর্ণনায় এতটুকু বেশী রয়েছে যে, সে জান্নাতের আটটি দরজার মধ্যে যেটি দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করবে। হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে যেমন হাদীসে ও কুরআনে “روح منه” বলা হয়েছে ঐ রকমই কুরআন কারীমের একটি আয়াতে রয়েছে-

وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَعِيشاً مِنْهُ

অর্থাৎ “তিনি যা কিছু আকাশে ও যা কিছু যমীনে রয়েছে সমস্তই নিজের পক্ষ হতে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন।” (৪৫: ১৩) অর্থাৎ স্থীয় মাখলুক হতে ও নিজের রূহ হতে এর ভাবার্থ এটাই। সুতরাং এখানে ‘মুন্হ’-এর সঙ্গে শব্দটি ‘تَبْعِيْص’ - এর জন্যে অর্থাৎ কতককে বুঝাবার জন্যে নয়, যেমন অভিশপ্ত খ্রীষ্টানদের ধারণা রয়েছে যে হ্যরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর একটা অংশ ছিলেন। বরং এখানে ‘অর্থাৎ প্রারম্ভের জন্যে এসেছে। হ্যরত মুজাহিদ বলেন যে, ‘রূহ মুন্হ’-এর ভাবার্থ হচ্ছে ‘রূপ মুন্হ’। অর্থাৎ তাঁর পক্ষ হতে রাসূল।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ‘مُحَمَّدٌ مِنْ’ কিন্তু বেশী স্পষ্ট হচ্ছে প্রথম উক্তিটি। অর্থাৎ তাঁকে রূহ দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে যা স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলার মাখলুক। সুতরাং তাঁকে ‘রহল্লাহ’ বলা ঐরূপই যেরূপ বলা হয় ‘নাকাতুল্লাহ’ (আল্লাহর উদ্ভী) এবং ‘বায়তুল্লাহ’। অর্থাৎ শুধুমাত্র সৌজন্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই নিজের দিকে সম্মত লাগিয়েছেন। হাদীস শরীফে এও রয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আমি আমার প্রভুর নিকট তাঁর ঘরে যাবো।’

তারপরে আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ তোমরা এ বিশ্বাস করে নাও যে, আল্লাহ এক, তিনি স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং এটাও বিশ্বাস করে নাও যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর দাস, তাঁর সৃষ্টি এবং তাঁর সম্মানিত রাসূল। তোমরা ‘তিনি’ বলো না। অর্থাৎ ঈসা (আঃ) ও মারইয়াম (আঃ)-কে আল্লাহর সাথে অংশীদার করো না। কেউ যে তাঁর অংশীদার হবে এ হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। সূরা-ই-মায়েদায় আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ.

অর্থাৎ ‘যারা বলে যে, আল্লাহ তিনজনের মধ্যে একজন তারা অবশ্যই কাফির হয়ে গেছে, আল্লাহ এক, তিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই।’ (৫:৭৩) যেমন আল্লাহ তা‘আলা সূরা-ই-মায়েদার শেষে বলেছেন-

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرِيمَ إِنَّمَا قُلْتَ لِلنَّاسِ أَتَتَخْذُونِي وَآمِنِي إِلَهِي  
مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا

অর্থাৎ ‘যখন আল্লাহ বললেন- হে মারইয়াম নন্দন ঈসা, তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, আল্লাহকে পরিত্যাগ করে তোমরা আমাকে ও আমার মাতাকে দুই মা’বৃদ্ধরূপে গ্রহণ কর?’ (৫: ১১৬) হ্যরত ঈসা (আঃ)

ওটা সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীকার করবেন। খ্রীষ্টানদের নিকট এ ব্যাপারে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই। অথবা তারা ভাস্তির পথে চালিত হয়ে নিজেদেরকে ধর্মসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো হ্যারত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। আর কেউ কেউ তাঁকে আল্লাহ তা'আলার শরীক মনে করছে। আবার কেউ কেউ তাঁকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলছে।

সত্য কথা এই যে, যদি দশজন খ্রীষ্টান একত্রিত হয় তবে তাদের খেয়াল হবে এগার রকম। সাইদ ইবনে বাতরীক ইসকান্দারী নামক খ্রীষ্টানদের একজন বড় পণ্ডিত প্রায় চারশ হিজরীতে বর্ণনা করেছে যে, কনস্টান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠাতা কুসতুন্তীনের আমলে সে যুগীয় বাদশাহর নির্দেশক্রমে খ্রীষ্টানদের এক সম্মেলন হয়। তথায় তাদের দু'হাজারেরও বেশী বড় বড় পাদরী ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে এত বেশী মতবিরোধ সৃষ্টি হয় যে, কোন বিষয়ের উপর সন্তুর আশি জনের বেশী লোক একমত হতে পারেনি। দশজনের এক রকম বিশ্বাস, বিশজনের আর এক খেয়াল, চল্লিশজন অন্য কিছু বলে এবং ষাট জন অন্য দিকে যায়।

মোটকথা, হাজার হাজার লোকের মধ্যে অতিকষ্টে মাত্র তিনশ আঠারোজন লোক এক সিদ্ধান্তে একমত হয়। বাদশাহ ঐ আকীদাকেই গ্রহণ করে এবং বাকীগুলো পরিত্যাগ করে। তাদেরই সে পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং তাদের জন্যে গীর্জা বানিয়ে দেয়, গ্রন্থার্জি লিখিয়ে দেয় ও আইন কানুন লিপিবদ্ধ করে। ওরাই আমানত-ই-কুবরার মাসআলা বের করে যা প্রকৃতপক্ষে জগন্যতম খেয়ানতই ছিল। ঐ লোকগুলোকে ‘মালেকানিয়্যাহ’ বলা হয়। দ্বিতীয় বার সম্মেলনে যে দলটি গঠিত হয়, তার নাম হচ্ছে ‘ইয়াকুবিয়্যাহ।’ অতঃপর তৃতীয় সম্মেলনে যে দলটি গঠিত হয় তার নাম ‘নাসতুরিয়্যাহ।’ এ তিনটি দল হ্যারত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে তিনটি উক্তি করে থাকে। (অর্থাৎ একদল তাঁকেই আল্লাহ বলে, একদল তাঁকে আল্লাহর অংশীদার বলে এবং একদল তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে)। তারা আবার একে অপরকে কাফির বলে থাকে। আর আমাদের নিকট তো তারা সবাই কাফির।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমরা এটা হতে বিরত হও এবং এ বিরত থাকাই তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। আল্লাহ তো এক, সন্তান হওয়া হতে তাঁর সন্তা সম্পূর্ণ পবিত্র। সমস্তই তাঁর সৃষ্টি এবং সমস্ত কিছুই তাঁর অধিকারে রয়েছে। সকলেই তাঁর দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সবকিছুই তাঁর উপর নির্ভরশীল। তাহলে তাঁরই মাখলুকের মধ্যে কেউ তাঁর স্ত্রী এবং কেউ তাঁর সন্তান কিরণে হতে পারে? অন্য একটি আয়াতে রয়েছে-

بِدِيعِ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ

অর্থাৎ তিনি তো হচ্ছেন প্রথম আকাশ ও যমীনের সৃষ্টিকারী, সুতরাং কিরণে তাঁর সন্তান হতে পারে? (৬: ১০১) সূরা-ই-মারইয়ামের ওَقَالُوا اتَّخَذَ<sup>১</sup> هَذَا<sup>২</sup> بَنًى<sup>৩</sup> وَقَدْ جِئْتُمْ شِيَرًا<sup>৪</sup> (১৯ : ৮৮-৯৫) পর্যন্ত আয়াতেও বিস্তারিতভাবে এর অঙ্গীকৃতি রয়েছে।

১৭২। আল্লাহর সেবক হতে  
মাসীহ এবং সান্নিধ্য থাণ্ড  
ফেরেশতাগণের কোনই  
সংকোচ নেই; এবং যে তাঁর  
সেবায় সংকুচিত হয় ও  
অহংকার করে, তিনি তাদের  
সকলকে নিজের দিকে  
একত্রিত করবেন।

১৭৩। অনন্তর যারা বিশ্বাস  
স্থাপন করেছে ও সৎকার্য করে  
থাকে, তাদেরকে তিনি তাদের  
সম্যক প্রতিদান প্রদান  
করবেন এবং স্বীয় সম্পদ হতে  
অধিকতর দান করবেন; এবং  
যারা সংকুচিত হয় ও  
অহংকার করে, তাদেরকে  
তিনি যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি প্রদান  
করবেন। এবং আল্লাহ ব্যতীত  
তারা নিজেদের জন্য কোন  
অভিভাবক বা সাহায্যকারী  
পাবে না।

১৭২- لَنْ يَسْتَنِكِفَ الْمَسِيحُ  
أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا  
الْمَلِكَةُ الْمُقْرِبُونَ وَمَنْ  
يَسْتَنِكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ  
وَيَسْتَكِبِرُ فَسِيَحُشْرُهُمْ إِلَيْهِ  
جَمِيعًا ○

১৭৩- فَامَّا الَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَيُوَفَّىٰ  
أُجُورُهُمْ وَيُزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ  
وَامَّا الَّذِينَ اسْتَنِكُوا  
وَاسْتَكَبَرُوا فَيُعَذَّبُهُمْ عَذَابًا  
أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ  
دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نِصِيرًا ○

ভাবার্থ এই যে, হযরত মাসীহ (আঃ) ও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতাগণও আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে মোটেই সংকোচবোধ করেন না এবং অহংকারও করেন না। এটা তাদের জন্যে শোভনীয়ও নয়। বরং যাঁরা যত বেশী আল্লাহ তা'আলার নৈকট লাভ করেন তাঁরা ততো বেশী পরিমাণ তাঁর ইবাদত করে থাকেন। কেউ কেউ এ আয়াত দ্বারা এ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, ফেরেশতাগণ মানুষ অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ আয়াত দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয় না। কেননা, এখানে **مَسِيحٌ**-এর উপর **مُلِكٌ** শব্দের সংযোগ হয়েছে। আর **إِسْتِنْكَافٌ** শব্দের অর্থ হচ্ছে বিরত হওয়া এবং ফেরেশতাদের মধ্যে এ শক্তি হযরত মাসীহ (আঃ) অপেক্ষা বেশী আছে। এ জন্যে এটা বলা হয়েছে। কিন্তু বিরত হওয়ার উপর বেশী ক্ষমতাবান হওয়াতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। এও বলা হয়েছে যে, হযরত ইস্রাইল (আঃ)-কে যেমন মানুষ পূজো করতো তেমন ফেরেশতাদেরকেও পূজো করতো। তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইস্রাইল (আঃ) মানুষকে আল্লাহর ইবাদত হতে বাধা দেননি। তারপরে ফেরেশতাদেরও এ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা যাঁদের পূজো করছে তাঁরাও স্বয়ং আল্লাহর ইবাদত করে থাকেন। সুতরাং তাঁদেরকে পূজো করা নির্দ্দিতা ছাড়া আর কি হতে পারে? যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

**وَقَالُوا أَتَأْخُذُ الرَّحْمَنُ وَلَا سَبِّحْنَاهُ بِلِّعِبَادٍ مُّكْرِمُونَ**

অর্থাৎ ‘তারা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন। অথচ তিনি তা হতে পবিত্র, বরং তারা সম্মানিত দাস।’ (২১: ২৬) তাই, এখানেও বলা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং অহংকার করছে তারা একদিন তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তিত হবে এবং সেদিন তাদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তা তারা নিজেরাই শনে নেবে। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করতঃ সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে তাদের কার্যের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় করুণা দ্বারা পুরস্কৃত করবেন।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ **أَجْرٌ** তো এই যে, তাকে আল্লাহ তা'আলা জানাতে প্রবিষ্ট করেন এবং **وَيَزِيدُهُمْ** **مِنْ فَضْلِهِ** -এর ভাবার্থ এই যে,

যার জন্যে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে তার জন্যেও এই সব লোক সুপারিশ করবে যাদের সাথে সে দুনিয়ায় ভাল ব্যবহার করেছে। কিন্তু এর সনদ প্রমাণিত নয়। কিন্তু যদি হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর উক্তির উপরেই ওটা বর্ণনা করা হয় তবে ঠিকই আছে।

অতঃপর বলা হচ্ছে- ‘যারা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত ও আনুগত্য হতে সরে পড়ে এবং অহংকার করে তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা যত্নগাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। তারা আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না’। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে-

رَأَنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيِّدِ الْخَلْقِ جَهَنَّمَ دُخِرُّبِنَ -

অর্থাৎ ‘যারা আমার ইবাদত হতে অংহকার করে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’ (৪০: ৬০) অর্থাৎ তাদের অস্বীকার ও অহংকারের প্রতিদান এই দেয়া হবে যে, তারা ঘৃণ্য, লাঞ্ছিত ও অপাদন্ত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

### ১৭৪। হে লোক সকল!

তোমাদের প্রতিপালকের  
সন্ধান হতে তোমাদের  
নিকট প্রত্যক্ষ প্রমাণ এসেছে  
এবং আমি তোমাদের প্রতি  
সমুজ্জ্বল জ্যোতি অবর্তীণ  
করেছি।

১৭৫। অতঃপর যারা আল্লাহর  
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে  
এবং তাঁকে সুদৃঢ় রূপে ধারণ  
করেছে, ফলতঃ তিনি  
তাদেরকে স্বীয় করণা ও  
কল্যাণের দিকে প্রবিষ্ট  
করবেন এবং স্বীয় সরল পথে  
পথ-প্রদর্শন করবেন।

- ১৭৪ -  
يَا يَهَا النَّاسُ قَدْ جَاءُوكُمْ

بُرْهَانٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا  
إِلَيْكُمْ نُورًا مِّنْ نَا

- ১৭৫ -  
فَامَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ

وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيِّدِ خَلْقِهِمْ  
فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ  
وَهُدًى إِلَيْهِمْ أَلَيْهِ صِرَاطًا  
مَسْتَقِيمًا

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানব জাতিকে সঙ্গেধন করে বলেছেন-আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট পূর্ণ দলীল, ওয়ার, আপত্তি ও সন্দেহ দূরকারী প্রমাণাদি অবতীর্ণ করা হয়েছে। আমি তোমাদের উপর স্পষ্ট জ্যোতি (কুরআন কারীম) অবতীর্ণ করেছি, যার দ্বারা সত্যের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

ইবনে জুরায়েজ প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এর দ্বারা কুরআন কারীমকে বুঝান হয়েছে। এখন যারা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনয়ন করবে, তাঁর উপরই পূর্ণ নির্ভরশীল হবে, তাঁকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, তাঁরই দাসত্ব করবে, সমস্ত কাজ তাঁকেই সমর্পণ করবে এবং এও হতে পারে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতঃ তাঁর কিতাবকে দৃঢ়রূপে ধারণ করবে তাদের উপর তিনি স্বীয় করুণা ও অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন, তাদেরকে সুখময় জান্মাতে প্রবিষ্ট করবেন, তাদের প্রতিদান বৃদ্ধি করবেন, তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন এবং তাদেরকে এমন সরল সঠিক পথ-প্রদর্শন করবেন যা না কোন দিকে বাঁকা থাকবে, না কোন জায়গা সংকীর্ণ হবে। সুতরাং মুমিন ব্যক্তি পৃথিবীতে সরল ও সোজা পথের উপরে থাকে এবং ইসলামের "পথে থাকে। আর পরকালে থাকে জান্মাতের পথে ও শান্তির পথে। তাফসীরের প্রারম্ভে একটি পূর্ণ হাদীস অতীত হয়েছে যাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘোষণা রয়েছে- আল্লাহর সরল ও সোজা পথ এবং তাঁর সুদৃঢ় রজ্জু হচ্ছে কুরআন কারীম।

### ১৭৬। তারা তোমার নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করছে, তুমি

বল- আল্লাহ তোমাদেরকে  
পিতা-পুত্রহীন সম্বন্ধে ব্যবস্থা  
দান করছেন, যদি কোন  
ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মরে  
যায় এবং তার ভগী থাকে  
তবে সে তার পরিত্যক্ত  
সম্পত্তি হতে অর্ধাংশ পাবে;  
এবং যদি কোন নারীর সন্তান  
না থাকে তবে তার ভাতাই  
তদীয় উত্তরাধিকারী হবে;  
কিন্তু যদি দু' ভগী থাকে তবে

— ১৭৬ —  
يَسْتَفْتُونَكَ قِيلَ اللَّهُ

يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنْ امْرَأً  
هَلَّكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أختٌ  
فَلَهَا نُصُفُّ مَا تَرَكَ وَهُوَ  
يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يُكُنْ لَهَا وَلَدٌ  
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا  
الثُّلُثُنِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا

তাদের উভয়ের জন্যে  
পরিত্যক্ত বিষয়ের দুই  
ত্বক্তীয়াৎশ এবং যদি তারা  
আতা-ভগ্নী পুরুষ ও নারীগণ  
থাকে, তবে পুরুষ দু' নারীর  
তুল্য অংশ পাবে, আল্লাহ  
তোমাদের জন্যে বর্ণনা  
করছেন যেন তোমরা বিভাস্ত  
না হও, এবং আল্লাহ  
সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

إِخْوَةٌ رِّجَالًا وَ نِسَاءٌ فَلِلذِّكْرِ  
مُثُلٌ حَظٌ الْأَنْشِيْنَ بَيْنَ اللَّهِ  
لَكُمْ أَنْ تَضْلُوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ  
٤٤٥٤ شَيْءٍ عَلِيمٌ

হ্যরত বারা' (রাঃ) বলেন যে, সূরাসমূহের মধ্যে সর্বশেষ অবতীর্ণ হয় সূরা-ই-বারা'আত এবং আয়াতসমূহের মধ্যে সর্বশেষে অবতীর্ণ হয় ইস্টফটোনক-এ আয়াতটি। হ্যরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ “আমি রোগে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে দেখতে আসেন। তিনি অযু করে সেই পানি আমার উপর নিক্ষেপ করেন, ফলে আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমি তাঁকে বলি! হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমিতো ‘কালালা’। আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি কিভাবে বন্ধিত হবে? সে সময় আল্লাহ তা'আলা ফরায়ের আয়াত অবতীর্ণ করেন।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় এ আয়াতটিই অবতীর্ণ হওয়ার কথা রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘মানুষ তোমাকে জিজ্ঞেস করে অর্থাৎ ‘কালালা’ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে’। প্রথমে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, ‘কালালা’ শব্দটি **لَكِيل** শব্দ হতে নেয়া হয়েছে যা চতুর্দিক হতে মাথাকে ঘিরে থাকে। অধিকাংশ আলেমের মতে ‘কালালা’ ঐ মৃত ব্যক্তিকে বলা হয় যার পুত্র ও পৌত্র না থাকে। আবার কারও কারও উক্তি এও আছে যে, যার পুত্র না থাকে। যেমন এ আয়াতে রয়েছেঃ **لَيْسَ لَهُ ولد**

হ্যরত উমার ইবনে খাতাব (রাঃ)-এর সামনে যেসব জটিল প্রশ্ন এসেছিল তন্মধ্যে এটিও ছিল একটি। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে, হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ ‘তিনটি বিষয় সম্বন্ধে আমার এ আকাঞ্চ্ছা রয়ে গেল যে, যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ সব ব্যাপারে আমাদের নিকট কোন

অঙ্গীকার করতেন তাহলে আমরা ঐ দিকে প্রত্যাবর্তন করতাম। ঐগুলো হচ্ছে দাদা, কালালা এবং সুদের অধ্যায়সমূহ। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ‘কালালা’ সম্বন্ধে যত প্রশ্ন করেছি অন্য কোন মাসআলা সম্বন্ধে ততো প্রশ্ন করিনি। অবশ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার বক্ষে স্বীয় আঙুলির দ্বারা আঘাত করে আমাকে বলেনঃ “তোমার জন্যে গ্রীষ্মকালের আয়াতটিই যথেষ্ট যা সূরা-ই-নিসার শেষে রয়েছে।”

অন্য হাদীসে রয়েছে, হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে আরও বেশী করে জেনে নিতাম তবে আমার জন্যে লাল উট পাওয়া অপক্ষেও উত্তম হতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ কথার ভাবার্থ হয়তো এই হবে যে, আয়াতটি সম্বৃতঃ গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বুঝবার উপায় বলে দিয়েছিলেন এবং ওতেই যথেষ্ট হবে একথা বলেছিলেন, তাই তিনি ওর অর্থ জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তিনি দুঃখ প্রকাশ করতে থাকেন।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ‘কালালা’ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন এবং বলেনঃ “আল্লাহ তা'আলা কি এটা বর্ণনা করেননি?” তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) স্বীয় ভাষণে বলেনঃ “সূরা-ই-নিসার প্রথম দিকে ফারায়েমের ব্যাপারে যে আয়াতটি রয়েছে তা পুত্র ও পিতার জন্যে, দ্বিতীয় আয়াতটি স্বামী-স্ত্রী, বৈপিত্রীয় ভাইদের জন্যে এবং যে আয়াত দ্বারা সূরা-ই-নিসাকে সমাপ্ত করা হয়েছে ওটা সহোদর ভাই-বোনদের জন্যে। আর যে আয়াত দ্বারা সূরা-ই-আনফালকে শেষ করা হয়েছে তা হচ্ছে আজীয়দের জন্যে যে আজীয়তার মধ্যে ‘আসাবা’ চালু রয়েছে”। (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর)

### অর্থের উপর কালামের বর্ণনাঃ

এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে **মাটَ هَلَكَ شَبَدِهِ** অর্থাৎ মরে গেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—**كُلُّ شَيْءٍ هَلَكٌ إِلَّا وَجْهِهِ**—“আল্লাহ তা'আলার সত্তা ছাড়া সমস্ত জিনিসই মরণশীল।” (৮৮: ৮৮) অন্য আয়াতে রয়েছে—

**كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ \* وَبَقَى وَجْهُ رِبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ \***

অর্থাৎ “এর উপর যা রয়েছে সবই মরণশীল, শুধু তোমার প্রভুর চেহারা অবশিষ্ট থাকবে যিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও মহা সম্মানিত।” (৫৫: ২৬-২৭)

এরপর বলা হচ্ছে-‘তার পুত্র নেই’। এর দ্বারা কেউ কেউ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, ‘কালালার’ শর্তে পিতা না হওয়া নেই বরং যার পুত্র নেই সেই ‘কালালা’। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে হ্যরত উমার ইবনে খাতাব (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে।

কিন্তু জমহুরের উক্তিই হচ্ছে সঠিক এবং হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এরও সিদ্ধান্ত এটাই যে, ‘কালালা’ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার পুত্র ও পিতা নেই এবং আয়াতের পরবর্তী শব্দ দ্বারাও এটাই বুঝা যাচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

وَلِهِ اخْتَفْلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

অর্থাৎ “যদি তার ভগী থাকে তবে তার জন্যে সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদ হতে অর্ধাংশ ।” আর যদি বোনের সঙ্গে পিতা থাকে তবে পিতা তাকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করে দেবে। সবারই মত এই যে, ঐ অবস্থায় বোন কিছুই পাবে না। সুতরাং সাব্যস্ত হচ্ছে যে, ۝۝۝ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার পুত্র না থাকে এবং এটা প্রকাশ্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর যদি পিতাও না থাকে এবং এটা দলীল দ্বারাই সাব্যস্ত হচ্ছে বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ চিন্তার পর। কেননা, পিতার বিদ্যমানতায় বোন অর্ধাংশতো পায়ই না, এমন কি সে উত্তরাধিকার হতে সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত হয়।

হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ)-কে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয় যে, একটি স্ত্রী লোক মারা গেছে। তার স্বামী ও একটি সহোদরা ভগী রয়েছে। তখন তিনি বলেনঃ “অর্ধেক স্বামীকে দাও অর্ধেক ভগীকে দাও।” তাঁকে এর দলীল জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ “আমার উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক্ষেপ অবস্থায় এ ফায়সালাই করেছিলেন”। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) হতে নকল করা হয়েছে, যে মৃত ব্যক্তি একটি মেয়ে ও একটি বোন ছেড়ে যায় এর ব্যাপারে তাঁদের উভয়েরই ফতওয়া ছিল এই যে, ঐ অবস্থায় বোন বঞ্চিতা হয়ে যাবে, সে কিছুই পাবে না। কেননা, কুরআন কারীমের এ আয়াতে বোনের অর্ধাংশ

পাওয়ার অবস্থা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে। আর এখানে সন্তান রয়েছে। কিন্তু জামহূর এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন যে, ঐ অবস্থাতেই নির্ধারিত অংশ হিসেবে মেয়ে অর্ধেক পাবে এবং ‘আসাবা’ হিসেবে বোনও অর্ধেক পাবে।

হ্যরত ইবরাহীম ইবনে আসওয়াদ (রঃ) বলেনঃ আমাদের মধ্যে হ্যরত মুআয় ইবনে জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে এ ফায়সালা করেন যে, অর্ধেক মেয়ে পাবে ও অর্ধেক ভগ্নী পাবে। সহীহ বুখারীর আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হ্যরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর মেয়ে, পৌত্রী ও বোনের ব্যাপারে মেয়েকে অর্ধেক ও বোনকে অর্ধেক দেয়ার ফতওয়া দেন, অতঃপর বলেনঃ “হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কেও একটু জিজ্ঞেস করে এসো। সম্ভবতঃ তিনি আমার মতই ফতওয়া দেবেন।” কিন্তু যখন হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয় এবং সাথে সাথে হ্যরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর ফতওয়াও তাঁকে শুনিয়ে দেয়া হয় তখন তিনি বলেনঃ “তাহলে তো আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো এবং সুপথ প্রাণ লোকদের মধ্যে আমি গণ্য হবো না। জেনে রেখো এ ব্যাপারে আমি ঐ ফায়সালাই করবো যে ফায়সালা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) করেছেন। অর্ধেক দাও মেয়েকে, এক ষষ্ঠাংশ দাও পৌত্রীকে, তাহলে দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়ে গেল এবং যা অবশিষ্ট থাকলো তা বোনকে দিয়ে দাও।” আমরা ফিরে এসে হ্যরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-কে এ সংবাদ দিলে তিনি বলেনঃ “যে পর্যন্ত এ আল্লামা তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন সে পর্যন্ত তোমরা আমার নিকট এ মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এসো না।”

অতঃপর বলা হচ্ছে—‘এ তার উত্তরাধিকারী হবে যদি তার সন্তান না থাকে।’ অর্থাৎ ভাই তার বোনের মালের উত্তরাধিকারী হবে যদি সে ‘কালালা’ হয় অর্থাৎ যদি তার সন্তান ও পিতা না থাকে। কেননা, পিতার বর্তমানে ভাই কোন অংশ পাবে না। হ্যাঁ, তবে যদি ভাই-এর সঙ্গে অন্য কোন নির্দিষ্ট অংশ বিশিষ্ট উত্তরাধিকারী থাকে, যেমন স্বামী বা বৈপিত্রেয় ভাই, তবে তাকে তার অংশ দিয়ে দেয়া হবে এবং অবশিষ্ট মালের উত্তরাধিকারী ভাই হবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা ফারায়েয়কে ওর প্রাপকের সঙ্গে

মিলিয়ে দাও। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা ঐ পুরুষলোকের জন্যে যে বেশী নিকটবর্তী।”

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘বোন যদি দু’টো হয় তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে।’ দু’য়ের বেশী বোনেরও একই হুকুম। এখান হতেই একটি দল দুই মেয়ের হুকুম গ্রহণ করেছেন। যেমন দু’য়ের বেশী বোনের হুকুম দু’টি মেয়ের হুকুম হতে নিয়েছেন যে আয়াতের শব্দগুলো নিম্নরূপঃ

فَإِنْ كُنْ نِسَاءٌ فَوْقُ اثْنَتِينِ فَلْهُنْ ثُلَاثًا مَا تَرَكَ

অর্থাৎ “যদি তারা দু’য়ের উপর স্ত্রীলোক হয় তবে সে যা ছেড়ে যাবে তা হতে তাদের জন্যে দুই তৃতীয়াংশ।”

অতঃপর বলা হচ্ছে— যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে তবে প্রত্যেক পুরুষের অংশ দু’জন নারীর সমান। ‘আসাবা’রও এ হুকুমই। তারা ছেলেই হোক বা পৌত্রই হোক অথবা ভাই হোক যখন তাদের মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়ই থাকবে তখন দু’জন নারী যা পাবে একজন পুরুষও তাই পাবে। আল্লাহ স্বীয় ফারায়েয় বর্ণনা করছেন, স্বীয় সীমা নির্ধারণ করছেন এবং স্বীয় শরীয়ত প্রকাশ করছেন যেন তোমরা পথভঙ্গ না হও।’ আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত কার্যের পরিণাম অবগত রয়েছেন, বান্দাদের মঙ্গল ও অঙ্গল সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। প্রাপকের প্রাপ্য কি তা তিনি খুব ভালই জানেন।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণ সমভিব্যাহারে কোন জায়গায় যাচ্ছিলেন। তাঁরা সফরে ছিলেন। হ্যরত হ্যাইফা (রাঃ)-এর সোয়ারীর মাথা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে উবিষ্ট সাহাবীর নিকটে ছিল এবং হ্যরত উমার (রাঃ)-এর সোয়ারীর মাথা হ্যরত হ্যাইফা (রাঃ)-এর সোয়ারীর দ্বিতীয় আরোহীর নিকটে ছিল। এমন সময়ে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন হ্যরত হ্যাইফা (রাঃ)-কে এটা শুনিয়ে দেন এবং হ্যরত হ্যাইফা (রাঃ) হ্যরত উমার (রাঃ)-কে শুনিয়ে দেন। এরপর আবার যখন হ্যরত উমার (রাঃ) এটা জিজ্ঞেস করেন তখন হ্যাইফা (রাঃ) বলেনঃ ‘আল্লাহর শপথ আপনি অবুৰুৎ। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে যেমনভাবে

শুনিয়ে ছিলেন তেমনই আমিও আপনাকে শুনিয়েছি। আল্লাহর শপথ! আমি এর উপর কিছুই বেশী করতে পারি না।” তাই হ্যরত উমার ফারাক (রাঃ) বলতেন, “হে আল্লাহ! আপনি প্রকাশ করেছেন বটে কিন্তু আমার নিকট তা প্রকাশিত হয়নি।” কিন্তু এ বর্ণনাটি মুনকাতা’। এ বর্ণনারই অন্য সনদে আছে যে, হ্যরত উমার (রাঃ) তার এ দ্বিতীয় বার প্রশ্ন তাঁর খিলাফতের যুগে করেছিলেন।

অন্য হাদীসে রয়েছে, হ্যরত উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ ‘কালালার উন্নোধিকার কিভাবে বটিত হবে’। সে সময় আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। কিন্তু তিনি তাতেও পূর্ণভাবে সান্ত্বনা লাভ করতে পারেননি বলে স্বীয় কন্যা ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহধর্মিণী হ্যরত হাফসা (রাঃ)-কে বলেনঃ ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খুশীর অবস্থায় তুমি এটা জিজ্ঞেস করে নিও।’ অতএব হ্যরত হাফসা (রাঃ) একদা একুপ সুযোগ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এটা জিজ্ঞেস করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত হাফসা (রাঃ)-কে বলেনঃ “সম্বতঃ তোমার পিতা তোমাকে এটা জিজ্ঞেস করতে বলেছেন। আমার ধারণা তিনি এটা মনে রাখতে পারবেন না।” হ্যরত উমার (রাঃ) একথা শুনতে পেয়ে বলেনঃ “রাসূলুল্লাহই (সঃ) যখন এ কথা বলেছেন তখন আমি ওটা জানতে পারি না।”

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হ্যরত উমার (রাঃ)-এর নির্দেশক্রমে হ্যরত হাফসা (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঝুঁটির উপর এ আয়াতটি লিখিয়ে দেন, অতঃপর হাফসা (রাঃ)-কে বলেনঃ ‘উমার (রাঃ) কি তোমাকে এটা জিজ্ঞেস করতে বলেছিলেনঃ আমার ধারণা যে তিনি এটা ঠিক রাখতে পারবেন না। তাঁর জন্যে কি গ্রীষ্ম কালের ঐ আয়াতটি যথেষ্ট নয় যা সূরা-ই-নিসায় রয়েছেঃ’ ওটা হচ্ছেঃ *وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَورثُ كَلَّةً أَوْ مَرْأَةً*—এ আয়াতটি। তার পরে জনগণ যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন তখন ঐ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় যা সূরা-ই-নিসার শেষে রয়েছে এবং ঝুঁটি নিষ্কেপ করা হয়। এ হাদীসটি মুরসাল।

একদা হ্যরত উমার (রাঃ) সাহাবীগণকে একত্রিত করেন এবং ঝুঁটির একটি খণ্ড নিয়ে বলেনঃ “আজ আমি এমন একটা ফায়সালা করবো যে,

পর্দানশীন নারীরাও জানতে পারবে।” ঐ সময়েই ঘর হতে একটি সাপ বেরিয়ে আসে এবং সমস্ত লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক চলে যায়। তখন হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “মহা সম্মানিত আল্লাহর যদি এ কাজ পূর্ণ করার ইচ্ছে থাকতো তবে তিনি অবশ্যই তা পূর্ণ করিয়ে দিতেন।” এর ইসনাদ সহীহ।

মুসতাদরিক-ই-হাকিম গ্রন্থে রয়েছে যে, হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “যদি আমি তিনটি জিজ্ঞাস্য বিষয় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করে নিতাম তবে তা আমার নিকট লালবর্ণের উট পাওয়া অপেক্ষাও পছন্দনীয় হতো। প্রথম হচ্ছে এই যে, তাঁর পরে খলীফা কে হবেন? দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, যেসব লোক যাকাতকে স্বীকার করে বটে কিন্তু বলে-আমরা আপনার নিকট আদায় করবো না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হালাল কি না? তৃতীয় হচ্ছে ‘কালালা’ শ্বসক্ষে”। অন্য হাদীসে যাকাত আদায় না করার স্থলে সুদের মাসআলার বর্ণনা রয়েছে। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “হ্যরত উমার (রাঃ)-এর শেষ যুগে আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ ‘কথা ওটাই যা আমি বলেছি।’ আমি জিজ্ঞেস করি-ওটা কি? তিনি বলেন **ম্যার্ট** তাকেই বলে যার সন্তান না থাকে।”

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “**ম্যার্ট**-এর ব্যাপারে আমার ও হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় এবং কথা ছিল ওটাই যা আমি বলছিলাম।” হ্যরত উমার (রাঃ) সহোদর ভাইদেরকেও বৈপিত্রেয় ভাইদেরকে এক তৃতীয়াংশে অংশীদার করতেন যখন তারা একত্রিত হতো। কিন্তু হ্যরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর বিপরীত ছিলেন। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, মুসলমানদের খলীফা হ্যরত উমার (রাঃ) একবার দাদার উত্তরাধিকার ও ‘কালালা’র ব্যাপারে এক টুকরো কাগজে কিছু লিখেছিলেন। তারপর তিনি ইসতিখারা (লক্ষণ দেখে শুভাশুভ বিচার) করেন এবং অপেক্ষা করতে থাকেন। তিনি আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করতে থাকেনঃ “হে আমার প্রভু! আপনার জ্ঞানে যদি এতে মঙ্গল নিহিত থাকে তবে তা আপনি চালু করে দিন।”

অতঃপর যখন তাঁকে আহত করা হয় তখন তিনি ঐ কাগজ খণ্ডকে চেয়ে নিয়ে লিখা উঠিয়ে ফেলেন। জনগণ জানতে পারলো না যে, তাতে কি লিখা

ছিল। অতঃপর তিনি নিজেই বলেনঃ ‘আমি ওতে পিতামহ ও ‘কালালা’র কথা লিখেছিলাম এবং আমি ইসতিখারা করেছিলাম। তারপরে আমার ধারণা হয় যে, তোমরা যার উপরে ছিলে তার উপরেই তোমাদেরকে ছেড়ে দেই।’ তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে, হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “এ ব্যাপারে আমি হ্যরত আবু বকর (রাঃ) এর বিরোধিতা করায় লজ্জাবোধ করছি।”

হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর উক্তি ছিলঃ ‘কালালা’ ঐ ব্যক্তি যার পিতা ও পুত্র না থাকে। এর উপরেই রয়েছেন জমহুর-ই-সাহাবা (রাঃ), তাবেঙ্গন এবং আইশ্মা-ই-দ্বীন। ইমাম চতুষ্টয় ও সপ্ত ধর্মশাস্ত্রবিদেরও এটাই মাযহাব। পবিত্র কুরআনেও এরই প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ তা‘আলা সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।” আল্লাহ তা‘আলই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূরা :

‘নিসা’র তাফসীর

সমাপ্ত

## سُورَةُ الْمَائِدَةِ مَدْنِيَّةٌ

(আয়াতঃ ১২০, রুক্ক'ঃ ১৬)      (১৬, رُكُوعَاتِهَا: ১২০)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল একটি হাদীসের উল্লেখ করে বলেছেন যে, আসমা বিনতে ইয়ায়ীদ বর্ণনা করেছেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আয়রা নামী উষ্টীর লাগাম ধারণ করেছিলাম। তখন হঠাৎ তাঁর উপর সম্পূর্ণ সূরা মায়িদাহ অবতীর্ণ হয়। এ সূরার ভাবে তখন উষ্টীর পায়ের উপরিভাগ ভেঙ্গে চুরমার হবার উপক্রম হয়। আসেম আল আইওয়াল বর্ণনা করেন যে, আমর তাঁর চাচার নিকট থেকে তাঁর নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তাঁর চাচা একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর সূরা মায়িদাহ অবতীর্ণ হয়। সূরা মায়িদাহ ভাবে তাঁর বাহনের ঘাড় ভেঙ্গে চুরমার হবার উপক্রম হয়। আবার আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, 'রাসূলে কারীম (সঃ)' যখন তাঁর বাহনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন তখন তাঁর উপর সূরা মায়িদাহ অবতীর্ণ হয়, এর ফলে বাহনটি তাঁকে বহন করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। তখন তিনি তাঁর বাহন হতে অবতরণ করেন। এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল একাই বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিয়ী হাদীসটিকে একটু অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে সূরা 'মায়িদাহ' ও সূরা 'আল-ফাত্হ' সর্বশেষ সূরা। এরপর ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এ হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, হাদীসের সংজ্ঞান্যায়ী এটা একটা 'গারীব' ও 'হাসান' হাদীস। তিনি ইবনে আবুস (রাঃ)-এর উদ্দ্বিত্ত দিয়ে আরও বলেছেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা হলো: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ' (১১০: ১)

হাকিম তাঁর 'মুসতাদরিক' গ্রন্থে তিরমিয়ীর বর্ণনার ন্যায় আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের সনদের মাধ্যমে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এটা ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) কর্তৃক আরোপিত শর্তানুযায়ী একটি সহীহ হাদীস। কিন্তু ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) কেউই এ হাদীসটিকে তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। হাকিম আরও বর্ণনা করেন যে, যুবাইর ইবনে নুফাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি একদা হজ্জে গমন করি। এরপর আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে

দেখা করি। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘হে যুবাইর (রাঃ)! তুমি কি  
সূরা মায়দাহ পড়?’ আমি উত্তরে বললামঃ হ্যাঁ। তখন তিনি বললেনঃ “এটাই  
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ শেষ সূরা। সুতরাং তোমরা তার মাধ্যমে  
যেসব বিষয় বৈধ হিসেবে পাও সেগুলোকে বৈধ হিসেবে গ্রহণ কর। আর  
যেগুলোকে অবৈধ হিসেবে পাও সেগুলোকে অবৈধ হিসেবে গ্রহণ কর।”  
অতঃপর হাকিম এ হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এটা ইমাম বুখারী (রঃ)  
ও ইমাম মুসলিম (রঃ) কর্তৃক আরোপিত শর্তানুযায়ী একটি সহীহ হাদীস।  
কিন্তু হাদীসটিকে তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে স্থান দেননি।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল আবদুর রহমান ইবনে মাহদীর সনদের  
মাধ্যমে মুআবিয়া ইবনে সালেহ হতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং কিছু  
বেশী অংশ যোগ করেন। এ বেশী অংশটুকু নিম্নরূপঃ

যুবাইর ইবনে নুফাইর (রাঃ) বলেনঃ “আমি একদা হ্যরত আয়েশা  
(রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি  
বলেন যে, পবিত্র কুরআনই তাঁর চরিত্র।” ইমাম নাসাইও (রঃ) এ হাদীসটিকে  
আবদুর রহমান ইবনে মাহ্মীর সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

ପରମ କରୁଥାଯିବ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଜୀ ଆଲ୍ଲାହର ନାମେ ଶ୍ରୀ କରାଇ ।  
୧ । ହେ ମୁମିନଗଣ ! ତୋମରା  
ତୋମାଦେର ଓୟାଦାଗୁଲୋ ପାଲନ  
କର । ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟେ ଚତୁଃପଦ  
ଜନ୍ମ ହାଲାଲ କରା ହେଁଛେ ।  
ତବେ ଯେଣୁଲୋ ହାରାମ ହେୟା  
ସମ୍ପର୍କେ ତୋମାଦେର ଉପର  
ପବିତ୍ର କୁରାନେର ଆୟାତଗୁଲୋ  
ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଁଛେ ସେଣୁଲୋ ଏବଂ  
ଇହରାମ ବାଁଧା ଅବସ୍ଥାର  
ତୋମାଦେର ଶିକାର କରା  
ଜନ୍ମ ଗୁଲୋ ହାଲାଲ ନୟ ।  
ନିଶ୍ଚଯଇ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ର ଇଚ୍ଛାମତ  
ହୁକୁମ କରେ ଥାକେନ ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
كَيْفَ يَعْلَمُ الَّذِينَ امْنَوْا وَمَا  
بِالْعَقُودِ أَحْلَتْ لَكُمْ بِهِمْ  
الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يَتَلَى  
عَلَيْكُمْ غَيْرُ مَحْلِي الصِّدْرِ  
وَإِنْتُمْ حَرَمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا  
يَرِيدُ

২। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী, নিষিদ্ধ মাসগুলো, কুরবানীর পশুগুলোর গলায় ব্যবহৃত চিহ্নগুলো এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পাবার জন্যে সম্মানিত ঘরে যাবার ইচ্ছে করে তাদের অবমাননা করা বৈধ মনে করো না। আর তোমরা যখন ইহরামমুক্ত হও তখন শিকার কর। যারা তোমাদেরকে পবিত্র মসজিদে যেতে বাধা দিয়েছে সেই সম্প্রদায়ের দুশমনি যেন তোমাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে যেতে উৎসাহিত না করে। নেক কাজ করতে ও সংযৰ্দ্দি হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর। তবে পাপ ও শক্রতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

٢- يَا يَهَا الَّذِينَ امْنَوْا لَا تَحْلُوا  
شَعَابِرُ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ  
وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَادِ وَلَا  
أَمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَسْتَغْوِنُ  
فَضْلًا مِنْ رِبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
يَجِرْ مِنْكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ إِنْ  
صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوِنُوا عَلَى  
الْبَرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوِنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

মা'আন অথবা আউফ হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে কিছু উপদেশ দিতে অনুরোধ করেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ ‘যখন তুমি **‘يَا يَهَا الَّذِينَ امْنَوْا’** কথাটি শ্রবণ কর তখন তার জন্যে তোমার কানকে সতর্ক করে দিও। কারণ, হয়তো তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুরিনদেরকে কোন ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করছেন।’ আবার যুহুরী হতে বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহ **‘يَا يَهَا الَّذِينَ امْنَوْا’** বলে কোন কাজের নির্দেশ দেন তখন তোমরা ঐ কাজ কর। কারণ, উক্ত সম্বোধনের মধ্যে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের

মধ্যে আল্লাহর নবীও (সঃ) আছেন। আবার খাইসুমা হতে বর্ণিত আছে যে, পবিত্র কুরআনে যে অবস্থায় **يَأْبِهَا الَّذِينَ أَمْنَوا** বলে সম্মোধন করা হয়েছে সেই অবস্থায় পবিত্র তাওরাত গ্রহে **يَأْبِهَا الْمَسَائِكِينُ** বলে সম্মোধন করা হয়েছে। যায়েদ ইবনে ইসমাইল তাঁর সনদের মাধ্যমে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির মূল রাবী ইবনে আবুবাস (রাঃ) বলেনঃ “পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত **يَأْبِهَا الَّذِينَ أَمْنَوا** দ্বারা যাদেরকে সম্মোধন করা হয়েছে, হ্যরত আলী (রাঃ) তাঁদের মধ্যে নেতৃত্বানীয় ও সম্মানিত। কারণ, পবিত্র কুরআনে একমাত্র হ্যরত আলী (রাঃ) ছাড়া অন্যান্য সকল সাহাবীকে ভর্তসনা করা হয়েছে। হ্যরত আলী (রাঃ)-কে কুরআনের কোথাও ভর্তসনা করা হয়নি।” তাফসীরকারক ইবনে কাসীর মন্তব্য করেন যে, হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এ হাদীসটি ‘গারীব’। এ হাদীসের মধ্যে কতগুলো অশোভনীয় শব্দ রয়েছে এবং এর সনদ সম্পর্কেও মন্তব্য করার অবকাশ আছে। এ হাদীসের একজন রাবী ঈসা ইবনে রাশেদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রঃ) মন্তব্য করেছেন যে, তিনি একজন অপরিচিত ব্যক্তি এবং হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী তাঁর হাদীস ‘মুনকার’। ইবনে কাসীর (রঃ) উক্ত হাদীসের একজন রাবী আলী ইবনে বুজাইমা সম্পর্কে বলেন যে, যদিও তিনি একজন বিশ্বস্ত রাবী, কিন্তু তিনি শিয়া মতাবলম্বী। তাঁর থেকে বর্ণিত এ ধরনের হাদীসের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকায় এটা গ্রহণযোগ্য নয়। এ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, পবিত্র কুরআনে আলী (রাঃ) ছাড়া আর সকল সাহাবীকে ভর্তসনা করা হয়েছে। অবশ্য এর দ্বারা পবিত্র কুরআনের ঐ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে আয়াতে সাহাবীদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আলাপ করার পূর্বে ‘সাদকা’ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। একধিক ব্যক্তি উল্লেখ করেছেন যে, একমাত্র আলী (রাঃ) ছাড়া আর কেউই এ আয়াত অনুযায়ী কাজ করেননি। আর এ সাদকা দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাক পরবর্তীতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন—“তোমরা কি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আলোচনা করার পূর্বে সাদকা দিতে ভয় পাওঃ যখন তোমরা তা করনি তখন আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।”

এ আয়াতের দ্বারা যে ভর্তসনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সে সম্পর্কেও মন্তব্যের অবকাশ আছে। কেননা, কেউ কেউ বলেছেন যে, সাদকা দেয়ার নির্দেশটি মুস্তাহাব ছিল, ওয়াজিব ছিল না। আর তাছাড়া কার্যকরী করার পূর্বেই তো আয়াতের নির্দেশকে তাদের জন্যে মওকফ করা হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সাহাবীদের কারও নিকট থেকেই এ আয়াতের নির্দেশের বিপরীত

কোন কাজ প্রকাশ পায়নি। আর এ ছাড়া পবিত্র কুরআনে হ্যরত আলী (রাঃ)-কে কখনই ভর্ত্সনা করা হয়নি বলে রাবী যে মন্তব্য করেছেন সে সম্পর্কেও মন্তব্যের অবকাশ আছে। কেননা, যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিয়ে মুক্তিপণ গ্রহণের ব্যাপারে সূরা আনফালে যে আয়াতটি আছে তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, যারা মুক্তিপণ গ্রহণের ব্যাপারে মত দিয়েছিলেন তাদের সকলের ক্ষেত্রেই এ আয়াতটি প্রযোজ্য। হ্যরত উমার (রাঃ) ছাড়া আর কেউই এ তিরক্ষার হতে মুক্ত নন। অতএব, পূর্বাপর ঘটনা হতে বুঝা যায় যে, উক্ত হাদীসটি দুর্বল। তবে আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমর ইবনে হাকামকে যখন নাজরানে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁকে যে চিঠিটি দিয়েছিলেন সেই চিঠিটি আমি পড়েছি। উক্ত চিঠিটি পরবর্তীকালে আবৃ বকর ইবনে হাযমের নিকট ছিল। চিঠির প্রথমাংশ নিম্নরূপঃ

এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর নিকট হতে বর্ণনা-'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ওয়াদাগুলো পূরণ কর।' এরপর তিনি সূরা মায়দাহৰ *سَرِيعٌ*  
*اللّهُ أَنْ* *الْمُسَابِبُ* 'নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর' (৫: ৪) পর্যন্ত লিখেন। আবুদুল্লাহ তাঁর পিতা আবৃ বকর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সেই চিঠি যা তিনি আমর ইবনে হাযমকে দিয়েছিলেন। যখন তিনি তাঁকে ইয়ামান বাসীদেরকে জ্ঞান দান, তাঁর শিক্ষাদান এবং সাদকা আদায়ের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি এ চিঠিটি লিখে দিয়েছিলেন। উক্ত চিঠিতে তিনি তাঁকে কতগুলো উপদেশ এবং তাঁর কার্যাবলী সম্বন্ধে কতগুলো নির্দেশ দিয়েছিলেন। চিঠির শুরুতে তিনি লিখেনঃ 'দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর পক্ষ হতে চিঠি।' অতঃপর তিনি সূরা মায়দাহৰ নিম্নের আয়াত দ্বারা শুরু করেনঃ

'হে মুমিনগণ! তোমরা প্রতিজ্ঞাগুলো পূরণ কর।' যখন তিনি আমর ইবনে হাযমকে ইয়ামানে পাঠান তখন তিনি তাঁকে একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করেন। উক্ত অঙ্গীকারনামায় তিনি তাঁকে তাঁর প্রতিটি কাজে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দেন। কারণ আল্লাহ পরহেয়গার ও সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন

‘*أَوْفُوا بِالْعَهْدِ*’ তাফসীরকারক এ অংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইবনে আবাস (রাঃ), মুজাহিদ (রাঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন ‘*عَقْوَدٌ*’ শব্দের দ্বারা অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে ‘*عَقْوَدٌ*-এর অর্থের ব্যাপারে তাফসীরকারকগণ একমত। তিনি বলেন যে, কোন কিছুর

ব্যাপারে পরম্পরের শপথ বা অঙ্গীকারকে عقود' বলা হয়ে থাকে। আলী ইবনে আবু তালহা (রঃ) ইবনে আবাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, عقود'-এর দ্বারা عهود' বা অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক যেসব বিষয় বৈধ ও অবৈধ ঘোষণা করেছেন, যেসব বিষয় অবশ্যকরণীয় করেছেন এবং যেসব বিষয় সম্পর্কে পরিত্র কুরআনে تفزوا ولا تنكوا' ৰ' বলে সাবধান করেছেন, عهود' দ্বারা সেসব বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ এ সম্পর্কে আরও কঠোর ভাষায় বলেনঃ ‘আল্লাহর সাথে ওয়াদা করার পর যারা উক্ত ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং তিনি যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছেন তা ছিন্ন করে.....তাদের জন্যে জগন্য আবাসস্থল রয়েছে।’ আবার যহুহাক (রঃ) عقوب' -এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ পাক যেসব বিষয় বৈধ ও অবৈধ করেছেন এবং তাঁর কিতাব ও নবী (সঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের নিকট হতে তিনি বৈধ ও অবৈধ সংক্রান্ত বিভিন্ন আবশ্যকীয় যে কাজগুলো করার ওয়াদা নিয়েছেন عقوب' দ্বারা সেগুলোকে বুঝায়। যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ)-এর ব্যাখ্যায় বলেন যে، عقوب' - عقوب' দ্বারা ছয়টি বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। (ক) আল্লাহর সাথে ওয়াদা, (খ) শপথ করা, চুক্তি করা, (গ) অংশীদারী সংক্রান্ত ওয়াদা, (ঘ) ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত ওয়াদা, (ঙ) বিবাহ বন্ধন এবং (চ) কসম খাওয়া। মুহাম্মাদ ইবনে কাব (রঃ) বলেন যে، عقوب' বলতে পাঁচটি বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। গুলোর একটি হচ্ছে অজ্ঞতার যুগে কৃত চুক্তিনামা। আর অন্যটি হচ্ছে অংশীদারী সংক্রান্ত চুক্তি। ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর উক্ত স্থানে অবস্থানকালেও উক্ত বস্তু গ্রহণ করা বা না করার কোন ইখতিয়ার ক্রেতা বা বিক্রেতার থাকে না। এ মতে যারা বিশ্বাসী তারা أوفوا' عقوب' দ্বারা তাঁদের পক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন যে, এ আয়াতটি উক্ত স্থানে থাকা অবস্থায়ও চুক্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত ও অবশ্যপালনীয় করার প্রতি ইঙ্গিত করে এবং উক্ত স্থানে থাকা অবস্থায়ও বস্তু গ্রহণ করা না করার ইখতিয়ারকে অঙ্গীকার করে। এটাই ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও ইমাম মালিক (রঃ)-এর মত। কিন্তু ইমাম শাফিন্দ (রঃ), ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ) এবং অধিকাংশ আলেম এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে গৃহীত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর একটি হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘বিক্রয়স্থল ত্যাগ করার পূর্বপর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতার বস্তু গ্রহণ করা বা না করার ইখতিয়ার আছে।’ সহীহ বুখারীতে অন্যভাবেও হাদীসটি এসেছে। তা নিম্নরূপঃ

“যখন দু’জন লোক ক্রয়-বিক্রয় করে তখন বিক্রয়স্থল ত্যাগ করার পূর্বপর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের বস্তুটি গ্রহণ করা বা না করার ইথিতিয়ার আছে।” তাফসীরকারক ইবনে কাসীর (রঃ) মন্তব্য করেন যে, এ হাদীসটি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনের পরেও উক্ত স্থানে থাকা অবস্থায় বস্তুটি গ্রহণ করা বা না করার ইথিতিয়ারকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে প্রকাশ্য দলীল। উক্ত ইথিতিয়ারের প্রশ্নটি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে আসে। অতএব এই ইথিতিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হওয়াকে অঙ্গীকার করে না, বরং চুক্তিকে আইনগতভাবে কার্যকরী করে। অতএব চুক্তিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থই হচ্ছে অঙ্গীকারকে পূর্ণ করা।

**أُحِلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةُ الْأَنْعَامِ**-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারক বলেন যে, চতুর্ষিং জন্ম বলতে এখানে উট, গরু ও বকরীকে বুঝানো হয়েছে। আবুল হাসান, কাতাদা এবং আরও অনেকের এটাই মত। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, আরবদের ভাষা অনুযায়ী চতুর্ষিং জন্ম বুলতে এটাই বুঝানো হয়। ইবনে উমার (রাঃ), ইবনে আবাস (রাঃ) এবং আরও অনেকে এ আয়াত হতে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, যবেহকৃত গাভীর পেটে যদি মৃত বাচ্চা পাওয়া যায় তাহলে ঐ মৃত বাচ্চার গোশ্ত খাওয়া মুবাহ। এ প্রসঙ্গে হাদীসের সুনান গ্রন্থসমূহে বহু হাদীস এসেছে। যেমন আবু দাউদ (রঃ), তিরমিয়ী (রঃ) এবং ইবনে মাজাহ (রঃ) আবু সাঈদ (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজেস করলাম, আমরা উট, গাভী এবং বকরী যবেহ করি। ওগুলোর পেটের মধ্যে কখনও কখনও বাচ্চা পাই। আমরা কি তা ফেলে দেবো, না ভক্ষণ করবো? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “তোমরা ইচ্ছে করলে তা খেতে পার। কেননা, তার মাকে যবেহ করাই হচ্ছে তাকেও যবেহ করা।” ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এটি একটি ‘হাসান’ হাদীস। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) হ্যরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “মাকে যবেহ করাই হচ্ছে বাচ্চাকেও যবেহ করা।” এ হাদীসটিকে ইমাম আবু দাউদ (রঃ) একাই তাঁর হাদীস গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।

**مَا يَطْلِي عَلَيْكُمْ لَا** আলী ইবনে আবি তালহা ইবনে আবাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর দ্বারা মৃত পশু, রক্ত এবং শূকরের মাংসকে বুঝানো হয়েছে। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মৃত পশু এবং যে পশুকে যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহই

এর সঠিক অর্থ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত । তবে প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, এর দ্বারা **حُرْمَتٌ عَلَيْكُمُ الْمِيَتَةُ** (৫:৩)-এ আয়াতের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে । অর্থাৎ “তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে, মৃত পশু, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, গলা টিপে মারা পশু, প্রহারে মৃত পশু, শিং-এর আঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্ম” । যদিও এগুলো চতুর্পদ জন্মের অন্তর্ভুক্ত তবুও উল্লিখিত কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে । এ জন্যে আল্লাহ বলেছেনঃ “তবে তোমরা যেগুলোকে যবেহ দ্বারা পবিত্র করেছ সেগুলো হালাল এবং যেগুলোকে মৃত্তিপূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়েছে সেগুলোও হারাম ।” অর্থাৎ উক্ত পশুগুলোকে এজন্যে হারাম করা হয়েছে যে, তাদেরকে আর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে না এবং হালাল পশুর সাথে আর যুক্ত করা যাবে না । আর এ কারণেই আল্লাহ পাক বলেছেনঃ “তোমাদের জন্যে চতুর্পদ জন্মের হালাল করা হয়েছে । তবে যেগুলো হারাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের উপর কুরআনের আয়াত নাফিল হয়েছে সেগুলো হারাম ।” অর্থাৎ এসব পশুর মধ্য হতে বিশেষ অবস্থায় কোন কোন পশুর হারাম হওয়া সংক্রান্ত আয়াত অতিসত্ত্ব তোমাদের উপর অবর্তীর্ণ হবে ।

**غَيْرِ مُحلِّي الصَّدِيرِ وَأَنْتُمْ حِرْمَانُوا** কোন কোন ব্যাকরণবিদের মতে এ বাক্যটি হাল হওয়ার কারণে হালাতে নাসাবীতে আছে । আন'আম বলতে উট, গরু, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু এবং হরিণ, গাড়ী, গাধা প্রভৃতি বন্য পশুকে বুঝানো হয় । আর গৃহপালিত হালাল পশুগুলোর মধ্যে উক্ত পশুগুলোকে এবং বন্য হালাল পশুগুলোর মধ্য হতে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা পশুগুলোকে হারাম বলে পৃথক করা হয়েছে । কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে-আমরা তোমাদের জন্য চতুর্পদ জন্মের হালাল করেছি । তবে জন্মগুলো হতে যেগুলোকে হারাম বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে সেগুলো হালাল নয় । আর এ নির্দেশ ঐ ব্যক্তির জন্যেই প্রযোজ্য যে ইহরাম অবস্থায় শিকার করাকে হারাম বলে গ্রহণ করেছে । যেহেতু আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেনঃ “তবে যে মৃতপ্রায় অথচ অন্যায়কারী ও সীমালংঘনকারী নয়, তার জন্যে অবৈধ জানোয়ার খাওয়া হালাল । আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু” । অর্থাৎ উক্ত আয়াতের ন্যায় এখানেও আল্লাহ বলেনঃ আমরা যেভাবে সর্বাবস্থায় চতুর্পদ জন্মের হালাল করেছি, ঠিক সেভাবে ইহরাম অবস্থায় শিকার করাকে হারাম মনে কর । কারণ আল্লাহ পাকই এ নির্দেশ দিয়েছেন । আর তিনি যা করা বা না করার নির্দেশ দেন সেগুলোর সবকিছুই হিকমতে পরিপূর্ণ । এজন্যেই তিনি বলেছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত হ্রক্ষম করেন ।

شَعَّابِرُ اللَّهِ يَأْبَاهَا لَمَنْ أَمْنَى لَا تَحْلُوا شَعَّابِرُ اللَّهِ  
শুন্দের দ্বারা হজ্রের নির্দেশনাবলীকে বুঝানো হয়েছে। আর মুজাহিদ বলেন যে,  
এর দ্বারা সাফা, মারওয়া, কুরবানীর পশ্চ ও উটকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ  
বলেছেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ পাক যে সমস্ত বস্তুকে হারাম করেছেন  
সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ কর্তৃক হারাম ঘোষিত  
বস্তুগুলোকে হালাল মনে করো না। এ জন্যে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ “নিষিদ্ধ  
মাসগুলোকেও তোমরা অবমাননা করো না।” অর্থাৎ মাসগুলোর প্রতি সম্মান  
প্রদর্শন কর এবং তোমরা এ মাসে শক্র সাথে যুদ্ধ করার মত নিষিদ্ধ  
কাজগুলো পরিহার কর। যেমন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেছেনঃ হে নবী (সঃ)!  
তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল— এই  
মাসে যুদ্ধ করা বড় গুনাহ। আল্লাহ পাক অন্যত্র আরও বলেছেনঃ “আল্লাহর  
নিকট মাসের সংখ্যা ১২টি।” সহীহ বুখারীতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত  
আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায় হজ্রের ভাষণে বলেছিলেনঃ “আসমান ও  
যমীন সৃষ্টি করার দিন আল্লাহ যামানাকে যেরূপ সৃষ্টি করেছিলেন এখন তা  
সেরূপে ফিরে এসেছে। ১২ মাসে একটি বছর হয়। এর মধ্যে ৪টি মাস  
নিষিদ্ধ। তার মধ্যে ৩টি মাস পরম্পর সংযুক্ত। যেমন যুলকাদা, যুলহাজ্রা এবং  
মুহাররম। আর অন্যটি হলো মুজার গোত্র কর্তৃক কথিত রজব মাস। এ মাসটি  
জমাদিউস্সানী এবং শা'বান মাসের মাঝখানে অবস্থিত।” এর থেকে প্রমাণিত  
হয় যে, এ মাসগুলোর এ জাতীয় সম্মান কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। ইবনে  
আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ “তোমরা নিষিদ্ধ মাসে  
যুদ্ধ করাকে বৈধ মনে করো না।” মুকাতিল ইবনে হাইয়ান, আবদুল করীম  
ইবনে মালিক আলজায়রী এবং ইবনে জারীরও এ মতই পোষণ করেন। কিন্তু  
অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, আয়াতটির নির্দেশ রাহিত হয়ে গেছে এবং  
উক্ত নিষিদ্ধ মাসগুলোতে কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করা এখন  
বৈধ। কুরআনের নিম্নের আয়াতটি তাদের দলীলঃ

“যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতীত হয়ে যায় তখন তোমরা মুশরিকদেরকে  
যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর।” এর অর্থ এই যে, মাসগুলোর অতীত  
সম্মান যখন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তখন তোমরা কাফিরদের সাথে সব সময়  
জিহাদ করতে থাক। এটা এখন তোমাদের জন্যে বৈধ হয়ে গেল। পবিত্র  
কুরআন এরপর আর কোন মাসকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেনি। ইমাম আবু  
জাফর এ পর্যায়ে আলেমদের ইজমার উল্লেখ করে বলেন যে, আল্লাহ পাক যে

কোন সময় এবং যে কোন মাসে জিহাদ করা বৈধ রেখেছেন। তিনি আলেমদের আর একটি ইজমার উল্লেখ করে বলেছেন যে, যদি কোন মুশরিক হারাম শরীফের যাবতীয় বৃক্ষের ছাল দ্বারা নিজেকে আবৃত করে এবং পূর্ব থেকে কোন মুসলমান তাকে নিরাপত্তা প্রদান না করে থাকে তবে সে নিরাপত্তা পাবে না। এ বিষয়টি এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণন করা সম্ভব নয়।

**وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا القِلَّاءٌ** অর্থাৎ তোমরা কা'বা গৃহের দিকে কুরবানীর পশু পাঠানো হতে বিরত থেকো না। কারণ এতে আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রকাশ পায়। আর তোমরা কুরবানীর পশুর গলায় কালাদা (চেইন) পরানো হতে বিরত থেকো না। কারণ এর দ্বারা এ পশুগুলোকে অন্যান্য পশু হতে পৃথক করা হয়। আর এর দ্বারা এটাও প্রকাশ পায় যে, পশুগুলো কুরবানীর উদ্দেশ্যে কা'বা গৃহে পাঠানো হয়েছে। ফলে মানুষ এ পশুগুলোর ক্ষতি করা হতে বিরত থাকে। আর পশুগুলোকে দেখে অন্যান্যরা এ জাতীয় পশু কুরবানী পাঠাতে উদ্বৃদ্ধ হবে। আর যে ব্যক্তি অন্যকে কুরবানী করার প্রতি উৎসাহ "দান করে, তাকে তার অনুসরণকারীর অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হয়। অথচ অনুসরণকারীর পুরস্কার কোন অংশেই কম করা হয় না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বিদায় হজ্রের সময় যুলহুলাইফাতে রাত্রি যাপন করেন। এ যুলহুলাইফাকে ওয়াদিউল আকীকও বলা হয়। অতঃপর তিনি সকাল বেলা তাঁর ৯ জন স্ত্রীর নিকট গমন করেন এবং গোসল শেষে খোশবু ব্যবহার করেন ও দু'রাকআত নফল নামায আদায় করেন। অতঃপর কুরবানীর পশুর চুটি ক্ষত করেন এবং ওর গলায় কালাদা (চেইন) পরান। এরপর হজ্র এবং উমরার জন্যে তিনি ইহরাম বাঁধেন। তাঁর কুরবানীর পশুর সংখ্যা ছিল ষাটটির অধিক। তাদের গায়ের রং ও শারীরিক গঠন ছিল অতি উন্মত। যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেনঃ "যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তবে সেটা তার অন্তরের তাকওয়া প্রকাশ করে।" কেউ কেউ সম্মান প্রদর্শন শব্দটির দ্বারা কুরবানীর পশুকে উন্মত স্থানে রাখা, ভাল খাওয়ানো এবং তাকে মোটা তাজা করানোর প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে কুরবানীর পশুর চোখ ও কানকে ভালভাবে লক্ষ্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন।" মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেনঃ **لَا**, **لَا** দ্বারা জাহেলিয়া যুগের লোকদের মত কালাদা ব্যবহার করাকে হালাল মনে করো না। কারণ জাহেলিয়া যুগে হারাম শরীফের বাইরে বসবাসকারী

আরবরা যখন নিষিদ্ধ মাস ব্যতীত অন্য মাসে তাদের গৃহ হতে বের হতো তখন তারা তাদের গলায় কালাদা স্বরূপ পশম ও চুল ব্যবহার করতো। আর হারাম শরীফের মুশকির অধিবাসীগণ যখন তাদের গৃহ হতে বের হতো তখন তারা তাদের গলায় কালাদা স্বরূপ হারাম শরীফের গাছের ছাল ব্যবহার করতো। এর ফলে লোকেরা তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করতো। ইবনে আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা মায়দাহ্ দু'টি আয়াত মানসূখ হয়ে গেছে। একটি কালাদার আয়াত, আর অপরটি হচ্ছে—  
 فَإِنْ جَاءَكُمْ فَاحْكُمْ بِمَا هُمْ عَنْهُ عَرِضُواْ (৫: ৪২)-এ আয়াতটি। ইবনে আউফ (রঃ) বলেনঃ আমি হাসান (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম— সূরা মায়দাহ্ কি কোন অংশ মানসূখ বা রহিত হয়েছে? তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ “না।” আতা (রঃ) বলেন যে, হারাম শরীফের অধিবাসীগণ বৃক্ষের ছাল দ্বারা কালাদা ব্যবহার করতো। ওটা দ্বারা তারা নিরাপত্তা লাভ করতো, ফলে আল্লাহ পাক হারাম শরীফের বৃক্ষ কাটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। মুতরাফ ইবনে আবদুল্লাহ এ মত পোষণ করেন।

..... وَلَا أَمِينٌ ..... وَرَضُوانًا—এ অংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারক বলেন যে, আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে যারা রওয়ানা হয় তাদের সাথে যুদ্ধ করা হালাল মনে করো না। কারণ, ঐ ঘরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে সে শক্ত হতে নিরাপত্তা লাভ করে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়, তোমরা তাকে বাধা দিও না, বিরত রেখো না এবং কোন প্রকার কৃৎসা রটনা করো না। কাতাদা, মুজাহিদ, আতা প্রমুখ মুফাস্সিরদের মতে আল্লাহর অনুগ্রহ অবেষণের অর্থ ব্যবসা করা। পবিত্র কুরআনের পূর্ববর্তী আয়াত **لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أَنْ تَبْتغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ** (২৪: ১৯৮) দ্বারা ব্যবসাকে বুঝানো হয়েছে। আর শব্দের ব্যাখ্যায়-ইবনে আবুস (রাঃ) বলেন যে, হজ্র গমনকারী ব্যক্তিগণ হজ্রের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে থাকেন। ইকরামা ও ইবনে জারীর প্রমুখ তাফসীরকারকগণ বলেন যে, এ আয়াতটি হাতিম ইবনে হিন্দ আল বাকরীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। একদা সে মদীনার একটি চারণভূমি লুঠন করে এবং পরবর্তী বছর সে বায়তুল্লাহ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এ সময় কোন কোন সাহাবী পথিমধ্যে তাকে বাধা দেয়ার মনস্ত করলে আল্লাহ পাক এ আয়াত নাফিল করেন। ইবনে জারীর আলেমদের ইজমার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, কোন মুশরিক ব্যক্তিকে যদি কোন মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদান করা না হয় তবে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে। যদিও সে বায়তুল্লাহ বা বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কেননা, উল্লিখিত আয়াতের নির্দেশ

মুশরিকদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি নাফরমানী, শিরক ও কুফরী করার উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফের দিকে রওয়ানা হয় তাকেও বাধা দেয়া বৈধ। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ “হে মুমিনগণ! নিচয়ই মুশরিকরা অপবিত্র। অতএব তারা যেন এ বছরের পর আর কখনও কা'বা গৃহের নিকটবর্তী না হয়।” এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) নবম হিজরীতে যখন হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-কে আমীরুল্লাহ হজ্ঞ হিসেবে পাঠান তখন হ্যরত আলী (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতিনিধি হিসেবে পাঠান এবং তাঁকে এ ঘোষণা করতে নির্দেশ দেন যে, মুসলমান ও মুশরিক একে অপর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, এ বছরের পর যেন কোন মুশরিক হজ্ঞ করতে না আসে এবং কোন ব্যক্তি যেন উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করে। ইবনে আবুবাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, প্রথমে ঈমানদার ও মুশরিকগণ একত্রে হজ্ঞ করতো এবং আল্লাহ পাক কাফিরদেরকে বাধা প্রদান না করতে ঈমানদারদের প্রতি নির্দেশ দেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجْسٌ** (১৪: ২৮)-এ, আয়াত দ্বারা কাফিরদেরকে হজ্ঞ করতে নিষেধ করেন। আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ “যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে একমাত্র তারাই আল্লাহর ঘরকে আবাদ করবে।” অতএব উক্ত আয়াতগুলো দ্বারা মুশরিকদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কাতাদা বর্ণনা করেন যে, **وَلَا الْقَلَدِ** -এ আয়াতটি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। অজ্ঞতার যুগে যখন কোন ব্যক্তি হজ্ঞের উদ্দেশ্যে তার গৃহ হতে বের হতো তখন সে বৃক্ষের ছাল দ্বারা কালাদা পরিধান করতো। ফলে কেউ তাকে কষ্ট দিতো না। আবার ঘরে ফেরার সময় চুলের তৈরী কালাদা পরিধান করতো। এর ফলে কোন লোক তাকে কষ্ট দিতো না। ঐ সময় মুশরিকদেরকে হজ্ঞ করতে নিষেধ করা হতো না। আর মুসলমানদেরকে নিষিদ্ধ মাসসমূহে এবং কা'বা গৃহের আশে পাশে যুদ্ধ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। অতঃপর এ আয়াতের নির্দেশকে আল্লাহর অপর আয়াত **فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حِيتَ وَجَدْتُمُوهُمْ** (১৪: ৫) দ্বারা মানসূখ করা হয়েছে। ইবনে জারীর এ মত পোষণ করেন যে, **وَلَا الْقَلَدِ** দ্বারা যদি মুশরিকরা হারামের বৃক্ষের ছাল দ্বারা কালাদা ব্যবহার করে তবে তোমরা তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান কর-’ এটাই বুঝানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, এ জন্যেই যে ব্যক্তি এ নির্দেশের অবমাননা করতো আরবরা তাকে সর্বদাই লজ্জা দিতো। তিনি এ পর্যায়ে হত্যাকারীদের প্রতি একজন কবির ব্যাঙ্গেক্তির উল্লেখ করেছেন।

وَإِذَا حَلَّتْ فَاصْطادُوا - এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারক বলেন যে, যখন তোমরা তোমাদের ইহরাম খুলে ফেল এবং মুক্ত হয়ে যাও তখন তোমাদের জন্যে পূর্বে ইহরাম অবস্থায় যা হারাম ছিল এখন তা হালাল করা হলো। অর্থাৎ এখন শিকার করা হালাল। হালাল হওয়ার এ নির্দেশটি অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পর আবার বৈধ ঘোষিত হয়েছে। আর এ ব্যাপারে সঠিক মত এই যে, কোন বস্তু অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পর বৈধ ঘোষিত হলে তা অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বাবস্থা (বৈধতা) ফিরে পাবে। সুতরাং পূর্বে যা ওয়াজিব ছিল পরে তা ওয়াজিব হবে, মুস্তাহাব মুস্তাহাব হবে এবং মুবাহ মুবাহ হবে। কারও মতে নির্দেশটি শুধু ওয়াজিবের জন্যে এবং কারও মতে শুধু মুবাহ কাজের জন্যে প্রযোজ্য। কিন্তু এ উভয় মতেরই বিপক্ষে পবিত্র কুরআনে যথেষ্ট আয়াত রয়েছে। সুতরাং আমরা যা বর্ণনা করেছি সেটাই সঠিক মত। আর এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন উসুলবিদও এ মত পোষণ করেন।

وَلَا يَجِدُ مِنْكُمْ ... الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ أَنْ تَعْتَدُوا - তাফসীরকারক এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ যে জাতি তোমাদেরকে হৃদায়বিয়ার বছর কা'বা গৃহে যেতে বাধা দিয়েছিল, তোমরা তাদের প্রতি শক্রতা পোষণ করে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে আল্লাহর হৃকুম লংঘন করো না, বরং আল্লাহ তোমাদেরকে যেভাবে প্রত্যেকের সাথে ন্যায় বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন কর। আর পবিত্র কুরআনের আর একটি আয়াতও এ অর্থ বহন করে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘কোন জাতির শক্রতা তোমাদেরকে যেন ন্যায় বিচার না করতে উৎসাহিত না করে, বরং তোমরা ন্যায় বিচার কর। আর এটাই তাকওয়ার অতি নিকটবর্তী।’ অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ের হিংসা-বিদ্রে যেন তোমাদেরকে ন্যায় বিচার না করতে উৎসাহিত না করে। কারণ, যে ন্যায় বিচার করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব, ওটা যে কোন অবস্থায়ই প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নাফরমানী করে তবে তোমার উচিত হবে তার ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ করা। ন্যায়-নীতির উপরই আসমান-যমীন প্রতিষ্ঠিত। ইবনে আবি হাতিম যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ যখন মুশরিকগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হৃদায়বিয়া প্রাত্তরে কষ্টকর অবস্থায় কালাতিপাত করছিলেন তখন পূর্বাঞ্চলীয় একদল মুশরিক কা'বা ঘর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

এমতাবস্থায় সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেনঃ “আমরা এ লোকগুলোকে কা’বা গৃহে যেতে বাধা দেবো যেমন তাদের সাথীরা আমাদেরকে বাধা দিয়েছে।” তখন আল্লাহ তা’আলা এ আয়াতটি নাখিল করেন। এখানে ‘শনান’ শব্দ দ্বারা হিংসা-বিদ্বেষকে বুঝানো হয়েছে। এটাই ইবনে আবুস রাঃ) ও অন্যান্যদের মত। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, কোন কোন আরব ‘শনান’-এর কেন্দ্র পরিবর্তে জর্জ দিয়ে পড়েছেন এবং আরবী কবিতায়ও এ জাতীয় পঠনের রীতি দেখা যায়। অবশ্য কোন কুরআনী এভাবে পড়েছেন কি-না তা আমাদের জানা নেই।

‘..... وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبَرِّ ..... وَالْعَدُوانِ’

আল্লাহ পাক এ আয়াতের দ্বারা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে উত্তম কাজে পরম্পরকে সাহায্য করতে এবং খারাপ কাজ পরিহার করে নৈকট্য ও পরহেয়গারী অর্জন করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি তাদেরকে শরীয়ত পরিপন্থী কাজ, পাপ কাজ এবং অবৈধ কাজে পরম্পরকে সাহায্য করতে নিষেধ করছেন। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ যে কাজ করতে আদেশ করেছেন তা পরিহার করাকেই পাপ কাজ বলা হয় এবং ‘عدوان’ বা সীমালংঘন করার দ্বারা ধৈর্যের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা এবং নিজের ও অন্যের ব্যাপারে অবশ্যকরণীয় কাজের সীমালংঘন করাকেই বুঝানো হয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ) আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর যদিও সে অত্যাচারী বা অত্যাচারিত হয়।” তখন কোন কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! অত্যাচারিত ভাইকে সাহায্য করার অর্থ তো আমরা বুঝালাম, কিন্তু অত্যাচারী ভাইকে কি করে আমরা সাহায্য করবো?” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “তুমি তাকে অত্যাচার করা হতে বাধা প্রদান কর ও নিষেধ কর। আর এটাই তাকে সাহায্য করা হবে।” ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ) একজন সাহাবী হতে বর্ণনা করেন যে, যে ঈমানদার ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে সেই ব্যক্তি ঐ ঈমানদার ব্যক্তি হতে অধিক প্রতিদান পাবে যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের দেয়া কষ্টও সহ্য করে না। এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে অন্য একটি সনদেও এসেছে। ইমাম তিরফিমীও (রঃ) হাদীসটিকে অন্য আর একটি সনদে তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। আবু বকর আল বায়য়ার তাঁর হাদীস গ্রন্থে আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে সৎকাজের প্রতি পথ-প্রদর্শন করে সে সৎকর্মকারীর ন্যায়

প্রতিদান পাবে।” ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসের অনুরূপ আর একটি সহীহ হাদীস আছে। তা হচ্ছে— “যে ব্যক্তি মানুষকে সৎপথে আহ্বান করে তাকে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ সৎপথ যত ব্যক্তি অনুসরণ করবে তাদের সকলের প্রতিদানের অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হবে। অথচ এ ব্যাপারে সৎপথ অনুসরণকারীদের প্রতিদান কমানো হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে অসৎ পথে আহ্বান করে, তাকে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ অসৎ পথ যত লোক অনুসরণ করবে তাদের সকলের পাপের অনুরূপ পাপ প্রদান করা হবে। অথচ এ ব্যাপারে অসৎ পথ অনুসরণকারীদের পাপ কোন অংশে কমানো হবে না।” ইমাম তিবরানী আবুল হাসান ইবনে সাখার হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর সাথে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে চলাফেরা করে, অথচ সে জানে যে, ঐ ব্যক্তি একজন অত্যাচারী, তাহলে সে ইসলাম হতে বহিক্ত বলে গণ্য হবে।”

৩। তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত,  
শুকর-মাংস, আল্লাহ ছাড়া  
অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু,  
কঠরোধে মারা পশু, আঘাত  
লেগে মরে যাওয়া পশু, পতনের  
ফলে মৃত পশু, শৃঙ্গাঘাতে মৃত  
পশু এবং হিস্ত জন্মতে খাওয়া  
পশু হারাম করা হয়েছে; তবে যা  
তোমরা যবেহ দ্বারা পবিত্র করেছ  
তা হালাল। আর যে সমস্ত পশুকে  
পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া  
হয়েছে তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা  
ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের  
জন্য হারাম করা হয়েছে। এসব  
কাজ পাপ। আজ কাফিরেরা  
তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণের  
ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে।  
সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয়  
করনা; শুধু আমাকেই ভয় করো।

وَ حِرْمَةٌ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الْدَّمُ  
وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهْلِكَ لِغَيْرِ  
اللَّهِ بِهِ وَ الْمَنْخِنَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ  
وَ الْمَتْرَدِيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا  
أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ وَ مَا  
ذُبَحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ  
تَسْتَقِسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ  
فِسْقُ الْيَوْمِ يُسَيِّسُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ  
وَ اخْشُونَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتَ لَكُمْ

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের  
দীন পূর্ণঙ্গ করলাম, তোমাদের  
প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ  
করলাম এবং ইসলামকে  
তোমাদের জন্য দীন হিসাবে  
মনোনীত করলাম। তবে কেহ  
পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার  
তাড়নায় আহার করতে বাধ্য হলে  
সেগুলি খাওয়া তার জন্য হারাম  
হবেনা। কারণ নিচয়ই আল্লাহ  
ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

دِينَكُمْ وَاتَّمَّتْ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ  
دِينًا فَمَنِ اضْطَرَفَ  
مُخْصَّةٌ غَيْرُ مُتَجَانِفٌ لِّا ثُمَّ  
فِيَنَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

আল্লাহ পাক উল্লিখিত আয়াতে যে সমস্ত বস্তু খাওয়া অবৈধ তার বর্ণনা দিয়েছেন। মৃত ঐ জানোয়ারকে বলা হয়, যে জানোয়ার যবেহ অথবা শিকার ব্যতীত নিজেই মৃত্যুবরণ করে। মৃত পশু খাওয়া এ জন্যেই নিষিদ্ধ যে, তাতে শরীর ও দ্বিনের জন্যে ক্ষতিকর রক্ত থেকে যায়। তবে মৃত মাছ খাওয়া হালাল। কারণ মুআত্তায়ে মালিক, মুসনাদে শাফিউ, মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবি দাউদ, জামেউত তিরমিয়ী, সুনানে নাসাই, সুনানে ইবনে মাজাহ, সহীহ ইবনে খুয়াইমা এবং সহীহ ইবনে হারবানে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলল্লাহ (সঃ)-কে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন তিনি বলেন যে, ওর পানি পবিত্র এবং ওর মধ্যেকার মৃত হালাল। এ সম্পর্কীয় একটি হাদীস সামনে রয়েছে।

أَوْلَمْ شَدَّ د্঵ারَا প্রবাহিত রক্তকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেছেনঃ ‘‘أَوْلَمْ دَمًا مَسْفُوحًا’’ (৬: ১৪৬)-এর দ্বারাও প্রবাহিত রক্তকে বুঝানো হয়েছে। এটাই আবাস (রাঃ) ও সাইদ ইবনে যুবাইর (রঃ)-এর মত। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেন যে, ইবনে আবাসকে পুরীহা ও কলিজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেনঃ “তোমরা তা খাও।” তখন লোকেরা বললোঃ ‘ওটা তো রক্ত।’ তিনি বললেনঃ “তোমাদের উপর শুধুমাত্র প্রবাহিত রক্তকেই হারাম করা হয়েছে।” হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ‘শুধু প্রবাহিত রক্তকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।’ ইমাম শাফিউ (রঃ) ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

“আমাদের জন্যে দু’টি মৃত জন্ম ও দু’প্রকারের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জন্ম দু’টি হলো মাছ ও ফড়িং এবং দু’প্রকার রক্ত হলো কলিজা ও প্লীহা।” এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, সুনানে ইবনে মাজাহ্, দারেকুতনী এবং বাযহাকীতেও বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবনে আসলামের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ আবদুর রহমান একজন দুর্বল রাবী। হাফিয় বাযহাকী বলেন যে, এ হাদীসটিকে ইসমাইল ইবনে ইদরীস এবং আবদুল্লাহও বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এ দু’জনও দুর্বল রাবী। তবে তাদের দুর্বলতার মধ্যে কিছু কম বেশী আছে। সুলাইমান ইবনে বিলালও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যদিও তিনি একজন বিশ্বস্ত রাবী তবুও কারও কারও মতে এটি একটি মওকুফ হাদীস। এর বর্ণনাকারী হচ্ছেন হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)। হাফিয় আবু জার আরায়ীর মতে এ হাদীসটি মওকুফ হওয়া সঠিক। ইবনে আবি হাতিম সুন্দী ইবনে আজলান হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে আমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি আহ্বান করার জন্যে প্রেরণ করেন এবং ইসলামের আহ্বানগুলো তাদের নিকট ব্যক্ত করার নির্দেশ দেন। আমি তাদের মধ্যে আমার কাজ করছিলাম। হঠাৎ একদিন তারা আমার নিকট এক পেয়ালা রক্ত নিয়ে উপস্থিত হলো এবং তারা সবাই মিলে ঐ রক্ত পান করার জন্যে প্রস্তুতি নিলো। তারা আমাকেও ঐ রক্ত পান করার জন্যে অনুরোধ করলো। তখন আমি তাদেরকে বললাম, তোমাদের জন্যে আফসোস! আমি তোমাদের কাছে এমন এক ব্যক্তির নিকট হতে এসেছি যিনি তোমাদের জন্য এ রক্তকে হারাম করেছেন। তখন তারা সকলে আমাকে সেই হৃকুমটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তখন আমি তাদেরকে এ আয়াতটি পড়ে শুনালাম। হাফিয় আবু বকর তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সুন্দী বলেন, আমি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে থাকি। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। একদিন আমি তাদেরকে আমাকে এক গ্লাস পান করাতে বলি। কারণ আমি সে সময় অত্যন্ত তৃষ্ণাত্মক ছিলাম। তখন তারা বললোঃ ‘না, আমরা তোমাকে মৃত্যু পর্যন্তও পান করাবো না।’ আমি তখন চিন্তিত অবস্থায় ভীষণ গরমের মধ্যে উত্তপ্ত পাথরের উপর ‘আবা’ মাথায় দিয়ে ঘূর্মিয়ে পড়লাম। ঘূর্মন্ত অবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এক ব্যক্তি অতি সুন্দর একটি কাঁচের পেয়ালায় উত্তম সুমিষ্ট পানীয় নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হলো এবং আমাকে পেয়ালাটি দিলো। আমি তখন তা হতে পান করলাম এবং সাথে সাথেই জেগে

উঠলাম। জেগে দেখলাম যে, আমার কোন পিপাসা নেই, বরং এরপর আজ পর্যন্ত আমি কখনও পিপাসার্ত হইনি। হাকিম তাঁর মুসতাদরিক গঢ়ে এ অংশটি বেশী বর্ণনা করেন। সুন্দী (রঃ) বলেন, এরপর আমি আমার সম্প্রদায়ের লোককে বলাবলি করতে শুনলামঃ “তোমাদের নিকট তোমাদের সম্প্রদায় হতে একজন সর্দার এসেছেন; অথচ তোমরা তাঁকে এক ঢেক পানিও প্রদান করলে না!” এরপর তারা আমার নিকট পানীয় দ্রব্য নিয়ে আসলো। তখন আমি বললাম, এখন আমার এর প্রয়োজন নেই। কারণ, আল্লাহ আমাকে খাইয়েছেন এবং পানও করিয়েছেন। আমি তাদেরকে আমার খাবারপূর্ণ পেট দেখলাম। তারপর তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করলো। কবি আ'শা তাঁর কবিতায় কত সুন্দরই না বর্ণনা করেছেনঃ “এবং তুমি কখনও ভক্ষণ করার উদ্দেশ্যে মৃত জন্মুর নিকট যেওনা এবং পশুর শরীরে আঘাত করে তা হতে নির্গত রক্ত পান করার উদ্দেশ্যে ধারাল অন্ত গ্রহণ করো না। আর তোমরা পূজার বেদীর উপর স্থাপিত কোন জন্মুকে খেওনা, মৃত্তিপূজা করো না, বরং আল্লাহর ইবাদত কর।” কাসীদার এ অংশটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক তাঁর গঢ়ে উল্লেখ করেছেন।

تَافْسِيرُ الْعِنْزِيرِ  
তাফসীরকারক এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, **لَحْمُ الْخِنْزِيرِ** এবং বন্য শূকর উভয়ই হারাম। শূকরের মাংস বলতে চর্বি এবং তার অন্যান্য অংশকে বুঝায়। এখানে পশু উঠতে পারে যে, **لَحْمُ** শব্দের দ্বারা মাংসকে বুঝানো হয়। শূকরের চর্বি বা অন্যান্য অংশ কি করে গ্রহণ করা যেতে পারে? এর উত্তরে যাহেরী সম্প্রদায় বলেন যে, কুরআন মাজীদের অন্য একটি আয়াতে আছে-

إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمٌ خِنْزِيرٌ فَإِنَّهُ رِجْسٌ (৬ : ১৪৬)

এখানে **خِنْزِيرٌ**-এর দ্বারা **خِنْزِيرٌ** কে বুঝানো হয়েছে। আর **خِنْزِيرٌ**-এর দ্বারা **خِنْزِيرٌ** কে বুঝানো হয়েছে। আর এখানে পশু উঠতে তার যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেই বুঝায়। কিন্তু এটা আরবী ভাষার রীতি অনুযায়ী সঠিক নয়। কারণ, আরবীতে **ضَمِيرٌ** বা সর্বনাম সব সময়ই **مُضَافٌ**-এর দিকে ফিরে, কখনও **مُضَافٌ إِلَيْهِ**-এর দিকে না। আর এখানে **مُضَافٌ** হলো **لَحْمٌ** শব্দটি। আসলে এর সঠিক উত্তর হলো এই যে, **لَحْمٌ** বা গোশ্ত বলতে আরবরা উক্ত জন্মুর প্রতিটি অঙ্গকেই গ্রহণ করে থাকে। সহীহ মুসলিম শরীফে হ্যারত বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি খেলায় অংশগ্রহণ করে সে যেন তার হস্তকে শূকরের গোশ্ত ও তার রক্তে রঞ্জিত করলো।” এখানে শূকরের গোশ্ত ও রক্ত স্পর্শ করার প্রতি ঘৃণা পোষণ

করা হয়েছে। অতএব ওটা ভক্ষণ করা নিঃসন্দেহে নিষিদ্ধ। এ হাদীস শুকরের গোশ্ত ও রক্তসহ যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবৈধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আরও উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ পাক মদ, মৃত, শূকর এবং মূর্তির ব্যবসাকে হারাম করেছেন।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়ঃ মৃতের চর্বি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? কারণ মানুষ তা দ্বারা নৌকায় প্রলেপ দেয়, চামড়াতে মালিশ করে এবং প্রদীপ জ্বালায়। তিনি উত্তরে বলেনঃ “ওগুলোও হারাম।” সহীহ বুখারীতে আবু সুফিয়ানের হাদীসে উল্লেখ আছে যে, একদা রোম সম্রাট আবু সুফিয়ানের নিকট জানতে চেয়েছিলেন -রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে কোন্ কোন্ বিষয়ে নিষেধ করেছেন? তদুত্তরে আবু সুফিয়ান বলেছিলেনঃ ‘রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে মৃত ও রক্ত খেতে নিষেধ করেছেন।’

**وَمَا أَحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ**-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারক বলেন যে, এর দ্বারা যে জন্মুকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ করা হয় তাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টজীবকে তাঁর মহান নামের উপর যবেহ করা ওয়াজিব করেছেন। অতএব যখন তাঁর নির্দেশকে লংঘন করে মৃতি বা অন্য কোন সৃষ্টজীবের নামে যবেহ করা হয় তখন তা হারাম হবে। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। তবে যদি কোন পশু যবেহ করার সময় ভুলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ পড়া না হয় তবে উক্ত পশু হারাম বা হালাল হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে সূরা আন-আমের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইবনে আবি হাতিম আবু তোফাইল হতে বর্ণনা করেন যে, যখন হ্যরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করেন তখন তাঁর উপর চারটি বস্তু হারাম করা হয়েছিল। সেগুলো হলো মৃত পশু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গিত পশু। এ চারটি বস্তুকে কখনও হালাল করা হয়নি। বরং আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করার পর হতেই এগুলো হারাম ছিল। ইসরাইলীদের পাপের কারণে আল্লাহ পাক তাদের জন্যে কিছু কিছু হালাল বস্তুকে হারাম করে দিয়েছিলেন। এরপর হ্যরত ঝিসা (আঃ)-এর যুগে হ্যরত আদম (আঃ)-এর যুগের ন্যায় নির্দেশ আসে এবং উল্লিখিত চারটি বস্তু ছাড়া সবকিছুই হালাল হয়ে যায়। কিন্তু তারা হ্যরত ঝিসা (আঃ)-কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করে।

হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এ হাদীসটি ‘গারীব’। ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেন যে, বানু রেবা গোত্রের ইবনে ওয়ায়েল নামে এক ব্যক্তি এবং ফারাজিদাকের পিতা গালিব উভয়েই একশটি করে উটের পা কাটার জন্যে বাজি

ধরে। কুফা শহরের উপকণ্ঠে একটি ঝর্ণার ধারে তারা তাদের উটগুলোর পাকাটা শুরু করে। তখন জনসাধারণ তাদের গাধা ও খচরের পিঠে চড়ে উটের গোশ্ত নেয়ার জন্যে তথায় গমন করে। এ দেখে হ্যরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি সাদা খচরের পিঠে চড়ে বলতে শুরু করেনঃ “হে জনমওলী! তোমরা এ উটগুলোর গোশ্ত খেওনা। কেননা, এগুলোকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।” হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এটিও একটি ‘গারীব’ হাদীস। তবে আবু দাউদের সুনানে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা এ হাদীসের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

ইবনে আবুবাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরব বেদুইনদের মত পরস্পর বাজি রেখে উটের পা কাটতে নিষেধ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) আরও বলেন যে, মুহাম্মাদ ইবনে জাফর এ হাদীসটিকে একটি ‘মওকুফ’ হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের বর্ণনাকারী হচ্ছেন হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুবাস (রাঃ)। ইমাম আবু দাউদ ইকরামা হতে আরও বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খাবার খেতে নিষেধ করেছেন।

—**وَالْمُنْخِفَّةُ**— এ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারক বলেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে যে জন্মুকে গলাটিপে মারা হয় অথবা যে জন্মু আকস্মিকভাবে দম বন্ধ হয়ে মারা যায় তাকে **مُنْخِفَّة** বলা হয়। যেমন কোন পশুকে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলে ছুটাছুটি করার ফলে গলায় দড়ির ফাঁস লেগে যদি দম বন্ধ হয়ে মারা যায় তবে তা খাওয়া হারাম। আর **الْمَوْقُوذَةُ** শব্দের দ্বারা ঐ মৃত জন্মুকে বুবানো হয়েছে যাকে ভারী অথচ ধারাল নয় এমন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে মারা হয়েছে। যেমন ইবনে আবুবাস (রাঃ) বলেন যে, যে জন্মুকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে মারা হয় তাকে **مَوْقُوذَة** বলা হয়। কাতাদা বলেন যে, জাহেলি যুগের লোকেরা লাঠি দ্বারা আঘাত করে পশু মেরে খেতো। হাদীসের সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, আদি ইবনে হাতিম (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি এক পার্শ্বে ধারাল এবং অপর পার্শ্বে ধারহীন এ জাতীয় এক প্রকার প্রশংস্ত অস্ত্র দ্বারা শিকার করি। এ শিকার খাওয়া কি জায়েয়!” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ “যদি ওটা ধারাল পার্শ্ব দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয় তবে তা খাওয়ে জায়েয়। আর যদি ওটা ধারহীন অংশ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যায় তবে তা অপবিত্র এবং তা খাওয়া জায়েয় নয়।” এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ধারহীন

অন্ত্র এবং ধারাল অন্ত্রের দ্বারা শিকার করা জন্তুর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি ধারাল অংশের দ্বারা আঘাতপ্রাণ হয়ে মৃত জন্তুকে খাওয়া জায়েয করেছেন এবং ধারাহীন অংশ দ্বারা আঘাত প্রাণ হয়ে মৃত জন্তুকে খাওয়া নাজায়েয করেছেন। ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ ব্যাপারে একমত। তবে যদি ক্ষত না করে শুধু অন্ত্রের ভারত্তের দ্বারা কোন জন্তু নিহত হয় তবে তা হারাম বা হালাল হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। ইমাম শাফিন্দ উভয় মতই পোষণ করেন। তাঁর এক মতানুযায়ী উল্লিখিত হাদীসের আলোকে এ জন্তুটি হালাল নয়। অন্য মতানুযায়ী কুকুর দ্বারা শিকার করা জন্তু খাওয়া যেহেতু হালাল, সেহেতু ভারী অন্ত্র দ্বারা শিকার করা জন্তুকে খাওয়াও হালাল। এ বিষয়টি নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলোঃ

যদি শিকারী কুকুরকে শিকারের জন্যে পাঠানো হয় এবং সে ক্ষত না করে ভারত্তের দ্বারা অথবা আঘাতের দ্বারা তাকে হত্যা করে তবে তা হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপার আলেমদের দু'টি মত আছে। এক মতানুসারে তা খাওয়া হালাল। কারণ কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে- “কুকুর তোমাদের জন্যে যা শিকার করে আনে তোমরা তা খাও।” এ আয়াতটি ক্ষত করা বা না করা উভয় ধরনের শিকারকেই বুঝিয়েছে। ঠিক একইভাবে আদি ইবনে হাতিমের হাদীসেও এ জাতীয় নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এটা ইমাম শাফিন্দ (রঃ)-এর মত। ইমাম নববী ও ইমাম রাফেয়ী প্রমুখ আলেমগণও ইমাম শাফিন্দ (রঃ)-এর এ মতকে সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন। তাফসীরকারক ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, ইমাম শাফিন্দ (রঃ)-এর <sup>مُختَصِّرٌ</sup> <sup>كتاب الام</sup>-এবং বর্ণিত তাঁর কথা হতে এ জাতীয় নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত বুঝায় না। উক্ত গ্রন্থেয়ে বর্ণিত তাঁর বক্তব্য দ্ব্যর্থবোধক। তাঁর অনুসারীগণ এ ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন এবং উভয় দলই তাঁর বক্তব্যকে নিজ নিজ দলের পক্ষে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য আল্লাহ পাকই এ বিষয়ে সম্যক অবগত। তবে তাঁর এ বক্তব্যে উক্ত পশু হালাল হওয়ার প্রতি অতি সামান্য ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। আসলে এ জাতীয় পশু হালাল না হারাম এ প্রসঙ্গে তিনি খোলাখুলি কোন মন্তব্য করেননি। ইবনে সাবাগ হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনানুযায়ী ইমাম আবু হানীফা (রঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এ জাতীয় পশু হালাল। ইমাম আবু জাফর ইবনে জারীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, সালমান ফারসী (রাঃ), আবু হুরাইরা (রাঃ), সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং ইবনে উমার (রাঃ)-এর মতে এ জাতীয় পশু হালাল। কিন্তু হাদীসের

সংজ্ঞানুযায়ী এ হাদীসটি গারীব। কারণ তাঁদের পক্ষ হতে এ জাতীয় কোন প্রকাশ্য বক্তব্য নেই। ইবনে কাসীর ইবনে জারীরের এ রিওয়ায়াত সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেন।

শিকারী কুকুর কর্তৃক ভার বা আঘাত দ্বারা নিহত পশু খাওয়া হালাল কি হারাম এ ব্যাপারে আলেমদের দ্বিতীয় মত হলো এই যে, এই পশু খাওয়া হালাল নয়। আর এটাই ইমাম শাফিন্দ (রঃ)-এর আর একটি মত। ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ) এ মতকে সমর্থন করেন। ইবনে সাবাগও ইমাম শাফিন্দ (রঃ)-এর এ দ্বিতীয় মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ) ইমাম আবু হানীফা (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ জাতীয় পশু হালাল নয়। আর এটাই ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ)-এর প্রসিদ্ধ মত। ইবনে কাসীর (রঃ)-এর মতে এ মতটি সঠিক হওয়ারই সত্ত্বাবনা বেশী। কারণ এটাই ইসলামী আইনের নীতিমালার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইবনে সাবাগ এ মতের পক্ষে রাফে ইবনে খুদাইজের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

রাফে ইবনে খুদাইজ (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা আগামীকাল শক্রের সম্মুখীন হবো। তখন কাছে কোন ছুরি থাকবে না। আমরা কি বাঁশের ধারাল অংশ দ্বারা কোন শিকারকে যবেহ করতে পারিঃ তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “যে অন্ত রক্ত প্রবাহিত করে এবং যে জন্মে যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয় তোমরা তা খেতে পার।” এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয় প্রচ্ছেই রয়েছে। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, যদিও এ হাদীসটি একটি বিশেষ কারণে বর্ণনা করা হয়েছে, তবুও অধিকাংশ উসুলবিদ ও আইনবিদ হাদীসটিকে সাধারণভাবে গ্রহণ করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একদা মধুর তৈরী নাবীজ জাতীয় পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ “যে সমস্ত পানীয় মানুষের মধ্যে মাতলামি এনে দেয় সেগুলো হারাম।” এ হাদীসটি সম্পর্কে কোন কোন ফিকাহবিদ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) খাস করে মধুর তৈরী পানীয় সম্পর্কেই এ মন্তব্য করেছেন। ঠিক এমনিভাবে উল্লিখিত হাদীসটিতে যদিও একটি বিশেষ যবেহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল তথাপি এর জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন একটি মন্তব্য করেন যা উক্ত বিশেষ যবেহ এবং এর সাথে সংযুক্ত অন্যান্য যবেহকে শামিল করে। কারণ আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সংক্ষিপ্ত অর্থে

ব্যাপক অর্থবোধক বক্তব্য রাখার ক্ষমতা দান করেছিলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, যদি শিকারী কুকুর আঘাত বা তার ভারত্তের দ্বারা কোন পশুকে হত্যা করে অথচ এতে রক্ত প্রবাহিত না হয় তাহলে উক্ত পশু খাওয়া হালাল নয়। কারণ উপরোক্ত হাদীসে যে অবস্থায় পশুকে হালাল করা হয়েছে তার বিপরীত অবস্থায় তা নিশ্চয়ই হারাম হবে। এ হাদীস হতে কুকুরের শিকার করা পশু সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে কেউ কেউ প্রশ্ন উঠাপন করেছেন যে, উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে যবেহ্ করার অন্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাঁকে যবেহ্ করা পশু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়নি। এজন্যে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অন্য এক হাদীসে দাঁত ও নখের দ্বারা কোন পশু যবেহ্ করতে নিষেধ করেছেন। আর এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, দাঁত হাড়ের অনুরূপ এবং নখ দ্বারা অমুসলিম হাবসীরা যবেহ্ করতো। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে দু'টি বস্তু দ্বারা পশু যবেহ্ করতে নিষেধ করেছেন সে বস্তু দু'টো যবেহের অন্তর্ভুক্ত। ওটা নিশ্চয়ই যবেহকৃত পশুর প্রতি কোন ইঙ্গিত বহন করে না। অতএব পূর্ববর্তী হাদীসে কুকুরের শিকার পশু সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত নেই। ইবনে কাসীর (রঃ) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে বস্তু রক্ত প্রবাহিত করে এবং যে জন্তু আল্লাহর নামে যবেহ্ করা হয় তা খাওয়া তোমাদের জন্যে হালাল। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ‘যে বস্তু রক্ত প্রবাহিত করে সেই অন্ত দ্বারাই তোমরা পশুকে যবেহ্ কর’- একথা বলেননি। অতএব এ হাদীসটি হতে একই সাথে দু'টি নির্দেশ পাওয়া যায়। একটি অন্ত সম্পর্কিত এবং অপরটি যবেহকৃত পশু সম্পর্কিত। অর্থাৎ পশুকে এমন অন্ত দ্বারা যবেহ্ করতে হবে যা রক্ত প্রবাহিত করে। কিন্তু তা দাঁত বা হাড় হওয়া চলবে না। উল্লিখিত হাদীস হতে কুকুরের শিকার সম্পর্কে ইমাম মুয়ানী এভাবে দলীল গ্রহণ করে থাকেন যে, হাদীসটিতে তীর দ্বারা শিকার করা পশু সম্পর্কে বলা হয়েছে-‘যদি অন্তের ধারহীন অংশের আঘাত দ্বারা শিকার করা পশু মারা যায় তবে তা খেয়ো না। আর যদি ধারাল অংশের আঘাতে মারা যায় তবে তা খাও।’ কিন্তু কুকুর সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য করা হয়েছে। এখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ সাধারণ মন্তব্যকে বিশেষ অর্থে গ্রহণ করতে হবে। কারণ দু'টি ভিন্ন জাতীয় বস্তু দ্বারা শিকার করা হলেও নির্দেশটি শিকার করা পশু সম্পর্কিত। যেমন পবিত্র কুরআনে অন্যায়ভাবে হত্যাকারীকে একটি মুমিন গেলাম আয়াদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ‘যেহার’ সম্পর্কিত নির্দেশে শুধু গোলাম আয়াদ করার কথাই বলা হয়েছে। এখানে যদিও এক জায়গায় মুমিন গোলামের কথা বলা হয়েছে এবং অন্য জায়গায় শুধু

গোলামের কথা বলা হয়েছে, তবুও উভয় ক্ষেত্রেই মুমিন গোলাম আযাদ করার অর্থই গ্রহণ করতে হবে। ইবনে কাসীর (রঃ)-এর মতে ইমাম মুয়ানীর এ মতটি সঠিক। বিশেষভাবে যাঁরা এ মতবাদের মূলনীতিকে গ্রহণ করেন তাঁদের জন্যে এ যুক্তিটি উত্তম বলে মনে হবে। সুতরাং যাঁরা এর বিরোধিতা করে থাকেন তাঁদের পক্ষে এ ব্যাপারে সঠিক ও যুক্তিসম্মত মত পেশ করা উচিত। ইবনে কাসীর (রঃ) ইমাম মুয়ানীর (রঃ) পক্ষে বলেনঃ আমরা জানি যে, হাদীসে এসেছে-'অন্ত্রের ধারহীন অংশের আঘাত দ্বারা মৃত শিকার খাওয়া হালাল নয়।' এ হাদীসের উপর কিয়াস করেও আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কুকুর তার ভারত্তের দ্বারা কোন শিকারকে হত্যা করলে তা খাওয়া হালাল হবে না। কারণ এ দু'টোই শিকারের অন্ত্র স্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উল্লিখিত আয়াতটিতে **مَّا أَمْسَكَ عَلَيْكُمْ** (৫: ৮) কুকুরের শিকার সম্পর্কে একটি সাধারণ নির্দেশ আছে। এখানে কোন শর্তের পশ্চর উল্লেখ করা হয়নি। আমরা কিয়াসের দ্বারা কুকুরের শিকারের প্রতি বিশেষ শর্ত আরোপ করছি। কারণ, এ জাতীয় অবস্থায় সাধারণ নির্দেশের পরিবর্তে কিয়াসের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। এটাই চার ইমাম এবং অধিকাংশ আলেমের মত। ইবনে কাসীর (রঃ)-এর মতেও এটা উত্তম মতবাদ। দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, **فَكُلُوا مِّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ** (৫: ৮) আয়াতটিতে একটি সাধারণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু উপরে আলোচিত মৃত শিকার শিং বা এ জাতীয় কোন বস্তু দ্বারা আঘাতপ্রাণ হয়ে মৃত অথবা দম বক্ষ হয়ে বা এ জাতীয় অন্য কোনভাবে মৃত জস্ত নির্দেশিত হকুমের অন্তর্ভুক্ত। তবে যে কোন অবস্থায় **فَكُلُوا مِّا أَمْسَكْنَ** (৫: ৮) নির্দেশকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ শরীয়ত এ আয়াতের নির্দেশকে শিকারের ব্যাপারেই গ্রহণ করেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আদি ইবনে হাতিম (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ 'যদি শিকার তীরের ধারহীন অংশের আঘাতে মারা যায় তবে তা অপবিত্র। কাজেই তোমরা তা খেয়ো না।' ইবনে কাসীর (রঃ) বলেনঃ আমাদের জানামতে এমন কোন আলেম নেই যিনি কুরআন ও হাদীসের নির্দেশের মধ্যে পার্থক্য করে একথা বলেছেন যে, শুধু অন্ত্রের ধারহীন অংশ দ্বারা শিকার করা জস্তই শিকারের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং শিং- এর আঘাতে মৃত জস্ত শিকারের নির্দেশের আওতায় পড়ে না। সুতরাং আলোচ্য মৃত শিকারকে যদি হালাল বলা হয় তবে এর দ্বারা সমস্ত আলেমের ইজমার বিরোধিতা করা হবে। অথচ ইজমার বিরোধিতা করা কারো মতেই জায়েয় নয়, বরং অধিকাংশ আলেম এ ধরনের কাজকেই বিধি বহির্ভূত বলেছেন।

”**دِيْنِيْتَهُمْ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ**“ (৫: ৮) -এ আয়াতটি আলেমদের ইজমা অনুযায়ী সাধারণ নির্দেশ বহন করে না। বরং এ আয়াতের দ্বারা শুধুমাত্র ঐ ধরনের জন্মকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল। সুতরাং এর সাধারণ নির্দেশ হতে হারাম জন্মগুলো বাদ পড়ে যায়। কেননা, শরীয়তের সাধারণ নির্দেশের দু'টি স্তর আছে, একটিতে সীমা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এবং অন্যটিতে কোন সীমা নির্ধারণ করা থাকে না। আর এ জাতীয় সাধারণ নির্দেশের বেলায় সীমা নির্ধারিত নির্দেশকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। অন্য আর একটি মতে বলা হয়েছে যে, এ ধরনের শিকার মৃত জন্মের হকুমের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এ ধরনের শিকারের মধ্যে রক্ত ও যাবতীয় রস ওর ভেতরেই থেকে যায়। আর মৃত জন্মেও এ কারণেই হারাম হয়ে থাকে। সুতরাং কিয়াস অনুযায়ী উপরোক্ত শিকারও হালাল নয়। অন্য আর একটি মত এই যে, পবিত্র কুরআনের ”**حِرْمَةٌ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ**“ আয়াতটি হারাম জন্মের বর্ণনায় একটি ‘মুহকাম’ আয়াত। এর কোন হকুম অন্য কোন আয়াতের হকুম দ্বারা বাতিল হয় না। **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَحِلَّ لَهُمُ الطَّيْبَاتُ** (৫: ৮)-এ আয়াতটি হালাল জন্মের বর্ণনায় একটি মুহকাম আয়াত। মূলতঃ এ ধরনের আয়াতের নির্দেশের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আর এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা হাদীস শরীফে রয়েছে। যেমন তীর দ্বারা শিকার করা জন্ম সম্পর্কিত হাদীসটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ হাদীসে যে জন্ম হালাল সম্পর্কিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত তার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ অস্ত্রের ধারাল অংশ দ্বারা যা শিকার করা হয় তা হালাল। কারণ তা পবিত্র বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে যে জন্ম হারাম সম্পর্কিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ অস্ত্রের ধারহীন অংশ দ্বারা যে জন্মকে শিকার করা হয়েছে তা হারাম। কারণ তা অপবিত্র। আর এটা অপবিত্র বস্তু হারাম সম্পর্কিত আয়াতের নির্দেশের একটি অঙ্গও বটে। অতএব কুকুর যে শিকারকে ক্ষত করে মেরে ফেলে তা হালাল সম্পর্কিত আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। আর কুকুর যে শিকারকে আঘাতে বা ভারের দ্বারা মেরেছে তা শিং বা ঐ জাতীয় বস্তু দ্বারা মৃত জন্ম সম্পর্কিত নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা হালাল নয়। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কুকুরের শিকার সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কেন নির্দেশ দেয়া হয়নি? যেমন যদি কুকুর শিকারকে ক্ষত করে মেরে ফেলে তবে তা হালাল। আর যদি ক্ষত না করে মেরে ফেলে তবে তা হালাল নয়। তাফসীরকারক এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ভার বা আঘাতের দ্বারা শিকারকে মেরে ফেলার উদাহরণ বিরল।

কারণ কুকুর সাধারণতঃ নথ বা থাবা অথবা এ দু'টো দ্বারাই শিকারকে হত্যা করে থাকে। সুতরাং কুকুরের শিকার সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন হৃকুম দেয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। অথবা যদি কুকুর ভার বা আঘাতের দ্বারা শিকারকে হত্যা করে তবে এর হৃকুম এই ব্যক্তির নিকট স্পষ্ট। কারণ সে জানে যে, এর হৃকুম মৃতজন্ম, দম আটকিয়ে মৃতজন্ম, প্রহারে মৃতজন্ম, পতনে মৃতজন্ম এবং শিং-এর আঘাতে মৃতজন্মের হৃকুমেরই মত। তবে শিকারী কোন কোন সময় তীর বা ধারহীন অঙ্গকে <sup>‘</sup>مَعْرَاضٍ<sup>’</sup> ভুল বশতঃ বা খেলাচ্ছলে শিকারের গায়ে ঠিকমত লাগাতে পারে না। বরং অধিকাংশ সময়েই ঠিকভাবে শিকারের গায়ে লাগাতে ব্যর্থ হয়ে থাকে। শিকার ক্ষত না হয়ে অঙ্গের চাপ বা আঘাতের ফলে মারা যায়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এ দু'ব্যাপারে বিস্তারিত হৃকুম দান করেছেন। অবশ্য আল্লাহই এ ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন। ঠিক এমনিভাবে কুকুর তার অভ্যাস বশতঃ কখনো কখনো শিকারকৃত জন্মকে খেয়ে ফেলে। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওর সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেনঃ “যদি কুকুর শিকারকে খেয়ে ফেলে তবে তোমরা তা খেয়ো না। কারণ আমি ভয় করি যে, কুকুর তার নিজের জন্যেই এই জন্মকে রেখে দিয়েছে।” হাদীসের এ বর্ণনাটি সঠিক। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয় গ্রন্থে হাদীসটি স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে কুকুরের শিকার সম্পর্কে এ নির্দেশটিকে কুকুরের শিকার হালাল হওয়া সম্পর্কিত আয়াতের নির্দেশ হতে পৃথক করে বলা হয়েছে যে, কুকুর যদি তার শিকারের কোন অংশ খেয়ে ফেলে তবে তা হালাল নয়। হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) ও হ্যরত ইবনে আকবাস (রাঃ) হতে একুপ বর্ণিত হয়েছে। হাসান (রঃ), শাবী (রঃ) এবং নাথজীরও (রঃ) এ অভিমত। ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ), ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্পল (রঃ) এবং ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ)-এর একটি প্রসিদ্ধ অভিমতও এটাই। ইবনে জারীর (রঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আলী (রাঃ), সাঈদ (রঃ), সালমান (রঃ), আবু হুরাইরা (রাঃ), ইবনে উমার (রাঃ) এবং ইবনে আকবাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, কুকুরের শিকার খাওয়া যাবে যদিও সে শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে। এমন কি সাঈদ (রঃ), সালমান (রঃ), আবু হুরাইরা (রাঃ) ও অন্যান্যদের মতে যদি কুকুর শিকারের এক টুকরা গোশ্ত ব্যতীত সবটুকু খেয়ে ফেলে তবুও এই গোশ্তের টুকরাটি খাওয়া যাবে। ইমাম মালিক (রঃ) এবং ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ)-এর পূর্ব মতও এটাই। ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ) তাঁর পরবর্তী নতুন অভিমতে কুকুরের শিকার সম্পর্কিত দু'টি অভিমতের প্রতিই

ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। আবু মনসুর ইবনে সাবরাগ ও অন্যান্য শাফিই মতাবলম্বী ইমামগণ ইমাম শাফিই (রঃ) হতে তাঁর এ অভিমত বর্ণনা করেন। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) উভয় ও জোরালো সনদ দ্বারা আবু সালাবা আল খুশানী হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুকুরের শিকার সম্পর্কে বলেছেনঃ “যদি তুমি কুকুরকে শিকারের জন্যে পাঠাবার সময় আল্লাহর নাম উল্লেখ করে থাক তবে তুমি শিকারকে খাও, যদিও কুকুর তার কিছু অংশ খেয়ে ফেলে এবং তোমার হস্ত তোমার প্রতি যা ফিরিয়ে দেয় তা খাও।” ইমাম নাসাই (রঃ) এ হাদীসটি আমর ইবনে শোআইবের সনদের দ্বারা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে নিম্নরূপঃ

আবু সালাবা নামক এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সম্মোধন করে বলেছিলঃ “হে আল্লাহর রাসূল!.....” ইমাম নাসাই (রঃ) হাদীসটির পরবর্তী অংশটুকু আবু দাউদ (রঃ)-এর রিওয়ায়াতের মতই বর্ণনা করেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে জারীর (রঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন কোন লোক তার কুকুরকে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে এবং কুকুর শিকারকৃত জন্তুর কিছু অংশ খেয়ে নেয় তবে বাকী অংশ সে খেতে পারে।” ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এ হাদীসটিকে হ্যারত সালমান (রাঃ) হতে ‘মাওকুফ’ হাদীস বলে অভিমত প্রকাশ করেন। অধিকাংশ আলেম কুকুরের শিকার সম্পর্কিত নির্দেশের ক্ষেত্রে আদি কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন এবং আবু সালাবা প্রমুখের বর্ণিত হাদীসকে দুর্বল বলে অভিমত প্রকাশ করেন। কোন কোন আলেম আবু সালাবা বর্ণিত হাদীসকে এ অর্থে গ্রহণ করেছেন যে, কুকুর শিকার করার পর যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মালিকের অপেক্ষা করার পর ক্ষুধার তাড়নায় বা এ জাতীয় কোন কারণে শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তবে বাকী অংশটুকু খেতে কোন দোষ নেই। কেননা, এ অবস্থায় এ আশংকা করা যায় না যে, কুকুর শিকারকে তার নিজের জন্যেই গ্রহণ করেছে। তবে কুকুর যদি শিকার করা মাত্রাই তা ভক্ষণ করতে শুরু করে তবে এ অবস্থায় বুব্বা যাবে যে, সে শিকারকে তার নিজের জন্যেই গ্রহণ করেছে। অবশ্য এ ব্যাপারে মহান আল্লাহই সম্যক অবগত।

শিকারী পাখী সম্পর্কে ইমাম শাফিই (রঃ) বলেন যে, এর শিকারের হুকুমও কুকুরের শিকারের ন্যায়। অধিকাংশ আলেমের মতে যদি শিকারী পাখী শিকার করে তার কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তবে তা খাওয়া হারাম। কিন্তু অপর একদল আলেমের মতে তা খাওয়া হারাম নয়। শাফিই মতাবলম্বী ইমাম মুয়ানী

সূরাঃ মায়িদাহ ৫

পাখীর শিকার সম্পর্কে এ অভিমত পোষণ করেন যে, শিকারী পাখী যদি শিকার করার পর শিকারের কোন অংশ খেয়ে ফেলে তবে তা খাওয়া হারাম নয়। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ)-এর মতও এটাই। তাঁরা এর কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, কুকুরকে যেমন মারপিট করে শিকার করা শিক্ষা দেয়া যায়, পাখীকে সেরূপভাবে শিকার করা শিখানো যায় না। আর তা ছাড়া শিকার খাওয়া ব্যতীত পাখীকে শিকার করা শিক্ষা দেয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এটা ধর্তব্য নয়। এ ছাড়া কুকুরের শিকার সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ এসেছে। কিন্তু পাখীর শিকার সম্পর্কে শরীয়তে কোন নির্দেশ আসেনি। শেখ আবু আলী তাঁর ‘ইফসাহ’ গ্রন্থে লিখেছেনঃ যেহেতু আমরা শিকারী কুকুর কর্তৃক শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলার পরে ঐ শিকারকে হারাম বলে গণ্য করি, সেহেতু শিকারী পাখী কর্তৃক শিকারের কিছু অংশ খাওয়া হলে উক্ত শিকার হারাম হওয়ার ব্যাপারে দুঃটি দিক রয়েছে। কিন্তু কাহী আবু তাইয়েব আবু আলী কর্তৃক এ বিশ্লেষণকে অঙ্গীকার করেছেন। তিনি বলেন যে, ইমাম শাফিন্দি (রঃ) কুকুরের ও পাখীর শিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় একই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে আল্লাহই সম্যক জ্ঞান রাখেন।

‘**أَنْطِيَهُ**’<sup>۱</sup> এ জন্মকে বলা হয় যা অন্য জন্মের শিৎ-এর আঘাতে মারা যায়।  
 যদি ওটা শিৎ দ্বারা আঘাতপ্রাণ হয় এবং তা হতে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং ঐ  
 আঘাত যদি যবেহ করার স্থানেও লাগে তবুও ঐ ধরনের জন্ম খাওয়া হারাম।  
 আরবী ভাষায় ‘**شَدَّتِيَّةً**’<sup>۲</sup> অর্থাৎ ‘**مَفْعُولٍ**’<sup>۳</sup>-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।  
 আরবী ভাষায় এ ধরনের শব্দ অধিকাংশ সময়ে ‘**بَعْتَاهِ**’<sup>۴</sup> ব্যবহৃত হয়ে থাকে।  
 যথা ‘**كَفْ خَضِيبٌ**’<sup>۵</sup> অর্থাৎ সুরমা লাগান চোখ এবং ‘**عَيْنٌ كَعِيلٌ**’<sup>۶</sup>  
 লাগান হস্তাতলু। আরবী ভাষায় এটা কখনও ‘**عَيْنٌ كَحِيلَةٌ**’<sup>۷</sup> এবং ‘**كَفْ خَضِيبَةٌ**’<sup>۸</sup>  
 হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু উক্ত আয়াতের শব্দগুলোতে ‘**شَدَّتِيَّةً**’<sup>۹</sup> ব্যবহৃত হওয়া

সম্পর্কে কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন যে, উক্ত শব্দগুলো ‘’স্মা-‘’-এর স্থানে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে ওর শেষে ‘’তানিষ‘’-এর ‘’-এর ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আরবরা বলে থাকে ‘’طَرِيقَةَ طُوبِلَةَ‘’ কিন্তু কেউ কেউ বলে থাকেন যে, উক্ত শব্দগুলোতে ‘’তানিষ‘’ এ জন্যেই ব্যবহার করা হয়েছে যাতে দেখা মাত্রই বুঝা যায় যে, এ শব্দগুলো ‘’মৌন্ত‘’ বা ‘’স্লিঙ্গ‘’। ত কَعِيلٌ حَسِيبٌ وَ عَيْنٌ-এর বেলায় প্রথম দৃষ্টেই ওটা ‘’মৌন্ত‘’ বলে মনে হয়।

‘’وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ‘’-এ অংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারক বলেন যে, সিংহ, নেকড়ে বাঘ, চিতা বাঘ বা কুকুর যে জন্তুকে আক্রমণ করে এবং ওর কিছু অংশ খেয়ে ফেলার কারণে ওটা মারা যায় তা খাওয়া হারাম। যদিও আঘাতের কারণে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং উক্ত আঘাত জন্তু যবেহ করার স্থানে লাগে তবুও আলেমদের ইজমা অনুযায়ী উক্ত জন্তু খাওয়া হালাল নয়। যদি হিংস্র জন্তু ছাগল, উট, গরু বা এ জাতীয় কোন জন্তুকে মেরে কিছু অংশ খেয়ে ফেলতো তবুও অঙ্গতার যুগের লোকেরা উক্ত জন্তুর কাকী অংশ খেতো। কিন্তু আল্লাহ পাক মুমিনদের জন্যে ওটা হারাম করে দেন।

‘’مَا ذَكَرْتُ‘’ অর্থাৎ দম আটকিয়ে পড়া, প্রহারে আহত, পতনে ও শিং-এর আঘাতে এবং জন্তুর আক্রমণে মৃতপ্রায় জন্তুকে যদি জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায় ও তাকে যবেহ করা যায় তবে তা খাওয়া হালাল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ ‘’যদি এ ধরনের জন্তুগুলোকে তোমরা প্রাণ থাকা অবস্থায় যবেহ করতে সক্ষম হও তবে তোমরা সেগুলো খাও। কারণ ওগুলো পবিত্র।’’ সাইদ ইবনে যুবাইর (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) এবং সুন্দীও (রঃ) এ অভিমত পোষণ করেন। হ্যরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি এ ধরনের জন্তুগুলোকে যবেহ করার পর ওগুলো লেজ, পাখা ও চোখ নাড়ে তবে সেগুলো খাওয়া হালাল। ইবনে জারীর (রঃ) হ্যরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যদি তোমরা প্রহারে, পতনে বা শিং-এর আঘাতে মৃতপ্রায় জন্তুকে হাত বা পা নাড়া অবস্থায় পাও তবে ওকে যবেহ করে খাও। তাউস, হাসান, কাতাদা, উবাইদ ইবনে উমাইর, যহুহাক এবং আরও অনেকের মতে যদি যবেহ করার পর জন্তু তার কোন অংশকে নাড়ে এবং যবেহ করার পরও বুঝা যায় যে, ওর প্রাণ আছে তবে তা খাওয়া হালাল। এটাই অধিকাংশ ফিকাহবিদের মত। ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বলও (রঃ) এ অভিমতই পোষণ করেন। ইবনে ওয়াহুহাব (রঃ) বলেন যে, একদা ইমাম মালিক (রঃ)-কে এমন বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস

করা হয়, যাকে কোন হিংস জন্ম আঘাত করার ফলে নাড়ি ভুড়ি বেরিয়ে পড়ে। তিনি উত্তরে বলেনঃ ‘আমার মতে ওকে যবেহ করার প্রয়োজন নেই।’ আশহাব বলেন যে, ইমাম মালিক (রঃ)-কে আরও জিজ্ঞেস করা হয়, যদি হিংস জন্ম কোন বকরীকে আঘাত করে তার পিঠকে ভেঙ্গে দেয় তবে ওটা মারা যাওয়ার পূর্বে কি ওকে যবেহ করা যাবে? তিনি উত্তরে বলেনঃ ‘যদি আঘাত ওর গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে আমার মতে ওটা খাওয়া ঠিক নয়। তবে যদি ওর দেহের কোন একাংশে আঘাত লেগে থাকে তাহলে আমার মতে ওটা খেতে কোন অসুবিধা নেই।’ তাঁকে আরো প্রশ্ন করা হয়, কোন হিংস জন্ম যদি বকরীর উপর লাফিয়ে পড়ে তার পিঠ ভেঙ্গে ফেলে তবে ওটা খাওয়া কি হালাল? তিনি জবাবে বলেনঃ ‘আমার মতে ওটা খাওয়া ঠিক নয়। কারণ এত বড় আঘাতের পরে ওটা জীবিত থাকতে পারে না।’ তাঁকে আরও জিজ্ঞেস করা হয়, যদি হিংস জন্ম উক্ত বকরীর পেটকে চিরে ফেলে অথচ ওর নাড়ি ভুড়ি বের না হয় তবে কি ওটা খাওয়া হালাল হবে? তিনি উত্তরে বলেনঃ ‘আমার মতে ওটা খাওয়া যাবে না।’ আর এটাই ইমাম মালিক (রঃ)-এর মাযহাবপন্থীদের মত। ইবনে কাসীর (রঃ) ইমাম মালিক (রঃ)-এর উল্লিখিত মতামত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, উক্ত আয়াতটি একটি সাধারণ নির্দেশ বহন করে। ইমাম মালিক (রঃ) এ সাধারণ নির্দেশ হতে যে বিশেষ নির্দেশগুলো বের করেছেন। এর পক্ষে বিশেষ দলীল প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থেই রাফে ইবনে খুদাইজ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ আমরা আগামীকাল শক্তির সম্মুখীন হবো। এমতাবস্থায় আমাদের সাথে যদি কোন ছুরি না থাকে তবে বাঁশের ধারাল অংশ দ্বারা আমরা যবেহ করতে পারব কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ যদি রক্ত প্রবাহিত করে এবং যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয় তবে তোমরা ঐ জন্ম খাও। কিন্তু দাঁত না নথ দ্বারা কোন জন্ম যবেহ করা যাবে না। আর এর কারণ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে এই বলি যে, দাঁত হচ্ছে হাড় স্বরূপ, আর নথ হচ্ছে আবিসিনিয়ার অমুসলিমদের অস্ত্র। দারেকুতনী (রঃ) যে হাদীসকে মারফু’ হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন সে সম্পর্কে মন্তব্যের অবকাশ আছে। হ্যরত উমার (রাঃ) হতে যে মওকুফ হাদীসটি বর্ণিত আছে ওটাই অধিক বিশুদ্ধ। হাদীসটি নিম্নরূপঃ ‘কঠ ও লুক্বা যবেহ করার প্রকৃত স্থান এবং তোমরা প্রাণ বের হওয়ার জন্যে তাড়াছড়া করো না।’।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বলের মুসনাদে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ কঠ ও লুক্বার মধ্যে যবেহ করাই কি সঠিক? তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ ‘তার রানে আঘাত করলেও তোমার জন্যে যথেষ্ট হবে।’ সনদের দিক থেকে এটা একটা বিশুদ্ধ হাদীস। তবে হাদীসের নির্দেশটি ঐ বিশেষ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে যখন জন্মের কঠ বা লুক্বাতে যবেহ করা সম্ভবপর হবে না।

**مَا ذُبَحَ عَلَى النَّصِبِ** মুজাহিদ এবং ইবনে জুরাইদ বলেন যে, কা'বা শরীফের এলাকায় অবস্থিত একটি পাথরকে **نَصْبٌ** বলা হয়। ইবনে জুরাইদ আরও বলেন যে, সেখানে ৩৬০টি পূজার বেদী ছিল। জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা এ বেদীগুলোর নিকটে পশু বলি দিত এবং তারা পবিত্র কা'বা গৃহের নিকটবর্তী বেদীগুলোতে বলি দেয়া পশুগুলোর রক্ত ছিটিয়ে দিতো। তারা উক্ত পশুগুলোর গোশ্ত বেদীতে রেখে দিতো। আরও অনেক তাফসীরকারকও এ বর্ণনা দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন এবং পূজার বেদীর বলি দেয়া পশুগুলোকে খাওয়া হারাম করে দেন। এমনকি পূজার বেদীর উপর বলিদানকৃত পশুগুলোকে হত্যা করার সময় আল্লাহর নাম নিলেও তা খাওয়া হারাম। কারণ এটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) এ জাতীয় শিরককে নিষেধ বলে ঘোষণা করেছেন। আর এটা হারাম হওয়াই বাস্তুনীয়। কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে যবেহ করা জন্মের হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশ ইতিপূর্বেই দেয়া হয়েছে।

**وَإِن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ** অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তীরের সাহায্যে অংশ বণ্টন করাও তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। **أَرْمَنْيِ رَبِّيْ** শব্দের একবচন **أَرْمَنْيِ** যুলাম শব্দটি। কখনো কখনো একে যালামও পড়া হয়। অজ্ঞতার যুগে আরবরা এ তীরের সাহায্যে ভাগ্য নির্ধারণ করতো। সেখানে তিনটি তীর থাকতো। একটিতে লিখা থাকতো **أَفْعُلُ** বা কর। দ্বিতীয়টিতে লিখা থাকতো **أَفْعُلُ لَّا** বা করো না। আর তৃতীয়টিতে কিছুই লিখা থাকতো না। কারো কারো বর্ণনানুযায়ী প্রথমটিতে লিখা থাকতো **أَرْمَنْيِ رَبِّيْ** অর্থাৎ আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয়টিতে লিখা থাকতো **أَرْهَانْيِ رَبِّيْ** অর্থাৎ আমার প্রভু আমাকে নিষেধ করেছেন। আর তৃতীয়টিতে কিছুই লিখা থাকতো না। যখন তাদের কোন কাজে দ্বিধা-সংকোচ আসতো তখন তারা এ তীর নিষ্কেপ করতো। যদি নির্দেশসূচক তীরটি উঠতো তখন তারা ঐ কাজটি করতো।

নিষেধসূচক তীরটি উঠলে তারা এ কাজটি থেকে বিরত থাকতো। আর শুন্য তীরটি উঠলে তারা পুনরায় তীর নিষ্কেপ করতো। **‘سِتْقَسَام’**, শব্দটি আরবী ভাষায় তীরের দ্বারা অংশ অব্বেষণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটাই আবৃ জাফর ইবনে জারীরের অভিযন্ত। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) ইবনে আববাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ‘**لِّجَّا**’ এমন ধরনের তীরকে বলা হতো যদ্বারা তারা তাদের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখজি, হাসান বসরী এবং মুকাতিল ইবনে হাইয়ান থেকেও এই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক এবং অন্যান্যদের মতে কুরাইশদের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মূর্তিটির নাম ছিল হ্বল। ওটা পবিত্র কা'বা গৃহের ভেতরের কৃপের মধ্যে পোঁতা ছিল। কা'বা শরীফের জন্যে যে সমস্ত উপটোকন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আসতো তা উক্ত কৃপে সংরক্ষিত রাখা হতো। হ্বলের নিকট সাতটি তীর রাখা হতো, এ তীরগুলোতে কিছু লিখা থাকতো। তাদের বিভিন্ন কাজে যখন দ্বিধা-সংকোচের সৃষ্টি হতো তখন তারা এ তীরগুলো নিষ্কেপ করতো এবং তীরের নির্দেশানুযায়ী কাজ করতো। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন তখন তিনি তথায় হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) ও হ্যরত ইসমাইল (আঃ)-এর পূর্ণ মূর্তি দেখতে পান। তাদের দু'হাতে তীর রাখা ছিল। নবী করীম (সঃ) তখন বলেনঃ “আল্লাহ তাদেরকে (অঙ্গতা যুগের আরবদেরকে) ধ্রংস করুন! কারণ তারা জানতো যে, হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) ও হ্যরত ইসমাইল (আঃ) কখনও ভাগ্য নির্ধারণে এ তীর ব্যবহার করতেন না।” সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আরও বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং আবৃ বকর (রাঃ) মদীনায় হিজরতের জন্যে রওয়ানা হন তখন সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জাশাম তাদেরকে ধরে জীবিতাবস্থায় মক্কায় ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সুরাকা বলেন যে, তিনি তাঁরেদকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবেন কি না তা বের হওয়ার পূর্বেই তীর নিষ্কেপ করে জানবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দেখা গেল যে, তীর টানার ফলে তাঁর অপছন্দনীয় বস্তুটি প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ তিনি তাঁদের ক্ষতি সাধন করতে পারবেন না। এরপর তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও তীর নিষ্কেপ করেন। কিন্তু প্রতিবারই তাঁর অপছন্দনীয় বস্তুটি প্রকাশ পেতে থাকে। এতদ্সত্ত্বেও তিনি তাঁদের অব্বেষণে বের হন। অবশ্য তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে মিরদুওয়াই হ্যরত আবৃ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ভবিষ্যদ্বাণী করে অথবা তীরের দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করে এবং কোন বিশেষ ঘটনাকে অঙ্গ মনে করে সফর হতে বিরত

থাকে, সে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।' হ্যরত মুজাহিদ (রহঃ)-এর ব্যাখ্যায় আরও বলেন যে, 'أَزْلَمُ بِالْأَزْلَامِ'-কুবাবুরুমানো হতো। তাফসীরকারক বলেন যে, মুজাহিদের এ মত সম্পর্কে মন্তব্যের অবকাশ আছে। তবে এটা বলা যেতে পারে যে, আরবরা তীর দ্বারা জুয়া খেলতো এবং ইস্তাখারা করতো। আল্লাহই এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানেন।

মহান আল্লাহ তীর এবং জুয়াখেলা এ দু'টিকে একই সাথে বর্ণনা করেছেন। যেমন এ সূরার শেষাংশে আল্লাহ পাক বলেনঃ "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মৃত্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ধারক তীর ঘৃণ্য বস্তু ও শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা ওটা বর্জন কর। যেন তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ-জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায হতে বাধা দিতে চায়। তবুও কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?" ঠিক এমনিভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করা জঘন্যতা, অষ্টতা, মূর্খতা এবং একটি শিরকী কাজ। আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যখন তাদের কোন কাজে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় তখন যেন তারা আল্লাহর ইবাদত করে, তাদের বাস্তিত কাজের জন্যে ইস্তাখারা করে এবং আল্লাহর কাছে তাদের কাজের জন্যে মঙ্গল কামনা করে। মুসনাদে আহমাদ, সহীহ বুখারী এবং সুনান ইন্সমূহে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে যাবতীয় কাজে পবিত্র কুরআনের শিখানোর মত করে ইস্তাখারা করা শিক্ষা দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ যখন তোমাদের কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে পড়বে তখন তোমরা দু'রাকআত নফল নামায পড়ে নিয়ে নিম্নের দু'আটি পড়বেঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِبِرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ  
الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِيرُ لَا أَقْدِيرُ وَتَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ وَإِنْتَ عَلَامُ الْغَيُوبِ اللَّهُمَّ إِنِّي  
كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (تَسْمِيهِ بِإِسْمِهِ) خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ  
أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَأَجْلِهِ فَاقْدِرُهُ لِي وَيُسْرِهُ لِي ثُمَّ بَارِكُهُ فِيهِ - وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ  
أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَأَجْلِهِ فَاصْرِفُهُ  
عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْلِي الْخَيْرَ حِيثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ -

অনুবাদঃ “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে মঙ্গল কামনা করছি এবং আপনার ক্ষমতার ওসিলায় আপনার নিকট শক্তি কামনা করছি। আপনার নিকট আপনার মহান দান যাঞ্চগা করছি। কারণ আপনি ক্ষমতাবান আর আমি অক্ষম। আপনি জানেন আর আমি কিছুই জানি না। আপনি অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে সম্যক অবগত। হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন যে, এ কাজে (কাজের নাম বলতে হবে) আমার দ্বীন, দুনিয়া, ইহজীবন ও পরজীবন অথবা বর্তমান বা ভবিষ্যতের জন্যে কোন মঙ্গল নিহিত রয়েছে, তবে আপনি তা আমার জন্যে নির্ধারিত করে দিন এবং সহজ করে দিন, অতঃপর তাতে বরক্ত দান করুন। হে আল্লাহ! যদি আপনি জানেন যে, আমার এ কাজে আমার দ্বীন, দুনিয়া, ইহজীবন ও পরজীবনে কোন অমঙ্গল রয়েছে, তবে আমাকে তা হতে বিরত রাখুন এবং উক্ত কাজকেও আমা হতে দূরে রাখুন। আর যে কাজে আমার জন্যে মঙ্গল রয়েছে তা আমার জন্যে নির্ধারিত করে দিন এবং ঐ কাজে আমার সন্তুষ্টি দান করুন।” উক্ত দু’আয় বর্ণিত শব্দগুলো মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিয়ী (রাঃ) এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ “হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এ হাদীসটি একটি হাসান সহীহ এবং গারীব হাদীস। এ হাদীসটিকে আমরা শুধু আবুল মাওয়ালীর সনদের মাধ্যমে পাই।”

**আলী ইবনে আবি তালহা ইবনে আবুরাস (রাঃ)** হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, কাফিররা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে। অর্থাৎ তারা তোমাদের ধর্মের সাথে তাদের ধর্মকে মিশিয়ে দেয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে। আতা ইবনে আবি রাবাহ, সুন্দী ও মুকাতিল ইবনে হাইয়ান হতেও এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে। আয়াতের এ অর্থ বহনকারী একটি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আরব উপদ্বীপের নামাযীগণ শয়তানের পূজা করবে, শয়তান এটা থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে সে তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উক্ফানি দিতে থাকবে।” উক্ত আয়াতটির অর্থ এটা ও হতে পারে যে, মকার মুশরিকগণ মুসলমানদের মত রূপ ধারণ করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কারণ, ইসলামের নির্দেশাবলী এ দু’টি সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এ জন্যেই তো আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা ধৈর্য ধারণ করে, কাফিরদের বিরোধিতায় দৃঢ় তাকে এবং আল্লাহ

ছাড়া আর কাউকেও তয় না করে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেছেনঃ “কাফিরগণ কর্তৃক তোমাদের বিরোধিতা করা হলে তোমরা তাদেরকে তয় করো না, বরং তোমরা আমাকে তয় কর। আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো, তাদের উপর বিজয় দান করবো এবং তোমাদেরকে হিফাজত করবো যেন তারা তোমাদের ক্ষতি করতে না পারে। আর সর্বেপরি দুনিয়া ও আখিরাতে আমি তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করবো।”

**الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ  
الْإِسْلَامَ دِينًا۔**

এটা উপরে মুহাম্মাদিয়ার প্রতি আল্লাহর মহান দান। কারণ, তিনি এ উপরের জীবন বিধানকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন, যার ফলে তারা অন্য বিধানের মুখাপেক্ষী নয়। এমনিভাবে তিনি তাদের নবী (সঃ)-কে ‘খাতামুন্নাবিয়তীন’ বা সর্বশেষ নবী করেছেন এবং অন্য কোন নবীর মুখাপেক্ষী করেননি। আর তাদের নবীকে সমগ্র মানব জাতির ও বিশ্ববাসীর নবী করে পাঠিয়েছেন। তিনি যে বস্তুকে হালাল করেছেন সেটাই হালাল এবং যেই বস্তুকে হারাম করেছেন সেটাই হারাম। তিনি যে দ্বীনকে প্রবর্তন করেছেন ওটাই একমাত্র দ্বীন এবং তিনি যে সংবাদ প্রদান করেছেন ওটা ন্যায় ও সত্য তাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা বা বৈপরিত্য নেই। যেমন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেছেনঃ “(হে নবী!) তুমি যে সমস্ত সংবাদ দিয়েছ সেগুলো সত্য এবং যে সমস্ত আদেশ ও নিষেধ করেছ সেগুলো ন্যায় নীতি ভিত্তিক।” আল্লাহ এ উপরের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করার মাধ্যমে তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। আর এজন্যেই তিনি বলেছেনঃ “আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করেছি এবং তোমাদের জন্যে আমার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছি। আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছি।” সুতরাং তোমরা ওটাকে তোমাদের নিজেদের জন্যে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হও। কেননা, ওটা সেই দ্বীন যাকে আল্লাহ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। আর এ দ্বীনসহ তিনি তাঁর সম্মানিত রাসূলদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাসূল (সঃ)-কে পাঠিয়েছেন। এ দ্বীনসহ তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গৃহকে অবতীর্ণ করেছেন। হ্যরত আলী ইবনে তালহা ইবনে আবুস (রাঃ) হতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, দ্বীনের দ্বারা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাঁর নবী ও মুমিনদেরকে এ আয়াতের দ্বারা এ সংবাদ প্রদান করেন যে, তিনি তাঁদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। সুতরাং তাঁরা আর কখনও

এর চেয়ে অধিক বস্তুর মুখাপেক্ষী হবে না। আর আল্লাহ যখন এ দ্঵ীনকে একবার পরিপূর্ণতা দান করেছেন তখন তিনি আর কখনও তাকে অসম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাবেন না। আল্লাহ একবার যখন ওর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন তখন আর কখনও ওর প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। আসবাত সুন্দী হতে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত আরাফার দিনে অবতীর্ণ হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হালাল এবং হারাম সম্পর্কিত আর কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ হজু হতে প্রত্যাবর্তনের পরই ইন্তেকাল করেন। আসমা বিনতে উমাইস বলেনঃ “আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হজু করেছিলাম। যখন আমরা সফরের অবস্থায় ছিলাম তখন একদিন হঠাৎ জিবরাইল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বাহনের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় একটু নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েন। বাহনটি তখন অহীর ভার সহ্য করতে না পারায় বসে পড়ে। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শরীরের উপর আমার চাদরটি বিছিয়ে দিলাম।” ইবনে জারীর এবং আরও অনেকের মতে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আরাফাত দিবসের ৮১ দিন পরে ইন্তেকাল করেন। ইবনে জারীর আনতারার উদ্ভৃতি দিয়ে আরও বলেন যে, উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দিনটি ছিল হজে আকবরের দিন। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হ্যরত উমার (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করেন। উমার (রাঃ) বলেনঃ “আমরা এ দ্বীন সম্পর্কে আরও বেশী কিছু আশা করেছিলাম। কিন্তু এটা যখন পূর্ণতা লাভ করেছে, তখন সাধারণ নিয়মানুযায়ী এখন তা অবনতির দিকে যেতে পারে।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তুমি সত্য কথাই বলেছো।” এ হাদীসের অর্থের স্বপক্ষে অন্য একটি সহীহ হাদীস এসেছে, হাদীসটি নিম্নরূপঃ

“ইসলাম স্বল্প সংখ্যক লোক নিয়ে শুরু হয়েছিল এবং অতিসত্ত্বরই তা স্বল্প সংখ্যার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব এ স্বল্প সংখ্যক লোকের জন্যে সুসংবাদ।” ইমাম আহমদ ইবনে হাস্বল (রঃ) তারিক ইবনে শিহাব হতে বর্ণনা করেন যে, একজন ইয়াহুদী হ্যরত উমার ইবনে খাতাব (রাঃ)-এর নিকট এসে বলেনঃ “হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাদের ধর্মীয় প্রস্ত্রে একটি আয়াত আছে, তা যদি ইয়াহুদীদের উপর অবতীর্ণ হতো তবে আমরা ঐ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিনটিকে একটি ঈদের দিন হিসেবে গণ্য করতাম।” তখন হ্যরত উমার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “আয়াতটি কি?” উক্তরে ইয়াহুদী বলেঃ

- এ আয়াতটি । হ্যরত উমার (রাঃ) তখন বললেনঃ ‘আল্লাহর শপথ! যে দিনে ও যে সময়ে উক্ত আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল আমি উক্ত দিন ও সময় সম্পর্কে অবগত আছি । ওটা ছিল আরাফার দিন শুক্ৰবার সন্ধ্যার সময় ।’ ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এবং ইমাম নাসাই (রঃ) এ হাদীসটিকে তাঁদের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন । ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থের কিতাবুত তাফসীরে এ হাদীসটি তারিক হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে, ইয়াহুদীগণ হ্যরত উমার (রাঃ) বললোঃ ‘আপনারা আপনাদের পবিত্র কুরআনের এমন একটি আয়াত পাঠ করে থাকেন যে, যদি ঐ আয়াতটি আমাদের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের উপর অবতীর্ণ হতো তবে আমরা ঐ দিনকেই ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম ।’ তখন হ্যরত উমার (রাঃ) বললেনঃ ‘আমি এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও স্থান সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছি । আর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন কোথায় ছিলেন সেটাও জানি । উক্ত দিনটি ছিল আরাফার দিন এবং আল্লাহর শপথ! আমিও সে সময় আরাফায় ছিলাম ।’ সুফিয়ান বলেনঃ ‘আরাফার দিনটি শুক্ৰবার ছিল কি-না এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে ।’ ইবনে কাসীর (রঃ) বলেনঃ সুফিয়ান যদি এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে থাকেন যে, শুক্ৰবারের কথাটি হাদীসের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে কি-না, তবে এটা হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তাঁর অসতর্কতা । কারণ, তিনি সন্দেহ করেছেন যে, তাঁর শায়েখ তাঁকে শুক্ৰবারের কথা বলেছেন কি বলেননি । আর যদি তাঁর এ ব্যাপারে সন্দেহ হয়ে থাকে যে, বিদায় হজ্রের বছর আরাফায় অবস্থান শুক্ৰবার দিন হয়েছিল কি-না? তবে আমার ধারণায় এ সন্দেহ সুফিয়ান সওরী কর্তৃক হতে পারে না । কারণ, এটা এমন একটি জানা ও প্রসিদ্ধ ঘটনা যাতে ‘মাগায়ী’ ও ‘সিয়র’ লেখক এবং ফকীহগণ একমত । এ ব্যাপারে এতে অধিকসংখ্যক প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত রয়েছে যে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারে না । অবশ্য আল্লাহই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন ।

হ্যরত উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বছ সনদের মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে । ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেন যে, হ্যরত কা'ব (রঃ) হ্যরত উমার (রাঃ)-কে বলেনঃ ‘যদি অন্য কোন উম্মতের উপর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হতো তবে তারা ঐ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিনটিকে একটি ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করতো এবং সেই দিনে তারা সকলেই একত্রিত হতো ।’ তখন হ্যরত উমার (রাঃ) হ্যরত কা'ব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ ‘ওটা কোন আয়াত? ’

তিনি উভয়ের বললেনঃ ... - الْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... এ আয়াতটি। তখন হ্যরত উমার (রাঃ) বললেনঃ “আমি এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিন ও সময় সম্পর্কে জানি। ওটা ছিল জুম‘আ ও আরাফার দিন। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছিয়ে, এ দু’দিনই আমাদের ঈদের দিন।” ইবনে জারীর (রাঃ) আম্বারা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একদা হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) আয়াতটি পাঠ করেন। তখন একজন ইয়াহুদী তাঁকে বলেনঃ “যদি এ আয়াতটি আমাদের উপর অবতীর্ণ হতো তবে আমরা ওর অবতীর্ণ হওয়ার দিনকেই ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম।” উভয়ের ইবনে আবুস (রাঃ) বলেনঃ “ওটা দু’টি ঈদের দিনে অবতীর্ণ হয়েছে। একটি ঈদের দিন এবং অপরটি জুম‘আর দিন।” হ্যরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ... الْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর আরাফার দিন সক্ষ্যার সময় অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) দণ্ডয়মান অবস্থায় ছিলেন। আমর ইবনে কায়েস আস্সাকুনী বলেন যে, তিনি মু‘আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ)-কে মিস্তরের উপর দণ্ডয়মান অবস্থায় ... الْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... পূর্ণ আয়াতটি তিলাওয়াত করতে শুনেন। অতঃপর মুআবিয়া (রাঃ) বলেনঃ “এ আয়াতটি আরাফার দিন অবতীর্ণ হয়। নবী করীম (সঃ) সে সময় মাওকাফে অবস্থান করছিলেন। ইবনে জারীর (রাঃ), ইবনে মিরদুওয়াই (রাঃ) এবং তিবরানী (রাঃ) তাঁদের সনদের মাধ্যমে হ্যরত আবুস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেন, সোমবার দিন তিনি মক্কা হতে হিজরত করেন, সোমবার দিন তিনি মদীনায় প্রবেশ করেন এবং সোমবার দিন তিনি বদরের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এ সোমবার দিন সূরা মায়দাহ তথা ... الْيَوْমُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং সোমবারের যিকরের (ইবাদতের) অধিক মূল্য দেয়া হয়েছে। ইবনে কাসীর (রাঃ) এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এটি একটি ‘গারীব’ হাদীস এবং এর সনদ দুর্বল। ইমাম আহমাদ ইবনে হাসল (রাঃ) তাঁর সনদের মাধ্যমে ইবনে আবুস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেছেন, সোমবার দিন তাঁকে নবুওয়াত প্রদান করা হয়েছে, সোমবার দিন তিনি মক্কা হতে মদীনার দিকে হিজরত করেছেন এবং সোমবার দিন হাজরে আসওয়াদকে স্থাপন করা হয়েছে। তাফসীরকারক বলেনঃ ইমাম আহমাদ ইবনে হাসল (রাঃ)-এর এ বর্ণনায় সোমবার দিন সূরা মায়দাহ অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ নেই। আল্লাহ পাক এ বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।

ইবনে কাসীর (রঃ) আরও বলেনঃ সম্ভবতঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতে চেয়েছিলেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিন তিনি প্রকারের ঈদের দিন ছিল। কিন্তু বর্ণনাকারী ভুল বশতঃ *أَنْتَنِينَ*, শব্দের দ্বারা সোমবারের অর্থ করেছেন। আল্লাহই এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী জানেন।

ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় সম্পর্কে আরও দু'টি অভিমত রয়েছে। একটি অভিমত হলো এই যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দিন কারও জানা নেই। ইবনে জারীর এ অভিমতের স্বপক্ষে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে একটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। আর একটি মতানুযায়ী বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিদায় হজ্রের সফরে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে জারীর এ হাদীসটি তাঁর সনদের মাধ্যমে রাখী ইবনে আসাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেনঃ ইবনে মিরদুওয়াই তাঁর সনদের মাধ্যমে আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর গাদিরে জুমের দিন অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আলী (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ “আমি যার নেতা আলীও তার নেতা।” ইবনে মিরদুওয়াই এ হাদীসটি হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতেও বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় দেখা যায় যে, ঐদিনটি ছিল ১৪ই খিলহজ্জ। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিদায় হজ্জ থেকে প্রতাবর্তনের দিন। ইবনে কাসীর (রঃ) উপরোক্ত মতগুলোর কোনটিই শুন্দ নয় বলে মন্তব্য করেছেন। বরং সঠিক ও সন্দেহাতীত অভিমত এই যে, আয়াতটি আরাফার দিন অবতীর্ণ হয়েছে। আর সেদিন ছিল জুম‘আর দিন। হ্যরত উমার ইবনে খাতোব (রাঃ), আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ), ইসলামের প্রথম বাদশাহ মু’আবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ), কুরআনের ভাষ্যকার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হতেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আরাফার দিনটি ছিল জুম‘আর দিন। শা’বী, কাতাদাহ ইবনে দিমাআহ, শাহর ইবনে হাওশাব এবং বছ ইমাম ও আলেমেরও অভিমত এটাই। ইবনে জারীর তাবারীও এ মতটিই গ্রহণ করেছেন।

- فَمَنِ اضطَرَّ فِي مُخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَا ثُمَّ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ -

আল্লাহ যে সমস্ত বস্তুকে হারাম করেছেন, প্রয়োজনের তাকিদে যদি কোন লোক ওগুলো থেতে বাধ্য হয় তবে সেগুলো থেতে পারে। আল্লাহ এ ব্যাপারে তার প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। কেননা, আল্লাহ জানেন যে, সে অপারগ ও অক্ষম হয়ে

হারাম বস্তুকে গ্রহণ করেছে। সুতরাং তিনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন। ইবনে হিবানের সহীহ ঘষ্টে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যে কাজ করার অনুমতি প্রদান করেছেন তা পালন করাকে তিনি ঐরকম পছন্দ করেন যেমন তিনি তাঁর অবাধ্য না হওয়াকে পছন্দ করে থাকেন।

আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ)-এর মুসনাদে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতিকে গ্রহণ করলো না সে যেন আরাফার পাহাড় সমূহের সমান গুনাহ করলো। এজন্যেই ফিকাহবিদগণের মতে কখনও মৃত জন্ম খাওয়া ওয়াজিব এবং ওটা ঐ সময়, যখন হালাল বস্তু পাওয়া যায় না, আর ক্ষুধার কারণে মৃত্যুর আশংকা রয়েছে। আবার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনও মৃত জন্ম খাওয়া মুস্তাহাব এবং কখনও মুবাহ। অবশ্য প্রয়োজনের তাকিদে হারাম বস্তু কি পরিমাণ গ্রহণ করা যাবে এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে যে পরিমাণ খেলে জান বাঁচে তার বেশী নয়। কারও মতে পেট ভরেও খাওয়া যাবে। আবার কারো কারো মতে পেট ভরে খাওয়াও যাবে এবং ভবিষ্যতের জন্যে রেখেও দেয়া যাবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আহকাম সম্পর্কিত কিভাবে পাওয়া যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় বিব্রত হয়ে পড়ে, এমতাবস্থায় মৃত জন্ম পেলে বা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার পেলে সে কি মৃত জন্ম বা শিকারকৃত জন্ম খেয়ে নেবে না অন্যের খাদ্য তার বিনানুমতিতেই খেয়ে নেবে এবং পরে মালিককে সেই পরিমাণ খাদ্য দিয়ে দেবে, এ ব্যাপারে আলেমদের দু'ধরনের অভিমত রয়েছে। ইমাম শাফিউ (রঃ) হতে দু'ধরনের অভিমতই বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ সাধারণ লোকের মধ্যে ধারণা প্রচলিত আছে যে, মৃতজন্ম হালাল হওয়ার জন্যে তিন দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকা শর্ত। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এ শর্ত ঠিক নয়, বরং যখনই কোন ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় মৃত খেতে বাধ্য ও মজবুর হয়ে পড়বে তখনই তার জন্যে তা খাওয়া জায়েয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ) তাঁর সনদের মাধ্যমে আবু ওয়াকিদ আল লায়সী হতে বর্ণনা করেন যে, একদা সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ আমরা কখনও কখনও এমন স্থানে উপস্থিত হই সেখানে আমরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি। তখন কোন্ কোন্ অবস্থায় আমাদের জন্যে মৃত জন্ম খাওয়া হালাল হবে? রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ ‘যখন তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় কোন খাদ্য

বা তরিতরকারী না পাও তখন তোমরা তা (মৃত জন্ম) খেতে পার।” হাদীসে উল্লিখিত সনদটি ইমাম আহমাদ একাই তাঁর গ্রন্থে এনেছেন। অবশ্য সনদটি সহীহ। কারণ, ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) সনদ সহীহ হওয়ার জন্যে যেসব শর্ত আরোপ করেছেন তা উক্ত শর্তগুলো পূরণ করে। এ হাদীসটি ইবনে জারীরও তাঁর সনদের মাধ্যমে ইমাম আওয়ায়ী হতে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ এ হাদীসটিকে “মুরসাল” সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, যে সনদে কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ থাকে না তাকে মুরসাল সনদ বলে। ইবনে জারীর তাঁর সনদের মাধ্যমে ইবনে আউন হতে বর্ণনা করেন, আমি হাসানের নিকট সামুরার কিতাব দেখতে পাই এবং তাঁর সম্মুখে ওটা পাঠ করি। তাতে লিপিবদ্ধ ছিল যে, সকাল বা সন্ধ্যায় খাদ্য পাওয়া না গেলে ঐ অবস্থাকে ক্ষুধার চরম অবস্থা বলে বিবেচনা করা যাবে। (আর এ অবস্থায় মৃত জন্ম খাওয়া যেতে পারে।) হাসান বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ কোন অবস্থায় হারাম বস্তু খাওয়া যায়? তিনি উত্তরে বলেনঃ “যখন তুমি তোমার পরিবারবর্গের জন্যে দুধ অথবা অন্য খাদ্যসামগ্ৰী সরবরাহ করতে না পার তখন হারাম বস্তু (মৃত জন্ম) খেতে পার।” অপর একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হালাল ও হারাম বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। উত্তরে তিনি বলেনঃ “তোমার জন্যে পবিত্র বস্তু খাওয়া হালাল এবং অপবিত্র বস্তু খাওয়া হারাম। তবে যদি তুমি কখনো কোন খাদ্য খেতে বাধ্য হও তাহলে হালাল বা হারাম বিবেচনা না করে খেতে পার। কিন্তু যে অবস্থায় তুমি তা পরিহার করে চলতে পার সে অবস্থায় তা খাওয়া হারাম।” ঐ ব্যক্তি তখন তাকে আবার জিজ্ঞেস করলো, উক্ত অনন্যোপায় অবস্থাটা কি? যে অবস্থায় আমার জন্যে হারাম খাওয়া সিদ্ধ এবং ঐ অবস্থাই বা কি, যে অবস্থা আমাকে হারাম বস্তু খাওয়া থেকে নিবৃত্ত রাখবে? রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বললেনঃ “ঐ অবস্থাকে অনন্যোপায় অবস্থা বলা হয়, যে অবস্থায় তুমি কোন হালাল বস্তু না পাও অথচ তোমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলো হারাম বস্তু হিসেবে পেয়ে থাক। ঐ সময় তুমি ওগুলো দ্বারা প্রয়োজনমত তোমার পরিবার পরিজনকে খাওয়াও। তবে যখন ওগুলো পরিহার করে চলার অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন সেগুলো খাওয়া বন্ধ কর। আর অনুকূল অবস্থা বলতে ঐ অবস্থাকে বুঝায়, যে অবস্থায় তুমি তোমার পরিজনকে শুধুমাত্র রাতের বেলায় সামান্য পরিমাণ পানীয় বস্তু দিতে পার। এ অবস্থায় তুমি হারাম বস্তু পরিহার কর। কারণ এটা তোমার জন্যে অনুকূল অবস্থা। তাই এ অবস্থায় কোন হারাম খাওয়া জায়েয় নয়।” ইমাম আবু দাউদ (রঃ) তাঁর সনদের মাধ্যমে নুয়ায়ী আল-আমেরীর মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে

তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ কোন্ অবস্থায় আমাদের জন্যে মৃত জন্ম খাওয়া হালাল? রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, “তোমাদের খাদ্য কি?” উভরে তিনি বললেনঃ আমরা সকালে এক পেয়ালা এবং বিকালে এক পেয়ালা দুধ পান করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “এ অবস্থাকে ক্ষুধার্ত অবস্থা বলা যায়।” তিনি এ অবস্থায় তাঁদেরকে মৃত জন্ম খেতে অনুমতি দেন। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) এ হাদীসটিকে একাই তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। ইবনে কাসীর (রঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেনঃ তারা সকাল ও বিকাল বেলায় যা খেতো তা তাদের জন্যে যথেষ্ট ছিলনা বলেই তাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে মৃতজন্ম খেতে অনুমতি দিয়েছেন। ফিকাহবিদদের একটি দল এ হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করে বলেন যে, এ জাতীয় লোকদের জন্যে পেট ভরেও হারাম বস্তু খাওয়া জায়েয়। শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর জন্যে খাওয়া যেতে পারে, এরপ শর্ত তাঁরা আরোপ করেননি। অবশ্য আল্লাহই এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী জানেন।

ইমাম আবু দাউদ (রঃ) তাঁর সনদের মাধ্যমে সামুরা হতে আর একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, একটি লোক তাঁর পরিবার পরিজনসহ হারারা নামক স্থানে অবতরণ করে। তথায় এক ব্যক্তি তার উদ্ধৃতিকে হারিয়েছিল। সে এ লোকটিকে বললোঃ ‘যদি তুমি আমার হারানো উটটি পাও তবে তোমার কাছে রেখে দিও।’ এরপর সে উদ্ধৃতি পেল এবং বহু খোঁজাখুজির পরেও মালিকের কোন সন্ধান পেলো না। ইত্যবসরে এ উদ্ধৃতি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লো। তখন তার স্ত্রী তাকে বললোঃ ‘তুমি উদ্ধৃতিকে যবেহ কর।’ কিন্তু সে যবেহ করতে অস্বীকার করলো এবং পরে উদ্ধৃতি মারা গেল। মারা যাওয়ার পর তার স্ত্রী তাকে উদ্ধৃতির চামড়া ছাড়াতে এবং ওর গোশত ও চর্বি শুকিয়ে নিতে বললো, যেন তারা তা খেতে পারে। তখন সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস না করে তা করতে অস্বীকার করলো। এর পর সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “তোমার কাছে কি এ পরিমাণ খাদ্য আছে যে, ওর ফলে তুমি এ মৃত উদ্ধৃতির গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকতে পার?” উভরে লোকটি বললোঃ ‘না।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাদেরকে তা খেতে অনুমতি দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, এরপর উদ্ধৃতির মালিক ফিরে আসে এবং লোকটি তাকে সমষ্ট খবর খুলে বলে। উদ্ধৃতির মালিক তাকে বলে, ‘তুমি প্রথমেই কেন উদ্ধৃতিকে যবেহ করে খাওনি?’ সে উভরে বলেঃ ‘আমি তোমার সামনে লজ্জিত হবো বলেই যবেহ করিনি।’ এ হাদীসটি ও ইমাম আবু দাউদ (রঃ) একাই বর্ণনা করেছেন। এ

হাদীসের আলোকে ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের অপর একটি দল দলীল গ্রহণ করেন যে, এ প্রকার লোকদের জন্যে হারাম বস্তু পেট ভরে খাওয়া, প্রয়োজনোধে কিছু সময়ের জন্যে সঞ্চিত করা উভয়ই জায়েয়। তবে আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন।

**غَيْرُ مُتَجَانِفٌ لِّأَنْ** অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে লিঙ্গ না হয় তার জন্যেই এ প্রকারের হারাম বস্তু ভক্ষণ করা বৈধ। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেনঃ মহান আল্লাহ সূরা মায়দাহর এ আয়াতে শুধুমাত্র পাপে লিঙ্গ ব্যক্তিদের জন্যে হারাম বস্তু ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু সীমালংঘনকারীদের জন্যেও যে তা ভক্ষণ করা হারাম তার কোন উল্লেখ নেই। যেমন সূরা বাকারার আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। আয়াতটি নিম্নরূপঃ

“যারা অনন্যোপায় অবস্থায় অন্যায়কারী, কিন্তু সীমালংঘনকারী নয় তাদের কোন পাপ হবে না। নিচয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।” এ আয়াত হতে ফিকাহবিদগণের একটি দল প্রমাণ গ্রহণ করেন যে, যে ব্যক্তি সফরে নাফরমানীমূলক কাজে লিঙ্গ থাকে, সে সফর সংক্রান্ত ব্যাপারে শরীয়তের শিথিলতা পাওয়ার যোগ্য নয়। কেননা, পাপ কার্যে লিঙ্গ ব্যক্তিদের জন্যে শিথিলতা প্রযোজ্য নয়। তবে আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন।

#### ৪। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস

করে-তাদের জন্যে কি কি হালাল করা হয়েছে? তুমি বল-পরিত্র জিনিসগুলো তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী তোমরা যে সমস্ত পশুপক্ষীকে শিকার করা শিক্ষা দিয়েছ; তারা যা শিকার করে আনে তা তোমরা খাও এবং ওগুলোকে শিকারের জন্য পাঠাবার সময় আল্লাহর নাম স্বরণ কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিচয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

۴- يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا أَحِلَّ لَهُمْ  
وَوَوَّ وَوَّ لَكُمُ الطِّبْتُ وَمَا  
عَلِمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكْلِبِينَ  
تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلِمْتُمُ اللَّهُ  
فَكُلُوا مِمَّا امْسَكْنَ عَلَيْكُمْ  
وَإِذْ كَرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী আয়াতে শরীর বা দ্বীন অথবা উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর ও অপবিত্র বস্তুগুলোকে হারাম করেছেন। তবে প্রয়োজনবোধে আবার ঐগুলোকে হালাল করেছেন। যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেছেনঃ “আল্লাহ তোমাদের জন্যে বিশদভাবে হারাম বস্তুগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। তবে যদি তোমরা অনন্যোপায় হয়ে পড় তবে ঐগুলো খাওয়া তোমাদের জন্যে হালাল।” এরপর মহান আল্লাহ কোনুন্কোনুন্ব বস্তু হালাল সে সম্পর্কে এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন। যেমন সূরা আ’রাফে আল্লাহ তা’আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গুণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) পবিত্র বস্তুগুলোকে তাঁর উশ্মতের জন্যে হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তুগুলো তাদের জন্যে হারাম করেছেন। ইবনে আবি হাতিম তাঁর সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, একদা তাই গোত্রের আলী ইবনে হাতিম নামক একজন লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ মৃতজস্তুকে হারাম করেছেন। এখন আমাদের জন্যে কোন বস্তুগুলো হালাল?” তখন এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়। সাইদ বলেন যে, যবেহকৃত জন্মকেই তাইয়েব বলা হয়। একদা ইমাম যুহরীকে “ওমুধ হিসেবে প্রস্তাব পান করা জায়েয কি না”-এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। উভরে তিনি বলেছিলেনঃ “ওটা পবিত্র নয়?” ইবনে আবি হাতিম এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে ওয়াহহাব বলেন যে, মানুষ যে সমস্ত পশু খায় না সেগুলো বেচা-কেনা করা জায়েয কি না সে সম্পর্কে একদা ইমাম মালিক (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেন যে, গুণের বিক্রয়লক্ষ অর্থ পবিত্র বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়।

كُوكُر، চিতাবাঘ, বাজপাখী প্রভৃতি শিকারী  
 জানোয়ার তোমাদের জন্যে যা শিকার করে আনে সেটাও তোমাদের জন্যে  
 হালাল। অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঙ্গ এবং ইমামের এটাই অভিমত। আলী  
 ইবনে আবি তালহা ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায বলেছেন  
 যে, শিকারী পশু বলতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর, বাজপাখী এবং অন্যান্য পশুকে  
 বুঝানো হয়। এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও  
 বলেন যে, খায়সামা, তাউস, মুজাহিদ, মাকহল এবং ইয়াহহায়া ইবনে কাসীর  
 হতেও এ ধরনের বর্ণনা এসেছে। হাসান হতে বর্ণিত আছে যে, বাজ ও ‘সাকার’  
 পাখী দুটিও গুরাহুঁ-এর অন্তর্ভুক্ত। আলী ইবনে হুসাইন হতেও এ ধরনের  
 বর্ণনা পাওয়া যায়। মুজাহিদের মতে যে কোন ধরনের পাখীর শিকার খাওয়া  
 মাকরুহ। তাঁর এ মতের স্বপক্ষে তিনি - এ আয়াতটি

উল্লেখ করেন। সাঁদ ইবনে যুবাইর হতেও এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনে জারীর এ মতটি যথোক এবং সুন্দী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীর তাঁর সনদের মাধ্যমে ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, বাজ এবং অন্যান্য শিকারী পাখীর শিকার যদি জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায় তবে তা যবেহ করে খাওয়া হালাল, অন্যথায় তা হালাল নয়। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেনঃ অধিকাংশ আলেমের মতে শিকারী পাখীর শিকার শিকারী কুকুরের শিকারের ন্যায় খাওয়া হালাল। কারণ, শিকারী কুকুর যেমন শিকারকে থাবা দ্বারা যখম করে, অনুরূপভাবে পাখীও শিকারকে থাবা দ্বারা যখম করে। সুতরাং পাখী এবং কুকুরের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। এটাই ইমাম চতুষ্টয় এবং অন্যান্যদের অভিমত। ইবনে জারীরও এ মতকেই সমর্থন করেন। তাঁরা এ মতের স্বপক্ষে আদী ইবনে হাতিমের হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন। আদী ইবনে হাতিম বলেনঃ আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বাজ পাখীর শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেনঃ “যদি সে তোমার জন্যে শিকার করে নিয়ে আসে তবে তুমি তা খেতে পার।” ইমাম আহমাদ ইবনে হাবল (রঃ)-এর মতে কাল কুকুর দ্বারা শিকার করা জায়েয় নয়। তিনি প্রমাণ হিসেবে সহীহ মুসলিম শরীফে হ্যরত আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তিনটি জিনিস নামায ভঙ্গ করে থাকে। গাধা, স্ত্রীলোক ও কালো কুকুর।” বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ লাল কুকুর হতে কালো কুকুরকে পার্থক্য করার কারণ কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ “কালো।” অন্য আর একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা সকল প্রকার কুকুরকে হত্যা করার জন্যে আদেশ দেন। পরে তিনি আবার বলেনঃ “সকল প্রকার কুকুরকে হত্যা করার প্রয়োজন নেই। শুধু কালো কুকুরগুলোকে তোমরা হত্যা কর।” **جَرْحٌ شَدْقٌ جَوَارِحٌ** ধাতু হতে উত্তৃত। **جَرْحٌ**-এর অর্থ হলো অর্জন করা। যেহেতু শিকারী জন্তুগুলোকে **جَوَارِحٌ** বলা হয়ে থাকে। আর আরবের অধিবাসীরা এ কথাটি ঐ সময় বলে যে সময় কোন ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের জন্যে ভাল কিছু অর্জন করে নিয়ে আসে। ঠিক এমনিভাবে তারা বলে থাকে “**فُلَانْ لَا جَارَحَ**” অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির কোন অর্জনকারী নেই। পবিত্র কুরআনেও **جَرْحٌ شَدْقٌ** অর্জন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ **وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ**” অর্থাৎ “তোমরা

দিবাভাগে ভাল বা মন্দ যাই কর, আল্লাহ তা সম্যক অবগত আছেন।”(৬৪: ৬০) এ আয়াতের শানে ন্যূন প্রসঙ্গে ইবনে আবি হাতিম বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

আবু রাফে’ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা সকল প্রকার কুকুরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। তখন বহু কুকুরকে হত্যা করা হলো। ফলে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি যেগুলোকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো দ্বারা আমাদের কি ধরনের উপকার বৈধ?” তিনি তাঁদের এ প্রশ্নের উত্তরে চুপ থাকলেন। তখন পবিত্র কুরআনের *بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*-এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়। এ আয়াত অবর্তীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “যখন কোন লোক তার কুকুরকে শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠায় এবং পাঠাবার সময় আল্লাহর নাম উল্লেখ করে, এমতাবস্থায় যদি কুকুর শিকার করে মালিকের জন্যে রেখে দেয় এবং তা না খায় তবে উক্ত শিকার খাওয়া যাবে।” ইবনে জারীর তাঁর সনদের মাধ্যমে আবু রাফে’ হতে বর্ণনা করেন যে, একদা হ্যরত জিবরাইস্ল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি ভেতরে আসলেন না তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ “হে আল্লাহর দৃত! আমাদের অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও কেন আপনি ভেতরে প্রবেশ করছেন না?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “যেই ঘরে কুকুর থাকে সেই ঘরে আমরা প্রবেশ করি না।” এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আবু রাফে’ (রাঃ)-কে মদীনার সকল প্রকার কুকুর হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। হ্যরত আবু রাফে’ বলেনঃ “আমি তখন সকল প্রকার কুকুরকে হত্যা করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমি এক বৃদ্ধা মহিলার একটি কুকুরকে হত্যা করতে উদ্যত হলাম। কুকুরটি তখন মহিলাটির নিকট গিয়ে ঘেউ ঘেউ করে আশ্রয় প্রার্থনা করলো। এ দেখে আমার অন্তরে দয়ার উদ্বেক হলো। আমি তখন কুকুরটিকে হত্যা করা হতে বিরত থাকলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটে এসে ব্যাপারটি বললাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে পুনরায় কুকুরটিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। সুতরাং আমি ওকে হত্যা করি। সাহাবায়ে কিরাম তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি যে জন্মগুলোকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, ওগুলো দ্বারা আমরা কোন উপকার লাভ করতে পারি কি?” ঐ সময় আল্লাহ তা ‘আলা উক্ত আয়াতটি অবর্তীর্ণ করেন। হাকিম এ হাদীসটিকে তাঁর *মস্তدر* গঠন করেন।

দিয়েছেন এবং হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, এটি একটি সহীহ হাদীস। কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম এ হাদীসটিকে তাঁদের গ্রন্থে স্থান দেননি।

ইবনে জারীর ইকরামা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবু রাফে' (রাঃ)-কে কুকুর হত্যা করার জন্যে প্রেরণ করেন। তিনি তখন কুকুর হত্যা করতে করতে মদীনার উচ্চ এলাকায় উপস্থিত হন। সে সময় আসিল ইবনে আদী (রাঃ), সাদ ইবনে খুসাইমা (রাঃ) এবং ওয়াইম ইবনে সায়েদা (রাঃ) নামক সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে বলেনঃ “আমরা এ জন্মগুলো হতে কি ধরনের উপকার প্রহণ করতে পারিম?” তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হাকিমও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরজীও এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, কুকুর হত্যা প্রসঙ্গে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

”**إِنَّمَا عَلِمْتُمْ حَالَهُمْ إِذْ أَرَيْتُمْهُمْ**“  
এর পূর্বে এটা বাক্যের কর্তার অবস্থা বর্ণনা করে। এটা **جَوَارِحٍ**-এরও **حَالٍ** হতে পারে। এ অবস্থায় এটা বাক্যের কর্মের অবস্থা বর্ণনা করে। আর্থাৎ যে সমস্ত শিকারী পশুকে তোমরা শিকার করা শিক্ষা দিয়েছ, আর তারা তাদের থাবা এবং নথ দ্বারা শিকার করে, তাদের শিকার তোমরা খেতে পারবে। সুতরাং এ হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শিকারী জন্ম যদি তার আঘাতের দ্বারা শিকারকে হত্যা করে তবে তা খাওয়া জায়েয হবে না। এটা ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ)-এর দু'টি উক্তির একটি। একদল আলেমও এ অভিমত পোষণ করেন।

”**أَرَدْتُ لِعِلْمِهِنَّ مِمَّا عَلِمْتُكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ**“  
অর্থাৎ জন্ম তখনই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবে যখন তার মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি গুণ পাওয়া যাবে। (ক) যখন তাকে শিকারের জন্যে পাঠানো হয় তখন সে ছুটে যায়, (খ) যখন তাকে ডাকা হয় তখন সাথে সাথে ফিরে আসে এবং (গ) শিকার করার পর ওটা সে নিজে ভক্ষণ না করে তার মালিকের জন্যে রেখে দেয়। আর আল্লাহ এজন্যেই বলেনঃ “শিকারী জন্মগুলো তোমাদের জন্যে যা রেখে দেয় তা তোমরা খাও এবং শিকারী পশুগুলোকে শিকারের জন্যে পাঠাবার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর।” অর্থাৎ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্মকে শিকারের জন্যে পাঠাবার সময় যদি আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় তবে ওর শিকার খাওয়া হালাল, যদিও সে শিকার করার পর ওকে হত্যা করে ফেলে। এ ব্যাপারে সকল আলেমই একমত। এ আয়াত শিকার সম্পর্কে যে

নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে, হাদীসেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু ইবনে হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে হাতিম, (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকারের জন্যে পাঠাই এবং ঐ সময় আল্লাহর নাম স্বরণ করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ “তোমার কুকুর যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং ওকে শিকারের জন্যে পাঠাবার সময় যদি তুমি আল্লাহর নাম নিয়ে থাক তবে ওটা তোমার জন্যে যা শিকার করে আনবে তা তুমি খেতে পার, যদিও কুকুর ওকে মেরেও ফেলে। তবে হ্যাঁ, এটা অবশ্যই জরুরী যে, ওটা শিকারের সময় অন্য কুকুর যেন ওর সাথে মিলিত না হয়। কেননা, তুমি তোমার কুকুরটিকে আল্লাহর নাম নিয়ে ছেড়েছো বটে, কিন্তু অন্য কুকুরটিকে তো বিস্মিল্লাহ বলে ছাড়া হয়নি।”

আমি বললাম, আমি ধারাল খড়ি দ্বারা শিকার করে থাকি। তিনি বললেনঃ “যদি ওটা তীক্ষ্ণ প্রাপ্ত দিয়ে আহত করে তবে তুমি খেতে পার। কিন্তু যদি তোতা দিক দিয়ে আহত করে তবে খেয়ো না। কেননা, ওকে ঝাপটা দিয়ে মারা হয়েছে।” অন্য বর্ণনায় নিম্নরূপ শব্দ রয়েছে—যখন তুমি তোমার কুকুরটিকে ছেড়ে দেবে তখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। অতঃপর যদি ওটা শিকারকে ধরে রাখে এবং তোমার নিকট পৌছার সময় ঐ শিকার জীবিত থাকে তবে ওকে যবেহ করবে। আর যদি কুকুরটাই ওকে মেরে ফেলে এবং তার থেকে কিছুই ভক্ষণ না করে তবে ওটাও তুমি খেতে পার। কেননা, কুকুরের ওটাকে শিকার করাই হচ্ছে ওকে যবেহ করা। আর এক বর্ণনায় নিম্নরূপ শব্দগুলোও রয়েছে— যদি ওটা ওকে ভক্ষণ করে তাহলে তুমি ওটা খেয়ো না। কেননা, আমার আশংকা হচ্ছে যে, কুকুরটি শিকারটিকে নিজের জন্যেই তো ধরে রাখেনি! এটাই জমহুরের দলীল। আর প্রকৃতপক্ষে ইমাম শাফিঙ্গ (রঃ)-এর সহীহ মাযহাবও এটাই যে, কুকুর যখন শিকারকে খেয়ে নেবে তখন ওটা সাধারণভাবেই হারাম হয়ে যাবে। এতে কোন ব্যাখ্যা নেই, যেমন হাদীসে রয়েছে। হ্যাঁ, তবে পূর্ববর্তী গুরুজনদের একটি দলের উক্তিও এটাই যে, ওটা সাধারণভাবেই হালাল। তাঁদের দলীল হচ্ছে নিম্নরূপঃ হ্যরত সালমান ফারসী (রাঃ) বলেনঃ তুমি (ঐ শিকার) খেতে পার, যদিও কুকুরটি ওর এক তৃতীয়াংশ খেয়ে ফেলে। হ্যরত সাঈদ ইবনে আবি আকাস (রাঃ) বলেনঃ কুকুর যদি দুই তৃতীয়াংশও খেয়ে ফেলে তবুও তুমি ওটা খেতে পার। হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর এটাই নির্দেশ। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ “যখন তুমি বিস্মিল্লাহ বলে তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরটিকে শিকারের জন্যে ছেড়ে

দেবে তখন ওটা যে জন্মতিকে তোমার জন্যে ধরে রাখবে, তুমি ওটা থাবে, কুকুরটি ওটা থেকে কিছু খেয়ে থাকুক বা না থাকুক।” হ্যরত আলী (রাঃ) এবং হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। হ্যরত আত’ (রঃ) এবং হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) হতে এ ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। যুহরী (রঃ) রাবীআ’হ (রঃ)-এবং মালিক (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফিন্দ (রঃ) স্বীয় প্রথম উক্তিতে এ দিকেই গেছেন এবং নতুন উক্তিতেও এই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। হ্যরত সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত ইবনে জারীর (রঃ)-এর একটি মারফু’ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন কোন লোক শিকারের উদ্দেশ্যে স্বীয় কুকুরটিকে প্রেরণ করে, অতঃপর শিকারকে এমন অবস্থায় পায় যে, কুকুরটি ওকে খেয়ে ফেলেছে তখন যা অবশিষ্ট রয়েছে সে তা খেতে পারে।” এ হাদীসের সনদে ইবনে জারীর (রঃ)-এর উক্তি অনুসারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে এবং বর্ণনাকারী সাঈদ (রঃ)-এর হ্যরত সালমান ফারসী (রাঃ) হতে শ্রবণ জানা যায়নি। আর বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী ওকে ‘মারফু’ করেন না, বরং হ্যরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর উক্তি নকল করেন মাত্র। এ উক্তিটি সঠিক বটে, কিন্তু এ অর্থেরই অন্যান্য মারফু’ হাদীসও বর্ণিত আছে। সুনানে আবি দাউদে হ্যরত আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, আবু সা’লাবা (রাঃ) নামক একজন গ্রাম্য লোক রাসূলল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার নিকট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর রয়েছে। ওর শিকার সম্পর্কে ফতওয়া কি? রাসূলল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ ‘ওটা যে জন্ম তোমার জন্যে ধরে আনে তা তোমার জন্যে হালাল।’ তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ যবেহ করতে পারি বা না পারি, সর্বাবস্থাতেই কি (হালাল)? এবং কুকুরটি তা খেয়ে থাকে তবুও কি (হালাল)? তিনি জবাবে বললেনঃ ‘হ্যাঁ, যদি খেয়ে থাকে তবুও (হালাল)।’ তিনি আবার একটি প্রশ্ন করলেনঃ আমি আমার তীর ও কামান দ্বারা শিকার করবো, এ ব্যাপারে ফতওয়া কি? তিনি জবাব দিলেনঃ “এমনকি যদি তুমি দেখতেও না পাও এবং অনুসন্ধানের পর পাওয়া যায় তবুও, যদি না তাতে অন্য কারও তীরের চিহ্ন থাকে।” তিনি তৃতীয় প্রশ্ন করলেনঃ প্রয়োজনবোধে অগ্নিপূজকদের বরতন ব্যবহার করা আমাদের জন্যে কিরূপ? তিনি উত্তরে বললেনঃ “তুমি ওটা ধূয়ে নাও। অতঃপর তুমি তাতে খেতে ও পান করতে পার।” হাদীসটি সুনানে নাসাঈর মধ্যে রয়েছে। সুনানে আবি দাউদের দ্বিতীয় হাদীসে রয়েছেঃ “যখন তুমি স্বীয় কুকুরকে আল্লাহর নাম নিয়ে পাঠাও তখন তুমি ওর শিকারকে খেতে পার, যদিও কুকুর তা থেকে কিছু খেয়েও নেয়। আর তোমার হাত যে শিকারকে

তোমার জন্যে নিয়ে আসে ওটা ও তুমি খেতে পার।” এ দু’টি হাদীসের সনদ খুবই মজবুত ও উত্তম। অন্য হাদীসে আছে—তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর যে শিকার তোমার জন্যে ধরে আনে, তুমি ওটা খেয়ে নাও। হ্যরত আদী (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ যদি কুকুর তা থেকে কিছু খেয়ে নেয় তবুও কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ “হ্যাঁ, তবুও।” এসব আছার ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, শিকারী কুকুর শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেললেও বাকী অংশ কুকুরের প্রভু খেতে পারে। এসব হচ্ছে এসব লোকের দলীল, যাঁরা কুকুর ইত্যাদির ভক্ষণকৃত শিকারকে হারাম বলেন না। এ দু’টি দলের (যাঁরা সরাসরি হারাম বলেন বা হালাল বলেন) মাঝামাঝি আর একটি দল রয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, যদি কুকুর শিকার ধরার পর পরই তা খেয়ে ফেলে তবে বাকী অংশ হারাম। কিন্তু যদি শিকার ধরার পর স্বীয় প্রভুর জন্যে অপেক্ষা করে এবং দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরও প্রভুকে না পায়, তারপর ক্ষুধার তাড়নায় তা খেয়ে ফেলে তবে অবশিষ্ট অংশ হালাল। প্রথম কথাটির উপর প্রযোজ্য হয় হ্যরত আদী (রাঃ) সম্বলিত হাদীস। দ্বিতীয় কথাটির উপর প্রযোজ্য হ্যরত আবু সালাবা (রাঃ) সম্বলিত হাদীস। এ দু’টি মতভেদ অতি উত্তম এবং এর দ্বারা দু’টি বিশুদ্ধ হাদীস একত্রিত হচ্ছে। উত্তাদ আবুল মায়ালী জুয়াইনী (রাঃ) স্বীয় গ্রন্থ ‘নিহায়া’র মধ্যে এ আশা করেছেন যে, যদি কেউ এর মধ্যে এ ব্যাখ্যা করে নেয়। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা যে, জনগণই এর ব্যাখ্যা করে নিয়েছে। এ মাসআলায় চতুর্থাংশের মত এই যে, কুকুরের ভক্ষিত শিকার হারাম, যেমন নাকি হ্যরত আদী (রাঃ)-এর হাদীসে রয়েছে। আর বাজ পাখীর ভক্ষিত শিকার হারাম নয়, কেননা সে তো খাবারের মাধ্যমেই শিক্ষা অর্জন করে থাকে। হ্যরত ইবনে আকবাস (রাঃ) বলেন যে, যদি পাখী স্বীয় মনিবের কাছে ফিরে আসে এবং শিকারকে হত্যা না করে, অতঃপর সে যদি পাখায় খামচা দেয় অথবা গোস্ত খায় তবে তুমি তা খেয়ে নাও। ইবরাহীম নাখটি, শা’বী ও হাম্মাদ ইবনে সুলাইমানও এ কথা বলেন। তাঁদের দলীল হ্যরত ইবনে আবু হাতিমের বর্ণনা করা এ হাদীস যে, হ্যরত আদী (রাঃ) রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আমরা কুকুর এবং বাজের দ্বারা শিকার করে থাকি। এটা কি আমাদের জন্যে হালাল? তিনি (সঃ) বলেনঃ “যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী জন্ম তোমাদের জন্যে শিকারকে ধরে রাখে এবং তোমরা ওকে পাঠাবার সময় আল্লাহর নাম করে থাক, তোমরা ঐ শিকার খেয়ে নাও।” তিনি পুনরায় বললেনঃ “তুমি যে কুকুরকে আল্লাহর নাম নিয়ে ছেড়েছো, সে যে জন্মকে ধরে রাখবে, তুমি তা খাও।” (আদী রাঃ বলেনঃ) আমি বললামঃ সে যদি ওকে মেরে ফেলে তবুও কি? তিনি উত্তর

দিলেনঃ “মেরে ফেলে তবুও । তবে শর্ত এই যে, যেন খেয়ে না থাকে ।” আমি আবার জিজ্ঞেস করলামঃ যদি ঐ কুকুরের সঙ্গে অন্য কুকুরও মিলিত হয়ে যায় তাহলে? তিনি জবাবে বললেনঃ “তাহলে তা তুমি খেয়ো না যে পর্যন্ত না তোমার মনে বিশ্বাস জন্মে যে, তোমার কুকুরই ওকে শিকার করেছে ।” আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলামঃ মানুষ তীর দ্বারা শিকার করে থাকে । ওর মধ্যে কোনটা হালাল? তিনি উত্তর দিলেনঃ “যে তীর আহত করে এবং তুমি ওটা ছাড়বার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে থাকো, ঐ শিকার তুমি খেতে পার ।” প্রকাশ থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুকুরের বেলায় না খাওয়ার শর্ত আরোপ করলেন, কিন্তু বাজ পাখীর বেলায় সেই শর্ত আরোপ করলেন না । সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য সাব্যস্ত হয়ে গেল । আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন ।

আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ তোমাদের জন্তুগুলো যে হালাল জন্তুগুলো শিকার করে আনে তা তোমরা খাও এবং ঐ শিকারী জন্তুগুলোকে ছাড়বার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর । যেমন হ্যরত আদী (রাঃ) ও হ্যরত সা'লাবা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে । এজন্যেই ইমাম আহমাদ (রঃ) প্রমুখ ইমামগণ এ শর্ত গুরুত্বের সাথে আরোপ করেছেন যে, শিকারের জন্মে শিকারী জন্তুকে ছাড়বার সময় এবং তীর ছাড়বার সময় বিস্মিল্লাহ অবশ্যই উচ্চারণ করতে হবে । জমহূরের প্রসিদ্ধ মাযহাব এটাই যে, এ আয়াত ও হাদীসের ভাবার্থ হচ্ছে শিকারী জন্তুকে শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠাবার সময় অল্লাহর নাম নেয়া । হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেনঃ “শিকারী জন্তুকে শিকারের জন্মে প্রেরণের সময় বিস্মিল্লাহ পড়ে নাও । তবে ভুলে গেলে কোন দোষ নেই ।” কেউ কেউ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে খাওয়ার সময় বিস্মিল্লাহ বলা । যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) উমার ইবনে আবু সালমা (রাঃ)-এর পালিতা মেয়েকে বলেছিলেনঃ ‘আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর, ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনের দিক থেকে খাও ।’ সহীহ বুখারীতে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এমন লোকেরা আমাদের নিকট গোশ্ত নিয়ে আসে যারা নওমুসলিম, তারা (জন্তু যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কি করে না তা আমাদের জানা নেই । আমরা সেই গোশ্ত খেতে পারি কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ ‘তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তা খেয়ে নাও ।’ মুসনাদে আহমাদে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা ছয়জন সাহাবীর সাথে খানা খাচ্ছিলেন । এমন সময় একজন বেদুঈন এসে তা হতে দু'গ্রাস খেয়ে নেয় । তখন নবী (সঃ) বললেনঃ

‘যদি লোকটি বিস্মিল্লাহ বলতো তবে এ খাদ্য তোমাদের সকলের জন্যেই যথেষ্ট হতো। তোমাদের কেউ যখন খানা খেতে বসবে তখন সে যেন বিস্মিল্লাহ বলে নেয়। যদি প্রথমে (বিস্মিল্লাহ বলতে) ভুলে যায়। তবে যখন শুরণ হবে তখন যেন বলে **بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ** আল্লাহর নামে শুরু করছি এর প্রথমের জন্য ও শেষের জন্য।’” এ হাদীসটিই মুনকাতা সনদে সুনানে ইবনে মাজার মধ্যেও রয়েছে। অন্য সনদে এ হাদীসটি সুনানে আবি দাউদ, জামেউত তিরিমিয়ী, সুনানে নাসাই এবং মুসনাদে আহমাদের মধ্যে রয়েছে। ইমাম তিরিমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। জাবির ইবনে সাবীহ (রঃ) বলেনঃ ‘আমি (একবার) হ্যরত মুসনা ইবনে আবদুর রহমান খুয়াঙ্গের সাথে (ওয়াসিত নামক জায়গা)-এর সফরে বের হই। তাঁর অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি খাদ্য খাওয়ার শুরুতে বিস্মিল্লাহ বলতেন এবং শেষ গ্রাসের সময় **بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ** বলতেন। তিনি আমাকে বললেন যে, খালিদ ইবনে উমাইয়া ইবনে মাখশা (রাঃ) নামক সাহাবী বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি আহারের সময় বিস্মিল্লাহ বলে না তার সাথে শয়তান খেতে থাকে। অতঃপর যখন সে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তখন তার (শয়তানের) বমি হয়ে যায় এবং যতটা সে খেয়েছে তার সবই বেরিয়ে পড়ে।” (মুসনাদ আহমাদ ইত্যাদি) ইবনে মুঈন (রঃ) এবং নাসাই (রঃ) এ হাদীসের বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য বলেন বটে, কিন্তু আবু ফাতহ ইয়দী (রঃ) বলেন যে, এ বর্ণনাকারীর হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। হ্যরত হুয়াইফা (রাঃ) বলেনঃ আমরা যখন নবী (সঃ)-এর সাথে আহারে বসতাম তখন খাদ্য তাঁর হাত দেয়ার পূর্বে আমরা হাত দিতাম না। (একদা) আমরা তাঁর সাথে আহার করছিলাম, এমন সময় একটি মেয়ে পড়তে পড়তে আসলো, কেউ যেন তাকে ধাক্কা দিচ্ছিল। এসেই সে ঘুর্খে গ্রাস উঠিয়ে দিতে চাইলো কিন্তু নবী (সঃ) তার হাত ধরে নিলেন। এরপর এভাবেই একজন বেদুঈন আসলো এবং এসেই পাত্রে হাত দিতে গেল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তারও হাতটি ধরে ফেললেন এবং বললেনঃ ‘যখন কোন খাদ্যের উপর বিস্মিল্লাহ বলা হয় না তখন শয়তান ঐ খাদ্যকে নিজের জন্যে হালাল করে নেয়। সে আমাদের সাথে খাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমে এ মেয়েটির সাথে এসেছে, এমতাবস্থায় আমি তার হাত ধরে ফেলেছি। তারপর সে এ বেদুঈনের সাথে এসেছে। আমি তার হাতও ধরে ফেলেছি। যার হাতে আমর প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এ দু'জনের হাতের সাথে শয়তানের হাতও আমার হাতের মধ্যে রয়েছে।’”<sup>১</sup>

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবি দাউদ ও সুনানে নাসাইতে রয়েছে।

সহীহ মুসলিম, সুনানে আবি দাউদ, সুনানে নাসাই ও সুনানে ইবনে মাজার মধ্যে হয়রত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ মানুষ যখন বাড়ীতে প্রবেশের সময় ও খাদ্য খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তখন শয়তান (তার অধীনস্থদেরকে) বলে—“তোমাদের জন্যে না আছে রাত্রি কাটানোর জায়গা এবং না আছে রাত্রির আহারের ব্যবস্থা।” আর যখন বাড়ীতে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না তখন শয়তান বলে—“তোমরা রাত্রি কাটানোর এবং রাত্রির আহারের জায়গা পেয়ে গেছো।” মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবি দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজার মধ্যে রয়েছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হায়ির হয়ে অভিযোগের সুরে বললোঃ আমরা খাদ্য খাই কিন্তু পরিত্পু হই না, (এর কারণ কি)। তিনি উত্তরে বললেনঃ “সম্ভবতঃ তোমরা পৃথক পৃথকভাবে খানা খেয়ে থাক। তোমরা সবাই মিলিতভাবে খানা খাও এবং বিসমিল্লাহ বল। এতে আল্লাহ তোমাদের জন্যে (খাদ্যে) বরকত দান করবেন।”

৫। আজ তোমাদের জন্যে পবিত্র

বস্তুগুলো হালাল রাখা হয়েছে,

আর আহলে কিতাবের

যবেহকৃত জীবও তোমাদের

জন্যে হালাল এবং তোমাদের

যবেহকৃত জীবও তাদের

জন্যে হালাল। আর সতী

সাধ্বী মুসলিম নারীরাও এবং

তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে

কিতাবের মধ্যকার সতী সাধ্বী

নারীরাও (তোমরা জন্যে

হালাল), যখন তোমরা

তাদেরকে তাদের বিনিময়

(মহর) প্রদান কর, এরূপে যে,

তোমাদের (তাদেরকে)

পঞ্জীরূপে গ্রহণ করে নাও, না

প্রকাশে ব্যভিচার কর, আর

٥- الْيَوْمَ أَحِلُّ لَكُمُ الطَّيْبَاتِ

وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتَوا الْكِتَابَ

جِلْ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جِلْ لَهُمْ

وَالْمَحْصُنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ

وَالْمَحْصُنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أَوْتَوا

الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا اتَّيْتُمُ

وَسَوْدَانَ وَسَوْدَانَ هُنْ أَجْوَرُ هُنْ مَحْصُنَينَ غَيْرَ

مُسْفِحِينَ وَلَا مَتْخَذِي أَخْدَانٍ

وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ

না গোপন প্রণয় কর; আর যে  
ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী  
করবে তার আমল নিষ্ফল হয়ে  
যাবে এবং সে পরকালে  
সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

عَمْلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ  
الْخَسِيرِينَ

হালাল ও হারামের বর্ণনা দেয়ার পর এটাকে পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করার  
জন্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, সমুদয় পবিত্র বস্তু হালাল। তারপর তিনি  
ইয়াহুদ ও নাসারাদের যবেহকৃত জীবগুলোর বৈধতার বর্ণনা দিলেন। হ্যরত  
ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবু উমামাহ (রাঃ), মুজাহিদ (রাঃ), সান্দ ইবনে  
যুবাইর (রাঃ), ইকরামা (রাঃ), আতা' (রাঃ), হাসান বসরী (রাঃ), মাকহুল (রাঃ),  
ইবরাহীম নাখঙ্গ (রাঃ), সুনী (রাঃ), মুকাতিল (রাঃ) এবং ইবনে হাইয়ানও (রাঃ)  
একথাই বলেন যে, এখানে এর ভাবার্থ হচ্ছে তাদের স্বহস্তে যবেহকৃত  
জানোয়ার। এটা খাওয়া মুসলমানদের জন্যে হালাল। কেননা, তারাও  
গায়রূপ্তাহর নামে যবেহ করাকে নাজায়েয মনে করে এবং যবেহ করার সময়  
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেয় না। যদিও আল্লাহ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস  
সম্পূর্ণরূপে অমূলক, যা থেকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা পবিত্র ও বহু  
উর্ধ্বে। সহীহ হাদীসে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত  
আছে, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে আমি চর্বি ভর্তি একটি মশক প্রাপ্ত হই।  
আমি ওটাকে নিজের অধিকারে নিয়ে নিই এবং বলি, আজ আমি কাউকেও এর  
অংশ দেবো না। তারপর এদিক ওদিক দৃষ্টি নিষ্কেপ করি। হঠাৎ দেখি যে,  
রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং মুচকি হাসছেন। এ  
হাদীসটি দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা হয়েছে সে, গন্নীমতের মধ্য হতে  
পানাহারের কোন প্রয়োজনীয় জিনিস বন্টনের পূর্বেও নিয়ে নেয়া জায়েয। এ  
দলীল এ হাদীসের দ্বারা পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মায়হাবের  
ফকীহগণ মালেকীদের সামনে এ সনদ পেশ করে বলেছেনঃ তোমরা যে বলে  
থাক, আহলে কিতাবের নিকট যে খাদ্য হালাল সেই খাদ্য আমাদের নিকটও  
হালাল- এটা ভুল। দেখো, ইয়াহুদীরা চর্বিকে তাদের জন্যে হারাম মনে করে  
থাকে, অথচ মুসলমান ওটা গ্রহণ করছে। কিন্তু তাদের এ কথা বলা ঠিক  
নয়। কেননা, ওটা ছিল একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাছাড়া এটাও হতে পারে  
যে, ওটা ছিল এমন চর্বি যা ইয়াহুদীরাও তাদের জন্যে হালাল মনে করে থাকে।  
অর্থাৎ পিঠের চর্বি, নাড়ি সংলগ্ন চর্বি এবং হাড়ের সাথে লেগে থাকা চর্বি। এর

চেয়ে আরও বেশী প্রমাণযুক্ত ঐ দলীলটি যাতে রয়েছে যে, খায়বারবাসী সদ্য ভাজা একটি ছাগী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে উপচোকন দিয়েছিল যার একটি কাঁধে তারা বিষ মিশ্রিত করেছিল। কেননা, তাদের জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাঁদের গোশ্ত পছন্দ করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ গোশ্ত মুখে দিয়ে দাঁত দ্বারা কাটা মাত্রই আল্লাহর নির্দেশক্রমে ঐ কাঁধ বলে উঠলোঃ “আমাতে বিষ মিশ্রিত রয়েছে।” তিনি তৎক্ষণাত্মে ওটা থুথু করে ফেলে দিলেন। ওর ক্রিয়া তাঁর সামনের দাঁতে রয়েও গেল। আহারে তাঁর সাথে হ্যরত বাসার ইবনে মারুরও (রাঃ) ছিলেন। ঐ বিষক্রিয়াতেই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হলেন। এর প্রতিশোধ হিসেবে বিষ মিশ্রিতকারিণী মহিলাটিকেও হত্যা করা হলো, যার নাম ছিল যয়নব। এটা প্রমাণরূপে স্বীকৃত হওয়ার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং সঙ্গীগণসহ ঐ গোশ্ত ভক্ষণের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন এবং তারা যে চর্বিকে হারাম মনে করতো তা তারা বের করে ফেলেছে কি-না সেটাও তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন না। অন্য একটি হাদীসে আছে যে, একজন ইয়াতুনী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দাওয়াত দেয় এবং তাঁর সামনে যবের রুটি এবং পুরাতন শুষ্ক চর্বি হাধির করে। হ্যরত মাকতুল (রঃ) বলেন যে, যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া না হবে ওটা খাওয়া হারাম করার পর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমানদের উপর দয়া পরবশ হয়ে তা মানসূখ বা রহিত করতঃ আহলে কিতাবের যবেহকৃত জন্তু তাদের জন্যে হালাল করে দেন। এটা শ্মরণ রাখা দরকার যে, আহলে কিতাবের যবেহকৃত জন্তু তাদের জন্যে হালাল করার দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয় না যে, যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হবে না সেটাও হালাল হবে। কেননা, তাদের মধ্যে মুশরিকও ছিল, যারা যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নিতো না, এমনকি তাদের গোশ্ত ভক্ষণ যবেহের উপরই নির্ভরশীল ছিল না। বরং তারা মৃত জন্তুরও গোশ্ত ভক্ষণ করতো। কিন্তু আহলে কিতাব এদের বিপরীত এবং এদের মত আরও কয়েকটি সম্প্রদায় রয়েছে। যেমন সামেরাহ, সায়েবাহ এবং ইবরাহীম (আঃ) ও শীষ (আঃ) প্রমুখ গয়গম্বরদের ধর্মের দাবীদার। যেমন আলেমদের দু'টি উক্তির মধ্যে একটি উক্তি রয়েছে। আর আরবের খ্রীষ্টান যেমন বানূ তাগলিব, তানূখ, বাহ্ৰা, জুয়াম, লাখম, আমেলা এবং তাদের ন্যায় আরও। জমহুরের মতে এদের হাতে যবেহকৃত জানোয়ারের গোশ্ত খাওয়া চলবে না। হ্যরত আলী (রাঃ) বলেনঃ “তোমরা বানূ তাগলিবের হাতে যবেহকৃত জানোয়ারের গোশ্ত ভক্ষণ করো না। কেননা, তারা তো শুধুমাত্র মদ্যপান ছাড়া খ্রীষ্টানদের নিকট হতে আর কিছুই গ্রহণ করেনি।”

তবে সাইদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ)-এর মতে বানু তাগলিবের শ্রীষ্টানদের হাতে যবেহকৃত জন্মুর গোশ্ত ভক্ষণে কোন দোষ নেই। এখন বাকি থাকলো মাজুসীদের ব্যাপারটা, তাদেরকে শ্রীষ্টানদের সাথে মিলিয়ে দিয়ে তাদের অনুগামী করতঃ তাদের নিকট জিয়িয়া আদায় করা হলেও তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করা এবং তাদের যবেহকৃত জীবের গোশ্ত ভক্ষণ করা জায়েয় নয়। হ্যাঁ, তবে ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ)-এর সঙ্গী সাথীদের অনুসারী আবু সউর ইবরাহীম ইবনে খালিদ কালবী এর বিপরীত মত পোষণ করেন। যখন তিনি এ কথা বলেন এবং জনগণের মধ্যে এটা ছড়িয়ে পড়ে তখন ফকীহগণ এ কথার ভীষণভাবে প্রতিবাদ করেন। এমনকি ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ) তো একথাও বলে ফেলেন যে, এ মাসআলায় তিনি নিজের নামের মতই বটে অর্থাৎ বলদের পিতা। আবু সাউর একটি সাধারণ হাদীসকে সামনে রেখে একথা বলে দিয়েছেন যে, হাদীসে রয়েছেঃ “তোমরা মাজুসীদের সাথে আহলে কিতাবের ন্যায় ব্যবহার কর।” কিন্তু প্রথমতঃ এ বর্ণনা তো এ শব্দগুলো দ্বারা সাব্যস্তই নয়। দ্বিতীয়তঃ এ বর্ণনাটি ‘মুরসাল’। হ্যাঁ, তবে সহীহ বুখারীতে শুধু এটুকু তো অবশ্যই রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হিজরের মাজুসীদের নিকট থেকে জিয়িয়া গ্রহণ করেছিলেন। এসব ছাড়া আমরা বলি যে, আবু সাউরের পেশকৃত হাদীসকে যদি আমরা মেনেও নেই তথাপি আমরা বলতে পারি যে, এর ‘উমূম’ দ্বারাও এ আয়াতের মাফহূম-মুখালিফের দলীলের মাধ্যমে আহলে কিতাব ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের যবেহকৃত জন্মুর আমাদের জন্যে হারাম সাব্যস্ত হচ্ছে।

এরপর বলা হচ্ছে-তোমাদের (মুসলমানদের) যবেহকৃত জীব তাদের (আহলে কিতাবদের) জন্যে হালাল। অর্থাৎ হে মুসলমানরা! তোমরা আহলে কিতাবদেরকে তোমাদের যবেহকৃত জীবের গোশ্ত খাওয়াতে পার। এটা এ আমরের খবর নয় যে, তাদের ধর্মে তাদের জন্যে তোমাদের যবেহকৃত প্রাণী হালাল। হ্যাঁ, তবে খুব বেশী বলা গেলে এটুকুই বলা যেতে পারেঃ এটা এ কথারই খবর হবে- তাদেরকেও তাদের কিতাবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে জীবকে আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে তা তারা খেতে পারে। এ ব্যাপারে এটা সাধারণ কথা যে, যবেহকারী তাদের ধর্মের অনুসারীই হোক বা অন্য কেউ হোক। কিন্তু প্রথম উক্তিটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশী সুন্দর অর্থাৎ তোমাদের জন্যে অনুমতি রয়েছে যে, তোমরা আহলে কিতাবদেরকে তোমাদের যবেহকৃত জন্মুর গোশ্ত ভক্ষণ করাও, যেমন তোমরা তাদের যবেহকৃত জন্মুর

গোশ্ত খেতে পার। এটা যেন অদল বদলের হিসেবে বলা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলকে নিজের বিশেষ জামা দ্বারা কাফন পরিয়েছিলেন। কোন কোন গুরুজন যার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচা হ্যরত আববাস (রাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁকে নিজের জামাটি প্রদান করেছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর বিনিময়ে তার কাফনের জন্যে স্বীয় জামাটি প্রদান করেছিলেন। হ্যাঁ, তবে একটি হাদীসে রয়েছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা মুমিন ছাড়া আর কারও সাথে উঠা বসা করো না এবং মুত্তাকীদের ছাড়া আর কাউকেও নিজেদের খাদ্য খেতে দিও না।” এ হাদীসটিকে এ অদল বদলের বিপরীত মনে করা ঠিক হবে না। কেননা, হতে পারে যে, মুস্তাহাব হিসেবে এ হৃকুম দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ঘোষিত হচ্ছে—সতী সাধ্বী মুসলিম নারীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। এটা অবতরণিকা হিসেবে বলা হয়েছে। এ জন্যেই এর পরই বলা হচ্ছে—তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের সতী সাধ্বী নারীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে। এ উক্তিও রয়েছে যে, <sup>‘১’</sup><sub>‘২’</sub>-এর ভাবার্থ হচ্ছে <sup>‘৩’</sup><sub>‘৪’</sub> স্বাধীনা নারীগণ। অর্থাৎ দাসী যেন না হয়। এ উক্তিটি হ্যরত মুজাহিদ (রঃ)-এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত। মুজাহিদ (রঃ)-এর উক্তির শব্দগুলো হচ্ছে নিম্নরূপঃ

<sup>‘১’</sup><sub>‘২’</sub>-এর ভাবার্থ হচ্ছে <sup>‘৩’</sup><sub>‘৪’</sub> বা স্বাধীনা নারীগণ। ভাবার্থ যখন এটা হবে যে, দাসীরা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তখন এ অর্থও নেয়া যেতে পারে যে, সতী সাধ্বী নারীগণকে বিয়ে করা হালাল। কেননা, তার থেকে এ শব্দগুলো দ্বারাই অন্য একটি বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। জমতুরও এ কথা বলেন। আর এটাই সঠিকতমও বটে। এটা না হলে যিষ্মীয়া এবং অসতী নারীও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এর ফলে অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিগড়ে যাবে এবং তার “শুধু পেট ভর্তি ও খারাপ পরিমাপ”—এ প্রবাদ বাক্যের নায়কে পরিণত হবে। সুতরাং এটাই সঠিক মনে হচ্ছে যে, এখানে <sup>‘৫’</sup><sub>‘৬’</sub>-এর ভাবার্থ হবে ঐ সব নারী যারা সতী সাধ্বী ও ব্যভিচার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। যেমন অন্য আয়াতে <sup>‘৭’</sup><sub>‘৮’</sub>-এর সাথে ও ব্যভিচার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। যেমন অন্য আয়াতে <sup>‘৯’</sup><sub>‘১০’</sub>-এর সাথে <sup>‘১১’</sup><sub>‘১২’</sub> (৪:২৫) শব্দগুলো রয়েছে। আলেম ও

মুফাস্সিরগণের মধ্যে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, আহলে কিতাবদের স্বাধীনা ও দাসী সকল সতী সাধ্বী নারীই কি এ আয়াতের অন্তর্ভুক্তঃ তাফসীরে ইবনে জারীরের মধ্যে পূর্ববর্তী গুরুজনদের একটি দলের উক্তি নকল করা হয়েছে। তাঁরা বলেন যে, **مُحْصَنٌ**-এর অর্থ হচ্ছে সতী সাধ্বী। একটি উক্তি এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে যিন্মীয়া নারীগণ, স্বাধীনা নারীগণ নয়। এর দলীল হিসেবে-

**قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ**

অর্থাৎ “যারা আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর।” (৯: ২৯)-এ আয়াতটি পেশ করা হয়েছে। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) খ্রীষ্টান নারীদেরকে বিয়ে করা নাজায়েয মনে করতেন এবং বলতেনঃ তারা বলে যে তাদের প্রভু হচ্ছে হ্যরত ঈসা (আঃ), এর চেয়ে বড় শিরক আর কি হতে পারেঃ আর তারা যখন মুশরিক রূপে পরিগণিত হলো তখন কুরআন কারীমের **وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ** (অর্থাৎ “মুশরিকা নারীগণ যে পর্যন্ত ঈসান না আনে সে পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না।”) (২: ২২১)-এ আয়াতটি উপর অবশ্যই প্রযোজ্য হবে।

ইবনে আবি হাতিম (রঃ) হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মুশরিকদেরকে বিয়ে না করার হকুম নায়িল হয় তখন সাহাবায়ে কিরাম তা থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর যখন আহলে কিতাবের সতী সাধ্বীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি যুক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন জনগণ তাদেরকে বিয়ে করেন। সাহাবীদের একটি দল এ আয়াতটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতঃ খ্রীষ্টান নারীদেরকে বিয়ে করেন এবং এটাকে কোন অপরাধমূলক কাজ মনে করেননি। তাহলে এটা যেন সূরায়ে বাকারায় নিষেধযুক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু পরে অন্য আয়াত একে বিশিষ্ট করে দিয়েছেন। এটা ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যখন মেনে নেয়া হবে যে, নিষেধযুক্ত আয়াতের মধ্যে এটাও শামিল ছিল। নচেৎ এ দু'টি আয়াতের মধ্যে কোনই বৈপরীত্য নেই। কেননা, আরও বহু আয়াতে আহলে কিতাবদেরকে মুশরিকদের হতে পৃথকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনঃ **وَقُلْ لِلَّذِينَ أَوتُوا الْكِتَبَ وَالْأَمْمَنِ إِنَّمَاٰ لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا** (৩: ২০) আয়াত দু'টিতে তাদেরকে মুশরিকদের হতে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে- তোমরা তাদেরকে তাদের নির্দিষ্ট মহর প্রদান কর। অর্থাৎ যেহেতু তারা নিজেদেরকে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেহেতু তোমরা তাদেরকে তাদের ন্যায্য মহর সন্তুষ্টিতে দিয়ে দাও। হ্যরত জবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ), আমির শা'বী (রঃ), ইবরাহীম নাথঙ্গ (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ)-এর ফতওয়া এই যে, যদি কোন লোক কোন নারীকে বিয়ে করে এবং সহবাসের পূর্বে তার স্ত্রী ব্যভিচারে লিঙ্গ হয়ে পড়ে তবে স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে এবং স্বামী তার স্ত্রীকে যে মহর প্রদান করেছে তা তার নিকট থেকে ফিরিয়ে নিতে হবে। (তাফসীরে ইবনে জারীর)

বলা হচ্ছে-তোমরা তাদেরকে পত্নী ঝপে গ্রহণ করে নাও, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর। সুতরাং নারীদের জন্যে যেমন পবিত্রতা ও সতীত্বের শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তেমনই পুরুষদের জন্যেও এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর সাথে সাথেই বলা হয়েছে যে, তারা যেন না প্রকাশ্য ব্যভিচারী হয়, না এদিক ওদিক ঘুরাঘুরি করে এবং না বিশেষ সম্পর্কের কারণে হারাম কার্যে লিঙ্গ হয়ে পড়ে। সুরায়ে নিসার মধ্যে একপই নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদও (রঃ) এদিকেই গেছেন যে, ব্যভিচারিণী নারীর সাথে তাওবা করার পূর্বে কোন সৎ লোকের বিবাহ কখনও জায়েয নয়। আর তাঁর নিকট পুরুষদের ব্যাপারেও এ হকুমই প্রযোজ্য যে, কোন ব্যভিচারী পুরুষের সাথে কোন সতী সাধ্বী নারীর বিবাহ জায়েয নয় যে পর্যন্ত না সে খাঁটি অন্তরে তাওবা করে এবং জঘন্য কাজ থেকে বিরত হয়। তাঁর দলীল হিসেবে একটি হাদীসও রয়েছে। তাতে রয়েছে যে, ব্যভিচারী লোক চাবুক দ্বারা প্রহত হওয়ার পর একমাত্র তার মত নারীকেই বিয়ে করতে পারে। খলীফাতুল মুসলিমীন হ্যরত উমার ফারক (রাঃ) একবার বলেনঃ “কোন মুসলমান যদি ব্যভিচার করে তবে আমি চাই যে, কোন সতী সাধ্বী মুসলমান নারীর সাথে তার বিয়ে কখনও হতে দেবো না।” হ্যরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) বলেনঃ “হে আমীরুল মুমিনীন! শিরকের পাপ তো এর চেয়ে অনেক বড় তথাপি মুশরিকদের তাওবাও তো কবূল হয়ে থাকে।”

এ মাসআলাকে আমারা **إِلَّا إِنِّي لَا يُنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً** (২৪: ৩)-এ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবো। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে-কাফিরদের আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং পরকালে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৬। হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাযের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও তখন (নামাযের পূর্বে) তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলোকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মাথা মাসেহ কর এবং পা গুলোকে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল; কিন্তু যদি রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা হতে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (স্ত্রী সহবাস কর), অতঃপর পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াস্তু করে নাও, তখন তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ কর, আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সংক্রিংতা আনয়ন করতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে ও তোমাদের উপর স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

٦- يَا يَهَا الَّذِينَ امْنَوْا إِذَا قُمْتُمْ  
إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  
وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ  
إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جَنْبًا  
فَاطْهِرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضِيًّا أَوْ  
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ  
مِنَ الْغَابِطِ أَوْ لِمَسْتِمِ النِّسَاءِ  
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَمْسِحُوا  
صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسِحُوا  
وَوَجْهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا  
وَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ  
حَرْجٍ وَلِكِنْ يَرِيدُ لِيَطْهِرَكُمْ  
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ  
وَوَسْكُونَ ○

অধিকাংশ মুফাস্সির বলেছেন যে, মানুষের যখন অযু থাকবে না সে সময় তার জন্যে অযুর নির্দেশ প্রযোজ্য হবে। একটি দল বলেন যে, যখন তোমরা দণ্ডায়মান হও অর্থ হচ্ছে—যখন তোমরা ঘূম থেকে জাগরিত হও। এ দু'টি উক্তির ভাবার্থ প্রায় একই। অন্যান্য মনীষীরা বলেন যে, আয়াত তো সাধারণ, সুতরাং তা নিজের সাধারণত্বের উপরই থাকবে। কিন্তু যার অযু থাকবে না তার

জন্যে অযুর নির্দেশ ওয়াজিব হিসেবে প্রযোজ্য হবে। আর যার অযু থাকবে তার জন্যে অযুর নির্দেশ হবে মুস্তাহাব হিসেবে। একটি দলের ধারণা এই যে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যেক নামাযের জন্যে অযুর নির্দেশ ছিল। কিন্তু পরে তা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুনভাবে অযু করতেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি অযু করে মোজার উপর মাসেহ করেছিলেন এবং ঐ একই অযুতে কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করেছিলেন। এটা দেখে হ্যরত উমার (রাঃ) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আজ আপনি এমন কাজ করলেন যা ইতিপূর্বে কখনও করেননি। তখন তিনি বলেনঃ “হ্যাঁ, আমি ভুলে এক্ষণ করিনি, ববং জেনে শুনে ইচ্ছে করেই করেছি।” সুনানে ইবনে মাজা ইত্যাদির মধ্যে রয়েছে যে, হ্যরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) এক অযুতে কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়তেন। তবে প্রস্তাব করলে বা অযু ভঙ্গে গেলে নতুনভাবে অযু করতেন এবং অযুরই অবশিষ্ট পানি দ্বারা মোজার উপর মাসেহ করতেন। এটা দেখে হ্যরত ফযল ইবনে বাশীর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ এটা কি আপনি নিজের মতানুযায়ী করেন? তিনি উত্তরে বলেনঃ না, আমি নবী (সঃ)-কে এক্ষণ করত দেখেছি। মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি প্রস্তুত রয়েছে যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুনভাবে অযু করতেন, অযু নষ্ট হোক বা না হোক। এটা দেখে তাঁর পুত্র হ্যরত উবাইদুল্লাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় এর সনদ কি? উত্তরে তিনি বলেন যে, তাঁর কাছে হ্যরত আসমা বিনতে ইয়ায়ীদ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা, যিনি এমন লোকের পুত্র ছিলেন যাঁকে ফেরেশ্তাগণ গোসল দিয়েছিলেন। বর্ণনাটি এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুনভাবে অযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। অযু থাক বা নষ্ট হয়ে যাক। কিন্তু এটা তাঁর জন্যে কষ্টকর হলে প্রত্যেক নামাযে অযু করার পবিরত্নে মিসওয়াক করার নির্দেশ দেয়া হয়। হ্যাঁ, তবে অযু ভঙ্গে গেলে নামাযের জন্যে নতুনভাবে অযু করা জরুরী। এটাকে সামনে রেখে হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর খেয়াল হয় যে, তাঁর তো শক্তি রয়েছে, এজন্যে তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্যে অযু করতেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সেই অবস্থাই থাকে। এর একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন হ্যরত মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রাঃ)। কিন্তু যেহেতু তিনি স্পষ্টভাবে <sup>‘ঢেঢ়ে’</sup> বলেছেন সেহেতু ‘তাদলীস’ এর ভয়ও দূর হয়ে গেল। তবে ইবনে আসাকিরের বর্ণনায় এ শব্দগুলো নেই। আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর এই কাজ এবং তাঁর এতে সদা লেগে থাকা এটাই প্রমাণ করে যে, এটা অবশ্যই মুস্তাহাব এবং জমহুরের এটাই মাযহাব। তাফসীরে ইবনে জারীরে রয়েছে যে, খলীফাগণ প্রত্যেক নামাযের জন্যে অযু করতেন। হ্যরত আলী (রাঃ) প্রত্যেক নামাযের জন্যে অযু করতেন এবং দলীল হিসেবে এ আয়াতটি পাঠ করতেন। একদা তিনি যোহরের নামায আদায় করে জনসমাবেশে উপস্থিত হন। অতঃপর তাঁর নিকট পানি আনা হলে তিনি মুখ ও হাত ধোত করেন এবং মাথা ও পা মাসেহ করেন। এরপর বলেনঃ “এটা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির অযু যার অযু রয়েছে।” একবার তিনি হালকাভাবে অযু করে একথাই বলেছিলেন। হ্যরত উমার ফারকুর (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। সুনানে আবি দাউদ তায়ালেসীর মধ্যে হ্যরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ)-এর উক্তি রয়েছে যে, অযু থাকা অবস্থায় অযু করা বাড়াবাঢ়ি। তবে প্রথমতঃ সনদের দিক দিয়ে এ উক্তিটি খুবই দুর্বল। দ্বিতীয়তঃ এটা ঐ ব্যক্তির জন্যে প্রযোজ্য যে একে ওয়াজিব মনে করে। আর যে ব্যক্তি একে মুস্তাহাব মনে করে পালন করে সে তো হাদীসের উপরই আমলকারী। সহীহ বুখারী, সুনান প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুনভাবে অযু করতেন। একজন আনসারী এ কথা শুনে হ্যরত আনাস (রাঃ)-কে জিজেস করেনঃ আপনারা কি করতেনঃ তিনি উত্তরে বললেনঃ “আমরা অযু নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত একই অযুতে কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করতাম।” তাফসীরে ইবনে জারীরের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশ বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি অযু থাকতে অযু করে তার জন্যে দশটি পুণ্য লিখা হয়। জামেউত তিরমিয়ী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থের মধ্যেও এ বর্ণনা রয়েছে এবং ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) একে দুর্বল বলেছেন। একটি দল বলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, অন্য কোন কাজের সময় অযু করা ওয়াজিব নয়, শুধুমাত্র নামাযের জন্যেই অযু ওয়াজিব। এ নির্দেশ এ জন্যেই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযু ভঙ্গে যাওয়ার পর নতুনভাবে অযু না করা পর্যন্ত কোন কাজ করতেন না। এটাই ছিল তাঁর নীতি। হাদীসে ইবনে আবি হাতিম প্রভৃতির মধ্যে একটি দুর্বল বর্ণনা রয়েছে, বর্ণনাকারী বলেনঃ যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রস্তাবের ইচ্ছে করতেন তখন আমরা তাঁকে কিছু বললে তিনি উত্তর দিতেন না এবং সালাম দিলে সালামের জবাবও দিতেন না। অবশেষে ঝুঁক্সাতের এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়। সুনানে আবি দাউদের মধ্যে রয়েছে, বর্ণনাকারী বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) পায়খানা হতে বের হন এবং তাঁর সামনে খাদ্য হায়ির করা হয়। আমরা তাঁকে বললাম—আপনার নির্দেশ

হলে অযুর পানি নিয়ে আসি। তখন তিনি বললেনঃ “যখন আমি নামায়ের মধ্যে দাঁড়াই তখনই শুধু আমার প্রতি অযুর নির্দেশ রয়েছে।” ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) একে হাসান বলেছেন। অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, নবী (সঃ) বলেনঃ “আমাকে এমন খুব কম নামায়ই পড়তে হয় যাতে আমি অযু করে থাকি।” ‘যখন তোমরা নামায়ের জন্যে দাঁড়াও তখন অযু করে নাও’ -আয়াতের এ শব্দগুলো দ্বারা উলামায়ে কিরামের একটি দল দলীল গ্রহণ করেছেন যে, অযুতে নিয়ত ওয়াজিব। কালামুল্লাহর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা নামায়ের জন্যে অযু করে নাও। যেমন আরবের লোকেরা বলে থাকে, যখন তোমরা আমীরকে দেখ তখন দাঁড়িয়ে যাও অর্থাৎ আমীরের জন্যে দাঁড়িয়ে যাও। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে- “আমলের পরিণাম নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক মানুষের জন্যে শুধু ওটাই রয়েছে যার সে নিয়ত করেছে। অযুতে মুখমণ্ডল ধৌত করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। কেননা, একটি খুবই বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি অযুতে বিসমিল্লাহ বললো না তার অযু হলো না।” এটাও শ্বরণীয় বিষয় যে, অযুর পানির বরতনে হাত প্রবেশ করানোর পূর্বে হাত ধূয়ে নেয়া মুস্তাহাব। আর যখন কেউ ঘুম থেকে জেগে উঠবে তার জন্যে তো এ ব্যাপারে খুবই তাগীদ রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জেগে উঠবে তখন যেন সে তার হাত তিনবার ধূয়ে নেয়ার পূর্বে বরতনে প্রবেশ না করায়, কেননা তোমাদের কেউই জানেনা যে, রাত্রে তার হাতটি কোথায় ছিল।” মুখমণ্ডলের সীমা দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ মাথার চুল গজাবার যেটা জায়গা সেখান থেকে নিয়ে দাঢ়ির হাড় ও থুতনি পর্যন্ত এবং প্রস্ত্রে এক কান থেকে নিয়ে অপর কান পর্যন্ত। কপালের দু'দিকে চুল গজিয়ে ওঠার জায়গাটা মাথার অন্তর্ভুক্ত কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আর দাঢ়ির লটকে থাকা চুল ধৌত করা মুখমণ্ডল ধৌত করার ফরযিয়াতের অন্তর্ভুক্ত কি না এ ব্যাপার দু'টি উক্তি রয়েছে। এক তো এই যে, ওর উপর পানি বইয়ে দেয়া ওয়াজিব। কেননা, মুখমণ্ডল সামনে করার সময় ওটাও সামনে হয়ে থাকে। একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে দাঢ়ি ঢেকে রাখা অবস্থায় দেখে বলেনঃ “ওটা খুলে ফেল, কেননা ওটা মুখমণ্ডলেরই অন্তর্ভুক্ত।” হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ আরবাসীদেরও অভ্যাস এই যে, ছেলেদের যখন দাঢ়ি গজিয়ে ওঠে তখন তারা বলে ‘**طَلْعَ وَجْهٍ**’ (অর্থাৎ

তার চেহারা প্রকাশ পেয়েছে)। সুতরাং বুকা গেল যে, আরববাসী দাঢ়িকেও মুখের অন্তর্ভুক্ত মনে করে থাকে। দাঢ়ি ঘন হলে ওটা খিলাল করাও মুস্তাহাব। হ্যরত উসমান (রাঃ)-এর অযুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় তিনবার দাঢ়ি খিলাল করেছেন এবং বলেছেনঃ “তোমরা আমাকে যেভাবে অযু করতে দেখলে ঠিক সেভাবেই আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অযু করতে দেখেছি।” (জামেউত তিরমিয়ী ইত্যাদি) এ রিওয়ায়াতকে ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) হাসান বলেছেন। সুনানে আবি দাউদে হ্যরত হাসান ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযু করার সময় এক অঞ্জলী পানি নিয়ে থুতনির নীচে দিতেন এবং দাঢ়ি মুবারক খিলাল করতেন ও বলতেনঃ “আমাকে আমার মহিমাবিত প্রভু এভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন।” ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেন যে, দাঢ়ি খিলাল করা হ্যরত আশ্মার (রাঃ), হ্যরত আয়েশা (রাঃ) ও হ্যরত উষ্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে এবং একে ছেড়ে দেয়ার রুখসত হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ), হ্যরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ), হ্যরত নাখচী (রঃ) এবং তাবেঙ্গণের একটি জামআত হতে বর্ণিত রয়েছে। সিহাহ ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন অযু করতে বসতেন তখন তিনি কুলি করতেন এবং নাকে পানি দিতেন। এ দু'টো কাজ অযু ও গোসলে ওয়াজিব কি মুস্তাহাব এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাষল (রঃ)-এর মায়হাবে এটা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম শাফিউদ্দীন (রঃ) ও ইমাম মালিক (রঃ) এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। তাঁদের দলীল হচ্ছে সুনানের ঐ সহীহ হাদীসটি যাতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাড়াতাড়ি নামায আদায়কারী লোকটিকে বলেছিলেনঃ “তুমি সেভাবে অযু কর যেভাবে আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।” ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মায়হাব এই যে, এই দু'টো কাজ গোসলে ওয়াজিব, অযুতে ওয়াজিব নয়। ইমাম আহমাদ (রঃ) হতে একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব কিন্তু কুলি করা মুস্তাহাব। কেননা, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি অযু করবে সে যেন নাকে পানি দেয়।” অন্য বর্ণনায় রয়েছে— “তোমাদের কেউ যখন অযু করবে তখন সে যেন তার নাকের দু'টি ছিদ্রে পানি প্রবেশ করিয়ে দেয়, তারপরে যেন নাক ঝাড়ে।” অর্থাৎ যেন নাকের ছিদ্রে ভালভাবে পানি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে উত্তম রূপে নাক পরিষ্কার করে।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ) হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি অযু করতে বসে মুখমণ্ডল ধোত করলেন। এরপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে তা দ্বারা কুলি করলেন ও নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে ডান হাত ধুলেন। এরপর আর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাম হাত ধুলেন। তারপর মাথা মাসেহ করলেন। এরপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে তা ডান পায়ে ঢেলে দিলেন এবং পা ধোত করলেন। অতঃপর আর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাম পা ধুয়ে ফেললেন। এরপর বললেনঃ “এভাবেই আমি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে অযু করতে দেখেছি।”-এর অর্থ হচ্ছে-  
وَلَا تاكلوا مَعَ الْمَرَاقِقِ অর্থাৎ কনুইসহ। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেনঃ  
أَمْوَالِهِمُ إِلَيْهِ كَانَ حُوَيْبًا كَبِيرًا অর্থাৎ ‘তোমরা তোমাদের মালসহ তাদের (ইয়াতীমদের) মাল ভক্ষণ করো না, নিশ্চয়ই এটা গুরুতর পাপ।’ অন্দুপ এখানেও অর্থ হবে তোমরা হাতকে কনুই পর্যন্ত নয় বরং কনুইসহ ধোত কর। ইমাম দারেকুতনী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযু করার সময় স্বীয় কনুইসহের উপর পানি বইয়ে দিতেন। কিন্তু এ হাদীসের দু’জন বর্ণনাকারীর সমালোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

অযু কারীর জন্যে এটা উত্তম যে, সে যেন অযুতে কনুই-এর সাথে বাহকেও ধুয়ে নেয়। কেননা, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন আমার উম্মত অযুর চিহ্নের কারণে উজ্জ্বল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট অবস্থায় আগমন করবে। সুতরাং তোমাদের কারও সম্ভব হলে সে যেন তার উজ্জ্বল্যের দূরত্ব বাড়িয়ে নেয়।” সহীহ মুসলিমে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আমার বন্ধু (সঃ)-কে বলতে শুনেছি- মুমিনকে ঐ স্থান পর্যন্ত অলংকার পরানো হবে যে স্থান পর্যন্ত তার অযুর পানি পৌছবে।

وَامْسِحُوا بِرُّهْ وَسِكْمٌ -এর মধ্যে بِ অক্ষরটি الصَّاقِ বা মিলিয়ে দেয়ার জন্যে হওয়াই সুস্পষ্ট। কিন্তু এটা تَبْعِيضٌ বা কিছু অংশের জন্যে হওয়ার মধ্যে চিন্তা ভাবনা করার অবকাশ রয়েছে। কোন কোন মূলনীতি বিশারদ বলেন যে, যেহেতু আয়াত হচ্ছে সংক্ষিপ্ত সেহেতু সুন্নাহ এর ব্যাখ্যা যা দিয়েছে সেটাই কর্তব্য এবং সেদিকেই ফিরে যেতে হবে। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েদ ইবনে ‘আসিম (রাঃ) নামক সাহাবীকে একটি লোক বলেনঃ আপনি অযু করে আমাদেরকে দেখিয়ে দিন। তখন তিনি পানি চাইলেন এবং হাত দু’টি দু’বার করে ধুলেন,

তারপর তিনবার কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। এরপর চেহারা ধোত করলেন। তারপর কনুইসহ হাত দু'টি দু'বার ধুলেন। অতঃপর দু'হাত দিয়ে মাথা মাসেহ করলেন, মাথার প্রথম অংশ থেকে শুরু করে গ্রীবা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর সেখান থেকে এখান পর্যন্ত ফিরিয়ে আনলেন। তারপর পাদু'টি ধোত করলেন। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অযুর নিয়ম হ্যরত আলী (রাঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত আছে। সুনামে আবি দাউদে হ্যরত মু'আবিয়া (রাঃ) এবং হ্যরত মিকদাদ (রাঃ) হতেও এরপরই বর্ণিত রয়েছে। এ হাদীসগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরয হওয়ার দলীল। হ্যরত ইমাম মালিক (রঃ) এবং হ্যরত আহমাদ (রঃ)-এর এটাই মাযহাব। আর এটাই মাযহাব ঐ সব গুরুজনেরও যারা আয়াতকে সংক্ষিপ্ত বলে মেনে থাকেন এবং হাদীসকে এর ব্যাখ্যাকারী মনে করে থাকেন। হানাফীদের ধারণা এই যে, মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরয যা হচ্ছে মাথার প্রথম অংশ। আমাদের সাথী বলেন যে, ফরয শুধু ঐ টুকু যার উপর মাসেহর প্রয়োগ হয়ে থাকে। তার কোন সীমা নির্ধারিত নেই। মাথার কতক চুলের উপর মাসেহ হলেও ফরয আদায় হয়ে যাবে। এ দু'দলের দলীল হচ্ছে হ্যরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি। তিনি বলেনঃ (একবার সফরে) রাসূলুল্লাহ (সঃ) পেছনে রয়ে যান এবং আমিও তাঁর সাথে পেছনে থেকে যাই। যখন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করে ফেলেন তখন আমার নিকট পানি চান। আমি লোটা (পানি পাত্র) নিয়ে আসি। তিনি হাতের কজি দু'টি ধুলেন। তারপর মুখমণ্ডল ধোত করলেন। এরপর কজি হতে কাপড় সরিয়ে ফেললেন এবং কপালের সাথে মিলে থাকা চুল ও পাগড়ির উপর মাসেহ করলেন। (সহীহ মুসলিম) ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ এর উত্তর দেন যে, তিনি মাথার প্রথম অংশের উপর মাসেহ করে অবশিষ্ট মাসেহ পাগড়ির উপর পুরো করেন। এর বছ দৃষ্টান্ত হাদীসে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বরাবরই পাগড়ির উপর ও মাথার উপর মাসেহ করতেন। সুতরাং এটাই উত্তম এবং এটা কোনক্রমেই প্রমাণ করে না যে, মাথার কিছু অংশের উপর বা শুধুমাত্র কপালের চুলের উপর মাসেহ করতে হবে, আর এর পূর্ণতা পাগড়ির উপর হবে না। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আবার মাথার উপর মাসেহ তিনবার হবে কি একবারই হবে এ ব্যাপারেও মতান্বেক্য রয়েছে। ইমাম শাফিন্দি (রঃ)-এর মতে মাসেহ তিনবার করতে হবে। কিন্তু ইমাম আহমাদ (রঃ) ও তাঁর অনুসারীদের মতে মাসেহ একবারই করতে

হবে। তাঁদের দলীল এই যে, হ্যরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) অযু করতে বসে দু'হাতের উপর তিনবার পানি ঢালেন ও হাত দু'টি তিনবার ধৌত করেন, তারপর কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। এরপর তিনবার হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন, প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাত। তারপর মাথা মাসেহ করেন। এরপর তিনবার করে পা দু'টি ধৌত করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ “যে ব্যক্তি আমার এ অযুর মত অযু করে শুন্দ অন্তরে দু'রাকআত নামায আদায় করে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলম) সুনানে আবি দাউদের মধ্যে এ রিওয়ায়াতেই মাথা মাসেহ করার সাথে সাথে এ শুন্দও রয়েছে যে, তিনি মাথা একবার মাসেহ করেন। হ্যরত আলী (রাঃ) থেকেও এরূপই বর্ণিত আছে। আর যাঁরা মাথা মাসেহকেও তিনবার করার কথা বলেন তাঁরা ঐ হাদীস থেকে দলীল নিয়েছেন যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তিনবার করে অযুর অঙ্গণ্ডলো ধুয়েছিলেন। হ্যরত উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি অযু করেন। তারপর এরূপই রিওয়ায়াত রয়েছে এবং তাতে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার উল্লেখ নেই। আর তাতে আছে যে, অতঃপর তিনি তিনবার মাথা মাসেহ করেন এবং তিনবার স্বীয় পা দু'টি ধৌত করেন। অতঃপর বলেনঃ “আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এভাবেই অযু করতে দেখেছি।” তিনি আরও বলেনঃ “যে ব্যক্তি এরূপভাবে অযু করে, তার জন্যে এটাই যথেষ্ট।” কিন্তু হাদীস গ্রন্থে যে হাদীসগুলো হ্যরত উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে সেগুলো দ্বারা মাথা মাসেহ একবার করাই সাব্যস্ত হচ্ছে।

عَطْفٌ كَرِئَةً - وَجُوْهْكُمْ وَابْدِيْكُمْ لَامْ - وَارْجَلْكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

এর উপর করে উত্তুল কে কে পড়া হয়েছে এবং এভাবে ধৌত করার দিকে ফিরোনো হয়েছে। হ্যরত ইবনে আবরাস (রাঃ) এরূপভাবেই পাঠ করতেন। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এটাই করতেন। হ্যরত উরওয়া (রঃ), হ্যরত আতা' (রঃ), হ্যরত ইকরামা (রঃ), হ্যরত হাসান (রঃ), হ্যরত মুজাহিদ (রঃ), হ্যরত ইবরাহীম (রঃ), হ্যরত যহুহাক (রঃ), হ্যরত সুন্দী (রঃ), হ্যরত মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ), হ্যরত যুহুরী (রঃ) এবং হ্যরত ইবরাহীম তাইমীরও (রঃ) এটাই উক্তি। আর সুম্পষ্ট কথা এটাই যে, পা ধুতেই হবে। পূর্ববর্তী গুরুজনদেরও এটাই নির্দেশ যে, পা ধুতেই হবে। এখান থেকেই জমুরুর এই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, অযুতে তরতীব ওয়াজিব। একমাত্র ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি অযুতে তরতীব বা ক্রমাবলয়ে করাকে শর্ত মনে করতেন না। তাঁর মতে যদি কেউ প্রথমে পা ধুয়ে

নেয়, এরপর মাথা মাসেহ করে, তারপর হাত ধৌত করে, অতঃপর মুখমণ্ডল ধৌত করে তবুও জায়েয হবে। কেননা, আয়াতে এ অঙগুলোকে ধৌত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। وَأَوْلَىٰ -এর لَبْلَدْ কখনও তরতীবের উপর হয় না। জমতুর এর কয়েকটি জবাব দিয়েছেন। একটি এই যে, بِالْكَفْرِ تَرْتَبِعُ অক্ষরটি তরতীবের উপর لَبْلَدْ করে। আয়াতের শব্দগুলোতে নামায আদায়কারীকে মুখমণ্ডল ধৌত করার নির্দেশ فَاغْسِلُواْ شব্দ দ্বারা হচ্ছে। তাহলে কমপক্ষে মুখমণ্ডলকে প্রথম ধৌত করা তো শব্দগুলো দ্বারাই সাব্যস্ত হচ্ছে। এখন এর পরের অঙগুলোতে তরতীব ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে। এটা বিবেক বিরুদ্ধও নয়। অতঃপর فَ أَكْشَرْ অক্ষরটি যা تَعْقِيبٌ বা অনুসরণের জন্যে আসে এবং যা تَرْتِيبٌ বা ক্রমান্বয়ের দাবীদার, যখন একটির উপর এসেছে তখন একটির তরতীব মেনে নিয়ে অন্যটির তরতীব কেউ অস্বীকার করে না, বরং হয়তো বা সবকটির তরতীব স্বীকারকারী হয়, নয় তো কোন একটিরও তরতীব স্বীকারকারী হয় না। সুতরাং এ আয়াতটি নিশ্চিতরূপে তাঁদের উপর দলীল হচ্ছে যাঁরা মোটেই তরতীব স্বীকার করেন না। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, وَأَوْ অক্ষরটি তরতীবের উপর لَبْلَدْ করে না এটাও আমরা স্বীকার করি না। বরং ওটা তরতীবের উপর لَبْلَدْ করে। যেমন ব্যাকরণবিদগণের একটি দলের এবং ফিকাহশাস্ত্রবিদদের কারও কারও মাযহাব এটাই। তাছাড়া এ বিষয়টিও চিন্তা ভাবনার যোগ্য যে, আভিধানিক অর্থে এটা তরতীবের উপর لَبْلَد করে না এটা যদি মেনে নেয়াও হয়, তথাপি শরীয়তের অর্থে যে জিনিসগুলোতে তরতীব হতে পারে সেগুলোতে এর لَبْلَد তরতীবের উপর হয়ে থাকে। সহীহ মুসলিমে একটি হাদীস রয়েছে যে, رَأَسْ لَبْلَادْ (সঃ) يَخْنَمْ بَرْيَاتْ بَلْلَاهْ তাওয়াফ করে সাফার দরজা হতে বের হন, তখন إِنَّ الصَّفَاَ، শুরু করে আলালাহ তা'আলা পাঠ করেন এবং বলেনঃ “আমি سَمَحْتُ لِلَّهِ مِنْ شَعَاعِ اللَّهِ (১৫৮)-এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেনঃ ‘আমি سেখান থেকেই শুরু করবো যার বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা প্রথম দিয়েছেন।’” সুতরাং তিনি সাফা থেকে দৌড় শুরু করেন। সুনানে নাসাইতে رَأَسْ لَبْلَادْ (সঃ)-এর এ নির্দেশও বর্ণিত আছে— “তোমরা সেখান থেকেই শুরু কর যেখান থেকে আল্লাহ শুরু করেছেন।” এর ইসনাদও বিশুদ্ধ এবং এতে আমর বা নির্দেশ রয়েছে। অতএব জানা গেল যে, যার বর্ণনা পূর্বে হয়েছে তাকে পূর্বে করা এবং যার বর্ণনা পরে হয়েছে তাকে পরে করা ওয়াজিব। সুতরাং সুস্পষ্টরূপে সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, এরপ স্তুলে শরীয়তের দিক দিয়ে তরতীব উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ত্রুটীয় দল উভরে বলেন যে, হাত কনুইসহ ধৌত করার হুকুম এবং পা ধৌত করার হুকুমের মধ্যভাগে মাথা মাসেহ করার হুকুম বর্ণনা করা এ কথারই স্পষ্ট দলীল যে, তরতীবকে বাকী রাখাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। নতুবা নায়মে কালাম বা কথার ছন্দ উলট পালট করা হতো না। এর প্রথম উভর এটাও যে, সুনানে আবি দাউদ ইত্যাদির মধ্যে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযুর অঙ্গগুলো একবার একবার করে ধৌত করেন। অতঃপর বলেনঃ “এটাই হচ্ছে অযু যা ছাড়া আল্লাহ নামায কবূল করেন না।” এখন অবস্থা হলো দু’টি, হয় এই অযুতে তরতীব ছিল, নয় তো ছিল না। যদি বলা হয় যে, নবী (সঃ)-এর এই অযু তরতীবসহ ছিল অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে একটি অঙ্গের পর আর এক অঙ্গ ছিল তাহলে বুঝতে হবে যে, যে অযুতে আগা পিছা হবে এবং সঠিকভাবে তরতীব থাকবে না সেই অযুতে নামায গ্রহণীয় হবে না। তাহলে জানতে হবে যে, অযুতে তরতীব ওয়াজীব ও ফরয। আর যদি মেনে নেয়া হয় যে, এই অযুতে তরবীত ছিল না, বরং এলোমেলো ছিল, যেমন পা ধুয়েছিলেন, তারপর কুলি করেছিলেন, এর পর মাসেহ করেছিলেন, তারপর মুখ ধুয়েছিলেন ইত্যাদি, তাহলে তরতীব না করাই ওয়াজীব হয়ে যাবে! অথচ এরূপ মত পোষণকারী উম্মতের মধ্যে একজনও নেই। অতএব, সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, অযুতে তরতীব ফরয। আয়াতের এ অংশের একটি কিরআত ওয়া আরজুলিকুম অর্থাৎ **مَرْحُى** কে যের দিয়েও রয়েছে। আর এটা থেকেই শী’আ সম্পদায় এ দলীল গ্রহণ করেছে যে, পায়ের উপর মাসেহ করা ওয়াজীব। কেননা, তাদের নিকট এর **عَطْفٌ** বা **সংযোগ**-**وَامْسَحُوا بِرُءُسِّكِمْ** এর উপর হয়েছে। পূর্ববর্তী কোন কোন গুরুজন হতেও এরূপ উক্তি বর্ণিত আছে। যার ফলে পা মাসেহ করার কল্পনা জেগে ওঠে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন-মূসা ইবনে আনাস জনসমাবেশে হ্যরত আনাস (রাঃ)-কে বলেন যে, হাজ্জায আহওয়ায নামক স্থানে ভাষণ দিতে গিয়ে তাহারাত ও অযুর আহকামের ব্যাপারে বলেছেনঃ “তোমরা মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং পা ধুয়ে ফেল। সাধারণতঃ পায়েই ধূলা ময়লা লেগে যায়। সুতরাং পায়ের তলা, উপরিভাগ ও গোড়ালিকে উত্তমরূপে ধৌত কর।” তখন হ্যরত আনাস (রাঃ) উভরে বলেনঃ আল্লাহ তা’আলা সত্যবাদী এবং হাজ্জায মিথ্যবাদী। আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ **- وَامْسَحُوا بِرُءُسِّكِمْ وَارْجِلَكُمْ**

হ্যরত আনাস (রাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি পায়ের মাসেহ করতেন তখন পা সম্পূর্ণরূপে ভিজিয়ে দিতেন। অথচ তাঁর থেকেই বর্ণিত আছে

যে, কুরআন কারীমে পায়ের উপর মাসেহ করার হকুম রয়েছে। হ্যাঁ, তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নাত হচ্ছে পা ধৌত করা। হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অযুতে দু'টো অঙ্গ ধুতে হয় এবং দু'টো অঙ্গ মাসেহ করতে হয়। হ্যরত কাতাদাহ (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতটিতে পায়ের উপর মাসেহ করার বর্ণনা রয়েছে। ইবনে উমার (রাঃ), আলকামাহ (রঃ), আবু জাফর (রঃ), মুহাম্মাদ ইবনে আলী (রঃ) এবং এক রিওয়ায়াতে হ্যরত হাসান (রঃ) ও হ্যরত জাবির ইবনে যায়েদ (রঃ) এবং আর এক রিওয়ায়াতে হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) হতেও এক্সপই বর্ণিত আছে। হ্যরত ইকরামা (রাঃ) পায়ের উপর মাসেহ করতেন। শা'বী (রঃ) বলেন যে, হ্যরত জিবরাইল (আঃ)-এর মাধ্যমে মাসেহৰ হকুম নাফিল হয়েছে। তাঁর থেকে এটাও বর্ণিত আছে- “তোমরা কি দেখছো না যে, যে অঙ্গগুলোর উপর ধোয়ার নির্দেশ ছিল, গুণগুলোর উপর তো তায়াশুমের সময় মাসেহ করার হকুম রয়েছে। আর যেগুলোর উপর মাসেহ করার হকুম ছিল, তায়াশুমের সময় গুণগুলো ছেড়ে দেয়া হয়েছে।” হ্যরত আমির (রাঃ)-কে কেউ বললেনঃ “লোকেরা বলছেন যে, হ্যরত জিবরাইল (আঃ) পা ধোয়ার হকুম নিয়ে এসেছেন।” হ্যরত আমির (রাঃ) একথা শুনে বললেনঃ “হ্যরত জিবরাইল (আঃ) মাসেহ করার হকুম নিয়ে নাফিল হয়েছিলেন।” সুতরাং এসব আছার সম্পূর্ণরূপেই গারীব এবং ঐ বিষয়ের উপর মাহমুল যে, এখানে মাসেহৰ ভাবার্থ হচ্ছে ঐ গুরুজনদের হালকাভাবে ধৌতকরণ। কেননা, সুন্নাত দ্বারা এটা পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত আছে যে, পা ধৌত করা ওয়াজিব। স্বরণ রাখতে হবে যে, যেরের কিরআতটি হয় তো ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ও সৌষ্ঠবের জন্যেই হবে। যেমন আরবদের কথায় আছে-

عَالِيهِمْ ثِيَابٌ سَنْدِسٌ خَضْرُونَ حَجَرٌ ضَبْ وَأَسْتِرْبَقْ (৭৬: ২১)

এবং আল্লাহ পাকের কালামে রয়েছে- আরবদের ভাষায় এটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ কারণে উভয় শব্দকে একই <sup>২১</sup> আর' দিয়ে দেয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায়। হ্যরত ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ) এর একটি কারণ এও বর্ণনা করেছেন যে, এ হকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যখন পায়ে মোজা থাকবে। কেউ কেউ বলেন যে, এখানে মাসেহৰ অর্থ হচ্ছে হালকাভাবে ধৌত করা, যেমন কতক রিওয়ায়াতে সুন্নাত দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়েছে। মোটকথা পা ধোয়া ফরয, এটা ছাড়া অযুই হবে না, আয়াতেও এটাই আছে এবং হাদীসেও তাই আছে। যেগুলো আমরা পেশ করছি ইনশাআল্লাহ।

হাদীসে বায়হাকীতে রয়েছে, একদা হ্যরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) যোহরের নামায আদায় করার পর বসে থাকেন এবং আসর পর্যন্ত জনগণের কাজ কামে লিঙ্গ থাকেন। তারপর পানি আনিয়ে নেন এবং অঞ্জলি দ্বারা মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়, মাথা ও পদদ্বয় মাসেহ করেন এবং অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করে নেন। অতঃপর বলেনঃ “লোকেরা দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে অপছন্দনীয় মনে করে। অথচ আমি যা করলাম তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে করতে দেখেছি।” এরপর তিনি বলেনঃ “এটা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির অযু যার অযু রয়েছে।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) শী‘আদের মধ্যে যারা পায়ের মাসেহ মোজার মাসেহর মত বলেছেন তাঁরা অবশ্যই ভুল করেছেন এবং জনগণকে ভাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। অন্দপ তাঁরাও ভুল করেছেন যাঁরা মাসেহ করা ও ধৌত করা দু’টোকেই জায়ে বলেছেন। আবার যাঁরা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করেছেন যে, তিনি হাদীসসমূহের উপর ভিত্তি করে পা ধোয়া এবং আয়াতে কুরআনীর উপর ভিত্তি করে পায়ের উপর মাসেহ করাকে ফরয বলেছেন তাঁদের তাহকীক বা বিশ্লেষণও ঠিক নয়। তাফসীরে ইবনে জারীর আমাদের নিকট বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর কথার ব্যাখ্যা এই যে, পা দু’টিকে রগড়ানো ওয়াজিব। কিন্তু অন্য অঙ্গগুলোর ব্যাপারে এটা ওয়াজিব নয়। কেননা, পা দ্বারা মাটিতে চলাফেরা করতে হয়। কাজেই পায়ে ময়লা মাটি ভরে যায়। তাই পা ধোয়া জরুরী, যাতে পায়ে কিছু লেগে থাকলে ধোয়ার ফলে তা দূর হয়ে যায়। কিন্তু এ রগড়ানোর জন্যে তিনি মাসেহ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। আর এতেই কতক লোকের মনে সন্দেহ জেগে ওঠে এবং তাঁরা বুঝে নেন যে, তিনি ধৌত করা ও মাসেহ করাকে এভাবে জমা করে দিয়েছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এর কোন অর্থই হয় না। মাসেহ তো ধৌত করারই অন্তর্ভুক্ত, তা আগেই হোক বা পরেই হোক। সুতরাং আসলে ইমাম সাহেবের ইচ্ছা ওটাই যা আমি উল্লেখ করলাম। আর একে না বুঝে অধিকাংশ ফেকাহ শাস্ত্রবিদ ওটা মুশকিল জেনেছেন। আমি খুব চিন্তা ভাবনা করলে আমার কাছে এটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইমাম সাহেবে উভয় কিরআতকে একত্রিত করারই পক্ষা খুঁজছিলেন। সুতরাং তিনি যেরের কিরআত অর্থাৎ মাসেহকে তো মাহমুল করেছেন **ক্লাঁ** বা ভালভাবে রগড়িয়ে পরিষ্কার করার উপর আর যবরের কিরআত তো **গ্রেস্ল** বা ধৌত করার উপর আছেই। সুতরাং তিনি ধৌত করা ও রগড়ানো উভয়কেই ওয়াজিব বলেছেন, যাতে যের ও যবর উভয় কিরআতের উপর একই সাথে আমল হয়ে যায়। এখন পা ধৌত করা জরুরী হওয়া সম্পর্কে যে হাদীসগুলো এসেছে সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে-

আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ), আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হযরত ইবনে আবাস (রাঃ), হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এবং হযরত মিকদাদ ইবনে মাদীকারব (রাঃ)-এর বর্ণনাগুলো ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযু করার সময় স্বীয় পদন্ধয় একবার, দু'বার বা তিনবার ধুয়েছেন। হযরত আমর ইবনে শুআইব (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযু করেছেন এবং স্বীয় পা দু'টি ধুয়েছেন। তারপর বলেছেনঃ “এটা হচ্ছে অযু, যা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা নামায কবুল করেন না।”

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন। যখন তিনি আগমন করেন তখন আমরা তাড়াতাড়ি অযু করছিলাম। আমরা তাড়াহড়া করে আমাদের পাগুলো স্পর্শ করা শুরু করে দেই। সেই সময় তিনি খুবই উচ্চেঃস্থরে বললেনঃ “অযু পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন কর। আগুনে পায়ের গোড়ালির অঙ্গল রয়েছে।” অন্য একটি হাদীসে আছে—“আগুনে পায়ের গোড়ালির ও পায়ের তলার অঙ্গল রয়েছে।”<sup>১</sup> আর একটি হাদীসে রয়েছেঃ “আগুনের কারণে পায়ের গিট্টের অঙ্গল রয়েছে।”<sup>২</sup> ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একটি লোকের পায়ের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা শুষ্ক দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আগুনের কারণে পায়ের গোড়ালির জন্যে অঙ্গল রয়েছে।” ইবনে জারীর (রঃ) হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সম্প্রদায়কে নামায পড়তে দেখেন যাদের একজনের পায়ের গোড়ালির এক দিরহাম পরিমাণ জায়গায় বা নথ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌছেনি, তখন তিনি বলেনঃ “আগুনের কারণে গোড়ালির জন্যে অঙ্গল রয়েছে।” বর্ণনাকারী বলেন যে, এরপর মসজিদে ইতর অন্দ্র এমন কেউ থাকতো না যে ঘুরে ফিরে নিজের গোড়ালির দিকে চেয়ে দেখতো না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন একটি লোককে নামায পড়তে দেখেন যার পায়ের গোড়ালির এক দিরহাম পরিমাণ চামড়া শুষ্ক ছিল। এ দেখে তিনি উক্ত রূপ মন্তব্য করেন। তখন অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, কারও যদি

১. এ হাদীসটি ইমাম বাযহাকী (রঃ) ও ইমাম হাকিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর মুসনাদে রয়েছে।

সামান্য পরিমাণ জায়গা শুষ্ক থেকে যেতো তবে সে পুনরায় শুরু থেকে অযু করতো। সুতরাং এই হাদীসসমূহ দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পাধৌত কর্তা ফরয। যদি মাসেহ করা ফরয হতো তবে সামান্য পরিমাণ জায়গা শুষ্ক থাকায় আল্লাহর নবী (সঃ) জাহান্নামের আগন্তের ভয় প্রদর্শন করতেন না। কেননা, মাসেহের সময় পায়ের সব জায়গায় হাত পৌছানোই হয় না, বরং মোজার উপর যেভাবে মাসেহ করা হয় সেভাবেই পায়ের উপর মাসেহ করা হয়। এ কথাটাই ইবনে জারীর (রঃ), শী'আদের মোকাবিলায় পেশ করেছেন। ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে হযরত উমার ইবনে খাতাব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে অযু করতে দেখতে পান যার পায়ে নথ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌছেনি, বরং শুষ্ক রয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “তুমি ফিরে যাও এবং ভালভাবে অযু করে এসো।” ইমাম বায়হাকীও (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ) হযরত খালিদ ইবনে মি'দান (রঃ)-এর মাধ্যমে নবী (সঃ)-এর কোন একজন স্ত্রী হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) এমন একজন লোককে দেখতে পান যার পায়ের গোড়ালির উপরিভাগের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা শুষ্ক রয়ে গিয়েছিল, সেখানে পানি পৌছেনি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে পুনরায় অযু করার নির্দেশ দেন। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি **স্লো** বা নামায শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। এ ইসনাদটি উত্তম, মজবুত ও বিশুদ্ধ। আল্লাহই ভাল জানেন।

হযরত উসমান (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অযুর যে নিয়ম বর্ণিত হয়েছে তাতে এও রয়েছে যে, তিনি অঙ্গুলিগুলোর খিলালও করেছিলেন। সুনান গ্রন্থগুলোতে রয়েছে যে, হযরত সাবরা' (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অযু সম্পর্কে জিজেস করলে তিনি বলেনঃ “অযু পূর্ণভাবে ও উত্তমরূপে কর, অঙ্গুলিগুলোর মধ্যে খিলাল কর এবং নাকে উত্তমরূপে পানি দাও। তবে যদি রোয়ার অবস্থায় থাক তাহলে অন্য কথা।”

ইমাম আহমাদ (রঃ) হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে, তিনি হযরত আমর ইবনে আবসা' (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আমর ইবনে আবসা') বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমাকে অযু সম্পর্কে সংবাদ দিন! তিনি বললেনঃ “যে ব্যক্তি অযুর পানি নিয়ে কুলি করে ও নাকে পানি দেয়, পানির সাথে সাথে ও নাক ঝাড়ার সাথে সাথে তার মুখ ও নাকের ছিদ্র হতে পাপরাশি ঝরে পড়ে। তারপর আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী যখন

সে মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন দাঢ়ির ধার ও দাঢ়ির চুল হতে পানি ঝরে পড়ার সাথে সাথে তার মুখের পাপরাশি ঝরে পড়ে। অতঃপর যখন সে কনুইসহ হাত দু'টি ধৌত করে তখন তার অঙ্গুলির দিক থেকে পাপরাশি ঝরে পড়ে। এর পর যখন সে মাথা মাসেহ করে তখন তার চুলের ধার দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে তার মাথার পাপরাশি ঝরে পড়ে। তারপর যখন সে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী পা দু'টি গোড়ালিসহ ধৌত করে তখন পায়ের অঙ্গুলি দিয়ে পানি টপ টপ করে পড়ার সাথে সাথেই তার পায়ের পাপরাশি দূর হয়ে যায়। অতঃপর যখন সে দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা ও গুণ বর্ণন করতঃ দু'রাকআত নামায আদায় করে তখন সে পাপ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যায় যে, যেন সে আজকেই জন্মগ্রহণ করলো।” এটা শুনে হ্যরত আবু উমামা (রাঃ) হ্যরত আমর ইবনে আবসা (রাঃ)-কে বললেনঃ আপনি কি বলছেন তা খুব চিন্তা করে দেখুন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে আপনি এরূপই শুনেছেন তো? এ সব কিছুই কি মানুষ একই স্থানে লাভ করে থাকে। হ্যরত আমর (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ “দেখুন আবু উমামা! আমি বুঝিয়ে গেছি। আমার অঙ্গিণী দুর্বল হয়ে পড়েছে; আমার মৃত্যু নিকটবর্তী হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করায় আমার লাভ কি? একবার নয়, দু'বার নয়, তিনবার নয়, আমি এটা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর মুখে সাতবার বরং তার চেয়েও অধিকবার শুনেছি।” এ হাদীসের ইসনাদ সম্পূর্ণরূপেই বিশুদ্ধ। সহীহ মুসলিমের অন্য সনদযুক্ত হাদীসে রয়েছেঃ “তারপর সে স্বীয় পদদ্বয় ধৌত করে যেমনভাবে ধৌত করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।” সুতরাং জানা গেলো যে, কুরআন কারীমের হৃকুম হচ্ছে পা ধুয়ে নেয়া। আবু ইসহাক সাবীঈদ হ্যরত হারিসের মাধ্যমে হ্যরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ “স্বীয় পদদ্বয় গোড়ালির উপর পর্যন্ত ধৌত কর যেমন তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।” এর দ্বারা এটাও জানা গেল যে, যে রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্বীয় পদদ্বয় জুতার মধ্যেই ভিজিয়ে নেয়া হ্যরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ওর ভাবার্থ হচ্ছে জুতার মধ্যে হালকাভাবে ধুয়ে নেয়া। আর চটি জুতা পায়ে থাকলে এভাবে পা ধোয়া যেতে পারে। মোটকথা এ হাদীসও পা ধোয়ার দলীল। অবশ্য এর দ্বারা সংশয়ে পতিত লোকদের খণ্ডন হয়ে থাকে যারা সীমা ছাড়িয়ে যায়। এমনভাবে অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সম্প্রদায়ের ময়লা ও খড়কুটা ফেলার জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করেন। তারপর পানি চেয়ে নিয়ে অযু করেন এবং স্বীয় স্যাঞ্জেলের উপর মাসেহ করেন। কিন্তু এ

হাদীসটি অন্য সনদেও বর্ণিত আছে এবং তাতে রয়েছে যে, তিনি স্বীয় মোজার উপর মাসেহ করেন। এগুলো এভাবে একত্রিত করা যেতে পারে যে, তাঁর পায়ে মোজা ছিল এবং মোজার উপর স্যাঞ্জেল ছিল। ঐ দু'টোর উপর তিনি মাসেহ করেছিলেন। এ হাদীসেরও ভাবার্থ এটাই হবে। মুসনাদে আহমাদে আউস ইবনে আবি আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ “আমি দেখতে ছিলাম এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযু করেন এবং স্বীয় স্যাঞ্জেলের উপর মাসেহ করেন। তারপর নামাযের জন্যে দণ্ডয়মান হন।” এ রিওয়ায়াতটি অন্য সনদেও বর্ণিত আছে এবং তাতে তাঁর খড়কুটোর উপর দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করা, তারপর অযু করা এবং স্যাঞ্জেলদ্বয় ও পদদ্বয়ের উপর মাসেহ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) হাদীসটি এনেছেন, অতঃপর বলেছেনঃ “এটা মাহমুল হচ্ছে ওর উপর যে, ঐ সময় তাঁর প্রথম অযু ছিল।” কোন মুসলমান এটা কিরণে মেনে নিতে পারে যে, আল্লাহর ফরয ও তাঁর নবী (সঃ)-এর সুন্নাতের মধ্যে বৈপরীত্ব দেখা দেবে। আল্লাহ এক কথা বলবেন এবং নবী (সঃ) অন্য কিছু করবেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চিরস্থায়ী কাজ হিসেবে অযুতে পা ধৌতকরণ দ্বারা এর ফরয হওয়া সাব্যস্ত হচ্ছে। আর আয়াতের সহীহ মতলবও এটাই। যার কান পর্যন্ত এ দলীলগুলো পৌঁছে যাবে, তার উপর আল্লাহর লজ্জত পূর্ণ হয়ে যাবে। যবরের কিরআত দ্বারা পা ধৌত করা এবং যেরের কিরআতও এরই উপর মাহমুল হওয়ার ফলে ওটা যে ফরয তা অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেল। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষী তো একথাও বলেছেন যে, এ আয়াত দ্বারা মোজার উপর মাসেহ মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। যদিও হ্যরত আলী (রাঃ) হতেও এরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে, কিন্তু ওর ইসনাদ বিশুদ্ধ নয়, বরং স্বয়ং তাঁর থেকেই বিশুদ্ধতার সাথে এর বিপরীত সাব্যস্ত হয়েছে। আর যাঁরই কথা এটা হোক না কেন, তার এ ধারণাই ঠিক নয়। কেননা, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মোজার উপর মাসেহ করা সাব্যস্ত আছে। মুসনাদে আহমাদে হ্যরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ “সূরায়ে মায়দাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার পরই আমি মুসলমান হই। আমার ইসলাম প্রহণের পরে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি।”

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হ্যরত হাম্মাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, হ্যরত জারীর (রাঃ) প্রস্তাব করেন, তারপর অযু করেন এবং মোজার উপর মাসেহ করেন। তাঁকে জিজেস করা হলোঃ আপনি এরূপ করে

থাকেন? তিনি উভয়ের বললেনঃ “হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এক্ষণপই করতে দেখেছি।” হাদীসের বর্ণনাকারী হ্যরত ইবরাহীম (রঃ) বলেন যে, জনগণের কাছে এ হাদীসটি খুবই ভাল লাগতো। কেননা, হ্যরত জারীরের ইসলাম গ্রহণই সূরায়ে মায়দাহ অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা ছিল। আহকামের বড় বড় কিতাবগুলোতে ধারাবাহিকতার সাথে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা ও কাজের দ্বারা মোজার উপর মাসেহ সাব্যস্ত রয়েছে। এখন মাসেহর জন্যে মুদ্দত বা সময়ের দৈর্ঘ্য আছে কি নেই তা আলোচনার জায়গা এটা নয়। আহকামের কিতাবগুলোতে এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। রাফেয়ীগণ এতেও মতভেদ সৃষ্টি করেছে। তাদের কাছে এর কোন দলীল প্রমাণ নেই, আছে শুধু অঙ্গতা ও ভাস্তি। স্বয়ং হ্যরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনায় সহীহ মুসলিমে এটা সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু রাফেয়ীরা তা মানে না। যেমন হ্যরত আলী (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত দ্বারা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের নিকাহে মুতআর নিষিদ্ধতা সাব্যস্ত হয়েছে, তথাপি শী'আরা ওটাকে বৈধ বলেছে। ঠিক তদ্দুপ এ আয়াতে কারীমা পদব্য ধৌত করার উপর স্পষ্টভাবে পথ নির্দেশ করছে এবং এই কাজটিই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ধারাবাহিক হাদীসসমূহ দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে, তথাপি শী'আ সম্প্রদায় এর বিরোধিতা করছে। প্রকৃতপক্ষে এ মাসায়েলের ব্যাপারে তাদের হাত দলীল-প্রমাণ হতে সম্পূর্ণ শূন্য। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। অনুরূপভাবে এ লোকগুলো পায়ের গিঁঠের ব্যাপারেও আয়াতের ও পূর্ববর্তী গুরুজনদের বিরোধিতা করেছে। তারা বলে যে ওটা পায়ের পিঠের উপর রয়েছে। সুতরাং তাদের নিকট প্রত্যেক পায়ে একটি মাত্র গিঁঠ রয়েছে। আর জমহুরের নিকট গিঁঠের ঐ হাড়গুলো যা পায়ের গোছা ও পায়ের মধ্যভাগে রয়েছে ঐগুলো হচ্ছে (কَعْبَيْنِ)। ইমাম শাফিউ (রঃ)-এর ফরমান এই যে, যে (কَعْبَيْنِ)-এর আলোচনা এখানে হয়েছে ওটা গিঁঠের ঐ হাড় দু'টি যা দু'দিকেই প্রকাশমান রয়েছে, তা একই পায়ে দু'টি গিঁঠ। এটা জনগণের মধ্যেও সুপরিচিত। আর হাদীসের পথ নির্দেশও এর উপরই। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, হ্যরত উসমান (রাঃ) অযু করার সময় ডান পা (কَعْبَيْনِ) বা গিঁঠ দু'টিসহ ধৌত করেন। তারপর বাম পাটিও এভাবেই ধৌত করেন। সহীহ ইবনে খুয়াইমা এবং সুনানে আবি দাউদের মধ্যে রয়েছে, বর্ণনাকারী নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলেনঃ “আল্লাহর শপথ! হয় তোমরা তোমাদের সারিগুলো সোজা করে

নাও, নয়তো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি করে দেবেন।” হাদীসের বর্ণনাকারী নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেনঃ তখন থেকে এই অবস্থা দাঁড়ালো যে, প্রতিটি লোক তার পার্শ্ববর্তী লোকের গিঁটের সাথে গিঁঠ, জানুর সাথে জানু এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে রাখতো। এ বর্ণনা দ্বারা পরিষ্কারভাবে জানা গেল যে, (عَبْيُّ) ঐ হাড়ের নাম নয় যা পায়ের পিঠের দিকে রয়েছে। কেননা, পাশাপাশি দাঁড়ানো দু'টি লোকের পক্ষে ওটা মিলানো সম্ভব নয়। বরং ওটা ঐ দু'টি উত্থিত হওয়া হাড় যা পায়ের গোছার শেষ ভাগে রয়েছে। আহলে সুন্নাতের মাযহাব এটাই। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) ইয়াহ্যায়া ইবনে হারিস তাইমী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ “যায়েদের যে শী'আ সঙ্গীটিকে হত্যা করা হয়েছিল তাকে আমি দেখেছি। তার গিঁটেটি পায়ের পিঠের উপর পেয়েছি। এটা ছিল তার কুদুরতী শাস্তি, যা তার মৃত্যুর পরে প্রকাশ করা হয়েছে এবং সত্যের বিরোধিতা ও সত্য গোপন করার প্রতিফল দেয়া হয়েছে।”

এরপর তায়াম্মুমের নিয়মের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এর পূর্ণ তাফসীর সূরায়ে নিসায় হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আয়াতে তায়াম্মুমের শানে ন্যূনও সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে আমীরুল মুমিনীন ইমাম বুখারী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে একটি বিশেষ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি নিম্নে দেয়া হলোঃ

উস্মুল মুমিনীন হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার গলার হারটি বায়দা নামক স্থানে পড়ে যায়। আমরা মদীনায় প্রবেশকারী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সওয়ারীটি থামিয়ে দেন এবং আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। ইত্যবসরে আমার পিতা হ্যরত আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট আগমন করেন এবং আমাকে তিরক্ষারের সূরে বলেনঃ “তুমি হার হারিয়ে দিয়ে লোকদেরকে থামিয়ে দিয়েছো?” এ কথা বলে তিনি আমাকে প্রহার করতে শুরু করেন যার ফলে আমার কষ্টবোধ হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে মনে করে আমি নড়াচড়া করা হতে বিরত থাকি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জেগে ওঠেন এবং ইতিমধ্যে ফজরের নামাযের সময় হয়ে যায়। সুতরাং তিনি পানি খোঁজ করেন। কিন্তু পানি পাওয়া গেল না। সেই সময় এ পূর্ণ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন হ্যরত উসাইদ

ইবনে হ্যাইর (রাঃ) বলে ওঠেনঃ “হে আবু বকর (রাঃ)-এর বংশধর, আল্লাহ জনগণের জন্যে তোমাদেরকে কল্যাণময় বানিয়ে দিয়েছেন। তোমরা তাদের জন্যে পুরোপুরি কল্যাণময় হয়ে গেলে।”<sup>১</sup>

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকারের সংক্রীণতা ও অসুবিধায় ফেলতে চান না। এজন্যেই তিনি দ্বীনকে সহজ ও হালকা করে দিয়েছেন, কঠিন ও মুশকিল করেননি। হকুমতো ছিল এই যে, তোমরা পানি দ্বারা অযু করবে। কিন্তু যদি পানি পাওয়া না যায় কিংবা তোমরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড় তবে তোমাদেকে তায়াম্বু করার অনুমতি দেয়া হলো। বাকী হকুমের জন্যে আহকামের কিতাবগুলো দ্রষ্টব্য।

ইরশাদ হচ্ছে-বরং আল্লাহ তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তোমাদের উপর স্বীয় নিয়ামত পরিপূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। অর্থাৎ তাঁর প্রশংস্ত আহকাম, কোমলতা, দয়া, সহজকরণ এবং অবকাশ দানের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অযুর পরে আল্লাহর রাসূল (সঃ) একটি দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন, তা যেন এ আয়াতেরই আওতাভুক্ত রয়েছে। মুসনাদে আহমাদ, সুনান এবং সহীহ মুসলিমে হ্যরত উকবা ইবনে আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমরা পালাক্রমে উট চরাতাম। আমি আমার পালার দিন রাত্রে ইশার সময় আগমন করে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়িয়ে জনগণকে কিছু বলতে রয়েছেন। আমি যখন পৌছে গেলাম তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে শুনতে পেলামঃ “যে মুসলমান ভালভাবে অযু করে আন্তরিকতার সাথে দু'রাকআত নামায পড়বে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব।” এ কথা শুনে আমি বললাম, বাঃ বাঃ! এটা তো খুবই ভাল কথা। আমার এ কথা শুনে আমার সামনে উপবিষ্ট একজন সাথী বলেনঃ “এর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে কথাটি বলেছিলেন তা এর চেয়েও অধিক উত্তম।” আমি খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করে বুঝলাম যে, তিনি হচ্ছেন হ্যরত উমার ফারক (রাঃ)। আমাকে তিনি বললেন, তুমি তো এখনই আসলে। তোমার আসার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ)

১. সুইউতী (রঃ) বলেনঃ হাদীসটি এটাই প্রমাণ করছে যে, আয়াতটি নাফিল হওয়ার পূর্বেই তাদের উপর অযু ওয়াজিব ছিল। এ কারণেই পানিশূন্য জায়গায় অবতরণ করাকে তাঁরা খুবই বড় করে দেখেছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ এ মত পোষণ করেন যে, আয়াতের প্রথম অংশ অযু ফরয হওয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। তারপর বাকী অংশ তায়াম্বুমের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তবে প্রথমটি বেশী ঠিক, কেননা মকায় নামায ফরয হওয়ার সাথে অযুও ফরয করা হয়। আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় মদীনায়।

বলেছিলেনঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করার পর বলে—

أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা-ই খুলে যায়, সে যেটা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে। হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন কোন মুসলমান বা মুমিন অযু করতে বসে, অতঃপর তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন পানির সাথে সাথে বা পানির শেষ ফেঁটার সাথে সাথে তার চক্ষুদ্বয়ের সমুদয় পাপ ঝরে পড়ে। অনুরূপভাবে হাত ধোয়ার সময় হাতের সমুদয় পাপ এবং এভাবেই পা ধোয়ার সময় পায়ের সমুদয় পাপ পানির সাথে সাথে বা পানির শেষ ফেঁটার সাথে সাথে ঝরে পড়ে। অবশেষে সে পাপসমূহ থেকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র হয়ে যায়।” ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কোন ব্যক্তি“অযু করার সময় যখন হাত দু'টি ধৌত করে তখন হাত হতে পাপরাশি বিদ্রূরিত হয়ে যায়। যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন মুখমণ্ডল হতে পাপসমূহ দূর হয়ে যায়। যখন মাথা মাসেহ করে তখন মাথার গুনাহ দূরীভূত হয়। যখন পা ধূয়ে নেয় তখন পা হতে পাপরাশি ঝরে পড়ে।” অন্য সনদে মাসেহ করার কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাফসীরে ইবনে জারীরে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে নামাযের জন্যে দণ্ডায়মান হয়, তার কান হতে, চোখ হতে, হাত হতে এবং পা হতে সমস্ত গুনাহ ঝড়ে পড়ে।” সহীহ মুসলিমে হ্যরত আবু মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “অযু হচ্ছে অর্ধেক ঈমান। ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলার কারণে পুণ্যের পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ‘সুবহানাল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে ফেলে। রোয়া হচ্ছে ঢাল স্বরূপ, ধৈর্য হচ্ছে জ্যোতি স্বরূপ এবং সাদকা হচ্ছে দলীল স্বরূপ। কুরআন তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। প্রত্যেক লোক সকালে উঠেই স্বীয় প্রাণকে ত্রয়-বিত্রয় করে থাকে। অতঃপর সে ওকে মুক্ত করে দেয় অথবা ধ্বংস করে ফেলে।” সহীহ মুসলিমে হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “হারাম মালের সাদকা আল্লাহ কবৃল করেন না এবং অযু ছাড়া নামাযও কবৃল করেন না।”

৭। আর তোমরা তোমাদের প্রতি  
বর্ষিত আল্লাহর অনুগ্রহকে  
স্মরণ কর এবং তাঁর ঐ  
অঙ্গীকারকেও স্মরণ কর, যে  
অঙ্গীকার তিনি তোমাদের  
নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন,  
যখন তোমরা বলেছিলে—  
আমরা শুনলাম ও মেনে  
নিলাম, আর তোমরা  
আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই  
তিনি অস্তর্নির্হিত কথাগুলোরও  
পূর্ণ খবর রাখেন।

৮। হে মুমিনগণ! তোমরা  
আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিধানসমূহ  
পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠাকারী ও  
ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী  
হয়ে যাও, কোন বিশেষ  
সম্প্রদায়ের শক্রতা যেন  
তোমাদেরকে এর প্রতি উদ্যত  
না করে যে, তোমরা ন্যায়  
বিচার করবে না, তোমরা  
ন্যায় বিচার কর, এটা  
তাকওয়ার অধিকতর  
নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে  
ভয়কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ  
তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ  
ওয়াকিফহাল।

৯। যারা ঈমান এনেছে ও ভাল  
কাজ করেছে, তাদেরকে  
আল্লাহ প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন  
যে, তাদের জন্যে ক্ষমা ও  
মহান পুরক্ষার রয়েছে।

৭- وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
وَمِيشَاقَهُ الذِّي وَاثْقَمْ بِهِ اذْ  
قَلْتُمْ سِمعَنَا وَاطَّعْنَا وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ  
الصُّدُورِ ○

৮- يَا يَهِيَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا  
قُومِينَ لِلَّهِ شَهِداءَ بِالْقِسْطِ  
وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
إِلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

৯- وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ لَهُمْ مغْفِرَةٌ  
وَاجْرٌ عَظِيمٌ ○

১০। পক্ষান্তরে যারা কুফরি  
করেছে এবং আমার  
বিধানসমূহকে মিথ্যা জেনেছে,  
তারাই হচ্ছে জাহান্নামের  
অধিবাসী।

১১। হে মুমিনগণ! তোমাদের  
প্রতি যে আল্লাহর অনুগ্রহ  
রয়েছে তা স্মরণ কর, যখন  
এক সম্প্রদায় এ চিন্তায় ছিল  
যে, তোমাদের দিকে তাদের  
হস্ত প্রসারিত করবে, কিন্তু  
আল্লাহ তাদের হাতকে  
তোমাদের দিক থেকে থামিয়ে  
দিয়েছেন, এবং তোমরা  
আল্লাহকে ভয় কর, এবং  
মুমিনদের আল্লাহর উপরই  
ভরসা করা উচিত।

এ বিরাট ধর্ম এবং এ মহান রাসূল (সঃ)-কে পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা এ  
উচ্চতরের উপর যে ইহসান করেছেন সেটাই তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আর  
সেই অঙ্গীকারের উপর দৃঢ় থাকার জন্যে তাদেরকে হিদায়াত করেছেন, যে  
অঙ্গীকার মুসলমানরা করেছিল, তারা আল্লাহর রাসূলের (সঃ) অনুগত হবে,  
তাঁকে সর্ব প্রকারের সাহায্য করবে, দ্বিনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, নিজেরা তা  
কবূল করবে এবং অপরের নিকটও তা পৌছিয়ে দেবে। ইসলাম গ্রহণের সময়  
প্রতিটি মুমিন স্বীয় বায়আতে উক্ত জিনিসগুলো স্বীকার করতো। সাহাবায়ে  
কিরাম নিম্নলিখিত ভাষায় বলেছিলেনঃ “আমরা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর  
নিকট বায়আত গ্রহণ করছি যে, আমরা শুনতে থাকবো, মানতে থাকবো।  
আমাদের মনের চাহিদা হোক বা না-ই হোক অথবা অন্যদেরকে আমাদের  
উপর প্রাধান্য দেয়া হোক না কেন। কোন যোগ্য লোকের নিকট থেকে আমরা  
কোন কাজ ছিনিয়ে নেবো না।”

ইরশাদ হচ্ছে-তোমরা ঈমান আনছো না কেন? অথচ রাসূলুল্লাহ (সঃ)  
তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনার আহ্বান জানাচ্ছেন! আর  
তিনি তোমাদের নিকট অঙ্গীকারও নিয়েছেন, যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়। এটাও

١- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا  
يَا يَتَّبِعُنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ  
١١- يَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا  
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ  
أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ  
فَكَفَ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلَ  
٤٦ ( )  
المُؤْمِنُونَ

বলা হয়েছে যে, এ আয়াতে ইয়াহুদীদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে- তোমরা তো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আনুগত্য স্বীকারের কথা দিয়েছো, এরপরেও তাঁকে মান্য না করার কি অর্থ হতে পারে? একথাও বলা হয়েছে যে, হ্যরত আদমের পৃষ্ঠ থেকে বের হবার পর আল্লাহ তা'আলা বানু আদমের নিকট থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন- আমি কি তোমাদের প্রভু নই? সবাই স্বীকারোক্তি করেছিল-হ্যাঁ, আমরা এর উপর সাক্ষী থাকলাম। কিন্তু প্রথম উক্তিটি বেশী প্রকাশমান। সুন্দী (রঃ) ও হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) একে পছন্দনীয় বলেছেন। সর্বাবস্থায় মানুষের আল্লাহকে ভয় করা উচিত। তিনি অন্তরের ও বক্ষের গোপনীয় কথাও পূর্ণভাবে অবগত রয়েছেন।

ঘোষিত হচ্ছে-হে মুমনিগণ! লোকদেরকে দেখাবার জন্যে নয়, বরং আল্লাহর জন্যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং ইনসাফের সাথে সঠিক সাক্ষী হয়ে যাও। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হ্যরত নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ আমার পিতা আমাকে একটি দান দিয়ে রেখেছিলেন। তখন আমার মা উমরাহ বিনতে রাওয়াহা (রাঃ) বলেনঃ ‘আমি এ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারি না যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এর উপর সাক্ষী বানানো হয়।’ এ কথা শুনে আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হায়ির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমার অনান্য সন্তানদেরকেও কি একপ দান দিয়ে রেখেছো?” আমার পিতা উত্তরে বললেনঃ ‘না।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ “আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বীয় সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম কর। যাও, আমি কোন অত্যাচারের উপর সাক্ষী হতে পারি না।” আমার পিতা তখন ঐ দান আমার নিকট হতে ফিরিয়ে নেন।

ইরশাদ হচ্ছে- কোন সম্পদায়ের শক্রতা যেন তোমাদেরকে আদল ও ইনসাফের পথ থেকে সরিয়ে না দেয়।<sup>১</sup> বক্তু হোক বা শক্র হোক, তোমাদের ইনসাফের পক্ষ অবলম্বন করা উচিত। এটাই হচ্ছে তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। এখানে **فِعْلَتْ**-এর উপর **مُصْدَرْ**-**كَوْمَ** করেছে যার দিকে **ضَمِيرْ** টি ফিরেছে। এ নথীর কুরআন মাজীদে আরও রয়েছে। আরবদের কথাতেও এর ব্যবহার দেখা যায়। কুরআন কারীমের এক জায়গায় রয়েছে-

১. এখানে ‘কওম’ দ্বারা ইয়াহুদকে বুঝানো হয়েছে। তারা নথী (সঃ)-কে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল। যেমন ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। আর সুহাইলী বলেন যে, এখানে ‘কওম’ দ্বারা গাওরাস ইবনে হারিস গাতফানীকে বুঝানো হয়েছে।

وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُوا فَارْجِعوا هُوَ أَزْكِي لَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা যদি কোন বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর, “আর সে সময় তোমাদেরকে বলা হয়- ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্যে অধিক পবিত্র থাকার কারণ হবে।”(২৪: ২৮) সুতরাং এখানেও এর উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু দ্রল্লত-এর ফুল এবং স্মৃতি বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ ফিরে যাওয়া। অনুরূপভাবে আয়াতেও এ অর্থাৎ ‘ইনসাফ করা’ বিদ্যমান রয়েছে। এটাও স্বরণীয় বিষয় যে, এখানে **أَقْرَبَ** শব্দটি এর রূপ। এটা এমন জায়গায় রয়েছে যে অন্যদিকে আর কিছুই নেই। যেমনঃ **صَحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقْرًا وَاحْسَنُ مَقْبِلًا** (২৫: ২৪)-এ আয়াতটিতে রয়েছে। আর যেমন এক মহিলার হযরত উমার (রাঃ)-এ **أَنْتَ افْظُ وَاغْلُظِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**-কে কথা বলা।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের আমল সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি ভাল ও মন্দের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। তিনি মুমিনদের পাপ ক্ষমা করে তাদেরকে মহান পুরক্ষার অর্থাৎ জান্নাত দান করার অঙ্গীকার করেছেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা এ রহমত একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহের ফলেই লাভ করবে, কিন্তু এ রহমতের প্রতি মনোযোগ দেয়ার কারণ হবে তাদের আমল। অতএব, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকারের প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ এবং সব কিছুই তাঁরই অনুগ্রহ ও দয়া মাত্র। জ্ঞান ও ইনসাফের দাবী তো এটাই যে, মুমিন ও সৎ লোকদেরকে জান্নাত দেয়া হোক এবং কাফির ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে জাহানামে প্রবিষ্ট করা হোক। সুতরাং হবেও তাই।

তারপর আল্লাহ পাক নিজের আর একটি নিয়ামতের কথা মুমিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কোন এক সফরে নবী (সঃ) একটি মন্দিলে অবতরণ করেন। জনগণ ছায়াযুক্ত বৃক্ষারাজির খোজে বিচ্ছিন্নভাবে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় হাতিয়ার একটি গাছে লটকিয়ে রাখেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে তাঁর তরবারীখানা হাতে টেনে নিয়ে বলে, আপনাকে এখন আমার হাত থেকে কে বাঁচাতে পারে? উত্তরে

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “মহামহিমাৰিত আল্লাহ (আমাকে বাঁচাবেন)।” সে দ্বিতীয়বার এ প্রশ্নই করলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় এ উত্তরই দিলেন। বেদুইন তৃতীয়বার বললো, “আপনাকে আমা থেকে রক্ষা করবে কে?” তিনি উত্তরে বললেনঃ আল্লাহ। বর্ণনাকারী বলেন যে, এ কথা বলার সাথে সাথে বেদুইনের হাত থেকে তরবারী পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে ডাক দিলেন। তাঁরা এসে গেলে তিনি তাঁদের কাছে বেদুইনের ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। সে তখনও তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি তার কোন প্রতিশোধ নিলেন না। কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, কতগুলো লোক প্রতারণা করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং তারাই ঐ বেদুইনকে গুপ্তযাতক হিসেবে তাঁর নিকট পাঠিয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের পরিকল্পনা এভাবে ব্যর্থ করে দেন। সহীহ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, ঐ বেদুইনের নাম ছিল গাওরাস ইবনে হারিস। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াতুরীরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবীদেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে খাদ্য বিষ মিশিয়ে তাদেরকে দাওয়াত করে। কিন্তু মহান আল্লাহ এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জানিয়ে দেন। সুতরাং তারা বেঁচে যান। একথা ও বলা হয়েছে যে, কা’ব ইবনে আশরাফ এবং তার ইয়াতুরী সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে কষ্ট দিতে চেয়েছিল। এটা ঐ সময়ের ঘটনা, যখন নবী (সঃ) আমেরী লোকদের দিয়াত গ্রহণের জন্যে তাদের নিকট গিয়েছিলেন। ঐ সময় দুষ্টেরা আমর ইবনে জাহাশ ইবনে কা’বকে উত্তেজিত করতঃ বলেছিল- “আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নীচে দাঁড় করিয়ে রেখে আলোচনায় লিঙ্গ করিয়ে রাখবো, এ সুযোগে তুমি উপর থেকে তাঁর উপর পাথর ফেলে দিয়ে তাঁকে দুনিয়া হতে বিদায় করে দেবে।” কিন্তু মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে পথেই তাদের দুষ্টামির কথা জানিয়ে দেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণসহ সেখান হতে ফিরে আসেন। এ আয়াতে ঐ ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে-মুমিনদের আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। বিপদ আপদ থেকে রক্ষাকারী একমাত্র তিনিই। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে বানূ নাফীরের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। তাদের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করেন এবং কতক লোককে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন।

১২। আর আল্লাহ বানী  
ইসরাইলদের নিকট থেকে  
অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং  
আমি তাদের মধ্য হতে  
বারোজন দলপতি নিযুক্ত  
করেছিলাম; এবং আল্লাহ  
বলেছিলেন-আমি তোমাদের  
সাথে রয়েছি; যদি তোমরা  
নামায সুপ্রতিষ্ঠিত কর ও  
যাকাত দিতে থাক। এবং  
আমার রাসূলদের উপর ঈমান  
আনতে থাক ও তাদেরকে  
সাহায্য করতে থাক এবং  
আল্লাহকে উত্তমরূপে কর্জ  
দিতে থাক। তবে আমি  
অবশ্যই তোমাদের শুনাইগুলো  
তোমাদের থেকে মোচন করে  
দেবো এবং অবশ্যই  
তোমাদেরকে এমন  
উদ্যানসমূহে দাখিল করবো  
যার তলদেশে নহরসমূহ  
বইতে থাকবে, অনন্তর যে  
ব্যক্তি এরপরও কুফরী করবে,  
নিচয়ই সে সোজা পথ থেকে  
দূরে সরে পড়লো।

১৩। বস্তুতঃ শুধু তাদের  
প্রতিশ্রূতি ভঙ্গের দরুনই আমি  
তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে  
দূর করে দিলাম, তারা কালাম  
(তাওরাত)-কে ওর স্থানসমূহ  
হতে পরিবর্তন করে দেয়,  
এবং তাদেরকে যা কিছু

১২ - وَلَقَدْ أَخْذَ اللَّهُ مِيشَاقَ بَنِي  
إِسْرَائِيلَ وَبَعْثَنَا مِنْهُمْ أَشْنَىٰ  
عَشْرَ نَبِيًّا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي  
مَعَكُمْ لَيْسَ أَقْمَتْمُ الْصَّلَاةَ  
وَأَتَيْتُمُ الزَّكُوْنَ وَامْنَتُمْ بِرَسْلِي  
وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَاقْرَضْتُمُ اللَّهَ  
قَرْضًا حَسَنًا لَا كَفِرْنَ عَنْكُمْ  
سَيَّاتِكُمْ وَلَا دُخْلَنَكُمْ جَنَّةٌ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ فَمَنْ  
كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ  
ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلُ ۝

১৩ - فِيمَا نَقْضَيْهُمْ مِيشَاقُهُمْ  
لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً  
يَحْرِفُونَ الْكِلَمَ عنْ مَوَاضِعِهِ  
وَنَسُوا حَظَّهُمْ مَا ذَكَرْوَا بِهِ

উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা  
 তার মধ্য হতে এক বড়  
 অংশকে হারাতে বসেছে, আর  
 আগামীতেও (অবিরত) তাদের  
 কোন না কোন খিয়ানতের  
 সংবাদ তোমার নিকট আসতে  
 থাকবে, তাদের অল্প  
 কয়েকজন ব্যতীত, অতএব  
 তুমি তাদেরকে ক্ষমা করতে  
 থাক এবং তাদেরকে মার্জনা  
 করতে থাক; নিচয়ই আল্লাহ  
 সদাচারী লোকদেরকে  
 ভালবাসেন।

১৪। আর যারা বলে-আমরা  
 নাসারা, আমি তাদের নিকট  
 থেকেও ওয়াদা নিয়েছিলাম,  
 অনন্তর তাদেরকেও যা কিছু  
 উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার  
 মধ্য হতে তারা নিজেদের এক  
 বড় অংশ হারাতে বসেছে,  
 সুতরাং আমি তাদের  
 পরম্পরের মধ্যে হিংসা ও  
 শক্রতা সঞ্চার করে দিলাম  
 কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এবং  
 অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে  
 তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সংবাদ  
 দেবেন।

উপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাঁ'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে অঙ্গীকার  
 পুরো করা, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্য দেয়ার  
 নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাথে সাথে প্রকাশ্য ও গোপনীয় নিয়ামতগুলোর কথা স্মরণ  
 করিয়ে দিচ্ছেন। এখন এ আয়াতগুলোতে তাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের  
 নিকট হতে গ্রহণকৃত অঙ্গীকারের হাকীকত ও অবস্থা বর্ণনা করছেন। তারপর

وَلَا تزالْ تَطْلُعُ عَلَىٰ خَاتِمَةٍ  
 مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ  
 عَنْهُمْ وَاصْفِحْ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ  
 الْمُحْسِنِينَ ۝

١٤- وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ  
 نَصْرَىٰ أَخْذَنَا مِيَثَاقُهُمْ  
 فَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذَكَرُوا بِهِ  
 فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ  
 وَالْبَغْضَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ  
 وَسُوفَ يَنْبَئُهُمُ اللَّهُ بِمَا  
 كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝

তারা যখন আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে দেয় তখন তাদের পরিণাম কি হলো তা বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা থেকে বিরত রাখছেন। তাদের বারোজন সর্দার ছিল অর্থাৎ গোত্রের বারোজন চৌধুরী ছিল যারা তাদের নিকট বায়আত গ্রহণ করতো যে, তারা যেন আল্লাহর এ রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করে। হ্যরত মূসা (আঃ) যখন অবাধ্যদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে গমন করেন তখন তিনি প্রত্যেক গোত্রের নেতা হতে একজন করে সর্দার নির্বাচন করে যান। (১) আদবীল গোত্রের নেতা ছিল শামুন ইবনে আকওয়ান, (২) শামউনের চৌধুরী ছিল শাফাত ইবনে জান্দী, (৩) ইয়াতুদার নেতা ছিল কালিব ইবনে ইউফনা, (৪) ফীখাইলের নেতা ছিল ইবনে ইউসুফ, (৫) ইফরান্দিমের সর্দার ছিল ইউশা ইবনে নূন, (৬) বিন ইয়ামীন গোত্রের চৌধুরী ছিল কিতাতামী ইবনে ওয়াফুন, (৭) যাবুলুনের সর্দার ছিল জান্দী ইবনে শূরী, (৮) মিনশারীর নেতা ছিল হান্দী ইবনে সূফী, (৯) দান আমলাসিলের সর্দার ছিল ইবনে হামল, (১০) আশা গোত্রের সর্দার ছিল সাতুর, (১১) নাফতালীর সর্দার ছিল বাহর, (১২) ইয়াখারার গোত্রের নেতা ছিল লাবিল। তা ওরাতের ৪ৰ্থ খণ্ডে বানূ ইসরাইলের গোত্রগুলোর সর্দারদের নাম উল্লিখিত রয়েছে। ঐ নামগুলো এবং এ নামগুলোর মধ্যে কিছু গরমিল দেখা যায়। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

### বর্তমান তাওরাতের নামগুলো নিম্নরূপঃ

(১) বানূ আদবীল গোত্রের নেতা সুফী ইবনে সাদুন, (২) বানূ শামউনের সর্দার শামওয়াল ইবনে সূর, (৩) বানূ ইয়াতুদার সর্দার হাশুর ইবনে উমাইয়ায়ার, (৪) বানূ ইয়াসখারের নেতা শাল ইবনে সাউন, (৫) বানূ যাবুলুর নেতা আলাইয়াব ইবনে হালুব, (৬) বানূ ফারাইয়ামের সর্দার মিনশা ইবনে গামছুর, (৭) বানূ মিনশার নেতা হামইয়াঙ্গল, (৮) বানূ বিন ইয়ামীনের নেতা আবদীনা, (৯) বানূ দানের সর্দার জাইয়ার, (১) বানূ আশাৱের নেতা নাহাবিল, (১১) বানূ কানের সর্দার সায়েফ ইবনে দাওয়াবীল এবং (১২) বানূ নাফতারীর নেতা আজ্যা'।

এটা স্মরণীয় বিষয় যে, লাইলাতুল আকাবায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আনসারদের নিকট হতে বায়আত গ্রহণ করেন সে সময় তাঁদের সর্দারও বারজনই ছিলেন। আউস গোত্রের ছিলেন তিনজন। তাঁরা হলেনঃ (১) হ্যরত উসায়েদ ইবনে হৃষায়ের (রাঃ), (২) হ্যরত সাদ ইবনে হালীমা (রাঃ) এবং

(৩) হ্যরত রূফাআ ইবনে আবদুল মুগযির (রাঃ)। অন্য বর্ণনায় হ্যরত রূফাআর (রাঃ) স্থলে হ্যরত আবদুল হাইসাম ইবনে তাইহান (রাঃ)-এর নাম রয়েছে। বাকী নয়জন সর্দার ছিলেন খায়রাজ গোত্রের মধ্য হতে। তাঁরা হচ্ছেনঃ (১) আবু উমামাহ আসআদ ইবনে যারারাহ (রাঃ), (২) সা'দ ইবনে রাবী' (রাঃ), (৩) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রাঃ), (৪) রাফি ইবনে মালিক ইবনে আজলান (রাঃ), (৫) বারা ইবনে মারুর (রাঃ), (৬) উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ), (৭) সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ), (৮) আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রাঃ) এবং (৯) মুনযির ইবনে আমর ইবনে খামরাস (রাঃ)। এ সর্দারগণ নিজ নিজ কওমের পক্ষ থেকে শেষ নবী (সঃ)-এর হাতে শ্রবণ করার ও মান্য করার বায়আত গ্রহণ করেন। হ্যরত মাসরুক (রাঃ) বলেনঃ আমরা হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর পাশে বসেছিলাম। তিনি সে সময় আমাদেরকে কুরআন পাঠ শিক্ষা দিছিলেন। এমন সময় একটি লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন -এ উম্মতের ক'জন খলীফা হবেন এ কথা কি আপনারা নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ যখন থেকে আমি ইরাকে এসেছি, আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে এটা জিজ্ঞেস করেননি। এ সম্বন্ধে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ “বারোজন হবে। বানী ইসরাইলের দলপতিদেরও এ সংখ্যাই ছিল।”

সনদের দিক দিয়ে এ হাদীসটি গারীব বটে, কিন্তু হাদীসের বিষয়বস্তু সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনা দ্বারাও সাব্যস্ত হয়েছে। হ্যরত জাবির ইবনে সামরা (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি- “মানুষের কাজ চলতে থাকবে যে পর্যন্ত তাদের অলী বারোজন হবে।” তারপর নবী (সঃ) একটি কথা বলেন যা আমি শুনতে পাইনি। আমি তখন অন্যকে জিজ্ঞেস করি-নবী (সঃ) এখন কি বললেনঃ তিনি উত্তরে বলেনঃ “তারা সব কুরাইশ হবে।” সহীহ মুসলিমে এ শব্দই রয়েছে। এ হাদীসের ভাবার্থ এই যে, বারোজন সৎ খলীফা হবেন যাঁরা হক প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং লোকদের মধ্যে আদল ও ইনসাফ কায়েম করবেন। এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁরা সবাই পর্যাক্রমেই হবেন। তাঁদের মধ্যে চারজন খলীফা তো পর্যাক্রমেই হয়েছেন। তাঁরা হচ্ছেনঃ হ্যতর আবু বকর (রাঃ), হ্যরত উমার (রাঃ), হ্যরত উসমান (রাঃ) এবং হ্যরত আলী (রাঃ)। এ চারজন খলীফার খিলাফত নবুওয়াতের তরীকা অনুযায়ীই ছিল। ঐ বারোজন খলীফার মধ্যে পঞ্চম হচ্ছেন

উমার ইবনে আবদুল আয়ীয়। বানু আববাসের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ খলীফা ছিলেন। কিয়ামতের পূর্বে এ বারো সংখ্যা পূর্ণ হওয়া অবশ্যই জরুরী। তাঁদের মধ্য হতেই একজন হচ্ছেন ইমাম মাহ্মুদী (রঃ), যাঁর সুসংবাদ হাদীসে এসেছে। নবী (সঃ)-এর নামে তাঁর নাম হবে এবং নবী (সঃ)-এর পিতার নামে তাঁর পিতার নাম হবে। তিনি ভূ-পৃষ্ঠকে আদল ও ইনসাফ দ্বারা পূর্ণ করে দেবেন। অথচ তাঁর পূর্বে পৃথিবী অত্যাচার ও অনাচারে ভরপুর থাকবে। কিন্তু শী'আ সম্প্রদায় যে ইমামের জন্যে অপেক্ষমান রয়েছে তিনি সেই ইমাম নন। শী'আদের ঐ ইমামের আসলে তো কোন অস্তিত্বই নেই। এটা তো শুধু তাদের ধারণা ও কল্পনা মাত্র। এ হাদীস শী'আদের বারো ফিরকার ইমামদেরকে বুঝায় না।

এ হাদীসকেই ঐ বারোজন ইমামের উপর মাহমুল করাও শী'আদের ঐ ফিরকার বানানো কথা মাত্র। এটা তো তাদের অজ্ঞতা এবং জ্ঞানের স্বল্পতাই প্রমাণ করে। তাওরাতে হ্যরত ইসমাইল (আঃ)-এর শুভ সংবাদের সাথে সাথে লিখিত আছে যে, তাঁর বংশের মধ্যে বারোজন মহান ব্যক্তি হবেন। এর দ্বারাও মুসলমানদের এ বারোজন কুরায়েশী বাদশাহকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু যেসব ইয়াতুন্দী মুসলমান হয়েছিল তারা ছিল অন্য। তারা নিজেদের ইসলামে কাঁচা ছিল এবং সাথে সাথে মূর্খও ছিল। তারা হয় তো শী'আদের কানে এটা ফুঁকে দিয়েছিল এবং এর ফলেই তারা মনে করে নিয়েছিল যে, এর দ্বারা বারোজন ইমামকে বুঝানো হয়েছে। নতুনা হাদীসে তো পরিষ্কারভাবে এর উল্টোই বিদ্যমান রয়েছে।

এখন ঐ আহাদ ও অঙ্গীকারের আলোচনা করা হচ্ছে যা আল্লাহ তা'আলা ইয়াতুন্দীদের নিকট গ্রহণ করেছিলেন। সেই অঙ্গীকার এই যে, তারা নামায পড়বে, যাকাত দেবে, আল্লাহর রাসূলদের সত্যতা স্বীকার করবে, তাদের সাহায্য সহানুভূতি করবে এবং আল্লাহর সম্মতির কাজে নিজেদের মাল খরচ করবে। তারা যদি এ সব কিছু পালন করে তবে আল্লাহর সাহায্য সহায়তা তাদের সাথে থাকবে, তাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তাদের জাল্লাতে প্রবিষ্ট করা হবে। আর তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা হবে এবং তাদের ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তারা যদি এ অঙ্গীকারের পরও তা থেকে ফিরে যায় এবং ওগুলো পালন না করে তবে অবশ্যই তারা সত্য পথ থেকে দূরে সরে পড়বে এবং বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। সুতরাং হলোও তা-ই। তারা অঙ্গীকার ভেঙ্গে দিলো

এবং ওয়াদা খেলাফ করলো । তখন তাদের উপর আল্লাহর লান্ত বর্ণিত হলো, তারা হিদায়াত থেকে দূরে সরে পড়লো, তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, তারা ওয়াজ-নসীহতে মোটেই উপকৃত হলো না, তাদের বিবেক-বুদ্ধি বিগড়ে গেল, আল্লাহর কথাকে তারা হেরফের করতে লাগলো এবং ভুল ও মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে লাগলো । কালামুল্লাহর প্রকৃত ভাবার্থ যা হবে তা পরিবর্তন করে দিয়ে অন্য ভাবার্থ বুঝতে ও বুঝাতে লাগলো এবং আল্লাহর নাম নিয়ে ঐসব মাসআলা বর্ণনা করতে লাগলো যা আল্লাহ বলেননি । অবশেষে আল্লাহর কিতাব তাদের হাত থেকে ছুটে গেল এবং তারা তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বে-আমল হয়ে গেল, আর তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করতে লাগলো । দ্বীনের আসল আমল যখন তাদের হাত থেকে ছুটে গেল তখন ফুরুঙ্গ আমল কিরণে কবূল হতে পারে? আমল ছুটে যাওয়ার কারণে না অন্তর ঠিক থাকলো, না স্বভাব ভাল থাকলো, না আন্তরিকতা রইলো । প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে নিজেদের নীতিতে অভ্যাস বানিয়ে নিলো । আর তারা নবী (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের বিরোধিতা করতে লাগলো ।

নবী (সঃ)-কে বলা হচ্ছে- তুমি তাদেকে ক্ষমা ও মার্জনা করতে থাক । তাদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা উন্নত হবে । হ্যরত উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ “যে ব্যক্তি তোমার সাথে আল্লাহর নাফরমানীমূলক ব্যবহার করে, তুমি তাকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান কর ।” এতে যৌক্তিকতা ও পরিগামদর্শিতা এই রয়েছে যে, ফলে সে হয় তো ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে এবং আল্লাহ তাকে হিদায়াত নসীব করবেন ।

ইরশাদ হচ্ছে-আল্লাহ সৎকর্মশীদের ভালবাসেন । অর্থাৎ যারা অপরের দুর্ব্যবহারকে ক্ষমা করতঃ তার সাথে সৎ ব্যবহার করে, এরূপ লোককে আল্লাহ খুবই ভালবাসেন । কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, দুর্ব্যবহারকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার লকুম জিহাদের আয়াত দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে ।

যৌষণ করা হচ্ছে-স্ত্রীষ্ঠানদের নিকট থেকেও আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যে, তারা আমার প্রেরিত রাসূল (সঃ)-এর উপর ঈমান আনবে, তাঁকে সাহায্য করবে এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে । কিন্তু ইয়াতুন্দীদের মত তারাও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে । এর শাস্তি স্বরূপ আমি তাদের পরম্পরের মধ্যে শক্রতা সৃষ্টি করে দিয়েছি এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে । তারা আজ দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে । একদল অপর দলকে কাফির ও অভিশঙ্গ বলছে এবং নিজেদের উপাসনালয়েও আসতে দেয় না । মালেকিয়াহ দল ইয়াকুবিয়াহ দলকে খোলাখুলিভাবে কাফির বলছে । এরূপ সমস্ত দলই করতে রয়েছে ।

ଆଲ୍ଲାହ ପାକ ବଲେନଃ ଅଚିରେଇ ଆଲ୍ଲାହ ତାଦେରକେ ତାଦେର କୃତକର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧେ  
ସଂବାଦ ଦେବେନ । ଏ କଥା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଷ୍ଟାନଦେରକେ ଶାସ୍ତିର ଭୀତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରା ହଚ୍ଛେ ।  
କେନନା, ତାରା ଆଲ୍ଲାହ ଓ ତା'ର ରାସୁଲ (ସଃ)-ଏର ଉପର ମିଥ୍ୟ ଆରୋପ କରେଛେ ।  
ତାରା ମହାନ ଆଲ୍ଲାହର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେଛେ (ନାଉୟୁବିଲ୍ଲାହି ମିନ ଯାଲିକ) ।  
କିଯାମତେର ଦିନ ତାଦେରକେ କଠିନଭାବେ ପାକଡ଼ାଓ କରା ହବେ । ଆଲ୍ଲାହ ତୋ ହଚ୍ଛେ  
ଏକ ଓ ଅଦ୍ଵିତୀୟ, ତିନି କାରାଓ ମୁଖାପେକ୍ଷୀ ନନ । ତା'ର କୋନ ସନ୍ତାନ ନେଇ ଏବଂ  
ତିନିଓ କାରାଓ ସନ୍ତାନ ନନ । ଆର ତା'ର ସମତଳ୍ୟ ଓ ସମକକ୍ଷ କେଉଁ ନେଇ ।

১৫। হে আহলে কিতাব!

୧୬ । ତା ଘାରା ଆଲ୍ଲାହ ଏକପି  
ଲୋକଦେଇକେ ଶାନ୍ତିର ପଞ୍ଚାସମୂହ  
ବଲେ ଦେନ ଯାରା ତାଁର ସମ୍ଭାଷିତର  
ଅନ୍ଧେଷଣ କରେ, ଏବଂ ତିନି  
ତାଦେଇକେ ନିଜ ତାଓଫୀକେ ଓ  
କର୍ମଣାୟ (କୁଫରୀର) ଅନ୍ଧକାର  
ଥେକେ ବେର କରେ (ଈମାନେର)  
ଆଲୋର ଦିକେ ଆନୟନ କରେନ  
ଏବଂ ତାଦେଇକେ ସରଳ (ସଠିକ)  
ପଥେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଖେନ ।

١٥- يَاهْلُ الْكِتَبِ قَدْ جَاءَكُمْ  
رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا  
كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَبِ  
وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ  
مِنَ اللَّهِ نَهْرٌ وَكِتَبٌ مِنْ

١٦- يَهْدِي يَهْدِي إِلَيْهِ اللَّهُمَّ مِنْ أَتَّبَعَ  
رِضَّوَانَهُ سُبُّلَ السَّلَمِ  
وَهُوَ وَوَدُودٌ لِّمَنْ يُحِبُّ  
وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى  
النُّورِ بِأَذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى  
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রাসূল হ্যরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে হিদায়াত ও দ্বীনে হকসহ সমস্ত মাখ্লুকের নিকট পাঠিয়েছেন। মুজিয়া ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি তাঁকে দান করেছেন। যে কথাগুলো ইয়াহুদ ও নাসারাগণ বদলিয়ে দিয়েছিল, ভুল ব্যাখ্যা করে অন্য অর্থ বানিয়ে নিয়েছিল, আল্লাহর সন্তার উপর অপবাদ দিয়েছিল, কিতাবুল্লাহর যে অংশটি তাদের জীবনের প্রতিকূল ছিল তা তারা গোপন করে দিয়েছিল। এ সব কিছুই এ রাসূল (সঃ) প্রকাশ করে দেন। তবে যেগুলো বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই সেগুলো তিনি বর্ণনা করেন না। মুসতাদরিকে হাকিম গ্রহে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি রজম বা ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করার মাসআলাকে অঙ্গীকার করলো সে অজ্ঞতা বশতঃ কুরআন কারীমকে অঙ্গীকার করলো। কেননা, এ আয়াতে এই রজমকেই গোপন করার উল্লেখ রয়েছে।<sup>১</sup>

এরপর মহান আল্লাহ কুরআন কারীম সম্পর্কে বলেন যে, তিনিই তাঁর প্রিয় নবী (সঃ)-এর উপর তাঁর এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা সত্য সন্ধানীদেরকে শান্তির পথ দেখিয়ে দেয়, লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে নিয়ে আসে এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করে। এ কিতাবের কারণে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ লাভ করা এবং তাঁর শান্তি হতে রক্ষা পাওয়া খুবই সহজ। এটা আন্তিকে বিদ্রুতিকারী এবং হিদায়াতকে প্রকাশকারী।

### ১৭। অবশ্যই তারা কাফির যারা

বলে- নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বয়ং  
হচ্ছেন মাসীহ ইবনু  
মারইয়াম, তুমি (হে মুহাম্মাদ  
সঃ)! বল, তাহলে যদি  
আল্লাহ মাসীহ ইবনু  
মারইয়ামকে ও তার মাকে

১৭- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ  
اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مُرْيَمَ  
قُلْ فَمَنْ يُمِلِّكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

১. ইবনে জারীর (রঃ) তাখরীজ করেছেন যে, ইয়াহুদীরা নবী (সঃ)-এর কাছে এসে রজম সম্পর্কে জিজেস করলে তিনি তাদেরকে বললেনঃ ‘তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পণ্ডিত কে?’ তারা ইঙ্গিতে ইবনে সুরিয়াকে দেখালো। তখন তিনি তাকে সেই আল্লাহর কসম দিলেন যিনি হ্যরত মুসা (আঃ)-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলেন এবং বানী ইসরাইলের উপর তূর পাহাড় ও অঙ্গীকার তুলে ধরেছিলেন। তখন সে বললোঃ “যখন আমাদের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো তখন ব্যভিচারের শান্তি হিসেবে একশ চাবুক মারার ও মাথা মুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়।” একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের উপর রজমের বিধান জারী করেন। সে সময় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

এবং ভৃ-পৃষ্ঠে যাক্ক আছে  
তাদের সবকে খৎস করার  
ইচ্ছা করেন তবে এরূপ কে  
আছে যে তাদেরকে আল্লাহ  
হতে একটুও রক্ষা করতে  
পারে? আল্লাহর জন্যেই  
প্রভুত্ব নির্দিষ্ট রয়েছে  
আকাশসমূহে ও যমীনে এবং  
এতদুভয়ের মধ্যস্থিত  
যাবতীয় বস্তুর উপর; তিনি যা  
ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন,  
আর আল্লাহ সকল বস্তুর  
উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৮। ইয়াহুদী ও নাসারাগণ  
বলে—আমরা আল্লাহর পুত্র ও  
তাঁর প্রিয়পাত্র, তুমি বলে দাও,  
আছে তাহলে তিনি  
তোমাদেরকে তোমাদের  
পাপের দরুন কেন শান্তি  
প্রদান করবেন? বরং  
তোমরাও অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায়  
সাধারণ মানুষ মাত্র। তিনি  
যাকে ইচ্ছা মার্জনা করবেন,  
এবং যাকে ইচ্ছা শান্তি দেবেন,  
আর আল্লাহর প্রভুত্ব রয়েছে  
আকাশসমূহে ও যমীনে এবং  
এতদুভয়ের মধ্যস্থিত  
সবকিছুতেও; আর সবকে  
আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন  
করতে হবে।

إِنَّ أَرَادَ أَنْ يَهْلِكَ الْمَسِيحَ  
ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّهُ وَمَنِ فِي  
الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  
بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

١٨- وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى  
نَحْنُ أَنَا مَلَكُ الْأَرْضِ وَلَا  
فِيمَا يَعْذِبُكُمْ بِذِنْبِكُمْ بِلْ  
أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ خَلْقِي فَغَفِرْ  
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَعْذِبُ مَنْ  
يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْيَمِينُ  
الْمُصِيرُ

আল্লাহ তা'আলা খ্রীষ্টানদের কুফরের কথা বর্ণনা করছেন যে, তারা আল্লাহরই সৃষ্টিকে তাঁরই মর্যাদা প্রদান করছে। অথচ আল্লাহ শিরক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। সমস্ত বস্তুই তাঁর অনুগত এবং প্রত্যেক বস্তুর উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। সবকিছুরই উপরই তাঁর আধিপত্য রয়েছে। এমন কেউ নেই যে তাঁকে তাঁর ইচ্ছে থেকে বিরত রাখতে পারে। যদি তিনি মাসীহ (আঃ)-কে, তাঁর মাকে এবং ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত সৃষ্টজীবকে ধ্রংস করে দেয়ার ইচ্ছা করেন তবুও কারও শক্তি নেই যে, তাঁর সামনে এগিয়ে আসে এবং তাঁকে বাধা প্রদান করে। সমস্ত প্রাণী ও সৃষ্টি বস্তুর উঙ্গাবক ও সৃষ্টিকর্তা তিনিই। সকলের মালিক ও অধিকর্তা তিনিই। তিনি যা চান তা-ই করেন। কোন জিনিসই তাঁর ক্ষমতার বাইরে নেই। কেউই তাঁর কাজের কোন হিসাব নিতে পারে না। তাঁর রাজত্ব ও সাম্রাজ্য খুবই প্রশংসন্ত। তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব খুবই উচ্চ। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, তিনি মহাকারিগর। তিনি যেভাবে চান সেভাবেই ভাঙ্গেন ও গড়েন। তাঁর শক্তির কোন সীমা নেই।

খ্রীষ্টানদের দাবী খণ্ডনের পর এখন ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান উভয়েরই দাবীকে খণ্ডন করছেন। তারা আল্লাহর উপর একটা মিথ্যা আরোপ এভাবে করেছে যে, তারা আল্লাহর পুত্র (নাউয়ুবিল্লাহি মিন যালিকা) ও প্রিয় পাত্র। তারা নবীদের পুত্র এবং আল্লাহর আদরের সন্তান। তারা নিজেদের কিতাব থেকে নকল করে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা ইসরাইল (আঃ)-কে বলেছিলেনঃ اَنْتُ اِبْرِيْ بَكْرِيْ অতঃপর তারা এর ভুল ব্যাখ্যা করে ভাবার্থ বদলিয়ে দিয়ে বলে-তিনি যখন আল্লাহর পুত্র হলেন তখন আমরাও তাঁর পুত্র ও প্রিয়পাত্র হলাম। অথচ তাদেরই মধ্যে যারা ছিল জ্ঞানী ও বিবেচক তারাও তাদেরকে বুঝিয়ে বলেছিল যে, এ শব্দগুলো দ্বারা হ্যরত ইসরাইল (আঃ)-এর শুধু মর্যাদা ও সম্মানই প্রমাণিত হচ্ছে মাত্র। এর দ্বারা তাঁর আল্লাহর সাথে আল্লায়তার বা রক্তের সম্পর্ক কোনক্রমেই প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ অর্থেরই আয়ত খ্রীষ্টানের নিজেদের কিতাব থেকে নকল করেছিল যে, হ্যরত ইসা (আঃ) বলেছিলেনঃ اِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى اِبْرِيْ وَ اِبِيْكُمْ، يَعْنِي رَبِّيْ وَ رِبِّكُمْ এর দ্বারাও প্রকৃত পিতাকে বুঝায় না, বরং তাদের পরিভাষায় আল্লাহর জন্যেও একুপ শব্দ ব্যবহৃত হতো। অতএব, এর ভাবার্থ হবে-আমি আমার ও তোমাদের প্রভুর নিকট যাচ্ছি। আর এর দ্বারা এটা ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, এখানে এ আয়াতে যে সম্পর্ক হ্যরত ইসা (আঃ)-এর রয়েছে ঐ সম্পর্কই তাঁর সমস্ত উন্নতের দিকেও রয়েছে। কিন্তু এ

লোকগুলো নিজেদের ভুল আকীদায় আল্লাহর সাথে হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর যে সম্পর্ক স্থাপন করতো, নিজেদের ব্যাপারে তা মনে করতো না। সুতরাং এ শব্দ শুধুমাত্র সম্মান ও মর্যাদার জন্যেই ছিল, অন্য কিছুর জন্যে ছিল না।

আল্লাহ পাক তাদেরকে উত্তর দিচ্ছেন-যদি এটা ঠিকই হয় তবে তোমাদের কুফর ও মিথ্যা আরোপের কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন কেন? কোন একজন সুফী একজন ফিকাহশাস্ত্রবিদকে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘কুরআন মাজীদের মধ্যে কোন জায়গায় এটাও কি আছে যে, বন্ধু স্বীয় বন্ধুকে শাস্তি দেন না?’ তিনি এর কোন উত্তর দিতে সম্ভব হলেন না। সুফী তখন এ আয়াতটিই পাঠ করলেন। এই উক্তিটি খুবই উত্তম। আর এরই দলীল হচ্ছে মুসনাদের এ হাদীসটি যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে সাথে নিয়ে পথ চলছিলেন। একটি ছোট ছেলে পথে খেলা করছিল। তার মা যখন দেখলো যে, একটি বিরাট দল গ্রি পথ দিয়েই আসছেন তখন সে ভয় পেয়ে গেল যে, না জানি তাঁরা তার ছেলেকে পদতলে পিষ্ট করে ফেলবেন। তাই সে “আমার ছেলে আমার ছেলে” বলতে বলতে দৌড়িয়ে আসলো এবং অতি তাড়াতাড়ি তার ছেলেকে কোলে উঠিয়ে নিলো। এই দেখে সাহাবীগণ বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ মহিলাটি তো তার প্রিয় ছেলেটিকে কখনও আগনে নিষ্কেপ করতে পারে না!” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “ঠিক কথাই বটে। আল্লাহ তা‘আলা ও কখনও তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবেন না।”

ইয়াহুদীদের কথার উত্তরে আল্লাহ তা‘আলা বলছেনঃ অন্যান্য মানুষের মত তোমারও মানুষই বটে। অন্যান্য লোকদের উপর তোমাদের কোনই প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপর মহা বিচারক এবং তিনিই হচ্ছেন তাদের মধ্যে সঠিক ফায়সালাকারী; তিনি যাকে ইচ্ছা মার্জনা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। তাঁর কোন হৃকুমকেই কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। তিনি সত্ত্বরই বান্দাদের কৃতকর্মের হিসাব গ্রহণকারী। যমীন, আসমান এবং এতদুভয়ের সমুদয় মখলুক তাঁরই অধিকারে রয়েছে। সবকিছুরই প্রভু তিনিই। সমস্তই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনিই বান্দাদের ফায়সালা করবেন। তিনি অত্যাচারী নন, তিনি ন্যায় বিচারক। তিনি পুণ্যবানদেরকে শাস্তি এবং অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। নো’মান ইবনে আ’সা, বাহর ইবনে উমার, শাস ইবনে আদী প্রমুখ ইয়াহুদীদের বড় বড় আলেমগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। তিনি তাদেরকে অনেক বুঝালেন। শেষ পর্যন্ত

তাদেরকে শান্তির ভয় দেখালেন। তখন তারা বললো, ‘‘জনাব! আপনি আমাদেরকে কিসের ভয় দেখাচ্ছেন? আমরা তো আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র।’’ খ্রীষ্টানেরাও এ কথা বলতো, তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তারা পরম্পরের মধ্যে বানিয়ে সানিয়ে এ কথাটিও ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, আল্লাহ তা‘আলা হয়রত ইসরাইল (আঃ)-এর নিকট প্রত্যাদেশ করেছিলেন-তোমার প্রথম পুত্রটি আমার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। তার সন্তানরা চল্লিশদিন পর্যন্ত জাহানামে থাকবে। এ সময়ের মধ্যে আগুন তাদেরকে পবিত্র করে দেবে এবং তাদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেবে। তারপর একজন ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলবেনঃ ‘‘ইসরাইল (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে যারই খৎনা করা আছে সে যেন বেরিয়ে আসে।’’ কুরআন কারীমে তাদের যে উক্তিটি বর্ণিত আছে তার অর্থ এটাই যে, তারা বলেঃ ‘‘আমাদেরকে গণনাকৃত কয়েকটি দিন মাত্র জাহানামে থাকতে হবে।’’<sup>১</sup>

## ১৯। হে আহলে কিতাবগণ!

তোমাদের নিকট আমার রাসূল (মুহাম্মদ সঃ) এসে পৌছেছে, যে তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে (আল্লাহর হৃকুম) বলে দিচ্ছে, যে সময় রাসূলদের আগমনের সূত্র (দীর্ঘকাল) বঙ্গ ছিল, যেন তোমরা (কিয়ামতের দিন) একুপ বলে না বস যে আমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেনি; (এখন তো) তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এসে গেছে, আর আল্লাহ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

١٩- يَاهْلُ الْكِتَبِ قَدْ جَاءَكُمْ  
رَسُولُنَا يَبْيَنُ لَكُمْ عَلَىٰ  
فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُولِ إِنَّ  
تَوْلُوا مَاجَأَنَا مِنْ  
بِشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ  
جَاءَكُمْ بِشِيرٍ وَنَذِيرٍ وَاللَّهُ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) ও ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুন্দী ও নাসারাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ আমি তোমাদের সকলের নিকট স্বীয় রাসূল (সঃ) পাঠিয়েছি, যে শেষ নবী, যার পরে আর কোন নবী বা রাসূল আসবে না। দেখো, হয়রত ঈসা (আঃ) থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন রাসূলের আগমন ঘটেনি। এ সুনির্দিষ্ট সময়ের পরে এ নবী আগমন করেছে। কেউ কেউ বলেন যে, এ দীর্ঘ সময় ছিল ছ'শ বছর। কারও কারও মতে ওটা ছিল সাড়ে পাঁচশ বছর। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তা ছিল পাঁচশ চালিশ বছর। অন্য কারও মতে তা ছিল চারশ বছর এবং আরও ত্রিশ বছরের কিছু বেশী। ইবনে আসাকির (রঃ) শা'বী (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ “হয়রত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া এবং আমাদের নবী (সঃ)-এর মদীনায় হিজরত করার মাঝে ১৩৩ বছরের ব্যবধান ছিল।” কিন্তু সঠিক উক্তি হচ্ছে প্রথমটিই অর্থাৎ ছ'শ ত্রিশ বছর। এ দু'টি উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করা যেতে পারে যে, প্রথম উক্তি সূর্য মাস হিসেবে এবং দ্বিতীয় উক্তি চান্দ্র মাস হিসেবে। এ গণনায় প্রতি তিনশ বছরে আট বছরের ব্যবধান হয়ে যাবে। এ জন্যেই আহলে কাহাফের ঘটনায় রয়েছে-

وَلِبِشْوَافِيْ كَهْ فِهِمْ ثَلَاثٌ مائَةٌ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا

অর্থাৎ “তারা তাদের গুহায় তিনশ বছর অবস্থান করে এবং আরও নয় বছর বাড়িয়ে দেয়।” (১৮ঃ ২৫) সুতরাং সূর্য হিসেবে তাদের গর্তে অবস্থানের সময়কাল আহলে কিতাবের যা জানা ছিল তা ছিল তিনশ বছর। তার সাথে ন'বছর বাড়িয়ে দিয়ে চন্দ্র হিসেবে পূর্ণ হয়ে গেল। এ আয়াতের দ্বারা জানা গেল যে, বানী ইসরাইলের শেষ নবী হয়রত ঈসা (আঃ) হতে নিয়ে সাধারণভাবে বানী আদমের শেষ নবী হয়রত মুহাম্মাদ (সঃ) পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবী আসেননি। সহীহ বুখারী শরাফতে হয়রত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুন্নাহ (সঃ) বলেছেনঃ “অন্যান্য লোকদের তুলানায় ঈসা (আঃ)-এর সাথে আমার সম্পর্ক বেশী রয়েছে। কেননা, আমার ও তাঁর মাঝে কোন নবী নেই।” ঐ হাদীস দ্বারা এসব লোকের ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে যারা মনে করে যে, এ দুই মর্যাদা সম্পন্ন নবীর মাঝে আরও একজন নবী ছিলেন। যার নাম খালিদ ইবনে সিনান। যেমন কায়াঙ্গ প্রমুখ লোক বর্ণনা করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, শেষ নবী আল্লাহর হাবীব হয়রত মুহাম্মাদ (সঃ) দুনিয়ার বুকে ঐ সময় আগমন করেছেন যে সময় রাসূলগণের শিক্ষা লোপ পেয়েছিল, তাঁদের পথ নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছিল, দুনিয়া তাওহীদ বা একত্বাদকে ভুলে গিয়েছিল, স্থানে স্থানে মাখলুকের পূজা শুরু হয়েছিল, সূর্য, চন্দ্র ও

মুর্তিপূজা চলছিল, আল্লাহর দ্বীন বদলে গিয়েছিল, দ্বীনের আলোর উপর কুফরীর অঙ্ককার ছেয়ে গিয়েছিল, দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল, আদল ও ইনসাফ এমনকি মনুষ্যত্ব পর্যন্ত দুনিয়া হতে মুছে গিয়েছিল, মূর্খতা ও অজ্ঞতার শাসন চালু হয়েছিল এবং মুষ্টিমেয় কতক লোক ছাড়া ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর নাম উচ্চারণকারী কেউ ছিল না। অতএব জানা গেল যে, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর মর্যাদা ও সমান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত বেশী ছিল এবং তিনি যে প্রেরিতত্ত্বের কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন তা কোন সাধারণ প্রেরিতত্ত্ব ছিল না।

মুসনাদে আহমাদে হ্যরত আইয়ায় ইবনে হাম্মাদুল মাজেশেই (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) একদা খুৎবায় বলেনঃ আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যা জান না তা আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দেই। আল্লাহ আমাকে আজই জানিয়ে দিয়েছেন-আমি আমার বান্দাদেরকে যা কিছু দান করেছি তার সবই তাদের জন্যে হালাল করেছি। আমি আমার সকল বান্দাকেই একত্ববাদীরূপে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তান তাদের কাছে এসে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে এবং আমার হালালকৃত বস্তু তাদের উপর হারাম করে দেয়। আর সে তাদেরকে বলে যে, তারা যেন কোন দলীল না থাকা সত্ত্বেও আমার সাথে অংশীদার স্থাপন করে। জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীবাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন এবং সমস্ত আরব ও আজমকে অপছন্দ করেছেন, শুধু বানী ইসরাইলের কতক লোককে নয় যারা তাওহীদ বা একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারপর তিনি আমাকে বলেছেনঃ আমি তোমাকে এজনেই নবী করে প্রেরণ করেছি যে, তোমাকে পরীক্ষা করবো এবং তোমারই কারণে অন্যদেরকেও পরীক্ষা করে নেবো। আমি তোমার উপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাকে পানিতে ধূয়ে ফেলতে পারবে না, যাকে তুমি ঘুমস্ত ও জাগ্রত সর্বাবস্থায় পাঠ করে থাক। অতঃপর আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন কুরাইশদের মধ্যে আল্লাহর পঞ্জাম পৌছিয়ে দেই। আমি তখন বললাম-হে আল্লাহ! এরা তো আমার মাথায় আঘাত করে ঝুঁটির মত করে দেবে। তখন আমার প্রভু আমাকে বলেনঃ তুমি তাদেরকে বের করে দাও যেমন তারা তোমাকে বের করে দিয়েছে। তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তোমাকে সাহায্য করা হবে। তুমি তাদের উপর খরচ কর, তোমার উপরও খরচ করা হবে। তুমি তাদের মোকাবিলায় সেনাবাহিনী প্রেরণ কর, আমি তার উপর আরও পাঁচগুণ সৈন্য প্রেরণ করবো। তুমি অনুগতদেরকে নিয়ে অবাধ্যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

জান্নাতী লোক তিনি প্রকারের। (১) ন্যায়পরায়ণ, সৎ ব্যবহাকারী ও দান খরয়রাতকারী বাদশাহ। (২) দয়ালু ব্যক্তি, যিনি প্রত্যেক আত্মীয় ও মুসলমানের সাথে বিনয় ও ন্যূন ব্যবহার করে থাকেন। (৩) ঐ ব্যক্তি, যিনি দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও হারাম থেকে বেঁচে থাকেন, অথচ তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে রয়েছে। আর জাহান্নামী লোক পাঁচ প্রকারের। (১) ঐ দুর্বল ও নিম্ন শ্রেণীর লোক, যার কোন ধর্ম নেই। সে অধীনস্থ লোক এবং তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও মালধন নেই। (২) ঐ খিয়ানতকারী ব্যক্তি, যার দাঁত ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিসের উপরও লেগে থাকে এবং সে অতি তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসের প্রতি খিয়ানত করতেও ছাড়ে না। (৩) এসব লোক, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় জনগণকে তাদের পরিবার ও মালধনে ধোঁকা দিয়ে থাকে। (৪) কৃপণ অথবা (বর্ণনাকরীর সন্দেহ) মিথ্যাবাদী। (৫) অকথ্য ভাষা প্রয়োগকারী। এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাইতেও রয়েছে। এটা বলার উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রেরণের সময় ভূ-পৃষ্ঠে কোন সত্য ধর্ম বিদ্যমান ছিল না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর মাধ্যমে মানুষকে অঙ্ককার ও ভ্রান্ত পথ থেকে বের করে আলো ও হিদায়াতের পথে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথে এনে দাঁড় করিয়ে দেন। তাদেরকে তিনি উজ্জ্বল ও স্পষ্ট শরীয়ত দান করেন, যাতে তাদের ওয়র পেশ করার কোন অবকাশ না থাকে এবং তারা একথা বলার সুযোগ না পায় যে, তাদের কাছে কোন নবী-রাসূল আগমন করেননি এবং তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেননি ও জাহান্নাম হতে ভয় প্রদর্শন করেননি। সুতরাং ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ স্বীয় মনোনীত নবী (সঃ)-কে সারা বিশ্বের হিদায়াতের জন্যে প্রেরণ করেন। আমাদের মহান প্রভু তাঁর বাধ্য ও অনুগত বান্দাদেরকে জান্নাতী শান্তি প্রদানে এবং অবাধ্য বান্দাদেরকে জাহান্নামের শান্তি প্রদানে পূর্ণভাবে সক্ষম।

## ২০। আর যখন মূসা (আঃ) স্বীয়

সম্প্রদায়কে বললো- হে  
আমার সম্প্রদায়! তোমাদের  
প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে  
স্মরণ কর, যখন তিনি  
তোমাদের মধ্যে বহু নবী সৃষ্টি  
করলেন, এবং তোমাদেরকে  
এমন বস্তুসমূহ দান করলেন  
যা বিশ্ববাসীদের মধ্যে  
কাউকেও দান করেননি।

٢- وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ  
يَقُولُونَ إِذْ كُرِّوا نِعْمَةَ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَنْبِيَاءً  
وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَاتَّكَمْ مَا  
لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعِلْمِينَ ○

২১। হে আমার সম্প্রদায়! এ পুণ্য ভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন, আর পিছনের দিকে ফিরে যেয়ো না, তাহলে তোমরা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২২। তারা বললো—হে মূসা (আঃ)! সেখানে তো পরাক্রমশালী লোক রয়েছে; অতএব, তারা যে পর্যন্ত সেখান হতে বের হয়ে না যায় সে পর্যন্ত আমরা সেখানে কখনও প্রবেশ করবো না। হ্যাঁ যদি তারা সেখান হতে বেরিয়ে যায় তবে নিচয়ই আমরা যেতে প্রস্তুত আছি।

২৩। সেই দু'ব্যক্তি, যারা (আল্লাহকে) ভয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল (এবং) যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, বললো—তোমরা তাদের উপর (আক্রমণ চালিয়ে নগরের) দ্বারদেশ পর্যন্ত যাও, অনন্তর যখনই তোমরা দ্বারদেশে পা রাখবে তখনই জয় লাভ করবে; এবং তোমরা আল্লাহর উপরই নির্ভর কর, যদি তোমরা মুমিন হও।

٢١- يَقُولُوْمَ ادْخُلُوا الْأَرْضَ  
الْمَقْدِسَةَ التِّي كَتَبَ اللَّهُ  
لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى  
أَدْبَارِكُمْ فَتَنَقِلُّبُوا خِسْرِينَ  
٢٢- قَالُوا يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا  
قَوْمًا جَبَارٍ يَنْ وَانَّا  
لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا  
مِنْهَا فَإِنَّ يَخْرُجُوا مِنْهَا  
فَإِنَا دَخْلُونَ  
٢٣- قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ  
يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا  
ادْخُلُوا عَلَيْهِمِ الْبَابَ فَإِذَا  
دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِيبُونَ  
وَعَلَى اللَّهِ فَتُوكِلُوا إِنْ كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ

২৪। তারা বললো- হে মুসা !  
নিশ্চয়ই আমরা কখনও  
সেখানে পা রাখবো না যে  
পর্যন্ত তারা সেখানে বিদ্যমান  
থাকে, অতএব, আপনি ও  
আপনার প্রভু (আল্লাহ) চলে  
যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন,  
আমরা এখানেই বসে  
থাকবো ।

২৫। মুসা বললো-হে আমার  
প্রভু! আমি শুধু নিজের উপর  
ও নিজের ভাই-এর উপর  
অধিকার রাখি, সূতরাং আপনি  
আমাদের উভয়ের এবং এ  
অবাধ্য সম্পদায়ের মধ্যে  
মীমাংসা করে দিন ।

২৬। তিনি (আল্লাহ) বললেন-  
(তা হলে মীমাংসা এই যে) এ  
দেশ চাঞ্চিল বছর পর্যন্ত এদের  
হস্তগত হবে না, এরপেই  
তারা ভূ-পৃষ্ঠে মাথা কোটে  
কিরতে থাকবে; সূতরাং তুমি  
এ অবাধ্য সম্পদায়ের জন্যে  
(একটুও) বিষণ্ণ হয়ো না ।

٢٤- قَالُوا يَمْوَسِي إِنَّا  
لَن نَدْخُلَهَا أَبْدَامًا دَمْوَانَ  
فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرِيكَ  
فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قِعْدُونَ ۝

٢٥- قَالَ رَبِّنِي لَا أَمْلِكُ إِلَّا  
نَفْسِي وَآخِرُ فَافْرَقْ بَيْنَنَا  
وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَسِيقِينَ ۝

٢٦- قَالَ فَإِنَّهَا مُحْرَمةٌ عَلَيْهِمْ  
أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيمُونَ فِي  
الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ  
الْفَسِيقِينَ ۝

হ্যরত মুসা (আঃ) স্বীয় সম্পদায়কে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে  
দিয়ে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। এরই বর্ণনা  
দেয়া হচ্ছে যে, হ্যরত মুসা (আঃ) স্বীয় সম্পদায়কে সংশোধন করে বললেনঃ “হে  
আমার সম্পদায়! তোমরা আল্লাহর ঐ নিয়ামতের একথা স্মরণ কর যে, তিনি  
তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই মধ্য হতে একের পর এক নবী পাঠাতে রয়েছেন।  
হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পর হতে আজ পর্যন্ত তাঁরই বংশধরের মধ্যে  
নবুওয়াত রয়েছে। এসব নবী তোমাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে রয়েছেন।

এ ক্রমপরম্পরা হয়েরত ইসা (আঃ)-এর উপর শেষ হয়েছে। অতঃপর নবী ও রাসূলদের নেতা হয়েরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে পরিপূর্ণ নবুওয়াত দান করা হয়। তিনি হয়েরত ইসমাইল (আঃ)-এর মাধ্যমে হয়েরত ইব্ৰাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনিই ছিলেন সমস্ত নবী ও রাসূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাঁর উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন। হে আমার কওম! তোমরা আরও স্মরণ কর যে, মহান আল্লাহ তোমাদেরকে বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছেন। হয়েরত ইবনে আবুবাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে বাদশাহ বানিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাদেরকে খাদেম, স্তৰী এবং ঘরবাড়ী দান করেছেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, বানী ইসরাইলের মধ্যে কোন লোকের স্তৰী, খাদেম ও ঘরবাড়ী থাকলেই তাকে বাদশাহ বলা হতো। ইবনে জারীর (রাঃ) হয়েরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে একটি লোক জিজ্ঞেস করেনঃ “আমি কি মুহাজির দরিদ্রদের অন্তর্ভুক্ত নই।” তিনি (আবদুল্লাহ) উত্তরে বলেনঃ “তোমার কি স্তৰী রয়েছে?” তিনি বলেনঃ ‘হ্যাঁ’। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “তোমার কি ঘরবাড়ী রয়েছে?” তিনি উত্তরে বললেনঃ ‘হ্যাঁ’; তখন হয়েরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ “তাহলে তো তুমি ধনীদেরই অন্তর্ভুক্ত।” লোকটি তখন বললেনঃ “আমার খাদেমও রয়েছে।” এ কথা শুনে হয়েরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেনঃ “তুমি তাহলে বাদশাহদেরই অন্তর্ভুক্ত।” হয়েরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন যে, যার সওয়ারী, খাদেম ও ঘরবাড়ী রয়েছে সেই বাদশাহ। কাতাদার (রঃ) উক্তি এই যে, প্রথম প্রথম বানী ইসরাইলের মধ্যেই খাদেমদের প্রচলন হয়েছিল। একটি মারফু’ হাদীসে রয়েছে যে, তাদের মধ্যে যার কাছে খাদেম, সওয়ারী ও স্তৰী থাকতো তাকেই বাদশাহ বলা হতো। আর একটি মারফু’ হাদীসে আছে যে, যার ঘরবাড়ী ও খাদেম রয়েছে সে বাদশাহ। এ হাদীসটি ‘মুরসাল’ ও ‘গারীব’। একটি হাদীসে আছে— “যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় সকাল করলো যে, তার শরীর সুস্থ, তার প্রাণে শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে এবং সারাদিনের জন্যে যথেষ্ট হয় এ পরিমাণ খাবারও তার কাছে রয়েছে, সে যেন সারা দুনিয়াকেই পেয়ে বসেছে।” সেই সময় যে ইউনানী, কিবর্তী ইত্যাদি ছিল তাদের চেয়ে এদেরকে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর আয়াতে রয়েছে— আমি বানী ইসরাইলকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে সারা বিশ্বের উপর মর্যাদা

দিয়েছিলাম। যখন বানী ইসরাইল মুশরিকদের দেখাদেখি হয়রত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ বানাতে বললো তখন হয়রত মূসা (আঃ) তাদেরকে উভরে বলেছিলেনঃ ‘তিনি তোমাদেরকে সারা বিশ্বের উপর মর্যাদা দান করেছেন।’ এর ভাবার্থ সব জায়গায় একই যে, আল্লাহ পাক বানী ইসরাইলকে সেই যুগের সমস্ত মানুষের উপর ফয়লত দান করেছিলেন। কেননা, এটাতো প্রমাণিত বিষয় যে, উপরে মুহাম্মাদী তাদের অপেক্ষা সবদিক দিয়েই উত্তম। কেননা, স্বয়ং কুরআন কারীমে ঘোষণা করা হচ্ছে- *وَكُنْتُمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ* (৩: ১১০) এবং অন্য জায়গায় বলা হয়েছে- *وَجَعَلْنَا كَمْ أَمَةً وَسَطَا* (২: ১২৪)

একথাও বলা হয়েছে যে, এ ফয়লতে উপরে মুহাম্মাদীকেও বানী ইসরাইলদের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন ‘মান’ ও ‘সালওয়া’ নামক খাদ্য অবতরণ করা, মেঘ দ্বারা ছায়া দান করা ইত্যাদি, যা ছিল সত্যিই অস্বাভাবিক ব্যাপার। তবে অধিকাংশ মুফাস্সিরের উক্তি ওটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে- তাদেরকে সেই সময়ের লোকদের উপর ফয়লত দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তাদের দাদা হয়রত ইয়াকুব (আঃ)- এর যুগে বায়তুল মুকাদ্দাস প্রকৃতপক্ষে তাদেরই দখলে ছিল এবং যখন তারা সপরিবারে মিসরে হয়রত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট চলে গিয়েছিল তখন তথায় আমালেকা জাতি তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তাদের হাত পা ছিল অত্যন্ত শক্ত। তখন হয়রত মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ ‘তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করবেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরায় তোমাদের দখলে এনে দেবেন।’ কিন্তু বানী ইসরাইল ভীরুতা প্রদর্শন করতঃ হয়রত মূসা (আঃ)-এর কথা অমান্য করলো। এরই শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে ‘তীহ’ ময়দানে উদ্বিঘ্ন অবস্থায় অবস্থান করতে হলো। *أَرْضٌ مَقْدَسَةٌ* শব্দের অর্থ হচ্ছে পবিত্র। ইবনে আবুবাস (রাঃ) বলেন যে, *أَرْضٌ مَقْدَسَةٌ* দ্বারা তূর পর্বত ও ওর চার পাশের ভূমিকে বুবানো হয়েছে এবং ওটাকে ‘ইলিয়া’ বলা হয়। একটি বর্ণনায় *أَرْبَعَةِ* শব্দের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা, *أَرْبَعَةِ* কে জয় করা উদ্দেশ্যও ছিল না এবং ওটা তাদের পথের উপরেও ছিল না। কারণ, ফিরাউনের ধৰ্মস সাধনের পর তারা মিসর শহর থেকেই আসছিল এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের পথে ভ্রমণ করছিল। এটা হতে পারে যে, ওটা ঐ বিখ্যাত শহরই হবে যা তূর পর্বতের দিকে বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল।

‘যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন’-এর ভাবার্থ এই যে, বানী ইসরাইলকে বলা হচ্ছে- তোমাদের পূর্বপুরুষ হ্যরত ইসরাইল (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছিলেন যে, এই পুণ্যভূমি তিনি তাঁর পরবর্তী মুমিন সন্তানদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রদান করবেন। সুতরাং হে বানী ইসরাইল! তোমরা যখন ওটাকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছ তখন তোমরা ধর্মত্যাগী হয়ে যেয়ো না। অর্থাৎ জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসে পড়ো না, নতুন তোমরা ভীষণ ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবে।

তারা তখন উত্তরে হ্যরত মূসা (আঃ)-কে বললোঃ আপনি আমাদেরকে যে শহরে যেতে বলছেন এবং যে শহরবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন, সে সম্পর্কে আমাদের অভিমত এই যে, তারা যে খুব শক্তিশালী বীর পুরুষ তা আমাদের বেশ ভালভাবেই জানা আছে। সুতরাং আমরা তাদের সাথে মোকাবিলা করতে পারবো না। আর যে পর্যন্ত তারা এই শহরে বিদ্যমান থাকবে সে পর্যন্ত আমরা ওর মধ্যে প্রবেশ করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম থাকবো। তবে যদি তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে আমরা তথায় প্রবেশ করবো। এটা ছাড়া আপনার নির্দেশ পালন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন হ্যরত মূসা (আঃ) ‘আরীহা’র নিকটবর্তী হলেন তখন তিনি বারোজন গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন। বানী ইসরাইলের প্রত্যেক গোত্র থেকে তিনি একজন করে গুপ্তচর প্রাহ্ণ করলেন। অতঃপর সঠিক সংবাদ আনয়নের জন্যে তাদেরকে আরীহায় প্রেরণ করলেন। এ লোকগুলো তথায় গিয়ে তাদের মোটা দেহ ও শক্তি দেখে ভয় পেয়ে গেলো। তারা সবাই একটা বাগানে অবস্থান করছিল। ঘটনাক্রমে বাগানের মালিক ফল পাঢ়ার জন্যে তথায় আগমন করলো। সে ফল পেড়ে নিয়ে ফলের সাথে সাথে ঐগুলোকেও গাঁঠরিয়ে মধ্যে ভরে নিলো এবং বাদশাহৰ সামনে হাথির হয়ে ফলের গাঁঠরি খুলে ফেললো। গাঁঠরিয়ে মধ্যে এরা সবাই ছিল। বাদশাহ তাদেরকে বললেনঃ “এখন তো আমাদের শক্তি অনুমান করতে পেরেছো। আমি তোমাদেরকে হত্যা করছি না। যাও, তোমাদের লোকদের কাছে ফিরে আমাদের সম্পর্কে অবহিত কর।” সুতরাং তারা ফিরে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো, যার ফলে বানী ইসরাইল ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু এ হাদীসটির ইসনাদ ঠিক নয়।

আর একটি বর্ণনায় আছে যে, তাদের মধ্যে একটি লোক ঐ বারোজন লোককে ধরে ফেললো এবং স্বীয় চাদরের গাঁথরিতে তাদেরকে বেঁধে ফেললো এবং শহরে নিয়ে গিয়ে জনগণের সামনে তাদেরকে নিষ্কেপ করলো। তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলোঃ “তোমরা কোথাকার লোক?” তারা উভয়ে বললোঃ “আমরা হ্যরত মূসা (আঃ)-এর কওমের লোক। আপনাদের খবরাখবর নেয়ার জন্যে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে।” তারা এমন একটি আঙ্গুর তাদেরকে প্রদান করলো যা একটি লোকের জন্যে যথেষ্ট ছিল। আর তারা তাদেরকে বললোঃ “যাও, তোমরা তোমাদের লোকদেরকে বলে দাও যে, এটা হচ্ছে তাদের ফল।” তারা ফিরে গিয়ে স্বীয় কওমের নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো। তখন হ্যরত মূসা (আঃ) তাদেরকে ঐ শহরে প্রবেশ করার ও শহরবাসীদের সাথে জিহাদ করার নির্দেশ দিলেন। তারা তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিলো—আপনি ও আপনার প্রভু গমন করুন, অতঃপর যুদ্ধ করুন, আমরা এখান হতে নড়ছি না।

হ্যরত আনাস (রাঃ) একটি বাঁশ মেপে নেন যার দৈর্ঘ ছিল পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন হাত। অতঃপর তিনি ওটা গেড়ে দিয়ে বলেনঃ “ঐ আমালীকদের দেহ এ পরিমাণ লম্বা ছিল।” মুফাসসিরগণ অনেক ইসরাইলী রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যে, ঐ লোকগুলোর এ পরিমাণ শক্তি ছিল, তারা এ পরিমাণ মোটা ছিল এবং এতোটা লম্বা ছিল। আওজ ইবনে আনাক ইবনে হ্যরত আদম (আঃ) তাদেরই মধ্যে একজন ছিল যার দেহ ছিল তিন হাজার তিনশ তেক্রিশ গজ লম্বা এবং দেহের প্রস্থ ছিল তিন গজ। কিন্তু এসব একেবারেই বাজে কথা এবং এ কথা উল্লেখ করাই লজ্জাজনক ব্যাপার। এগুলো সহীহ হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হ্যরত আদম (আঃ)-কে ষাট হাত লম্বা করে সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর আজ পর্যন্ত মখলুকের দেহের দৈর্ঘ হ্রাস পেতে আছে। এই ইসরাইলী রিওয়ায়াতগুলোতে এও রয়েছে যে, আওজ ইবনে আনাক কাফির ও জারজ ছিল। সে হ্যরত নূহ (আঃ)-এর তুফানের সময় বিদ্যামান ছিল। সে নূহ (আঃ)-এর সাথে নৌকায় উঠেনি। তথাপি পানি তার জানু পর্যন্ত পৌছেনি। এটা ও একেবারে ভিত্তিহীন, বাজে ও মিথ্যা কথা। কুরআন কারীমের এটা সম্পূর্ণ উল্টো। কুরআন মাজীদে হ্যরত নূহ (আঃ)-এর প্রার্থনার উল্লেখ আছে। তিনি প্রার্থনায় বলেছিলেনঃ “হে আমার প্রভু! ভূ-পৃষ্ঠে একজন কাফিরও যেন রক্ষা না পায়।” প্রার্থনা কবৃলও হয়েছিল। আর হয়েছিলও তা-ই। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে— “আমি নূহ (আঃ)-কে এবং তার

নৌকার আরোহীদেরকে রক্ষা করেছিলাম এবং সমস্ত কাফিরকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।” স্বয়ং কুরআনে উল্লিখিত রয়েছে- “যাদের উপর আল্লাহর রহমত রয়েছে তারা ছাড়া আজকের দিন কেউই রক্ষা পাবে না।” বড়ই বিশ্বাসকর ব্যাপার যে, স্বয়ং নৃহ (আঃ)-এর ছেলেও ঈমানদার ছিল না বলে রক্ষা পায়নি, অথচ কাফির ও জারজ সন্তান আওজ ইবনে আনাক বেঁচে গেল। এটা আকল ও নাকল উভয়েই বিপরীত। বরং আওজ ইবনে আনাক বলে যে কোন লোক ছিল এটাই তো আমরা বিশ্বাস করি না। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

বানী ইসরাইল যখন তাদের নবীকে মানলো না বরং বেআদবী করলো, তখন যে দু'ব্যক্তির উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ছিল তাঁরা তাদেরকে বুঝাতে লাগলেন। তাঁদের অন্তরে অল্লাহর ভয় ছিল যে, বানী ইসরাইলের শয়তানীর কারণে না জানি আল্লাহর শান্তি এসে পড়ে। এক কিরআতে **يَخَافُونَ يَحْبَرُنَ** শব্দের পরিবর্তে **يَحْبَرُنَ** শব্দ রয়েছে, যার ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, কওমের মধ্যে ঐ দু'ব্যক্তির ইঞ্জত ও সম্মান ছিল। একজনের নাম ছিল হ্যরত ইউশা' ইবনে নূন এবং অপরজনের নাম ছিল হ্যরত কালিব ইবনে ইউফনা। তাঁরা দু'জন তাদেরকে বললেনঃ “যদি তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর, তাঁর রাসূলের অনুগত হও, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ঐ শক্রদের উপর জয়যুক্ত করবেন এবং স্বয়ং তিনি তোমাদেরকে শক্তি ও সাহায্য দান করবেন। তোমরা এই শহরে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করবে। তোমরা দরজা পর্যন্ত তো চল এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, বিজয় লাভ তোমাদেরই হবে।” ঐ কাপুরুষের দল তখন তাদের প্রথম উত্তরকে আরও মজবুত করে বললোঃ “এই প্রতাপশালী কওমের বিদ্যমানতায় আমরা একটি কদমও বাড়াতে পারবো না।” হ্যরত মূসা (আঃ) ও হ্যরত হারুন (আঃ) তাদের এই অবস্থা দেখে তাদেরকে অনেক বুঝালেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে বিনয়ও প্রকাশ করলেন। কিন্তু তারা কোনক্রমেই মানলো না। এই অবস্থা দেখে হ্যরত ইউশা এবং হ্যরত কালিব নিজেদের কাপড় ফেড়ে ফেললেন এবং তাদেরকে অনেক ভর্তসনা করলেন। কিন্তু সেই হতভাগার দল অবাধ্যতার উপর অটল থাকলো। এমনকি এটাও বলা হয়েছে যে, তারা ঐ মহান ব্যক্তিদ্বয়কে পাথর মেরে শহীদ করে দিয়েছিল। হঠকারিতার তুফান শুরু হয়ে গেল এবং তারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে অবিচল থাকলো।

হ্যরত মুসা (আঃ)-এর কওম বানী ইসরাইলের এই অবস্থাকে সামনে রেখে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবায়ে কিরামের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। মক্কার ৯০০ বা ১০০০ কাফির যখন তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গমন করলো, তখন সেই কাফেলা তো অন্য পথ ধরে মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে গেল, কিন্তু তাদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গমনকারী কাফিরোনি নিজেদের শক্তির দাপটের কারণে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ক্ষতি সাধন ব্যতিরেকে মক্কা ফিরে যাওয়া অপমানজনক মনে করে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে পদতলে পিষ্ট করার ইচ্ছায় মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলো। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন এই অবস্থা অবগত হলেন তখন তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সাহাবীদের নিকট পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে নিজেদের জান, মাল এবং স্ত্রী-ছেলে-মেয়েকে রেখে দিয়ে বললেনঃ “আপনিই এগুলোর মালিক। আমরা সংখ্যাও দেখতে চাই না, বিজয়ও দেখতে চাই না, বরং আমরা চাই শুধু আপনার নির্দেশের প্রতি নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে।” সর্বপ্রথম হ্যরত আবৃ বকর (রাঃ) এ ধরনের বক্তব্য পেশ করলেন। তারপর মুহাজির সাহাবীদের মধ্য থেকে কয়েকজন এ প্রকারের ভাষণ দিলেন। কিন্তু এর পরেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “হে মুসলমানগণ! আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন।” এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল আনসারদের আন্তরিক বাসনা অবগত হওয়া। কেননা, ওটা স্থান ছিল তাদেরই স্থান এবং তাঁরা ছিলেন মুহাজিরদের অপেক্ষা সংখ্যায় বেশী। তখন হ্যরত সাদ ইবনে মুআফ (রাঃ) নামক আনসারী দাঁড়িয়ে বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মনে হয় আপনি আমাদের (আনসারদের) মনের ইচ্ছা জানতে চাচ্ছেন। তাহলে শুনুন! যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! যদি আপনি আমাদেরকে সমুদ্রের তীরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তাহলে আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আপনি দেখবেন যে, আমাদের মধ্যে একজনও এমন থাকবে না যে সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে থাকবে। আপনি আগহের সাথে আমাদেরকে শক্তির মোকাবিলার জন্যে নিয়ে চলুন, আমরা যে যুদ্ধক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যের সাথে স্থির পদে টিকে থাকি তা আপনি দেখতে পাবেন। আপনি জেনে নেবেন যে, আমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে সত্য বলে জানি। আপনি আল্লাহর নাম নিয়ে উঠে পড়ুন। আমাদের বীরত্ব ও দৈর্ঘ্য দেখে ইনশাআল্লাহ আপনার চক্ষু ঠাণ্ডা হবে।” এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল

(সঃ) খুশী হয়ে যান এবং আনসারদের এই কথা তাঁর কাছে খুবই ভাল মনে হয় (আল্লাহর তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)। এক রিওয়ায়াতে আছে যে, বদরের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করেন। হ্যরত উমার (রাঃ) কিছু বক্তব্য পেশ করেন। তার পর আনসারগণ বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি আপনি আমাদের নিকট থেকে কিছু শুনতে চান তবে শুনুন! আমরা বানী ইসরাইলদের মত নই যে, বলবো- আপনি এবং আপনার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে থাকছি। বরং আমাদের উত্তর হচ্ছে- আপনি আল্লাহর সাহায্য নিয়ে জিহাদের জন্যে চলুন। আমরা আমাদের জান ও মালসহ আপনার সাথে রয়েছি।” হ্যরত মিকদাদ আনসারীও (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে এ কথাই বলেছিলেন। হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত মিকদাদ (রাঃ)-এর এই কথায় খুবই খুশী হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যুদ্ধের সময় আপনি দেখে নেবেন যে, আপনার সামনে, পিছনে, ডানে ও বামে আমরাই রয়েছি।” (হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন) “যদি আমি এমন সুযোগ পেতাম যাতে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে এ রকম সন্তুষ্ট করতে পারতাম (তবে কতই না ভাল হতো)।” একটি বর্ণনায় হ্যরত মিকদাদ (রাঃ)-এর এই উক্তিটি হৃদায়বিয়ার সন্ধির দিনে বর্ণিত আছে, যখন মুশরিকরা তাঁকে উমরার জন্যে বাযতুল্লাহর দিকে যাওয়ার পথে বাধা প্রদান করেছিল এবং কুরবানীর জন্মও যবেহ স্থলে পৌছতে পারেনি। সেই সময় তিনি বলেছিলেনঃ “আমি তো আমার কুরবানীর জন্ম নিয়ে বাযতুল্লাহ শরীফে পৌছে কুরবানী করতে চাই।” তখন হ্যরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) বলেনঃ আমরা হ্যরত মূসা (আঃ)-এর আসহাবের মত নই। এটা ওদের জন্যেই সম্ভব হয়েছে যে, ওরা ওদের নবীকে বলেছিল- “আপনি এবং আপনার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে রয়েছি।” বরং আমরা বলি- হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি চলুন, আপনার প্রতি আল্লাহর সাহায্য থাকবে এবং আমরা সবাই আপনার সাথে রয়েছি। এ কথা শুনে অন্যান্য সাহাবীগণও তাঁর কাছে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার ওয়াদা করতে শুরু করলেন। সুতরাং এই বর্ণনায় যদি হৃদায়বিয়ার কথাই উল্লেখ থাকে তবে হতে পারে যে, তিনি (মিকদাদ) বদরের দিনও এ কথা বলেছিলেন এবং হৃদায়বিয়ার দিনও এটা বলেছিলেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এ কথা শুনে হ্যরত মূসা (আঃ)-এর তাঁর উম্মতের উপর ভীষণ রাগ হয় এবং তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানান- “হে রাববুল আলামীন! আমার অধিকার তো শুধু নিজের উপর এবং ভাই-এর উপর রয়েছে। সুতরাং আপনি আমাদের উভয়ের এবং এ অবাধ্য সম্পদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন।” মহান আল্লাহ তাঁর এ প্রার্থনা কবৃল করলেন এবং বললেনঃ এরা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এখান থেকে যেতে পারবে না। তারা ‘তীহ’ ময়দানে উদ্ভাস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। কোনক্রমেই তারা এর সীমানার বাইরে যেতে পারবে না। এখানে তারা কতগুলো বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক বিষয় অবলোকন করলো। যেমন তাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া দান করণ, ‘মান’ ও ‘সালওয়া’ অবতরণ, তাদের কাছে বিদ্যমান একটি পাথর হতে পানি বের হওয়া ইত্যাদি। হ্যরত মূসা (আঃ) ঐ পাথরকে লাঠি দ্বারা আঘাত করা মাত্রই ওর মধ্য হতে বারোটি প্রস্তবণ বেরিয়ে পড়লো। প্রত্যেক গোত্রের দিকে একটি করে ঝরণা বয়ে যেতে লাগলো। এ ছাড়াও বানী ইসরাইল তথায় আরও মুজিয়া দেখলো। এখানে তাওরাত অবতীর্ণ হলো, আল্লাহর আহকাম নাযিল হলো ইত্যাদি। চল্লিশ বছর পর্যন্ত তারা উদ্বিঘ্নভাবে ঐ ময়দানেই ঘুরাফেরা করলো এবং সেখান থেকে বের হবার কোন পথ পেলো না। হ্যাঁ, তবে তাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া করা হয়েছিল এবং ‘মান’ ও ‘সালওয়া’ তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। ফুনুনের লম্বা চওড়া হাদীসে হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) হতে এসব বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর হ্যরত হারনের মৃত্যু হয় এবং তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পর কালীমুল্লাহ হ্যরত মূসা (আঃ) ইন্তেকাল করেন। তারপর তাঁর খলীফা হ্যরত ইউশা ইবনে নূন (আঃ)-কে নবী করা হয়। এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু বানী ইসরাইলের মৃত্যু ঘটে। এমনকি বলা হয় যে, শুধুমাত্র হ্যরত ইউশা (আঃ) ও কালিব (আঃ) অবশিষ্ট থাকেন।

কোন কোন মুফাসসির ‘সানাতান’ শব্দের উপর পূর্ণভাবে **وَقْفُ** করেন এবং আরবায়ীনা সানাতান শব্দ দু'টিকে **نَصْبٌ**-**عَالِمٌ** এর অবস্থা মেনে থাকেন এবং বলেন যে, এর হচ্ছে ইয়াতীহনা ফিল আরয়ে শব্দগুলো। এ চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে কয়জন বানী ইসরাইল অবশিষ্ট ছিল তাদেরকে নিয়ে হ্যরত ইউশা (আঃ) বেরিয়ে পড়েন। অন্যান্য পাহাড় থেকেও বাকী বানী ইসরাইল তাঁর সাথী হয়ে যায়। হ্যতর ইউশা (আঃ) বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেন। জুমআর দিন আসরের পরে যখন বিজয়ের সময় উপস্থিত হয় তখন শক্রদের পাঞ্জলো অচল হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে সূর্য অন্ত যাওয়ার উপক্রম হয়। জুমআর দিনের মর্যাদার কারণে সে যুগে সূর্য ডুবে যাওয়ার পরে সেই দিন

আর যুদ্ধ করা চলতো না । এ জন্যে আল্লাহর নবী (হ্যরত ইউশা) বললেনঃ ‘হে সূর্য! তুমি তো আল্লাহরই দাস । আর আমি তাঁরই অধীনস্থ বান্দা । হে আল্লাহ একে আরও কিছুক্ষণ আটকিয়ে রাখুন ।’ সুতরাং আল্লাহর নির্দেশক্রমে সূর্য থেমে গেল এবং তিনি মনমত যুদ্ধ করে বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করে নিলেন । আল্লাহ পাকের নির্দেশ হলোঃ বানী ইসরাইলকে বলে দাও যে, তারা যেন সিজদা করা অবস্থায় এ শহরের দরজায় প্রবেশ করে এবং **حَطَّ** (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের পাপ মার্জনা করুন!) বলে । কিন্তু তারা আল্লাহর এ হৃকুমকে বদলিয়ে দিলো এবং হামাগুড়ি দিয়ে চললো, আর মুখে **حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ** এ শব্দগুলো উচ্চারণ করতে থাকলো । বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা বাকারায় করা হয়েছে । অপর এক বর্ণনায় এটুকু বেশী রয়েছে যে, বানী ইসরাইল এ যুদ্ধে এতো বেশী গন্মতের মাল লাভ করেছিল যা তারা ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি । আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশানুযায়ী ওগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্যে আগুনের পার্শ্বে নিয়ে যাওয়া হলো । কিন্তু ওগুলো আগুনে পুড়লো না । তখন হ্যরত ইউশা (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ “তোমাদের মধ্যে কেউ অবশ্যই এ মাল থেকে কিছু চুরি করেছে । সুতরাং তোমাদের প্রত্যেক গোত্রের নেতা যেন আমার নিকট এসে আমার হাতে হাত রাখে ।” তাই করা হলো । একটি গোত্রের নেতার হাত নবীর হাতের সাথে লেগে গেলো । নবী (ইউশা আঃ) বললেনঃ ‘এ খিয়ানতের জিনিস তোমার নিকট রয়েছে সুতরাং তুমি ওটা নিয়ে আসো ।’ সে সোনার তৈরী গরুর একটি মাথা নিয়ে আসলো যার চক্ষুগুলো ছিল ইয়াকুতের তৈরী এবং দাঁতগুলো ছিল মুক্তার তৈরী । অন্য মালের সাথে ওটিকেও যখন আগুনে নিষ্কেপ করা হলো তখন সমস্তই আগুনে পুড়ে গেল । ইমাম ইবনে জারীরও (রাঃ) এ উক্তিটি পছন্দ করেছেন ।

আরবাইনা সানাতান-এর **عَامِلٌ مَحْرَمَةٌ فِي أَنْهَا** শব্দগুলো । বানী ইসরাইলের এ দলটি চল্লিশ বছর পর্যন্ত ঐ তীহের ময়দানে উদ্বিগ্নভাবে ফিরতে থাকে । তারপর মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে তারা বেরিয়ে পড়ে এবং বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করে । পূর্ববর্তী ইয়াহুদী আলেমদের ইজমাই হচ্ছে এর দলীল যে, আউজ ইবনে আনাককে হ্যরত মূসাই (আঃ) হত্যা করেছিলেন । তাহলে যদি তার হত্যা আমালীকের এ যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা হতো তবে বানী ইসরাইলের আমলীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করার কোনই কারণ থাকতো না । সুতরাং বুঝা গেল যে, এটা হচ্ছে ‘তীহ’ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার পরবর্তী ঘটনা ।

ইয়াহুদী আলেমদের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, বালআ'ম ইবনে বাউর আমালীক সম্প্রদায়ের প্রতাপশালীদেরকে সাহায্য করেছিল এবং সে হ্যরত মুসা (আঃ)-এর উপর বদদু'আ করেছিল। এ ঘটনাটিও ঐ ময়দান থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে ঘটেছিল। কেননা, এর পূর্বে তো প্রতাপশালীদের হ্যরত মুসা (আঃ) ও তাঁর কওম হতে ভয়ই ছিল না। ইবনে জারীর (রঃ)-এর এটাই দলীল। তিনি এ কথাও বলেন যে, হ্যরত মুসা (আঃ)-এর লাঠি ছিল দশ হাত এবং তার দেহও ছিল দশ হাত। তিনি ভূমি হতে দশ হাত লাফিয়ে গিয়ে আউজ ইবনে আনাককে ঐ লাঠি দ্বারা মেরেছিলেন যা তার পায়ের গিটে লেগেছিল এবং তাতেই সে মারা গিয়েছিল। তার দেহ দ্বারা নীল নদের সাঁকো বানানো হয়েছিল যার উপর দিয়ে বহু বছর ধরে নীলবাসী যাতায়াত করতো। নাওফ বাককালী বলেন যে, তার সিংহাসনটি তিনশ গজের ছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেনঃ তুমি তোমার কওম বানী ইসরাইলের জন্যে কোন দুঃখ করো না। তারা ঐ জেলখানারই যোগ্য।

সুতরাং এ ঘটনায় ইয়াহুদীদেরকে ধর্মক দেয়া হয়েছে এবং এতে তাদের বিরুদ্ধাচরণের ও দুষ্টামির বর্ণনা রয়েছে যে, আল্লাহর এ শক্ররা বিপদের সময়ও তাঁর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকছে না। তারা রাসূলদের আনুগত্য স্বীকার করছে না ও আল্লাহর পথে জিহাদ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। যে সম্মানিত রাসূলের সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ কথা বলেছিলেন তাঁর বিদ্যমানতায় তাঁর অঙ্গীকার ও আদেশের কোনই গুরুত্ব দিচ্ছে না। দিন রাত তারা তাঁর মুজিয়া দেখতে রয়েছে এবং ফেরাউনের বিধ্বস্তি স্বচক্ষে দেখেছে, অথচ অন্ন দিনও অতিবাহিত হয়নি এবং স্বয়ং সম্মানিত নবী সঙ্গে রয়েছেন, তথাপি তারা ভীরুতা ও কাপুরুষতাই প্রদর্শন করছে। তারা আল্লাহর নবীর সাথে বে-আদবী করছে এবং স্পষ্টভাবে জবাব দিয়ে দিচ্ছে। তারা তো স্বচক্ষে দেখেছে যে, আল্লাহ তা'আলা ফিরাউনের ন্যায় সাজ-সরঞ্জামপূর্ণ বাদশাহকেও তার সাজ-সরঞ্জাম, লোক-লক্ষ্মণ ও প্রজাসহ ডুবিয়ে মেরেছেন! তথাপি তারা সেই আল্লাহর উপর ভরসা করে ঐ গ্রামবাসীর দিকে ধাবিত হচ্ছে না এবং তাঁর হৃকুম পালন করছে না। অথচ তারা তো ফিরাউনের দশ ভাগের একভাগও ছিল না! ফলে তারা আল্লাহর ক্রোধে পতিত হচ্ছে। পৃথিবীর বুকে তাদের কাপুরুষতা প্রকাশ পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তাদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আরও বৃদ্ধি পাবে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র বলে

মনে করলেও তা ছিল প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে তারা বেরিয়ে পড়েছিল। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রকার শাস্তিতে তারা পতিত হয়েছিল। তাদেরকে শূকর ও বানরে পরিণত করা হয়েছিল। এখানে তারা চিরস্থায়ী অভিশাপে পতিত হয়ে পারলৌকিক স্থায়ী শাস্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। অতএব, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে যাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলাই হচ্ছে সমস্ত কল্যাণের চাবিকাঠি।

২৭। [হে নবী (সঃ)!] তুমি  
তাদেরকে (আহলে  
কিতাবদেরকে) আদমের  
পুত্রদ্বয়ের (হাবীল ও  
কাবীলের) ঘটনা সঠিকভাবে  
পাঠ করে শুনিয়ে দাও; যখন  
তারা উভয়েই এক একটি  
কুরবানী উপস্থিত করলো এবং  
তন্মধ্য হতে একজনের  
(হাবীলের) তো কবূল হলো  
এবং অপরজনের কবূল হলো  
না; সেই অপরজন বলতে  
লাগলো— আমি তোমাকে  
নিশ্চয়ই হত্যা করবো; সেই  
প্রথম জন বললো— আল্লাহ  
মুক্তাকীদের আমলই কবূল  
করে থাকেন।

২৮। তুমি যদি আমাকে হত্যা  
করার জন্যে হস্ত প্রসারিত  
কর, তথাপি আমি তোমাকে  
হত্যা করার জন্যে তোমার  
দিকে কখনও আমার হাত  
বাড়াবো না; আমি তো  
বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি।

- ২৭ -  
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً أَبْنَى

أَدَمَ بِالْحِقِّ إِذْ قَرَبَا قُرْبَانًا

فَتَقْبَلَ مِنْ أَهْدِهِمَا

وَلَمْ يَتَقْبَلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ

لَا قَتَلْنَاكَ قَالَ إِنَّمَا

يَتَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ۝

- ২৮ -  
لِئِنْ بَسْطَتِ إِلَيَّ يَدَكَ

لِتَقْتَلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ

يَدِي إِلَيْكَ لَا قَاتِلَكَ

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ

الْعَلَمِينَ ۝

২৯। আমি চাই যে, (আমার দ্বারা কোন পাপ না হোক) তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ সমস্তই নিজের মাথায় উঠিয়ে নাও; অনঙ্গের তুমি জাহানামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, অত্যাচারীদের শাস্তি একপই হয়ে থাকে।

৩০। অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভাত্ত হত্যার প্রতি উত্তুন্দ করে তুললো, সুতরাং সে তাকে হত্যা করেই ফেললো, ফলে সে ক্ষতিঘন্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়লো।

৩১। অতঃপর আল্লাহ একটি কাক প্রেরণ করলেন, সে মাটি খুঁড়তে লাগলো, যেন সে তাকে (কাবীলকে) শিখিয়ে দেয় যে, স্বীয় ভাতার মৃতদেহ কিভাবে ঢাকবে, সে বলতে লাগলো—আমার অবস্থার প্রতি আফসোস! আমি কি ঐ কাকের সমতুল্য হতে এবং স্বীয় ভাতার মৃতদেহ ঢেকে ফেলতে অক্ষম হয়ে গেলাম! ফলে সে অত্যন্ত লজ্জিত হলো।

২৯- إِنِّي أَرِيدُ أَنْ تَبْوَأَ بِإِثْمِي

وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ  
النَّارِ وَذَلِكَ جَزْءٌ لِّلظَّلَمِينَ○

৩- فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلًا

أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَاصْبَحَ مِنَ  
الْخَسِيرِينَ○

৩১- فَبَعَثَ اللَّهُ غَرَابًا يَبْحَثُ

فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهِ كَيْفَ  
يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ  
يُوَلِّتَنِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ  
مِثْلَ هَذَا الْفُرَابِ فَأَوَارِي  
سَوْءَةَ أَخِي فَاصْبَحَ مِنَ  
النَّدِيمِينَ○

এ কাহিনীতে হিংসা-বিদ্রোহ, উদ্ধৃত্য ও অহংকারের মন্দ পরিণামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, কিভাবে আদম (আঃ)-এর দুই সহোদর পুত্রের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং একজন আল্লাহর ভয়ে অত্যাচারিত অবস্থায় মারা যায় ও জান্নাতে

স্বীয় বাসস্থান বানিয়ে নেয়; আর অপরজন তার প্রতি অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করে বিনা কারণে তাকে হত্যা করে ফেলে এবং উভয় জগতে ধ্রংস হয়ে যায়।

আল্লাহ বলেনঃ ‘হে নবী (সঃ)! আহলে কিতাবদেরকে তুমি হ্যরত আদম (আঃ)-এর দু’টি সন্তানের সঠিক কাহিনী শুনিয়ে দাও।’ তাদের নাম ছিল হাবীল ও কাবীল। বর্ণিত আছে, ঐ সময়টা ছিল দুনিয়ার প্রাথমিক অবস্থা। তাই সেই সময় একই উদরে দু’টো সন্তান জন্মগ্রহণ করতো। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। তখন একটি গর্ভের ছেলের সাথে আর একটি গর্ভের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়া হতো। হাবীলের যমজ বোন সুন্দরী ছিল না, কিন্তু কাবীলের যমজ বোনটি সুন্দরী ছিল। সুতরাং কাবীল নিজের যমজ বোনকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল। হ্যরত আদম (আঃ) তাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন। শেষ পর্যন্ত ফায়সালা হলো যে, তারা উভয়ে যেন আল্লাহর নামে কিছু কুরবানী করে। যার কুরবানী কবূল হবে, মেয়েটির সাথে তারই বিয়ে দেয়া হবে। হাবীলের কুরবানী কবূল হয়, যার বর্ণনা কুরআন কারীমের এ আয়াতগুলোতে রয়েছে। মুফাস্সিরদের উক্তিগুলো নিম্নে দেয়া হলোঃ

হ্যরত আদম (আঃ)-এর ঔরসজাত সন্তানদের বিয়ের নিয়ম যা উপরে উল্লিখিত হলো তা বর্ণনা করার পর বর্ণিত আছে যে, বড় ভাই কাবীল কৃষি কাজ করতো এবং ছোট ভাই হাবীল ছাগলের মালিক ছিল। হাবীলের বোনের তুলনায় কাবীলের বোনটি ছিল অপেক্ষাকৃত সুন্দরী। তাকে বিয়ে করার জন্যে যখন হাবীলের প্রস্তাব যায়। তখন কাবীল তা প্রত্যাখ্যান করে এবং সে নিজেই তাকে বিয়ে করতে চায়। এতে হ্যরত আদম (আঃ) তাকে বাধা প্রদান করেন। তখন উভয়েই আল্লাহর নামে কুরবানী পেশ করলো যে, যার কুরবানী কবূল হবে সেই তাকে বিয়ে করবে। হ্যরত আদম (আঃ) সেই সময় মক্কাভূমির পথে যাত্রা শুরু করেন যে, দেখা যাক কি ঘটে? আল্লাহ তা‘আলা হ্যরত আদম (আঃ)-কে বললেনঃ “তৃ-পৃষ্ঠে আমার যে ঘরটি রয়েছে তা তুমি চেনো কি?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “না।” আল্লাহ বললেনঃ “ওটা মক্কায় রয়েছে। তুমি সেখানে চলে যাও।” হ্যরত আদম (আঃ) আকাশকে বললেনঃ “তুমি কি আমার সন্তানদেরকে হিফায়ত করবে?” আকাশ তা অস্বীকার করলো। তখন যমীনকে ঐ কথা বললেন। যমীনও অস্বীকৃতি জানালো। তারপর তিনি পাহাড়গুলোকে বললেন। তারাও অস্বীকার করলো। তারপর তিনি কাবীলকে ঐ কথা বললে সে বললোঃ “হ্যাঁ, আমি রক্ষক হয়ে গেলাম। আপনি ফিরে এসে দেখে নেবেন এবং খুশী হবেন।” এখন হাবীল একটি মোটাতাজা মেষ আল্লাহর নামে যবেহ করলেন এবং বড় কাবীল স্বীয় ভূমির শস্যের একটা অংশ আল্লাহর

নামে বের করলো। আগুন এসে হাবীলের নয়র তো জ্বালিয়ে ফেললো, যা ছিল সে যুগে কুরবানী গৃহীত হওয়ার নির্দর্শন, কিন্তু কাবীলের নয়র গৃহীত হলো না। তার ভূমির শস্য যা ছিল তা-ই থাকলো। সে ওটাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার পর শিষ হতে ভালভাল দানাগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলেছিল। এখন কাবীলের তার বোনকে বিয়ে করার আশার গুড়ে বালি পড়ে গিয়েছিল। তাই সে তার ভাই হাবীলকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল। তখন হাবীল বলেছিলেনঃ “আল্লাহ তা‘আলা মুত্তাকীদের কুরবানীই কবূল করে থাকেন। এতে আমার অপরাধ কি আছে?” একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, এ মেষটিকেই জান্নাতে পালন করা হয়েছে এবং এটা ঐ মেষ যাকে হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রের বিনিময়ে যবেহ করেছিলেন। আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হাবীল স্বীয় জানোয়ারগুলির মধ্য হতে সবচেয়ে উত্তম ও প্রিয় জন্তু আল্লাহর নামে খুশী মনে কুরবানী করেছিলেন। পক্ষান্তরে কাবীল স্বীয় কৃষিভূমির অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের শস্য আল্লাহর নামে বের করেছিল, সেটাও আবার খুশী মনে বের করেনি। হাবীলের দৈহিক শক্তি ও কাবীল অপেক্ষা বেশী ছিল। এতদসন্ত্ত্বেও তিনি আল্লাহর তয়ে ভীত হয়ে স্বীয় ভাতা কাবীলের অত্যাচার ও বাড়বাড়ি নীরবে সহ্য করলেন এবং ভাইয়ের উপর হাত উঠালেন না। বড় ভাইয়ের কুরবানী যখন কবূল হলো না এবং হ্যরত আদম (আঃ) তাকে এ কথা বললেন তখন সে তাঁকে বললোঃ “আপনি হাবীলকে ভালবাসেন বলে তার কুরবানী কবূল করবার জন্যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, ফলে তার কুরবানী কবূল হয়েছে।” এখন সে হাবীলকে হত্যা করে ফেলার দৃঢ় সংকল্প করে বসলো। সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। একদিন ঘটনাক্রমে হাবীলের বাড়ী আসতে বিলম্ব হয়। তখন হ্যরত আদম (আঃ) তাঁকে ডেকে আনার জন্যে কাবীলকে প্রেরণ করেন। সে তখন গুপ্তভাবে একটা ছুরি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পথেই দু’ভাইয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। তখন কাবীল তাঁকে বলেঃ “আমি তো তোমাকে মেরে ফেলবো। কেননা, তোমার কুরবানী কবূল হয়েছে, আর আমার কুরবানী কবূল হয়নি।” তখন হাবীল বললেনঃ “আমি উত্তম ও প্রিয় জিনিস আল্লাহর নামে কুরবানী দিয়েছি, আর তুমি খারাপ ও নিকৃষ্ট জিনিস তাঁর নামে কুরবানী দিয়েছো। আল্লাহ তা‘আলা মুত্তাকীদেরই কুরবানী কবূল করে থাকেন।” এতে সে আরও বিগড়ে গেল এবং পেটে ছুরি চুকিয়ে দিল। হাবীল বলতেই থাকলেনঃ “তুমি আল্লাহকে কি উত্তর দেবে? আল্লাহর কাছে তোমার এ অত্যাচারের প্রতিশোধ জঘন্যভাবে গ্রহণ করা হবে। আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে হত্যা করো না।” কিন্তু সেই নিষ্ঠুর কাবীল নিজের ভাই হাবীলকে মেরে ফেললো।

কাবীল তার যমজ বোনকেই বিয়ে করার আরও একটা কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেঃ “আমরা দু’জন জান্নাতে জন্মগ্রহণ করেছি, আর এরা দু’জন (হাবীল ও তার যমজ বোন) পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে। সুতরাং আমার যমজ বোনকে বিয়ে করার হক আমারই রয়েছে।” এও বর্ণিত আছে যে, কাবীল গম বের করেছিল এবং হাবীল গরু কুরবানী করেছিলেন। তখন তো কোন মিস্কীন ছিল না যে, তাকে সাদকা দেয়া যাবে। তাই এ প্রথা চালু ছিল যে, যে সাদকা দেয়া হতো, আকাশ থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিতো। এটা ছিল সাদকা কবূল হওয়ার নির্দশন। ছোট ভাই এ মর্যাদা লাভ করেছিলেন বলে বড় ভাই হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁকে হত্যা করার সংকল্প করে বসে। তারা যে বিয়ের মতানৈক্য দূর করার উদ্দেশ্যে কুরবানী করেছিল তা নয় বরং এমনিই তারা তা করেছিল। কুরআন কারীমের প্রকাশ্য শব্দ দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, বড় ভাই কাবীলের ছোট ভাই হাবীলের উপর অসন্তুষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ ছিল তার কুরবানী না হওয়া, অন্য আর কোন কারণ ছিল না। আর একটি বর্ণনায় উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর বিপরীত কথা রয়েছে। তাতে রয়েছে যে, কাবীল তার যে শস্য আল্লাহর নামে ন্যায় দিয়েছিল তা কবূল হয়েছিল। কিন্তু জানা যাচ্ছে যে, এতে বর্ণনাকারীর অ্বরণশক্তি ঠিক নেই এবং এটা প্রসিদ্ধ বিষয়ের উল্টোও বটে। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

“আল্লাহ মুত্তাকীদের আমলই কবূল করে থাকেন।” হ্যরত মুআয় ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন যে, লোকেরা কিয়ামতের মাঠে উপস্থিত থাকবে এমন সময় একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলবেনঃ “মুত্তাকীরা কোথায়?” তখন মুত্তাকীরা আল্লাহর কুদরতী ডানার নীচে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহ তাদের থেকে কোনই পর্দাই করবেন না, বরং প্রত্যক্ষভাবে তাদেরকে দেখা দেবেন। হাদীসটির বর্ণনাকারী আবু আফীফকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ “মুত্তাকী কে?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “মুত্তাকী তারাই যারা শিরুক ও মৃত্তিপূজা থেকে বেঁচে থাকে এবং খাঁটি অন্তরে আল্লাহরই ইবাদত করে।” অতঃপর এসব লোক জান্নাতে চলে যাবে।

হাবীল বললেনঃ “তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্যে হস্ত প্রসারিত কর তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করার জন্যে তোমার দিকে কখনও আমার হাত বাড়াবো না। আমি তো বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি।” শক্তিতে তো তিনি ভাই অপেক্ষা উর্ধ্বে ছিলেন। তথাপি সততা, বিনয়, ন্মতা এবং তাকওয়ার কারণেই তিনি এ কথা বললেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ ‘যখন দু’জন মুসলমান তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে (একে

অপরকে হত্যা করার জন্য) তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হবে।” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা হত্যাকারীর ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু নিহত ব্যক্তি অপরাধী হবে কেন?” তিনি উত্তরে বললেন : “কারণ এই যে, সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার লোভ করেছিল।” ইমাম আহমাদ (রঃ) বাশার ইব্ন সাঈদ (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন বিদ্রোহীগণ উসমান (রাঃ)-এর বাড়ী অবরোধ করেছিলেন তখন সাদ ইব্ন আবি ওক্স (রাঃ) বলেছিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন : “অচিরেই হাঙ্গামা লেগে যাবে, সেই সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডযামান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে, দণ্ডযামান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে এবং চলমান ব্যক্তি দৌড়ালু অপেক্ষা উত্তম হবে।” কোন একজন জিজ্ঞেস করলেন : “যদি কোন লোক আমার গৃহে প্রবেশ করে আমাকে হত্যা করতে ইচ্ছে করে (তাহলে আমি কি করব?)” তিনি উত্তরে বললেন : ‘সে সময় তুমি আদমের পুত্রের মত হয়ে যাও।’ একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেছিলেন। আইউব সুখ্তইয়ানী বলেন যে, সর্বপ্রথম যিনি এ আয়াতের উপর আমল করেছিলেন তিনি হলেন উসমান ইব্ন আফ্ফান (রাঃ)। একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি জন্মুর উপর সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর পিছনে বসেছিলেন হ্যরত আবু যার (রাঃ)। তিনি বললেনঃ “হে আবু যার (রাঃ)! আচ্ছা বলতো, যখন মানুষ এমন দারিদ্রের সম্মুখীন হবে যে, তারা (ক্ষুধার কারণে) বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্তও যেতে পারবে না, তখন তুমি কি করবে?” তিনি উত্তরে বললেনঃ ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর যা নির্দেশ হবে তা-ই করবো।’ তিনি বললেনঃ ‘যখন পরম্পরের মধ্যে খুনাখুনি শুরু হয়ে যাবে, এমনকি শরূত্বূমির পাথরও রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে, তখন কি করবে?’ (হ্যরত আবু যার রাঃ বলেন) আমি ঐ উত্তরই দিলাম। তিনি বললেনঃ ‘বাড়ীতেই অবস্থান করবে এবং দরজা বন্ধ রাখবে।’ আমি বললাম, আমি যদি তাতে অংশগ্রহণ না করি তবুও কি? তিনি বললেনঃ ‘তুমি যাদের অন্তর্ভুক্ত তাদের মধ্যেই চলে যাবে এবং সেখানেই অবস্থান করবে।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি অস্ত্র ধারণ করবো না কেন? তিনি বললেনঃ ‘তাহলে তুমি ও তাদের মধ্যেই শামিল হয়ে গেলে। বরং যদি কারও তরবারীর বলক তোমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে তবে তখনও তুমি তোমার মুখের উপর কাপড় দিয়ে দেবে যাতে সে তোমার ও তার নিজের পাপগুলো নিয়ে যায়।’ হ্যরত রাবই (রঃ) বলেন, আমরা হ্যরত হ্যাইফা (রাঃ)-এর জানায়ায় হায়ির ছিলাম। একজন লোক বললেনঃ আমি এঁর (হ্যরত হ্যাইফার) মুখে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)

হতে শোনা হাদীসগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেনঃ “তোমরা যদি পরম্পর লড়াই কর তবে আমি আমার সবচেয়ে দূরের বাড়ীতে চলে যাবো এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে বসে পড়বো। যদি সেখানেও কেউ ঢুকে পড়ে তবে আমি তাকে বলে দেবো, তুমি তোমার ও আমার পাপরাশি তোমার মাথায় উঠিয়ে নাও। আমি হ্যরত আদম (আঃ)-এর দ'পুত্রের মধ্যে যিনি উন্নত ছিলেন তাঁর মতই হয়ে যাবো।”

“আমি চাই যে, তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ সমস্তই নিজের মাথায় উঠিয়ে নাও” –এ কথা হাবীল কাবীলকে বলেছিলেন। এর ভাবার্থ হচ্ছে–হে কাবীল! তুমি ইতিপূর্বে যে পাপ করেছো তা এবং এখন আমাকে হত্যা করার পাপ, এ সমস্তই নিয়ে তুমি কিয়ামতের দিন উঠবে এটাই আমি চাই।

হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) এবং হ্যরত মুজাহিদ (রহঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, আমার নিজের পাপ এবং আমাকে হত্যা করার পাপ এ সবগুলোই তুমি তোমার মাথায় উঠিয়ে নাও। আমি (ইবনে কাসীর) বলি যে, সম্বতঃ মুজাহিদ (রহঃ)-এর এ দ্বিতীয় উক্তিটি সাব্যস্ত নয়। এর উপর ভিত্তি করেই কতক লোক বলেন যে, হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সমস্ত পাপ নিজের মাথায় বহন করবে। আর এ অর্থের একটি হাদীসও রয়েছে। কিন্তু এর কোন ভিত্তি নেই। হাফিয আবু বকর আল বায়্যায (রঃ) হ্যরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “বিনা কারণে হত্যা (নিহত ব্যক্তির) সমস্ত পাপ মিটিয়ে দেয়।” এ হাদীসটি উপরে বর্ণিত হাদীসের অর্থে না হলেও এটাও বিশুদ্ধ হাদীস নয়। আর এ রিওয়ায়াতের ভাবার্থ এটাও হবে যে, হত্যার কষ্টের কারণে আল্লাহ নিহত ব্যক্তির সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকেন। এখন এ পাপ কি হত্যাকারীর উপর এসে যাবেঃ এ কথাটি সাব্যস্ত নয়। তবে কতক হত্যাকারী ঐরূপও হতে পারে। কিয়ামতের মাঠে নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে খুঁজতে থাকবে এবং তার অত্যাচার মোতাবেক তার পুণ্য নিতে থাকবে। পুণ্য নেয়ার পরেও যদি অত্যাচার শেষ না হয় তবে নিহত ব্যক্তির পাপ হত্যাকারীর উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। তাহলে হতে পারে যে, নিহত ব্যক্তির সমস্ত পাপই কতক হত্যাকারীর মাথার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। কেননা, অত্যাচারের এভাবে বদলা নেয়ার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর এটা স্পষ্ট কথা যে, হত্যা সবচেয়ে বড় অত্যাচার এবং অতি জঘন্য কাজ। আল্লাহ তা’আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এ বাক্যের বিশুদ্ধতম অর্থ হচ্ছে- হে কাবীল! আমি চাই যে, তুমি নিজের পাপ এবং আমাকে হত্যা করার পাপ এ সমস্তই নিজের উপর নিয়ে নেবে। তোমার অন্যান্য পাপের সাথে এই একটি পাপও বেড়ে যাক। আমার পাপও তোমার ঘাড়ে চেপে বসুক-এ বাক্যের ভাবার্থ কখনও এটা হতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমলের প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে।’ তাহলে এটা কিরূপে সম্ভব হবে যে, নিহত ব্যক্তির সারা জীবনের পাপ হত্যাকারীর ক্ষেত্রে চাপিয়ে দেয়া হবে? এখন বাকী থাকছে এই কথা যে, হাবীল তাঁর ভাইকে এ কথা কেন বললেন? এর উত্তর এই যে, তিনি শেষবারের মত তাকে উপদেশ দেন এবং তায় প্রদর্শন করেন যে, সে যেন এ কাজ থেকে বিরত থাকে, নতুনা সে পাপী হয়ে জাহান্নামবাসী হয়ে যাবে। কারণ, তিনি তো তার মোকাবিলা করছেন না। সুতরাং সমস্ত পাপের বোৰা তার উপরই পড়বে এবং সেই অত্যাচারী সাব্যস্ত হবে। আর অত্যাচারীদের বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম।

(এই উপদেশ সত্ত্বেও) তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভ্রাতৃহত্যার প্রতি উদ্বৃক্ষ করলো। সুতরাং সে তাঁকে হত্যা করেই ফেললো, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। অর্থাৎ শয়তান কাবীলকে তার ভাই এর হত্যার প্রতি উত্তেজিত করলো এবং সে স্বীয় নাফসে আশ্মারার অনুসরণ করলো আর লোহা দ্বারা তাঁকে মেরে ফেললো। একটি বর্ণনায় আছে যে, হাবীল স্বীয় পশুপাল নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে গিয়েছিলেন, আর এদিকে কাবীল তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে ওখানে গিয়ে পৌছে যায়। সে একটি ভারী পাথর উঠিয়ে নিয়ে তাঁর মাথায় মেরে দেয়। ঐ সময় তিনি ঘুমিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, চতুর্থ জন্মের মত তাঁকে গলা টিপে মেরে ফেলেছিল বা তাঁর গলা কেটে নিয়েছিল। এ কথাও বলা হয়েছে যে, ঐ শয়তানের হত্যা করার নিয়ম জানা ছিল না, তাই সে তাঁর গলা মোচড়াচ্ছিল। অতঃপর সে একটা জন্মকে ধরে তার মাথাটি একটি পাথরের উপর রাখলো। তারপর একটি পাথর সঙ্গেরে তার মাথায় মেরে দিলো। তৎক্ষণাত্মে জন্মটি মারা গেল। এই দেখে সে তার ভাইয়ের সাথেও ঐ ব্যবহার করলো। এও বর্ণিত আছে যে, যেহেতু তখন পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠে কোন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়নি, ফলে কাবীল কখনও বা তার ভাইয়ের চক্ষুগুলো বন্ধ করতো এবং কখনও বা থাপড় ঘূষি মারতো। এই দেখে অভিশপ্ত ইবলীস তার কাছে এসে বললো, “একটা পাথর নিয়ে এসো এবং তা দিয়ে তার মাথা খেতলিয়ে দাও।” সে তাই করলো। তখন সেই মালউন দৌড়িয়ে হ্যারত হাওয়া (আঃ)-এর কাছে এসে বললোঃ ‘কাবীল হাবীলকে হত্যা করে

ফেলেছে।” তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “হত্যা কিরূপে হয়?” সে উভরে বললোঃ “এখন সে না পানাহার করতে পারবে, না কথা বলতে এবং না নড়াচড়া করতে পারবে।” তিনি তখন বললেনঃ “সম্ভবতঃ তার মৃত্যু হয়ে গেছে।” সে বললোঃ “হ্যাঁ, এটাই মৃত্যু।” তখন তিনি কানায় ভেঙ্গে পড়লেন। ইতিমধ্যে হ্যরত আদম (আঃ) এসে পড়লেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “ব্যাপার কি?” কিন্তু শোকে দুঃখে তার মুখে কোন কথা সরলো না। তখন তিনি বললেনঃ “তাহলে তুমি তোমার কন্যাগণসহ হা-হৃতাশ করতে থাক। আর আমি ও আমার পুত্রগণ এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।”

কাবীল ক্ষণিকস্ময়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। সে দুনিয়া ও আখিরাত দু’টোকেই নষ্ট করলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয় তার খুনের বোঝা হ্যরত আদম (আঃ)-এর ঐ সন্তানের উপরই পতিত হয়। কেননা, সে-ই সর্বপ্রথম ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে রক্ত বহিয়েছিল।” মুজাহিদ (রহঃ)-এর উক্তি এই যে, ঐ হত্যাকারীর একটি পায়ের গোছাকে উরুর সাথে লটকানো হয়েছে এবং তার মুখটা সূর্যের দিকে করে দেয়া হয়েছে। ওর ঘুরার সাথে সাথে সেও ঘুরতে রয়েছে। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে আগুন ও বরফের গর্তে থাকে শান্তি দেয়া হচ্ছে। সবচেয়ে বড় শান্তি প্রাণ ব্যক্তি সে-ই। ভূ-পৃষ্ঠে সমস্ত হত্যাকাণ্ডের জন্যে সে-ই দায়ী। ইমাম নাখন্দ (রঃ) বলেন যে, সমস্ত অন্যায় খুনের বোঝা তার উপর ও শয়তানের উপর পড়ে থাকে।

তাঁকে হত্যা করে দেয়ার পর কি করতে হবে, মৃতদেহ কিভাবে ঢাকতে হবে সে ব্যাপারে তার কিছুই জানা ছিল না। তখন আল্লাহ তা’আলা দু’টি কাক প্রেরণ করলেন যারা একে অপরের ভাই ছিল। তারা তার সামনে লড়তে লাগলো। অবশেষে একে অপরকে মেরে ফেললো। তারপর জীবিত কাকটি একটি গর্ত খনন করলো এবং মৃত কাকটিকে ওর মধ্যে রেখে দিয়ে মাটি চাপিয়ে দিলো। এ দেখে কাবীলের বুদ্ধি জেগে গেল এবং সে-ও ঐরূপ করলো। হ্যরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নিজে নিজেই মৃত একটি কাককে অপর একটি কাক এভাবে গর্ত খনন করে দাফন করে দিয়েছিল। এও বর্ণিত আছে যে, কাবীল এক বছর পর্যন্ত তার মৃত ভাইয়ের মৃতদেহ স্বীয় ক্ষম্বে বহন করে ফিরছিল। অতঃপর কাকটিকে ঐরূপ করতে দেখে সে নিজেকে ভৃৎসনা করে বলতে লাগলো—“হায়! আমি এ কাকটির মত কাজও করতে পারলাম না।” একথাও বর্ণিত আছে যে, সে ভাইকে মেরে ফেলার পর খুবই অনুত্তম হয়েছিল এবং মৃতদেহ কোলে নিয়ে বসে পড়েছিল। আর তা এ জন্যও ছিল যে, ভূ-পৃষ্ঠে প্রথম মৃত ও প্রথম হত্যা ওটাই ছিল। তাওরাত ধারীরা বলে

যে, যখন কাবীল তার ভাই হাবীলকে হত্যা করলো তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ‘হে কাবীল! তোমার ভাই হাবীল কোথায়?’ সে উত্তরে বললেনঃ ‘আমি জানি না। আমি তার প্রহরী ছিলাম না।’ আল্লাহ পাক তখন বললেনঃ “এখন তোমার ভাইয়ের রক্ত যমীন হতে আমাকে ডাক দিচ্ছে। যে যমীনের মুখ খুলে দিয়ে তুমি ওর মুখে তোমার নিষ্পাপ ভাইয়ের রক্ত ঢেলে দিয়েছ সেই তুমি তোমাকে লানত করছে। তুমি এ যমীনে যে চাষাবাদ করবে তাতে তুমি কোন ফসল পাবে না যে পর্যন্ত না তুমি চিন্তাবিত হবে।” সে তখন ঐ কাজই করলো।

অতঃপর সে খুব লজ্জিত হলো এবং অনুত্তাপ করতে থাকলো! ওটা যেন শান্তির উপরে শান্তি ছিল। এ কাহিনীতে মুফাস্সিরগণ এ ব্যাপারে তো একমত যে, এ দু'জন হ্যরত আদম (আঃ)-এর ঔরসজাত পুত্র ছিল এবং কুরআন কারীমের শব্দগুলো দ্বারা বাহ্যতঃ এটাই বুঝা যাচ্ছে। আর হাদীসেও রয়েছে যে, যমীনের বুকে যেসব হত্যাকাণ্ড চলছে তার এক অংশের বোঝা ও পাপ হ্যরত আদম (আঃ)-এর এ প্রথম পুত্রের উপর পড়েছে। কেননা সে-ই সর্বপ্রথম হত্যার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। কিন্তু হ্যরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন যে, এ দু'জন বানী ‘ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুরবানী সর্বপ্রথম তাদের মধ্যেই চালু হয়েছিল। পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম আদম (আঃ) মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কিন্তু এ উক্তিটির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ আছে। তাছাড়া এর ইসলামও সঠিক নয়। একটি মারফু’ হাদীসে রয়েছে যে, এ ঘটনাটি একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ যেন এর মধ্য থেকে ভালটি গ্রহণ করে এবং মন্দটি পরিত্যাগ করে।<sup>১</sup> এ হাদীসটি মুরসাল। কথিত আছে যে, এ আকস্মিক দুর্ঘটনায় হ্যরত আদম (আঃ) শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং এক বছর ধরে তাঁর মুখে হাসি ফুটেনি। অবশেষে ফেরেশত্বাগণ তাঁর দুঃখ দূর হওয়ার ও মুখে হাসি আসার জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করেন। হ্যরত আদম (আঃ) ঐ সময় শোকে ও দুঃখে এ কথাও বলেছিলেন যে, শহর ও শহরের সবকিছু বদলে গেছে, পৃথিবীর রং -এর পরিবর্তন ঘটেছে এবং ওর চেহারা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। সব জিনিসেরই রং ও স্বাদ বিদায় নিয়েছে এবং আকর্ষণীয় চেহারাগুলোর সৌন্দর্য লোপ পেয়েছে। জবাবে বলা হলো যে, এ মৃত ব্যক্তির সাথে এ জীবিত ব্যক্তিও যেন নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং যে

১. ইবনে জাবীর (রাঃ) হাসান বসরী (রাঃ) হতে এটা মারফু’রপে তাখরীজ করেছেন।

অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল ওর বোৰা তার উপর এসে গেছে। প্রকাশ্যভাবে জানা যাচ্ছে যে, কাবীলকে তখনই কোন শাস্তি দেয়া হয়েছে। যেহেতু বলা হয়েছে যে, তার পায়ের গোছাকে তার উরুর সাথে লটকিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তার মুখমণ্ডল সূর্যের দিকে করে দেয়া হয়েছে। ওর সাথে সাথেই সে ঘুরতে ছিল। অর্থাৎ সূর্য যেদিকেই থাকতো সেদিকেই তার মুখখানা ঘুরে যেতো। হাদীস শরীফে এসেছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যতগুলো গুনাহ এরই উপযুক্ত যে, আল্লাহ তাড়াতাড়ি করে ও শাস্তি দুনিয়াতেই প্রদান করবেন এবং পরকালেও তার জন্যে ভীষণ শাস্তি জমা রাখবেন, গুগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে সমসাময়িক শাসনকর্তার বিরুদ্ধাচরণ করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া!” কাবীলের মধ্যে এ দু'টো পাপই জমা হয়েছিল।

‘فَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ’  
নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং নিশ্চয়ই  
আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।’ (২৪: ১৫৬)

৩২। এ কারণেই আমি বানী ইসরাইলের প্রতি এ নির্দেশ দিয়েছি যে, যে ব্যাঙ্ক কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য থাণের বিনিময় ব্যতীত, কিংবা তার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে কোন ফাসাদ বিস্তার ব্যতীত তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেললো; আর যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করলো তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করলো; আর তাদের (বানী ইসরাইলদের) কাছে আমার বহু রাসূল স্পষ্ট থমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিল তবু এর পরেও তন্মধ্য হতে অনেকেই ভূ-পৃষ্ঠে সীমা লংঘনকারী রয়ে গেছে।

- ৩২ -  
 منْ أَجْلِ ذِلْكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ  
 بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ  
 نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ  
 فِي الْأَرْضِ فَكَانَ مَا قَاتَلَ  
 النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَا هَا  
 فَكَانَ مَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  
 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رَسُلُنَا بِالْبَيِّنِ  
 ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ  
 فِي الْأَرْضِ لَمْسِرِفُونَ ○

৩৩। যারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর  
রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে,  
আর ভৃ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে  
বেড়ায়, তাদের শান্তি এটাই  
যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে  
অথবা শূলে চড়ান হবে, অথবা  
এক দিকের হাত ও অপর  
দিকের পা কেটে ফেলা হবে  
অথবা ভৃ-পৃষ্ঠ হতে বের করে  
দেয়া হবে; এটা তো ইহলোকে  
তাদের জন্যে ভীষণ অপমান,  
আর পরকালেও তাদের জন্যে  
ভীষণ শান্তি রয়েছে।

৩৪। কিন্তু হ্যাঁ, তোমরা তাদেরকে  
গ্রেফতার করার পূর্বে যারা  
তাওবা করে নেয়, তবে জেনে  
রেখো যে, নিক্ষয়ই আল্লাহ  
ক্ষমাশীল, দয়ালু।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আদমের এ ছেলের অন্যায়ভাবে তার ভাইকে হত্যার  
কারণে আমি বানী ইসরাইলকে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছি, তাদের কিতাবে  
লিখে দিয়েছি এবং তাদের শরঙ্গৈ হুকুম করে দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কাউকে বিনা  
কারণে হত্যা করে ফেললো, না সে নিহত ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছিল, না সে  
ভৃ-পৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়ে দিয়েছিল, তাহলে সে যেন দুনিয়ার সমস্ত লোককেই হত্যা  
করে ফেললো। কেননা, আল্লাহর কাছে সমস্ত সৃষ্টজীব সমান। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি  
কোন নির্দোষ লোককে হত্যা করা থেকে বিরত থাকলো, ওটাকে হারাম জানলো,  
তবে সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ বাঁচালো। কেননা, সমস্ত মানুষ এভাবে শান্তি ও  
নিরাপত্তার সাথে থাকবে। আমীরুল মুমিনীন হ্যরত উসমান (রাঃ)-কে যখন  
বিদ্রোহীরা ঘিরে ফেলে, তখন হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) তাঁর কাছে গিয়ে  
বলেনঃ “হে আমীরুল মুমিনীন। আমি আপনার পক্ষ হয়ে আপনার বিরুদ্ধাচরণ-  
কারীদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছি। আপনি লক্ষ্য করুন যে, পানি এখন মাথার

٣٣ - إِنَّمَا جَزْءُ الَّذِينَ يَحْرَبُونَ  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي  
الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يَقْتَلُوا أَوْ  
يُصْلَبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ  
وَارْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْ  
مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حُزْنٌ فِي  
الْدُنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ ○

٣٤ - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ ৫

উপরে উঠে গেছে। সুতরাং এখন তাদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।” এ কথা শুনে হ্যরত উসমান (রাঃ) বলেনঃ “তুমি কি সমস্ত লোককে হত্যা করার প্রতি উত্তেজিত হয়েছো যাদের মধ্যে আমিও একজন?” হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ “না, না।” তখন তিনি বললেনঃ “জেনে রেখো যে, তুমি যদি একজন লোককেই হত্যা কর তবে যেন তুমি সমস্ত লোককেই হত্যা করলে। যাও, ফিরে যাও। আমি চাই যে, আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করুন, পাপকার্যে লিঙ্গ না করুন।” এ কথা শুনে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) ফিরে গেলেন, যুদ্ধ করলেন না। ভাবার্থ এই যে, হত্যা হচ্ছে পৃথিবীর ধর্মসের কারণ। হ্যরত সান্দেহ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ মনে করে সে সমস্ত লোকের ঘাতক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে সে যেন সমস্ত লোকেরই প্রাণ রক্ষা করে। হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন যে, নবীকে এবং ন্যায়পরায়ণ মুসলমান বাদশাহকে হত্যাকারীর উপর সারা বিশ্বের মানুষের হত্যার পাপ বর্তিত হয়। আর নবী এবং ন্যায়পরায়ণ ইমামের বাহুকে মজবুত করা বিশ্ববাসীর জীবন রক্ষা করার শামিল। (তাফসীরে ইবনে জারীর)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলেই সে জাহানামী হয়ে যায়। সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করলো। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, কোন মুমিনকে কোন শরঙ্গ কারণ ছাড়াই হত্যাকারী জাহানামী, আল্লাহর দুশ্মন, অভিশপ্ত এবং শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। সুতরাং সে যদি সমস্ত লোককেও হত্যা করতো তবে এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হতো? যে ব্যক্তি হত্যা করা থেকে বিরত থাকলো, তার পক্ষ থেকে যেন সবারই জীবন রক্ষা পেলো। আব্দুর রহমান বলেন যে, এক হত্যার বদলেই তার খুন হালাল হয়ে গেলো। এটা নয় যে, কয়েকটি হত্যার পর সে কিসাসের যোগ্য হবে। আর যে তাকে জীবিত রাখবে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির অভিভাবক হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেবে, সে যেন লোকদেরকে জীবিত রাখলো। আবার এই ভাবার্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মানুষের জীবন বাঁচাবে, যেমন ডুবন্ত মানুষকে উঠিয়ে নেবে, আগুনে পড়ে যাচ্ছে এমন লোককে আগুন থেকে রক্ষা করবে এবং কাউকে ধর্মসের মুখ থেকে বাঁচিয়ে নেবে ইত্যাদি। উদ্দেশ্য হচ্ছে—মানুষকে অন্যায় খুন থেকে বিরত রাখা, তাদেরকে মানুষের কল্যাণ কামনা, শাস্তি ও নিরাপত্তার প্রতি উদ্বৃদ্ধ করা। হ্যরত হাসান বসরী (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ “বানী ইসরাইল যেমন এ হৃকুমের আওতাভুক্ত ছিল তদ্বপ আমরাও কি এ হৃকুমেরই

আওতাভুক্ত?" তিনি উভয়ের বললেনঃ "হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! বানী ইসরাইলের রক্ত আল্লাহর নিকট আমাদের রক্ত অপেক্ষা কোনক্রমেই মর্যাদাপূর্ণ নয়।" সুতরাং একটি লোককে বিনা কারণে হত্যা করা সকলকে হত্যা করার শামিল এবং একটি লোকের জীবন রক্ষা করার পুণ্য সমস্ত লোকের জীবন রক্ষা করার পুণ্যের সমান। ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, একদা হযরত হাময়া ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে এমন কাজ বাতলিয়ে দিন যা আমার জীবনকে সুখময় করে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হে হাময়া (রাঃ)! কারও জীবন রক্ষা করা আপনার নিকট পছন্দনীয় কাজ, না কাউকে মেরে ফেলা পছন্দনীয় কাজ?" উভয়ের তিনি বললেনঃ "কারও জীবন রক্ষা করাই আমার নিকট পছন্দনীয় কাজ।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তাহলে আপনি এ কাজেই লেগে থাকুন।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ বানী ইসরাইলের কাছে আমার বহু রাসূলও স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিল, তবু এর পরেও তাদের মধ্য হতে অনেকেই ভূ-পৃষ্ঠে সীমালংঘনকারী রয়ে গেছে। যেমন ইয়াহুদী বানু কুরাইয়া ও বানু নায়ীর আউস ও খায়রাজ গোত্রয়ের সাথে মিলিত হয়ে একে অপরের সাথে যুদ্ধ করতো এবং নিহত ব্যক্তির মুক্তিপণ আদায় করতো। তাদেরকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে আয়ত নাখিল করা হয়- তোমাদের নিকট এই অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল যে, তোমরা তোমাদের লোকদেরকে হত্যা করবে না এবং তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে না। কিন্তু এই মজবুত আহাদ ও অঙ্গীকার সন্ত্বেও তোমরা তার উল্টো করেছো। যদিও মুক্তিপণ আদায় করেছো, কিন্তু তাদেরকে দেশ হতে বের করে দেয়াও তো হারাম ছিল। এর কি অর্থ হতে পারে যে, তোমরা কোন কোন হকুম মানবে এবং কোন কোনটা মানবে না? একলে লোকদের শাস্তি তো এটাই যে, তারা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম থেকে উদাসীন নন।

إِنَّمَا جَزْءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يُصْلِبُوا أَوْ تُنْقَطِعَ أَيْدِيهِمْ وَارْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جُزٌّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ -

এ আয়াতে শব্দের অর্থ হচ্ছে বিরুদ্ধাচরণ করা এবং হকুমের বিপরীত করা। এর ভাবার্থ হচ্ছে কুফরী করা, ডাকাতি করা, ব্যভিচার করা এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন প্রকারের অশাস্তি সৃষ্টি করা। এমনকি পূর্ববর্তী অনেক মনীষী, যাঁদের মধ্যে

হয়েরত সান্দেহ ইবনে মুসাইয়াবও (রাঃ) রয়েছেন, বলেন যে, রৌপ্যমুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রা অধিকার করে নেয়াও হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টি করার শামিল। আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেনঃ যখন কাউকে কোন কাজের অলী বানিয়ে দেয়া হয় তখন সে ফাসাদ ও অশান্তি ছড়িয়ে দেয় এবং চাষাবাদের ভূমি ও মানবজাতিকে ধ্রংস করে ফেলে, আর আল্লাহ ফাসাদকে ভালবাসেন না। এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা, এতে এটাও আছে যে, যখন একুপ লোক এ কাজগুলো করার পর মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই তাওবা করে নেয় তবে তার কোন জবাবদিহি নেই। পক্ষান্তরে যদি কোন মুসলমান এমন কাজ করে এবং পলায়ন করে কাফিরদের নিকট চলে যায় তবে শরঙ্খ হৃদ থেকে মুক্ত হবে না। হয়েরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ যদি মুসলমানদের হাতে পড়ে যাওয়ার পূর্বে তাওবা করে নেয় তবে তার কৃতকর্মের দরুণ যে হৃকুম তার উপর সাব্যস্ত হয়ে গেছে তা টলতে পারে না। হয়েরত উবাই (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আহলে কিতাবের একটা দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু তারা তা ভঙ্গ করে এবং গুগোল সৃষ্টি করে। তখন আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে স্বাধীনতা দেন যে, তিনি ইচ্ছে করলে তাদেরকে হত্যা করতে পারেন, আবার ইচ্ছে করলে তাদের একদিকের হাত ও অপরদিকের পা কেটে ফেলতে পারেন। হয়েরত সাদ (রাঃ) বলেন যে, আয়াতটি হাকুরিয়া খারেজীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। সঠিক কথা এই যে, যে কেউই এ কাজ করবে তারই ব্যাপারে এ হৃকুম প্রযোজ্য হবে। যেহেতু সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হয়েরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উকাল গোত্রের কতগুলো লোক আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর নিকট আগমন করে এবং তাঁর কাছে ইসলামের বায়আত গ্রহণ করে। অতঃপর মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হয় এবং তাদের পেট মোটা হয়ে যায়। তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এর অভিযোগ পেশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বললেনঃ “তোমরা চাইলে আমাদের রাখালের সাথে চলে যাও, তথায় উটের প্রস্তাৱ ও দুধ পান করবে।” তারা বললোঃ “হ্যাঁ (আমরা যেতে চাই।)” সুতরাং তারা বেরিয়ে পড়লো। অতঃপর তাদের রোগ সেরে গেলো। তখন তারা রাখালকে মেরে ফেললো এবং উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে তাঁদের পশ্চাদ্বাবন করে তাদেরকে ধরে আনার নির্দেশ দেন। অতএব তাদেরকে পাকড়াও করে

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে পেশ করা হয়। তখন তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হয় এবং চোখে গরম শলাকা ভরে দেয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে রৌদ্রে ফেলে রাখা হয় ফলে তারা ধড়কড় করে মৃত্যুবরণ করে। সহাই মুসলিমে রয়েছে যে, ঐ লোকগুলো উক্কাল গোত্রের ছিল কিংবা উরাইনা গোত্রের ছিল। তারা পানি চেয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি। তারা চুরিও করেছিল, হত্যাও করেছিল, সৈমান আনয়নের পর কুফরীও করেছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করেছিল এবং তারা রাখালের চোখে গরম শলাকাও ভরে দিয়েছিল। সেই সময় মদীনার আবহাওয়া ভাল ছিল না। তারা ‘বারসাম’ নামক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের পিছনে ২০ জন ঘোড় সওয়ার আনসারীকে পাঠিয়েছিলেন। একজন পদ্ব্রজে চলছিলেন, যিনি পদচিহ্ন দেখে দেখে পথ দেখিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। মৃত্যুর সময় তারা পিপাসায় এতো কাতর হয়ে পড়েছিলো যে, মাটি চাটতে শুরু করেছিলো! তাদের ব্যাপারেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। একদা হাজ্জাজ হ্যরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাউকে সবচেয়ে বড় ও কঠিন যে শান্তি দিয়েছিলেন তা বর্ণনা করুন।” তখন হ্যরত আনাস (রাঃ) এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তাতে এ কথাও রয়েছে যে, ঐ লোকগুলো বাহ্রাইন থেকে এসেছিল। রোগের কারণে তাদের রং হলদে বর্ণ ধারণ করেছিল। আর পেট বড় হয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেছিলেনঃ “তোমরা সাদকার উটের নিকট গমন কর এবং ওগুলোর দুধ ও প্রস্ত্রাব পান কর।” হ্যরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ “তারপর আমি দেখলাম যে, হাজ্জাজ এ রিওয়ায়াতকে নিজের অত্যাচারের দলীল বানিয়ে নিলো। আমি তখন খুবই লজ্জিত হলাম যে, আমি তার কাছে এ হাদীসটি কেন বর্ণনা করলাম।” অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তাদের মধ্যে চারজন লোক ছিল উরাইনা গোত্রের এবং তিনজন ছিল ইকাল গোত্রের। এরা যখন সুস্থ হয়ে উঠলো তখন ধর্মত্যাগী হয়ে গেলো। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তারা রাস্তাও বন্ধ করে দিয়েছিল এবং ব্যতিচারীও ছিল। তারা যখন আগমন করে তখন দারিদ্র্যের কারণে তাদের পরনে কাপড় পর্যন্ত ছিল না। তারা হত্যা ও লুঠ করে নিজেদের শহরের দিকে যাচ্ছিল। হ্যরত জারীর (রাঃ) বলেনঃ তারা তাদের কওমের কাছে প্রায় পৌছেই গিয়েছিল এমতাবস্থায় আমরা তাদেরকে ধরে ফেলি। তারা পানি চাচ্ছিল, আর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ “এখন তো পানির পরিবর্তে জাহানামের আগুন পাবে।” এ বর্ণনায় এটাও বলা হয়েছে যে, তাদের চোখে শলাকা ভরে দেয়াকে আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। এ হাদীসটি দুর্বল ও

গারীব। কিন্তু এর দ্বারা এটা জানা গেল যে, ঐ ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যে সৈন্যদল পাঠানো হয়েছিল তাঁদের সর্দার ছিলেন হ্যরত জারীর (রাঃ)। এ বর্ণনার এ অংশটি একেবারই বর্জনীয় যে, তাদের চোখে শলাকা ভরে দেয়াকে আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। কেননা, সহীহ মুসলিমে এটা বিদ্যমান আছে যে, তারা রাখালের সাথে ঐ ব্যবহার করেছিল। সুতরাং ওটা ছিল তাদের কিসাস বা প্রতিশোধ গ্রহণ। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আর একটি বর্ণনায় আছে যে, ঐলোকগুলো বানু ফায়ারাহ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ শাস্তি আর কাউকেও দেননি। অন্য এক বর্ণনায় বরঞ্চে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইয়াসার নামক এক ক্রীতদাস ছিল। সে অত্যন্ত নামাযী ছিল বলে তিনি তাকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। অতঃপর স্বীয় উটের পালে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে ঐ উটগুলো দেখা শোনা করতো। তাকেই ঐ ধর্মত্যাগীরা হত্যা করে ফেলেছিল এবং তার চোখে কঁটা গেড়ে দিয়ে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। যে সেনাবাহিনী তাদেরকে গ্রেফ্টার করে এনেছিলেন তাদের মধ্যে একজন শক্তিশালী যুবক ছিলেন হ্যরত কুরয় ইবনে ফাহরী (রাঃ)। হাফিয় আবু বকর মিরদুওয়াই (রঃ) এ বর্ণনার সমস্ত তরীকা বা পস্থাকে একত্রিত করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁকে উক্তম পুরক্ষার প্রদান করুন। আবু হাময়াহ ইবনে আবদুল করীম (রঃ) উটের প্রস্তাবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি ঐ ধর্মত্যাগীদের কাহিনী বর্ণনা করেন। তাতে এ কথাও আছে যে, ঐ লোকগুলো কপটতার সাথে ঈমান এনেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট মদীনার প্রতিকূল আবহাওয়ার অভিযোগ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তাদের প্রতারণা, হত্যা, লুঁঠন ও ধর্মত্যাগের বিষয় জানতে পারেন তখন তিনি ঘোষণা দেন যে, আল্লাহর সৈন্যগণ যেন তাদের পশ্চাদ্বাবনে বেরিয়ে পড়ে। এ ঘোষণা শোনা মাত্রই সাহাবীগণ কেউ কারও জন্যে অপেক্ষা না করেই তাদের পিছনে বেরিয়ে পড়েন। তাদেকে পাঠিয়ে দেয়ার পর স্বয়ং নবী করীমও (সঃ) রওয়ানা হয়ে যান। ঐ বিদ্রোহী ও ডাকাতের দল তাদের নিরাপদ জায়গায় প্রায় পৌছেই গেছে, এমন সময় সাহাবায়ে কিরাম তাদেরকে ঘিরে ফেলেন। তাদের মধ্যে যে কয়েকজন গ্রেফ্টার হয় তাদেরকে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে পেশ করেন। ঐ সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তাদেরকে দেশান্তরিত করা ছিল এই যে, তাদেরকে ইসলামী হুকুমতের সীমানা থেকে বের করে দিয়ে শিক্ষামূলক শাস্তি দেয়া হয়েছিল। এর পর নবী করীম (সঃ) আর কোন দিনই কোন লোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেহচুত করেননি, বরং তিনি তা থেকে নিষেধ করেন। জন্মুর সাথেও

এক্লপ ব্যবহার নিষিদ্ধ। কেউ কেউ বলেন, হত্যার পর তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ওরা বানু সালীম গোত্রের লোক ছিল। কোন কোন মনীষী বলেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাদেরকে যে শাস্তি দিয়েছিলেন তা আল্লাহ তা'আলার পছন্দ হয়নি এবং এ আয়াত দ্বারা এটা মানসূখ বা রহিত করে দেয়া হয়েছে। তাদের মতে এ আয়াতে যেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ শাস্তি দেয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন **عَنَّ اللَّهِ عَنْكُمْ**-এ আয়াতটি। কারও কারও মতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) “মুসলা” অর্থাৎ নাক, কান কেটে নিতে যে নিষেধ করেছেন তা দ্বারা এ শাস্তি মানসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু এতে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। তারপর এটা ও জিজ্ঞাস্য বিষয় যে, মানসূখকারীর বিলম্বের দলীল কি? কেউ কেউ বলেন যে, এটা হচ্ছে ইসলামের হদ স্থিরীকরণের পূর্বেকার ঘটনা। কিন্তু এটা ও মোটেই ঠিক নয়, বরং স্থিরীকরণের পরের ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। কেননা, এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হচ্ছে হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)। আর তিনি সূরা মায়িদাহ অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের চোখে গরম শলাকা ভরে দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল তখন তিনি তা থেকে বিরত থাকলেন। কিন্তু এটা ও সঠিক কথা নয়। কেননা, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এ শব্দ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের চোখে গরম শলাকা ভরে দিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে আজলান বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে যে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন তা যে উচিত ছিল না এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। যাতে উচিত শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে আর তা হচ্ছে হাত-পা বিপরীতভাবে কেটে নেয়া এবং দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া। আর দেখা যাচ্ছে যে, এরপর আর কোনদিন কারও চোখে গরম শলাকা ভরে দেয়া হয়েছে বলে কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু ইমাম আওয়ায়ী (রঃ) বলেন যে, তারা যা করেছিল তারই প্রতিফল তারা পেয়েছিল। এখন যে আয়াত নাযিল হলো তাতে এক্লপ লোকদের জন্যে একটা বিশেষ হৃকুম বর্ণনা করা হলো এবং তাতে চোখে গরম শলাকা ভরে দেয়ার হৃকুম দেয়া হলো না। এ আয়াত দ্বারা জমতুর উলামা এ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, পথ বৰ্ক করে দিয়ে যুদ্ধ করা এবং শহরে যুদ্ধ করা দু'টোই সমান। কেননা, আয়াতে **بَسْعَوْنَ فِي لَأْرَضٍ فَسَادًا** শব্দগুলো রয়েছে। মালিক, আলয়াঙ্গ এবং শাফিউর (আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় হোন) এটাই মাযহাব যে, বিদ্রোহীরা শহরের ভেতরেই এসব হাঙ্গামা

সৃষ্টি করুক বা শহরের বাইরেই করুক, তাদের শাস্তি এটাই। এমনকি ইমাম মালিক (রঃ) তো এতদূর পর্যন্ত বলেন যে, কোন লোক অপর কোন লোককে তার বাড়ীতে এ ধরনের প্রতারণা করে হত্যা করলে তাকে ধরে আনা হবে এবং তার কাছে যেসব মাল ও আসবাবপত্র রয়েছে সবগুলোই ছিনিয়ে নেয়া হবে। আর সাথে সাথে তাকে হত্যা করে ফেলা হবে। সমসাময়িক ইমামই এ কাজ করবেন, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকেরা নয়। এমনকি যদি তারা (অভিভাবকেরা) তাকে ক্ষমা করে দিতে চায় তবুও তাদেরকে এ অধিকার দেয়া হবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মাযহাব এটা নয়। তিনি বলেন, যে **مُحَارِبٌ** ঐ সময় মেনে নেয়া হবে যখন কেউ শহরের বাইরে এরূপ হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। কেননা, শহরে তো সাহায্য পাওয়ার সন্ধাবনা রয়েছে। কিন্তু শহরের বাইরে এর কোনই সন্ধাবনা নেই। এ বিদ্রোহীদের যে শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের উপর তরবারী উঠাবে এবং পথকে বিপজ্জনক করে তুলবে, তাকে মুসলমানদের ইমাম উল্লিখিত তিনটি শাস্তির যে কোন একটি দিতে পারেন। আরও অনেকেরই এটাই উক্তি। আর অন্যান্য আয়াতের হুকুমের মধ্যেও এ ধরনের অধিকার বিদ্যমান রয়েছে। যেমন হজ্রের ইহরামের অবস্থায় কেউ শিকার করলে তাকে সেই শিকারের সমপর্যায়ের জন্ম কুরবানী করতে হয় বা মিসকীনদেরকে খানা খাওয়াতে হয় কিংবা সেই বরাবর রোয়া রাখতে হয়। অনুরূপভাবে রোগ বা মাথার অসুখের কারণে কেউ ইহরামের অবস্থায় মাথা মুণ্ডন করালে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাকে রোয়া, সাদকা বা কুরবানী করতে হয়। তদুপ কসমের কাফ্ফারায় মধ্যমভাবে দশজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানোর বা তাদেরকে কাপড় পরানোর অথবা একটি গোলাম আয়াদ করণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাহলে যেমন এখানে এ অবস্থাগুলোর মধ্য হতে যে কোন একটি পছন্দ করে নেয়ার অধিকার রয়েছে, ঠিক তেমনই বিদ্রোহী ধর্মত্যাগীদের শাস্তি ও হচ্ছে হত্যা অথবা বিপরীতভাবে হাত-পা কেটে নেয়া কিংবা দেশ হতে বিতাড়িত করা। আর জমহুরের উক্তি এই যে, এ আয়াতটি কয়েক অবস্থার সাথে জড়িত। যখন ডাকাত হত্যা ও লুঠপাট উভয় অপরাধে অপরাধী হবে তখন সে শূলেও হত্যার যোগ্য হবে। আর যদি শুধু হত্যার দোষে দোষী হয় তবে হত্যার বদলে শুধু হত্যাই করা হবে। যদি শুধু মাল নেয় তবে উল্টোভাবে হাত-পা কেটে নিতে হবে অর্থাৎ এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা- এভাবে কেটে নিতে হবে। আর যদি পথকে ভীতিপূর্ণ করে তোলে এবং জনগণের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, এছাড়া অন্য কোন পাপে লিঙ্গ না হয় তবে

শুধু তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। অধিকাংশ মনীষী ও ইমামদের মাযহাব এটাই। তারপর মনীষীদের মধ্যে এ ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে যে, তাকে শুধু শূলের উপর লটকিয়ে দিয়েই কি ছেড়ে দেয়া হবে, যাতে সে ক্ষুধার্ত ও ত্বক্ষার্ত অবস্থায় মারা যাবে? না বর্ণা ইত্যাদি দ্বারা হত্যা করা হবে, যাতে মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে? না তিনি দিন পর্যন্ত শূলেই রাখা হবে, তারপর নামিয়ে নেয়া হবে? না এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে? কিন্তু এটা তাফসীরের স্থান নয় যে, আমরা ছোটখাটো মতভেদ নিয়েই পড়ে থাকব এবং প্রত্যেকেরই দলীল পেশ করব। হ্যাঁ, তবে একটি হাদীসে শাস্তির কিছু বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ওর সনদ যদি সহীহ হয় তাহলে তা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ঐ বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের সম্পর্কে জিবরাইল (আঃ)-কে জিজেস করলেন তখন তিনি বললেন : “যারা মাল চুরি করবে এবং পথকে বিপজ্জনক করে তুলবে তাদের হাত চুরির বদলে কেটে নেয়া হবে, যে হত্যা করবে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। আর যে হত্যা করবে, পথকে বিপজ্জনক করে তুলবে এবং ব্যভিচার করবে তাকে শূলের উপর ঢাকিয়ে দিবে।”

أَوْ يَنْفُوا مِنَ الْأَرْضِ অথবা بৃ-পৃষ্ঠ হতে বের করে দেয়া হবে। অর্থাৎ তাদেরকে অনুসন্ধান করে তাদের উপর হদ কায়েম করা হবে অথবা দারুল ইসলাম থেকে বের করে দেয়া হবে, যেন তারা অন্য কোথায়ও চলে যায়। কিংবা এক শহর থেকে অন্য কোন শহরে এবং সেই শহর থেকে আর এক শহরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। অথবা ইসলামী রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণরূপেই বের করে দেয়া হবে। শা'বী (রঃ) তো শুধু বের করেই দিতেন। আর আতা' খোরাসানী (রঃ) বলেন যে, এক সেনাবাহিনী থেকে অন্য সেনাবাহিনীর মধ্যে পৌছিয়ে দেয়া হবে। এমনিভাবে তাকে কয়েক বছর পর্যন্ত যেখানে সেখানে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো হবে। কিন্তু তাকে দারুল ইসলাম থেকে বের করা হবে না। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এবং তাঁর সহচরগণ বলেন যে, তাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হবে। ইবনে জারীর (রঃ)-এর পছন্দনীয় কথা এই যে, তাকে তার নিজের শহর থেকে বের করে দিয়ে অন্য কোন শহরের জেলখানায় ভরে দেয়া হবে।

أَذْلِكَ لِهُمْ خَزِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَلِهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ<sup>৬০</sup> আয়াতের এ অংশটি ঐ সব লোকের পক্ষপাতিত্ব করছে যাঁরা বলেন যে, এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবর্তীণ হয়েছে এবং মুসলমানদের ব্যাপারে রয়েছে ঐ বিশুদ্ধ হাদীসটি যাতে আছে যে, বর্ণনাকারী হ্যারত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট থেকে ঐ অঙ্গীকারই গ্রহণ করেন যা তিনি স্ত্রীলোকদের

নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তা হচ্ছে—আমরা যেন চুরি না করি, ব্যভিচারে লিঙ্গ না হই, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা না করি এবং একে অপরের নাফরমানী না করি।<sup>১</sup> যারা এ অঙ্গীকার পূর্ণ করবে তাদের পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর দায়িত্বে। আর যারা এগুলোর মধ্যে কোন একটি পাপকার্যে লিঙ্গ হবে এবং ওর শাস্তি ও প্রাণ্ড হবে তবে সেটাই তার সেই পাপের প্রায়শিত্ব হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ সেটা গোপন করেন তবে তার সে বিষয়ের দায়িত্ব তাঁরই উপর থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দেবেন এবং ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন। হ্যরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি কোন পাপকাজ করলো, অতঃপর তাকে শাস্তি দেয়া হলো, তাহলে আল্লাহ যে তাকে পুনরায় শাস্তি দেবেন এ থেকে তাঁর আদল ও ইনসাফ বহু উর্ধ্বে। আর যে ব্যক্তি কোন পাপ করলো, অতঃপর আল্লাহ তা দেকে নিলেন এবং ক্ষমা করে দিলেন, তবে আল্লাহর করুণা এর বহু উর্ধ্বে যে, তিনি তাঁর বান্দার কোন পাপ ক্ষমা করে দেয়ার পর আবার ওর শাস্তি ফিরিয়ে আনবেন।<sup>২</sup> তবে এ শাস্তিপ্রাপ্তির পর যদি তাওবা ছাড়াই মারা যায় তবে পরকালের শাস্তি বার্কি থেকে যাবে, যার সঠিক কল্পনা করাও এখন অসম্ভব। হ্যাঁ, তবে যদি তাওবা নসৌব হয় তাহলে অন্য কথা। তারপর তাওবাকারীদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার প্রকাশ এ অবস্থায় তো স্পষ্ট যে, এ আয়াতকে মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ মেনে নেয়া হবে। কিন্তু যে মুসলমান বিদ্রোহী হবে এবং সে অধিকারে আসার পূর্বেই যদি তাওবা করে নেয় তবে তার উপর হত্যা, শূল এবং পা কেটে নেয়া তো প্রযোজ্য হবেই না, এমনকি তার হাতও কাটা যাবে কি না এ ব্যাপারে আলেমদের দুটি উক্তি রয়েছে। আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা এটা জানা যাচ্ছে যে, সমস্ত শাস্তিই তার উপর থেকে উঠে যাবে। সাহাবীদের আমলও এরই উপর রয়েছে। যেমন জারিয়া ইবনে বদর তাইমী বসরী যমীনে ফাসাদ বা হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এ ব্যাপারে কয়েকজন কুরাইশী হ্যরত আলী (রাঃ)-এর নিকট সুপারিশ করেন, যাঁদের মধ্যে হ্যরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রাঃ) এবং হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফরও (রাঃ) ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে নিরাপত্তা দান করতে অস্বীকার করেন। জারিয়া ইবনে বদর তখন সাইদ ইবনে কায়েস

১. অর্থাৎ কেউ যেন কারও উপর মিথ্যা অপবাদ না দেয়।

২. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ), তিরমিয়ী (রঃ) এবং ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

(রাঃ)-এর নিকট আগমন করে। তিনি তাকে নিজের বাড়ীতে রেখে হ্যরত আলী (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন এবং তাকে বলেনঃ আচ্ছা বলুন তো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যামীনে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করে, অতঃপর তিনি এ আয়াতগুলো ‘**مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ**’ পর্যন্ত পাঠ করেন। তখন হ্যরত আলী (রাঃ) বলেনঃ “এরপ ব্যক্তির জন্যে তো আমি নিরাপত্তা দান করবো।” হ্যরত সাইদ (রাঃ) তখন বলেনঃ “সে হচ্ছে জারিয়া ইবনে বদর।” এরপর জারিয়া তাঁর প্রশংসায় কবিতাও রচনা করেন।

ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মুরাদ গোত্রের একটি লোক কুফার মসজিদে কোন এক ফরয নামাযের পরে হ্যরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)-এর নিকট আগমন করে। সে সময় তিনি কুফার শাসনকর্তা ছিলেন। লোকটি এসে তাঁকে বলেঃ “হে আমীরে কুফা! আমি মুরাদ গোত্রের অমুকের পুত্র অমুক। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে লড়েছি এবং ভূ-পৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। কিন্তু আপনারা আমার উপর ক্ষমতা লাভ করার পূর্বেই তাওবা করেছি। আমি এখন আপনার আশ্রয়স্থলে দাঁড়িয়েছি।” একথা শুনে হ্যরত আবু মুসা আশআরী দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ “হে লোক সকল! এ তাওবার পরে তোমাদের কেউ যেন এর সাথে কোন প্রকারের দুর্ব্যবহার না করে। যদি সে তার তাওবায় সত্যবাদী হয় তবে তো ভাল কথা, আর যদি সে মিথ্যবাদী হয় তবে তার পাপই তাকে ধ্রংস করবে।” লোকটি কিছুকাল পর্যন্ত তো ঠিকভাবেই থাকলো। তারপর সে পুনরায় মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলাও তাকে তার পাপের কারণে ধ্রংস করে দিলেন এবং তাকে হত্যা করা হলো।

ইবনে জারীর (রাঃ) আরও বর্ণনা করেছেন যে, আলী আসাদী নামক একটি লোক মানুষের পথকে বিপজ্জনক করে তোলে। সে মানুষকে হত্যা করে এবং তাদের মালধন লুঠপাট করতে থাকে। বাদশাহ, সেনাবাহিনী এবং জনসাধারণ সদা তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টায় থাকে, কিন্তু অকৃতকার্য হয়। একদা সে জঙ্গলে অবস্থান করছিল এমন সময় একটি লোককে কুরআন পাঠ করতে শুনলো। লোকটি সেই সময় ‘**قُلْ يَعِبَادِي اللَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ**’ (৩৯: ৫৩)-এ আয়াটি পাঠ করছিল। এটা শুনে সে থমকে দাঁড়ালো এবং তাকে বললোঃ “হে আল্লাহর বান্দা! এ আয়াটি পুনরায় আমাকে পাঠ করে শুনো। লোকটি আবার তা পাঠ করলো। তখন আলী স্বীয় তরবারীখানা খাপে রেখে দিল। তৎক্ষণাত্ম সে বিশুদ্ধ মনে তাওবা করলো এবং ফজরের নামাযের পূর্বেই

মদীনায় পৌছে গেল। তার পর গোসল করলো এবং মসজিদে নবৰীতে (সঃ) প্রবেশ করে জামাআতে ফজরের নামায আদায় করলো। নামায শেষে লোকেরা হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর পাশে বসে পড়লো। সেও তখন তাদেরই মধ্যে একধারে বসে গেল। ফর্সা হয়ে গেলে লোকেরা তাকে দেখে চিনে ফেললো এবং তাকে ঘ্রেফতার করতে উদ্যত হলো। সে বললোঃ “দেখুন, আমার উপর আপনাদের ক্ষমতা লাভ হওয়ার পূর্বেই আমি তাওবা করেছি এবং তাওবা করার পর আপনাদের নিকট হাধির হয়েছি। সুতরাং এখন আমার উপর আপনাদের বল প্রয়োগের কোন পথ নেই।” তখন হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বললেনঃ “লোকটি সত্য কথাই বলেছে।” অতঃপর তিনি তার হাত ধরে মারওয়ান ইবনে হাকামের নিকট নিয়ে গেলেন। সে সময় তিনি মুআবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁকে বললেনঃ “এ হচ্ছে আলী আসাদী, সে তাওবা করেছে সুতরাং এর উপর আপনি কোন বল প্রয়োগ করতে পারেন না।” ফলে কেউই তার সাথে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করলেন না। মুজাহিদের একটি দল যখন রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে রওয়ানা হলেন, “তাঁদের সাথে এ আলী আসাদীও গেল। তাঁদের নৌকা সমুদ্রে চলছিল। তাঁদের সামনে রোমকদের কতগুলো নৌকা এসে পড়লো। তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্যে সে নিজেদের নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ে তাদের নৌকায় গিয়ে উঠলো। তারা তার তরবারীর চমক সহ্য করতে না পেরে পালে টান দিল। আলীও তাদের পশ্চাদ্বাবন করলো। নৌকার ভারসাম্য নষ্ট হলো। ফলে নৌকা ডুবে গেলো এবং রোমকদের সবাই ডুবে মরলো। তাদের সাথে হ্যরত আলী আসাদীও (রাঃ) ডুবে গিয়ে শাহাদত বরণ করলো।

৩৫। হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর সাম্রিধ্য অব্রেষণ কর ও আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাক, আশা যে, তোমরা সফলকাম হবে।

৩৬। নিশ্চয়ই যারা কাফির, যদি তাদের কাছে বিশ্বের সমস্ত দ্রব্যও থাকে এবং ওর সাথে তৎপরিমাণ আরও হয় যেন তারা তা প্রদান করে

٣٥ - يَا يَهُا الَّذِينَ أَمْنَوْا اتَّقُوا

اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ  
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لِعَلَكُمْ  
تُفْلِحُونَ ○

٣٦ - إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْا نَلَهُمْ  
مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ

কিয়ামতের শান্তি থেকে মুক্ত  
হয়ে যায়, তবুও এ দ্রব্যসমূহ  
তাদের থেকে ক্ষুল করা হবে  
না, আর তাদের জন্যে রয়েছে  
যন্ত্রণাদায়ক শান্তি।

৩৭। তারা এটা কামনা করবে যে,  
জাহানাম থেকে বের হয়ে যায়,  
অথচ তারা তা থেকে কখনও  
বের হতে পারবে না, বস্তুতঃ  
তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী  
শান্তি।

এখানে তাকওয়া ও সংযমশীলতার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং সেটাও আবার  
আনুগত্যের সাথে মিশ্রিতভাবে। ভাবার্থ এই যে, মানুষ যেন আল্লাহ পাকের  
নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে।  
'ওয়াসীলা'র অর্থ হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। হ্যরত  
মুজাহিদ, হ্যরত আবু ওয়ায়েল, হ্যরত হাসান, হ্যরত যায়েদ (আল্লাহ তাঁদের  
সকলের প্রতি সদয় হোন) প্রমুখ মুফাস্সিরগণ হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

কাতাদাহ (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে- আল্লাহ পাকের আনুগত্য  
স্বীকার করে এবং তাঁর মর্জি মুতাবিক আমল করে তাঁর নৈকট্য লাভ করা।  
ইবনে যায়েদ (রঃ) নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেনঃ

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِتَسْفِيْنِ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيْلَةُ

অর্থাৎ তারা তো ওরাই যারা তাদের প্রভুর নৈকট্য অনুসন্ধান করে থাকে।  
(১৭: ৫৭) এ ইমামগণ শব্দটির যে অর্থ করেছেন তার উপর সমস্ত  
মুফাস্সিরেরই ইজমা রয়েছে। তাঁদের কেউ এর বিপরীত অর্থ করেননি। ইমাম  
ইবনে জারীর (রঃ) এর উপর একটি আরবী কবিতাও পেশ করেছেন, যাতে  
ওয়াসীলাহ শব্দটি নৈকট্যের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ওয়াসীলাহ-এর অর্থ ঐ  
জিনিস যার দ্বারা আকাঙ্খিত বস্তু লাভ করা যায়। ওয়াসীলাহ জান্নাতের ঐ উচ্চ ও  
মনোরম জায়গার নাম যা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জায়গা এবং সেটা আরশের অতি  
নিকটে। সহীহ বুখারীতে হ্যরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত

معه ليفتدوا به من عذاب  
يوم القيمة ماتقبل منهم  
ولهم عذاب أليم

-৩৭-  
رِبِّيْدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ  
النَّارِ وَمَا هُم بِخَرْجٍ مِنْهَا  
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ

আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি আযান শুনে اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّعْوَةِ تَامُّ الْتَّائِبَةِ -এ দু'আটি পাঠ করে তার জন্যে কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত হালাল হয়ে যাবে ।” সহীহ মুসলিমে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন তোমরা আযান শুনবে তখন মুআধ্যিন যা বলে তোমরাও তা-ই বল, তারপর আমার উপর দরদ পাঠ কর, এক দরদের বিনিময়ে তোমাদের উপর আল্লাহ দশটি রহমত নাখিল করবেন । এরপর আমার জন্যে তোমরা আল্লাহর নিকট ওয়াসীলা যাঞ্চা কর । ওটা হচ্ছে জাম্বাতের একটি মনখিল যা শুধু একটি বান্দা লাভ করবে । আশা করি যে, ঐ বান্দা আমিই । সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্যে ওয়াসীলা প্রার্থনা করলো তার জন্যে আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে গেল ।” হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন তোমরা আমার উপর দরদ পাঠ করবে তখন আমার জন্যে ওয়াসীলা প্রার্থনা করবে ।” তখন জিজ্ঞেস করা হলোঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ওয়াসীলা কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ “ওটা হচ্ছে জাম্বাতের একটি উঁচু স্থান যা একটিমাত্র লোক লাভ করবে । আমি আশা করি যে, সেই লোকটি আমিই ।”<sup>১</sup> হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা আমার জন্যে আল্লাহর নিকট ওয়াসীলা যাঞ্চা কর । যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আমার জন্যে এ প্রার্থনা করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্যে সাক্ষী ও সুপারিশকারী হয়ে যাবো ।” অন্য একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “জাম্বাতে ওয়াসীলা অপেক্ষা বড় জায়গা আর নেই । অতএব, তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্যে ওয়াসীলা প্রাপ্তির প্রার্থনা কর ।” একটি গারীব ও মুনকার হাদীসে এতটুকু বেশীও রয়েছে যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলোঃ এই ওয়াসীলায় আপনার সাথে আর কে থাকবেন? উত্তরে তিনি হ্যরত ফাতিমা (রাঃ) এবং হ্যরত হাসান (রাঃ) ও হ্যরত হসাইন (রাঃ)-এর নাম উচ্চারণ করেন । আর একটি অত্যন্ত গারীব হাদীসে আছে যে, একদা হ্যরত আলী (রাঃ) কুফার মসজিদের মিস্ত্রে দাঁড়িয়ে বলেনঃ জাম্বাতে দু'টি মুক্তা রয়েছে, একটি সাদা ও অপরটি হলদে । হলদেটি তো আরশের নীচে রয়েছে । আর মাকামে মাহমুদ হচ্ছে সাদা মুক্তার তৈরী, যাতে সন্তুর হাজার প্রাসাদ রয়েছে, যেগুলোর প্রত্যেকটি তিন মাইলের সমান । ওর দরজা, জানালা, আসন ইত্যাদি যেন একই মূলের তৈরী । ওরই নাম হচ্ছে ওয়াসীলা । ওটাই হচ্ছে মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর আহলে বায়তের জন্যে ।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন ।

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لِعْلَكُمْ تَفْلِحُونَ<sup>۱۶</sup> তাকওয়া অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয়গুলো হতে বিরত থাকা এবং আদিষ্ট বিষয়গুলো মনে চলার নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর। মুশরিক, কাফির অর্থাৎ যারা তাঁর শক্র, যারা তাঁর দ্঵ীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাঁর সরল সঠিক পথ থেকে সরে পড়েছে, তোমরা তাদেরকে হত্যা কর। আর এসব মুজাহিদ হচ্ছে সফলকাম। কৃতকার্য্যতা, সৌভাগ্য এবং মর্যাদা তাদেরই। জাল্লাতের উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা এবং আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত তাদেরই জন্যে। তাদেরকে এ জাল্লাতে প্রবেশ করানো হবে, যেখানে মৃত্যু ও ধৰ্ম নেই, যেখানে ঘাটতি ও লোকসান নেই, যেখানে রয়েছে চির ঘৌবন, অটুট স্বাস্থ্য এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি।

সীয় প্রিয়পাত্রদের উত্তম পরিগাম বর্ণনা করার পর এখন আল্লাহ পাক তাঁর শক্রদের মন্দ পরিগামের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন- তাদেরকে এমন কঠিন ও জঘন্য শান্তি দেয়া হবে যে, সেই সময় যদি তারা সারা বিশ্বের অধিপতি হয়ে যায় এমনকি আরও এরই সমান হয় এবং এমতাবস্থায় সেই কঠিনতম শান্তি থেকে বাঁচার জন্যে বিনিময় হিসেবে এ সবগুলো দিতেও চায় তবুও তাদের থেকে সেগুলো গ্রহণ করা হবে না। বরং যে শান্তি তাদের উপর হবে তা হবে চিরস্থায়ী শান্তি। তা হতে কোনক্রমেই রক্ষা পাওয়া যাবে না। অন্য জায়গায় রয়েছে- জাহান্নামীরা যখন জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে তখন পুনরায় তাদেরকে ওরই মধ্যে ফিরিয়ে আনা হবে। জুলন্ত অগ্নিশিখার সাথে যখন তারা উপরে উঠে আসবে তখন তাদেরকে লোহার হাতুড় মেরে মেরে পুনরায় জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করা হবে। মোটকথা তাদের সেই চিরস্থায়ী শান্তি থেকে বের হওয়া অসম্ভব। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “জাহান্নামের একটি লোককে আনয়ন করা হবে। তারপরে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে-হে আদম সন্তান! তোমার জায়গা কেমন পেয়েছো?” সে উত্তরে বলবেঃ “আমার জায়গা অত্যন্ত খারাপ পেয়েছি।” আবার তাকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ “তুমি কি এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ প্রদানে সম্মত আছো?” সে উত্তর দেবেঃ “হে আমার প্রভু! হ্যাঁ (আমি সম্মত আছি।)” তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেনঃ “তুমি মিথ্যা বলছো। আমি তো তোমার কাছে এর চেয়েও বহু কম চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি সেটাও দাওনি।” অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।<sup>১</sup> হ্যরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “এক দল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে জাল্লাতে প্রবেশ করানো হবে।” বর্ণনাকারী

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাই হ্যরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে মারফু়’রূপে বর্ণনা করেছেন।

হ্যরত ইয়ায়ীদ ফকীর (রঃ) বলেনঃ আমি যখন হ্যরত জাবির (রাঃ)-কে  
 জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে **بِرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجٍ مِّنْهَا**  
 অর্থাৎ তারা জাহানাম থেকে বের হতে চাইবে কিন্তু তা থেকে তারা বের হতে  
 পারবে না-এ আয়াতের অর্থ কি হবে? তখন তিনি বললেনঃ এর পূর্বের  
 আয়াতটি **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْا نَلَمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِيُفْتَدِوا بِهِ**  
 কর। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এরা কাফির। সুতরাং কখনও  
 জাহানাম হতে বের হতে পারবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে-হ্যরত ইয়ায়ীদেরও এ  
 বিশ্বাস ছিল যে, জাহানাম থেকে কেউই বের হতে পারবে না, কাজেই উপরোক্ত  
 হাদীসটি শুনে তিনি হ্যরত জাবির (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আমার অন্য  
 লোকের উপর তো কোন দুঃখ নেই। আমার দুঃখ শুধু আপনাদের ন্যায়  
 সাহাবীদের উপর যে, আপনারাও কুরআন কারীমের বিপরীত কথা বলে থাকেনঃ  
 ঐ সময় আমার খুব রাগও হয়েছিল। আমার এ কথা শুনে হ্যরত জাবির  
 (রাঃ)-এর সঙ্গীগণ আমাকে খুব ধমক দেন। কিন্তু হ্যরত জাবির (রাঃ) অত্যন্ত  
 সহিষ্ণু ছিলেন বলে আমাকে বুঝিয়ে বললেনঃ “কুরআন কারীমে যাদের জাহানাম  
 থেকে বের না হওয়ার বর্ণনা রয়েছে তারা হচ্ছে কাফির। তুমি কি কুরআন  
 পড়নি?” আমি উত্তরে বললামঃ হ্যাঁ, পড়েছি। আমার সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ  
 আছে। তখন তিনি বলেনঃ তাহলে তোমার কি কুরআনের **وَمِنَ الْبَلِ فَتَهْجِدُ بِهِ** (১৭: ৭৯)-এ<sup>১</sup> আয়াতটি স্মরণ নেইঃ এ আয়াতে মাকামে মাহমুদের উল্লেখ  
 রয়েছে। আর এটা হচ্ছে শাফাআতের জায়গা। আল্লাহ তা'আলা কতক লোককে  
 তাদের পাপের কারণে জাহানামে নিষ্কেপ করবেন এবং যতদিন ইচ্ছা জাহানামে  
 রাখবেন। তারপর যখন ইচ্ছা তাদেরকে তিনি জাহানাম থেকে মুক্তি দেবেন।  
 হ্যরত ইয়ায়ীদ (রঃ) বলেন-এরপর থেকে আমার ধারণা শুধরে যায়।

হ্যরত তলাক ইবনে হাবীব (রঃ) বলেনঃ “আমিও জাহানামীদের জন্যে  
 শাফাআতের অঙ্গীকারকারী ছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি হ্যরত জাবির ইবনে  
 আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি। অতঃপর আমার দাবী সাব্যস্তকরণে  
 যেসব আয়াতে জাহানামে চির অবস্থানের বর্ণনা রয়েছে সেগুলো পাঠ করে  
 শুনাই। তিনি শুনে বলেনঃ “হে তলাক! তুমি কি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল  
 (সঃ)-এর সুন্নাতের ইলমের বিষয়ে নিজেকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করঃ জেনে  
 রেখো যে, যেসব আয়াত তুমি পাঠ করে শুনালে সেগুলো হচ্ছে জাহানামের  
 অধিবাসী অর্থাৎ মুশরিকদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। কিন্তু যারা জাহানাম থেকে বের

১. এটা হাফিয় ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হবে তারা এসব লোক যারা মুশরিক নয়, তবে পাপী। পাপ অনুযায়ী শাস্তি ভোগের পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।” হ্যরত জাবির (রাঃ) এসব বলার পর স্বীয় হাত দু’টি দ্বারা স্বীয় কান দু’টির দিকে ইশারা করে বলেনঃ আমি যদি আল্লাহর রাসূল (সঃ) থেকে শুনে না থাকি যে, জাহান্নামে প্রবেশের পরও মানুষকে তা থেকে বের করা হবে তবে আমার এ দু’টি (কান) বধির হয়ে যাক। আল-কুরআনের আয়াতগুলো যেমন তোমরা পড় তেমন আমিও পড়ি।<sup>১</sup>

৩৮। আর যে পুরুষ ছুরি করে

এবং যে নারী ছুরি করে, তোমরা তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে তাদের (ডান) হাত কেটে ফেল, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি, আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, মহা প্রজ্ঞাময়।

৩৯। অনন্তর যে ব্যক্তি

সীমালংঘন করার পর (ছুরি করার পর) তাওবা করে নেয় এবং আমলকে সংশোধন করে নেয়, তবে আল্লাহ তার প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

৪০। তুমি কি জান যে, আল্লাহরই জন্যে রয়েছে আধিপত্য আসমান সমূহের এবং যমীনের; তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন; আর আল্লাহ সব বিষয়ের উপয় পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৩৮- **وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ**

**فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ**

**عَزِيزٌ حَكِيمٌ**

৩৯- **فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ**

**وَاصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ**

**إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ**

৪- **أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لِهِ مُلْكُ**

**السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْذِبُ مَنْ**

**يُشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يُشَاءُ**

**وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**

১. এ হাদীসটি ইবনে মিরদুওয়াই বর্ণনা করেছেন।

হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতে ﴿فَأَنْطَعُوا أَيْدِيهِمَا﴾ রয়েছে। এ কিরআতটি খুবই বিরল হলেও আমল কিন্তু এর উপরই। তবে আমল এই কিরআতের কারণে নয়, বরং অন্যান্য দলীল প্রমাণের উপর ভিত্তি করে। চোরের হাত কাটার নিয়ম ইসলাম পূর্ব যুগেও ছিল। ইসলাম একে বিস্তারিত এবং শৃংখলিত করেছে। অনুরূপভাবে কাসামাত, দিয়াত, ফারায়েফ প্রভৃতি মাসআলাও পূর্ব থেকেই ছিল। কিন্তু সেগুলো ছিল বিশৃংখল ও অসম্পূর্ণভাবে। ইসলাম ঐগুলোকে ঠিকঠাক করে দিয়েছে। একটা উক্তি এটাও আছে যে, কুরাইশীরা সর্বপ্রথম চুরির অপরাধে ‘খুয়াআ’ গোত্রের দুওয়াইক নামক একটি লোকের হাত কেটে নিয়েছিল। সে কা’বা ঘরের গেলাফ বা আবরণ চুরি করেছিল। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, চোরেরা ওটা তার নিকট রেখে দিয়েছিল। কতক ধর্মশাস্ত্রবিদের অভিমত এই যে, চুরির বস্তুর কোন সীমা নেই। তা অল্লেই হোক আর বেশীই হোক এবং সুরক্ষিত জায়গা থেকে চুরি করে থাক বা অরক্ষিত জায়গা থেকে চুরি করে থাক, সর্বাবস্থাতেই চোরের হাত কাটা..যাবে। হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি সাধারণ। তাহলে এ উক্তিটির ভাবার্থ এটাও হতে পারে এবং অন্যটাও হতে পারে। যাঁরা উপরোক্ত মত পোষণ করেন তাঁদের একটি দলীল হচ্ছে এ হাদীসটি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ চোরের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন যে, সে সামান্য ডিম চুরি করে হাত কাটিয়ে নেয়, সে দড়ি বা রজ্জু চুরি করে, ফলে তার হাত কাটা হয়।” জমহুর উলামার অভিমত এই যে, চোরাই মালের সীমা নির্দিষ্ট আছে, যদিও সেই নির্দিষ্ট সীমার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, তিনটি খাঁটি রৌপ্যমুদ্রা বা এ পরিমাণ মূল্যের কোন জিনিস চুরি করলে হাত কাটা হবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি চোরের হাত একটা ঢাল চুরি করার অপরাধে কেটে নেয়ার কথা বর্ণিত আছে। আর ওর মূল্য এ পরিমাণই ছিল। একটি চোর দরজা বা জানালার উপরিস্থিত কাঠ চুরি করেছিল। এ অপরাধে হ্যরত উসমান (রাঃ) তার হাত কেটে নিয়েছিলেন। এ কাঠটির মূল্য তিনি দিরহামই ছিল। হ্যরত উসমান (রাঃ)-এর এ কাজটি যেন সাহাবায়ে কিরামের নীরব ইজমাই ছিল এবং এর দ্বারা এটাও সাব্যস্ত হচ্ছে যে, ফল চোরের হাত কেটে নেয়া হবে। হানাফীগণ এটা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে চোরাই মাল দশ দিরহাম মূল্যের হওয়া জরুরী। ইমাম শাফিস (রঃ) এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি চোরাই মালের জন্যে কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ

স্বর্ণমুদ্রা পরিমাণ মূল্য বা তার চেয়ে বেশী নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁর দলীল হচ্ছে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসটি। তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “এক চতুর্থাংশ স্বর্ণমুদ্রা বা তার চেয়ে বেশীতে চোরের হাত কেটে নেয়া হবে।” সহীহ মুসলিমে একটি হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “এক চতুর্থাংশ স্বর্ণমুদ্রা বা তার চেয়ে বেশী না হলে চোরের হাত কাটা যাবে না।” সুতরাং এ হাদীস স্পষ্টভাবে এ মাসআলার মীমাংসা করে দেয়। আর যে হাদীসে তিনি দিরহামে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চোরের হাত কেটে নেয়ার নির্দেশ বর্ণিত আছে, ওটা এর বিপরীত নয়। কেননা, ঐ সময় দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা বারোটি দিরহাম বা রৌপ্যমুদ্রা পরিমাণ মূল্যের ছিল। অতএব, মূল হচ্ছে এক চতুর্থাংশ দীনার, তিনি দিরহাম নয়। হ্যরত উমার ইবনে খাভাব (রাঃ), হ্যরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) এবং হ্যরত আলী ইবনে আবি তালিবও (রাঃ) এ কথাই বলেন। হ্যরত উমার ইবনে আবদুল আয়ীয় (রঃ), লায়েস ইবনে সাদ আওয়ায়ী (রঃ), ইমাম শাফিউদ্দীন (রঃ), ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রঃ) এবং আবু সাউর দাউদ ইবনে আলী যাহেরীও (রঃ) এটাই উক্তি।

এক রিওয়ায়াতে ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, চতুর্থাংশ দীনারই হোক বা তিনি দিরহামই হোক, দু’টোই হচ্ছে চোরের হাত কেটে ফেলার নেসাব। মুসনাদে আহমাদে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “এক চতুর্থাংশ দীনার মূল্যের বস্তু চুরিতে তোমরা চোরের হাত কেটে নাও, তার কম পরিমাণ মূল্যের জিনিস চুরিতে হাত কেটো না।” ঐ সময় দীনার ছিল বারো দিরহামের। সুতরাং এক চতুর্থাংশ দীনার তিনি দিরহামই হয়। সুনানে নাসাইর শব্দ হচ্ছে নিম্নরূপঃ “চোরের হাত ঢালের মূল্যের কমে কাটা হবে না।” হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজেস করা হয়ঃ ঢালের মূল্য কত? তিনি উত্তরে বলেনঃ “এক চতুর্থাংশ দীনার।” সুতরাং এ সমুদয় হাদীস দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হচ্ছে যে, হাত কাটার জন্যে দশ দিরহামের শর্ত করা ভুল। আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে যে ঢাল চুরির অপরাধে চোরের হাত কেটে নেয়া হয়েছিল ওর <sup>\*</sup> মূল্য ছিল দশ দিরহাম। যেমন আবু বকর ইবনে আবি শায়বা (রঃ) হ্যরত ইবনে আবুবাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ)-এর যুগে ঢালের মূল্য ছিল

দশ দিরহাম। আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘ঢালের মূল্যের কমে চোরের হাত কাটা হবে না।’ আর ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম। হানাফীগণ বলেনঃ ‘ঢালের মূল্যের ব্যাপারে হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) এবং হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর বিরোধিতা করেছেন। আর হৃদ্দের ব্যাপারে সাবধানতার উপর আমল করা উচিত এবং বেশীতেই সাবধানতা আছে। এ কারণেই আমরা চোরের হাত কাটার ব্যাপারে নেসাব নির্ধারণ করেছি দশ দিরহাম।’ পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষী বলেন যে, এর হ্দ হচ্ছে দশ দিরহাম বা এক দীনার। আলী ইবনে মাসউদ (রঃ), ইবরাহীম নখজ্জ (রঃ) এবং আবু জাফর (রঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। সাঙ্গে ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেন যে, পাঁচ দীনার বা পঞ্চাশ দিরহামের সমান মূল্যের দ্রব্য চুরি ছাড়া পঞ্চমাংশ কেটে নেয়া হবে না। যাহেরিয়্যার মাযহাব এই যে, চুরির মাল অল্পই হোক আর বেশীই হোক, তাতে হাত কেটে নেয়া হবে। তাদেরকে জমহুর এ উত্তর দিয়েছেন যে, প্রথমতঃ তো এ প্রয়োগই মানসূখ বা রহিত। কিন্তু এ উত্তর ঠিক নয়। কেননা, রহিত করণের ইতিহাসের কোন নিশ্চয়তা নেই। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, ডিমের ভাবার্থ হচ্ছে লোহার ডিম এবং রজ্জুর ভাবার্থ হচ্ছে নৌকার মূল্যবান রজ্জু। তৃতীয় উত্তর এই যে, পরিণামের দিকে লক্ষ্য রেখে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ চোর এ স্কুদ্র স্কুদ্র সাধারণ জিনিসগুলো চুরি করতে করতে শেষ পর্যন্ত মূল্যবান জিনিস চুরি করতে শুরু করে এবং এর ফলে তার হাত কেটে নেয়া হয়। আবার এও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ নির্দেশ ঘটনার বর্ণনা হিসেবে ছিল। অজ্ঞতার যুগে ছোট ছোট জিনিস চুরি করলেও হাত কেটে নেয়া হতো। সুতরাং তিনি হয়তো আফসোস করে এবং চোরকে লজ্জা দিতে গিয়ে বলেছিলেনঃ সে কতই না লাঞ্ছিত ও বেঙ্কুফ যে, সাধারণ জিনিসের কারণে হাতের মত এমন একটি নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্ণিত আছে যে, আবুল আলা মাআরবী যখন বাগদাদে আসে তখন সে এ ব্যাপারে বড় রকম আপত্তি করে বসে এবং তার মনে এ খেয়াল জাগে যে, তার এ আপত্তির কেউ কোন জবাব দিতে পারবে না। তাই সে এ ব্যাপারে একটি কবিতা রচনা করে। কবিতাটির অনুবাদ নিম্নরূপ-

‘যদি হাত কেটে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয় তবে এর দিয়্যাত হিসাবে পাঁচশ’ দেয়া হবে, আবার এই হাতকে মাত্র এক চতুর্থাংশ দীনার চুরির কারণে কেটে নেয়া হবেঃ এটা এমন একটি পরম্পর বিরোধী কথা যা আমার বোধগম্য হয় না,

কাজেই আমাকে নীবর থাকতে হয়, আর আমি আমার মাওলার নিকট  
জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” যখন তার এ উক্তির প্রসিদ্ধি  
লাভ ঘটলো তখন উলামায়ে কিরাম তার জবাব দিতে চাইলেন। এ দেখে সে  
পালিয়ে গেলো। কায়ী আবদুল অহ্মাব তার এ উক্তির জবাবে বলেছিলেনঃ  
“যতক্ষণ পর্যন্ত হাত বিশ্বস্ত ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তা মূল্যবান ছিল এবং যখন সে  
বিশ্বাসঘাতকতা করলো অর্থাৎ চুরি করলো তখন তার মূল্য কমে গেল।” কোন  
কোন মনীষী কিছু বিস্তারিতভাবে এর উত্তর দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেনঃ এর দ্বারা  
শরীয়তের পূর্ণ হিকমত প্রকাশ পাচ্ছে এবং দুনিয়ার শাস্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত  
হচ্ছে। তবে কেউ যদি কারও হাত বিনা কারণে কেটে দেয় তাহলে সে জন্যে বড়  
রকমের ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে লোক এ জঘন্য কাজ থেকে বিরত থাকে।  
সেখানে এ হৃকুমই উপযুক্ত ছিল। সামান্য জিনিস চুরি করার কারণে হাত কেটে  
নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে এ ভয়ে চুরির দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং  
এটাই তো হচ্ছে প্রকৃত হিকমতের পরিচয়। যদি চুরিতেও একটা নির্দিষ্ট  
পরিমাণের শর্ত লাগানো হতো তবে চুরির পথ বন্ধ হতো না। এটা কৃতকর্মেরই  
প্রতিফল। উচিত পস্তা এটাই যে, যে অঙ্গ দ্বারা সে অপরের ক্ষতিসাধন করেছে ঐ  
অঙ্গের উপরই শাস্তি হবে, যাতে তার যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হয় এবং অন্যেরাও সতর্ক  
হয়। আল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে প্রবল পরাক্রান্ত এবং স্বীয় আদেশ ও  
নিষেধের ব্যাপারে পূর্ণ বিজ্ঞানময়।

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاصْلَحَ فِي النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ -

যে ব্যক্তি  
সীমালংঘন করার পর অর্থাৎ চুরি করার পর তাওবা করে নেয় এবং আমলকে  
সংশোধন করে নেয়, তার প্রতি আল্লাহ (রহমতের) দৃষ্টি করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ  
পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি কারও মাল চুরি করার পর  
তা নিজের কাছেই রেখে দেয় তাহলে শুধুমাত্র তাওবা করলেই গুনাহ মাফ হবে  
না। যে পর্যন্ত না সেই মাল মালিককে ফিরিয়ে না দেবে অথবা ওর পূর্ণ মূল্য  
প্রদান করবে। জমতুর ইমামদের এটাই অভিমত। শুধুমাত্র ইমাম আবু হানীফা  
(রঃ) বলেন যে, যদি চুরির অপরাধে হাত কেটে নেয়া হয় এবং চোরাই মাল নষ্ট  
হয়ে গিয়ে থাকে তবে দুনিয়ায় ওর বদলা প্রদান করা তার উপর জরুরী নয়।  
ইমাম দারেকুত্নীর হাদীস গ্রন্থের একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ  
(সঃ)-এর সামনে একটি চোরকে হায়ির করা হয়। লোকটি একটি চাদর চুরি  
করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “আমার মনে হয় তুমি চুরি করনি।”

সে বলে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি চুরি করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদেরকে বলেনঃ “তোমরা একে নিয়ে গিয়ে হাত কেটে দাও।” তার হাত কেটে নেয়া হলে সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। তিনি তাকে বলেনঃ তাওবা কর। সে তখন তওবা করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করেছেন।”

সুনানে ইবনে মাজায় রয়েছে যে, হ্যরত উমার ইবনে সুমরা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি চুরি করে ফেলেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পবিত্র করে নিন। আমি অমুক কাবীলার উট চুরি করেছি।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন সেই কাবীলার লোকদের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে জানতে চান যে, ওটা সত্য কি-না। তারা বলেঃ “আমাদের একটি উট অবশ্যই চুরি হয়েছে।” তখন তাঁর নির্দেশক্রমে হ্যরত উমার ইবনে সুমরা (রাঃ)-এর হাত কেটে নেয়া হয়। তিনি তখন হাতকে সম্বোধন করে বলেনঃ “আমি সেই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যিনি আমার দেহ হতে তোমাকে পৃথক করে দিয়েছেন। তুমি আমার সমস্ত দেহকে জাহানামে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে।”

ইমাম আহমাদ (রঃ) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর যুগে একটি স্ত্রীলোক চুরি করেছিল। তখন যে লোকদের সে চুরি করেছিল তারা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। অতঃপর তারা বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ স্ত্রীলোকটি আমাদের চুরি করেছে।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ “তোমরা তার হাত কেটে নাও।” তার গোত্রীয় লোকেরা পুনরায় বলেঃ “আমরা তার মুক্তিপণ হিসেবে পাঁচশ' বর্ণমুদ্রা প্রদান করছি।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখনও বললেনঃ “তোমরা তার হাত কেটে নাও।” ফলে তার ডান হাত কেটে নেয়া হলো। স্ত্রীলোকটি তখন বললোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এতে আমার তাওবাও কি হয়ে গেল?” তিনি বললেনঃ “হ্যাঁ, তুমি পাপ থেকে এমন পাকসাফ হয়ে গেলে যে, যেন তুমি আজকেই জন্মগ্রহণ করলে।” তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ঐ স্ত্রীলোকটি ছিল মাখযুম গোত্রের। এ ঘটনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও আছে। স্ত্রীলোকটি সন্ত্রাস্ত বংশের ছিল বলে তার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে খুবই দুর্চিন্তা দেখা দেয় এবং তারা ইচ্ছা করে যে, রাসূলুল্লাহ

(সঃ)-কে তার সম্পর্কে কিছু সুপারিশ করা হোক। এ ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের সময় ঘটেছিল। অবশ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, হ্যরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)-এর মাধ্যমে সুপারিশ করা হোক। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। সুতরাং হ্যরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে তার জন্যে সুপারিশ করেন তখন তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং রাগতঃস্বরে বলেনঃ “উসামা (রাঃ)! তুমি আল্লাহর হস্ময়ের মধ্যে একটি হুদের ব্যাপারে সুপারিশ করছো?” একথা শুনে হ্যরত উসামা (রাঃ) অত্যন্ত ঘাবড়িয়ে যান এবং বলেনঃ “আমি বড়ই অপরাধ করে ফেলেছি, দয়া করে আমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।” সন্ধ্যার সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি ভাষণ প্রদান করেন। তাতে তিনি আল্লাহর পূর্ণ প্রশংসা ও স্তুতিবাদের পর বলেনঃ “তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ স্বভাবের কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে যখন কোন সন্ধান লোক চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিতো। পক্ষান্তরে কোন সাধারণ লোক চুরি করলে তার উপর হৃদ জারি করতো। যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদও (সঃ) চুরি করে তবে তারও হাত কেটে নেবো।” অতঃপর তাঁর নির্দেশক্রমে মহিলাটির হাত কেটে নেয়া হয়। হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ “এরপর ঐ মহিলাটি বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবা করে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারপর থেকে সে কোন কাজে কামে আমার কাছে আসতো এবং তার প্রয়োজনের কথা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে তুলে ধরতাম।”

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, একটি মহিলা লোকদের কাছ থেকে আসবাবপত্র ধার করতো, তারপর তা অঙ্গীকার করে বসতো। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার হাত কেটে নেয়ার নির্দেশ দেন। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, মহিলাটি এভাবে অলংকার গ্রহণ করতো এবং হ্যরত বিলাল (রাঃ)-কে তার হাত কেটে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আহকামের কিতাবগুলোর মধ্যে এ ধরনের বহু হাদীস রয়েছে যেগুলো চুরির সাথে সম্পর্কযুক্ত। আল্লাহ পাকের জন্যই সমৃদ্ধয় প্রশংসা। সমস্ত বাদশাহৰ বাদশাহ, সারা বিশ্বের প্রকৃত বাদশাহ এবং সঠিক শাসনকর্তা একমাত্র আল্লাহ, যাঁর কোন নির্দেশকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাঁর কোন ইচ্ছাকে কেউ বদলিয়ে দিতে সক্ষম নয়। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শান্তি দেন। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৪১। হে রাসূল (সঃ)! যারা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে কুফরীতে পতিত হয় (তাদের এ কর্ম) যেন তোমাকে চিন্তিত না করে, হয় তারা ঐসব লোকের মধ্য থেকেই হোক যারা নিজেদের মুখে তো (মিছামিছি) বলে- আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাস করেনি, অথবা তারা সেইসব লোকের মধ্য থেকেই হোক যারা ইয়াহুদী, তারা মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যন্ত, তারা তোমার কথাগুলো অন্য সম্প্রদায়ের জন্যে কান পেতে শোনে, যে সম্প্রদায়ের অবস্থা এরূপ যে, তারা তোমার নিকট আসেনি (বরং অন্যকে পাঠিয়েছে); তারা কালামকেও ওর স্থান থেকে পরিবর্তন করে থাকে, তারা বলে, যদি তোমরা (তথায় গিয়ে) এ (বিকৃত) বিধান পাও তবে তো তা কবূল করবে, আর যদি এ (বিকৃত) বিধান না পাও তবে বেঁচে থাকবে; আর যার অমঙ্গল আল্লাহরই মঙ্গল হয়, বস্তুতঃ তার জন্যে আল্লাহর সাথে তোমার কোন জোর চলতে পারে না; তারা এরূপ যে, তাদের অন্তরগুলো পবিত্র করা আল্লাহর অভিথায় নয়; তাদের জন্যে ইহলোকে রয়েছে অপমান এবং পরকালেও তাদের জন্যে রয়েছে ভীষণ শান্তি।

٤١- يَا يَهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزِنْكَ  
 الَّذِينَ يَسْأَلُونَ فِي الْكُفَّارِ  
 مِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّمَا  
 يَفْوَاهُهُمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ  
 وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَعُونَ  
 لِلْكَذِبِ سَمَعُونَ لِقَوْمٍ أَخْرَى  
 لَمْ يَاتُوكَ بِيَحْرَفُونَ الْكَلِمَ مِنْ  
 بَعْدِ مَوْاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنَّ  
 أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ  
 تَؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ  
 فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَسْمِلَكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ  
 شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدْ  
 اللَّهُ أَنْ يَطْهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي  
 الدُّنْيَا حَزْنٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
 عَذَابٌ عَظِيمٌ

৪২। তারা মিথ্যা কথা শুনতে  
অভ্যন্ত, হারাম বস্তু খেতে  
অভ্যন্ত, অতএব তারা যদি  
তোমার কাছে আসে, তবে হয়  
তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা  
করে দাও কিংবা তাদের থেকে  
বিরত থাক, আর যদি তুমি  
তাদের থেকে বিরতই থাক  
তবে তাদের সাধ্য নেই যে,  
তোমার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করে,  
আর যদি তুমি মীমাংসা কর  
তবে তাদের মধ্যে ন্যায়তঃ  
মীমাংসা করবে, নিশ্চয়ই  
আল্লাহ ন্যায় বিচারকদেরকে  
ভালবাসেন।

৪৩। আর তারা কিরণে তোমাকে  
মীমাংসাকারী বানিয়ে নিছে?  
অথচ তাদের কাছে তাওরাত  
রয়েছে, যাতে আল্লাহর বিধান  
বিদ্যমান! অতঃপর তারা  
এরপর (তোমার মীমাংসা  
হতে) ফিরে যায় আর তারা  
কখনও আস্থাবান নয়।

৪৪। আমি তাওরাত নাখিল  
করেছিলাম, যাতে হেদায়াত  
ছিল এবং (আনুষ্ঠানিক  
বিধানাবলীর) আলো ছিল,  
আল্লাহর অনুগত নবীরা  
তদনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে  
আদেশ করতো আর  
আল্লাহওয়ালাগণও এবং  
আলেমগণও, এ কারণে যে,

٤٢- سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ  
لِلسُّحْتِ فِيَنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ  
بَيْنَهُمْ أَوْ اغْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ  
تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضْرُوكَ  
شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاصْحَّمْ  
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ ○

٤٣- وَكَيْفَ يَحِكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ  
الْتَّوْرِةُ فِيهَا حِكْمَ اللَّهِ ثُمَّ  
يَتَولَّنَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا  
أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝

٤٤- إِنَا أَنْزَلْنَا التَّوْرِةَ فِيهَا  
هُدًى وَنُورٌ وَّ<sup>ج</sup> بِهَا النَّبِيُّونَ  
الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا  
وَالرَّبِّيْعُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا

তাদেরকে এ কিতাবুল্লাহর  
সংরক্ষণের আদেশ দেয়া  
হয়েছিল এবং তারা তা স্বীকার  
করেছিল; অতএব, (হে  
ইয়াহুদী আলেমগণ) তোমরাও  
মানুষকে ভয় করো না, বরং  
আমাকে ভয় কর; আর আমার  
বিধানসমূহের বিনিময়ে  
(পার্থিব) সামান্য বস্তু ঘৃণ  
করো না; আর যে ব্যক্তি  
আল্লাহর অবতারিত (বিধান)  
অনুযায়ী হকুম না করে,  
তাহলে এমন লোক তো পূর্ণ  
কাফির।

এ আয়াতসমূহে ঐ লোকদের নিন্দে করা হচ্ছে যারা স্বীয় অভিমত, কিয়াস  
এবং প্রবৃত্তিকে আল্লাহর শরীয়তের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর যারা আল্লাহ  
ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য পরিত্যাগ করে কুফরীর দিকে দৌড়ে যায়।  
তারা মুখে শুধু ইমানের দাবী করে বটে, কিন্তু তাদের অন্তর ইমান শূন্য।  
মুনাফিকদের অবস্থা তো এটাই যে, তারা মুখে খুব সাধুতা প্রকাশ করে, কিন্তু  
অন্তর তাদের সম্পূর্ণ কপট।

ইয়াহুদীদের স্বভাবও তদ্দুপ। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের শক্র। তারা  
মিথ্যা ও বাজে কথা খুব মজা করে শুনে তাকে এবং অন্তরের সাথে কবূল করে  
থাকে। পক্ষান্তরে সত্য কথা থেকে তারা দূরে সরে থাকে, এমনকি ঘৃণাও করে।  
তারা নবী (সঃ)-এর মজলিসে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য থাকে  
মুসলমানদের গোপনীয় কথা নিজেদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, তাদের পক্ষ থেকে  
তারা শুঙ্গরের কাজ করে। সবচেয়ে বড় দুষ্টুমি তাদের এই যে, তারা কথাকে  
বদলিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য এই যে, সেটা যদি তাদের মর্জি মোতাবেক হয় তবে  
তো মানবে, আর উল্টো হলে তা থেকে দূরে থাকবে। কথিত আছে যে, এ  
আয়াত ঐ সব ইয়াহুদীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা একে অপরকে হত্যা  
করেছিল। অতঃপর তারা পরম্পর বলাবলি করে—‘চল, আমরা রাসূলুল্লাহ

اَسْتَحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ  
وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهَادَةً  
فَلَا تَخْشُوْا النَّاسَ وَاخْشُونَ  
وَلَا تَشْتَرُوا بِاِيمَانِنِي ثُمَّا قَلِيلًا  
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا انْزَلَ اللّٰهُ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۝

(সঃ)-এর নিকট গমন করি। যদি তিনি রক্ষণ ও জরিমানার নির্দেশ দেন তবে তো মনে নেবো। আর যদি কিসাস বা হত্যার বদলে হত্যার নির্দেশ দেন তবে মানবো না।” কিন্তু সর্বাধিক সঠিক কথা এই যে, তারা এক ব্যভিচারিণী মহিলাকে নিয়ে এসেছিল। তাদের কিতাব তাওরাতে তো এ হুকুমই ছিল যে, ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী বিবাহিত বা বিবাহিতা হলে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করে দিতে হবে। কিন্তু তারা ওটাকে বদলিয়ে দিয়েছিল এবং একশ চাবুক মেরে, মুখে চুনকালি মাখিয়ে এবং গাধায় উল্টো করে সওয়ার করিয়ে লাঞ্ছিত করতো। আর একুপ শাস্তি দিয়েই ছেড়ে দিতো। নবী (সঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পর তাদের কোন একজন ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী হয়ে ফ্রেফতার হয়। তখন তারা পরম্পর বলাবলি করেঃ “চল, আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন করি এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। যদি তিনি আমাদের শাস্তি দানের মতই শাস্তির নির্দেশ দেন তবে আমরা তা মেনে নেবো এবং আল্লাহর কাছেও এটা আমাদের জন্যে সুন্দ হয়ে যাবে। আর যদি রজম বা পাথর নিষ্কেপে হত্যার নির্দেশ দেন তবে তা মানবো না।” সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে বললোঃ “আমাদের এক মহিলা ব্যভিচার করেছে। তার ব্যাপারে আপনি কি নির্দেশ দিচ্ছেন?” তিনি বললেনঃ ‘তোমাদের তাওরাতে কি নির্দেশ রয়েছে?’ তারা বললোঃ “আমরা তাকে লাঞ্ছিত করি এবং চাবুক মেরে ছেড়ে দেই।” এ কথা শুনে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বললেনঃ “তোমরা মিথ্যা কথা বলছো। তাওরাতে পাথর নিষ্কেপে হত্যার নির্দেশ রয়েছে, তাওরাত নিয়ে এসো দেখি।” তারা তাওরাত খুলে দিল বটে, কিন্তু রজমের আয়াতের উপর হাত রেখে দিয়ে পূর্বপর সমস্ত পড়ে শুনালো। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) সব কিছু বুঝে ফেললেন এবং তাদেরকে বললেন, হাত সরিয়ে নাও। হাত সরালে দেখা গেল যে, সেখানে রজমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তখন তাদেরকেও স্বীকার করতে হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশক্রমে ব্যভিচারীদ্বয়কে পাথর নিষ্কেপে হত্যা করে দেয়া হলো। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, আমি দেখলাম যে, ব্যভিচারী পুরুষ লোকটি ব্যভিচারিণী মহিলাটিকে পাথর থেকে বাঁচাবার জন্যে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অন্য সনদে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীরা বলেছিল, ‘আমরা তো তাদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে এবং কিছু মারপিট করে ছেড়ে দেই।’ অতঃপর রজমের আয়াত প্রকাশ হওয়ার পর তারা বলে, ‘রয়েছে তো এ হুকুমই কিন্তু আমরা তা

গোপন করে রেখেছিলাম।’ যে পাঠ করেছিল সে-ই রজমের আয়াতের উপর হাত রেখে দিয়েছিল। যখন তার হাত সরিয়ে ফেলা হলো তখন রজমের আয়াত প্রকাশ হয়ে পড়লো। এ দু’জনকে রজমকারীদের মধ্যে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমারও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ইয়াহুদীরা লোক পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ডেকে নিয়েছিল। তারা তাঁকে তাদের শিক্ষাগারে গদির উপর বসিয়েছিল। তাদের যে লোকটি তাওরাত পাঠ করেছিল সে তাওরাতের বড় পঙ্গিত ছিল। আর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে কসম দিয়ে বলেছিলেনঃ ‘তোমরা তাওরাতে বিবাহিত ব্যভিচারীর কি শান্তি দেখেছ?’ তারা উপরোক্ত উত্তরই দিয়েছিল। কিন্তু একটি যুবক কিছুই না বলে নীরবে দাঁড়িয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করে পুনরায় কসম দিয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন এবং উত্তর চাইলেন। সে বললো, “আপনি যখন এমন কসমই দিলেন তখন আমি মিথ্যা কথা বলবো না। বাস্তবিক তাওরাতে এ প্রকারের অপরাধীর শান্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যাই রয়েছে।” তিনি বললেনঃ “আচ্ছা তাহলে এটাও সত্যি করে বল যে, তোমরা সর্বপ্রথম এ রজমকে কার উপর থেকে উঠিয়ে দিয়েছ?” সে উত্তরে বললো, জনাব! আমাদের বাদশাহর কোন এক সন্ত্বান্ত্ব বংশীয় আত্মীয় ব্যভিচার করে। তার পদমর্যাদা এবং বাদশাহী প্রভাবের ফলে তাকে রজম করা হয়নি। তারপর এক সাধারণ লোক ব্যভিচার করে। তাকে রজম করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তার গোত্রের সমস্ত লোক প্রতিবাদ করে বলে, পূর্ববর্তী লোকটিকেও রজম করতে হবে, না হলে একেও ছেড়ে দিতে হবে। তখন আমরা সবাই মিলে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, এ ধরনের কোন শান্তি নির্ধারণ করা হোক। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাওরাতের হৃকুমকেই জারী করেন। এ ব্যাপারেই প্রাপ্তি আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহও (সঃ) ঐ আহকাম জারীকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে আবি দাউদ)

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, ইয়াহুদীরা একটি লোককে চুনকালি মাখাবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল এবং তারা তাকে চাবুকও মারছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। তারা উত্তরে বলে, “এ লোকটি ব্যভিচার করেছে।” তিনি জিজ্ঞেস করলেন—“তোমাদের বিধানে কি ব্যভিচারের শান্তি এটাই?” তারা উত্তর দিলো, হ্যাঁ। তিনি তখন তাদের এক আলেমকে ডাকলেন এবং তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তখন সে বললো, “আপনি

যদি আমাকে এক্সপ কসম না দিতেন তবে আমি কথনও বলতাম না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমাদের বিধানে ব্যতিচারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যাই বটে। কিন্তু আমীরুল উমারা ও সন্ত্রান্ত লোকদের মধ্যে এ পাপকার্য খুব বেশী ছড়িয়ে পড়লে তাদেরকে এ ধরনের শাস্তি দেয়া আমরা সমীচীন মনে করলাম না। তাই তাদেরকে তো ছেড়ে দিতাম। আর আল্লাহর নির্দেশও যাতে বৃথা না যায় তজ্জন্যে দরিদ্র ও কম মর্যাদা সম্পন্ন লোকদেরকে প্রস্তর নিষ্কেপে হত্যা করে দিতাম। তারপর আমরা পরামর্শ করলাম যে, এমন এক শাস্তি নির্ধারণ করা যাক যা ধনী-গরীব, ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সকলের উপর সমানভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অবশেষে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মুখে চুনকালি মাথিয়ে চাবুক মারা হবে।” একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ ‘তাদের উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করে ফেল।’ সুতরাং তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করে ফেলা হয়। সেই সময় তিনি বলেছিলেনঃ “হে আল্লাহ! আমি প্রথম ঐ ব্যক্তি যে আপনার একটি মৃত হৃকুমকে জীবিত করলো।” তখন *يَا يَاهَا الرَّسُولُ لَا يَعْزِنُكَ هُمُ الْكُفَّارُ* *وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُ* *الَّذِينَ يَسْأَلُونَ فِي الْكُفَّارِ*- পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এ ইয়াতুন্দীদেরই সম্পর্কে অন্য আয়াতে রয়েছে— ‘আল্লাহর নাযিলকৃত হৃকুম অনুযায়ী যারা শীমাংসা করে না তারা অত্যাচারী।’ অন্য আয়াতে ফাসিক শব্দ রয়েছে। (সহীহ মুসলিম ইত্যাদি) অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ব্যতিচারের ঘটনাটি ফিদকে ঘটেছিল। সেখানকার ইয়াতুন্দীরা মদীনার ইয়াতুন্দীদের নিকট একজন আলেমকে পাঠিয়ে ব্যতিচারের শাস্তি জানতে চেয়েছিল। তথাকার যে আলেমটি মদীনায় এসেছিল তার নাম ছিল ইবনে সূরিয়া। তার চক্ষু টেরা ছিল। তার সাথে আর একজন আলেমও ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে কসম দিলে তারা দু'জনই তা কবূল করেছিল। তিনি তাদেরকে বলেছিলেনঃ ‘আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহর কসম দিছি যিনি বানী ইসরাইলের জন্যে পানিতে রাস্তা করে দিয়েছিলেন, তাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া করেছিলেন, তাদেরকে ফিরাউন থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং তাদের উপর ‘মান’ ও ‘সালওয়া’ অবতীর্ণ করেছিলেন।’ এ কসমে তারা চমকে ওঠে এবং পরম্পর বলাবলি করে, ‘এটাতো বড়ই কঠিন কসম। এক্সপ স্থলে মিথ্যে বলা মোটেই ঠিক হবে না।’ তাই তারা বললো, জনাব! তাওরাতে রয়েছে যে, খারাপ নয়রে দেখাও যেনাতুল্য, গলায় গলায় মিলনও যেনার মত এবং চুম্বন দেয়াও যেনাতুল্য। যদি এর উপর চারজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, তারা পুঁঙ্গিলকে স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে

প্রবেশ করতে ও বের হতে দেখেছে, যেমন শলাকা সুরমাদানীর ভেতর যাতায়াত করে, তবে রজম বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা ওয়াজিব হয়ে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ মাসআলা তো এটাই। অতঃপর তিনি উক্ত যেনাকার পুরুষ ও নারীকে রজম করে দেয়ার নির্দেশ দেন। সেই সময় **فَإِنْ جَاءُكُمْ**-এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (সুনানে আবি দাউদ ইত্যাদি) আর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, যে দু'জন আলেমকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে আনয়ন করা হয়েছিল, তারা ছিল সূরিয়ার দুইপুত্র। এ বর্ণনায় ইয়াহুদীদের হৃদ পরিত্যাগ করার কারণ তাদের পক্ষ থেকে নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে— আমাদের মধ্যে যখন সালতানাত বা রাজত্ব রইলো না তখন আমরা আমাদের লোকদেরকে হত্যা করা সমীচীন মনে করলাম না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাক্ষীদেরকে ডাকিয়ে নিয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তারা বলে, আমরা তাদের দু'জনকে এ কু-কাজ করতে স্পষ্টভাবে দেখেছি, যেমনভাবে শলাকা সুরমাদানীর ভেতর প্রবেশ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাওরাত ইত্যাদি চেয়ে পাঠানো এবং তাদের আলেমদেরকে ডেকে পাঠানো তাদেরকে দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে ছিল না এবং উদ্দেশ্য এটাও ছিল না যে, তারা ওটা মানবার মুকাল্লাফই নয়, বরং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশই অবশ্য পালনীয়। এটা দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল প্রথমতঃ তাঁর সত্যতা প্রকাশ। তা এই যে, তাওরাতেও যে এ নির্দেশই রয়েছে তা তিনি অহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। আর প্রকাশ পেলও তা-ই। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে লঙ্ঘিত করা যে, তারা প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে তাদেরকে স্বীকার করতেই হলো এবং দুনিয়ায় এটা প্রকাশ পেয়ে গেলো যে, তারা আল্লাহর বিধানকে গোপনকারী এবং নিজেদের মত ও কিয়াসের উপর আমলকারী। তাছাড়া উদ্দেশ্য এও ছিল যে, ঐ ইয়াহুদীরা সরল মনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আসেনি যে, তাঁর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবে। বরং তাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, যদি তিনিও তাদের 'ইজমা' মোতাবেক নির্দেশ দেন তবে তারা মেনে নেবে, নচেৎ কিছুতেই মানবে না। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেন যে, তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার সুপর্য প্রাণি কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাদের অপবিত্র অন্তরকে পবিত্র করার আল্লাহর ইচ্ছাই নেই। তারা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং পরকালেও তাদের জন্যে রয়েছে ভীষণ শাস্তি।

বলা হচ্ছে—তারা মিথ্যা কথা কান লাগিয়ে শুনতে এবং হারাম বস্তু অর্থাৎ সুদ খেতে অভ্যন্ত। সুতরাং কিরূপে তাদের অপবিত্র অন্তর পবিত্র হবে? আর তাদের দু'আই বা আল্লাহ কি করে শুনবেন? হে নবী (সঃ)! যদি তারা তোমার কাছে

মীমাংসার জন্যে আসে তবে তাদের ফায়সালা করা না করার তোমার অধিকার রয়েছে। তুমি যদি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তথাপি তারা তোমার কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কেননা, তাদের উদ্দেশ্য সত্ত্যের অনুসরণ নয়, বরং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ। কোন গুরুজন বলেন যে, এ আয়াতটি *وَأَنَّ حُكْمَ بِبِنْهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ*-(৫: ৪৯)-এ আয়াতটি দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে-হে নবী (সঃ)! যদি তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা কর তবে ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করো, যদিও এরা নিজেরা অত্যাচারী এবং আদল ও ইনসাফ থেকে বহু দূরে রয়েছে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারকদেরকে ভালবাসেন।

অতঃপর ইয়াহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা, অন্তরের কলুষতা এবং বিরুদ্ধাচরণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, একদিকে তো তারা আল্লাহ পাকের এ কিতাবকে ছেড়ে দিয়েছে যার আনুগত্য স্বীকার ও সত্যতার কথা তারা নিজেরাও স্বীকার করেছে। দ্বিতীয়তঃ তারা ঐ দিকে ঝুঁকে পড়েছে যাকে তারা নিজেরাও মানে না এবং ওটাকে মিথ্যা বলে ছড়িয়ে দিয়েছে। আবার সেখানেও তাদের নিয়ত ভাল নয়। কারণ তাদের উদ্দেশ্য এই যে, যদি সেখানে গিয়ে তাদের ইচ্ছা মোতাবেক হুকুম পায় তবে তো তা মেনে নেবে, নতুনা ছেড়ে দেবে। তাই, আল্লাহ তা'আলা নবী (সঃ)-কে বলেনঃ তারা কি করে তোমার হুকুম মানতে পারে? তারা তো তাওরাতকেও ছেড়ে দিয়েছে। তাতে আল্লাহর হুকুম রয়েছে, এটা তো তারাও স্বীকার করেছে, অথচ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

তারপর এ তাওরাতের প্রশংসা করা হচ্ছে যা তিনি স্বীয় মনোনীত রাসূল হ্যরত মুসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। ওর মধ্যে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর হুকুমবাহী নবীগণ ওর মাধ্যমেই ফায়সালা করে থাকেন এবং ইয়াহুদীদের মধ্যে ওরই আহকাম জারী করেন। তাঁরা ওর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে বেঁচে থাকেন এবং আল্লাহওয়ালা লোকেরাও এ নীতির উপর থাকেন। কেননা, এ পবিত্র প্রস্তুত তাঁদেরকে সমর্পণ করা হয়েছিল এবং ওটা প্রকাশ করে দেয়া ও ওর উপর আমল করার তাঁদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাঁরা ওর উপর সাক্ষী ছিলেন।

ঘোষিত হচ্ছে-এখন তোমাদের উচিত যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না। তোমরা প্রতি মৃত্যুর্তে এবং পদে পদে আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে এবং তাঁর আয়াতগুলোকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করবে

না। জেনে রেখো যে, আল্লাহর নাযিলকৃত অহী মোতাবেক যারা ফায়সালা করে না তারা কাফির। এতে দু'টি উক্তি রয়েছে, যা ইনশাআল্লাহ এখনই বর্ণিত হচ্ছে। এ আয়াতগুলোর আরও একটি শানে নয়ল নিম্নরূপঃ

হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে এ লোকদেরকে কাফির, দ্বিতীয় আয়াতে যালিম এবং তৃতীয় আয়াতে ফাসিক বলা হয়েছে। ব্যাপার এই যে, ইয়াহুন্দীদের দু'টি দল ছিল। একটি বানূ নাযীর এবং অপরটি বানূ কুরাইয়া। প্রথমটি ছিল সবল এবং দ্বিতীটি ছিল দুর্বল। তাদের পরম্পরের মধ্যে এ কথার উপর সন্দি হয়েছিল যে, সবল দলটির কোন লোক যদি দুর্বল দলটির কোন লোককে হত্যা করে তবে তাকে পঞ্চাশ ওয়াসাক রক্তপণ দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি দুর্বল দলটির কোন লোক সবল দলটির কোন লোককে হত্যা করে তবে তাকে একশ ওয়াসাক রক্তপণ আদায় করতে হবে। এ প্রথাই তাদের মধ্যে চলে আসছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মদীনায় আগমনের পর একুপ এক ঘটনা ঘটে যে, দুর্বল ইয়াহুন্দীদের এক ব্যক্তি সবল ইয়াহুন্দীদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। তখন এদের পক্ষ থেকে এক লোক ওদের কাছে গিয়ে বলে, ‘এখন একশ’ ওয়াসাক আদায় কর।’ তারা উত্তরে বলে, “এটা তো প্রকাশ্যভাবে অন্যায় আচরণ। আমরা তো সবাই একই গোত্রের, একই ধর্মের, একই বংশের এবং একই শহরের লোক। অথচ আমরা রক্তপণ পাবো কম আর তোমরা পাবে বেশী! এতদিন পর্যন্ত তোমরা আমাদেরকে দাবিয়ে রেখেছিলে। আমরা বাধ্য ও অপরাগ হয়ে তোমাদের এ অন্যায় সহ্য করে আসছিলাম। কিন্তু এখন যেহেতু এখানে হ্যরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ন্যায় একজন ন্যায়পরায়ণ লোক এসে গেছেন সেহেতু আমরা তোমাদেরকে সেই পরিমাণ রক্তপণই প্রদান করবো যে পরিমাণ তোমরা আমাদেকে প্রদান করে থাক।” এ নিয়ে চতুর্দিকে গোলমান শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত পরম্পরের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এর মীমাংসাকারী নিযুক্ত করা হোক। কিন্তু সবল লোকেরা যখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলো তখন তাদের কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক তাদেরকে বললো, তোমরা এ আশা করো না যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অন্যায়ের আদেশ প্রদান করবেন। এটাতো স্পষ্ট বাড়াবাঢ়ি যে, আমরা দেবো অর্ধেক এবং নেবো পুরোপুরি! আর বাস্তবিকই এ লোকগুলো অপারগ হয়েই এটা মেনে নিয়েছিল। এক্ষণে যখন তোমরা হ্যরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে মীমাংসাকারী নির্বাচন করলে তখন অবশ্যই তোমাদের হক মারা যাবে। কেউ কেউ পরামর্শ দিলো,

গোপনে কোন লোককে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দাও। তিনি কি ফায়সালার করবেন তা সে জেনে আসুক। সেটা যদি আমাদের অনুকূলে হয় তবে তো ভাল কথা। আমরা তাদের নিকট থেকে আমাদের হক আদায় করে নেবো। আর যদি ওটা আমাদের প্রতিকূলে হয় তবে আমাদের পৃথক থাকাই বাঞ্ছণীয় হবে। এ পরামর্শ অনুযায়ী তারা মদীনার কয়েকজন মুনাফিককে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট প্রেরণ করলো। তারা তাঁর নিকট পৌছার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করে স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে তাদের কু-মতলব সম্পর্কে অবহিত করলেন। (সুনানে আবি দাউদ)

আর একটি বর্ণনায় আছে যে, বানু নায়ীর গোত্র পুরোপুরি রক্তপণ গ্রহণ করতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) উভয় গোত্রকে রক্তপণ সমান সমান দেয়ার ফায়সালা করলেন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, বানু কুরাইয়ার কোন লোক বানু নায়ীরের কোন লোককে হত্যা করলে তার কিসাস নেয়া হতো। পক্ষান্তরে বানু নায়ীরের কোন লোক বানু কুরাইয়ার কোন লোককে হত্যা করলে কিসাসের কোন ব্যবস্থাই ছিল না, বরং রক্তপণ ছিল একশ ওয়াসাক। এটা খুবই সম্ভব যে, এদিকে এ ঘটনা ঘটে এবং ঐদিকে ব্যভিচারের ঘটনা ঘটে যায়। আর দু'টো ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। হ্যাঁ, তবে আরও একটি কথা রয়েছে, যদ্বারা এ দ্বিতীয় শানে নয়লটির প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এরপরেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنفُ بِالأنفِ  
وَالاذنُ بِالاذنِ وَالسِّينُ بِالسِّينِ وَالجَرْحُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصْدَقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةُ لَهِ  
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ -

(অর্থাৎ আর আমি তাদের প্রতি তাতে (তাওরাতে) এটা ফরয করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং (অদ্রপ অন্যান্য) বিশেষ যথমেরও বিনিময় রয়েছে; অনন্তর যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয় তবে এটা তার জন্যে (পাপের) কাফ্ফারা হয়ে যাবে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত বিধান অনুযায়ী হৃকুম না করে তবে তো এমন ব্যক্তি পূর্ণ যালিম।) আল্লাহ পাকই সবচেয়ে বেশী জানেন।

অতঃপর যারা আল্লাহর শরীয়ত এবং তাঁর অবতারিত অহী অনুযায়ী ফায়সালা করে না তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। এ আয়াতটি মুফাস্সিরদের উক্তি অনুযায়ী শানে নয়ল হিসেবে আহলে কিতাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হলেও হকুমের দিক দিয়ে এটা সমস্ত লোকের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। এটা বানু ইসরাইলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল বটে; কিন্তু এ উচ্চতেরও এটাই হকুম। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, ঘৃষ খেয়ে কোন শরঙ্গ মাসআলার ব্যাপারে উল্টো ফতওয়া দেয়া কুফরী। সুন্দী (রঃ) বলেন যে, যদি ইচ্ছাপূর্বক আল্লাহর অহীর বিপরীত ফতওয়া দেয়, জানা সত্ত্বেও তার উল্টো করে তবে সে কাফির। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ফরমানকে অঙ্গীকার করবে তার হকুম এটাই। আর যে ব্যক্তি অঙ্গীকার করলো না বটে, কিন্তু তা মোতাবেক বললো না, সে যালিম ও ফাসিক। সে আহলে কিতাবই হোক বা আর কেউ হোক। শা'বী (রঃ) বলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের বিপরীত ফতওয়া দেবে সে কাফির, ইয়াহুদীদের মধ্যে দেবে সে যালিম এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যে দেবে সে ফাসিক। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তার কুফরী হচ্ছে এ আয়াতের সঙ্গে। তাউস (রাঃ) বলেন যে, তার কুফরী ঐ ব্যক্তির কুফরীর মত নয় যে আল্লাহ, রাসূল (সঃ), কুরআন এবং ফেরেশতাদেরকে সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীকার করে। আতা' (রঃ) বলেন যে, কুফরীর মধ্যে যেমন কম বেশী আছে তেমনই যুলম ও ফিসকের মধ্যেও কম বেশী আছে। এ কুফরীর কারণে সে মিল্লাতে ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “তোমরা যে দিকে যাচ্ছ এর দ্বারা ঐ কুফরী উদ্দেশ্য নয়।”

৪৫। আর আমি তাদের প্রতি  
তাতে (তাওরাতে) এটা ফরয  
করেছিলাম যে, থাণের  
বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে  
চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক,  
কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের  
বিনিময়ে দাঁত এবং (তদ্রপ  
অন্যান্য) বিশেষ যথমেরও  
বিনিময় রয়েছে; অনন্তর যে  
ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ  
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ  
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ  
بِالْأَذْنِ وَالْسِنُّ بِالْسِنِ  
وَالْجَرْوَحُ قِصَاصٌ فَمَنْ

তবে এটা তার জন্যে (পাপের) কাফ্ফারা হয়ে যাবে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত বিধান অনুযায়ী হৃকুম না করে তবে তো এমন ব্যক্তি পূর্ণ যালিম।

تَصْدِيقٍ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ  
لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
سُرَّاً وَمَوْلَى وَمَالِ الظَّالِمُونَ ○

ইয়াহুদীদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তাদের কিতাবে পরিষ্কার ভাষায় যে হৃকুমগুলো ছিল তারা তো খোলাখুলিভাবে তারও বিরোধিতা করছে এবং দুষ্টামি করে ও বেপরওয়া ভাব দেখিয়ে সেগুলোও পরিত্যাগ করছে। ইয়াহুদ বানূ নায়ীরকে ইয়াহুদ বানূ কুরাইয়ার বিনিময়ে হত্যা করছে, কিন্তু ইয়াহুদ বানূ কুরাইয়াকে ইয়াহুদ বানূ নায়ীরের বিনিময়ে হত্যা করছে না। অনুরূপভাবে তারা বিবাহিত ব্যভিচারীর রজমের হৃকুমকে বদলিয়ে দিয়েছে এবং মারপিট করে ছেড়ে দিচ্ছে। এজন্যই সেখানে তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। আর এখানে ইনসাফ না করার কারণে তাদেরকে যালিম বলা হয়েছে। সুনানে আবি দাউদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর <sup>وَالْعَيْنُ</sup> পড়াও বর্ণিত আছে। উলামায়ে কিরাম বলেনঃ “পূর্ববর্তী যে শরীয়তকে আমাদের সামনে আলোচনা পর্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা মানসূখ বা রহিত করা হয়নি ওটা আমাদের জন্যও শরীয়ত। যেমন উপরোক্ত এ সমস্ত হৃকুম আহকাম আমাদের শরীয়তেও একইভাবে প্রযোজ্য।” ইবাম নববী (রঃ) বলেন যে, মাসআলায় তিনটি পন্থা বা নীতি বর্ণিত রয়েছে। প্রথম তো ওটাই যা বর্ণনা করা হলো। দ্বিতীয়টি হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তৃতীয়টি হচ্ছে এই যে, শুধু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর শরীয়ত জারী ও বাকী রয়েছে। অন্য কোন শরীয়ত অবশিষ্ট নেই।

এ আয়াতটি সাধারণ বলে এর দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকের হত্যার বিনিময়েও পুরুষ লোককে হত্যা করা হবে। কেননা, এখানে <sup>نَفْسٌ</sup> শব্দ রয়েছে. যদ্যপি নারী পুরুষ উভয়কেই বুঝাচ্ছে। তাছাড়া সুনানে নাসাই ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমর ইবনে হাযাম (রাঃ)-কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, স্ত্রীলোকের হত্যার বিনিময়ে পুরুষ লোককে হত্যা করা হবে। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, মুসলমানদের রক্ত পরম্পরের মধ্যে সমান। কোন কোন মনীষী হতে বর্ণিত আছে যে, কোন পুরুষ লোক যদি কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করে তবে তার বিনিময়ে পুরুষ লোকটিকে হত্যা করা হবে না,

বরং তার নিকট থেকে রক্ষণ আদায় করতে হবে। এটা কিন্তু জমহুর উলামার বিপরীত কথা। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) তো এতদুর পর্যন্ত বলেছেন যে, যিদ্বা কাফিরের হত্যার বিনিময়েও মুসলমানকে হত্যা করা হবে এবং গোলামের হত্যার বিনিময়ে আযাদ ব্যক্তিকেও হত্যা করা হবে। কিন্তু এ মায়হাব জমহুরের বিপরীত। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কাফিরের হত্যার বিনিময়ে মুলমানকে হত্যা করা হবে না। আর পূর্ববর্তী মনীষীদের বহু নমুনা এ ব্যাপারে বিদ্যমান রয়েছে যে, তারা আযাদ ব্যক্তি হতে গোলাম হত্যার কিসাস গ্রহণ করতেন না। আর গোলামের হত্যার বিনিময়ে আযাদ ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না। এ ব্যাপারে কতগুলো হাদীসও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলো বিশুদ্ধতায় পৌছেনি। ইমাম শাফিউ (রঃ) তো বলেছেন যে, এ মাসআলা ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর উক্তির বাতিল হওয়া সাব্যস্ত হয় না যে পর্যন্ত না এ আয়াতের সাধারণত্বকে নির্দিষ্ট করণের কোন যববৃদ্ধস্ত ও স্পষ্ট দলীল সাব্যস্ত হয়।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, হ্যরত আনাস ইবনে নয়র (রাঃ)-এর ফুফু হ্যরত রাবী (রঃ) একটি দাসীর একটি দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তখন জনগণ তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু সে ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘কিসাস নেয়া হবে।’ তখন হ্যরত আনাস ইবনে নয়র (রাঃ) বলেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাঁর কি সামনের দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হবে?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ “হ্যাঁ! হে আনাস! আল্লাহর কিতাবে কিসাসের হকুম বিদ্যমান রয়েছে।” তখন হ্যরত আনাস (রাঃ) বললেনঃ না, না, যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! তাঁর দাঁত কখনও ভেঙ্গে ফেলা হবে না। বস্তুতঃ হলোও তাই। দাসীটির কওম সম্মত হয়ে গেল এবং কিসাস ছেড়ে দিলো, এমন কি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমাই করে দিলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ ‘অবশ্যই আল্লাহর কতক বান্দা এমন রয়েছে যে, তারা আল্লাহর উপর কোন কিছুর কসম করলে তিনি তা পুরো করেই ছাড়েন।’

দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রথমে তারা ক্ষমাও করেনি এবং দিয়্যাতও মঙ্গুর করেনি। সুনানে নাসাই ইত্যাদি হাদীস ঘন্টে রয়েছে যে, একটি গরীব জামাআতের গোলাম কোন এক ধনী জামাআতের গোলামের কান কেটে দেয়। ঐ লোকগুলো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে আরয় করেঃ আমরা দরিদ্র লোক, আমাদের কাছে মালধন নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের উপর কোন

জরিমানা করেননি। হতে পারে যে, গোলামটি হয়তো প্রাণ বয়ক্ষ হয়নি, কিংবা হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের পক্ষ থেকে দিয়্যাত প্রদান করেছিলেন। আবার এটাও হতে পারে যে, তিনি তাদেরকে সুপারিশ করে তাদের নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রাণের বদলে প্রাণ হত্যা করা হবে, কেউ কারও চক্ষু উঠিয়ে নিলে তারও চক্ষু উঠিয়ে নেয়া হবে, কেউ কারও নাক কেটে নিলে তারও নাক কেটে নেয়া হবে, কেউ কারও দাঁত ভেঙ্গে দিলে তারও দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং যখন্মেরও বদলা নেয়া হবে। এ ব্যাপারে আধাদ মুসলমান সবাই সমান। নারী ও পুরুষের একই হৃকুম, যখন তারা ইচ্ছাপূর্বক এ কাজ করবে। তাতে গোলামেরাও পরম্পরের মধ্যে সমান। তাদের পুরুষ লোকেরাও সমান এবং স্ত্রীলোকেরাও সমান।

নীতিমালাঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কর্তন কথনও জোড়ার উপর হয়ে থাকে। এতে কিসাস ওয়াজিব হয়। যেমন হাত, পা, হাতের তালু ইত্যাদি। কিন্তু যে ক্ষত জোড়ের উপর হয় না, বরং অস্ত্রির উপর হয় সে সম্পর্কে ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, উরু এবং উরুর ন্যায় অন্য অঙ্গ ছাড়া অস্তিত্বেও ওয়াজিব। কেননা, ওটা ভয় ও বিপদের জায়গা। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের মাযহাব এই যে, দাঁত ছাড়া কোন অস্তিত্বে কিসাস ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ)-এর নিকট কোন অস্ত্রির উপর সাধারণভাবে কিসাস ওয়াজিব নয়। হ্যরত উমার ফারুক (রাঃ) এবং হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও একপই বর্ণিত আছে। আতা' (রঃ), শা'বী (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), যুহরী (রঃ), ইবরাহীম নাখন্দি (রঃ) এবং উমার ইবনে আবদুল আয়ীতও (রঃ) এ কথাই বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী (রঃ) এবং লায়েস ইবনে সাদও (রঃ) এদিকেই গিয়েছেন। ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর দলীল হচ্ছে হ্যরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি যাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রাবী (রাঃ) হতে দাঁতের কিসাস গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ রিওয়ায়াত দ্বারা এ মাযহাব সাব্যস্ত হচ্ছে না। কেননা, তাতে এ শব্দগুলো রয়েছে যে, তিনি তার সামনের দাঁত ভেঙ্গে ছিলেন। আর হতে পারে যে, দাঁত না ভেঙ্গেই বারে পড়েছিল। এ অবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। তাঁর দলীলের পূর্ণ অংশ ওটাই যা সুনানে ইবনে মাজায় রয়েছে। তা এই যে, একটি লোক অপর একটি লোকের বাহতে কনুইর নীচে তালোয়ার মেরেছিল, যার ফলে তার হাতের কজি কেটে গিয়েছিল। এ মুকদ্দমা নবী (সঃ)-এর সামনে পেশ করা হয়। তিনি দিয়্যাত আদায়ের নির্দেশ দেন। তখন লোকটি বলেঃ

হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি কিসাস চাই। তিনি বললেনঃ ‘তুমি দিয়্যাত গ্রহণ কর। আল্লাহ তোমাকে তাতে বরকত দান করবেন।’ তিনি কিসাসের নির্দেশ দিলেন না। কিন্তু এ হাদীসটি খুবই দুর্বল। এর একজন বর্ণনাকারী হাশাম ইবনে উকলী আবারী দুর্বল। তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না। আর একজন বর্ণনাকারী হচ্ছে গেরান ইবনে জারিয়া আরাবী, সেও দুর্বল। অতঃপর তাঁরা বলেন যে, যখম ভাল ও ঠিক হয়ে যাওয়ার পূর্বে ওর কিসাস নেয়া জায়েয নয়। আর যদি ভাল হওয়ার পূর্বেই কিসাস নিয়ে নেয়, তারপর যখম বেড়ে যায় তবে আবার বদলা নেয়া যাবে না। এর দলীল হচ্ছে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীসটি। তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক অন্য একটি লোকের জানুতে আঘাত করে। সে তখন নবী (সঃ) এর নিকট হায়ির হয়ে বলেঃ ‘আমাকে কিসাস নিয়ে দিন।’ তিনি বললেনঃ ‘যখম ভাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।’ সে আবার এসে বললোঃ ‘আমাকে কিসাস নিয়ে দিন।’ তিনি তখন কিসাস নিয়ে দিলেন। এরপর লোকটি আবার নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বললোঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তো খোঢ়া হয়ে গেছি।’ তখন তিনি বললেনঃ “আমি তো তোমাকে (যখম ভাল হওয়ার পূর্বে কিসাস নিতে) নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তুমি তা মেনে নাওনি। এখন তোমার এ খোঢ়ামির কোন বদলা নেই।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখম ভাল হওয়ার পূর্বে কাউকে তার প্রতিপক্ষের নিকট হতে কিসাস গ্রহণ করতে নিষেধ করেন।

মাসআলাঃ কেউ যদি অন্যকে যখম করে এবং তার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া হয়, অতঃপর সে ঐ যখমেই মারা যায় তবে বিবাদীর উপর আর কিছুই ওয়াজিব হবে না। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিউ (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং জমতুর সাহাবা এবং তাবেঙ্গনের এটাই উক্তি। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর উক্তি এই যে, তার মাল থেকেই তার উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হবে। আতা’ (রঃ) বলেন যে, তার পিতা-মাতার পক্ষীয় আত্মীয়-স্বজনদের উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হবে। ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং নাখঙ্গ (রঃ) বলেন যে, বিবাদীর উপর হতে ঐ যখম পরিমাণ তো উঠে যাবে, আর বাকীটা তারই মাল থেকে ওয়াজিব হবে।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ অনন্তর যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেবে, ওটা ঐ যখমকারীর জন্যে কাফফারা হয়ে যাবে এবং যাকে যখম করা হয়েছে তার জন্যে সওয়াব বা পুণ্যের কারণ হবে, যা আল্লাহরই দায়িত্বে রয়েছে। কেউ

কেউ এটা ও বলেছেন যে, ঐ কাফ্ফারা হবে যখমকৃত ব্যক্তির জন্যে অর্থাৎ তার ঐ যখম পরিমাণ গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবেন। একটি মারফু' হাদীসে এসেছে যে, ওটা যদি দিয়্যাতের এক চতুর্থাংশ বরাবর জিনিস হয় এবং তা সে ক্ষমা করে দেয় তবে তার গুনাহৰ এক চতুর্থাংশ মাফ হয়ে যাবে। যদি এক ত্তীয়াংশের সমান হয় তবে এক ত্তীয়াংশ গুনাহ মাফ হবে। যদি অর্ধাংশের সমান হয় তবে অর্ধাংশ গুনাহ মাফ হবে। আর যদি পুরো দিয়্যাতের সমান হয় তবে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

ইমাম আহমাদ (রঃ) আবু সফর (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একজন কুরাইশী একজন আনসারীকে সজোরে ধাক্কা দেন। ফলে তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায়। হ্যরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর নিকট এ মুকদ্দমা নিয়ে যাওয়া হয়। তখন মুআবিয়া (রাঃ) ঐ বাদীকে বলেন, বিবাদীর ব্যাপারে তোমাকে অধিকার দেয়া হলো, তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার। ঐ সময় হ্যরত আবু দারদা (রাঃ) সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেনঃ “আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি—কেউ যদি কোন মুসলমানের দেহের উপর কোন কষ্ট দেয়, অতঃপর সে ধৈর্য ধারণ করে এবং প্রতিশোধ গ্রহণ না করে তবে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন।” একথা শুনে ঐ আনসারী বললেনঃ “আপনি কি সত্যি সত্যিই আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর মুখে এ কথা শুনেছেন?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “আমার কান শুনেছে এবং আমার অন্তর তা স্মরণ রেখেছে।” তখন আনসারী বললেনঃ “আমি আমার বিবাদীকে মাফ করে দিলাম।” হ্যরত মুআবিয়া (রাঃ) এ কথা শুনে খুবই খুশী হলেন এবং তাঁকে পুরস্কৃত করলেন। (তাফসীরে ইবনে জারীর) জামেউত তিরমিয়ীতেও এ হাদীসটি রয়েছে। কিন্তু ইমাম তিরমিয়ী একে গারীব বলেছেন। বর্ণনাকারী আবু সফরের হ্যরত আবু দারদা (রাঃ) হতে শ্রবণ সাব্যস্ত নয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, বিবাদী তিনগুণ দিয়্যাত দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাতেও সম্মত হচ্ছিলেন না। তাতে হাদীসের শব্দগুলো নিম্নরূপ রয়েছে—

“যে ব্যক্তি রক্ত বা তদপেক্ষা কমকে মাফ করে দেবে, ওটা তার জন্যে তার জীবন থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের কাফ্ফারা হয়ে যাবে।” মুসনাদে আহমাদে, রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কোন ব্যক্তির দেহে যদি কারও দ্বারা কোন যখম হয় এবং সে তাকে মাফ করে দেয় তবে আল্লাহ তার সেই পরিমাণ গুনাহ মাফ করে দেন।” মুসনাদে আহমাদে নিম্নের হাদীসটিও রয়েছে—

“যারা আল্লাহর হকুম অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা যালিম।” পূর্বেই  
বর্ণিত হয়েছে যে, কুফরীর মধ্যে কম বেশী আছে, যুলুমেরও কম বেশী আছে  
এবং ফিসকের মধ্যেও শ্রেণীভেদ রয়েছে।

৪৬। আর আমি তাদের পর ঈসা  
ইবনে মারইয়ামকে এ অবস্থায়  
প্রেরণ করেছিলাম যে, সে তার  
পূর্ববর্তী কিতাবের অর্থাত  
তাওরাতের সমর্থন করেছিল,  
এবং আমি তাকে ইঞ্জীল প্রদান  
করেছি, যাতে হিদায়াত ছিল  
এবং আলো ছিল, আর এটা  
স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাত  
তাওরাতের সত্যতা সমর্থন  
করতো, এবং এটা সম্পূর্ণরূপে  
মুত্তাকীদের জন্যে হিদায়াত ও  
নসীহত ছিল।

৪৭। আহুলে ইঞ্জীলের উচিত যে,  
আল্লাহ তাতে যা কিছু অবতীর্ণ  
করেছেন, তদনুযায়ী হকুম  
প্রদান করে, আর যে ব্যক্তি  
আল্লাহর অবতারিত (বিধান)  
অনুযায়ী হকুম প্রদান করে না,  
তবে তো একুপ লোকই পূর্ণ  
নাফরমান।

এখানে আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি ঈসা (আঃ)-কে বানী ইসরাইলের শেষ  
নবী করে পাঠিয়েছিলাম। সে তাওরাতকে বিশ্বাস করতো এবং ওর নির্দেশ  
অনুযায়ী লোকদের মধ্যে ফায়সালা করতো। আমি তাকে স্বীয় কিতাব ইঞ্জীল  
প্রদান করেছিলাম। তাতে সত্যের হিদায়াত ছিল, আর ছিল কাঠিন্য ও জটিলতার  
ব্যাখ্যা এবং পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর অনুকরণ। তবে কতগুলো মাসআলার তাতে  
স্পষ্ট ফায়সালা ছিল, যেগুলোতে ইয়াতুন্দীরা মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। যেমন

٤٦ - وَقَفَ فِينَا عَلَى أَثَارَهُمْ  
بِعِيسَى ابْنِ مَرِيمَ مُصَدِّقاً  
لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ مِنَ التُّورِيَّةِ  
وَاتَّبَعَهُ أَنْجِيلٌ فِيهِ هُدًى  
وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ  
مِنَ التُّورِيَّةِ وَهُدًى وَمُوعِظَةٌ  
سُوْدَرٌ طٌ  
لِلْمُتَّقِينَ ○

٤٧ - وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ  
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ  
يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ  
هُمُ الْفَسِيقُونَ ○

কুরআন কারীমের অন্য জায়গায় রয়েছে যে, হ্যরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেনঃ “আমি এমন কতগুলো জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করবো যেগুলোতোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছিল।” এ জন্যেই আলেমদের প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে যে, ইঞ্জীল তাওরাতের কতক হৃকুম মানসূখ করে দিয়েছে। ইঞ্জীল দ্বারা পুণ্যবান লোকেরা হেদায়াত, ওয়ায় ও উপদেশ লাভ করতো এবং এর ফলে তারা পুণ্য লাভের প্রতি আগ্রহী হতো অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতো। ‘অল য্যাহুকুম আহলুল ইঞ্জীলে’ এখানে ‘আহলাল ইঞ্জীলে’ও পড়া হয়েছে। এ অবস্থায় **وَسِعْكُمْ** শব্দটি **كُ’**-এর অর্থে হবে। তখন ভাবার্থ হবে-আমি ঈসা (আঃ)-কে ইঞ্জীল এ জন্যেই প্রদান করেছি যে, যেন সে তার যুগের তার অনুসারীদেরকে ওটা অনুযায়ীই পরিচালিত করে। আর যদি মাশহুর কিরআত **وَلِيْحُكْمٌ** **অনুযায়ী** **وَلِيْحُكْمٌ** -কে আমরের **لِمْ** মনে করা হয় তবে তখন অর্থ হবে- তাদের উচিত যে, তারা ইঞ্জীলের সমস্ত আহকামের উপর ঈমান আনে এবং ওটা অনুযায়ী ফায়সালা করে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে— **قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَبِ لَسْتُمْ** **أَرْثَانِ** “বল হে আহলে কিতাব! যে পর্যন্ত তোমরা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যা আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ করা হয়েছে এগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত না হবে সে পর্যন্ত তোমরা কিছুরই উপর নও। (৫: ৬৮) আর এক জায়গায় আছে— **الَّذِينَ يَتَبَعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ**— অর্থাৎ “যারা এ রাসূল, নবী উচ্চী (সঃ)-এর অনুসরণ করে যাঁর গুণাবলী তারা তাদেরই নিকট গচ্ছিত কিতাব তাওরাতে পেয়ে থাকে তারাই সফলকাম।” (৭: ১৫৭) যারা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবী (সঃ)-এর নির্দেশমত ফায়সালা করে না তারা আল্লাহর আনুগত্য হতে বেরিয়ে পড়েছে, সত্যকে পরিত্যাগ করেছে, বাতিলের উপর আমল করেছে। আয়াতটির গতি দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে যে, এটা খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর পূর্বে এ বর্ণনা দেয়াও হয়েছে।

#### ৪৮। আর আমি এ কিতাব

(কুরআন)-কে তোমার প্রতি নায়িল করেছি যা নিজেও সত্যতাগুণে বিভূষিত, (এবং) ওর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যতা প্রমাণকারী এবং ঐ সব কিতাবের সংরক্ষকও; অতএব, তুমি তাদের পাস্পারিক বিষয়ে আল্লাহর অবতারিত এ

৪৮-**وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ**  
**بِالْحَقِّ مَصِدِّقًا لِمَا بَيْنَ**  
**يَدِيهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمَهِيمِنًا**  
**عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا**

কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা  
করো, যা তুমি প্রাপ্ত হয়েছো,  
তা থেকে বিরত হয়ে তাদের  
প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করো না,  
তোমাদের প্রত্যেক (সম্প্রদায়)  
-এর জন্যে আমি নির্দিষ্ট  
শরীয়ত এবং নির্দিষ্ট পন্থা  
নির্ধারণ করেছিলাম; আর যদি  
আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে  
তোমাদের সকলকে একই  
উদ্দত করে দিতেন, কিন্তু তিনি  
তা করেননি। এই কারণে যে,  
যে ধর্ম তিনি তোমাদেরকে  
প্রদান করেছেন তাতে  
তোমাদের সকলকে পরীক্ষা  
করবেন, সুতরাং তোমরা  
কল্যাণকর বিষয়সমূহের দিকে  
ধাবিত হও; তোমাদের  
সকলকে আল্লাহর সমীপে  
প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন  
তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে  
দেবেন যাতে তোমরা  
মতবিরোধ করছিলে।

৪৯। আর আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে  
তুমি তাদের পারম্পরিক  
ব্যাপারে এ প্রেরিত কিতাব  
অনুযায়ী মীমাংসা করবে এবং  
তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ  
করবেন না, এবং তাদের দিক  
থেকে সতর্ক থাকবে যেন তারা  
তোমাকে আল্লাহর প্রেরিত  
কোন নির্দেশ হতে বিভ্রান্ত

أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاهُمْ  
عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ  
جَعْلَنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً  
وَمِنْهَا جَاءَ وَلُوْسَاءُ اللَّهِ  
لَجَعْلِكُمْ أَمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلِكُنْ  
لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا اتَّسْكُمْ  
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَ إِلَى  
اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا  
فِينَشِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ  
لَا تَخْتَلِفُونَ

৪৯- وَإِنْ أَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلْ  
اللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاهُمْ  
وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكُمْ عَنْ  
بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ فَإِنْ  
تُولُوا فَاعْلَمُ أَنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ

କରିତେ ନା ପାରେ; ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ତାରା  
ଯଦି ମୁଖ ଫିରିଯେ ନେଇ, ତବେ  
ଦୃଢ଼ବିଶ୍ୱାସ ରେଖୋ, ଆଲ୍ଲାହର  
ଇଚ୍ଛା ଏଟାଇ ଯେ, ତାଦେରକେ  
କୋନ କୋନ ପାପେର ଦରଳନ ଶାସ୍ତି  
ପ୍ରଦାନ କରିବେନ; ଆର ବହୁ ଲୋକ  
ତୋ ନାଫରମାନଇ ହେଁ ଥାକେ ।

৫০। তবে কি তারা অজ্ঞতা যুগের  
মীমাংসা কামনা করে? আর দৃঢ়  
বিশ্বাসীদের কাছে মীমাংসা  
কার্যে আল্লাহর চেয়ে কে উত্তম  
হবে?

তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করার পর এখন কুরআন কারীমের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে। আল্লাহ প্রাক বলছেন-আমি এ কুরআনকে হক ও সত্যতার সাথে নায়িল করেছি। নিশ্চিতরূপে এটা এক আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে এবং এটা তাঁরই কালাম বা কথা। এটা পূর্ববর্তী সমুদয় কিতাবের সত্যতা স্বীকার করছে এবং এসব কিতাবেও এর প্রশংসা ও গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে। আর ঐ কিতাবগুলোর মধ্যে এ বর্ণনাও রয়েছে যে, এ পবিত্র ও সর্বশেষ কিতাবটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল (সঃ)-এর উপর অবর্তীণ হবে। সুতরাং প্রত্যেক জ্ঞানী লোক এর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং একে মেনে চলে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

أَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلَّادْقَانِ سُجَّدًا \* وَ  
يَقُولُونَ سَبِّحْنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمْفُوْلًا \*

ଅର୍ଥାଏ “ଇତିପୂର୍ବେ ଯାଦେରକେ ଇଲ୍‌ମ ବା ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରା ହେଯେଛିଲ ତାଦେର ସାମନେ ଯଥନ ଏଟା ପାଠ କରା ହୟ ତଥନ ଥୁତନିର ଭରେ ତାରା ସିଜଦାୟ ପଡ଼େ ଯାଇ ଏବଂ ମୁଖେ ସ୍ଵିକାରୋକ୍ତି କରେ-ଆମାଦେର ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଓ ପବିତ୍ର, ଆମାଦେର ପ୍ରଭୁର ଓୟାଦା ସତ୍ୟ ଏବଂ ତା ସତ୍ୟରୂପେ ସାବ୍ୟକ୍ତ ହେଯେଇ ଗେଛେ ।” (୧୭୫ ୧୦୭-୧୦୮)

অর্থাৎ তিনি পূর্ববর্তী রাসূলদের মাধ্যমে যেসব সংবাদ দিয়েছিলেন, সবগুলোই সত্যে পরিগত হয়েছে এবং সমস্ত নবীর মাথার মুকুট সর্বশেষ রাসূল হ্যরত মুহাম্মদ (সঃ) এসেই গেছেন। আর এ কিতাব অর্থাৎ কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর আমানতদার। অর্থাৎ এতে যা কিছু রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে

সেগুলোই ছিল। এখন যদি কেউ বিপরীত বলে যে, পূর্ববর্তী অমুক কিতাবে এটা ছিল, তবে সেটা ভুল। এ কুরআন ঐসব কিতাবের সত্যসাক্ষী এবং ঐগুলোকে আবেষ্টনকারী। যেসব মঙ্গলময় ও কল্যাণকর বিষয় ঐ সব কিতাবে মিলিতভাবে ছিল ঐ সমুদয়ই এককভাবে এ সর্বশেষ কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। এ জন্যেই এটা সবগুলোর উপর হাকিম ও অগ্রগণ্য। এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার উপর রয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ عَلَيْهِ حَفْظٌ﴾<sup>১</sup> অর্থাৎ “এ উপদেশপূর্ণ কিতাব আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর হিফাযতকারী।” (১৫:৯) কেউ কেউ বলেছেন যে, এর ভাবার্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হচ্ছেন এ কিতাবের উপর আমানতদার। বাস্তবিকপক্ষে তো এ উক্তিটি সঠিক, কিন্তু এ তাফসীর করা ঠিক হয়নি। বরং আরবী ভাষার দিয়ে এটা চিন্তা ও গবেষণার বিষয়। সঠিক তাফসীর প্রথমটিই বটে। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) হতে এ উক্তিটি নকল করে বলেছেন যে, এটা বহু দূরের কথা, বরং এটা মোটেই ঠিক নয়। কেননা مَهِيمِنٌ শব্দের عَطْفٌ বা سِنْيَوْغٌ مُصْدِقٌ শব্দের উপর রয়েছে। সুতরাং صَفْتٌ শব্দটি যার صَفْتٌ ছিল এটাও ঐ জিনিসেরই صَفْتٌ বা বিশেষণ হবে। যদি হ্যরত মুজাহিদ (রঃ)-এর অর্থ সঠিক বল মেনে নেয়া হয় তবে عَبَارَتْ সংযোগ ছাড়াই হওয়া উচিত ছিল।

‘فَاحْكُمْ بِمِنْهُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ’ অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! সুতরাং তুমি এ সবের মধ্যে আল্লাহর নির্দেশাবলী ছড়িয়ে দাও, আরব হোক বা আয়ম হোক, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত হোক। ‘আল্লাহর নাযিলকৃত’-এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অহী। হয় সেটা এ কিতাবের আকারেই হোক, না হয় আল্লাহ তা'আলা যে পূর্ববর্তী আহকাম তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন সেটাই হোক। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতের পূর্বে তো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে ফায়সালা করা ও না করার অধিকার দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর অহী মোতাবেক ফায়সালা করা জরুরী। তাঁকে বলা হচ্ছে-হে নবী (সঃ)! এ দুর্ভাগ্য অজ্ঞরা নিজেদের পক্ষ থেকে যে আহকাম তৈরী করে নিয়েছে এবং ওর কারণে আল্লাহর কিতাবকে যে পরিবর্তন করে ফেলেছে, কোনক্রমেই তুমি তাদের প্রবৃত্তির পেছনে পড়ে সত্যকে ছেড়ে বসো না। তাদের প্রত্যেকের জন্যে আমি রাস্তা এবং পদ্ধা তৈরী করে দিয়েছি।

কোন কিছুর সূচনা করাকে شِرْعَةً বলা হয়। আভিধানিক অর্থে প্রকাশ্য ও সহজ পথকে مِنْهَاجٍ বলে। সুতরাং এ দুটি শব্দের এ তাফসীরই বেশী যুক্তিসঙ্গত হবে

যে, পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়ত যা আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল তার সবগুলোই তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশ্য ছোট খাটো হৃকুমের ব্যাপারে কিছুটা পার্থক্য ছিল। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমরা সব নবীর দল পরম্পরারের বৈমাত্রেয় ভাই। আমাদের সবারই দ্বীন এক।” প্রত্যেক নবীকে তাওহীদসহ পাঠানো হতো এবং প্রত্যেক আসমানী কিতাবে তাওহীদের বর্ণনা, ওটাকেই সাব্যস্ত করণ এবং ওরই দিকে আহ্বান থাকতো। যেমন কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছে- “তোমার পূর্বে আমি যত রাসূলই পাঠিয়েছিলাম তাদের এ অহী করেছিলাম-আমি ছাড়া কোন মা’বুদ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।”

অন্য জায়গায় আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ “আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়ে এ নির্দেশই দিয়েছিলাম-তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাগুত বা শয়তানের ইবাদত থেকে বিরত থাকবে।” হ্যাঁ, তবে আহকামের বিভিন্নতা অবশ্যই ছিল। কোন একটি জিনিস কোন এক যুগে হারাম ছিল, পরে তা হালাল হয়ে যায়। কিংবা এর বিপরীত, অর্থাৎ কোন যুগে হালাল ছিল, পরে তা হারাম হয়ে যায়। অথবা, কোন এক হৃকুম কোন সময় হালাকা ছিল, পরে তা ভারী হয়ে যায়। কিংবা এর বিপরীত। আর এটাও আবার ছিল হিকমত, মুসলিমাত এবং আল্লাহর দলীল প্রমাণের সাথে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, যেমন তাওরাত একটি শরীয়ত, ইঞ্জীল একটি শরীয়ত এবং কুরআন একটি পৃথক শরীয়ত। এটার কারণ হচ্ছে এই যে, যেন প্রত্যেক যুগের বাধ্য ও অবাধ্য বান্দাদের মধ্যে পরীক্ষা হয়ে যায়। অবশ্য সর্বযুগে তাওহীদ একই রূপ ছিল। আর এই বাক্যের অর্থ হচ্ছে-হে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মত। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে আমার এ কিতাবকে (কুরআনকে) শরীয়ত ও তরীকা বানিয়েছি। তোমাদের সবাবই এর অনুকরণ করা উচিত। এ অবস্থায় **‘جَعْلُ’**-এর পরে, সর্বনাম উহ্য মেনে নিতে হবে। সুতরাং উন্নত উদ্দেশ্য লাভের মাধ্যম ও পঙ্খা একমাত্র কুরআন, আর কিছুই নয়। কিন্তু সঠিক উক্তি প্রথমটিই বটে। এর এটাও একটা দলীল যে, এর পরে রয়েছে- “যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তোমাদের সকলকে একই উম্মত করে দিতেন।” অতএব জানা গেল যে, পূর্ব সংবোধন শুধু এ উম্মতকেই নয়, বরং এর সংবোধন হচ্ছে সকল উম্মতের প্রতিই। আর এতে আল্লাহ তা’আলার খুব বড় ও পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা রয়েছে যে, যদি তিনি চাইতেন তবে সমস্ত লোককে একই শরীয়ত ও একই দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করতেন, কোন সময়ও কোন প্রকার পরিবর্তন আসতো না। কিন্তু মহান

প্রভুর পরিপূর্ণ হিকমত ও কলাকৌশলের চাহিদা এই যে, তিনি পৃথক শরীয়ত নির্ধারণ করবেন, একের পর অন্য নবী প্রেরণ করবেন, কোন নবীর হৃকুমকে পরবর্তী নবীর মাধ্যমে বদলিয়ে দেবেন। শেষ পর্যন্ত হ্যরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ)-এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী সমস্ত দ্বীন মানসূখ বা রাহিত হয়ে যায়। তাঁকে সারা বিশ্বের জন্যে সর্বশেষ নবী করে পাঠানো হয়।

ঘোষিত হচ্ছে-এ বিভিন্ন শরীয়ত দেয়া হয়েছে শুধু তোমাদের পরীক্ষার জন্যে, যেন তিনি তোমাদের বাধ্য ও অনুগত লোকদেরকে পুরস্কার এবং অবাধ্য লোকদেরকে শাস্তি দেন। এটাও বলা হয়েছে যে, তিনি যেন ঐ জিনিস দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন যা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ কিতাব। অতএব, তোমাদের উচিত মঙ্গল ও পুণ্যের দিকে দৌড়িয়ে যাওয়া, আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর শরীয়ত মেনে চলতে আগ্রহী হওয়া এবং সর্বশেষ কিতাব এবং সর্বশেষ নবী (সঃ)-এর মনে প্রাণে আনুগত্য করা। হে লোক সকল! তোমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্তন ও আশ্রয়স্থল আল্লাহরই কাছে। সেখানে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মতভেদের মধ্যে প্রকৃত মত সম্পর্কে অবহিত করবেন। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিতদের তিনি পুরস্কৃত করবেন এবং মিথ্যা ও বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত, বিরুদ্ধবাদী ও প্রবৃত্তিপূজারীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। যারা হককে মানা তো দূরের কথা, বরং হকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। যহুক (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উচ্চতে মুহাম্মাদিয়াকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথমটিই উত্তম।

অতঃপর প্রথম কথার প্রতি আরও গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে এবং ওর বিপরীত থেকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে-হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি যেন এ বিশ্বাসঘাতক, চক্রান্তকারী, মিথ্যাবাদী, কাফির ইয়াহুদীর কথার ফাঁদে পড়ে আল্লাহর কোন হৃকুম থেকে এদিক ওদিক চলে না যাও। যদি তারা তোমার হৃকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং শরীয়ত বিরোধী কাজে লিঙ্গ হয়ে পড়ে তবে জেনে রেখো যে, তাদের কলংকময় কার্যাবলীর কারণে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবশ্যই নেমে আসবে। এজন্যই ভাল কাজের তাওফীক তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। অধিকাংশ লোকই হচ্ছে ফাসেক অর্থাৎ হকের আনুগত্য হতে বাইরে, আল্লাহর দ্বীনের বিরোধী এবং হিদায়াত হতে দূরে। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেছেন-

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتُ بِمُؤْمِنِينَ -

অর্থাৎ “তুমি লোভ করে চাইলেও অধিকাংশ লোক মুমিন নয়।”(১২৪ ১০৩)  
অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেন-

وَإِنْ تِطْعُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلُوكُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ -

অর্থাৎ ‘তুমি যদি পৃথিবীবাসীর অধিকাংশের কথা মেনে চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে।’ (৬: ১১৭)

ইয়াহুদীদের কয়েকজন বড় বড় নেতা এবং আলেম আপোমে এক মিটিং করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হায়ির হয় এবং বলেঃ ‘আপনি জানেন যে, আমরা যদি আপনাকে মেনে নেই তবে সমস্ত ইয়াহুদী আপনার নবুওয়াতকে স্বীকার করে নেবে। আর আমরা আপনাকে মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। আপনি শুধু এটুকু করেন যে, আমাদের মধ্যে এবং আমাদের কওমের মধ্যে একটা বিবাদ আছে, আপনি আমাদের মতানুযায়ী এর মীমাংসা করে দিন।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওটা অস্বীকার করলেন। ঐ সম্পর্কেই এ আয়াতগুলো অবর্তীর্ণ হয়।

এরপর মহান আল্লাহ ঐ লোকগুলো কথার প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়ে বলছেনঃ যারা আল্লাহর এমন হৃকুম থেকে দূরে সরে থাকে যার মধ্যে সমস্ত মঙ্গল বিদ্যমান রয়েছে এবং সমস্ত অঙ্গসূল দূরে আছে, এরূপ পবিত্র হৃকুম থেকে সরে গিয়ে কিয়াসের দিকে, কু-প্রবৃত্তির দিকে এবং ঐসব হৃকুমের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা লোকেরা কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে নিয়েছে। যেমন আহলে জাহেলিয়াত ও আহলে দলালাত (গুমরাহ সম্প্রদায়) নিজেদের মত ও মর্জি মোতাবেক হৃকুম আহকাম জারী করতো এবং যেমন তাতারীগণ রাস্তীয় কাজ কারবারে চেঙ্গিজ খানি হৃকুমের অনুসরণ করতো, যা আল-ইয়াসিক তৈরী করে দিয়েছিল। ওটা ছিল বহু সম্মিলিত আহকামের দফতর, যা বিভিন্ন শরীয়ত ও মাযহাব হতে ছেঁটে নেয়া হয়েছিল। ওটা ছিল ইয়াহুদিয়াত, নাসরানিয়াত, ইসলামিয়াত ইত্যাদি সমস্ত আহকামের সমষ্টি, আবার তাতে এমনও কতক আহকাম ছিল যা শুধুমাত্র জ্ঞান, মত ও সূক্ষ্ম চিন্তা দ্বারা আবিষ্কার করা হয়েছিল এবং যার মধ্যে প্রবৃত্তির ও সংযোগ ছিল। সুতরাং ঐ সমষ্টিই তাদের সন্তানদের নিকট আমলের যোগ্য বিবেচিত হতো এবং ওকেই তারা কিতাব ও সুন্নাতের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়ে দিলো। প্রকৃতপক্ষে এরূপ কার্য সম্পাদনকারীরা কাফির এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব। যে পর্যন্ত তারা ঐসব ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন না করে এবং যে কোন ছোট, বড়, গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন হৃকুম গ্রহণ না করে।

তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ তবে কি তারা অজ্ঞানতার যুগের মীমাংসা কামনা করে? দৃঢ় বিশ্বাসীদের কাছে মীমাংসা কার্যে আল্লাহর চেয়ে উত্তম কে হবে?

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারও হুকুম বেশী ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক হতে পারে না। ঈমানদার ও পূর্ণ বিশ্বাসীগণ খুব ভাল করেই জানে যে, এ আহকামুল হাকিমীন, আরহামুর রাহিমীনের চেয়ে বেশী উত্তম, স্বচ্ছ, সহজ ও পবিত্র আহকাম, মাসায়েল এবং কাওয়ায়েদ আর কারও হতে পারে না। মা তার ছেলের প্রতি যতটা পরবশ হতে পারে তার চেয়েও বেশী তিনি তাঁর সৃষ্টজীবের উপর মেহেরবান ও দয়ালু। তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান, বিরাট শক্তি এবং ন্যায় ও ইনসাফের অধিকারী। হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ফায়সালা ছাড়া কোন ফতওয়া দেয় ওটাকে জাহেলিয়াতের হুকুম বলা হবে। হ্যরত তাউস (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ “আমি কি আমার সন্তানদের কাউকে বেশী এবং কাউকে কম দিতে পারি?” তখন তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। তিবরানী (রঃ)-এর হাদীস গ্রন্থে হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “ঐ ব্যক্তি আল্লাহর সবচেয়ে বড় শক্তি যে ইসলামে অজ্ঞতা যুগের নিয়ম-কানুন ও চাল-চলন অনুসঙ্গান করে এবং বিনা কারণে কাউকে হত্যা করতে উদ্যত হয়।” এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতেও “রয়েছে এবং তাতে কিছুটা বেশী আছে।

৫১। হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও শ্রীষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে প্রহণ করো না, তারা পরম্পর বন্ধু, আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিচয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে; নিচয়ই আল্লাহ অত্যাচারী কওমকে সুপথ প্রদর্শন করেন না।

৫২। এ কারণেই যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে, তাদেকে তোমরা দেখেছ যে, তারা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে তাদের (কাফিরদের) মধ্যে প্রবেশ করছে, এবং তারা

৫১-<sup>بِأَيْمَانِهَا الَّذِينَ امْنَوْا</sup>  
 لَا تَتَخِذُوا إِلَيْهِمْ وَدًّا  
 وَالنَّصْرَى أُولَئِكُمْ بَعْضُهُمْ  
 أُولَئِكُمْ بَعْضٌ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  
 مِّنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِّنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 لَا يَهِدِي النَّقْوَمَ الظَّلِيمِينَ ০

৫২-<sup>فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ</sup>  
 مَرْضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ

বলে—আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে না কি! অতএব আশা যে, অচিরেই আল্লাহহ (মুসলমানদের) পূর্ণ বিজয় দান করবেন অথবা অন্য কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে (প্রকাশ করবেন), অনন্তর তারা নিজেদের অন্তরে লুকায়িত মনোভাবের কারণে লজ্জিত হবে।

৫৩। আর মুসলমানরা বলবে—  
আরে! এরাই না কি তারা! যারা অতি দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নামে শপথ করতো যে আমরা তোমাদের সাথেই আছি; এদের সমস্ত কর্মই ব্যর্থ হয়ে গেল, ফলে তারা অকৃতকার্য রইলো।

এখানে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের শক্তি ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মুমিনদেরকে নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন— তারা কখনও তোমাদের বন্ধু হতে পারে না। কেননা, তোমাদের ধর্মের প্রতি তাদের হিংসা ও শক্রতা রয়েছে। হ্যাঁ, তারা নিজেরা একে অপরের বন্ধু বটে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব কায়েম করবে তারা তাদেরই অস্তর্ভুক্ত হবে। হ্যরত উমার (রাঃ) হ্যরত আবু মুসা (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন করেছিলেন এবং এ আয়াতটি পড়ে শুনিয়েছিলেন।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উৎবা বলেনঃ “হে লোক সকল! তোমরা এ থেকে বেঁচে থাকো যে, তোমরা নিজেরা জানতেই পারবে না, অথচ আল্লাহর কাছে ইয়াহুদী ও নাসারা বলে পরিগণিত হয়ে যাবে।” বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বুঝে গেলাম যে, এ আয়াতের ভাবার্থই তার উদ্দেশ্য।

نَخْشِيْ أَنْ تُصِيبَنَا دَاءِرَةٌ  
فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَاتِيَ بِالْفَتْحِ  
أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصِبِّحُوا  
عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ  
نَدِيمِينَ ۝

وَيَقُولُ الَّذِينَ امْنَوْا أَهْلَاءَ  
الَّذِينَ اقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدًا  
إِيمَانَهُمْ إِنَّهُمْ لِمَعْكُمْ حِيطَتْ  
أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِحُوا خَسِيرِينَ ۝

যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা গোপনীয়ভাবে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে যোগাযোগ ও ভালবাসা স্থাপন করে থাকে এবং অজুহাত পেশ করে বলে-এরা যদি মুসলমানদের উপর জয়যুক্ত হয়ে যায় তবে না জানি আমরা বিপদে পড়ে যাই। এ জন্যই তাদের সাথে মিল রাখছি। কারও মন চটিয়ে আমাদের লাভ কি? আল্লাহ পাক বলেন-খুব সম্ভব, আল্লাহ মুসলমানদেরকে স্পষ্ট বিজয় দান করবেন। মঙ্গাও তাদের হাতে বিজিত হবে এবং শাসনকর্তা তারাই হবে। আল্লাহ তাদেরই পায়ের নীচে হৃকুমত নিষ্কেপ করবেন অথবা ইয়াহুদী নাসারাদেরকে পরাজিত করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করতঃ তাদের নিকট থেকে জিয়িয়া কর আদায় করার নির্দেশ তিনি মুসলমানদেরকে প্রদান করবেন। সুতরাং আজ যেসব মূলাফিক গোপনীয়ভাবে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে সংযোগ স্থাপন করছে এবং নেচে কুদে বেড়াচ্ছে, সেদিন এ চালাকির জন্যে তাদেরকে রক্তাশ্র বহাতে হবে। তাদের পর্দা সেদিন খুলে যাবে। ঐ সময় মুসলমানরা তাদের এ চক্রান্তের উপর বিশ্ববোধ করবে এবং বলবেঃ আরে! এরা কি ওরাই, যারা আমাদেরকে শপথ করে করে বলতো যে, তারা আমাদের সাথেই আছে! তারা যা কিছু করেছিল সব বিনষ্ট হয়ে গেল।<sup>وَيَقُولُ</sup> তো হচ্ছে জমহুরের কিরআত।<sup>وَلَوْ</sup> ছাড়াও একটি কিরআত রয়েছে। মদীনাবাসীর কিরআত এটাই। ইয়াকুলু হচ্ছে মুবতাদা এবং এর অন্য কিরআত ইয়াকুলা আছে। তাহলে এটা ফাআসা এর উপর আত্ফ হবে। এটা যেন ওয়া আঁইয়াকুলা ছিল। মদীনাবাসীর মতে এই আয়াতগুলোর শানে নয়ল এই যে, উহুদ যুদ্ধের পর একটি লোক বলে- ‘আমি এ ইয়াহুদীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছি, যাতে সুযোগ আসলে আমি এর দ্বারা উপকৃত হতে পারি।’ অপর একটি লোক বললোঃ ‘আমি অমুক খ্রীষ্টানের নিকট গমনাগমন করে থাকি এবং তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে আমি তাকে সাহায্য করবো।’ তখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

ইকরামা (রঃ) বলেন যে, লুবাবাহ ইবনে মুনফিরের ব্যাপারে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। যখন নবী (সঃ) তাঁকে বানু কুরাইয়ার নিকট প্রেরণ করেন তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবেন? তখন তিনি স্বীয় গলদেশের প্রতি ইঙ্গিত করেন অর্থাৎ তিনি ইঙ্গিতে বলেনঃ “তিনি তোমাদের সকলকে হত্যা করবেন।”

একটি বর্ণনায় আছে যে, এ আয়াতগুলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। হ্যরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ) রাসূলুল্লাহ

(সঃ)-কে বলেনঃ বহু ইয়াহুদীর সাথে আমার বন্ধুত্ব আছে, কিন্তু তাদের সবারই বন্ধুত্ব ভেঙ্গে দিলাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বন্ধুত্বই আমার জন্যে যথেষ্ট। তখন ঐ মুনাফিক (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই) বললোঃ আগা-পিছা চিন্তা করা আমার অভ্যাস। আমার দ্বারা এটা হতে পারে না। বলা যায় না কোন সময় কি হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ “হে আবদুল্লাহ! তুমি উবাদা (রাঃ) হতে খুবই নিম্নস্তরে নেমে গেছ।” ঐ সময় এ আয়াতগুলো অবর্তীর্ণ হয়।

আর একটি বর্ণনায় আছে যে, বদর যুদ্ধে যখন মুশকিরদের প্রারজয় ঘটে তখন কতক মুসলমান তাদের সাথে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ইয়াহুদীদেরকে বললেনঃ “তোমাদের পরিগামও এক্ষণপই হবে। সুতরাং এর পূর্বেই তোমরা সত্য ধর্ম (ইসলাম) কবূল করে নাও।” উত্তরে তারা বললোঃ “যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ কতক কুরাইশের উপর জয়লাভ করে অহংকারে মেতে ওঠো না। যদি আমাদের সাথে যুদ্ধের পালা পড়ে তবে যুদ্ধ কাকে বলে তা জেনে নেবে।” সেই সময় হ্যরত উবাদা (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর মধ্যে ঐ কথোপকথন হয় যা উপরে বর্ণিত হলো।

যখন ইয়াহুদীদের এ গোত্রের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ বাঁধে এবং আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে মুসলমানরা জয়লাভ করেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে থাকেঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার বন্ধুদের ব্যাপারে আমার উপর অনুগ্রহ করুন। এ লোকগুলো খায়রায গোত্রের সঙ্গী ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে কোন উত্তর দিলেন না। সে আবার বললো। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে তখন তাঁর অঞ্চল ধরে লটকে গেল। তিনি রাগতঃ স্বরে বললেনঃ “ছেড়ে দাও।” সে বললোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! না, আমি ছাড়বো না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। তাদের দল খুবই বড় এবং আজ পর্যন্ত তারা আমার পক্ষ অবলম্বন করে আসছে। আর একদিনেই তারা ধ্রংসের ঘাটে অবতরণ করছে! আমার তো খুব ভয় হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে হয় তো আমাদেরকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।” অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “যাও, ঐ সব কিছু তোমারই জন্যে অবধারিত।” অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন বানু কাইনুকার ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহ তাদেরকে প্রারজয়ের ফ্লানি ভোগ করান, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। কিন্তু হ্যরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) তাদের বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তাদের পক্ষে সুপারিশ

করতে স্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করেন। তখন ‘হমুল গালেবুনা’ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবর্তীর্ণ হয়। মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে দেখতে যান এবং বলেনঃ ‘আমি তো তোমাকে বারবার ঐ ইয়াহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করেছিলাম।’ তখন সে বললোঃ “সা’দ ইবনে যারারা” (রাঃ) তো তাদের সাথে শক্রতা করতেন, তথাপি তিনি তো মারা গেছেন।”

৫৪। হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হতে ফিরে যায়, তবে (এতে ইসলামের কোন ক্ষতি নেই। কেননা) আল্লাহ সত্তরই (তাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে আল্লাহ ভাল বাসবেন, তারা মুসলমানদের প্রতি মেহেরবান থাকবে, কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, আর তারা কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না; এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, বন্ধুত্বঃ আল্লাহ সুপ্রশস্ত মহাজ্ঞানী।

৫৫। তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এবং মুমিনরা— যারা নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত আদায় করে, এ অবস্থায় যে, তাদের মধ্যে বিনয় থাকে।

৫৪-**يَا يَاهَا الَّذِينَ امْنَوْا مِنْ يَرْتَدِ**

**مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَسُوفَ يَأْتِي**

**اللَّهُ بِقِيُومٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ**

**أَذْلَلِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّهُ**

**عَلَى الْكُفَّارِينَ يُجَاهِدُونَ فِي**

**سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً**

**لَا يَمِّنْ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ**

**مِنْ يِشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ**

৫৫-**إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ**

**وَالَّذِينَ امْنَوْا الَّذِينَ يَقِيمُونَ**

**الصَّلَاةَ وَيَؤْتُونَ الزَّكُوْةَ وَهُمْ**

**رَكِعُونَ** ০

৫৬। আর যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখবে  
আল্লাহর সাথে, তাঁর রাসূল  
(সঃ)-এর সাথে এবং  
মুমিনদের সাথে, তবে (তারা  
আল্লাহর দলভুক্ত হলো এবং)  
নিশ্চয়ই আল্লাহর দলই  
বিজয়ী।

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَالَّذِينَ امْنَوْا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ  
هُمُ الْغَلِيْبُونَ ٤٦

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন যে, যদি কেউ এ পবিত্র দ্বীন ত্যাগ করে, তবে সে ইসলামের একটুও ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ তাদের পরিবর্তে এমন লোকদেরকে এ সত্য ধর্মের খিদমতে লাগিয়ে দেবেন যারা সবদিক দিয়েই এদের চেয়ে উন্নত হবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে-  
إِنَّ بَشَّارَ اِرْتِدَادٍ بَلَّا هُوَ مُرْتَدٌ  
وَيَاتٍ يَذْهِبُكُمْ اِيْهَا النَّاسُ وَيَاتٍ يَاخْرِيْنَ  
(৪৪: ১৩৩) অন্য এক জায়গায় রয়েছে-  
يَخْلُقُ جَدِيدًا  
(১৪: ১৯) এসব আয়াতের ভাবার্থ ওটাই যা বর্ণনা করা হলো। হককে ছেড়ে দিয়ে বাতিলের দিকে ফিরে যাওয়াকে **أَرْتِدَادٍ** বলা হয়। মুহাম্মাদ ইবনে কাব (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি কুরাইশ নেতৃবর্গের ব্যাপারে অবর্তীণ হয়। হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর খিলাফতকালে যেসব লোক ইসলাম থেকে ফিরে গিয়েছিল তাদের হৃকুম এ আয়াতে রয়েছে। তাদের পরিবর্তে যে কওমকে আনয়নের ওয়াদা করা হচ্ছে, তার হচ্ছে আহ্লে কাদেসিয়া বা কওমে সাবা অথবা আহ্লে ইয়ামান, যারা কিন্দাহ ও সুকু গোত্রের লোক। একটি খুবই গারীব মারফু' হাদীসেও শেষোক্ত কথাটি বর্ণিত আছে। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) হ্যরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন এ আয়াতটি অবর্তীণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেনঃ “তারা এ লোকটির কওমের লোক।”

ঐ পূর্ণ ঈমানদারদের গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা তাদের বন্ধুদের প্রতি (অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি) খুবই কোমল ও ন্যূন হবে, কিন্তু কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-  
أَشَدَّاءٌ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءٌ  
‘অর্থাৎ’ ‘তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর আর পরম্পরের প্রতি অত্যন্ত কোমল ও দয়ালু।’ (৪৯: ২৯) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি বন্ধুদের সামনে ছিলেন অর্থাৎ তিনি বন্ধুদের প্রতি পুরুষ হিসেবে ছিলেন।

হাসিমুখ ও প্রফুল্ল চেহারা বিশিষ্ট, আর শক্রদের সামনে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও সংগ্রামী বীর পুরুষ। মুসলমানরা জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না, ক্লান্ত হয়ে পড়ে না, ভীরুতা প্রকাশ করে না এবং বিলাসপ্রিয় হয় না। তারা আল্লাহর ওয়াস্তে কাজ করতে গিয়ে কোন তিরক্ষারকারীর তিরক্ষারকে ভয় করে না। আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর শক্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, ভাল কাজের হকুম করা এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা ইত্যাদি কাজে তারা সদা নিমগ্ন থাকে।

ইমাম আহমাদ (রঃ) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সামিত (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হ্যরত আবু যার (রাঃ) বলেনঃ “আমার বক্তু (হ্যরত মুহাম্মাদ সঃ) আমাকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। (১) মিসকীনদের ভালবাসা এবং তাদের সাথে উঠাবসা করা। (২) (পার্থিব বিষয়ে) নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং উচ্চ পর্যায়ের লোকের দিকে নয়র না দেয়া। (৩) আঙ্গীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখা যদিও ঐ আঙ্গীয় তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। (৪) কারও কাছে কিছু না চাওয়া। (৫) তিক্ত হলেও সত্য কথা বলা। (৬) আল্লাহর ব্যাপার (ধর্মীয় কাজে) কোন তিরক্ষারকারীর তিরক্ষারকে ভয় না করা। (৭) অধিকাংশ সময় **لَحْوٌ وَلِقْوَةٌ**-এ কালেমাটি পাঠ করা, কেননা এটা আরশের কোষাগার।” অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হ্যরত আবু যার (রাঃ) বলেনঃ “আমি পাঁচবার রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে দীক্ষা গ্রহণ করেছি এবং তিনি আমাকে সাতটি কাজ পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে বলেছেন। আর আমি সাতবার নিজের উপর আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলেছি যে, আল্লাহর দ্বিনের ব্যাপারে কোন ভর্তসনাকারীর ভর্তসনাকে মোটেই গ্রাহ্য করবো না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) একবার আমাকে ডেকে বলেনঃ “জান্নাতের বিনিময়ে তুমি আমার হাতে দীক্ষা গ্রহণ করবে কি?” আমি তা স্বীকার করে আমার হাতখানা বাড়িয়ে দিলাম। তখন তিনি শর্ত দিলেনঃ “তুমি কারও কাছে কিছুই চাইবে না।” আমি বললামঃ বেশ, ঠিক আছে। তিনি বললেনঃ “যদি চাবুকও হয়, অর্থাৎ ওটাও যদি পড়ে যায় তবে স্বয়ং সওয়ারী থেকে নেমে তা উঠিয়ে নেবে।”

মুসলাদে আহমাদে রয়েছে, হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “লোকের ভয়ে তোমাদের কেউ যেন সত্য ও ন্যায্য কথা বলা থেকে বিরত না থাকে। জেনে রেখো যে, না কেউ মৃত্যুকে এগিয়ে আনতে পারে, না কেউ রিয়্ককে দূর করতে পারে।” ইমাম আহমাদ (রঃ) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে আরও বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ দেখার পর নিজেকে দুর্বল মনে করে নীরব থেকো

না, নতুবা কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। সেই সময় মানুষ উত্তর দিতে গিয়ে বলবেং আমি মানুষের ভয়ে নীরব ছিলাম। তখন মহান আল্লাহ বলবেনঃ “আমি এরই বেশী হকদার ছিলাম যে, তুমি আমাকেই ভয় করতে।” এটাও বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাকে এ প্রশ্নও করবেনঃ ‘তুমি শরীয়ত বিরোধী কাজ দেখে বাধা দাওনি কেন?’ অতঃপর আল্লাহ পাক নিজেই এর উত্তর চাইবেন। তখন সে বলবেং “হে আমার প্রভু! আমি আপনার উপর ভরসা করেছিলাম এবং মানুষকে ভয় করেছিলাম।” (সুনানে ইবনে মাজাহ) অন্য একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে—“মুমিনের জন্যে এটা উচিত নয় যে, সে নিজেকে লাঞ্ছিত করবে।” সাহারীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিভাবে সে নিজেকে লাঞ্ছিত করতে পারে? তিনি উত্তরে বললেনঃ “ঐ বিপদ সে নিজের উপর উঠিয়ে নেবে যা বহন করার শক্তি তার নেই।”

ইরশাদ হচ্ছে—এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানের এ গুণাবলী আল্লাহ পাকের বিশেষ দান। এর তাওফীক তাঁরই পক্ষ থেকে এসে থাকে। তাঁর অনুগ্রহ খুবই প্রশংসন্ত এবং তিনি মহাজ্ঞানী। এ বড় নিয়ামতের হকদার কে তা তিনিই খুব ভাল জানেন।

যৌষিষিত হচ্ছে— তোমাদের বক্তু কাফেররা নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বক্তুত্ব স্থাপন করা উচিত আল্লাহর সাথে, তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সাথে এবং মুমিনদের সাথে। মুমিন তো তারাই যাদের মধ্যে এ গুণাবলী রয়েছে যে, তারা নিয়মিতভাবে নামায আদায় করে যা ইসলামের একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ রূক্ন এবং যাকাত প্রদান করে যা আল্লাহর দুর্বল ও মিসকীন বান্দাদের হক। শেষ বাক্যটি সম্পর্কে কতক লোকের মনে সন্দেহ জেগেছে যে, ওটা **بُوْتَسْوَنَ الرَّكْوَةَ** (২: ৩) থেকে **حَالٌ** হয়েছে। অর্থাৎ তারা রূক্তুর অবস্থায় যাকাত প্রদান করে। এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল ধারণা। কেননা, যদি এটা মেনে নেয়া হয় তবে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, রূক্তুর অবস্থায় যাকাত দেয়া উত্তম। অথচ কোন আলেমই একথা বলেন না। সন্দেহ পোষণকারীরা এখানে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একদা হ্যরত আলী (রাঃ) নামাযে রূক্তুর অবস্থায় ছিলেন, এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে যায়। তখন তিনি ঐ অবস্থাতেই তাঁর আংটিটি খুলে তাকে দিয়ে দেন। হ্যরত সুন্দী (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি সমস্ত মুসলমানের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়। হ্যরত উৎবার উক্তি অনুযায়ী **وَالَّذِينَ أَمْنَوا** দ্বারা সমস্ত মুসলমান ও হ্যরত আলী (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। একটি মারফু’ হাদীসেও আংটির ঘটনাটি রয়েছে এবং কোন কোন তাফসীরকারকও এ তাফসীর

করেছেন। সনদ কিন্তু একটিরও সঠিক নয়। একটিরও বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, ঘটনাটি মোটেই সঠিক নয়। সঠিক ওটাই যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, এ আয়াতগুলো হ্যরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি পরিষ্কার ভাষায় ইয়াহুন্দীদের বন্ধুত্বকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং মুমিনদের বন্ধুত্বে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এ কারণেই আয়াতগুলোর শেষে ঘোষণা করা হয়েছে—যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে সে আল্লাহর সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহর সেনাবাহিনীই জয়যুক্ত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لِغَلِبِنَا وَرَسِلِنَا..... هُمْ أَمْفَلُحُونَ﴾ অর্থাৎ “আল্লাহ এটা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন- আমি ও আমার রাসূলগণই জয়যুক্ত থাকবো, নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত। যারা আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে তাদেরকে তুমি একুশ পাবে না যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর শক্রদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, যদিও তারা তাদের পিতা, ভাই এবং আত্মীয়-স্বজন হয়, এরা তো ওরাই যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিপিবদ্ধ করেছেন এবং স্বীয় কুহ জিবরান্দিল (আঃ) দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করবেন যেগুলোর নিমদেশ দিয়ে স্নোতশ্বিনীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে, তথায় তারা চিরকাল অবস্থান করবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহর সেনাবাহিনী, আল্লাহর সেনাবাহিনীই সফলকাম হবে।” (৫৮: ২১-২২) অতএব, যে কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং মুমিনদের বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, তাকে দুনিয়াতেও সাহায্য করা হবে এবং পরকালেও সে সফলকাম হবে। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতকে এ বাক্য দ্বারাই শেষ করেছেন।

৫৭। হে মুমিনগণ! যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, যাদের অবস্থা এই যে, তারা তোমাদের ধর্মকে হাসি ও তামাশার বস্তু করে রেখেছে—তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, এবং আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

৫৭- ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أُولَئِءِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ عِدَّهُ شَدِيدٌ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾

৫৮। আর যখন তোমরা নামায়ের জন্যে (আয়ান দ্বারা) আস্কান কর, তখন তারা ওর সাথে হাসি ও তামাশা করে, এর কারণ এই যে, তারা একুপ লোক, যারা মোটেই জ্ঞান রাখে না।

٥٨- وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ  
اتَّخِذُوهَا هَزْوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۝

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের মনে অমুসলিমদের বন্ধুত্ব ও ভালবাসার প্রতি ঘৃণা জনিয়ে দিয়ে বলছেন- তোমরা কি এমন লোকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, যারা তোমাদের পবিত্র ধর্মের সাথে হাসি তামাশা করছে? এর জন্যে এসেছে, যেমন **شَبَّانٍ**-**الْأَعْدَى**-**الْأَعْدَى**-এর মধ্যে। কেউ কেউ অল কুফ্ফারে পড়েছেন এবং **عَطْفٌ** করেছেন। আবার কেউ কেউ অল কুফ্ফারা পড়েছেন এবং **تَعْذِيزٌ**-**مَعْمُولٌ**-এর মধ্যে। তখন **تَقْدِيرٌ** **عِبَارَتْ** হবে অলাল কুফ্ফারা আউলিয়ায়া একুপ। এখানে দ্বারা মুশারিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতে ওয়া মিনাল্লায়না আশরাকু একুপ রয়েছে।

ঘোষিত হচ্ছে-যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে আল্লাহকে ভয় কর। এরা তো তোমাদের দ্বিনের সাথে, আল্লাহর সাথে এবং শরীয়তের সাথে শক্রতা করছে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ كُفَّارَ إِلَيْهَا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعُلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَقْوَى مِنْهُمْ تُقْبَةٌ وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ۝

অর্থাৎ “মুসলমানদের উচিত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা মুসলমানদের (বন্ধুত্ব) অতিক্রম করে, আর যে ব্যক্তি একুপ করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব রাখার কোন হিসেবে নয়, অবশ্য এমন অবস্থায় (বাহ্যিক বন্ধুত্বের অনুমতি আছে) যখন তোমরা তাদের থেকে কোন প্রকার আংশকা কর, আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর সন্তার ভয় দেখাচ্ছেন, আর আল্লাহরই কাছে ফিরে যেতে হবে।” (৩: ২৮) অনুরূপভাবে আহলে কিতাবের এ কাফিররা ও এবং মুশারিকরা ও এ সময়েও ঠাট্টা-বিন্দুপ করে থাকে যখন তোমরা নামায়ের জন্যে আয়ান দাও। অথচ এটাই আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত। কিন্তু

এ নির্বোধরা এটুকুও জানে না । তাই তারা শয়তানের অনুসারী । আর শয়তানের অবস্থা এই যে, আযান শোনামাত্রই সে গুহ্যমার দিয়ে বায় বের করতঃ লেজ গুটিয়ে পলায়ন করে এবং সেখানে গিয়ে থেমে যায় যেখানে আযানের শব্দ পৌছে না । তারপর আবার আসে এবং তাকবীর শুনে পালিয়ে যায় । তাকবীর দেয়া শেষ হলেই সে পুনরায় এসে পড়ে এবং নামাযীকে বিভ্রান্ত করার কাজে লেগে যায় । তাকে সে এদিক ওদিকের বিস্মরণ হয়ে যাওয়া কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, এমনকি কত রাকআত নামায হয়েছে তাও তার আর স্মরণ থাকে না । যখন এরূপ অবস্থা ঘটবে দু'টো সহু সিজদা করতে হবে । (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) ইমাম যুহরী (রঃ) বলেন যে, কুরআন কারীমে আযানের উল্লেখ রয়েছে । অতঃপর তিনি এ আয়াতটিই পাঠ করেন ।

মদীনায় একজন খ্রীষ্টান ছিল । আযানে যখন “আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ” শুনতো তখন সে বলতোঃ “এই মিথ্যাবাদী জুলে পুড়ে যাক ।” একদা রাত্রে তার চাকরাণী ঘরে আগুন নিয়ে আসে । কোন পতঙ্গ উড়ে আসে,” ফলে তার ঘরে আগুন লেগে যায় এবং ঐ ব্যক্তি ও তার ঘরবাড়ী পুড়ে ভৱ্য হয়ে যায় ।

মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত বিলাল (রাঃ)-কে কা'বা ঘরে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন । নিকটেই আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, আত্তাব ইবনে উসায়েদ এবং হারিস ইবনে হিশাম বসে ছিল । আত্তাব তো আযান শুনে বলেই ফেললোঃ “আমার পিতার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে যে, তিনি এ ক্রোধ উদ্দেককারী শব্দ শোনার পূর্বেই দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেছেন ।” হারিস বললোঃ “আমি যদি একে সত্য জানতাম তবে তো মেনেই নিতাম ।” আবু সুফিয়ান বললোঃ “ভয়ে তো আমার মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হচ্ছে না, না জানি এ কংকরণলো তাঁকে এ খবর জানিয়ে দেয় ।” তাদের কথাগুলো বলা শেষ হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের কাছে এসে পড়েন এবং তাদেরকে বললেনঃ “তোমরা এই সময় এই এই কথা বলেছো ।” তাঁর এ কথা শোনামাত্রই আত্তাব এবং হারিস তো বলেই ফেলেঃ “আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল! এখানে তো চতুর্থ কেউ ছিল না । তাহলে আমরা ধারণা করতে পারতাম যে, সেই হয়তো গিয়ে আপনকে এসব কথা বলে দিয়েছে ।” (সীরাতে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক)

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাজরীয় যখন সিরিয়ার সফরে বের হন তখন যাত্রার প্রাকালে হ্যরত আবু মাহয়ুরাকে বলেন, যাঁর ক্রোড়ে তিনি পিতৃহীন হিসেবে লালিত পালিত হয়েছিলেন—‘তথাকার লোকেরা অবশ্যই আমাকে আপনার

আযানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সুতরাং আপনি আপনার আযান সম্পর্কীয় ঘটনাগুলো আমার নিকট বর্ণনা করুন।” তখন আবৃ মাহ্যুরা (রাঃ) বলেনঃ তাহলে শুন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ছনায়েনের যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। সেই সময় আমরা পথে এক জায়গায় অবস্থান করছিলাম। নামায়ের সময় হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুআয্যিন আযান দেন। আমরা তখন আযানের সাথে সাথে হাসি তামাসা শুরু করি (অর্থাৎ বিদ্রূপ করে আযানের শব্দগুলো উচ্চারণ করতে থাকি)। কেমন করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কর্ণকুহরে আমাদের শব্দগুলো পৌছে যায়। তখন একজন সৈনিক এসে আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যান। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমাদের মধ্যে কার শব্দ সবচেয়ে উচ্চ ছিল?” সবাই তখন আমার দিকে ইশারা করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সবকে ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র আমাকেই ধরে রাখেন এবং বলেনঃ “দাঁড়িয়ে আযান বল।” আল্লাহর কসম! সেই সময় আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর আদেশ মান্য করা অপেক্ষা অপ্রীতিকর বিষয় আমার কাছে আর কিছুই ছিল না। কিন্তু কি করিঃ আমি নিরূপায় ছিলাম। সুতরাং দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি স্বয়ং আমাকে আযান শিখাতে থাকেন এবং আমি তা বলতে থাকি। (অতঃপর তিনি পূর্ণভাবে আযানের বাক্যগুলো বলেন) আযান দেয়া শেষ হলে তিনি আমাকে একটি থলে দেন, যার মধ্যে কিছু চাঁদি বা রৌপ্য ছিল। অতঃপর তিনি তাঁর পবিত্র হাতখানা আমার মাথায় রাখেন এবং তা পিঠ পর্যন্ত নিয়ে যান। তারপর তিনি বলেনঃ “আল্লাহ তোমার ভেতরে ও তোমার উপরে বরকত দান করুন।” আল্লাহর কসম! তখন তো আমার অন্তর হতে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর শক্রতা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় এবং ওর স্থলে অন্তরে ঐরূপই মুহূর্বত সৃষ্টি হয়। আমি অনুরোধ জানিয়ে বলিঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)। আমাকে মক্কার মুআয্যিন বানিয়ে দিন। তিনি বললেনঃ ‘আমি তোমার আবেদন মঞ্জুর করলাম।’” আমি মক্কা চলে গেলাম এবং তথাকার শাসনকর্তা হ্যরত আভাব ইবনে উসাইদ (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর নির্দেশক্রমে মুআয্যিন পদে নিযুক্ত হয়ে গেলাম। হ্যরত আবৃ মাহ্যুরা (রাঃ)-এর নাম ছিল সুমরা ইবনে মুগীরা ইবনে লাওয়ান। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চারজন মুআয্যিনের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। তিনি বহুদিন পর্যন্ত মক্কাবাসীদের মুআয্যিন ছিলেন।<sup>১</sup>

১. ইমাম আহমদ (রঃ) ঐরূপই বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে এবং সুনানে আরবাআর সংকলকগণ এটা তাখরীজ করেছেন।

৫৯। তুমি বলে দাও-হে আহলে  
কিতাব! তোমরা আমাদের  
মধ্যে কোন কাজটি দূষণীয়  
পাছ এটা ব্যতীত যে, আমরা  
ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি  
এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা  
আমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে  
এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা  
অতীতে প্রেরিত হয়েছে, অথচ  
তোমাদের অধিকাংশ লোক  
(উল্লিখিত কিতাবসমূহের)  
প্রতি ঈমান (এর গন্ধী) হতে  
বহির্ভূত।

৬০। তুমি বলে দাও-আমি কি  
তোমাদেরকে একুপ পছ্না বলে  
দেব, যা প্রতিদান থাণ্ডি  
হিসাবে ওটা হতেও (যাকে  
তোমরা মন্দ বলে জান)  
আল্লাহর কাছে অধিক নিকৃষ্ট?  
ওটা ঐসব লোকের পছ্না,  
যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত  
করেছেন এবং যাদের প্রতি  
গ্যব নায়িল করেছেন ও  
যাদেরকে বানর ও শূকর  
বানিয়ে দিয়েছেন এবং তারা  
শয়তানের পূজা করেছে; একুপ  
লোক (যাদের কথা বর্ণিত  
হলো, পরকালে) বাসস্থান  
হিসেবে ও (যা তারা প্রতিদান  
হিসেবে) পাবে খুবই মন্দ এবং  
(ইহকালেও) সরল পথ হতে  
বহুদূরে।

৫৯- ٠٩- قُلْ يَا هَلَّا كِتَبٌ هُلَّ  
٠٩- تَنْقِمُونَ مِنَا إِلَّا أَنْ أَمْنَا  
٠٩- بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا  
٠٩- أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِ وَلَرَأَنَا  
٠٩- فِسْقُونَ ۝

৬০- ٠٩- قُلْ هَلَّا أَنْبَئْنَكُمْ  
٠٩- بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مُثْوِيَةٌ عِنْدَ  
٠٩- اللَّهِ مِنْ لِعْنَةِ اللَّهِ وَ  
٠٩- غَضَبِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ  
٠٩- الْقِرَدةَ وَالخَنَازِيرَ وَعَبْدَ  
٠٩- الطَّاغِيَاتِ اولِيَّ  
٠٩- شَرْمَكَانَا وَاضْلَلَ عَنْ سَوَاءِ  
٠٩- السَّبِيلِ ۝

৬১। আর যখন তারা তোমাদের নিকট আসে, তখন বলে-আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা কুফ্রই নিয়ে এসেছিল এবং তারা কুফ্রই নিয়ে চলে গেছে; এবং আল্লাহ তো খুব ভাল জানেন যা তারা গোপন রাখে।

৬২। আর তুমি তাদের মধ্যে এমন লোক দেখেছো, যারা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে পাপ, যুরুম ও হারাম ভক্ষণে নিপত্তি হচ্ছে, বাস্তবিকই তাদের এ কাজ মন্দ।

৬৩। তাদেরকে আল্লাহওয়ালাগণ এবং আলেমগণ পাপের কথা হতে এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা হতে কেন নিষেধ করছে না? বাস্তবিকই তাদের এ অভ্যাস নিন্দনীয়।

নির্দেশ হচ্ছে-হে মুমিনগণ! যেসব আহলে কিতাব তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রূপ ও উপহাস করছে তাদেরকে বল-তোমরা আমাদের প্রতি যে বৈরীভাব পোষণ করছো তার কারণ তো এটা ছাড়া আর কিছু নয় যে, আমরা আল্লাহর উপর এবং তাঁর সমুদয় কিতাবের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং এটা কোন ঈর্ষার কারণ নয় এবং কোন নিন্দারও কারণ নয়। এটা *استثنى منقطع* হয়েছে। অন্য আয়াতের আছে- *وَمَا نَقْمُوا لَاَنْ اغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ*— অর্থাৎ তারা শুধু এ কারণে প্রতিশোধ নিয়েছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মাল দিয়ে ধনী করে দিয়েছেন।” (৯: ৭৪)

٦١- وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا أَمْنًا  
وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ  
قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا  
كَانُوا يَكْتُمُونَ ○

٦٢- وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ  
يَسَارِعُونَ فِي الْأِثْمِ وَالْعَدْوَانِ  
وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لِبَئْسَ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

٦٣- لَوْلَا يَنْهَا هُمُ الرَّبِينَ وَ  
وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْأِثْمِ  
وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لِبَئْسَ  
مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ○

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে—‘ইবনে জামিল ওরই বদলা নিচ্ছে যে, সে দরিদ্র ছিল, অতঃপর আল্লাহ তাকে ধনী করে দিয়েছেন।’

তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক, অর্থাৎ, সোজা-সরল পথ থেকে তোমরা সরে পড়েছো।<sup>১</sup> তোমরা আমাদের সম্পর্কে যে ধারণা করছো, তাহলে এসো, তোমাদেরকে বলি যে, আল্লাহর নিকট প্রতিফল প্রাপক হিসেবে কে অধিক নিকৃষ্ট! আর এরপ তোমরাই বটে। কেননা, এরপ অভ্যাস তোমাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে নিষ্কেপ করেছেন, যাদের উপর তিনি এতো রাগাভিত হয়েছেন যে, এরপর আর সন্তুষ্ট হওয়ার নয় এবং যাদের কোন কোন দলের আকার বিকৃত করতঃ তাদেরকে তিনি বানর ও শূকরে পরিণত করেছেন। তারা তো তোমরাই। সূরায়ে বাকারায় এর পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল— এখন যেসব বানর ও শূকর রয়েছে এগুলো কি ওরাই? তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ “যে কওমের উপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হয় তাদের বংশধর কেউ থাকে না। (অর্থাৎ তাদেরকে সমূলে ধ্রংস করে দেন)। তাদের পূর্বেও শূকর ও বানর ছিল।” এ রিওয়ায়াতটি বিভিন্ন শব্দে সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাইতেও রয়েছে। মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, জিনদের একটি কওমকে সর্প বানিয়ে দেয়া হয়েছিল, যেমন (ইয়াহূদীদের একটি কওমকে) বানর ও শূকর বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ হাদীসটি অত্যন্ত গারীব। তাদের মধ্য হতেই কোন কোন দলকে গায়রূল্লাহর পূজারী বানিয়ে দেয়া হয়। এক কিরআতে <sup>أضافت</sup>-এর সাথে তাগুতে যেরও রয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে প্রতিমার গোলাম বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। হ্যরত বুরাইদাহ আসলামী (রাঃ) এটাকে আবেদুত্ত তাগুতে পড়তেন। আবু জাফর কারী হতে আওবেদাত্ত ত্বাগুতু -এ পঠনও বর্ণিত আছে। এতে অর্থের দূরত্ব এসে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দূরত্বও নয়। ভাবার্থ এই যে, তোমরা ওরাই

১. লুবাব ঘন্টে রয়েছে যে, একদল ইয়াহূদী নবী (সঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করে—আপনি কোন কোন রাসূলের উপর ঈমান এনেছেন? তিনি উত্তরে বলেনঃ “আম ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর, ইসমাইল (আঃ)-এর উপর, ইয়াকুব (আঃ)-এর উপর, তাঁর সন্তানদের উপর এবং যা দেয়া হয়েছিল, মূসা (আঃ)-কে ও ঈসা (আঃ)-কে এবং যা দেয়া হয়েছিল অন্যান্য নবীদেরকে তাঁদের প্রভুর পক্ষ থেকে।” যখন তিনি ঈসা (আঃ)-এর উল্লেখ করলেন তখন তাঁরা নবুওয়াতকে অঙ্গীকার করলো এবং বললোঃ ‘আমরা ঈসা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনি না এবং যে তাঁর উপর ঈমান এনেছে তাঁর উপরও না।’ তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

যাদের মধ্যে তাগুতের পূজা করা হয়েছে। মোটকথা, আহলে কিতাবকে দোষারোপ করে বলা হচ্ছে— তোমরা তো আমাদেরকে দোষারূপ করছো, অথচ আমরা একত্ত্ববাদী। আমরা শুধু এক আল্লাহকে মেনে থাকি। আর তোমরা তো হচ্ছ ওরাই যে, তোমাদের মধ্যে সব কিছুই পাওয়া যায়। এ কারণেই শেষে বলা হয়েছে—এ লোকেরাই সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে খুবই নিকৃষ্ট পর্যায়ের। তারা সীরাতে মুসতাকীম থেকে বহুদূরে। তারা ভুল ও বিভাস্তির পথে রয়েছে। এখানে **إِسْمُ تَفْضِيلٍ بِّيَابِهِ الرَّاكِبِ** ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এতো অধিক পথভ্রষ্ট আর কেউই হতে পারে না। যেমনঃ **أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقْرٌ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا** (২৫: ২৪)-এ আয়াতে রয়েছে।

অতঃপর মুনাফিকদের একটি বদ অভ্যাসের কথা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে জানিয়ে দিয়ে বলেছেনঃ বাহ্যিকভাবে তো মুমিনদের সামনে তারা ঈমান প্রকাশ করে থাকে, কিন্তু তাদের ভেতর কুফরীতে পরিপূর্ণ। তারা তোমার কাছে কুফরীর অবস্থাতেই আগমন করে এবং যখন ফিরে যায় তখন কুফরীর অবস্থাতেই ফিরে যায়। তোমার কথা ও উপর্যুক্ত তাদের উপর মোটেই ক্রিয়াশীল হয় না। ভেতরের এ কল্পুষ্ঠা দ্বারা কি উপকার তারা লাভ করবে? যাঁর কাছে তাদের কাজ, তিনি আলেমুল গায়েব। অদৃশ্যের সমন্ত খবরই তো তিনি জানেন। তাদের অন্তরের গোপন কথা তাঁর কাছে উজ্জ্বল হঙ্গে রয়েছে। সেখানে গিয়ে তাদেরকে এর পূর্ণ ফল ভোগ করতে হবে।

হে নবী (সঃ)! তুমি তো স্বচক্ষে দেখছো যে, তারা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে কিভাবে পাপ, যুলুম ও হারাম ভক্ষণে নিপত্তি হচ্ছে! তাদের কৃতকর্মগুলো অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। তাদের অলী উল্লাহরা অর্থাৎ আবেদ ও আলেমরা তাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখছে না কেন? প্রকৃতপক্ষে এসব আলেম ও পীরের কাজগুলোও খারাপ হয়ে গেছে।

হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন যে, আলেম ও ফকীর দরবেশদের ধর্মকের জন্যে এর চেয়ে বেশী কঠিন আয়াত কুরআন কারীমে আর একটিও নেই। হ্যরত যহুহাক (রঃ) হতেও এরকমই বর্ণিত আছে। একদা হ্যরত আলী (রাঃ) এক খুৎবায় আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর বলেনঃ “হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণেই খংস হয়ে গেছে যে, তারা অসৎ কাজে লিঙ্গ থাকতো এবং তাদের আলেমরা ও আল্লাহওয়ালারা সম্পূর্ণরূপে নীরব থাকতো। যখন এটা তাদের অভ্যাসে পরিগত হলো তখন আল্লাহ তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি অবতীর্ণ করলেন। সুতরাং তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যে শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল সেই শাস্তিই তোমাদের উপর

অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তোমাদের উচিত মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। বিশ্বাস রেখো যে, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান না তোমাদের রিয়্ক বা খাদ্য কমাবে, না তোমাদের মৃত্যু নিকটবর্তী করবে। সুনানে আবি দাউদে হ্যরত জাবীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি—“যে কওমের মধ্যে কোন লোক অবাধ্যতার কাজ করে এবং ঐ কওমের লোকগুলো বাধা দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখে না, তাহলে আল্লাহ সবারই উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বেই স্বীয় শান্তি নাফিল করবেন।” সুনানে ইবনে মাজাতেও এ বর্ণনাটি রয়েছে।

### ৬৪। আর ইয়াহুদীরা বললো-

আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে;  
তাদেরই হাত বন্ধ এবং তাদের  
এ উক্তির দরুণ তারা রহমত  
হতে বিদ্রূতি হয়েছে, বরং  
তাঁর (আল্লাহর) তো উভয়  
হাত উন্মুক্ত, যেন্নপ ইচ্ছা ব্যয়  
করেন; আর যে বিষয় তোমার  
নিকট তোমার প্রভুর পক্ষ হতে  
প্রেরিত হয়, তা তাদের মধ্যে  
অনেকের নাফরমানী ও কুফর  
বৃদ্ধির কারণ হয়, এবং তাদের  
পরম্পরের মধ্যে শক্রতা ও  
হিংসা নিষ্কেপ করেছি কিয়ামত  
পর্যন্ত; যখনই (মুসলমানদের  
বিরুদ্ধে) যুদ্ধাঘি প্রজ্ঞালিত  
করতে চায়, আল্লাহ তা  
নির্বাপিত করে দেন; এবং তারা  
ভৃ-পৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়ে  
বেড়ায়, আর আল্লাহ অশান্তি  
বিস্তারকারীদেরকে ভালবাসেন  
না।

٦٤ - وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ  
مَغْلُولَةٌ غَلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنَا  
بِمَا قَالُوا بَلْ يَدِهِ مَبْسُطَتِنَ  
يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَ  
كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ  
رِّيكَ طَغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَبْنَا  
بَيْنَهُمُ الْعِدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى  
يَوْمِ الْقِيَمَةِ كَلِمَا أَوْقَدُوا نَارًا  
لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللَّهُ وَيُسْعَونَ  
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ  
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ○

সূরাঃ মায়িদাঃ ৫

୬୫ । ଆର ଏ ଆହଲେ କିତାବଗଣ  
 (ଇଯାହୂଦୀ ଓ ନାସାରା) ଯଦି  
 ଈମାନ ଆନତୋ ଏବଂ ତାକଓୟା  
 ଅବଲସ୍ବନ କରତୋ, ଆମି  
 ଅବଶ୍ୟଇ ତାଦେର ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାଯୀ  
 କ୍ଷମା କରେ ଦିତାମ ଏବଂ  
 ଅବଶ୍ୟଇ ତାଦେରକେ ଶାନ୍ତିର  
 ଉଦ୍ୟାନସମ୍ବହେ ଦାସିଲ କରତାମ ।

୬୬ । ଆର ଯଦି ତାରା ତାଓରାତ ଓ  
ଇଞ୍ଜୀଲେର ଏବଂ ଯେ କିତାବ  
(ଅର୍ଥାତ୍ କୁରାନ) ତାଦେର ପ୍ରଭୁର  
ପକ୍ଷ ହତେ ତାଦେର ପ୍ରତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ  
ହେଁଛେ, ଓର ସଥାରୀତି  
ଆମଲକାରୀ ହତୋ, ତବେ ତାରା  
ଉପର (ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ) ହତେ  
ଏବଂ ନିମ୍ନ (ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀନ) ହତେ  
ପ୍ରାଚୁର୍ୟେର ସାଥେ ଭକ୍ଷଣ କରତୋ,  
ତାଦେର ଏକଦଳ ତୋ ସରଳ  
ପଥେର ପଥିକ; ଆର ତାଦେର  
ଅଧିକାଂଶଇ ଏରୁପ ଯେ ତାଦେର  
କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ ଅତି ଜୟନ୍ୟ ।

অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের একটি জন্ম উক্তির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা মহান  
আল্লাহকে কৃপণ বলতো। তারাই আল্লাহ পাককে দরিদ্রও বলতো। আল্লাহ  
তা'আলার পবিত্র সন্তা সেই অপবিত্র উক্তির বহু উর্ধ্বে। সুতরাং “আল্লাহর হাত  
বন্ধ হয়ে আছে”- এটার ভাবার্থ তাদের নিকট এই ছিল না যে, তাঁর হাত বন্ধন  
মুক্ত রয়েছে। বরং এর দ্বারা তারা তাঁর কৃপণতা বুঝাতে চেয়েছিল। এ  
বাকরীতিই কুরআন কারীমের অন্য জায়গাতেও রয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক  
বলেনঃ

٦٥- وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَبِ امْنَأُوا  
وَاتَّقُوا لِكُفْرِنَا عَنْهُمْ سِيَّرَتْهُمْ  
وَلَا دُخُلُنَّهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ○

٦٦- وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرِيَةَ  
وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ  
رِبِّهِمْ لَا كَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ  
تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمْةٌ  
مَقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ

١٣- عَمَلُوا مَا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ “স্বীয় হাতকে নিজের গর্দানের সাথে বেঁধে রেখো না এবং সীমা থেকে বেশীও বিস্তার করো না, নচেৎ লজ্জিত হয়ে বসে পড়তে হবে।” (১৭:২৯) সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহ কৃপণতা থেকে এবং অযথা ও অতিরিক্ত খরচ করা থেকে বিরত থাকতে বললেন। অতএব, ইয়াহুদীদেরও “হাত বন্ধন মুক্ত রয়েছে”-এ কথার উদ্দেশ্য এটাই ছিল। ফারাস নামক ইয়াহুদী এ কথা বলেছিল। এই অভিশঙ্গ ইয়াহুদীদেরই “আল্লাহ দরিদ্র এবং আমরা ধনী”-এ উক্তিও ছিল। ফলে হ্যরত আবু বকর (রাঃ) তাকে প্রহার করেছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহুদীদের শাস ইবনে কায়েস নামক একটি লোক বলেছিলঃ ‘নিশ্চয়ই তোমার প্রভু কৃপণ, তিনি খরচ বা দান করেন না।’<sup>১</sup> তখন এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, কৃপণ, লাঞ্ছিত এবং কাপুরূষ হচ্ছে তারা নিজেরাই। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে—“তারা যদি বাদশাহ হয়ে যায় তবে কাউকেও কিছুই দেবে না।” বরং তারা তো অন্যদের নিয়ামত দেখে জুলে পুড়ে মরে। তারা লাঞ্ছিত লোক, বরং আল্লাহর হাত খোলা রয়েছে, তিনি অনেক কিছু খরচ করতে রয়েছেন, তাঁর ফসলও অনুগ্রহ প্রশংস্ত, তাঁর দান সাধারণ। সব জিনিসের ভাণ্ডার তাঁরই হাতে রয়েছে। সমস্ত সৃষ্টজীব দিনরাত সব জায়গায় তাঁরই মুখাপেক্ষী। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

وَاتَّا كُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُو هَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كُفَّارٌ -

অর্থাৎ “তোমরা যা চেয়েছো তাই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করতে চাও তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না, নিশ্চয়ই মানুষ অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ।” (১৪: ৩৪) মুসনাদে আহমাদে হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর দক্ষিণ হস্ত পরিপূর্ণ। রাত দিনের খরচ তাঁর ধনভাণ্ডারকে কমায় না। শুরু হতে আজ পর্যন্ত যত কিছু তিনি স্বীয় মাখলুককে দান করেছেন তা তাঁর ধনভাণ্ডারকে একটুও হ্রাস করেনি। প্রথমে তাঁর আরশ পানির উপর ছিল। তাঁর অপর হাতে ‘দান’ অথবা অধিকার রয়েছে। ওটাই উঁচু করে এবং নীচু করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘তোমরা আমার পথে খরচ কর, আমি তোমাদেরকে দান করবো।’ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি রয়েছে।

১. তিবরানী (রঃ) হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) হতে তাখরীজ করেছেন যে, এ উক্তিকারী ছিল শাস ইবনে কায়েস। আর আবুশ শায়েখ তাখরীজ করেছেন যে, এ উক্তিকারীর নাম হচ্ছে ফানহাস।

ঘোষণা করা হচ্ছে-হে নবী (স):! তোমার কাছে আল্লাহর নিয়ামত যত বৃদ্ধি পাবে, এ শয়তানদের কুফর ও হিংসা-বিদ্বেষ ততো বেড়ে যাবে। অনুরূপভাবে যেমন মুমিনদের ঈমান, আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে তেমনই এসব ইয়াতুন্দী ও মুশরিকদের অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং হিংসা-বিদ্বেষ বাড়তে থাকবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আছে-

قُلْ هُوَ لِلّذِينَ امْنَأْتُمْ هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَذْنِهِمْ وَقَرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّا أُولَئِكَ يَنادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ -

অর্থাৎ “মুমিনদের জন্যে এটা তো হিদায়াত ও প্রতিষেধক এবং বেঙ্গিমানরা এর থেকে অন্ধ ও বধির, এদেরই দূর দূরান্ত থেকে ডাক দেয়া হচ্ছে।” (৪১: ৪৪) আর একটি আয়াতে আছে-

وَنَزَّلَ مِنَ الْقَرآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا -

অর্থাৎ “আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা মুমিনদের জন্যে প্রতিষেধক ও করুণা এবং এর দ্বারা অত্যাচারীদের ক্ষতিই বেড়ে যায়।” (১৭: ৮২)

ইরশাদ হচ্ছে- তাদের পরম্পরের অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈরীভাব কিয়ামত পর্যন্ত মিটবে না। তারা একে অপরের রক্ত পিপাসু। হক ও সত্যের উপর তাদের একতাবন্ধ হওয়া অসম্ভব। তারা নিজেদেরই ধর্মের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে। তাদের পরম্পরের মধ্যে ঝাগড়া-বিবাদ ও শক্রতা চলে আসছে এবং চলতে থাকবে। তারা মাঝে মাঝে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু প্রতিবারেই তাদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়। তাদের চক্রান্ত তাদেরই উপর প্রত্যাবর্তিত হয়। তারা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং আল্লাহর শক্র। কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন না।

মহান আল্লাহ বলছেন-যদি এ আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াতুন্দী ও নাসারারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর উপর ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, আর হারাম ও হালাল মেনে চলতো, তবে আমি তাদের কৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিতাম ও তাদেরকে সুখের উদ্যানে প্রবিষ্ট করতাম এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল করতাম।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং কুরআনকে মেনে নিতো, কেননা তাওরাত ও ইঞ্জীলকে মেনে নিলে কুরআনকে মেনে নেয়া অবশ্যঞ্চাবী হয়ে পড়বে; কারণ ঐ দু’টি কিতাবের সঠিক শিক্ষা এটাই যে, কুরআন

সত্য। কুরআনের ও শেষ নবী (সঃ)-এর সত্যতার স্বীকারোক্তি পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে রয়েছে, সুতরাং যদি তারা এ কিতাবগুলোকে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়াই মেনে নিতো, তবে গুলো তাদেরকে ইসলামের পথ দেখাতো, যে ইসলামের প্রচার নবী (সঃ) করেছেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়ার সুখ শান্তি ও প্রদান করতেন। আকাশ থেকে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। ফলে যমীন হতে সফল উৎপাদিত হতো। তখন উপর ও নীচের অর্থাৎ আসমান ও যমীনের বরকত তাদেরকে দান করা হতো। যেমন তিনি বলেছেন-

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْيَ امْنَوْا وَتَقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

অর্থাৎ “গ্রামবাসীরা যদি ঈমান আনতো ও তাকওয়া অবলম্বন করতো, তবে আমি অবশ্যই তাদের উপর আসমান ও যমীনের বরকত নায়িল করতাম” (৭৯:৯৬) আর এক জায়গায় আছে-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

অর্থাৎ “মানুষের অসৎ কর্মের কারণে স্থলে ও পানিতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা প্রকাশিত হয়েছে।” (৩০: ৪১) অর্থ এটাও হতে পারে, বিনা কষ্টে ও পরিশ্রমে আমি তাদেরকে প্রচুর ও বরকতপূর্ণ রিয়্ক বা খাদ্য দান করতাম। কেউ কেউ এ বাকেয়ের ভাবার্থ এও বর্ণনা করেছেন যে, ঐ লোকগুলো একুপ করলে ভাল হয়ে যেতো। কিন্তু এ উক্তিটি পূর্ববর্তী গুরুজনদের উক্তির বিপরীত। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এ জায়গায় একটি হাদীস এনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘এটা খুবই নিকটে যে, ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে।’ একথা শুনে হ্যরত যিয়াদ ইবনে লাবীদ (রাঃ) আরয় করেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কিরণে হতে পারে যে, ইলম উঠে যাবে? অথচ আমরা নিজেরা কুরআন পড়েছি এবং আমাদের সন্তানদেরকে তা শিখিয়েছি। তিনি তখন বলেনঃ “আফসোস! আমি তো তোমাকে মদীনাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী মনে করতাম! তুমি কি দেখছো না যে, ইয়াহুদী ও নাসারাদের হাতেও তো তাওরাত ও ইঞ্জিল রয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা তাদের কি উপকার হয়েছে? তারা তো আল্লাহর আহকাম পরিত্যাগ করেছে।” অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন একটি বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ ‘এটা ইলম উঠে যাওয়ার সময় ঘটবে।’ তখন হ্যরত ইবনে লাবীদ (রাঃ) বলেনঃ ইলম কিরণে উঠে যাবে? অথচ আমরা কুরআন পড়েছি এবং আমাদের

সন্তানদেরকে তা শিখিয়েছি। তারা আবার তাদের সন্তানদেরকে শিখাবে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এটা চালু থাকবে। এর উভরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যা বলেছিলেন তা উপরে বর্ণিত হলো।

ইরশাদ হচ্ছে-তাদের মধ্যে একটি দল সরল-সঠিক পথের পথিকও রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই কার্যকলাপ অতি জগ্ন্য। যেমন এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ امْتَهِنُونَ بِالْحِقْ وَهُنَّ يَعْدِلُونَ -

অর্থাৎ “মূসার কওমের মধ্যে একটি দল হকের হিদায়াত গ্রহণকারী এবং ওর মাধ্যমই আদল ও ইনসাফকারীও ছিল।” (৭০ ১৫৯) হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর কওমের ব্যাপারে বলা হয়েছে-

فَاتَّيْنَا الَّذِينَ امْنَوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ

অর্থাৎ “তাদের মধ্যকার ঈমানদার লোকদেরকে আমি তাদের পুণ্যের পুরস্কার দান করেছিলাম।” (৫৭৪ ২৭) এটা মনে রাখার বিষয় যে, আহলে কিতাবের জন্যে মধ্যম শ্রেণীকে উন্নত শ্রেণী বলা হলো। আর উন্নতে মুহাম্মাদিয়ার মধ্যে এ মর্যাদা হচ্ছে দ্বিতীয় একটি মর্যাদা, যার উপর তৃতীয় একটি মর্যাদার স্তরও রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

ثُمَّ اورثَنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مَقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرِتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفُضْلُ الْكَبِيرُ -

অর্থাৎ “অতঃপর আমি কিতাবের উন্নরাধিকারী আমার কতক বান্দাকে বানিয়েছি, যাদের মধ্যে কতিপয় বান্দা তো নিজেদের নফসের উপর যুলুমকারী, কতিপয় বান্দা মধ্যমপন্থী এবং কতক বান্দা আল্লাহর হৃকুমে পুণ্য অর্জনে অগ্রগামী। এটাই বড় অনুগ্রহ।” (৩৫৪ ৩২) সুতরাং এ উন্নতের তিন প্রকারের লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা সাহাবীদের সামনে বলেনঃ “মূসা (আঃ)-এর উন্নতের একান্তরটি দল হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হবে জান্নাতী, বাকী সন্তরটি দল হবে জাহান্নামী। ঈসা (আঃ)-এর উন্নতের বাহান্তরটি দল হয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি হবে জান্নাতী এবং বাকী একান্তরটি হবে জাহান্নামী। আমার উন্নত এ দু'জনের চেয়ে বেড়ে যাবে। তাদেরও একটি দল জান্নাতী হবে এবং বাকী বাহান্তরটি দল জাহান্নামী হবে।” জনগণ জিজেস করলোঃ ‘ঐ দলটি কারা?’

তিনি উভয়ে বললেনঃ ‘জামাআত, জামাআত।’ ইয়াকুব ইবনে ইয়ায়ীদ বলেন যে, হ্যরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখন কুরআন কারীমের <sup>وَمَنْ خَلَقْنَا أَمَّةً يَهْدُونَ</sup> এবং <sup>وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ امْنُوا وَاتَّقُوا</sup> <sup>وَرَبُّهُمْ يُعَذِّبُهُمْ</sup> ১৮১)-এ আয়াতগুলোও পাঠ করতেন এবং বলতেন যে, এর দ্বারা উচ্চতে মুহাম্মাদিয়াকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এ শব্দে এবং এ সন্দে হাদীসটি অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল। সত্ত্বের উপর দলগুলোর হাদীসটি বহু সন্দে বর্ণিত আছে, যা আমরা অন্য জায়গায় বর্ণনা করেছি।

৬৭। হে রাসূল (সঃ)! যা কিছু

তোমার প্রতিপালকের পক্ষ  
থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ  
করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে)  
সব কিছুই পৌছিয়ে দাও; আর  
যদি একপ না কর, (যেন) তুমি  
আল্লাহর একটি পয়গামও  
পৌছাওনি; আর আল্লাহ  
তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ  
কাফির) হতে সংরক্ষিত  
রাখবেন; নিক্ষয়ই আল্লাহ  
কাফির সম্প্রদায়কে সুপর্য  
প্রদর্শন করেন না।

٦٧ - يَا يَاهَا الرَّسُولُ بِلْغُ مَا أَنْزِلَ  
إِلَيْكَ مِنْ رِبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعِلْ  
فَمَا بَلَغْتُ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ  
يَعِصِّمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يَهِيءُ لِلنَّاسِ الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ ۝

মহান আল্লাহ এখানে স্বীয় নবী (সঃ)-কে ‘রাসূল’ -এ প্রিয় শব্দ দ্বারা সম্মোধন করে বলছেন-তুমি মানুষের কাছে আমার সমস্ত আহকাম পৌছিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ (সঃ) করলেনও তাই। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ ‘যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর নাযিলকৃত কোন কিছু গোপন করেছেন, সে মিথ্যা বলেছে।’ এখানে হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে আছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ যদি মুহাম্মাদ (সঃ) কুরআনের কোন অংশ গোপন করতেন তবে তিনি অবশ্যই <sup>وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبَدِّيهٌ وَتَخْشِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ</sup> (৩৩: ৩৭)-এ আয়াতটিই গোপন করতেন। ইবনে আবি হাতিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ)-কে বলেঃ “লোকদের মধ্যে এ আলোচনা চলছে যে, আপনাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন কতগুলো

কথা বলেছেন যা তিনি অন্য লোকদের নিকট প্রকাশ করেননি?" তখন তিনি এ আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে এরূপ কোন বিশিষ্ট জিনিসের উত্তরাধিকারী করেননি।" এ হাদীসের ইসনাদ খুবই উত্তম। সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, একটি লোক হ্যরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনাদের কাছে কি কুরআন ছাড়া অন্য অঙ্গও আছে?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "যে আল্লাহ শস্য উৎপন্ন করেছেন এবং জীবজন্ম সৃষ্টি করেছেন তাঁর শপথ! না, শুধু এ বুদ্ধি ও বিবেক, যা তিনি কোন লোককে কুরআনের ব্যাপারে দিয়েছেন এবং যা কিছু এই সহীফায় রয়েছে (এছাড়া আর কিছুই নেই)।" তিনি আবার জিজ্ঞেস করেনঃ 'সহীফায় কি আছে?' উত্তরে তিনি বলেনঃ "এর মধ্যে দিয়্যাতের মাসআলা ও বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়ার আহকাম রয়েছে এবং এ বিধান রয়েছে যে, কাফিরকে হত্যা করার কারণে কিসাস হিসেবে কোন মুসলমানকে হত্যা করা হবে না।"

সহীহ বুখারীতে হ্যরত যুহরী (রাঃ)-এর উক্তি রয়েছে, তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হচ্ছে রিসালাত, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা এবং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মেনে নেয়া।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তা'আলার সমন্ত কথা পৌছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সমন্ত উন্নতই এর সাক্ষী। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমানত পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং যেটা সবচেয়ে বড় সম্মেলন ছিল তাতে সবাই এটা স্বীকার করে নিয়েছেন। অর্থাৎ হাজ্বাতুল বিদা' বা বিদায় হজ্বের খুৎবায় সমন্ত সাহাবী এ কথা স্বীকার করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছেন এবং আল্লাহর বাণী সকলের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন। সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর এ ভাষণে জনগণকে সমোধন করে বলেছিলেনঃ "তোমরা আল্লাহর কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তাহলে বল তো তোমরা কি উত্তর দেবে?" সবাই সমন্বয়ে বললেনঃ "আমরা সাক্ষ্য দান করছি যে, আপনি প্রচার করেছেন, রিসালাতের হক পুরোপুরি আদায় করেছেন এবং পূর্ণভাবে আমাদের মঙ্গল কামনা করেছেন।" তিনি তখন স্বীয় হস্ত ও মন্তক আকাশ পানে উত্তোলন করতঃ জনগণের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে বললেনঃ "হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি?" মুসলাদে আহমাদে এটাও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ ভাষণে জনগণকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ 'হে লোক সকল! এটা কোন দিন?' সবাই উত্তরে বললেনঃ 'মর্যাদা সম্পন্ন দিন।' তিনি আবার প্রশ্ন করলেনঃ 'এটা কোন শহর?' সবাই জবাবে বললেনঃ 'সম্মানিত শহর।' পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ 'এটা

কোনু মাস?’ সবাই বললেনঃ ‘মর্যাদা সম্পন্ন মাস।’ তখন তিনি বললেনঃ “সুতরাং তোমাদের মাল, তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের ইজ্জত ও আবরুণ একে অপরের কাছে এ রকমই মর্যাদা রয়েছে যেমন এ দিনের, এ শহরের এবং এ মাসের সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে।” বারবার তিনি এর পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর তিনি স্বীয় অঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠিয়ে বললেনঃ ‘হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি?’ হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) বলেনঃ ‘আল্লাহর শপথ! এটা তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অসিয়ত ছিল।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “দেখো! তোমাদের প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন প্রত্যেক অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট এটা পৌঁছে দেয়। দেখো! তোমরা আমার পরে যেন কাফের হয়ে যেয়ো না এবং একে অপরকে হত্যা করো না।” ইমাম বুখারীও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে-হে নবী (সঃ)! তুমি যদি আমার হৃকুম আমার বান্দা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে না দাও তবে তুমি রিসালাতের হক আদায় করলে না। তারপর এর যা শাস্তি তা তো স্পষ্ট। যদি তুমি একটি আয়াতও গোপন কর তবে তুমি রিসালাত ভেঙ্গে দিলে। হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যখন “যা কিছু অবর্তীণ হয়েছে তা পৌঁছিয়ে দাও”-এ হৃকুম নায়িল হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমি তো একা, আর এই সব কিছু মিলে আমার উপর ভারী হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমি কিভাবে এটা পালন করতে পারি!” তখন এ দ্বিতীয় বাক্যটি অবর্তীণ হয়ঃ ‘তুমি যদি এটা পালন না কর তবে তুমি রিসালাতের দায়িত্বেই পালন করলে না।’

তারপর আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমাকে লোকদের থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার, তোমার রক্ষক ও সাহায্যকারী আমি। তুমি নির্ভর্য থাক, কেউই তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এ আয়াত অবর্তীণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের প্রহরী রাখতেন। সাহাবীগণ তাঁকে রক্ষা করার কাজে নিযুক্ত থাকতেন। যেমন হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ একদা রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জেগেই ছিলেন। তাঁর ঘূর হচ্ছিল না। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ব্যাপার কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ ‘যদি আজ রাত্রে আমার কোন হৃদয়বান সাহাবী আমাকে পাহারা দিতো!’ তিনি একথা বলতেই আছেন, হঠাৎ আমার কানে অন্তরের শব্দ আসলো, তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ ‘কে?’ উত্তর আসলোঃ ‘আমি সাদ ইবনে মালিক (রাঃ)।’ তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ ‘কেন আসলে?’ তিনি উত্তরে বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনাকে পাহারা দেয়ার জন্য এসেছি।”

এরপর তিনি নিশ্চিন্তে ঘূমিয়ে পড়লেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, এটা দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনা। এ আয়াতটি নাযিল হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁবু হতে মাথা বের করে দিয়ে প্রহরীদেরকে বললেনঃ “তোমরা চলে যাও, আমি আমার প্রভুর আশ্রয়ে এসে গেছি। সুতরাং এখন তোমাদের পাহারা দেয়ার কোনই প্রয়োজন নেই।” আর একটি বর্ণনায় আছে যে, অবৃত্তালিব সদা রাসূলুল্লাহর সাথে কোন না কোন লোক রাখতেনই। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন তিনি তাঁকে বললেনঃ “চাচাজান! এখন আর আমার সাথে কোন লোক পাঠাবার প্রয়োজন নেই। আমি মহান আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণে এসে গেছি।” কিন্তু এ রিওয়ায়াতটি গারীব ও মুনক্কার। এটাতো মক্কার ঘটনা, আর এ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এতে কোনই সন্দেহ নেই, মহান আল্লাহ মক্কাতেই স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে পূর্ণভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। চুতদিকে অন্তর্শলে সজ্জিত শক্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চুল পরিমাণ ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হয়নি। রিসালাতের প্রথম ভাগে তাঁর চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ হতে থাকে। কেননা, আবু তালিব ছিলেন কুরাইশদের এক প্রভাবশালী নেতা। আল্লাহ তাঁর অন্তরে স্বীয় রাসূল (সঃ)-এর প্রতি ভালবাসা স্থাপন করেছিলেন। এ ভালবাসা ছিল প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক ভালবাসা, শরীয়তগত ভালবাসা নয়। আবু তালিবের এ ভালবাসা যদি শরীয়তগত হতো তবে কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাথে তাঁকেও হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো। আবু তালিবের মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা মদীনার আনসাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি শরীয়তগত মুহূর্বত পয়দা করে দেন এবং তিনি তাঁদের কাছেই চলে যান। তখন মুশারিকরা ও ইয়াহুদীরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে ও ভারী ভারী অন্তর্শলে সজ্জিত সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মানসে দ্রুত এগিয়ে আসে। কিন্তু বারবার অকৃতকার্য হওয়ার ফলে তাদের আশার গুড়ে বালি পড়ে যায়। অনুরূপভাবে তাদের গোপন ষড়যন্ত্রে আল্লাহর ফফল ও করমে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এক দিকে তারা তাঁর উপর যাদু করে, অপরদিকে সূরা ‘নাস’ ও ‘ফালাক’ অবতীর্ণ হয় এবং যাদুক্রিয়া নষ্ট করে দেয়া হয়। একদিকে তারা শত চেষ্টা করে ছাগীর কাঁধে বিষ মিশিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দাওয়াত করতঃ তাঁর সামনে পেশ করে, অন্য দিকে আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সঃ)-কে ঐ ব্যাপারে সতর্ক করে দেন এবং তারা বিফল মনোরথ হয়। এ ধরনের আরও বহু ঘটনা তাঁর জীবনে পরিলক্ষিত হয়।

তাফসীরে ইবনে জারীরে রংয়েছে যে, এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি ছায়াদার বৃক্ষের নীচে দুপুরে নিদ্রা গিয়েছিলেন। এরপ ছায়াদার বৃক্ষ সাহাবীগণ অভ্যাসগতভাবে প্রতি মনযিলে খুঁজে খুঁজে তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখতেন। হঠাৎ এক বেদুইন তথায় এসে যায়। বৃক্ষের শাখায় ঝুলত্ব তাঁর তরবারীখানা নামিয়ে সে তা খাপ থেকে বের করলো এবং বললোঃ ‘বলতো কে এখন তোমাকে রক্ষা করবে?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ ‘আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন।’ তখনই বেদুইনের হাত কেঁপে উঠলো এবং তরবারীখানা তার হাত থেকে পড়ে গেল। আর তার মাথাটি গাছে সজোরে আঘাত প্রাপ্ত হলো। ফলে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। সেই সময় আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলেন।

ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বানু আনমার গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন, সে সময় তিনি যাতুর রিকা নামক খেজুরের বাগানে একটি কৃপে পা লটকিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় বানু নাজ্জার গোত্রের ওয়ারিস নামক একটি লোক বলে ওঠেঃ ‘দেখ, আমি এখনই মুহাম্মাদকে হত্যা করছি।’ লোকেরা জিজ্ঞেস করলোঃ কিরাপে? সে উত্তরে বললোঃ ‘আমি কোন বাহানা করে তাঁর তরবারীখানা নিয়ে নেবো। তারপর ঐ তরবারী দ্বারাই তাঁর জীবন শেষ করবো।’ একথা বলে সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলো এবং এ কথা সে কথা বলার পর তাঁর তরবারীটা দেখতে চাইলো। তিনি তো তাকে দিয়ে দিলেন। কিন্তু ওটা হাতে নেয়া মাত্রাই সে এতো কাঁপতে শুরু করলো যে, শেষ পর্যন্ত তরবারী হাতে রাখতে পারলো না, তার হাত থেকে পড়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ “তোমার ও তোমার কুমতলবের মাঝে আল্লাহ প্রতিবন্ধক হয়েছিলেন।” ঐ সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

হয়াইরিস ইবনে হারিসেরও ঐরপই একটি ঘটনা প্রসিদ্ধি লাভ করে আছে। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ সাহাবায়ে কিরামের অভ্যাস এই ছিল যে, সফরে তাঁরা যেখানে বিশ্রামের জন্যে থামতেন সেখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে ঘন ছায়াযুক্ত একটি বড় গাছ রেখে দিতেন। তিনি সেই গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতেন। একদা তিনি এ ধরনের একটি গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর তরবারীখানা ঐ গাছেই লটকান ছিল। এমন সময় একটি লোক এসে পড়ে এবং তরবারীখানা হাতে নিয়ে বলেঃ ‘এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?’ তিনি উত্তরে বললেনঃ ‘আল্লাহ বাঁচাবেন। তুমি তরবারী রেখে দাও।’

সূরাঃ মায়দাহ ৫

তখন সে এতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, তাকে ছক্ষুম পালন করতেই হয়। সে  
اللَّهُ يَعِصِّمُكَ مِنَ النَّاسِ-এ আয়াতটি অবর্তীর্ণ করেন।

সাহাবায়ে কিরাম একটি লোককে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ধরে নিয়ে  
আসেন এবং তাঁকে বলেনঃ ‘এ লোকটি আপনাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল।’  
তখন লোকটি কাঁপতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বলেনঃ ‘তুমি  
আমাকে হত্যা করতে চাইলেও আল্লাহ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন না।’

ইরশাদ হচ্ছে-তোমার দায়িত্ব হচ্ছে শুধু প্রচার করে দেয়া। হিদায়াত করার  
হাত আল্লাহর। তিনি কাফিরদেরকে হিদায়াত করবেন না। তুমি পৌছিয়ে দাও।  
হিসাব গ্রহণকারী হচ্ছেন আল্লাহ।

৬৮। তুমি বলে দাও- হে আহলে

কিতাব! তোমরা কোন পথেই  
প্রতিষ্ঠিত নও যে পর্যন্ত না  
তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যে  
কিতাব (অর্থাৎ কুরআন)  
তোমাদের নিকট তোমাদের  
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে  
পাঠানো হয়েছে তার পূর্ণ  
পাবন্দী করবে; আর অবশ্যই  
যা তোমার প্রতি তোমার প্রভুর  
পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়, তা  
তাদের মধ্যে অনেকেরই  
নাফরমানী ও কুফর বৃদ্ধির  
কারণ হয়ে যায়, অতএব, তুমি  
এ কাফিরদের জন্যে মনঃক্ষুঁপ  
হয়ো না।

৬৯। এটা সুনিশ্চিত যে,  
মুসলমান, ইয়াহুদী, সাবেই  
এবং নাসারাদের মধ্যে যে

٦٨- قُلْ يَا هَلَ الْكِتَبُ لَسْتُ  
عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقْرِئَ مَا  
فِي التُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَمَا أُنْزِلَ  
إِلَيْكُمْ مِنْ رِبِّكُمْ وَلَيَزِدَنَ  
كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ  
رِبِّكَ طَفِيْلًا وَكُفَّارًا فَلَاتَّا سَ  
عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ ۝

٦٩- إِنَّ الَّذِينَ امْنَأُوا وَالَّذِينَ  
هَادُوا وَالصِّيَّنُونَ وَالنَّصْرَى

ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও  
কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে  
এবং সৎকার্য করে, তবে এরপ  
লোকদের জন্যে শেষ দিবসে  
না কোন প্রকার ভয় থাকবে  
আর না তারা চিন্তাভিত হবে।

مِنْ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خُوفٌ  
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحزِنُونَ ○

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলছেন—ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা কোন ধর্মের উপরই  
নেই যে পর্যন্ত তারা নিজ নিজ কিতাবের উপর এবং আল্লাহ পাকের এ কিতাব  
অর্থাৎ কুরআনের উপর ঈমান না আনবে। কিন্তু তাদের অবস্থাতো এই যে, যখন  
কুরআন অবতীর্ণ হয় তখন তাদের বিরোধিতা ও কুফর বাড়তে থাকে। সূতরাং  
হে নবী (সঃ)! তুমি এ কাফিরদের প্রতি দুঃখ ও আফসোস করে তোমার  
জীবনকে কষ্টের মধ্যে নিষ্কেপ করো না।

খ্রীষ্টান ও মাজুসীদের বেদীন দলকে সাবেঙ্গ বলা হয়। আর শুধুমাত্র  
মাজুসীদেরকেও সাবেঙ্গ বলা হয়। এটা মাজুসীদের মত ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের  
মধ্যকার একটি দল ছিল। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, তারা যবুর পাঠ করতো।  
তারা গায়ের কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়তো এবং ফেরেশতাদের পূজা  
করতো। অহাব (রঃ) বলেন যে, সাবেঙ্গরা আল্লাহকে চিনতো। নিজেদের শরীয়ত  
অনুযায়ী তারা আমল করতো। তাদের মধ্যে কুফরের উৎপত্তি হয়নি। তারা  
ইরাক সংলগ্ন ভূমিতে বসবাস করতো। তাদেরকে ইয়ালুসা বলা হতো। তারা  
নবীদেরকে মানতো। প্রতি বছর তারা ত্রিশটি রোয়া রাখতো এবং ইয়ামনের  
দিকে মুখ করে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তো। এছাড়া আরও উক্তি  
রয়েছে। **رَفِعْ-** পূর্ববর্তী দু'টি বাক্যের পরে তাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে বলে  
সাথে করা হয়েছে। এদের সবারই সম্পর্কে আল্লাহর পাক বলেন যে, শান্তি  
ও নিরাপত্তা লাভকারী এবং নির্ভয় হবে ওরাই যারা আল্লাহ উপর এবং কিয়ামতের  
উপর সত্য ঈমান রাখে এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে। আর এটা সম্ভব নয়,  
যে পর্যন্ত এই শেষ নবী হ্যরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা না  
হবে, যাকে সমস্ত দানব ও মানবের নিকট আল্লাহর রাসূল করে পাঠানো হয়েছে।  
সূতরাং যারা এ সর্বশেষ নবী (সঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে তারাই  
পরবর্তী জীবনের বিপদ আপদ থেকে নির্ভয় ও নিরাপদ থাকবে। আর দুনিয়ায়  
ছেড়ে যাওয়া লোভনীয় জিনিসের জন্যে তাদের কোনই দুঃখ ও আফসোস থাকবে  
না। সূরায়ে বাকারার তাফসীরে এ বাক্যের বিস্তারিত অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে।  
সূতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্পংয়োজন।

৭০। আমি বানী ইসরাইল হতে  
অঙ্গীকার নিয়েছি এবং তাদের  
কাছে বহু রাসূল প্রেরণ করেছি;  
যখনই তাদের কাছে কোন নবী  
আগমন করতো এমন কোন  
বিধান নিয়ে যা তাদের  
মনঃপুত হতো না, তখনই  
তারা কতিপয়কে মিথ্যাবাদী  
সাব্যস্ত করতো এবং  
কতিপয়কে হত্যাই করে  
ফেলতো ।

৭১। আর তারা এ ধারণাই  
করেছিল যে, কোন শাস্তি ই  
হবে না, এতে আরও অঙ্গ ও  
বধিরদের ন্যায় হয়ে গেল,  
অতঃপর দীর্ঘকাল পর আল্লাহ  
তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি  
করলেন; তবুও তারা অঙ্গ ও  
বধিরই রইলো— তাদের  
অনেকে; বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের  
(এই) কার্যকলাপ খুবই প্রত্যক্ষ  
করেন ।

আল্লাহর তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারাদের নিকট ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তারা  
আল্লাহর আহকামের উপর আমল করবে এবং অঙ্গীর অনুসরণ করবে । কিন্তু তারা  
ঐ ওয়াদা ভেঙ্গে দেয় এবং নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদার পেছনে লেগে পড়ে!  
আল্লাহর কিতাবের যে কথা তারা নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে পায় তা মেনে নেয়  
এবং যা তাদের স্বার্থের প্রতিকূলে হয় তা পরিত্যাগ করে । শুধু এটুকুই নয়, বরং  
তারা রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলে এবং বহু রাসূলকে হত্যা করে ফেলে । কেননা,  
তাঁরা তাদের কাছে যে আহকাম নিয়ে এসেছিলেন তা তাদের মতের বিপরীত  
ছিল ।

এতবড় পাপ করার পরেও তারা নিশ্চিন্ত থাকে এবং মনে করে নেয় যে,  
তাদের কোনই শাস্তি হবে না । কিন্তু তাদের ভীষণ আধ্যাত্মিক শাস্তি হয় । অর্থাৎ

٧. - لَقَدْ أَخْذَنَا مِيشَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسْلًا كَلْمًا جَاءُهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَ افْسَهُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُوا وَفَرِيقًا يُقْتَلُونَ ○

٧١. - وَحِسِّبُوا إِلَّا تَكُونُ فِتْنَةٌ فَعَمِّلُوهُمْ ثُمَّ وَصَمُّوْهُمْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمِّلُوهُمْ كَثِيرًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصَرِيرِ بِمَا يَعْمَلُونَ ○

তাদেরকে হক অনুধাবন করা থেকে দূরে নিষ্কেপ করা হয় এবং অঙ্গ ও বধির বানিয়ে দেয়া হয়। না তারা 'হক'কে শুনতে পায়, না 'হিদ্যায়াত'কে দেখতে পায়। কিন্তু তবুও আল্লাহ তাদের উপর দয়া করেন। আর এর পরেও তাদের অধিকাংশই ঐ ঝুপই থেকে যায়, অর্থাৎ তারা হক দর্শন থেকে অঙ্গ এবং হক শ্রবণ থেকে বধির। আল্লাহ তাদের আমল সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। কাজেই কে কিসের যোগ্য তা তিনি ভালই জানেন।

### ৭২। নিচয়ই তারা কাফির হয়েছে,

যারা বলেছে যে, আল্লাহ তিনি তো মাসীহ ইবনে মারইয়াম; অথচ মাসীহ নিজেই বলেছিল—  
হে বানী ইসরাইল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক; নিচয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থাপন করবে, তবে আল্লাহ তার জন্যে জালাত হারাম করে দেবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম, আর এক্ষেপ অত্যাচারীদের জন্যে কোন সাহায্যকারী হবে না।

### ৭৩। নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে— আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা'বুদের) এক, অথচ এক মা'বুদ ভিন্ন অন্য কোনই (হক) মা'বুদ নেই; আর যদি তারা স্বীয় উক্তিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কাফির থাকবে তাদের উপর যত্নগাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।

— ৭২ —  
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ

اللهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمٍ

وَقَالَ الْمَسِيحُ يَسُنْ بْنُ إِسْرَائِيلَ

أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ

مَنْ يَشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهَ

عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا وَرَاهُ

وَمَا لِلظَّلَمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

— ৭৩ —  
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ

اللهُ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ

إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّ لَمْ يَنْتَهِوا

عَمَّا يَقُولُونَ لِيَمْسِنَ الَّذِينَ

كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

৭৪। এর পরও কি তারা আল্লাহর  
সমীপে তাওবা করে না এবং  
তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে  
না? অথচ আল্লাহ অত্যন্ত  
ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

۷۴-أَفَلَا يَتَوَبُونَ إِلَى اللَّهِ  
وَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ  
شَدِيدٌ  
رَحِيمٌ ○

৭৫। মাসীহ ইবনে মারইয়াম  
একজন রাসূল ছাড়া আর  
কিছুই নয়; তার পূর্বে আরও  
বহু রাসূল গত হয়েছে, আর  
তার মা একজন তাপসী মহিলা  
ছিল; তারা উভয়ে খাদ্য ভক্ষণ  
করতো, লক্ষ্য কর! আমি  
কিরণপে তাদের নিকট  
প্রমাণসমূহ বর্ণনা করছি,  
আবার লক্ষ্য কর! তারা উল্টো  
কোন দিকে যাচ্ছে।

۷۵-مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا  
رَسُولٌ قَدْ خَلَقَ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولَ  
وَامْهَدَ صَدِيقَةً كَانَتِ يَاكِلِينَ  
الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نَبِيْسِنَ  
لَهُمُ الْإِيْتِ ثُمَّ انْظَرَنِي  
بِوْفَكُونَ ○

এখানে খ্রীষ্টানদের দলগুলোর অর্থাৎ মালেকিয়াহ, ইয়াকুবিয়াহ এবং  
নাসতুরিয়াহদের কুফরের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা মাসীহকেই (আঃ)  
প্রভু বলে মেনে থাকে। আল্লাহ তাদের এ উক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে পাক ও পবিত্র।  
মাসীহ (আঃ) তো আল্লাহর গোলাম ছিলেন। পার্থিব জগতে পা রেখে  
দোলনাতেই তাঁর মুখের প্রথম কথা ছিলঃ ‘‘**إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ**’’ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি  
আল্লাহর গোলাম বা দাস। (১৯: ৩০) “আমি আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র”-এ কথা  
তো তিনি বলেননি! বরং তিনি স্বীয় দাসত্বের কথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন।  
সাথে সাথে তিনি বলেছিলেনঃ ‘‘আমার এবং তোমাদের সকলের প্রভু একমাত্র  
আল্লাহ। তাঁরই ইবাদত কর। সরল ও সঠিক পথ এটাই।’’ যৌবনের প্রবর্তী  
বয়সেও বলেছিলেনঃ “তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর। যারা তাঁর সাথে অন্য  
কারও ইবাদত করে তাদের জন্যে জাহানাত হারাম এবং জাহানাম ওয়াজিব।”  
যেমন কুরআন পাকের অন্য আয়াতে রয়েছে— “আল্লাহ শিরকের গুনাহ কখনও  
মাফ করেন না।” জাহানামবাসীরা যখন জাহানাতবাসীদের কাছে খাদ্য ও পানি

চাইবে তখন তারা এ উত্তরই দেবে যে, এ দু'টি জিনিস আল্লাহ কাফিরদের উপর হারাম করে দিয়েছেন। রাসূলল্লাহ (সঃ) ঘোষকদের দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, শুধু মুমিন ও মুসলমানরাই জান্নাতে যাবে। সূরায়ে নিসার **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَن يُشْرِكَ** (৪: ১১৬)-এ আয়াতের তাফসীরে এ হাদীসটিও বর্ণনা করা হয়েছে যাতে রয়েছে যে, পাপের তিনটি শ্রেণী রয়েছে। এ তিন শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে ওটা যা আল্লাহ তা'আলা কখনও ক্ষমা করবেন না। সেই পাপটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে শির্ক করা। হ্যরত মাসীহ (আঃ) স্বীয় কওমের মধ্যে এ ওয়ায় করেছিলেন যে, এরূপ অন্যায়কারী মুশ্রিকদের কোন সাহায্যকারী হবে না।

এখন ঐ লোকদের কুফরীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা আল্লাহকে তিন মা'বুদের মধ্যে এক মা'বুদ মনে করতো। ইয়াহুদীরা হ্যরত উয়ায়ের (আঃ)-কে এবং খ্রীষ্টানরা হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলতো। (নাউয়ুবিল্লাহি মিন যালিক) এবং আল্লাহকে তিন মা'বুদে মধ্যে এক মা'বুদ মনে করতো। কিন্তু এ আয়াতটি শুধু খ্রীষ্টানদের ব্যাপারেই অবর্তীণ হয়। তারা পিতা, পুত্র এবং তাঁর সেই কালিমাকে মা'বুদ মানতো যা পিতার পক্ষ থেকে পুত্রের দিকে ছিল। অতঃপর এ তিনিকে নির্ধারিত করার ব্যাপারেও খুব বড় রকমের মতানৈক্য ছিল এবং প্রত্যেক দল একে অপরকে কাফির বলতো। সত্য কথা এই যে, তারা সবাই কাফির ছিল। তারা হ্যরত মাসীহ (আঃ)-কে, তাঁর মাকে এবং আল্লাহকে মিলিয়ে দিয়ে আল্লাহ মানতো। এ সূরার শেষে এরই বর্ণনা রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে সম্মোধন করে বলবেন- 'তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে-তোমরা আল্লাহকে ছাড়াও আমাকে ও আমার মাকে আল্লাহ বলে স্বীকার কর?' তিনি তা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করবেন এবং নিজের না জানার কথা ও নিরপরাধ হওয়ার কথা প্রকাশ করবেন। সবচেয়ে বেশী প্রকাশ্য উক্তি হচ্ছে এটাই। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

প্রকৃতপক্ষে ইবাদতের যোগ্য মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউই নয়। সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রকৃত মা'বুদ তিনিই। যদি এরা কুফরীপূর্ণ উক্তি থেকে বিরত না থাকে তবে নিশ্চিতরূপে এরা ধ্রংসাত্ত্বক শাস্তির শিকারে পরিণত হবে।

অতঃপর আল্লাহ স্বীয় দয়া, অনুকম্পা, স্নেহ ও ভালবাসার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাদের এতো কঠিন অপরাধ ও এতো ভীম নির্লজ্জতা ও মিথ্যারোপ সত্ত্বেও তাদেরকে স্বীয় রহমতের দাওয়াত দিচ্ছেন এবং বলছেনঃ এখনও যদি তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হও তবে তোমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদেরকে আমার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দেবো।

হ্যরত মাসীহ (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূলই ছিলেন। তাঁর মত রাসূল তাঁর পূর্বেও অতীত হয়েছেন। যেমন তিনি বলেন، ‘إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ’، অর্থাৎ ‘সে একজন গোলামই ছিল।’ (৪৩: ৫৯) তবে তিনি তাঁর উপর স্বীয় রহমত নাযিল করেছিলেন এবং বানী ইসরাইলের জন্যে তাঁর একটি নির্দেশ বানিয়েছিলেন। তাঁর মা মুমিনা ও সত্যবাদিনী ছিলেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, তিনি নবী ছিলেন না। কেননা, এটা হচ্ছে বিশেষণ বা গুণ বর্ণনার স্থান। সুতরাং তিনি যে গুণের অধিকারিণী ছিলেন তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যদি তিনি নবুওয়াতের অধিকারিণী হতেন তবে এ স্থলে ওটার বর্ণনা দেয়া খুবই জরুরী ছিল। ইবনে হায়ম (রঃ) প্রমুখ মনীষীর ধারণা এই যে, হ্যরত ইসহাক (আঃ)-এর মা হ্যরত মূসা (আঃ)-এর মা এবং হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর মা নবী ছিলেন এবং তাঁরা এর দলীল দিতে গিয়ে বলেন, ফেরেশতাগণ হ্যরত সারা (আঃ) এবং হ্যরত মারইয়াম (আঃ)-কে সঙ্ঘোধন করেন এবং তাঁদের সাথে কথা বলেছেন। আর হ্যরত মূসা (আঃ)-এর মাতা সম্পর্কে আল্লাহই তা'আলা বলেনঃ

وَأَوْجَبْنَا إِلَيْهِ مُوسَىً إِنْ ارْضَعْتَهُ

অর্থাৎ ‘আমি মূসার মায়ের কাছে অঙ্গী পাঠিয়েছিলাম-তুমি তাকে দুধ পান করাও।’ (২৮: ৭) কিন্তু জম্হুরের মায়হাব এর উল্টো। তাঁরা বলেন যে, নবুওয়াত পুরুষ লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। যেমন কুরআন পাকে আছে-

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا

অর্থাৎ ‘তোমার পূর্বে আমি গ্রামবাসীদের মধ্য হতে পুরুষ লোকদেরকেই রিসালাত দান করেছিলাম।’ (২১: ৭) আবুল হাসান আশআরী (রঃ) তো এর উপর ইজমা হওয়ার কথা নকল করেছেন।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে-মাতা ও পুত্র উভয়ে পানাহারের মুখাপেক্ষী ছিল। আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, যা তেতরে যাবে তা বেরিয়ে আসবে। অর্থাৎ তাদের প্রস্তাব পায়খানাও হতো। সুতরাং সাব্যস্ত হচ্ছে যে, তাঁরা অন্যদের মত বান্দাই ছিলেন। খোদায়ী গুণ তাঁদের মধ্যে ছিল না। দেখো তো! আমি কিভাবে খোলাখুলি তাদের সামনে আমার দলীল প্রমাণাদি পেশ করছি! আবার লক্ষ্য কর যে, এতো দলীল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে তারা বিভাস্ত হয়ে এদিক ওদিক ফিরছে! কেমন ভষ্ট মায়হাবের উপর তারা রয়েছে! কেমন জঘন্য ও দলীল প্রমাণহীন উক্তি তারা করছে!

৭৬। তুমি বলে দাও-তোমরা কি  
আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুর  
ইবাদত কর যা না তোমাদের  
কোন অপকার করবার ক্ষমতা  
রাখে, আর না কোন উপকার  
করবার; অথচ আল্লাহই সব  
শোনেন, সব জানেন।

৭৭। তুমি বল-হে আহলে  
কিতাব! তোমরা নিজেদের ধর্মে  
অন্যায়ভাবে সীমালংঘন করো  
না, এবং ঐসব লোকের  
(ভিত্তিইন) কল্পনার উপর  
চলো না যারা অতীতে  
নিজেরাও ভাস্তিতে পতিত  
হয়েছে এবং আরও বহু  
লোককে ভাস্তিতে নিষ্কেপ  
করেছে, বস্তুতঃ তারা সরল পথ  
থেকে দূরে সরে পড়েছিল।

এখানে আল্লাহকে ছেড়ে বাতিল মা'বুদগুলোর ইবাদত করতে নিষেধ করা  
হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা নবী (সঃ)-কে বলছেন- ঐসব লোককে বলে দাও-যারা  
তোমাদের কোন ক্ষতি করার এবং উপকার করার কোনই ক্ষমতা রাখে না,  
তাদের তোমরা কেন পূজা করছো? যিনি সবকিছু শুনেন ও সবকিছুর খবর  
রাখেন, সেই আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে যাদের শুনবার, দেখবার এবং উপকার ও  
অপকার করবার কোনই ক্ষমতা নেই, তাদের অনুসরণ করা কতই না নির্দিষ্টার  
কাজ! হে আহলে কিতাব! তোমরা হক ও সত্যের সীমা ছাড়িয়ে যেয়ো না। যার  
যতটুকু সম্মান করার নির্দেশ রয়েছে তার ততটুকুই সম্মান কর। মানুষের মধ্যে  
যাদেরকে আল্লাহ নবুওয়াত দান করেছেন তাদেরকে নবুওয়াতের মর্যাদা থেকে  
বাড়িয়ে আল্লাহর মর্যাদায় পৌছিয়ে দিয়ো না। যেমন তোমরা মাসীহ (আঃ)-এর  
ব্যাপার ভুল করছো। এর একমাত্র কারণ এটাই যে, তোমরা তোমাদের পীর,  
মুরশিদ, উস্তাদ এবং ইমামদের পিছনে লেগে পড়েছো। তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট

٧٦-قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا  
نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ  
الْعَلِيمُ

٧٧-قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُبُوا  
فِي دِينِكُمْ غَيْرُ الرَّحِيمِ  
وَلَا تَبْغُوا هَوَاءَ قَوْمٍ قد  
ضَلُّوا مِنْ قَبْلِ وَاضْلُلُوا كَثِيرًا  
وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

(١٤)

এবং অনুসারীদেরকেও করেছে পথভ্রষ্ট। বহু দিন হতে সরল ও ন্যায়ের পথকে ছেড়ে দিয়েছে এবং ভ্রান্তি ও বিদআতের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছে। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মধ্যে একটি লোক ধর্মের খুবই পাবন্দ ছিল। কিছুদিন পর শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। সে তাকে বলে, “আগের লোকেরা যা করে গেছে তুমিও তো তাই করছো। এতে কি হবে? এর দ্বারা না জনগণের মধ্যে তোমার কোন মর্যাদা লাভ হবে, না তোমার কোন খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। বরং একটা নতুন কিছু আবিষ্কার কর এবং জনগণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দাও। তাহলে দেখতে পাবে যে, তোমার খ্যাতি কিরূপে ছড়িয়ে পড়ছে এবং কিভাবে স্থানে স্থানে তোমার সম্পর্কে আলোচনা চলছে।” সুতরাং সে তার কথা মত তা-ই করলো। তার ঐ বিদআতগুলো জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং বহু যুগ পর্যন্ত লোকেরা তার অন্ধ অনুকরণ করতে থাকলো। এখন হতে সে খুবই লজ্জিত হলো এবং সালতানাত ও রাজত্ব পরিত্যাগ করলো। তারপর নির্জনে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়লো। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাকে জানিয়ে দিলেন—“তুম যদি শুধু আমারই ব্যাপারে ভুল ও অপরাধ করতে তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিতাম। কিন্তু তুমি সাধারণ লোকের আমল নষ্ট করে দিয়েছো এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ভ্রান্তির পথে লাগিয়ে দিয়েছো। সেই পথে চলতে চলতে তারা মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের পাপের বোঝা তোমার উপর থেকে কিরূপে সরতে পারে? সুতরাং তোমার তাওবা কবুল করা হবে না।” এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

৭৮। বানী ইসরাইলের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদের উপর লা’নত করা হয়েছিল দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখে; এ লা’নত এ কারণে করা হয়েছিল তারা আদেশের বিরোধিতা করেছিল এবং সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল।

৭৯। যে অন্যায় কাজ তারা করেছিল, তা হতে নিবৃত্ত হচ্ছিল না; বাস্তবিকই তাদের কাজ ছিল অত্যন্ত গর্হিত।

لِعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي

إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤَدَ

وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمْ ذَلِكَ بِمَا

عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ○

كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَنْ

مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لِبِئْسَ مَا كَانُوا

يَفْعَلُونَ ○

৮০। তুমি তাদের (ইয়াহুদীদের) মধ্যে অনেক লোককে দেখবে যে, তারা বক্সুত্ত করছে কাফিরদের সাথে; যে কাজ তারা ভবিষ্যতের জন্যে করেছে তা নিঃসন্দেহে মন্দ, যেহেতু আল্লাহ তাদের প্রতি অস্তুষ্ট হয়েছেন, ফলতঃ তারা আযাবে চিরকাল থাকবে।

৮১। আর যদি তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতো এবং নবীর (মুসার আঃ) প্রতি এবং ঐ কিতাবের (তাওরাতের) প্রতি যা তার নিকট প্রেরিত হয়েছিল, তবে তাদেকে (মুশরিকদেরকে) কখনও বস্তুরপে গ্রহণ করতো না, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান।

ইরশাদ হচ্ছে যে, বানী ইসরাইলের কাফিররা প্রাচীন অভিশপ্ত। হ্যরত দাউদ (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর যুগে তারা অভিশপ্তরপে সাব্যস্ত হয়েছিল। কেননা, তারা ছিল আল্লাহর অবাধ্য এবং তারা আল্লাহর সৃষ্টজীবের প্রতি অত্যাচারী ছিল। তাওরাত, ইঙ্গীল, যাবুর, কুরআন প্রভৃতি সমস্ত কিতাবই তাদের উপর লান্ত বর্ষণ করে আসছে। তারা নিজেদের যুগেও একে অপরকে খারাপ কাজ করতে দেখেছে, কিন্তু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। হারাম কাজগুলো তাদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে চলতো এবং কেউ কাউকেও নির্বেধ করতো না। এ ছিল তাদের জঘন্য কাজ।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- “বানী ইসরাইলের মধ্যে প্রথম যখন পাপ কাজ শুরু হয় তখন তাদের আলেমরা তাদেরকে বাধা দেয়। কিন্তু যখন দেখে যে, তারা মানলো না তখন তারা তাদেরকে পৃথক না করে তাদের সাথেই উঠাবসা করতে থাকে। আল্লাহ তখন একে অপরের প্রতি

٨- تَرِيْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلُّونَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا لِبِئْسَ مَا قَدَّمْتُ  
لَهُمْ انفُسُهُمْ أَن سَخَطَ اللَّهُ  
عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ  
خَلِدُونَ ۝

٨١- وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالنَّبِيِّ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَا  
اتَّخِذُوهُمْ أُولَيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا  
مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ۝

হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেন এবং হ্যরত দাউদ (আঃ) ও হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর বদু'আর মাধ্যমে তাদের উপর লা'ন্ত বর্ষণ করেন। কেননা, তারা অবাধ্য ও অত্যাচারী ছিল।” এটা বর্ণনা করার সময় নবী (সঃ) বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু এ কথা বলার পর সোজা হয়ে বসে গিয়ে বলেনঃ “না, না। আল্লাহর কসম! তোমাদের অবশ্যই কর্তব্য হচ্ছে এই যে, তোমরা জনগণকে শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে বাধা প্রদান করবে এবং তাদেরকে শরীয়তের পাবন্দ বানিয়ে নেবে।”

সুনানে আবি দাউদে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “বানী ইসরাইলের মধ্যে সর্বপ্রথম বদভ্যাস এই চুকেছিল যে, কোন লোক অপর কোন লোককে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করতে দেখলে তাকে বাধা প্রদান করতো। তাকে সে বলতোঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং এ খারাপ কাজ পরিত্যাগ কর, এটা হারাম। কিন্তু পরদিন যখন সে তা ছাড়তো না তখন সে তার থেকে পৃথক হয়ে যেতো না। বরং একই সাথে পানাহার করতো এবং একই সাথে উঠাবাস করতো। এ কারণে সবারই অন্তরে সংকীর্ণতা এসে যায়।” তারপর তিনি পূর্ণ আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ “আল্লাহর শপথ! তোমাদের উপর ফরয হচ্ছে এই যে, তোমরা একে অপরকে ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। অত্যাচারীকে তার অত্যাচার থেকে বিরত রাখবে এবং তাকে হকের উপর আসতে বাধ্য করবে।” জামেউত তিরমিয়ী এবং সুনানে ইবনে মাজার মধ্যে এ হাদীসটি রয়েছে। সুনানে আবি দাউদ ইত্যাদির মধ্যে এ হাদীসের শেষাংশে এ কথাও আছে—তোমরা যদি এটা না কর তবে আল্লাহ তোমাদের অন্তরও একে অপরের সাথে মেরে দেবেন এবং তোমাদের উপরও তাঁর শান্তি অবতীর্ণ করবেন, যেমন এদের উপর অবতীর্ণ করেছেন।

এ সম্পর্কীয় আরও হাদীস রয়েছে। হ্যরত জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি তো ১৯  
”<sup>”</sup> لَوْلَا يَنْهَا مُحَمَّدٌ الرَّبَّانِيُّونَ (৫: ৬৩)-এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। ১০  
”<sup>”</sup> يَأَيُّهَا أَكْفَارُ الْأَنْتَارِ (৫: ১০৫)-এ আয়াতের তাফসীরে হ্যরত আবু বকর (রাঃ) ও হ্যরত আবু সালাবা (রাঃ)-এর হাদীসগুলো আসবে ইনশাআল্লাহ। মুসনাদে আহমাদ ও জামেউত তিরমিয়ীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “হয় তোমরা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতে থাকবে, না হয় আল্লাহ তোমাদের উপর স্বীয় পক্ষ থেকে শান্তি পাঠিয়ে দেবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে থাকবে, কিন্তু তোমাদের প্রার্থনা তিনি কবূল করবেন না।” সুনানে ইবনে মাজায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ

(সঃ) বলেছেন- “তোমরা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতে থাক এমন সময় আসার পূর্বে যে, তোমরা দু’আ করবে, কিন্তু তা কবূল করা হবে না।” সহীহ হাদীসে হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- “তোমাদের কেউ কাউকে শরীয়ত গহিত কাজ করতে দেখলে তাকে হাত দ্বারা বাধা প্রদান করা তার উপর ফরয। যদি এটার ক্ষমতা তার না থাকে তবে তার উচিত যে, সে যেন তাকে কথা দ্বারা বাধা দেয়। যদি ওটারও ক্ষমতা তার না থাকে তবে তার উচিত তাকে অন্তরে ঘৃণা করা, এবং এটা হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচয়।”<sup>১</sup>

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- “বিশিষ্ট লোকদের পাপের কারণে আল্লাহ সাধারণ লোকদেরকে শান্তি দেন না, কিন্তু ঐ সময় দিয়ে থাকেন যখন তাদের মধ্যে কু-কাজ ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা তাদেরকে বাধা প্রদান করে না। ঐ সময় আল্লাহ বিশিষ্ট ও সাধারণ সমন্ত লোককেই স্বীয় শান্তি দ্বারা ঘিরে নেন।”

নবী (সঃ) বলেছেন- “যে জায়গায় পাপ ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে যারা উপস্থিত আছে তারা যদি ঐ শরীয়ত বিরোধী কাজে অস্তুষ্ট হয় (আর একটি বর্ণনায় আছে যে, যদি ঐ কাজে বাধা দেয়) তবে তারা যেন ঐ লোকদের মতই যারা সেখানে উপস্থিত নেই। পক্ষান্তরে যারা সেখানে উপস্থিত নেই, কিন্তু ঐ শরীয়ত বিরোধী কার্যে তারা সন্তুষ্ট হয়, তবে তারা যেন ঐ লোকদের মতই যারা সেখানে উপস্থিত আছে।”<sup>২</sup> সুনানে আবি দাউদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- “লোকদের ওয়র যে পর্যন্ত লুণ্ঠ না হবে সে পর্যন্ত তারা ধ্বংস হবে না।” হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুৎবা দিতে গিয়ে বলেনঃ ‘সাবধান! কাউকে যেন লোকদের ভয় সত্য কথা বলা থেকে বিরত না রাখে।’ এ হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে হ্যরত আবু সাঈদ (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমরা তো একপ স্থলে মানুষের ভয়কে স্বীকার করে থাকি। অন্য একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- ‘অত্যাচারী বাদশাহর সামনে সত্য কথা বলা হচ্ছে উত্তম জিহাদ।’<sup>৩</sup> সুনানে ইবনে মাজায় রয়েছে যে, জামরায়ে সানিয়ার নিকট রাসূলুল্লাহ

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এটা ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৪. হাদীসগুলো ইমাম আবু দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজা (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

(সঃ)-এর কাছে একটি লোক এসে জিজ্ঞেস করলো- ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! উত্তম জিহাদ কি?’ তিনি নীরব থাকলেন, তারপর তিনি জামরায়ে উকবাকে কংকর মারার পর যখন সওয়ারীর উপর আরোহণের উদ্দেশ্যে রেকাবে পা রাখলেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন- ‘প্রশ্নকারী কোথায়?’ লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমি হায়ির আছি। তিনি তখন বললেনঃ “অত্যাচারী বাদশাহর সামনে সত্য কথা বলে দেয়া (হচ্ছে উত্তম জিহাদ)।” সুনানে ইবনে মাজায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- ‘তোমাদের কারও নিজের অসম্মান কর উচিত নয়।’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কিরূপে? তিনি উত্তরে বললেনঃ তা এরূপে যে, সে শরীয়ত বিরোধী কাজ দেখবে এবং কিছুই বলবে না। কিয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ ‘অমুক স্থলে তুমি নীরব ছিলে কেন?’ সে উত্তর বলবেঃ ‘মানুষের ভয়ে।’ তখন আল্লাহর তা‘আলা বলবেন- ‘আমি এর সবচেয়ে বড় হকদার ছিলাম যে, তুমি আমাকেই ভয় করতে।’ অন্য বর্ণনায় আছে যে, তালকীনে হুজ্জতের উপর সে বলবেঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার উপর আশা ভরসা রেখেছিলাম এবং মানুষকে ভয় করেছিলাম। মুসলাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- ‘মুসলমানদের নিজেকে লাঞ্ছিত করা উচিত নয়।’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিরূপে? তিনি উত্তরে বললেনঃ ‘ঐ বিপদ আপদকে মাথা পেতে নেয়া যা বরদাশত করার ক্ষমতা তার নেই।’ সুনানে ইবনে মাজায় হ্যরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিজ্ঞেস করা হলোঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা কখন ছেড়ে দেয়া হবেঃ তিনি উত্তরে বললেনঃ ‘ঐ সময় ছেড়ে দিতে হবে যখন তোমাদের মধ্যে ঐ জিনিসই-প্রকাশ পেয়ে যাবে যা পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল।’ আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ ‘ওটা কি জিনিস?’ তিনি উত্তর দিলেনঃ ‘রাজত্ব ইতর লোকদের মধ্যে চলে যাওয়া, বড় লোকদের মধ্যে ব্যভিচারী এসে পড়া, ছোট লোকদের মধ্যে ইলম এসে যাওয়া।’ হ্যরত যায়েদ (রাঃ) বলেন যে, ইতর ও ছোট লোকদের মধ্যে এসে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ফাসেক ও পাপাচারদের মধ্যে ইলমের আগমন ঘটা। এ হাদীসের সাক্ষী আবু সালাবা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা ‘**لَيُضْرِكُمْ** (৫: ১০৫)-এ আয়াতের তাফসীরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

ইরশাদ হচ্ছে-অধিকাংশ মুনাফিককে তুমি দেখবে যে, তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। তাদের এ কার্যের কারণে অর্থাৎ মুসলমানদের বন্ধুত্ব ছেড়ে দিয়ে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করার কারণে তারা তাদের জন্যে বড় যথীরা জমা করে রেখেছে। এরই প্রতিশোধ হিসেবে তাদের অন্তরে নেফাক বা

কপটতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এরই উপর ভিত্তি করেই তাদের উপর আল্লাহর গ্যব নাখিল হয়েছে। আর কিয়ামতের দিন তাদের জন্যে চিরস্থায়ী শান্তি অপেক্ষা করছে। ইবনে আবি হাতিম (রহ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সহ) বলেছেন—“হে মুসলমানগণ! তোমরা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাক। কেননা, এতে ছয়টি অকল্যাণ রয়েছে। তিনটি দুনিয়াতে ও তিনটি আখিরাতে। দুনিয়ার তিনটি অকল্যাণ হচ্ছে— (১) এর ফলে ইয়ত, সম্মান ও সৌন্দর্য লোপ পায়, (২) এর ফলে দারিদ্র এসে পড়ে এবং (৩) এর কারণে আয়ু কমে যায়। আর আখিরাতের তিনটি অকল্যাণ হচ্ছে— (১) আল্লাহর গ্যব, (২) হিসাবে কাঠিন্য এবং (৩) জাহানামে চিরস্থায়ী অবস্থান।” তারপর রাসূলুল্লাহ (সহ) এ আয়াতের শেষ বাক্যটি পাঠ করেন। এ হাদীসটি দুর্বল। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যদি এ লোকগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সহ)-এর উপর এবং কুরআনের উপর পূর্ণ ঈমান আনতো তবে কখনও কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতো না ও খাঁটি মুসলমানের সাথে শক্রতা করতো না। প্রকৃত ব্যাপারে এই যে, তাদের অধিকাংশ লোকই ফাসেক। অর্থাৎ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সহ)-এর আনুগত্য হতে সরে পড়েছে এবং তাঁর অঙ্গী ও পাক কালামের আয়াতগুলোর বিরোধী হয়ে গেছে।

৮২। তুমি মানবমণ্ডলীর মধ্যে

মুসলমানদের সাথে অধিক  
শক্রতা পোষণকারী পাবে এ<sup>১</sup>  
ইয়াতুন্দী ও মুশরিকদেরকে,  
আর তন্মধ্যে মুসলমানদের  
সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর  
নিকটবর্তী ঐসব লোককে  
পাবে, যারা নিজেদেরকে  
নাসারা বলে, এটা এ কারণে  
যে, তাদের মধ্যে বহু  
জ্ঞানপিপাস্ন আলেম এবং বহু  
সংসার বিরাগী দরবেশ রয়েছে,  
আর এই কারণে যে, তারা  
অহংকারী নয়।

٨٢-٨٣-  
لَتِجْدِنَ أَشَدُ النَّاسِ عَدَاؤَهُ  
لِلَّذِينَ امْنَوْا بِالْيَهُودِ وَالَّذِينَ

أَشْرَكُوا وَلَتِجْدِنَ أَقْرَبَهُمْ مُوْدَةً  
لِلَّذِينَ امْنَوْا بِالَّذِينَ قَالُوا إِنَّ

نَصَرَى ذَلِكَ بَيْانٌ مِّنْهُمْ  
قَسِيسِينَ وَرَهْبَانًا وَأَنْهُمْ

لَا يَسْتَكْبِرُونَ  
○

এ আয়াতটি এবং পরবর্তী চারটি আয়াত নাজ্জাসী এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের ব্যাপারে অবর্তীর্ণ হয়। যখন তাঁদের সামনে হাবসা বা আবিসিনিয়া রাজ্য

হ্যরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) কুরআন মাজীদ পাঠ করেন তখন তাদের চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে, এমন কি তাঁদের দাঢ়ি ভিজে যায়। কিন্তু এটা শ্঵রণ রাখার বিষয় যে, এ আয়াতগুলো মদীনায় অবতীর্ণ হয়। আর হ্যরত জাফর (রাঃ)-এর এ ঘটনাটি হিজরতের পূর্বের ঘটনা। এটাও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতগুলো এই প্রতিনিধির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যাকে বাদশাহ নাজাসী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। উদ্দেশ্যে এই যে, যেন তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর অবস্থান ও গুণাবলী পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাঁর কথাগুলো শ্রবণ করেন। যখন তিনি নবী (সঃ)-এর সাথে মিলিত হন এবং তাঁর মুখ থেকে কুরআন কারীম শ্রবণ করেন তখন তাঁর অন্তর গলে যায়। তিনি খুবই ত্রন্দন করেন এবং ইসলাম কবূল করেন। ফিরে গিয়ে তিনি নাজাসীর কাছে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করেন। নাজাসী তখন রাজ্য ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিলনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু সঠিক বর্ণনায় সাব্যস্ত হয় যে, তিনি আবিসিনিয়ায় রাজত্ব করতে করতেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর দিনই নবী (সঃ) সাহাবায়ে কিরামকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করেন এবং তাঁর গায়েবানা জানায়ার নামায আদায় করেন। কেউ কেউ তো বলেন যে, এ প্রতিনিধি দলে সাতজন আলেম ও পাঁচজন দরবেশ ছিলেন অথবা পাঁচজন আলেম ও সাতজন দরবেশ ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তাঁরা মোট পাঁচজন জন ছিলেন। আবার বলা হয়েছে যে, তাঁদের সংখ্যা ষাটের কিছু বেশী ছিল। একটি উক্তি এও আছে যে, তাঁরা সন্তুরজন ছিলেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

‘হ্যরত আতা’ (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতে যাদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন হাবশের অধিবাসী। হাবশের মুহাজির মুসলমানগণ যখন তাঁদের কাছে আগমন করেন তখন তাঁরা সবাই মুসলমান হয়ে যান। হ্যরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, প্রথমে তাঁরা ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী ছিলেন। যখন তারা মুসলমানদেরকে দেখতে পান ও কুরআন শ্রবণ করেন তখনই তাঁরা মুসলমান হয়ে যান। ইবনে জারীর (রঃ)-এর ফায়সালা এসব উক্তিকে সত্য বলে সাব্যস্ত করছে। তিনি বলেন যে, এ আয়াতগুলো এসব লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যাদের মধ্যে এ গুণাবলী রয়েছে। তাঁরা হাবশারই হোন বা অন্য কোন জায়গারই হোন। ইয়াহূদীদের মুসলমানদের সাথে যে ভীষণ শক্রতা রয়েছে তার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে দুষ্টামি, বিরোধিতা ও অস্ত্রীকার করার মাদ্দাহ বা মূল খুব বেশী আছে। তারা জেনে শুনে কুফরী করে থাকে এবং জেদের বশবর্তী হয়ে অন্যায় আচরণ করে থাকে। তারা হকের মোকাবিলায় বিগড়ে যায়। হক পন্থীদের উপর তারা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়। তাদের প্রতি হিংসা পোষণ করে। আলেমের সংখ্যা তাদের মধ্যে খুবই কম। আলেমদের কোন প্রভাব তাদের উপর পড়ে না। এ কারণে তারা বহু নবীকে হত্যা করেছিল। স্বয়ং শেষ নবী হ্যরত মুহাম্মাদকেও

(সঃ) তারা হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। একবার নয়, বার বার। তারা তাঁর খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে, তাঁর উপর যাদু করে এবং তাদের ন্যায় দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর উপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু প্রত্যেকবারই মহান আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন—“যখন কোন ইয়াহুদী কোন মুসলমানকে একাকী পায় তখন তার অন্তরে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা পয়দা হয়ে যায়।” অন্য এক সনদেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। কিন্তু তা অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল। তবে হাঁ, মুসলমানদের বন্ধুত্বের ব্যাপারে সবচেয়ে নিকটবর্তী ঐসব লোক, যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে। যারা হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর সত্য অনুসারী এবং ইঞ্জীলের আসল ও সঠিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাদের মনে মোটের উপর মুসলমান ও ইসলামের প্রতি মহৱত আছে। এর কারণ এই যে, তাদের মধ্যে ন্যূনতা রয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে—

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الْذِينَ أَبْتَغُوا هُوَ رَحْمَةٌ

অর্থাৎ ‘হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের অন্তরে আমি ন্যূনতা ও দয়া সৃষ্টি করেছি।’ (৫৭: ২৭) তাদের কিতাবে নির্দেশ আছে—যে তোমার ডান গালে থাপ্পড় মারে, তুমি তার সামনে তোমার বাম গালটিও এগিয়ে দাও। তাদের শরীয়তে যুদ্ধই নেই। এখানে তাদের বন্ধুত্বের কারণ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে খৃতীব ও উপদেষ্টা রয়েছে। এস-ওসিসিস—এর বহু বচন হচ্ছে ক্ষিস্ত, এর বহু বচন ক্ষিস্ত শব্দটি বহু বচন হচ্ছে ক্ষিস্তিন, এর বহু বচন রাহেব শব্দের বহু বচন। এটা শব্দ থেকে বের হয়েছে। রাহেব বলা হয় আবেদকে। এ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভয়। যেমন রাইক—এর বহু বচন ফার্স এবং রুকীয়ান—এর বহু বচন রুহাব এসে থাকে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, কখনও কখনও রহবান শব্দটি এক বচনের জন্যেও এসে থাকে। এর বহু বচন রহাবিন এসে থাকে। যেমন রহাবিন এবং গুজুরান ও কুরাইন এবং গুজুরান ও কুরাইন এসে থাকে। আবার কোন কোন সময় এর বহু বচন রহবান এসে থাকে। আরবীদের কবিতাতেও রহবান শব্দটি এক বচনে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি লোক ক্ষিস্তিন ও রহবান পড়ে, একটি লোক হ্যরত সালমান ফারসী (রাঃ)-কে এর অর্থ জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি উভয়ের বলেনঃ ক্ষিস্তিন কে খানকান ও জনহীন স্থানে ছেড়ে এসো; আমাকে তো রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে রহবান ও পড়িয়েছেন। (বায়ুয়া ও ইবনে মিরদুওয়াই)

মোটকথা এখানে তাদের তিনটি গুণের কথা বলা হয়েছে। (১) তাদের মধ্যে আলেম বেশী থাকা, (২) তাদের মধ্যে আবেদের সংখ্যা বেশী হওয়া এবং (৩) তাদের মধ্যে ন্যূনতা ও ভদ্রতা থাকা।

সূরাঃ মায়দাহ ৫

৮৩। আর যখন তারা তা শ্রবণ  
করে, যা রাসূল (সঃ)-এর প্রতি  
নায়িল হয়েছে, তখন তুমি  
দেখতে পাও যে, তাদের চোখে  
অশ্রু বইতে আছে, এ কারণে  
যে, তারা সত্যকে উপলক্ষ্য  
করতে পেরেছে, তারা এরূপ  
বলে- হে আমাদের  
প্রতিপালক! আমরা মুমিন হয়ে  
গেলাম, সুতরাং আমাদেরকেও  
ঐসব লোকের সাথে লিপিবদ্ধ  
করে নিন, যারা (মুহাম্মাদ সঃ  
ও কুরআনকে সত্য বলে)  
স্বীকার করে।

৮৪। আর আমাদের কি এমন  
ওয়ার আছে যে, আমরা ইমান  
আনবো না আল্লাহর প্রতি এবং  
সেই সত্যের প্রতি যা আমাদের  
কাছে পৌঁছেছে? অথচ এ আশা  
রাখবো যে, আমাদের  
পরওয়ারদিগার নেককারদের  
সাথে আমাদেরকে শামিল  
করবেন।

৮৫। ফলতঃ তাদের এ উভিই  
বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে  
এমন উদ্যানসমূহ প্রদান  
করবেন, যার তলদেশে নহর  
বইতে থাকবে, তারা তাতে  
অনন্তকাল অবস্থান করবে।

৮৬। আর যারা কাফির হয়েছে  
এবং আমার আয়াত সমূহকে  
মিথ্যা বলেছে, তারা হবে  
জাহানামের অধিবাসী।

- ৮৩ -  
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْ  
الرَّسُولِ ترَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ  
مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ  
الْحِقِّ يَقُولُونَ رَبُّنَا أَمْنَا  
فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ ○

- ৮৪ -  
وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا  
جَاءَنَا مِنَ الْحِقِّ وَنَطَمَعُ أَنْ  
يُدْخِلَنَا رَبِّنَا مَعَ الْقَوْمِ  
الصَّلِحِينَ ○

- ৮৫ -  
فَاثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا  
جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ  
خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ  
الْمُحْسِنِينَ ○

- ৮৬ -  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا  
بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ  
الْجَنَّةِ ○

আল্লাহ পাক বলছেন—যখন তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অবতারিত অহী শ্রবণ করে তখন হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যে, তাদের চক্ষু অশ্রুসিঙ্গ হয়েছে। কেননা, তারা সেই ভবিষ্যত সুসংবাদ সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেছে যা (তারা মুহাম্মাদ সঃ -এর প্রেরিতত্ত্ব সম্পর্কীয় সংবাদ) তাদের কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলে দেখেছিল। তাই তারা বলতে শুরু করে— হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদের ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা সাক্ষ্য দান করেছে ও ঈমান এনেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **مَعَ الشُّهْدَاءِ** দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাঁর উম্মতকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা তাঁদের নবী (সঃ)-এর জন্যে সাক্ষ্য দান করেছিলেন যে, নবী (সঃ) প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং অন্যান্য রাসূলদের জন্যেও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁরাও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরও বলেন যে, **تَفِيْصُ مِنَ الدَّمْعِ** ঐ লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যাঁরা কৃষক শ্রেণীর লোক ছিলেন এবং হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ)-এর সাথে আবিসিনিয়া হতে এসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তাঁদেরকে কুরআন মাজীদ পাঠ করে শুনান তখন তাঁরা ঈমান আনেন। ঐ সময় তাঁদের চোখে অশ্রু দেখা দেয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বলেনঃ “যখন তোমরা স্বদেশে ফিরে যাবে তখন তোমাদের পূর্ব মাযহাবে ফিরে যাবে না তো?” তাঁরা উত্তরে বলেনঃ ‘আমরা আমাদের এ দীন হতে কখনও ফিরে যাবো না।’ মহান আল্লাহ তাঁদের উক্তিকে এভাবে নকল করেছেন—

**وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطَمْعُ أَن يَدْخُلَنَا رَبِّنَا مَعَ الْقَوْمِ الْصَّلِحِينَ .**

অর্থাৎ “আমাদের এমন কি ওয়ার আছে যে, আমরা ঈমান আনবো না আল্লাহর প্রতি এবং সেই সত্যের প্রতি যা আমাদের কাছে এসেছে? অথচ আমরা এ আশা রাখবো যে, আমাদের প্রভু সৎ লোকদের সাথে আমাদেরকে শামিল করবেন।” ঐ লোকগুলো ছিলেন নাসারা যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেনঃ “আহলে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে এবং বিশ্বাস রাখে ঐ কিতাবের উপর যা তোমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল, আর আল্লাহর সামনে তারা বিনয় প্রকাশ করে।” অন্য জায়গায় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “যখন তাদের

সামনে (কুরআন) পাঠ করা হয় তখন তারা বলে-আমরা এর উপর ঈমান  
এনেছি, এটা আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য, আমরা তো ইতিপূর্বেই মুসলমান  
ছিলাম।” এ জন্যেই আল্লাহ তা‘আলা এখানে বলেনঃ “এ স্বীকারোভির কারণে  
আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতসমূহ প্রদান করবেন যেগুলোর নিম্নদেশ দিয়ে  
স্নোতশ্বিনীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে, তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে।  
এক মুহূর্তের জন্যেও তাদেরকে সেখান থেকে সরানো হবে না, সৎকর্মশীলদের  
প্রতিদান এটাই।” অতঃপর তিনি দুষ্ট লোকদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ  
‘যারা কুফরী করলো এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, তারা  
জাহানামের অধিবাসী।’

৮৭। হে মুমিনগণ! আল্লাহ যেসব  
বস্তু তোমাদের জন্যে হালাল  
করেছেন তন্মধ্যে সুস্বাদু  
বস্তুগুলোকে হারাম করো না;  
এবং সীমালংঘন করো না;  
নিশ্চয়ই আল্লাহ  
সীমালংঘনকারীদের পছন্দ  
করেন না।

৮৮। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যা  
দান করেছেন তন্মধ্য হতে  
হালাল রুচিকর বস্তুগুলো  
ভক্ষণ কর এবং আল্লাহকে ভয়  
কর-যাঁর প্রতি ঈমান রাখ ।

٨٧- يَا يَهُودَ اَمْنَوْلَا  
لَهُمْ وَمَا طَبِّتُ مَا اَحْلَلَ اللَّهُ  
لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ ○

٨٨- وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْتُمُ اللَّهُ  
حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ○

হ্যৱত ইবনে আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতটি নবী (সঃ)-এর সাহাবীদের একটি দলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাঁরা বলেছিলেন- ‘আমরা আমাদের পুঁজিগ্রস্ত কর্তন করবো এবং দুনিয়ার কাম, লোভ-লালসা পরিত্যাগ করবো।’ নবী (সঃ)-এর কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁরা বলেনঃ ‘হ্যা, আমরা এক্ষেপ্ত সংকল্প করেছি।’ তখন নবী (সঃ) বলেনঃ “কিন্তু জেনে রেখো যে, আমি তো রোষাও রাখি এবং (কোন কোন সময়) নাও রাখি, রাত্রে নামাযও পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আমি স্ত্রীদের সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধও হই।

সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নীতি গ্রহণ করে সে আমারই অন্তর্ভুক্ত এবং যে ব্যক্তি আমার নীতি গ্রহণ করে না সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।”<sup>১</sup>

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কয়েকজন সাহাবী তাঁর পত্নীদেরকে তাঁর গোপনীয় আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন! তখন (সম্ভবতঃ তাঁর রাত দিনের আমল সম্পর্কে অবহিত হয়ে) তাঁদের মধ্যে কোন একজন বলেনঃ ‘আমি এখন থেকে আর কথনও গোশ্ত খাবো না।’ আর একজন বলেনঃ ‘আমি কথনও স্ত্রীলোকদের সাথে বিবাহিত হবো না।’ অন্য একজন বললেনঃ ‘আমি কথনও বিছানায় শয়ন করবো না (বরং মাটিতে শয়ন করবো)।’ এসব কথা নবী (সঃ)-এর কানে পৌছলে তিনি বলেনঃ “ঐ লোকদের কি হয়েছে যে, তাদের কেউ একথা বলে এবং ও কথা বলেঃ কিন্তু আমি তো রোষাও রাখি এবং কোন কোন সময় নাও রাখি, আমি নিদ্রাও যাই এবং নামাযও পড়ি, আমি গোশ্তও খাই এবং নারীদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নীতি থেকে সরে পড়ে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।”

হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি যখন গোশ্ত ভক্ষণ করি তখন স্ত্রীলোকদের প্রতি আমার কামভাব খুবই বৃদ্ধি পায়। এ জন্যে আমি নিজের উপর গোশ্ত হারাম করে ফেলেছি। তখন ‘হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে পবিত্র জিনিসগুলো হালাল করেছেন সেগুলো তোমরা নিজেদের জন্যে হারাম করো না’ -এ আয়াত অবর্তীর্ণ হয়। হ্যরত সুফইয়ান সাওরি (রঃ) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমরা এক যুক্ত দীর্ঘদিন পর্যন্ত নবী (সঃ)-এর সাথে অবস্থান করি এবং সে সময় আমাদের সাথে স্ত্রীলোক ছিল না। তখন আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করিঃ আমরা কি খাসী হবো না (অর্থাৎ আমাদের অঙ্গকোষ কর্তন করবো না)? তিনি তখন আমাদেরকে এটা করতে নিষেধ করেন এবং আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে কাপড়ের বিনিময়ে কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করার অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) <sup>১</sup> আমো لَا تَحِرِّمُوا <sup>২</sup> يَا بِهَا الَّذِينَ امْنَوْا - এ আয়াতটি পাঠ করেন। কিন্তু এটা নিকাহে মুত্ত্ব হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে মিরদুওয়াইও বর্ণনা করেছেন।

হযরত মাসরুক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা (একদা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট হায়ির ছিলাম, এমন সময় (রান্নাকৃত) পশুর স্তনের গোশ্ত নিয়ে আসা হলো। তখন (আমরা সবাই তা খেতে শুরু করলাম, কিন্তু) একটি লোক মজলিস থেকে সরে পড়লো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাকে বললেনঃ কাছে এসো (এবং খাওয়াতে অংশগ্রহণ কর)। সে তখন বললোঃ ‘আমি তো এটা না খাওয়ার শপথ গ্রহণ করেছি।’ তখন তিনি বললেনঃ ‘তুমি এসে এটা খেয়ে নাও এবং শপথ ভঙ্গে দেয়ার কাফ্ফারা আদায় কর।’ অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন।

ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ) প্রমুখ আলেমদের মাযহাব এই যে, যে ব্যক্তি নিজের উপর কোন খাদ্য অথবা স্তীদের ছাড়া অন্য কোন জিনিস হারাম করে নেয় তা তার উপর হারাম হয়ে যায় না এবং তার উপর কোন কাফ্ফারাও নেই। কেননা, আল্লাহ পাক বলেছেন- হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপর পবিত্র জিনিসগুলো হারাম করো না, যেগুলো তিনি „তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন। এ কারণেই যে ব্যক্তি নিজের উপর গোশ্ত ভক্ষণ হারাম করে নিয়েছিল তাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাফ্ফারা আদায় করার নির্দেশ দেননি। কিন্তু আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ) প্রমুখ ইমামগণ বলেন যে, যে ব্যক্তি নিজের উপর কোন খাদ্য বা পোশাক অথবা অন্য কোন জিনিস হারাম করে নেয়, তার উপর সেই কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা ওয়াজিব। কেননা, যখন কোন লোক নিজের উপর কোন জিনিস পরিত্যাগ করা অপরিহার্য করে নেয়, তখন কসমের কাফ্ফারার মতই নিজের উপর শুধু হারাম করে নেয়ার ফলে ও অপরিহার্য না হওয়া জিনিসকে অপরিহার্য করে নেয়ার প্রতিশোধ হিসেবে তাকে জবাবদিহি করা উচিত এবং এটা কাফ্ফারার মাধ্যমেই সম্ভব। হযরত ইবনে আবুস (রাঃ) এরূপ ফতওয়া দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম দ্বারাও এটা সাব্যস্ত হচ্ছে। ইরশাদ হচ্ছে-

يَا يَهُآ النَّبِيِّ لِمَ تَحْرِم مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتٍ ازْوَاجَكَ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থাৎ “হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেস, আপনি আপনার স্তীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। (৬৬: ১) এখানে আল্লাহ তা‘আলা উল্লিখিত আয়াত বর্ণনা

করার পর কসমের কাফ্ফারার বর্ণনা দিলেন। এর দ্বারা এটা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, কসমের উল্লেখ না থাকলেও যদি কেউ নিজের উপর কোন জিনিস হারাম করে নেয় তবে কসমের কাফ্ফারার মতই তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইবনে জারীর (রাঃ) বলেন যে, কয়েকজন সাহাবী, যেমন হযরত উসমান ইবনে মাঘ্টুন (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) দুনিয়া পরিত্যাগ করা, পুঁজিগ কর্তন করা এবং চট পরিধান করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইবনে জুরাইহ ইকরামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান ইবনে মাঘ্টুন (রাঃ), আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ), ইবনে মাসউদ (রাঃ), মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ), আবু হ্যাইফা (রাঃ)-এর ত্রীতদাস সালিম (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ সংসার ত্যাগের ইচ্ছে করে বাড়ীর মধ্যে বসে পড়লেন, স্ত্রীদের সংসর্গ ত্যাগ করলেন, চট পরিধান করলেন এবং ভাল ভাল খাদ্য ও পোশাক নিজেদের উপর হারাম করে দিলেন। তাঁরা বানী ইসরাইলের সন্ন্যাসীদের মত জীবন যাপন করতে শুরু করলেন এবং খাসী হয়ে যাওয়ার সংকল্প করলেন। এ এক্যমতে তাঁরা পৌছলেন যে, পর্যায়ক্রমে সারারাত সালাত আদায় করবেন এবং সারাদিন রোয়া রাখবেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল এবং তাঁদেরকে বলা হল : আল্লাহর পবিত্র ও হালাল বস্তুগুলোকে নিজেদের উপর হারাম করে নিয়ো না ও সীমা অতিক্রম করনা, আমি এসব লোককে কখনই পছন্দ করি না। এগুলো মুসলিমদের নীতি নয় যে, তোমরা স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকবে, ভাল খাবার, পানীয় ও পোশাক পরিত্যাগ করবে, সদা সারারাত ধরে সালাত আদায় করবে ও সারাদিন রোয়া রাখবে এবং খাসী হয়ে যাবে, অর্থাৎ পুঁজিগ কর্তন করবে। এসব নীতি সম্পূর্ণ ভুল। অতঃপর যখন তাঁদের ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হল তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁদেরকে জানিয়ে দিলেন-“তোমাদের উপর তোমাদের নফসের হক রয়েছে এবং তোমাদের চক্ষুর হক রয়েছে। তোমরা রোয়া রাখবে ও (মাঝে মাঝে) রোয়া ছেড়েও দিবে, (রাতে নফল) সালাত আদায় করবে এবং নিদ্রাও যাবে। আর জেনে রাখবে যে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত পরিত্যাগ করবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।” তখন তাঁরা বললেন : হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এ সংকল্প হতে রক্ষা করুন এবং আপনার অবতারিত অহী অনুযায়ী চলার তাওফীক দিন।

وَلَا تَعْتَدُوا—এর অর্থ এটা ও হতে পারে-তোমরা হালাল বস্তুকে নিজেদের উপর হারাম করে দিয়ে নফসের উপর সংকীর্ণতা আনয়ন করো না। আবার এও

অর্থ হতে পারে—তোমরা হালালকে হারাম বানিয়ে নিয়ো না এবং হালাল দ্বারা উপকার লাভ করতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করো না। হালালকেও প্রয়োজন পরিমাণই গ্রহণ কর, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করো না। **كُلُّوا وَا شْرِبُوا وَلَا تُسْفِرُوا** অর্থাৎ “তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপব্যয় করো না।” (৭৪ ৩১) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “মুমিন ওরাই যে, যখন তারা খরচ করে তখন তারা অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না, বরং তাদের খরচ করণ এর মাঝামাঝি পস্তায় হয়ে থাকে।” আল্লাহ তা‘আলা না ‘ইফরাত’ বা বাহল্যের অনুমতি দিয়েছেন, না ‘তাফরীত’ বা অত্যল্লতার অনুমতি দিয়েছেন। এ জন্যেই তিনি বলেছেন— **وَلَا تَعْتَدُوا** অর্থাৎ তোমরা সীমা অতিক্রম করো না।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ “তোমরা সর্বাবস্থায় হালাল ও পবিত্র জিনিস ভক্ষণ কর এবং সর্বকাজে আল্লাহকেই ভয় কর। তাঁর মর্জির অনুসরণ কর এবং বিরোধিতা ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক।

### ৮৯। আল্লাহ তোমাদেরকে

তোমাদের কসমগুলোর মধ্যে  
অর্থহীন কসমের জন্যে  
পাকড়াও করবেন না, কিন্তু  
তিনি তোমাদেরকে ঐ  
কসমসমূহের জন্যে পাকড়াও  
করবেন, যেগুলোকে তোমরা  
(ভবিষ্যত বিষয়ের প্রতি) দৃঢ়  
কর, সুতরাং ওর কাফ্কারা হচ্ছে  
দশজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য  
প্রদান করা মধ্যম ধরনের, যা  
তোমরা নিজ পরিবারের  
লোকদেরকে খাওয়াইয়ে থাক,  
কিংবা তাদেরকে পরিধেয় বস্তু  
দান করা (মধ্যম ধরনের),  
কিংবা একটা গোলাম বা বাঁদী  
আয়াদ করা, আর যে ব্যক্তি  
সমর্থ না হয়, তবে (একাধারে)  
তিনিদিনের রোষা; এটা

—৮৯—  
**لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ**  
**فِي أَيْمَانِكُمْ وَلِكُنْ**  
**بِيُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقْدَتُمُ الْإِيمَانَ**  
**فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ**  
**مَسْكِينِ مِنْ أَوْسَطِ مَا**  
**تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ**  
**كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقْبَةِ**  
**فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ**  
**أَيَّامٍ ذِلِّكَ كَفَارَةً أَيْمَانِكُمْ إِذَا**

তোমাদের কসমসমূহের  
কাফ্ফারা যখন তোমরা কসম  
কর (অতঃপর ভঙ্গ কর) এবং  
নিজেদের কসমসমূহের প্রতি  
লক্ষ্য রেখো; এরপেই আল্লাহ  
তোমাদের জন্যে স্বীয়  
বিধানসমূহ বর্ণনা করেন, যেন  
তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

حَفْتَمْ وَاحْفَظُوا إِيمَانَكُمْ  
كَذَلِكَ يَبْيَنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَتِهِ  
لِعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ ○

অর্থহীন কসমের বর্ণনা সূরায়ে বাকারায় দেয়া হয়েছে, সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্পত্তিয়োজন। এ ধরনের কসম মানুষ তার কথা বার্তার মধ্যে অনিচ্ছা সন্ত্রেও করে থাকে। যেমন সে বলে, আল্লাহর কসম ইত্যাদি। এটা ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ)-এর উক্তি। অন্যান্যদের উক্তি এই যে, এরপ কসম উপহাস ও অবাধ্যতার স্থলেও হতে পারে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর উক্তি এই যে, দৃঢ় বিশ্বাসের সময় এরপ করা হলেও তা অর্থহীন কসমের সংজ্ঞার মধ্যেই পড়ে যাবে। কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, এটা হচ্ছে ক্রেতের সময় বা ভুল বশতঃ কসম। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, কেউ যদি কোন খাদ্য, পানীয় বা পোষাক পরিত্যাগ করা সম্পর্কে কসম খায় তবে এ দলীল অনুযায়ী তাকে পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে যে কসম মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ওটাই হচ্ছে অর্থহীন বা বাজে কসম।

وَلِكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقِدْتُمُ الْإِيمَانَ

অর্থাং তোমরা যদি কসমকে দৃঢ় করে নাও তবে সেই কসমের জন্যে আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন।

فَكَفَّارَتْهُ أَطْعَامٌ عَشَرَةٌ مَسْكِينٌ مِنْ أَوْسْطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ

অর্থাং দৃঢ় কসম ভেঙ্গে দেয়ার কাফ্ফারা হচ্ছে দশজন অভাবগ্রস্ত লোককে খেতে দেয়া। তাদেরকে তোমরা এমন মধ্যম ধরনের খাবার খেতে দেবে যা তোমরা তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে খাওয়াইয়ে থাক। এ মধ্যম ধরনের খাদ্য হচ্ছে রুটি ও দুধ কিংবা রুটি ও তেল। হ্যবত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কোন কোন লোক নিজের পরিবারকে তার ক্ষমতার তুলনায় খারাপ খাদ্য ভক্ষণ করিয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ নিজের ক্ষমতার তুলনায় ভাল খাবার খাওয়াইয়ে থাকে। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেছেন যে, সেই খাদ্য মধ্যম

ধরনের হওয়া উচিত। না খুবই ভাল, না খুবই মন্দ। হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে রুটি ও গোশ্ত, রুটি ও দুধ, 'রাওগান' তেল বা সিরকাহ ইত্যাদি।<sup>১</sup> ইবনে জারীর (রাঃ) বলেন যে, طَرْسُ<sup>২</sup> দ্বারা খাদ্যের স্বল্পতা ও আধিক্য বুঝানো হয়েছে। খাদ্যের পরিমাণের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হ্যরত আলী (রাঃ) বলেন যে, সকাল ও সন্ধ্যা এ দু'সময়ে দশজন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে হবে। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ) বলেন যে, একবারই যথেষ্ট। অর্থাৎ রুটি ও গোশ্ত। আর গোশ্ত দিতে না পারলে রুটি ও রাওগান তেল বা সিরকাহ যথেষ্ট হবে এবং তা পেট পুরে খাওয়াতে হবে। অন্যান্যগণ বলেন যে, দশজনের প্রত্যেককে অর্ধ সা' (প্রায় সোয়া সের) গম বা খেজুর অথবা এ ধরনের কোন খাবার দিতে হবে।<sup>৩</sup> ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন যে, গম হলে অর্ধ সা' আর অন্য কিছু হলে এক সা' দেয়া উচিত। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সা' খেজুর কাফ্ফারা হিসেবে আদায় করেছিলেন এবং লোকদেরকে তিনি এরই নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর খেজুর না হলে অর্ধ সা' গম দিতে হবে।

ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ) বলেন যে, কসমের কাফ্ফারায় নবী (সঃ)-এর সেই মুদ পরিমাণ ওয়াজিব, যে মুদ তিনি মিসকীনের জন্যে ধার্য করেছিলেন, আর তা হচ্ছে ৫৬ তোলা গম। কিন্তু তিনি তরকারীর কথা বলেননি। এখানে ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ) দলীল হিসেবে নবী (সঃ)-এর ঐ হৃকুমকে গ্রহণ করেছেন, যে হৃকুম তিনি ঐ ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন যে রম্যানের রোয়ার অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছিল। সে হৃকুম এই ছিল যে, সে যেন ৭০জন মিসকীনকে এমন পরিমাণ যত্নে গম মেপে দেয় যাতে ১৫ সা' গম ধরে, যেন প্রত্যেকে এক মুদ করে গম পেতে পারে। ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, গম দেবে এক মুদ অথবা অন্য জিনিস দেবে দু' মুদ।<sup>৪</sup> আল্লাহই সবচেয়ে বেশী জানেন।

<sup>১</sup> ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ) বলেন যে, যদি ঐ দশজনের প্রত্যেককেই একই পরিমাণ কাপড় দেয় যার উপর পোশাকের প্রয়োগ হতে পারে তবে তা যথেষ্ট হবে। যেমন একটা জামা বা পায়জামা অথবা পাগড়ী কিংবা চাদর।

১. এটা ইবনে সীরীন, হাসান ও যহুহাকের উক্তি।
২. এটা হ্যরত আয়েশা (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), সাইদ ইবনে জুবাইর (রাঃ), নাখন্দি (রঃ) এবং যহুহাকেরও (রঃ) উক্তি।
৩. এটা ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে মাজা (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন এবং তাঁর সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

ইমাম মালিক (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেককে এ পরিমাণ কাপড় দেয়া উচিত, যে পরিমাণ কাপড় নামাযে পরিধান করা জরুরী। পুরুষ ও স্ত্রীকে শরঙ্গ প্রয়োজন হিসেবে দিতে হবে। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হাসান (রঃ) বলেন যে, দু'টি কাপড় দিতে হবে। সাওরী (রঃ) বলেন যে, একটি পাগড়ী দেবে যা মাথাকে ঢেকে নেয় এবং একটি চাদর দেবে যা দেহকে ঢেকে দেয়।

**أَوْ تَغْرِيرُ رَقْبَةٍ** ইমাম আবু হানাফী (রঃ) এর দ্বারা সাধারণ গোলাম অর্থ নিয়েছেন। সুতরাং তাঁর মতে কাফির গোলামও আযাদ করতে পারে এবং মুমিন গোলামও আযাদ করতে পারে। ইমাম শাফিস (রঃ) ও অন্যান্য ফকীহগণ বলেন যে, হত্যার কাফ্ফারায় যেমন মুমিন গোলামের শর্ত রয়েছে তদুপ কসমের কাফ্ফারাতেও মুমিন গোলাম হওয়া জরুরী। কেননা, কারণ পৃথক হলেও ওয়াজিব তো একই। মুআবিয়া ইবনে হাকাম আস-সালমী (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তাঁর উপর একবার একটা গোলাম আযাদ করার দায়িত্ব পড়েছিল। তখন তিনি একটি হাবশি ত্রীতদাসী নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ত্রীতদাসীটিকে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘আল্লাহ কোথায়?’ সে উত্তরে বলেঃ তিনি আকাশে রয়েছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ ‘আমি কে?’ উত্তরে দেয়, আপনি আল্লাহর রাসূল (সঃ)। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুআবিয়া ইবনে হাকাম আস-সালমী (রাঃ)-কে বললেনঃ ‘এ মুমিনা, সুতরাং তুমি তাকে আযাদ করতে পার।’<sup>১</sup>

এখন এ তিনি প্রকারের কাফ্ফারার মধ্য হতে যে প্রকারের কাফ্ফারা আদায় করা হবে তাই আদায় হয়ে যাবে। কুরআন কারীমে সর্বপ্রথম সহজটার কথা বলা হয়েছে। তারপর শ্রেণীগতভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পোশাক দেয়ার তুলনায় খানা খাওয়ানো সহজ। অতঃপর গোলাম আযাদ করার তুলনায় পোশাক দেয়া সহজ। মোটকথা, নিম্নতম হতে উচ্চতমের দিকে পা বাড়ানো হয়েছে। সর্বশেষে বলা হয়েছে— **فَمَنْ لَمْ يَعْدُ فَصِيامُ ثُلَّةٍ أَيَّامٍ** অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ তিনটির মধ্যে একটির উপরেও সক্ষম হবে না, তাকে তিনটি রোয়া রাখতে হবে। ইবনে জারীর (রঃ) সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণনা

১. এটা ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে, ইমাম মালিক (রঃ) তাঁর মুআস্তা গ্রন্থে এবং ইমাম শাফিস (রঃ) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

করেছেন যে, তাঁরা বলেছেনঃ 'যার নিকট তিনটি দিরহাম বা রোপ্যমুদ্রাও থাকবে তাকে অবশ্যই খানা খাওয়াতে হবে, নচেৎ রোয়া রাখতে হবে।' এখন এ তিনটি রোয়া পর্যায়ক্রমে রাখা ওয়াজিব কি মুস্তাহাব বা বিচ্ছিন্নভাবে রাখাই যথেষ্ট কি-না এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ)-এর মতে পর্যায়ক্রমে রাখা ওয়াজিব নয়। ইমাম মালিকও (রঃ) এ কথাই বলেছেন। কেননা, **فَصِيَامُ ثُلَّةٍ أَيَّامٍ**, কথাটি সাধারণ, পর্যায়ক্রমে তিনদিন রোয়া রাখতে হবে- এভাবে একে বেঁধে দেয়া হয়নি। যেমন কারও যদি পর্যায়ক্রমে কয়েকটি রোয়া কায়া হয় তবে পর্যায়ক্রমে ওগুলোও আদায় করা জরুরী নয়। কেননা **فِعْدَةٌ** (২ঃ ১৮৪) কথাটি সাধারণ। এক জায়গায় ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ) পর্যায়ক্রমে তিনটি রোয়া ওয়াজিব হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। হানাফী ও হানাবেল সম্প্রদায়েরও এটাই উক্তি। তাঁদের দলীল এই যে, হ্যরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ)-এর একটি কিরআতে **فَصِيَامُ ثُلَّةٍ أَيَّامٍ مُتَبَاعِعَاتٍ**-এরপও রয়েছে।<sup>১</sup> এ কিরআতটি মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত না থাকলেও কমপক্ষে খবরে ওয়াহিদ তো বটে। তাছাড়া সাহাবীদের তাফসীর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় এবং এটা হাদীসে মারফুর ভক্তুমেই পড়ে।

**إِنَّمَا كَفَارَةَ اِيمَانِكُمْ اذَا حَلَقْتُمْ** এটা হচ্ছে কসমের শরঙ্গি কাফ্ফারা।

**وَاحْفَظُوا اِيمَانَكُمْ** ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তোমরা কাফ্ফারা আদায় না করে ছেড়ে দিয়ো না। এভাবেই আব্দুল্লাহ তাঁ'আলা স্বীয় নির্দর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৯০। হে মুমিনগণ! নিচয়ই মদ,  
জুয়া, মৃত্তি ইত্যাদি এবং  
লটারীর তীর, এসব গর্হিত  
বিষয়, শয়তানী কাজ ছাড়া  
আর কিছুই নয়, সুতরাং এ  
থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক,  
যেন তোমাদের কল্যাণ হয়।

১. হ্যরত মুজাহিদ (রঃ) ও শাবী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) -এর কিরআত এটাই ছিল।

٩- **يَا يَهَا الَّذِينَ امْتَوَأْتُمَا**  
**الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْأَنْصَابُ**  
**وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ**  
**الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعْلَكُمْ**  
**تَفْلِحُونَ**

৯১। শয়তান তো এটাই চায় যে,  
মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের  
পরম্পরের মধ্যে শক্রতা ও  
হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর  
স্মরণ হতে ও নামায হতে  
তোমাদেরকে বিরত রাখে,  
সুতরাং এখনও কি তোমরা  
ফিরে আসবে?

৯২। আর তোমরা আল্লাহর  
আনুগত্য করতে থাক ও রাসূল  
(সঃ)-এর আনুগত্য করতে  
থাক এবং সতর্ক থাক, আর  
যদি বিমুখ থাক তবে জেনে  
রেখো যে, আমার রাসূল  
(সঃ)-এর দায়িত্ব ছিল শুধু  
স্পষ্টভাবে (আদেশ) পৌছিয়ে  
দেয়া।

৯৩। যারা ঈমান রাখে ও ভাল  
কাজ করে, একুপ লোকদের  
উপর তাতে কোন গুনাহ নেই  
যা তারা পানাহার করেছে,  
যখন তারা পরহেযে করে এবং  
ঈমান রাখে ও ভাল কাজ করে,  
পুনঃ পরহেযে করতে থাকে  
এবং ঈমান রাখে, পুনঃ পরহেযে  
করতে থাকে ও ভাল কাজ  
করতে থাকে; বস্তুতঃ আল্লাহ  
একুপ সৎকর্মশীলদেরকে  
ভালবাসেন।

٩١- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ  
يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ  
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ  
اللَّهِ وَعَنِ الْصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ  
مُنْتَهُونَ ○

٩٢- وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  
الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فِيمَا تُولِيهِمْ  
فَاعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا  
بِالْبَلْغِ الْمِيَمِ ○

٩٣- لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصِّلَحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا  
طِعْمَوْا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصِّلَحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا  
وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاحْسَنُوا  
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ○

এখানে আল্লাহ পাক স্বীয় মুমিন বান্দাহদেরকে মদ্য পান জুয়া খেলা ইত্যাদি  
থেকে নিষেধ করছেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব  
(রাঃ) বলেন যে, শতরঞ্জ এক প্রকারের জুয়া। মুজাহিদ (রঃ) এবং আতা' (রঃ)  
বলেন যে, বাজি রেখে যে খেলা করা হয় সেটাই জুয়া। এমনকি ছেলেরা বাজি  
রেখে যে কড়ি খেলে সেটাও জুয়া। রাশিদ ইবনে সা'দ ও যমরা' ইবনে হাবীব  
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অঙ্গতার যুগে ইসলাম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই জুয়া  
বিশেষভাবে খেলা হতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এই জঘন্য  
খেলা খেলতে নিষেধ করেছেন। মালিক (রঃ) বলেন যে, অঙ্গতার যুগে  
সাধারণভাবে এই জুয়া খেলা হতো। একটি দু'টি ছাগলের গোশত শর্ত হিসেবে  
বিক্রি করে দেয়া হতো। যুহরী (রঃ) বলেন, জুয়া এভাবে হতো যে, মাল এবং  
ফলের উপর পাশা নিষ্কেপ করা হতো এবং এভাবে জুয়ার মাধ্যমে ওগুলোর উপর  
অধিকার লাভ করা হতো। কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (রঃ) বলেন যে, যা কিছু  
আল্লাহ ও নামাযের স্বরণ থেকে ভুলিয়ে রাখে তার সবই জুয়া। রাসূলুল্লাহ (সঃ)  
বলেছেন, পাশার মাধ্যমে যে খেলা করা হয় তা-ই জুয়া। অনুরূপভাবে খেলার  
সময় যে জিনিসকে মেরে জয়লাভ "করা হয় সেটাও জুয়া। এর ভাবার্থ যেন এটাই  
যে, শতরঞ্জ খেলা হারাম।

‘রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি ‘চওসর’ খেলা করলো সে যেন শূকরের মাংস ও রক্ত দ্বারা স্বীয় হাত রঙিয়ে দিলো।’<sup>১</sup> মুআত্তায়ে ইমাম মালিকের মধ্যে হ্যরত আবু মুসা আশ’আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি ‘চওসর’ খেললো সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর নাফরমানী করলো।’<sup>২</sup> আর শতরঞ্জ সম্পর্কে হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, ওটা ‘চওসর’ থেকেও খারাপ এবং তিনি ওটাকে পাশা ও জুয়ার মধ্যে গণ্য করেন। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ (রঃ) একে মাকরুহ বলেছেন।

‘সম্পর্কে হ্যৱত ইবনে আকবাস (রাঃ) ও হ্যৱত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ঐ পাথরগুলোকে বলা হতো যেগুলোর উপর পশ্চ যবাই করে মুশরিকরা তাদের মূর্তিগুলোর নামে উৎসর্গ করতো।’<sup>১</sup> ঐ পাশাগুলোকেও বলা হতো যেগুলোকে বণ্টন করে শুভাশুভ লক্ষণ বের করা হতো।<sup>২</sup> رجس مِنْ عَمَلٍ - الشَّيْطَنُ - অর্থাৎ এগুলো গর্হিত বিষয়, আর এগুলো শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি এগুলো হচ্ছে নিকৃষ্টতম শয়তানী কাজ।

- ଏଟା ଇମାମ ମୁସିଲିମ (ରୂପ) ବୁରାଇଦାହ ଇବନେ ଖାସିବ ଆସଲାଯାମୀ (ରୂପ) ହତେ ବର୍ଣନ କରେଛେ ।
  - ଏହି ହାଦୀସଟି ଇମାମ ଆହମାଦ (ରୂପ), ଇମାମ ଆବୁ ଦାଉ୍ଦ (ରୂପ) ଏବଂ ଇମାମ ଇବନେ ମାଜା (ରୂପ) ବର୍ଣନ କରେଛେ ।

‘এর ‘ه’ সর্বনামটি رجس’<sup>رجس</sup> শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা এগুলো পরিত্যাগ কর।

‘لَعْلَكُمْ تَفْلِحُون’<sup>لَعْلَكُمْ تَفْلِحُون</sup> - এ কথা দ্বারা আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দাদেরকে এসব কাজ পরিত্যাগ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ শয়তান তো ওটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শক্রতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখে, সুতরাং এখনও কি তোমরা (এসব কাজ থেকে) বিরত থাকবে না? এ কথাগুলো আল্লাহ তা‘আলার বান্দাদের প্রতি তায় প্রদর্শন ও সতর্কবাণী।

**মদ্য হারাম হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ**

ইমাম আহমাদ (রঃ) হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মদ্য তিনবার হারাম করা হয়। যখন নবী (সঃ) মদীনায় আগমন করেন সেই সময় মদীনার লোকেরা মদ্য পান করতো এবং জুয়ার মাধ্যমে উপার্জিত মাল ভক্ষণ করতো। ঐ সম্পর্কে তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আল্লাহ তা‘আলা নিম্নলিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

তুমি বল- এই দু’জিনিসে মানুষের জন্যে সামান্য উপকার আছে বটে; কিন্তু এই উপকারের তুলনায় ক্ষতি খুবই বেশী। তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগলোঃ আল্লাহ তা‘আলা এ দু’টো জিনিস আমাদের উপর হারাম তো করলেন না। তিনি শুধু বললেন যে, এ দু’টো জিনিসে আমাদের উপকার কম এবং ক্ষতি বেশী। সুতরাং তারা মদ্যপান করতেই থাকলো। কিন্তু একদিন এমন আসলো যে, এক মুহাজির সাহাবী নেশার অবস্থায় নামাযে কুরআন মাজীদ পাঠ করতে গিয়ে ভুল ও গড়বড় করে দেন। তখন নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

‘হে মুমিনগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাযের কাছেও যেয়ো না, যে পর্যন্ত না জানতে পার যে, তোমরা কি বলছো’। সুতরাং লোকেরা নামাযের সময় মদ্যপান পরিত্যাগ করলো বটে; কিন্তু অন্য সময় পান করতেই থাকলো। কেননা, তখন পর্যন্ত স্পষ্টভাবে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। অবশেষে একদিন মদ্যপান করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোন একজন লোক নামায পড়ছিল, এমন সময় পরিষ্কারভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আরো ‘يَا أَيُّهَا الَّذِينَا آتَنَا الْخُمُرَ وَالْمَيْسِرَ’<sup>يَا أَيُّهَا الَّذِينَا آتَنَا الْخُمُرَ وَالْمَيْسِرَ</sup> - এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন লোকেরা বলেঃ ‘হে আমাদের প্রভু! আমরা বিরত থাকলাম।’ অতঃপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলোঃ “হে

আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মদ্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বে যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছে কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে; কিন্তু তারা মদ্যপান করতো এবং জুয়া খেলতো- তাদের কি হবে? কেননা, আল্লাহ তা'আলা তো এটাকে শয়তানী কাজ বলে আখ্যায়িত করলেন এবং নিষিদ্ধ করলেন।” তখন নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হলো-যারা ঈমান এনেছিল এবং ভাল কাজ করেছিল তারা নিষিদ্ধ ঘোষণা হওয়ার পূর্বে যা কিছু ভক্ষণ করেছিল সে জন্যে তাদের উপর কোন দোষারোপ করা হবে না। আর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ ‘যদি তাদের জীবন্দশায় এটা হারাম করা হতো তবে তোমরা যেমন তা ছেড়ে দিলে, তারাও তদ্বপ ছেড়ে দিতো।’

ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে হ্যরত উমার (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বললেনঃ ‘হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে মদ্য সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা দিন।’ তখন সূরায়ে বাকারার *يَسْتَلُونَكُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَبِيرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ* (৪: ৪৩)-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর যখন হ্যরত উমার (রাঃ)-কে এ আয়াত শুনানো হয় তখন তিনি পুনরায় প্রার্থনা করেন, ‘হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে মদ্যের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা দান করুন! তখন সূরায়ে নিসার *بِإِيمَانِ الَّذِينَ امْنَأْنَا*’-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন নবী (সঃ)-এর মুআয়িন *لَا تَقْرِبُوا الصَّلْوَةَ وَإِنْتُمْ سُكْرٍ* বলার পর উচ্চেংস্বরে বলে দেন যে, নেশার অবস্থায় নামায পড়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। হ্যরত উমার (রাঃ)-কে এ আয়াতটিও পড়ে শুনানো হয়। তিনি এবারেও বলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্যে আরও সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করে দিন। তখন সূরায়ে মায়দাহৰ উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এবারও হ্যরত উমার (রাঃ)-কে আয়াতটি পাঠ করে শুনানো হয়। যখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, *فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ* (সুতরাং তোমরা বিরত থাকবে কি?) তখন হ্যরত উমার (রাঃ) বলেন, ‘আমরা বিরত থাকলাম, আমরা বিরত থাকলাম।’

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, হ্যরত উমার (রাঃ) নবী (সঃ)-এর মিস্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, হে লোক সকল! মদ হারাম ঘোষিত হয়েছে। আর পাঁচটি জিনিসের মধ্যে যেটা দিয়েই মদ তৈরী করা হবে সেটাই হারাম। সেই পাঁচটি জিনিস হচ্ছেঃ আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব। *خَمْرٌ* বা মদ শব্দটি সাধারণ। সুতরাং যে নেশার জিনিস পান করলে জ্ঞান লোপ

পায় সেটাই মদ। সহীহ বুখারীতে হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, যে সময় মদ হারাম করা হয় সে সময় মদীনায় আঙুরের মদ চালু ছিল না।

অপর একটি হাদীসে রয়েছে যে, আঙুর রহমান ইবনে আ'লা বলেন, আমি হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ)-কে মদ্য বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি বলেন, সাকীফ অথবা দাউদ গোত্রের একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বন্ধু ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিলিত হন এবং মদের একটি বড় কলস উপটোকন হিসেবে তাঁকে প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে বলেনঃ ‘আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করে দিয়েছেন, তা কি তুমি জান না?’ তখন লোকটি স্থীয় গোলামকে বলেনঃ ‘এটা নিয়ে গিয়ে বাজারে বেচে দাও।’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ ‘যিনি মদ হারাম করেছেন তিনি ওর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম করেছেন।’ তখন লোকটি তাঁর গোলামকে বললো, ‘তুমি এই কলসটি শহরে নিয়ে গিয়ে উলটিয়ে ফেলে দাও।’<sup>১</sup>

আর একটি হাদীসে তামীম দারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একটি মদের মটকা (মৎপাত্র) উপটোকন স্বরূপ পাঠাতেন। অতঃপর মদ হারাম হয়ে যাওয়ার পর পূর্বের অভ্যাস মত তিনি মদের মটকা নিয়ে আসেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে উঠে বলেনঃ “ইতিমধ্যে মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে।” তিনি তখন বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে আমি ওটা বিক্রি করে দেবো এবং ওর মূল্য দ্বারা উপকৃত হবো। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আল্লাহ ইয়াহুদীদের উপর লান্ত বর্ষণ করুন। তাদের উপর গরু ও ছাগলের চর্বি হারাম করে দিয়েছিলেন, তখন তারা তা গলিয়ে ‘রাওগান’ (তৈল) তৈরী করতঃ বিক্রি করতো। আল্লাহ তা'আলা মদ ও ওর মূল্য সব কিছুই হারাম করেছেন।”

মুসনাদে আহমাদে হ্যরত নাফে' ইবনে কাইসান হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর পিতা (কাইসান) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে মদের ব্যবসা করতেন। একবার তিনি ব্যবসার জন্যে সিরিয়া হতে কতগুলো মদের মটকা নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট তিনি একটি মটকা নিয়ে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার জন্য খুবই উত্তম মদ নিয়ে এসেছি।’ তখন তিনি বলেনঃ

১. এটা ইমাম আহমাদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম (রাঃ) ও ইমাম নাসাই (রাঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

‘হে কাইসান ! ইতিমধ্যে মদ তো হারাম করে দেয়া হয়েছে ।’ কাইসান (রাঃ) তখন জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি কি এটা বিক্রি করে দেবো? তিনি উত্তরে বলেনঃ “এটা হারাম করা হয়েছে এবং এর মূল্যও হারাম করে দেয়া হয়েছে ।” তখন কাইসান (রাঃ) মটকাগুলো নিয়ে গিয়ে পা দিয়ে উলটিয়ে ফেলে দেন এবং সমস্ত মদ বইয়ে দেন ।

মুসনাদে আহমাদে হ্যরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আবু তালহা (রাঃ)-এর বাড়িতে হ্যরত আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ), হ্যরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ), হ্যরত সুহাইল ইবনে বাইয়া (রাঃ) এবং তাঁর অন্যান্য সাথীদেরকে মদ পান করাচ্ছিলাম । এমনকি তাদের মাতাল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল । এমতাবস্থায় মুসলমানদের এক আগমনকারী এসে বলেনঃ “মদকে হারাম করে দেয়া হয়েছে এ খবর কি আপনারা জানেন?” তখন তাঁরা বলেন, এখনও আমরা অপেক্ষা করবো এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবো । অন্যান্য সাহাবীগণ বললেনঃ “হে আনাস (রাঃ)! তোমার মটকায় যা কিছু মদ অবশিষ্ট রয়েছে তা উলটিয়ে ফেলে দাও । আল্লাহর কসম! এখন আমরা আর মদ পান করবো না ।” এটা ছিল খেজুর ও ঘবের মদ । আর সে সময় ঐ মদই চালু ছিল ।<sup>১</sup> হ্যরত আনাস (রাঃ) হতে আর একটি বর্ণনা রয়েছে, তিনি বলেন, যেদিন মদ হারাম করা হয় সেদিন আমি আবু তালহা (রাঃ)-এর বাড়িতে লোকদেরকে মদ পান করাচ্ছিলাম । ঐ মদ ছিল যব ও খেজুরের তৈরী । হঠাৎ একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেন । তখন কেউ বলে ওঠেন, ‘বেরিয়ে দেখ তো কি ঘোষণা করা হচ্ছে?’ তখন জানা গেল যে, ঘোষণাকারী ঘোষণা করছেন—“জেনে রেখো যে, মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে ।” ঐ সময় মদীনার অলিতে গলিতে মদ বয়ে যাচ্ছিল । বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন, আবু তালহা (রাঃ) আমাকে বললেন, ‘বেরিয়ে গিয়ে মদ বইয়ে দাও ।’ তখন আমি তা বইয়ে দিলাম । তখন কেউ কেউ বললেন, ‘অমুক ও অমুক যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, অথচ এই মদ তাঁদের পেটের মধ্যে বিদ্যমান ছিল ।’ বর্ণনাকারী বলেন, তখন আল্লাহহ তা‘আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেন-

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ جَنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا

অর্থাৎ যারা ইমান রাখে ও ভাল কাজ করে, এরূপ লোকদের উপর তাতে কোন গুনাহ নেই যা তারা (পূর্বে) পানাহার করেছে । হ্যরত আনাস (রাঃ) বলেন,

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) হ্যরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ।

আমি আবৃ তালহা (রাঃ), আবৃ উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ), আবৃ দাজানা (রাঃ), মুআয় ইবনে জাবাল (রাঃ), সুহাইল ইবনে বাহ্যা (রাঃ) প্রমুখ ব্যক্তি মহোদয়ের কাছে মদ পরিবেশন করছিলাম এবং নেশার কারণে তাঁদের মাথাগুলো ঢলে পড়ছিল, এমন সময় আমি ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে শুনলাম, জেনে রেখো যে, মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে। এ কথা শোনা মাত্রই যাঁরা আমাদের কাছে আসছিলেন এবং যাঁরা আমাদের নিকট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, সবাই নিজ নিজ মদ বইয়ে দেন। আমরা সবাই মদের কলসগুলো ভেঙ্গে ফেলি। আমাদের কেউ কেউ অযু করেন এবং কেউ কেউ গোসলও করেন। আমরা উম্মে সুলাইমের নিকট থেকে সুগন্ধি নিয়ে ব্যবহার করি। অতঃপর আমরা মসজিদে গমন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে—*يَا يَهَا الَّذِينَ امْنَوْا إِنَّمَا الْخُسْرُ هُوَ هُنَّ هُنَّ فَهُلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَالْمَيْسِرُ*—হতে পর্যন্ত আয়তগুলো পাঠ করে শুনিয়ে দেন। একটি লোক তখন বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যারা এটা পান করা অবস্থায় মারা গেছে তাদের কি হবে? সেই সময় আল্লাহ তা'আলা *لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ امْنَوْا*—এ আয়তটি অবর্তীর্ণ করেন। একটি লোক হ্যরত কাতাদা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি আপনি এটা হ্যরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে শুনেছেন? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ। একটি লোক হ্যরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে শুনেছেন?’ তিনি উত্তর দেন, হ্যাঁ, আমরা কখনও মিথ্যা বলি না এবং মিথ্যা কি তা আমরা জানি না।’

ইমাম আহমাদ (রঃ) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন—‘নিচয় আল্লাহ মদ, জুয়া, শতরঞ্জ এবং গাবীরা গাছ হতে নিংড়ানো মদ হারাম করেছেন, আর প্রত্যেক নেশাযুক্ত জিনিসই হারাম।’ হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি বেড়ার দিকে গমন করেন। আমি তাঁর ডান দিকে ছিলাম। এমন সময় হ্যরত আবৃ বকর (রাঃ) সামনের দিক থেকে আগমন করলেন। আমি তখন পিছনে চলে গেলাম এবং হ্যরত আবৃ বকর (রাঃ) তাঁর ডান দিকে হয়ে গেলেন। আর আমি তাঁর বাম দিকে গেলাম। ইতিমধ্যে হ্যরত উমার (রাঃ)-কে আসতে দেখা গেল। আমি তখন সরে গেলাম এবং তিনি তাঁর বাম দিকে চলে গেলেন। এখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ বেড়ার মধ্যে আসলেন যা বাড়ীর পিছনে উট

১. এটা ইবনে জারীর (রঃ) ইবাদ ইবনে রাশিদ (রঃ)-এর হাদীস হতে তাখরীজ করেছেন, তিনি কাতাদাহ (রাঃ) হতে এবং তিনি আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

বাঁধার জায়গা ছিল। সেখানে মদের একটি মশক দেখা গেল। ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডাকলেন এবং ছুরি দিয়ে ওটা কেটে ফেলতে বললেন। আমি তখন ওটা ফেড়ে ফেললাম। তারপর তিনি বললেনঃ ‘মদ, মদ্যপানকারী, পরিবেশনকারী, বহনকারী, নিংড়িয়ে রস বেরকারী, তৈরিকারী এবং ওর মূল্য গ্রহণকারী সকলের উপর আল্লাহর লাভন্ত ।’<sup>১</sup>

হযরত সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদের ব্যাপারে চারটি আয়ত অবর্তীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একজন আনসারী আমাদেরকে দাওয়াত করেন। আমরা সেখানে প্রচুর মদ পান করি। এটা ছিল মদ হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। আমরা যখন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি তখন আমরা পরম্পর ফখর বা গৌরব প্রকাশ করতে শুরু করি। আনসারগণ বলেন, ‘আমরাই উত্তম।’ আবার কুরাইশরা বলেন, ‘আমরাই উত্তম।’ অতঃপর এক আনসারী উটের একটা বড় হাড় নিয়ে হযরত সাদ (রাঃ)-এর নাকের উপর মেরে দেন। ফলে হযরত সাদ (রাঃ)-এর নাকের হাড় ভেঙ্গে যায়। তখন *إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ*<sup>২</sup> হতে *فَهُلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ*<sup>৩</sup> পর্যন্ত আয়তগুলো অবর্তীর্ণ হয়।<sup>৪</sup>

হযরত ইবনে আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারদের দুটি দলকে কেন্দ্র করে মদ্য হারাম হওয়ার আয়তগুলো অবর্তীর্ণ হয়। তারা প্রচুর পরিমাণে মদ পান করার ফলে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তাদের পরম্পরের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। কারও চেহারায় আঘাত লাগে, কারও মাথা ক্ষত-বিক্ষত হয় এবং কারও দাঢ়ি উঠিয়ে ফেলা হয়। কেউ বলেন, ‘আমার অমুক সঙ্গী আমাকে আহত করেছে।’ এভাবে তারা একে অপরের শক্র হয়ে পড়েন। অথচ ইতিপূর্বে তাঁদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি বিদ্যমান ছিল। কারও প্রতি কোন হিংসা বিদ্বেষ ছিল না। তাঁরা বলতে শুরু করেন, ‘যদি সে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হতো তবে আমাকে এভাবে আহত করতো না।’ এভাবে তাদের মধ্যে শক্রতা বেড়ে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা *يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ*<sup>৫</sup> হতে *فَহُلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ*<sup>৬</sup> পর্যন্ত আয়তগুলো অবর্তীর্ণ করেন। এরপর কতক লোক বলেনঃ কতগুলো লোক উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, অথচ তাঁদের পেটে মদ বিদ্যমান ছিল, তাঁদের কি হবে? তখন আল্লাহ পাক *لَيْسَ عَلَى الدِّينِ*<sup>৭</sup> -*أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصِّلْحَ*<sup>৮</sup> এ আয়ত অবর্তীর্ণ করেন।<sup>৯</sup>

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

৩. এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী (রঃ) ও ইমাম নাসাই (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ইবনে জারীর (রাঃ) আবু বুরাইদাহ (রাঃ) হতে এবং তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (তাঁর পিতা) বলেন, আমরা একটা ছোট পাহাড়ের উপর বসে মদ পান করছিলাম। আমরা তিনজন বা চারজন ছিলাম। আমাদের সামনে মদের কলস ছিল এবং মদের চক্র চলছিল। আমি উঠে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে সালাম দিলাম। তখনই মদ হারাম হওয়ার আয়ত অবতীর্ণ হলো। আমি তৎক্ষণাত্মে আমার সঙ্গীদের নিকট আসলাম এবং তাঁদের কাছে ফেলেন<sup>۱۲۹/۶۰۰/۰۰۰</sup> পর্যন্ত পাঠ করলাম। কেউ মদ পান করে ফেলেছিলেন। আবার কেউ কেউ আংশিক পান করেছিলেন এবং আংশিক পাত্রে অবশিষ্ট ছিল। পাত্র তার হাতেই ছিল। কারও মুখে মদ লেগেও ছিল। এমতাবস্থায় সবাই নিজ নিজ মদ মাটিতে বইয়ে দিলেন এবং আয়াতের শেষাংশ <sup>۱۳۰/۶۰۰/۰۰۰</sup> ফেলেন<sup>۱۳۱/۰۰۰</sup> আমাদের প্রভু! আমরা বিরত থাকলাম।'

সহীহ বুখারীতে হ্যরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, উভদ যুদ্ধের দিন সকালে লোকেরা মদ পান করেছিলেন এবং সেই দিনই তাঁদের অধিকাংশ শহীদ হয়েছিলেন। এটা ছিল মদ হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

আবু দাউদ তায়ালিসী (রাঃ) হ্যরত বারা' ইবনে আমির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, যখন মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়ত অবতীর্ণ হয় তখন জনগণ বলেন, 'এটা হারাম হওয়ার পূর্বে যাঁরা এটা পান করেছিলেন (এবং ঐ অবস্থাতেই মারা গিয়েছেন) তাঁদের কি হবে?' তখন <sup>۱۳۱/۰۰۰</sup>-এ <sup>لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ أَمْنَوا</sup> আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

মুসনাদে আহমাদ হ্যরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত আবু তালহা (রাঃ) তাঁর কাছে প্রতিপালিত ইয়াতীমদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ফতওয়া জিজেস করেন যারা উত্তরাধিকার সূত্রে মদ প্রাণ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ 'ওটা বইয়ে দাও।' আবু তালহা (রাঃ) জিজেস করেন, 'ওর সিরকাহ বানিয়ে নিলে হয় না?' তিনি জবাবে বলেনঃ 'না।'

হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- 'যে ব্যক্তি দুনিয়ার মদ পান করলো এবং তা থেকে তাওবা করলো না, পরকালে তার জন্যে তা হারাম হয়ে গেল।'<sup>১</sup>

১. এটা ইমাম বুখারী (রাঃ) ও ইমাম মুসলিম (রাঃ) মালিক (রাঃ)-এর হাদীস হতে তাখরীজ করেছেন।

‘হ্যরত নাফে’ (রাঃ) হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- ‘নেশাযুক্ত’ প্রত্যেক জিনিসই হারাম। যে ব্যক্তি সারা জীবন ধরে মদ পান করে মারা গেলো এবং তা হতে তাওবা করলো না, সে পরকালে তা পান করতে পাবে না।<sup>১</sup>

হ্যরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ অনুগ্রহের খোঁটাদানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য এবং সদা মদ্যপানকারী জান্মাতে যাবে না।<sup>২</sup>

ইমাম যুহরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হ্যরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) একবার জনগণকে সম্মোধন করে বলেন, তোমরা মদ্য পান থেকে বিরত থাক, কেননা, এটাই হচ্ছে সমস্ত দুর্ক্ষার্য ও অশ্রীলতার মূল। তোমাদের পূর্ব যুগে একজন বড় ‘আবেদ লোক ছিল। সে জনগণের সাহচর্যে থাকতো না। একটি পতিতা মহিলার তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়। সে সাক্ষ্য নেয়ার বাহানায় তার চাকরাণীর মাধ্যমে তাকে ডেকে পাঠায়। সে তার সাথে চলে আসে। অতঃপর সে যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, পিছন থেকে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। অবশ্যে সে মহিলাটির নিকট হায়ির হয়ে দেখতে পায় যে, সেখানে একটি শিশু ও মন্দের একটি কলস রয়েছে। সে তখন তাকে বলে, ‘আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে সাক্ষ্য নেয়ার উদ্দেশ্যে ডাকিনি। বরং ডেকেছি এই উদ্দেশ্যে যে, আপনি আমার কাছে থেকে রাত কাটাবেন, অথবা এই শিশুটিকে হত্যা করবেন কিংবা মদ পান করবেন।’ তখন সে (হত্যা ও ব্যভিচার অপেক্ষা মদ্যপানের পাপকে ছোট মনে করে) এক পেয়ালা মদ পান করে ফেলে। তারপর বলেঃ ‘আমাকে আরও দাও।’ শেষ পর্যন্ত সে নেশাগ্রস্ত হয়ে শিশুটিকে হত্যা করে বসে এবং মহিলাটির সাথে ব্যভিচার করে ফেলে। তাই তোমরা মদ্যপান থেকে বিরত থাক। মদ ও ঈমান কখনও এক জায়গায় জমা হতে পারে না। মদ থাকলে ঈমান নেই এবং ঈমান থাকলে মদ নেই। তাঁর এ উক্তির প্রমাণ হিসেবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ঐ হাদীসটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ব্যভিচারী যে সময় ব্যভিচার করে সে সময় সে মুমিন থাকে না, চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন থাকে না এবং মদ্যপানকারী যখন মদ্যপান করে তখন সে মুমিন থাকে না। মুসনাদ আহমাদে আসমা বিনতে ইয়ায়ীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সূরাঃ মায়িদাহ্ ৫

বলেন, আমি নবী করীম (সঃ)-কে বলতে শুনেছি- “যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, আল্লাহ তার উপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেন। এ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তবে সে কাফির হয়ে মারা যাবে। আর যদি সে তাওবা করে তবে আল্লাহ সেই তাওবা কবুল করবেন। কিন্তু যদি সে পুনরায় এতে ফিরে যায় (অর্থাৎ পুনরায় পান করতে শুরু করে) তবে তাকে طيْنَةُ الْخَيْلِ পান করাবার অধিকার আল্লাহর আছে।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! طيْنَةُ الْخَيْلِ কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ ‘তা হচ্ছে জাহান্নামীদের পুঁজ।’

୯୪ । ହେ ମୁମିନଗଣ ! ଆଲ୍ଲାହ  
ତୋମାଦେରକେ କତକ ଶିକାରେ  
ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରବେନ, ଯେଣୁଲୋ  
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋମାଦେର ହାତ ଓ  
ତୋମାଦେର ବଲ୍ଲମ ପୌଛତେ  
ପାରବେ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ,  
ଆଲ୍ଲାହ ଜେନେ ନେବେନ, କେ  
ତାଙ୍କେ ନା ଦେଖେ ଭର କରେ?  
ସୁତରାଂ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏରପରାଗ  
ସୀମା ଲଂଘନ କରବେ, ତାର ଜନ୍ୟେ  
ସ୍ଵର୍ଗାଦାୟକ ଶାସ୍ତି ରହେଛେ ।

৯৫। হে মুমিনগণ! তোমরা  
ইহরামের অবস্থায় বন্য  
শিকারকে হত্যা করো না; আর  
তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি  
ইচ্ছাপূর্বক ওকে হত্যা করবে,  
তার উপর তখন বিনিময়  
ওয়াজিব হবে, যা (মূল্যের  
দিক দিয়ে) সেই জানোয়ারের  
সমতুল্য হয়, যাকে সে হত্যা  
করেছে, যার (আনুমানিক  
মূল্যের) মীমাংসা তোমাদের  
মধ্য হতে দু'জন নির্ভরযোগ্য  
ব্যক্তি করে দেবে। (অতঃপর  
নিরূপিত মূল্য দ্বারা) সেই  
বিনিময় হয় নির্দিষ্ট চতুর্শিং

٩٤- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
لَيَسْأَلُنَّكُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ  
الصَّيْدُ دَتَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ  
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ  
شَيْخَافِهِ بِالْغَيْبِ فَمِنْ اعْتَدَى  
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عِذَابٌ أَلِيمٌ ○

٩٥- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  
تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَإِنْتُمْ حَرَمٌ  
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً  
فَجِزَاءُهُ مِثْلُ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعْمِ  
يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ

জন্মেই হোক; এই শর্তে যে, নেয়ায় স্বরূপ কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবে, না হয় কাফ্ফারা (স্বরূপ নিরূপিত মূল্যের খাদ্য দ্রব্য) মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দেবে, অথবা এর সমপরিমাণ রোয়া রাখবে, যেন নিজের কৃতকর্মের পরিণামের স্বাদ প্রহণ করে; অতীত (ত্রুটি) আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন; আর পুনরায় যে ব্যক্তি এরূপ কর্মই করবে; আল্লাহ সেই ব্যক্তি হতে (এর) প্রতিশোধ প্রহণ করবেন; আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ প্রহণে সক্ষম।

هَدِيٌّ بِلْغُ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَارَةٌ  
طَعَامٌ مَسِكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ  
صِبَا مَا لِيذُوقَ وَيَالْأَمْرِ  
عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ  
عَادَ فَيُنَتَّقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ  
عِزِيزٌ ذُو انتِقامٍ

-এ- لَيْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ آয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে- আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, শিকার দুর্বল হোক বা ছেট হোক, তোমরা ইহরামের অবস্থায় শিকার করা থেকে বিরত থাকছো কি-না । এমনকি যদি লোকেরা চায় তবে সেই শিকারকে হাতে ধরে নিতে পারে, তাই তাদেরকে তার নিকটবর্তী হতেও আল্লাহ পাক নিষেধ করলেন। মুজাহিদ বলেন যে, أَيْدِيكُمْ দ্বারা ছেট ও বাক্ষা শিকারকে বুঝানো হয়েছে। رَمَاهُمْ দ্বারা বুঝানো হয়েছে বড় শিকার। মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) বলেন যে, মুসলমানরা যখন উমরা পালনের উদ্দেশ্যে হৃদায়বিয়ায় অবস্থান করছিলেন সে সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। সেখানে বন্য চতুষ্পদ জন্ম, পাথী এবং অন্যান্য শিকার তাঁদের অবস্থান স্থলে জমা হয়ে গিয়েছিল। এরূপ দৃশ্য তাঁরা ইতিপূর্বে দেখেননি। সুতরাং ইহরামের অবস্থায় তাঁদেরকে শিকার করতে নিষেধ করা হয়, যাতে আল্লাহ তা'আলা জানতে পারেন যে, কে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করছে এবং কে করছে না। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رِبِّهِمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاجْرٌ كَبِيرٌ

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখেই ভয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার।'(৬৭: ১২) এখন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে,

এরপরে যারা নাফরমানী করবে তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি । কেননা, সে মহান আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করলো ।

—يَاٰيَهَا الَّذِينَ امْنَوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَإِنْتُمْ حِرْمٌ—  
এ- নিষেধাজ্ঞা অর্থের দিক দিয়ে ধরা হলে হালাল জন্ম, ওর বাচ্চা এবং হারাম প্রাণীগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত হবে । কিন্তু ইমাম শাফিউ (রাঃ)-এর মতে যেসব শিকারের মাংস হালাল নয় সেগুলো শিকার করা ইহরামের অবস্থায় জায়েয । তবে জমহুর উলামার মতে এ ধরনের শিকারও ইহরামের অবস্থায় জায়েয নয় । সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে প্রাণীগুলোকে সর্বাবস্থায় হত্যা করার বৈধতা সাব্যস্ত আছে, সেগুলো ছাড়া জমহুর উলামা কোন প্রাণীকেই ইহরামের অবস্থায় শিকার করা হারামকৃত প্রাণীগুলোর বহির্ভূত মনে করেন না । হাদীসটি নিম্নরূপ :

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “পাঁচটি ফাসিক (প্রাণী)-কে হালাল ও হারাম সর্বাবস্থায় হত্যা করা যায় । ঐ পাঁচটি হচ্ছে- কাক, চিল, বিচু, ইঁদুর এবং কামড়িয়ে নেয় এমন কুকুর ।” ইমাম মালিক (রাঃ) ‘হযরত নাফে’ (রাঃ) ও হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “পাঁচটি বিচরণকারীকে হত্যা করা মুহরিমের জন্যে কোন অপরাধমূলক কাজ নয় । সেগুলো হচ্ছে- কাক, চিল, বিচু, ইঁদুর এবং কামড়িয়ে নেয় এ ধরনের কুকুর ।” আইউব (রাঃ) বলেন, ‘আমি নাফে’ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সাপের হুকুম কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ ‘সাপকে হত্যা করার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহই নেই এবং আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদও সৃষ্টি হয়নি ।’ ইমাম মালিক (রাঃ), ইমাম আহমাদ (রাঃ) প্রমুখ আলেমগণ কামড়িয়ে নেয় এরূপ কুকুরের সাথে নেকড়ে বাঘ, হিংস্র জন্ম এবং চিতা বাঘকেও সামিল করেছেন । কেননা, এগুলো তো কুকুর অপেক্ষাও ক্ষতিকারক । আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন ।

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) এবং হযরত সুফইয়ান সওরী (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক হামলাকারী হিংস্র জন্ম হুকুম কুকুরের হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত । এর সমর্থন এই হাদীসে পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) উৎবা ইবনে আবি লাহাবের উপর দু'আ করতে গিয়ে বলেনঃ “হে আল্লাহ! সিরিয়ায় তার উপর আপনি আপনার এক কুকুরকে কর্তৃত দান করুন!” তখন যারকা’ নামক স্থানে একটি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে ।

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعِمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَاتَلَ مِنَ النَّعْمَ<sup>”</sup> জমহুরের উক্তি এই যে, কাফ্ফারা আদায় করার ব্যাপারে ইচ্ছাপূর্বক ও ভুলবশতঃ হত্যাকারী উভয়েই সমান। ইমাম যুহরী (রঃ) বলেন যে, কুরআন কারীম দ্বারা শুধু ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয় বটে, কিন্তু হাদীস দ্বারা ভুলবশতঃ হত্যাকারীর উপরও কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়। ভাবার্থ হলো এই যে, কুরআন কারীম দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর উপর যেমন কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হলো, তেমনিভাবে তার গুনাহগার হওয়াও সাব্যস্ত হলো। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

**لِيُذْقِنَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيُنَتِّقُمُ اللَّهُ مِنْهُ**

অর্থাৎ “যেন সে তার পাপের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করে, তবে যা অতীত হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, আর যে ব্যক্তি পুনরায় সেই কাজ করবে, আল্লাহ তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।” আহকামে নবভী (সঃ) এবং আহকামে আসহাব দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে যে, ভুলবশতঃ হত্যা করার অবস্থাতেও কাফ্ফারা দিতে হবে, যেমন ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করলে কুরআন কারীমের নির্দেশ অনুযায়ী কাফ্ফারা দিতে হয়। কেননা, যদি শিকারকে হত্যা করা হয় তবে তাকে নষ্ট করা হলো। আর যখন ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট করবে তখন তাকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয়, অদ্যপ ভুলবশতঃ নষ্ট করলেও এটাই হকুম। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, ইচ্ছাপূর্বক শিকারকারী কাফ্ফারার সাথে গুনাহগারও হয়, কিন্তু ভুলবশতঃ শিকারকারী গুনাহগার হয় না।

**كَمْ مُضَافٍ فَجَزَاءٌ كَمْ شَكْرِيَّةٍ فَجَزَاءٌ كَمْ مُشْكِرٍ فَجَزَاءٌ كَمْ مُشْكِرٍ** পড়েছেন, আবার কেউ কেউ কেউ শক্রিকে পড়েছেন। হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সাথে পড়েছেন। কিন্তু যেভাবেই পড়া হোক না কেন, ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং জমহুরের দলীল সর্বাবস্থাতেই কায়েম থাকছে যে, শিকারকৃত জন্মুর অনুরূপ বিনিময় ওয়াজিব হবে। যদি ওরই অনুরূপ বা প্রায় অনুরূপ কোন গৃহপালিত পণ পাওয়া যায় তবে ওটাই দিতে হবে, অন্যথায় ওর মূল্য দিতে হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর এতে মতান্বেক্য রয়েছে। তাঁর মতে শিকারকৃত জন্মুর গৃহপালিত জন্মুর সাথে সাদৃশ্য থাক বা না-ই থাক, সর্বাবস্থাতেই ওর মূল্য দিতে হবে।

**بِحُكْمِ بِهِ ذَوَاعَدِلٍ مِّنْكُمْ** অর্থাৎ এ কাফ্ফারার ফায়সালা করবেন মুসলমানদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, যাঁরা এ ফায়সালা করবেন যে,

সাদৃশ্যযুক্ত জন্ম শিকারের বেলায় সাদৃশ্যযুক্ত জন্ম দিতে হবে কিংবা সাদৃশ্যহীন জন্ম শিকারের বেলায় মূল্য দিতে হবে। আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য শুধু এ ব্যাপারে রয়েছে যে, ঐ দুই মীমাংসাকারীর মধ্যে একজন স্বয়ং শিকারী হতে পারেন কি -না? এই ব্যাপারে দু'টি উক্তি রয়েছে। একটি উক্তি এই যে, স্বয়ং শিকারী মীমাংসাকারী হতে পারেন না। এটাই হচ্ছে ইমাম মালিকের মাযহাব। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, স্বয়ং শিকারী মীমাংসাকারী হতে পারেন। কেননা আয়াতটি আম বা সাধারণ। আর এটা হচ্ছে ইমাম শাফিস্ট (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর মাযহাব। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) মায়মুন ইবনে মাহরান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক বেদুঈন হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট এসে বললোঃ “আমি ইহরামের অবস্থায় একটি শিকারকে হত্যা করেছি। সুতরাং আপনার মতে আমাকে এর কি বিনিময় দিতে হবে?” তখন হ্যরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর পাশে উপবিষ্ট হ্যরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ)-কে বললেন, “তোমার নিকট এর ফায়সালা কি?” বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন “ঐ বেদুঈন বললোঃ “আমি এসেছি আপনার নিকট। আর আপনি হচ্ছেন মুসলমানদের খলীফা। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম, আর আপনি জিজ্ঞেস করছেন অন্যকে?” তখন আবু বকর (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি আপত্তি করছো কেন? আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ يَحْكُمْ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ<sup>১</sup> অর্থাৎ “তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যেন এর ফায়সালা করে।” সুতরাং আমি আমার সঙ্গীর সাথে পরামর্শ করলাম। আমরা দু'জন যে ফায়সালার উপর একমত হবো, তোমাকে আমি সেই ফায়সালা শুনিয়ে দেবো।”<sup>২</sup> এখানে এটারই সভাবনা ছিল। যেহেতু, হ্যরত সিন্দীকে আকবর (রাঃ) যখন দেখলেন যে, বেদুঈন মূর্খ এবং দুই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মাসআলা অবহিত নয়, তাই ন্যূনতার সাথে তাকে বুঝিয়ে দিলেন। কেননা মূর্খতার ওমুখ হচ্ছে শিক্ষাদান।

ইবনে জারীর বাজলী (রঃ) বলেন, ইহরামের অবস্থায় আমি একটি হরিণ শিকার করি। হ্যরত উমার (রাঃ)-এর নিকট আমি তা বর্ণনা করলে তিনি বলেন, “তুমি দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে আস যাঁরা তোমার এ কাজের ফায়সালা করবেন।” আমি তখন আব্দুর রহমান (রাঃ) ও সা'দ (রাঃ)-কে নিয়ে আসলাম। তাঁরা দু'জন ফায়সালা করলেন যে, আমাকে একটা হষ্টপুষ্ট ছাগ ফিদাইয়া স্বরূপ দিতে হবে।

১. ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এটা খুবই উত্তম ইসনাদ। কিন্তু মায়মুন (রাঃ) ও আবু বকর (রাঃ)-এর মধ্যে مُنْتَطِع رয়েছে।

এ ব্যাপারেও আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে যে, যদি পরবর্তী যুগেও কোন অপরাধীর মধ্যে এই অপরাধ প্রকাশ পায় তবে কি সেই সময়েরই দু'জন ফায়সালাকারীর প্রয়োজন হয়, না একুপ মাসআলায় সাহাবীদের যে ফায়সালা ছিল ওরই আলোকে ফতওয়া দেয়া যেতে পারে? এতে দু'টি উক্তি রয়েছে। ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম শাফিঁয়ে (রঃ) বলেন যে, সাহাবীগণ এ ব্যাপারে যে ফায়সালা দিয়েছিলেন তারই অনুসরণ করতে হবে, ফায়সালাকারী দু'জন সাহাবীর ফায়সালার বৈপর্যীত্ব করা চলবে না। আর যেখানে সাহাবীদের কোন ফায়সালা বিদ্যমান নেই, সেখানে সেই যুগেরই দু'জন ন্যায়পরায়ণ ফায়সালাকারীর ফায়সালা কার্যকরী হবে। কিন্তু ইমাম মালিক (রঃ) ও ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক যুগের ফায়সালা পৃথক পৃথক হবে এবং প্রত্যেক যামানায় সেই যামানারই দু'জন ন্যায়পরায়ণ ফায়সালাকারী নির্ধারণ করতে হবে, সেখানে সাহাবীদের ফায়সালা বিদ্যমান থাক আর নাই থাক। কেননা, আল্লাহ তা'আলা 'অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্য হতে' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

أَوْ كَفَارَةً طَعَامٌ مَسْكِينٌ أَوْ عَدْلٌ لِّكُلِّ صِبَامًا  
هَدِيَا بِلْغَ الْكَعْبَةِ  
অর্থাৎ এ কুরবানী কা'বা পর্যন্ত পৌছাতে হবে। সেখানেই ওটা জবেহ করতে হবে এবং হারাম শরীফের মিসকিনদের মধ্যে ওর গোশ্ত বন্টন করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনই মতভেদ নেই, বরং সবাই এতে একমত।

أَوْ كَفَارَةً طَعَامٌ مَسْكِينٌ أَوْ عَدْلٌ لِّكُلِّ صِبَامًا  
হَدِيَا بِلْغَ الْكَعْبَةِ  
অর্থাৎ মুহরিম ব্যক্তি যদি নিহত শিকারের অনুরূপ জিনিস না পায় অথবা নিহত জন্ম এমন শ্রেণীর জন্মই না হয় যে, গৃহপালিত জন্মের মধ্যে ওর সাদৃশ্য থাকতে পারে, তবে বিনিময়, খাদ্য খাওয়ানো এবং রোয়া রাখার ব্যাপারে যে কোন একটি পালন করার ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা রয়েছে। কুরআনে কারীমে ' শব্দটি ইখতিয়ারের অর্থেই এসেছে। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ)-এর এটাই উক্তি। ইমাম শাফিঁয়ে (রঃ)-এরও একটি উক্তি এটাই আছে। ইমাম আহমাদ (রঃ)-এরও প্রসিদ্ধ উক্তি এটাই যে, ' শব্দটি ইখতিয়ারের উদ্দেশ্যেই আনা হয়েছে। অন্য একটি উক্তি এই যে, ' শব্দটি ইখতিয়ারের উদ্দেশ্যে আনা হয়নি, বরং ক্রমিক হিসেবে আনা হয়েছে। আর এর রূপ এই যে, মূল্যের সমান হলেই খেমে যেতে হবে এবং এতেই নিহত শিকারের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। এটাই ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আবু হানীফা (রঃ), হাম্মাদ (রঃ) এবং ইমরাহীম (রঃ)-এর মত। কিন্তু ইমাম শাফিঁয়ে (রঃ) বলেন যে, এ মূল্য ঐ জানোয়ারের বিনিময় রূপ হবে যে, যদি ওটা বিদ্যমান থাকতো

তবে এটাই ওর মূল্য হতো। অতঃপর এ অর্থ দ্বারা খাদ্য ক্রয় করে সাদকা করে দিতে হবে এবং প্রত্যেক মিসকীনকে এক 'মুদ' অর্থাৎ ৫৬ তোলা খাবার দিতে হবে। এটা হচ্ছে ইমাম শাফিউদ্দীন (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ) এবং হেজায়বাসী আলেমদের মাসআলা। আর ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ), ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, প্রত্যেক মিসকীনকে দুই 'মুদ' করে আহার্য দিতে হবে। ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, গম হলে এক 'মুদ' এবং অন্য কোন জিনিস হলে দুই 'মুদ' দিতে হবে। যদি এটা দিতে অপারণ হয় তবে রোয়া রাখতে হবে। অর্থাৎ মিসকীনকে যে কয়েকদিন খানা খাওয়াতে হয়, ততদিন রোয়া রাখতে হবে।

এখন এ খানা কোথায় খাওয়াতে হবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফিউদ্দীন (রঃ) বলেন, এ খানা হারাম শরীফে খাওয়াতে হবে। আতা'রও এটাই উক্তি। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন, যে স্থানে শিকারকে হত্যা কুরা হয়েছে সেখানেই বা ওরই নিকটবর্তী কোন এক স্থানে এ খানা খাওয়াতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন যে, এ খানা খাওয়াবার জন্যে কোন স্থান নির্দিষ্ট নেই। সেটা হারাম শরীফেই হোক বা অন্য কোন জায়গাই হোক, সব জায়গাতেই খাওয়ানো চলবে।

**لِبَذْوَقٍ وَبَالْأَمْرِ** যেন সে তার দুষ্কর্মের শাস্তি গ্রহণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি তার উপর কাফ্ফারা এ জন্যেই ওয়াজিব করেছি যে, যেন সে আমার হকুমের বিরোধিতার শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু অজ্ঞতার যুগে তার দ্বারা যা কিছু সাধিত হয়েছিল তা আমি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবো। কেননা, সে ইসলাম গ্রহণের পর ভাল কাজ করেছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ **وَمَنْ عَادَ فَإِنْتَ قُمُّ اللَّهِ مِنْهُ** অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পর এর নিষিদ্ধতা সত্ত্বেও যে আল্লাহর নাফরমানী করতঃ ওটা করে বসবে, আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তিনি বিরুদ্ধচারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তবে অজ্ঞতার যুগে যা কিছু হয়েছে তা তিনি ক্ষমা করবেন। আবার এ প্রশ্নের উত্তর না বাচক হবে যে, ইসলামের ইমাম কি এর কোন শাস্তি দিতে পারেন? অর্থাৎ ইমামের শাস্তি প্রদানের কোন অধিকার নেই। এ গুনাহ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যকার ব্যাপার। হ্যাঁ, তবে ইমামের তাকে শাস্তি দেয়ার অধিকার না থাকা সত্ত্বেও ফিদইয়া তাকে অবশ্যই আদায় করতে হবে। এটা ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ভাবার্থ এই যে,

আল্লাহ তা'আলা কাফ্ফারার মাধ্যমেই প্রতিশোধ নিয়ে নেবেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের রূপ এটাই হবে।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুরুজনবৃন্দ এর উপর একমত যে, মুহরিম যখন শিকারকে হত্যা করে ফেললো তখন তার উপর ফিদইয়া ওয়াজিব হয়ে গেল। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভুলের মধ্যে কোন পর্থক্য নেই, ভুল যতবারই হোক না কেন। ভুলবশতঃ কাজ এবং ইচ্ছাপূর্বক কাজ হকুমের দিক দিয়ে সব সমান। হয়রত ইবনে আবুস রাওঁ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুহরিমের দ্বারা যদি ভুলবশতঃ শিকারের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তবে তার উপর প্রতিবারের হত্যার সময়েই এ হকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি ইচ্ছাপূর্বক সে এই কাজ করে তবে প্রথমবারে তো তার উপর এ হকুম প্রযোজ্য হবে, কিন্তু দ্বিতীয়বার তার দ্বারা এ কার্য সংঘটিত হলে তাকে বলা হবে—“আল্লাহ স্বয়ং তোমার এ কাজের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।”<sup>১</sup>

أَرْثَاءِ الْأَنْتِقَاءِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْتِقَاءٍ  
অর্থাতে অন্তিকামী ও আল্লাহ উচ্চ ও অন্তিকামী। কেউ তাঁকে তাঁর কাজে বাধা দিতে পারে না। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাইলে কে এমন আছে যে, তাঁর এ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেঁ। সারা জগত তাঁরই সৃষ্টি। সুতরাং এখানে হকুম শুধু তাঁরই চলবে। বিরুদ্ধাচারীদেরকে তিনি শান্তি অবশ্যই দেবেন।

## ৯৬। তোমাদের জন্যে সামুদ্রিক

শিকার ধরা ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও মুসাফিরদের উপভোগের জন্যে, আর স্থলচর শিকার ধরা তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাক; আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর সমীক্ষে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

১. শুরাইহ (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) এবং হাসান বসরীও (রঃ) এ উক্তিই করেছেন। ইবনে জারীর (রঃ) প্রথম উক্তিটি পছন্দ করেছেন।

۹۶-أَيْلُكُمْ صِيدُ الْبَحْرِ  
وَطَعَامُهُ مَتَاعُكُمْ  
وَلِلسيَارَةِ وَحِرْمَمْ صِيد  
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حِرْمَمْ وَاتَّقُوا  
اللَّهُ الدِّيْنِ تَحْشِرُونَ

১৭। মহা সম্মানিত গৃহ কা'বাকে  
 আল্লাহ মানুষের কল্যাণ সুদৃঢ়  
 থাকার উপায় নির্ধারণ করেছেন  
 এবং সম্মানিত মাসকেও,  
 হারামে কুরবানীর জীবকেও  
 এবং সেই জীবকেও যাদের  
 গলায় নির্দশন রয়েছে; এটা  
 এ জন্যে যেন তোমরা দৃঢ়  
 বিশ্বাস রাখ যে, নিচয়ই  
 আল্লাহ আকাশসমূহ ও  
 যমীনস্থিত সব বস্তুরই খবর  
 রাখেন, আর নিচয়ই আল্লাহ  
 সর্ব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।

১৮। তোমরা জেনে রেখো যে,  
 আল্লাহ কঠোর শাস্তি ও  
 প্রদানকারী এবং অতি  
 ক্ষমাশীল।

১৯। রাসূলের দায়িত্ব শুধু  
 পৌছিয়ে দেয়া মাত্র, আর  
 তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর  
 এবং যা কিছু গোপন কর তার  
 সবকিছুই আল্লাহ জানেন।

- ১৭ - جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ  
 الْحَرَامَ قِيمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ  
 الْحَرَامَ وَالهَدَى وَالقَلَابِدَ ذَلِكَ  
 لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ  
 اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- ১৮ - أَعْلَمُوا وَانَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
 الْعَقَابِ وَانَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

- ১৯ - مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا بَلَغَ  
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا  
 تَكْتُمُونَ

আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির ব্যাখ্যায় হ্যরত ইবনে  
 আকবাস (রাঃ) এবং হ্যরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে  
 তোমাদের জন্যে সমুদ্রের তাজা বা সজীব শিকার হালাল। আর ভাবার্থ-ও-طَعَامُهُ-এর  
 ভাবার্থ হচ্ছে- যে মাছ শুকিয়ে পাথেয় তৈরী করা হয় সেটাও তোমাদের জন্যে  
 হালাল। হ্যরত ইবনে আকবাস (রাঃ) হতে আর একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা এই যে,  
 দ্বারা এই শিকারকে বুঝানো হয়েছে যা সমুদ্র হতে জীবিত অবস্থায়  
 পাওয়া গেছে। আর দ্বারা সমুদ্রের এই মৃত শিকারকে বুঝানো হয়েছে যা মৃত

অবস্থায় সমুদ্রের তীরে নিষ্কিপ্ত হয়েছে।<sup>১</sup> হ্যরত আবু বকর (রাঃ) জনগণের সামনে খুতবা দান অবস্থায় বলেনঃ “শুধু সমুদ্রের শিকারই যে তোমাদের জন্যে হালাল তা নয়, বরং সমুদ্র হতে যা নিষ্কিপ্ত হয়, সেটাও তোমাদের উপকার লাভ ও পাথেয় হিসেবে হালাল।” ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, আবদুর রহমান ইবনে আবু হুরাইরা (রাঃ) হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ সমুদ্র বহু মাছকে তীরে নিষ্কেপ করে থাকে, আমরা ওগুলো খেতে পারি কি? তিনি উত্তরে বলেনঃ “তোমারা ওগুলো খেয়ো না।” অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বাড়ী ফিরে এসে কুরআন মাজীদ হাতে নেন এবং সূরা মায়দাহ পাঠ করতে থাকেন এবং আয়াতে এসে তিনি বলেনঃ “—وَطَعَامُهُ مَتَاعَالْكُمْ وَلِلْسَيَّارَةِ— আয়াতে এসে তিনি বলেনঃ যাও, বলে দাও—তোমরা ওটা খাও, কেননা সমুদ্রের জিনিসকে আল্লাহ পাক খাবেন। ইবনে জারীরও (রঃ) একথাই বলেছেন যে, দ্বারা সমুদ্রের মৃত মৎস্যকেই বুঝানো হয়েছে।”

এখানে শব্দটি ‘সীয়ার’ শব্দের বহু বচন। ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, সমুদ্রের তীরবর্তী লোকেরা তো সামুদ্রিক টাট্কা প্রাণী শিকার করে থাকে। আর যা মরে যায় তা শুকিয়ে জমা করে রাখে। কিংবা তারা শিকার করে রেখে দেয় এবং ওটা মুসাফির ও সমুদ্রের দূরবর্তী লোকদের জন্যে পাথেয়র কাজ দেয়। জমহূর মৃত মাছ হালাল হওয়ার দলীল হিসেবে এ আয়াতটিকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিক (রঃ) হ্যরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং হ্যরত উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ)-কে ঐ দলের আমীর নিযুক্ত করা হয়। তাঁদের সংখ্যা ছিল তিনশ’। আমিও তাঁদের একজন ছিলাম। আমরা পথে থাকতেই আমাদের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে আসে। তখন হ্যরত আবু উবাইদাহ (রাঃ) সকলের পাথেয় একত্রিত করার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশক্রমে সমস্ত পাথেয় জমা করা হয়। আমাদের পাথেয় ছিল খেজুর। আমরা প্রতিদিন তা থেকে অল্প অল্প করে খেয়ে থাকি। অবশ্যে ওগুলোও শেষ হয়ে আসে এবং রসদ হিসেবে আমরা শুধুমাত্র একটি করে খেজুর পেয়ে থাকি। অবশ্যে আমরা মৃত প্রায় অবস্থায় সমুদ্র তীরে উপনীত হই এবং দেখি যে, টিলার মত একটি বিরাট মাছ পড়ে রয়েছে।

১. এরূপই হ্যরত আবু বকর (রাঃ), হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ), ইবরাহীম নাথসি (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে।

সেনাবাহিনীর সমস্ত লোক আঠার দিন পর্যন্ত ওটা ভক্ষণ করে। হ্যরত আবু উবাইদাহ (রাঃ) ওর পাঁজরের হাড় দু'টিকে কামানের মত দাঁড় করে রাখার নির্দেশ দেন। অতঃপর ওর নীচ দিয়ে একজন উদ্ধারোহী গমন করে, তথাপি ওর উপরিভাগ স্পর্শ করতে পারেনি। এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে তাখরীজ করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমে হ্যরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ সমুদ্র তীরে উঁচু টিলার মত কি একটা দেখা গেল। আমরা তখন সেখানে গিয়ে দেখি যে, একটি সামুদ্রিক জন্তু মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ওকে আমবার বলা হয়। হ্যরত আবু উবাইদাহ (রাঃ) বললেনঃ “এটা তো মৃত।” তারপর তিনি বললেনঃ “মৃত হোক! আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দৃত! আমরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছি। সুতরাং তোমরা এর গোশ্ত ভক্ষণ কর।” আমরা তথায় একমাস কাল অবস্থান করি। আমরা ছিলাম তিনশ’জন লোক। আমরা খেয়ে মোটা হয়ে গিয়েছিলাম। ওর চোখের মণি হতে ‘রাওগান’ তেল বের করে আমরা আমাদের কলসগুলো ভর্তি করেছিলাম। এতো বড় বড় টুকরা আমরা কেটেছিলাম যে, ঐগুলোকে গরু বলে মনে হচ্ছিল। ওর পাঁজরের একটি হাড় নিয়ে কামানের আকারে মাটিতে গেড়ে রেখেছিলাম। বড় বড় উট ওর মধ্য দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল। আমরা ওর অবশিষ্ট গোশ্ত শুকিয়ে পাথেয় বানিয়েছিলাম। আমরা মদীনা পৌছে যখন ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করি তখন তিনি বলেনঃ “এটা ছিল ঐ আহার্য যা আল্লাহ তোমাদের জন্যেই বের করেছিলেন। তোমাদের কাছে ওর কিছু গোশ্ত আছে কি, যা আমাকে খাওয়াতে পার?” আমরা তখন তাঁর কাছে তুহফা পাঠালাম এবং তিনি তা ভক্ষণ করলেন।

ইমাম মালিক (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা সমুদ্রে সফর করে থাকি এবং অল্প পানি সঙ্গে রাখতে পারি। যদি আমরা এ পানিতে অযু করি তবে পিপাসার্ত থেকে যাই। সুতরাং আমরা সমুদ্রের পানিতে অযু করতে পারি কি? রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ “সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং মৃত (মাছও) হালাল।”<sup>১</sup>

কোন কোন ফিকাহ শাস্ত্রবিদ এ আয়াত হতে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, সমস্ত সামুদ্রিক জীব খাওয়া যেতে পারে। কোন জীবই এর বহির্ভূত নয়। তবে কেউ কেউ ব্যাঙকে এর ব্যতিক্রম বলেছেন এবং এটা ছাড়া সবগুলোকেই হালাল বলেছেন। কেননা, ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবু দাউদ (রঃ) এবং ইমাম

১. এ হাদীসটি ইমাম মালিক (রঃ) ও আসহাবুস্সুনান বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

নাসাঈ (রঃ) আবু আবদির রহমান ইবনে উসমান তাইমী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ব্যাঙকে মেরে ফেলতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেনঃ “তার ডাক বা শব্দ হচ্ছে আল্লাহর তাসবীহ”। অন্যান্যগণ বলেন যে, মাছ খাওয়া যাবে, কিন্তু ব্যাঙ খাওয়া যাবে না। এই দু’টো ছাড়া অন্যান্যগুলোর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। স্থলভাগের যেসব জন্মুর গোশ্ত হালাল ঐগুলোর সাথে সাদৃশ্য যুক্ত সামুদ্রিক জন্মুও হালাল। পক্ষান্তরে স্থলভাগের যেসব জন্মুর গোশ্ত হালাল নয় ঐগুলোর সাথে সাদৃশ্য যুক্ত সামুদ্রিক জন্মুও হালাল নয়। এসব মতভেদ হচ্ছে ইমাম শাফিই (রঃ)-এর মাযহাবের উপর ভিত্তি করে। আর ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন যে, সমুদ্রের যে মাছ মরে যাবে সেটা খাওয়া হালাল নয়। কেননা, আল্লাহ তা’আলা<sup>حُرْمَتٌ عَلَيْكُمْ الْمِيَتَةُ</sup> বলেছেন। ইবনে মিরন্দুওয়াই (রঃ) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন—“তোমরা সমুদ্রে যা শিকার কর এবং তা জীবিত থাকার পর মারা যায় ওটা খাও। আর যে মৃত মাছকে ঢেউ বয়ে এনে তীরে ফেলে দেয় তা খেয়ো না।” আসহাবে মালিক (রঃ), শাফিই (রঃ) এবং আহমাদ ইবনে হাষল (রঃ) হতে হাদীসে আমবাবের মাধ্যমে এবং ‘সমুদ্রের পানি পবিত্র ও তার মৃতও হালাল’-এ হাদীসের মাধ্যমে জমতুর দলীল গ্রহণ করেছেন। এ জন্যে তাঁরা একুপ মাছকেও খাওয়া জায়েয় বলে থাকেন। ইমাম শাফিই (রঃ) হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমাদের জন্যে দু’টি মৃত জন্মু ও দু’টি রক্ত হালাল। মৃত জন্মু দু’টি হচ্ছে মাছ ও ফড়িং এবং দু’টি রক্ত হচ্ছে কলিজা ও প্লীহা।”

<sup>حُرْمَةٌ عَلَيْكُمْ صَبَدُ الْبَرِّ مَادِمْتُمْ حَرَمًا</sup> অর্থাৎ ইহরামের অবস্থায় তোমাদের জন্যে স্থলচর শিকার ধরা হারাম। যদি তোমরা ইচ্ছাপূর্বক এ কাজ কর তবে তোমরা গুনাহগারও হবে এবং তোমাদেরকে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। আর যদি ভুলবশতঃ কর তবে ক্ষতিপূরণ দেয়ার পর তোমরা গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে বটে, কিন্তু ঐ শিকার খাওয়া তোমাদের জন্যে হারাম হবে। কেননা, ওটা মৃতেরই অনুরূপ। ইমাম শাফিই (রঃ) ও ইমাম মালিক (রঃ)-এর একটা উক্তি ও এটাই যে, মুহরিম ও গায়ের মুহরিম সবারই জন্যে ওটা খাওয়া হারাম। সুতরাং যদি শিকারী ওর থেকে কিছু অংশ থেয়ে নেয় তবে কি তার উপর দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবেঃ এ ব্যাপারে আলেমদের দু’টি উক্তি রয়েছে। একটি উক্তি এই যে, হ্যাঁ, তার উপর দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আলেমদের একটি দলের

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), দারেকুতনী (রঃ) এবং বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মাযহাব এটাই। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তার উপর দিগ্নগ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। মালিক ইবনে আনাস (রঃ)-এর এটাই মাযহাব। আবু উমার ইবনে আবদুল বার (রঃ) বলেন যে, ব্যভিচারীর উপর হদ লাগাবার পূর্বে সে বারবার ব্যভিচার করে থাকলেও তো তার উপর একটি হদই ওয়াজিব হয়ে থাকে। জমহুরের মাযহাবও এটাই। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন যে, স্বীয় শিকারের গোশ্ত খেয়ে নিয়ে তাকে মূল্য প্রদান করতে হবে, এর চেয়ে বেশী কিছু দিতে হবে না। যদি গায়ের মুহরিম শিকার করার পর মুহরিমের নিকট হাদীয়া পাঠায় তবে কারও কারও মতে ওটা মুহরিমের জন্যে সাধারণভাবেই জায়েয। সে তারই জন্যে শিকার করে থাক আর না থাক এ দু'য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, হ্যরত আবু লুরাইরা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, গায়ের মুহরিম ব্যক্তি যে শিকার করে থাকে, মুহরিম ব্যক্তি ওর গোশ্ত খেতে পারে কি? তখন তিনি ফতওয়া দেন যে, হ্যাঁ, খেতে পারে। তারপর তিনি হ্যরত উমার (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে ওটা অবহিত করেন। তখন হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “যদি তুমি এর বিপরীত ফতওয়া দিতে তবে আমি তোমাকে শাস্তি দিতাম।” কিন্তু অন্যান্য আলেমগণ এ গোশ্ত ভক্ষণ করা মুহরিমের জন্যে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বলেন। কেননা, **حَرَمٌ عَلَيْكُمْ**-এ আয়াতটি **عَامِ** বা সাধারণ। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মুহরিমের জন্যে শিকারের গোশ্ত ভক্ষণ পছন্দ করতেন এবং বলতেন যে, ওটা **وَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ صَدِيدُ الْبَرِّ مَادَمْتَ حَرَمًا** বা সন্দেহযুক্ত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা<sup>۱</sup> মুহরিমের জন্যে শিকারের গোশ্ত ভক্ষণ মাকরহ বা অপছন্দনীয় মনে করতেন।<sup>১</sup> হ্যরত আলীও (রাঃ) সর্বাবস্থায় মুহরিমের জন্যে শিকারের গোশ্ত ভক্ষণ মাকরহ জানতেন। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিউদ্দিন (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং জমহুর বলেন যে, গায়ের মুহরিম যদি মুহরিমের উদ্দেশ্যে শিকার করে তবে মুহরিমের জন্যে তা খাওয়া জায়েয নয়। কেননা, সা'ব ইবনে জাসামাহ (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী (সঃ)-কে একটি বন্য গাধা হাদিয়া দেন, কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দেন। অতঃপর তিনি তাঁর চেহারায় অস্ত্রুষ্টির ভাব লক্ষ্য করে বলেনঃ “আমি ওটা ফিরিয়ে দিয়েছি একমাত্র এই কারণে যে, আমি ইহরামের অবস্থায় রয়েছি।”<sup>২</sup> এর কারণ ছিল এই যে,

১. তাউস (রঃ) ও জাবির ইবনে যায়েদও (রঃ) এরপই মনে করতেন এবং সাওরীও ঐদিকেই গিয়েছেন।

২. এ হাদীসটি বহু শব্দে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ধারণায় এই শিকার তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল। সেই জন্যেই তিনি তা ফেরত দিয়েছিলেন। সুতরাং যদি কোন শিকার মুহরিমের উদ্দেশ্যে করা না হয় তবে মুহরিমের জন্যে ওটা খাওয়া জায়ে হবে। কেননা, আবু কাতাদা (রাঃ)-এর হাদীসে রয়েছে যে, তিনি একটি বন্য গাধা শিকার করেছিলেন। সেই সময় তিনি মুহরিম ছিলেন না। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা মুহরিম ছিলেন। তাই তাঁরা ওটা ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকলেন। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ “তোমাদের কেউ কি শিকারীকে শিকার দেখিয়ে দিয়েছিল বা শিকারকে হত্যা করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছিল?” সাহাবীগণ উত্তরে বললেনঃ “না।” তখন তিনি বললেনঃ “তাহলে তোমরা খাও।” আর স্বয়ং তিনিও খেলেন। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও বহু শব্দে বর্ণিত আছে।

**১০০। তুমি বলে দাও-** পবিত্র ও  
অপবিত্র সমান নয়, যদিও  
অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে  
বিস্থিত করে, অতএব হে  
জ্ঞানীগণ! আল্লাহকে ভয়  
করতে থাক যেন তোমরা (পূর্ণ)  
সফলকাম হও।

**১০১। হে মুমিনগণ!** তোমরা এমন  
সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না  
যে, যদি তা তোমাদের নিকট  
প্রকাশ করে দেয়া হয়, তবে  
তোমাদের বিরক্তির কারণ হবে,  
আর যদি তোমরা কুরআন  
অবর্তীর্ণ হওয়ার সময় উক্ত  
বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস  
কর, তবে তোমাদের জন্যে  
প্রকাশ করে দেয়া হবে,  
অতীতের জিজ্ঞাসাবাদ আল্লাহ  
ক্ষমা করে দিয়েছেন; বক্তুতঃ  
আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল,  
অতিশয় সহিষ্ণু।

١٠٠ - قل لَا يَسْتُوِي الْخَبِيتُ

وَالْطَّيْبُ لِوَاعْجَبَكَ كَثِيرٌ  
الْخَبِيتُ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا وَلِيَ

الْأَلْبَابِ لَعْلَكُمْ تَفْلِحُونَ

١٠١ - يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا

لَا تَسْتَأْلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنَّ

تَبْدِلُكُمْ تَسْؤُمُكُمْ وَإِنْ تَسْتَأْلُوا

عَنْهَا حِينَ يَنْزَلُ الْقُرْآنَ

تَبْدِلُكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ

غَفُورٌ حَلِيمٌ

১০২। একুণ্ড বিষয় তোমাদের  
পূর্বে অন্যান্য লোকেরাও  
জিজ্ঞেস করেছিল, অতঃপর ঐ  
সব বিষয়ের হক তারা আদায়  
করেনি।

— ১. ২ —  
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ  
وَمَنْ أَصْبَحَوْا بِهَا كَفِيرِينَ ॥

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সঃ)-কে বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি  
মানুষকে বলে দাও-হে মানবমণ্ডলী! অপবিত্র বস্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল মনে  
হলেও পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমান নয়। তোমরা জেনে রেখো যে, উপকারী  
পবিত্র জিনিস অল্প হলেও তা সেই অধিক হারাম বস্তু হতে উত্তম যা তোমাদের  
ক্ষতি সাধন করে থাকে।<sup>১</sup> যেমন হাদীসে রয়েছেঃ “অল্প ও প্রয়োজনের পৃষ্ঠে  
যথেষ্ট জিনিস সেই অধিক জিনিস হতে উত্তম যা মানুষকে আল্লাহর শ্ররণ হতে  
গাফেল ও উদাসীন রাখে।” হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে,  
সা'লাবা ইবনে হাতিব আনসারী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল  
(সঃ)! আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাকে প্রচুর মাল দান করেন।  
তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “যে অল্প মালের তুমি শুকরিয়া আদায় করে  
থাক তা ঐ প্রচুর মাল হতে উত্তম যার উপর তুমি শুকরিয়া আদায় কর না।”  
তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا وَلِيَ الْأَلَبِ ॥ অর্থাৎ “হে জ্ঞানী লোকেরা!  
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, হারাম থেকে দূরে থাক এবং হালালের উপরেই তুষ্ট  
থাক, তাহলে, তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হতে পারবে।”

মহান আল্লাহ এরপর বলেনঃ হে মুমিনগণ! তোমরা এমন সব বিষয় সম্পর্কে  
জিজ্ঞেস করো না যে, যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হয় তবে  
তোমাদের বিরক্তির কারণ হবে। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর মুমিন  
বান্দাদেরকে ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে অপকারী ও ক্ষতিকর প্রশ্ন  
জিজ্ঞেস করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কেননা, যদি ঐ বিষয়গুলো  
প্রকাশ করে দেয়া হয় তবে তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবে। যেমন হাদীসে এসেছে

১. ওয়াহেনী তাখরীজ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদ হারাম হওয়ার বর্ণনা দিলেন  
তখন একজন বেদুইন বললোঃ ‘আমি মদের ব্যবসা করতাম। তা থেকে অমি কিছু পৃথক  
করে রেখেছি। সেটা যদি আমি আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করি তবে তাতে কোন  
উপকার হবে কি?’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ ‘আল্লাহ পবিত্র ছাড়া কিছু গ্রহণ  
করেন না।’ তারই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক قل لَا يَسْتَعْنِي -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন,  
যেমন ‘লুবাব’ গ্রন্থে রয়েছে।

যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কেউ যেন আমার কাছে কারও কোন সংবাদ নিয়ে না আসে। আমি চাই যে, আমি তোমাদের সামনে বেরিয়ে আসি এবং তোমাদের সম্পর্কে আমার অন্তর সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার থাকে।” সহীহ বুখারীতে হ্যরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা এমন এক খুতবা দেন যা আমি ওর পূর্বে কখনও শুনিনি। এই খুত্বায় তিনি বলেনঃ “আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা হাসতে খুব কম এবং কাঁদতে খুব বেশী।” একথা শুনে সাহাবীগণ মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করেন। একটি লোক জিজ্ঞেস করেঃ “আমার পিতা কে ছিলেন?” তিনি উত্তরে বলেনঃ *أَشْبَأَ لَعْنَتُهُ عَلَيْهِ* -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বাইরে বের হন। সে সময় ক্রোধে তাঁর চেহারা মোবারক রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল। এই অবস্থায় তিনি মিস্ত্রে উপবেশন করেন। একটি লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন— আমার (মৃত) পিতা কোথায় আছে? তিনি উত্তরে বলেনঃ “জাহান্নামে।” আর একটি লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে— আমার পিতা কে? তিনি বলেনঃ “তোমার পিতা হচ্ছে আবু হ্যাফাত।” তখন হ্যরত উমার (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ “আমরা এতেই সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ আমাদের প্রভু, ইসলাম আমাদের ধর্ম, মুহাম্মাদ (সঃ) আমাদের নবী এবং কুরআন আমাদের ইমাম। হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সবেমাত্র আমরা অজ্ঞতা ও শিরকের যুগ অতিক্রম করেছি। আমাদের মৃত বাপ-দাদারা কোথায় আছে তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।” এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ক্রেতে প্রশংসিত হয় এবং সেই সময় *يَا بِنِي إِيمَانِكُمْ* -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সহীহ বুখারীতে হ্যরত ইবনে আবুস রাবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে (মাঝে মাঝে) কৌতুক করেও এসব কথা জিজ্ঞেস করতো। কেউ বলতোঃ “আমার পিতা কে?” আবার কেউ বলতোঃ “আমার হারানো উটনিটি কোথায় আছে?” তখন তাদেরকে এসব প্রশ্ন করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা’আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইমাম আহমাদ (রঃ) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা কতই না উত্তম! তা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে বলেনঃ “তোমাদের কেউ যেন কারও কোন কথা আমার নিকট না পৌছায়। কারণ আমি তোমাদের সামনে সরলমনা রূপে বের হওয়া পছন্দ করি (অর্থাৎ তোমাদের কোন দোষ আমার কাছে ধরা না পড়ুক এটাই আমি ভালবাসি)।”

*وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يَنْزَلُ الْقُرْآنَ تَبْدِلُكُمْ* অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় যদি তোমরা এমন কিছু জিজ্ঞেস কর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা

হয়েছে, তবে আল্লাহ ওটা তোমাদের জন্যে বর্ণনা করে দেবেন, তখন তোমরা কি করবে? আর ওটা আল্লাহর নিকট খুবই সহজ। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন ﴿عَنْهُ أَرْثَارٍ﴾ অর্থাৎ পূর্বে তোমাদের দ্বারা যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তা তিনি ক্ষমা করে দেবেন। কেননা, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু। কাজেই তোমরা নতুনভাবে কোন কিছু প্রশ্ন করো না। নতুবা এই প্রশ্নের উত্তরে তোমাদের উপর কাঠিন্য ও সংকীর্ণতা নেমে আসবে। আবার ওটা হবে নিজের হাতে বিপদ ডেকে আনা। হাদীসে এসেছে যে, মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার প্রশ্ন করার ফলে একটা হালাল জিনিস হারাম হয়ে গেছে এবং জনগণের উপর সংকীর্ণতা নেমে এসেছে। হ্যাঁ, তবে যদি কুরআনের কোন কথা সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে তোমাদের বোধগম্য না হয় এবং তোমরা তা বুঝবার প্রয়োজনীতা অনুভব কর তাহলে জিজ্ঞেস কর, আমি বর্ণনা করে দেবো। কেননা, হুকুম পালনের জন্যে তোমাদের ওটা জানবার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু যদি তাঁর কিতাবে কোনটার উল্লেখ না থাকে তবে সেটা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা ঐ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে নীরব থাক, যেমন তিনি (আল্লাহ) ওটা বর্ণনা না করে নীরব রয়েছেন। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আমি যা বর্ণনা করিনি তা অবতীর্ণ অবস্থাতেই থাকতে দাও। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী উদ্ধতেরা অধিক প্রশ্ন করা ও তাদের নবীদের হুকুমের ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।’ সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আল্লাহ যেগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলো অতিক্রম করো না, কতগুলো জিনিস তিনি হারাম করেছেন, সেগুলো হালাল মনে করো না এবং তোমাদের উপর দয়াপরবশ হয়ে কতগুলো বিষয়ে ইচ্ছাপূর্বক তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সুতরাং সেসব বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন উত্থাপন করো না।’

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بَهَا كُفَّارِينَ﴾ অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ নিষেধকৃত মাসআলাগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, তখন তাদেরকে জবাব দেয়া হলে তারা ওগুলোর উপর ঈমান আনেনি, বরং প্রত্যাখ্যান করেছিল। কারণ, তারা হিদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেনি, বরং বিদ্রূপ ও হঠকারিতা করেই প্রশ্ন করেছিল। হ্যরত ইবনে আবুবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণের মধ্যে ঘোষণা করেন- “হে আমার কওম! তোমাদের উপর হজ্ঞ ফরয করা হয়েছে।” তখন বানী আসাদ গোত্রের একটি লোক দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো-হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! প্রত্যেক বছরেই কি (হজ্ঞ করা ফরয করা হয়েছে)। এ কথা শুনে

রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভীষণ রাগাবিত হন এবং বলেনঃ “যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আমি যদি হঁয়া বলি তবে অবশ্যই তা (প্রতি বছরেই) ফরয হয়ে যাবে। আর তা যদি (প্রত্যেক বছরের জন্মেই) ওয়াজিব হয়ে যায় তবে তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবে না এবং কুফরী করবে। সুতরাং আমি তোমাদের জন্মে যা বর্ণনা করতে ছেড়ে দেই তা তোমরা ছেড়ে দাও। যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু করার আদেশ করি তোমরা তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাক।” তখন আল্লাহ তা'আলা এ কথার সমর্থনে এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “**‘خُسْتَانَرَا** যেমন সওয়াল করেছিল তোমরা ঐ ঝুপ সওয়াল করা থেকে বিরত থাক। তারা খাদ্য যাঞ্চা করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কুফরী করেছিল, মায়দাহ বা আকাশ থেকে অবতীর্ণ খাদ্যের মর্যাদা দেয়নি। তোমরা নিজেরা প্রশ্ন না করে স্বয়ং আমার বলে দেয়ার অপেক্ষা কর। তোমাদের প্রশ্ন ছাড়াই প্রশ্নের ব্যাখ্যায় কুরআনে আয়াত নাফিল হয়ে যাবে।’”

হ্যরত ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, তারা মু'জিয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতো যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বাগ-বাগিচা ও নদ-নদী যাঞ্চা করতো এবং বলতোঃ ‘সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়কে আমাদের জন্মে সোনা বানিয়ে দিন।’ যেমন ইয়াহুদীরা হ্যরত মুসা (আঃ)-কে বলেছিল- “হে মুসা (আঃ)! আমাদের উপর আকাশ হতে ন্যিতাব অবতীর্ণ করুন।” আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ **وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرِسِّلَ بِالْأَيْتِ** অর্থাৎ “যখনই আমি তাদের চাওয়া অনুযায়ী মু'জিয়া পাঠিয়েছি তখন পূর্ববর্তী লোকেরা মিথ্যা প্রতিপন্থ করেছে।” (১৭: ৫৯) আল্লাহ পাক আরও বলেনঃ “তারা কসম খেয়ে খেয়ে বলে যে, যদি তাদের কাছে মু'জিয়া এসে যায় তবে অবশ্যই তারা ঈমান আনবে। (হে নবী সঃ) তুমি বলে দাও যে, মু'জিয়াসমূহ আল্লাহর কাছেই রয়েছে, তোমরা বুঝছনা যে, মু'জিয়া তাদের কাছে আসলেও তারা ঈমান আনবে না।”

### ১০৩। আল্লাহ না বাহীরার প্রচলন

করেছেন, না সায়েবার, না ওয়াসীলার এবং না হামীর;  
কিন্তু যারা কাফির তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে,  
আর অধিকাংশই (ধর্ম) জ্ঞান রাখে না।

١٠٣ - **مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بِحِيرَةٍ**  
**وَلَا سَابِقَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ**  
**وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ**  
**عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَأَكْثَرُهُمْ**  
**لَا يَعْقِلُونَ**

১০৪। আর যখন তাদেরকে বলা  
হয়, আল্লাহর অবতারিত  
বিধানসমূহের দিকে আস এবং  
আস রাসূলের দিকে, তখন  
তারা বলে- আমাদের জন্যে  
ওটাই যথেষ্ট যার উপর  
নিজেদের পূর্বপুরুষদেরকে  
পেয়েছি; যদিও তাদের  
পূর্বপুরুষরা না কোন জ্ঞান  
রাখতো, আর না হেদায়েত  
প্রাপ্ত ছিল; তবুও কি (ওটা  
তাদের জন্যে যথেষ্ট হবে)?

٤- ١٠٤- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا  
إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَالِّي  
رَسُولٍ قَالُوا حَسْبُنَا  
مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ إِبَاءُنَا أَوْلَوْ  
كَانَ أَبْأُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا  
وَلَا يَهْتَدُونَ

ইমাম বুখারী (রঃ) ইবনে শিহাব (রঃ) ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ)-এর  
মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, ‘বাহীরা’ ঐ জন্মকে বলা হতো যার দুধ মানুষ দোহন  
করতো না এবং বলতো যে, এটা প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। ওর দুধ  
কেউ পানও করতো না। ‘সায়েবা’ ঐ জন্মকে বলা হতো যাকে মৃত্তির নামে ছেড়ে  
দেয়া হতো। না ওর উপর কোন বোঝা চাপানো হতো, না ওকে সোয়ারী রূপে  
ব্যবহার করা হতো। হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)  
বলেছেন- “আমি আমর ইবনে খুঙাঙ্কে দেখেছি যে, তাকে পেটের ভরে টেনে  
হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সেই সর্বপ্রথম জন্মকে মৃত্তির নামে ছেড়ে  
দেয়ার প্রথা চালু করেছিল।” ‘ওয়াসিলা’ ঐ উন্নীকে বলা হতো যা প্রথমবার  
একটা নর বাচ্চা প্রসব করতো, তারপর পর্যায়ক্রমে দু’টো মাদী বাচ্চা প্রসব  
করতো। ঐ ধরনের উন্নীকে প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হতো। আর ‘হামী’ ঐ  
ঘাড় উটকে বলা হতো যার নসলে কয়েকটা বাচ্চা জন্মলাভ করার পর যখন ওর  
নসল খুব বৃদ্ধি পেতো তখন ওর দ্বারা বোঝা বহনের কাজ করা হতো না এবং  
ওকে সওয়ারী হিসেবেও ব্যবহার করা হতো না, বরং মৃত্তির নামে ছেড়ে দেয়া  
হতো। আর ওর নাম তারা ‘হামী’ রাখতো।

ইমাম বুখারী (রঃ) যুহরী (রঃ), উরওয়া (রঃ) এবং হ্যরত আয়েশা  
(রাঃ)-এর মাধ্যম দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- “আমি  
জাহান্নামকে দেখেছি যে, এক আগুন অন্য আগুনকে খেতে আছে, আর আমরকে  
ওর মধ্যে হেঁড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই সর্বপ্রথম ‘সায়েবা’র প্রথা চালু

করেছিল।” ইমাম আহমাদ (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম সায়েবার প্রথা চালু করেছিল এবং প্রতিমা পূজায় লিঙ্গ হয়েছিল। সে হচ্ছে আবু খুয়াআ আমর ইবনে আমির। আমি তাকে পেটের ভরে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার অবস্থায় জাহানামে নিষ্কিপ্ত হতে দেখেছি।” আবদুর রায়যাক (রাঃ) যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “সর্বপ্রথম সায়েবার প্রথা কে চালু করেছিল এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মকে পরিবর্তন করেছিল তা আমি জানি।” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সে কে?” তিনি উভয়ের বললেনঃ “সে ছিল বানু কাব গোত্রের আমর ইবনে লুহাই। আমি দেখেছি যে, তাকে টেনে হেঁচড়ে জাহানামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তার দুর্গম্ভ অনান্য জাহানামবাসীদেরকে কষ্ট দিচ্ছে।” ‘বাহীরা’ বিদআতের আবিষ্কারক কে তাও আমি জানি।” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সে কে?” তিনি জবাব দিলেনঃ সে ছিল বানু মুদলাজ গোত্রের একটি লোক। তার দু'টি উষ্ট্রী ছিল। সে ঐ উষ্ট্রী দু'টির কান কেটে দিয়েছিল। প্রথমে সে ঐ উষ্ট্রী দু'টির দুধ পান নিজের উপর হারাম করেছিল। কিন্তু কিছুদিন পর দুধ পান করতে শুরু করে। আমি তাকে জাহানামে দেখেছি। উষ্ট্রী দু'টি তাকে তাদের মুখ দ্বারা কর্তন করতে রয়েছে এবং খুর দ্বারা দলিত করতে আছে। সেই হচ্ছে লুহাই ইবনে কামআর পুত্র। সে খুয়াআর নেতৃস্থানীয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জুরহুম গোত্রের পরে কা'বার মুতাওয়ালী তারাই হয়েছিল। তারাই সর্বপ্রথম দ্বীনে ইবরাহীম (আঃ)-এর পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। হেজায়ে তারাই প্রতিমাপূজার সূচনা করেছিল। জনগণকে প্রতিমাপূজার দিকে ও ওদের নৈকট্য লাভের দিকে আহ্বানকারী তারাই ছিল। জন্মসমূহের ব্যাপারে অজ্ঞতার যুগে সর্বপ্রথম হেজায়ে বিদআতের প্রচলনকারী ছিল তারাই। যেমন মহান আল্লাহ সূরায়ে আনআমে এর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

وَجَعْلُوا لِلّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرِثِ وَالْأَنْعَامَ نَصِيبًا

অর্থাৎ “ক্ষেতে উৎপাদিত শস্যের বা চতুর্পদ জন্মের মাত্র একটা অংশ তারা আল্লাহর নামে মনে করতো এবং অবশিষ্টগুলো প্রতিমার নামে মনে করতো।” (৬ঃ ১৩৭)

‘বাহীরা’ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা ঐ উষ্ট্রী যে পাঁচবার বাচ্চা প্রসব করেছে। পঞ্চমবার সে নর বাচ্চা প্রসব করলে তারা তাকে যবেহ করতো। অতঃপর পুরুষ লোকেরা ওর গোশ্ত ভক্ষণ করতো, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা ওর গোশ্ত খেতো না। আর ওটা মাদী বাচ্চা প্রসব করলে তারা ওর

কান কেটে নিতো এবং বলতো, “এটা হচ্ছে বাহীরা।” সুন্দী (রঃ) এবং অন্যান্যগণ প্রায় একুপই বর্ণনা করেছেন। ‘সায়েবা’ সম্পর্কে মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ওটা ঐ প্রকারের বকরী যে প্রকারের সংজ্ঞা ‘বাহীরা’ সম্পর্কে দেয়া হয়েছে। পার্থক্য শুধু এই যে, যখন ওটা ছ’বার বাচ্চা প্রসব করতো তখন পর্যন্ত ওর অবস্থা একইরূপ থাকতো। অতঃপর ওটা একটি বা দু’টি নর বাচ্চা প্রসব করতো তখন তারা ওকে যবেহ করতো এবং পুরুষ লোকেরাই শুধু ওর গোশ্ত ভক্ষণ করতো, স্ত্রীলোকেরা ভক্ষণ করতো না। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, ‘সায়েবা’ ঐ উন্নীকে বলা হতো যে, যখন সে পর্যায়ক্রমে দশটি মাদী বাচ্চা প্রসব করতো তখন তাকে মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হতো। তাকে সওয়ারী রূপে ব্যবহার করা হতো না, তার লোম কাটা হতো না এবং তার দুধও দোহন করা হতো না। কিন্তু অতিথি আসলে তাকে ঐ উন্নীর দুঃখ পান করানো যেতো। আবু রাওক (রঃ) বলেন যে, ‘সায়েবা’ ঐ উন্নী বা ছাগল ইত্যাদিকে বলা হতো যে, মানুষ যখন কোন কাজে বের হতো এবং ঐ কাজ সমাধা হয়ে যেতো তখন ঐ জঙ্গুকে ‘সায়েবা’ বানানো হতো এবং মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হতো, ওর বাচ্চাগুলোকে মূর্তির নামে উৎসর্গীকৃত মনে করা হতো। সুন্দী (রঃ) বলেন যে, “কোন লোক যখন কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বের হতো, কিংবা রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করতো, অথবা তার মালধন অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেতো, তখন সে নিজের কিছু মাল প্রতিমার নামে উৎসর্গ করতো। এই মালে বা জঙ্গুতে কেউ কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হতো।

‘ওয়াসীলা’ সম্পর্কে হযরত ইবনে আবুবাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা ছিল ঐ ছাগী, যে সাতবার বাচ্চা প্রসব করতো এবং সগুমবারে সে মৃত নর বাচ্চা প্রসব করলে ঐ বকরীর গোশ্তে শুধু পুরুষেরাই শরীক হতে পারতো, স্ত্রীলোকেরা শরীক হতে পারতো না। কিন্তু সগুমবারে ঐ বকরীটি মাদী বাচ্চা প্রসব করলে ওকে তারা জীবিতাবস্থাতেই রাখতো। আর একই সাথে নর ও মাদী বাচ্চা প্রসব করলে দু’টোকেই জীবিতাবস্থায় ছেড়ে দেয়া হতো এবং তারা বলতো—মাদীটি নরটিকেও ওয়াসীলা বানিয়ে দিয়েছে। এখন এটাও আমাদের জন্যে হারাম। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, ‘ওয়াসীলা’ ঐ বকরীকে বলা হতো যা পাঁচবারে দশটি মাদী বাচ্চা প্রসব করতো অর্থাৎ প্রতিবার দু’টি করে মাদী বাচ্চা প্রসব করতো। প্রতিবারের বাচ্চাদ্বয়কে ‘ওয়াসীলা’ রূপে ছেড়ে দেয়া হতো। এরপর নর অথবা মাদী যে বাচ্চাই প্রসব করুক না কেন, শুধু পুরুষদেরকেই ওর হকদার মনে করা হতো, স্ত্রীদেরকে নয়। কিন্তু মৃত বাচ্চা প্রসব করলে পুরুষলোক ও স্ত্রীলোক সবাই অংশীদার হতো।

‘হামী’ সম্পর্কে হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কোন নরের মাধ্যমে দশটি বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলে তাকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হতো এবং ওটাকেই ‘হামী’ বলা হতো। ওর উপর বোৰা চাপানো হতো না এবং ওর লোম কাটা হতো না। যে কোন লোকের ক্ষেত্রে ফসল সে খেতে পারতো এবং যে কোন প্রস্তুবণ থেকে ঐ জন্মগ্রহণ পান করতে পারতো। কেউই ওকে বাধা দিতো না। এ আয়াতের তাফসীরে এগুলো ছাড়া অন্য কিছুও বলা হয়েছে। মহান আল্লাহর-

وَلِكُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔

এ কথার ভাবার্থ এই যে, কাফিররা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে থাকে। আল্লাহ এগুলোকে শরীয়তের কাজরূপে নির্ধারণ করেননি এবং এগুলো তাঁর নৈকট্য লাভের উপায়ও নয়। এটা মুশুরিকদের আল্লাহ পাকের উপর মিথ্যারোপ ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা নিজেরাই এগুলোকে শরীয়তের পালনীয় কাজ বলে বরণ করে নিয়েছে। আর ওটাকেই তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করেছে। অথচ ওটা কখনও তাঁর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হতে পারে না। বরং তাদেরকে তাদের এ কৃতকর্মের “শাস্তি” ভোগ করতে হবে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَرْثَاثٍ يَخْنَمُونَ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

আল্লাহর অঙ্গীর দিকে ও তাঁর রাসূলের দিকে এসো, তখন তারা বলে—আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতি নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছি, এটাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তারা কি এটা বুঝে না যে, তাদের পূর্বপুরুষরাও বাতিল ও মিথ্যা রীতিনীতির উপর থাকতে পারে? তারাও হক ও সত্য থেকে দূরে ও হিদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে? সুতরাং কিরূপে তোমরা তাদের অনুসরণ করতে পারে? সত্য ব্যাপার এটাই যে, একমাত্র ভ্রান্ত ও মূর্খ লোকেরাই এরূপ মন্তব্য করতে পারে।

১০৫। হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের (সংশোধন করার) চিন্তা কর, যখন তোমরা ধীনের পথে চলছো, তখন কেউ পথভ্রষ্ট হলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই; তোমরা সবাই আল্লাহরই সমীক্ষে প্রত্যাবর্তিত হবে, অতঃপর তোমরা যা কিছু করছিলে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

۱۰۵-يَا يَاهُوَ سَادَ الذِّينَ امْنَوْا  
عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَضْرُوكُمْ  
مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدِيْتُمْ إِلَى اللَّهِ  
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِي نِبْئِكُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় এবং সৎকার্য সম্পাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আর তিনি তাদেরকে এ সংবাদও দিচ্ছেন যে, যারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, দুনিয়ার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সবাই ঝগড়া ফাসাদে লিঙ্গ হলেও তাদের কোনই ক্ষতি হবে না। এ আয়াতের তাফসীরে হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যখন বান্দা হারাম ও হালালের ব্যাপারে আমার নির্দেশ মেনে চলবে তখন যে যতই পথভ্রষ্ট হয়ে যাক না কেন তার কোনই ক্ষতি হবে না। তোমাদের সকলকেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃত ভাল ও মন্দ সম্পর্কে অবহিত করবেন। যার কাজ ভাল হবে তাকে ভাল বিনিময় প্রদান করা হবে এবং যার কাজ মন্দ হবে তাকে মন্দ বিনিময় দেয়া হবে। এ আয়াত দ্বারা এ দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে না যে, ভাল কাজের আদেশ প্রদান ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করণ জরুরী নয়। হ্যরত আবু বকর সিন্দীক (রাঃ) একদা দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর বলেনঃ হে লোক সকল! তোমরা এ আয়াতটি পাঠ কর বটে, কিন্তু উটাকে ওর নিজ স্থানে রাখছো না। আমি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে বলতে শুনেছি-‘মানুষ যখন কোন পাপের কাজ দেখে, অতঃপর ওর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করতঃ তার মধ্যে ক্রোধের সংঘার না হয়, তখন হতে বিশ্বয়ের কিছুই নেই যে, মহা প্রতাপার্থিত আল্লাহ সাধারণভাবে শাস্তি আনয়ন করবেন (সবাই সেই শাস্তির শিকার হবে)।’<sup>১</sup> ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) আবু উমাইয়া শাবানী (রঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি আবু সালাবা খুশানী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ আয়াতের কি ভাবার্থ গ্রহণ করে থাকেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ কোন আয়াত? আমি বললাম,

يَا يَاهَا الَّذِينَ امْنَأُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا هَتَدِيتُمْ

এ আয়াতটি। তিনি বললেনঃ আল্লাহর শপথ! এ সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিকেই আপনি জিজ্ঞেস করেছেন। আমি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ ‘তোমরা নিজ নিজ পাগড়ি সামলিয়ে নেয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থেকো না। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করণের কাজ অব্যাহত রাখো। তোমাদেরকে এ কাজ ঐ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে যে পর্যন্ত মানুষ সংকীর্ণমনা ও নিরুৎসাহী থাকে, যাকাত প্রদান না করে, কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়, প্রত্যেকে নিজ নিজ মতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং কোন উপদেষ্টার উপদেশবাণী শ্রবণ না করে। যখন অবস্থা এক্ষেপ হবে, এ সময় তাদের থেকে পৃথক থাকবে।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), আসহাবুস সুনান এবং ইবনে মাজা (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তাদেরকে তাদের নিজেদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেবে। তোমাদের পরেই এমন এক যুগ আসবে যে, তাতে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা ব্যক্তি হাতে আগুন ধরে রাখার মত বিপদে পতিত হবে। ঐ সময় যে ব্যক্তি শুধু নিজেই ভাল কাজ করবে সে পঞ্চশজন লোকের নেক আমলের সমান পুণ্য লাভ করবে। জিজ্ঞেস করা হলোঃ আমাদের পঞ্চশজন লোকের, না সেই দলের পঞ্চশজন লোকের? তিনি উভয়ে বললেনঃ ‘না, না বরং তোমাদের মধ্যকার পঞ্চশজন লোকের পুণ্যের সমান (সে পুণ্য লাভ করবে)।’

ইমাম রায়ী (রঃ) আবুল আলিয়া (রঃ) ও হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মাধ্যমে -**يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضْرُكُمْ مَنْ ضَلَّ**- এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট লোকেরা বসেছিল, এমন সময় কোন দু'টি লোকের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। তখন উপস্থিত জনতার মধ্য হতে একটি লোক বলেঃ আমি উঠে গিয়ে এদের দু'জনের মধ্যে (একটা সমবোতা করে দেয়ার মানসে) ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার ব্রত পালন করবো। তার এ কথা শুনে তার পার্শ্ববর্তী একটি লোক বললোঃ তুমি স্ব-স্থানে বসে থাক। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। তার একথা শুনে হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ ‘তাকে বাধা দিয়ো না। এ আয়াতের উপর আমল করার স্থান এটা নয়। কুরআন যখন অবর্তীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল তখন অবর্তীর্ণ হয়েছে। কুরআনের কতগুলো আয়াত এমন রয়েছে, যেগুলোর তা'বীল আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর যুগে হয়ে গেছে। আর কতগুলো আয়াতের তা'বীল কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিন কার্যকরী হবে। যতদিন পর্যন্ত তোমাদের মন ও অনুভূতি এক থাকবে, তোমাদের মধ্যে ভাঙ্গন না ধরবে, তোমরা একে অপরের ক্ষতি সাধন করা থেকে বিরত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে হবে। কিন্তু যখন তোমাদের মন বিগড়ে যাবে, তোমাদের একতায় ভাঙ্গন ধরবে এবং তোমরা একে অপরের শক্রতে পরিণত হয়ে যাবে, তখন তোমরা জনগণ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকবে।’ এ আয়াতের এ তাফসীরই বর্ণনা করা হয়েছে। ইবনে জারীর (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীর (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত হাসান (রঃ) এ আয়াতটি পাঠ করার পর বলেনঃ ‘আল্লাহর জন্যে সমুদয় প্রশংসা যে, অতীত যুগেও মুনাফিক ছিল এবং বর্তমান যুগেও মুনাফিক রয়েছে, কিন্তু মুসলমানরা মুনাফিকদের কাজকে সদা খারাপ মনে করে থাকে।’ হ্যরত সাইদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) বলেনঃ ‘যখন তুমি ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে তখন তুমি হিদায়াতের পথে রয়েছো বলে পথভ্রষ্ট লোকদের পথভ্রষ্টতা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।’

১০৬। হে মুমিনগণ! তোমাদের পরম্পরের (বিষয়াদির) মধ্যে দু'জন লোক ওসী থাকা সঙ্গত, যখন তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু আসল হয় (অর্থাৎ) অসিয়ত করার সময়, (এবং) এ দু'ব্যক্তি একুপ হবে যে দীনদার এবং তোমাদের মধ্য হতে অথবা ভিন্ন সম্প্রদায় হতে দু'জন হবে, যদি তোমরা সফরে থাক অতঃপর মৃত্যুর ঘটনা তোমাদের উপর উপস্থিত হয়; যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে ওসীদ্বয়কে নামাযের (জামাআতের) পর রুখে নাও, অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে-আমরা এ শপথের বিনিময়ে কোন স্বার্থ ভোগ করবো না, যদি আজীবণ হয়; আর আল্লাহর বিধানকে আমরা গোপন করবো না (যদি একুপ করি, তবে) এমতাবস্থায় আমরা ভীষণ পাপী হবো।

১০৭। অতঃপর যদি জানা যায় যে, ওসীদ্বয় কোন পাপে জড়িত হয়ে পড়েছে, তবে যাদের বিরুদ্ধে পাপে জড়িত হয়ে পড়েছিল তাদের মধ্য হতে (মৃতের) সর্বাপেক্ষা নিকটতম অপর দু'ব্যক্তি সে স্থানে দাঁড়াবে যে স্থানে

১০৬- يَا يَهُوَ إِنَّ الَّذِينَ امْنَوْا

شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ  
أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ حِينَ الْوَصِيَّةِ  
إِثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ أَخْرَى  
مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرِبُتُمْ  
فِي الْأَرْضِ فَاصَابُتُكُمْ  
مُّصِيبَةً الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا  
مِّنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فِي قِسْمَيْنِ  
بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهِ  
ثُمَّنًا وَلَوْ كَانَ ذَاقْرِبِيْ وَلَا  
نَكْتَمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا  
لِمِنَ الْأَثْمِيْنِ ○

১০৭- فَإِنْ عَثِرَ عَلَىٰ أَنْهَا  
اسْتَحْقَارًا ثُمَّا فَاخْرِنِيْ قَوْمَنِ  
مَقَامُهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحْقَ

সূরাঃ মায়িদাহ ৫

ওসীদ্বয় দাঁড়িয়ে ছিল, অতঃপর  
উভয়ে (একুপে) আল্লাহর নামে  
শপথ করে বলবে-নিশ্চয়ই  
আমাদের এ শপথ তাদের  
শপথ অপেক্ষা অধিক সত্য  
এবং আমরা বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম  
করিনি, (যদি করি, তবে)  
এমতাবস্থায় যালিমদের  
অন্তর্ভুক্ত হবো।

وَعَلَيْهِمُ الْأَوْلَيْنَ فَيُقْسِمُنَّ بِاللَّهِ  
لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ  
شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدْنَا إِنَّا  
إِذَا لَمْنَ الظَّالِمِينَ ○

১০৮। এটাই এ বিষয়ে অতীব  
সহজ পছ্টা যে তারা ঘটনা  
যথাযথভাবে প্রকাশ করে দেয়,  
অথবা এ ভয় করে যে, তারা  
শপথ গ্রহণ করার পর (পুনঃ)  
শপথগ্রহণকে ফিরানো হবে;  
আর আল্লাহকে ভয় কর এবং  
(বিধানসমূহ) শ্রবণ কর, আর  
আল্লাহ ফাসিকদেরকে পথ  
দেখাবেন না।

١٠٨ - ذلِك أدنى أن ياتوا  
بِالشَّهادَةِ عَلَى وُجُوهِهَا أَوْ  
يَخافُوا أَن تُرْدَى رُؤْسَهُمْ فَمَنْ  
يَعْلَمُ مَا بَيْنِ أَرْجُونِ  
أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمِعُوا  
عَلَيْهِمْ سَوْمَهُمْ وَرُودُهُمْ  
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ

এ আয়াতে কারীমা স্বাভাবিক হকুমের অন্তর্ভুক্ত। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি 'মানসূখ' বা রহিত হয়ে গেছে। তারকীবে নাহবীর দিক দিয়ে ইন্সান শব্দটি 'মুব্বত্ত' বা বিধেয়। আর বাক্যের মধ্যে, 'শهادة بِينَكُمْ' বা উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ বাক্যটি একপ ছিল। দ্বিতীয় শব্দটি 'شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ شَهَادَةٌ' ইন্সান মুসাফ রূপে ছিল যা লোপ করা হয়েছে এবং অর্থাৎ 'শব্দটিকেই' ওর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, একপ মনে করতে হবে। এ অবস্থায় শব্দটি 'ذَوَا عَدْلٍ' বাবের চিফত বিশেষণ হবে। কেউ কেউ বলেন যে, 'كُمْ' বুরানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, 'منَ الْمُسْلِمِينَ' দ্বারা উদ্দাই মন্তব্য। দ্বারা অসিয়ত কারীদেরকে বুরানো হয়েছে। আর 'منْ غَيْرِ كُمْ' বাবে আহলে কিতাবদেরকে বুরানো হয়েছে। অর্থাৎ অসিয়তকারীর 'الْمُسْلِمِينَ'

১. এটা বলেছেন ইবনে জারীর (রঃ)।

গোত্রের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী এবং আর দু'জন সাক্ষী হবে অন্য গোত্রের মধ্য হতে। -**صَرِيْتُمْ فِي الْأَرْضِ** এর ভাবার্থ হচ্ছে-যখন তোমরা সফরে থাকবে এবং ঐ অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যাবে তখন তোমরা মুসলমানদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখবে। আর মুসলমান পাওয়া না গেলে অমুসলিম হলেও চলবে। এখানে এ কথা বের হচ্ছে যে, সফরে অসিয়তের সময় মুসলমান বিদ্যমান না থাকলে যিন্মীদেরকে সাক্ষী বানানো যেতে পারে। শুরাইহ (রঃ) বলেন যে, সফর ও অসিয়তের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় ইয়াহুদী ও নাসারাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (রঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। আইম্মায়ে সালাসা বা ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ছাড়া বাকী তিনজন ইমাম এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন যে, কোন অবস্থাতেই মুসলিমের উপর অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) যিন্মীর উপর যিন্মীর সাক্ষ্য বৈধ বলেছেন।

ইমাম যুহরী (রঃ)-এর উক্তি নকল করে ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, বাসস্থানে বা সফরে কাফিরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়াই সুন্নাত তরীকা। সাক্ষ্য প্রদানের অধিকার শুধু মুসলমানেরই রয়েছে। ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ঐ সময় অবর্তীণ হয় যখন একটি লোক মারা গিয়েছিল এবং সেখানে সে সময় কোন মুসলমান বিদ্যমান ছিল না। ওটা ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। ঐ সময় সমস্ত শহর ছিল অমুসলিমদের দখলে এবং সব লোকই ছিল কাফির। উত্তরাধিকারের কোন নিয়ম-কানুনও তখন চালু ছিল না। ওটা অসিয়ত হিসেবে বন্টিত হতো। তারপর অসিয়ত মানসূখ হয়ে যায় এবং ফারায়েয (উত্তরাধিকারীদের অংশ) ফরয করা হয়। অতঃপর লোকেরা উত্তরাধিকারের নিয়ম-কানুনের উপর আমল করতে শুরু করে। এ বিষয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, **أَخْرَانِ مِنْ غَيْرِ كُمْ** দ্বারা দু'জন ওসীকে বুঝানো হয়েছে, কি দু'জন সাক্ষীকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, যদি লোক সফরে থাকে এবং তার সাথে মালধন থাকে, এমতাবস্থায় তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তবে মুসলমানদের মধ্যে দু'টি লোককে পেলে সে স্বীয় পরিত্যক্ত সম্পদ তাদের কাছে সমর্পণ করবে এবং দু'জন মুসলমানকে ওর উপর সাক্ষীও রাখবে। এটা ছিল ওসী নিযুক্ত করার অবস্থা। -**مِنْ غَيْرِ كُمْ** এর ভাবার্থ এই যে, এ দু'জন মুসলমান সাক্ষী নিযুক্ত হবে। আয়াতে কারীমার পূর্ব সম্পর্ক দ্বারা এটাই প্রকাশ পাচ্ছে। সুতরাং যদি এ দু'জন মুসলমানের সাথে তৃতীয় কোন মুসলমান উপস্থিত না থাকে তবে

অসিয়ত ও সাক্ষ্য এ বিশেষণও এ দু'জনের মধ্যেই একত্রিত হয়ে যাবে। যেমন তামীমুন্দারী ও আদী ইবনে বিদার কাহিনীতে সত্ত্বরই এর বর্ণনা আসছে ইনশাআল্লাহ।

**تَحِسِّنُهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ** ‘তোমরা এই দু'জনকে নামাযের পর রুখে নাও।’ ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আসর নামায বুঝানো হয়েছে। ইমাম যুহরী (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে এই দু'জন মুসলমানের মাযহাবী নামায। ভাবার্থ এই যে, এ দু'জন সাক্ষী নামাযের পর একত্রিত হবে যাতে বেশী লোকের সমাবেশে এ সাক্ষ্যদান কার্য সম্পন্ন হতে পারে। **فِي قِسْمٍ بِاللَّهِ أَرْبَتُمْ** অর্থাৎ সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্যদানের সময় আল্লাহর নামে শপথ করবে। **إِنْ ارْتَبَتْمُ** অর্থাৎ যদি আমাদের সন্দেহ হয় যে, তারা দু'জন ভুল বর্ণনা দেবে বা খিয়ানত করবে, তবে এই সাক্ষীদ্বয়কে সেই সময় আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে হবেং আমরা মিথ্যা শপথের বিনিময়ে এই নশ্বর জগতের সামান্য অর্থ উপার্জন করবো না, যদিও আমাদের এ শপথের কারণে আমাদের নিকট আঞ্চলিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। **وَلَنَكُمْ شَهَادَةُ اللَّهِ** অর্থাৎ আমরা আল্লাহর (আদিষ্ট) সাক্ষ্যকে গোপন করবো না। সাক্ষ্যদান কার্যের শুরুত্ব বুঝাবার জন্যেই সাক্ষ্যের সম্বন্ধ আল্লাহর সঙ্গে লাগানো হয়েছে।

**إِنَّا إِذَا لَمْنَ الْأَثْمَنَ** অর্থাৎ যদি আমরা সাক্ষ্য কোন প্রকার পরিবর্তন করি অথবা সম্পূর্ণরূপে তা গোপন করি তবে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

**فَإِنْ عُشَرَ عَلَىٰ أَنْهُمَا اسْتَحْقَاقًا** অর্থাৎ যদি এই দু'জন সাক্ষী ও ওসীর ব্যাপারে এটা প্রমাণিত হয় যে, তারা খিয়ানত করেছে এবং মৃত ব্যক্তির মাল উত্তরাধিকারীদের নিকট পৌছাতে গিয়ে কিছু আত্মসাঙ্কেতিক করেছে তবে যাদের প্রাপ্য নষ্ট হয়েছে তাদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী পূর্ববর্তী স্বাক্ষীদ্বয়ের স্থানে দাঁড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ যখন সঠিক সংবাদ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, পূর্ববর্তী দু'জন সাক্ষী খিয়ানত করেছে, তবে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্য হতে দু'জন অতি নিকটবর্তী উত্তরাধিকারী দাঁড়িয়ে যাবে এবং আল্লাহর নামে শপথ করে বলবেং “আমাদের সাক্ষ্য তাদের (পূর্ববর্তী সাক্ষীদ্বয়ের) সাক্ষ্যের তুলনায় বিশুদ্ধতর। তারা দু'জন বাস্তবিকই খিয়ানত করেছে এবং এ দোষারোপ করাতে আমরা মোটেই বাড়াবাড়ি করছি না। যদি আমরা মিথ্যা অপবাদ দেই তবে অবশ্যই আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।” এটা যেন উত্তরাধিকারীদের পক্ষ হতে শপথ। যেমন হত্যাকারীদের পক্ষ হতে বেঙ্গামী সাব্যস্ত হলে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা শপথ করে থাকে। এটা আহকামের বাবুল কাসামাতে স্থিরীকৃত হয়েছে।

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানী সাহম গোত্রের একটি লোক তামীমুদ্দারী ও আদী ইবনে বিদার সঙ্গে সফরে বেরিয়েছিল। অতঃপর সাহমী লোকটি এমন এক জায়গায় মৃত্যুবরণ করে যেখানে কোন মুসলমান ছিল না। যখন তারা দু'জন তার পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসে তখন সাহমীর পরিবারের লোকেরা রৌপ্য নির্মিত একটি পেয়ালা অনুপস্থিত দেখে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের দু'জনের শপথ গ্রহণ করেন। এরপর পেয়ালাটি মক্কায় পাওয়া যায়। তাদেরকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা বলেঃ ‘আমরা এটা তামীম ও আদীর নিকট হতে ক্রয় করে নিয়েছি।’ তারপর সাহমীর অভিভাবকদের মধ্য হতে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে যায় এবং শপথ করে বলেঃ ‘নিশ্চয়ই আমাদের দু'জনের শপথ এদের দু'জনের শপথ অপেক্ষা বেশী সত্য। নিশ্চয়ই পেয়ালাটি আমাদের সঙ্গীরই বটে।’ তাদের ব্যাপারেই এ আয়াতটি অবরীণ হয়।<sup>১</sup> আবু জাফর ইবনে জারীর (রঃ) শা'বী (রঃ) হতে যে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন তা এ ঘটনাটির সত্যতা প্রমাণ করে। ঘটনাটি এই যে, বিদেশে একজন মুসলমানের মৃত্যু ঘটে। ওসী নিযুক্ত করার মত কোন মুসলমান সেখানে ছিল না। তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত লোকটি আহলে কিতাবের মধ্য হতে দু'জন লোককে ওসী নিযুক্ত করে। এ লোক দু'টি কুফায় হ্যরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর নিকট হায়ির হয় এবং মৃত লোকটির পরিত্যক্ত সম্পদ তাঁর নিকট পেশ করে। এ দেখে হ্যরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেনঃ “একপই একটি ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় ঘটেছিল। এখন এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ঘটনা।” সুতরাং আসরের নামাযের পর লোক দু'টিকে শপথ করানো হয়। তারা শপথ করে বলেঃ ‘আমরা না খিয়ানত করেছি, না মিথ্যা বলছি, না কিছু আত্মসাং করেছি, বরং এটাই হচ্ছে মৃত ব্যক্তির সম্পদ।’ তখন তাদের শপথকে সত্য বলে মেনে নেয়া হয় এবং তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ীই হ্যরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) ফায়সালা করেন। নবী (সঃ)-এর যুগে ‘একপই ঘটনা’ দ্বারা তামীম ও আদীর ঘটনাকে বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে, তামীমুদ্দারী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা হচ্ছে নবম হিজরী। আর আশআরী (রাঃ) সম্পর্কীয় ঘটনাটি হচ্ছে অন্য ঘটনা। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এ আয়াতে নির্দেশ রয়েছে যে, মরণশয্যায় শায়িত ব্যক্তি দু'জন ওসী নিযুক্ত করবে এবং দু'জন মুসলমানকে সাক্ষী রাখবে। এটা হচ্ছে বাড়িতে অবস্থানরত সময়ের মাসআলা।

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) ও ইমাম আবু দাউদ (রঃ) তাখরীজ করেছেন। ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

يَا يَهُآ الَّذِينَ امْنَأُوا شَهَادَةً بِيُنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ  
ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ -

এ আয়াতের উপর ভিত্তি করেই একথা বলা হচ্ছে। আর সফরের ব্যাপারে  
বলা হয়েছে-

أَوْ أَخْرَانِ مِنْ غَيْرِ كُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابْتُكُمْ  
مُّصِبَّةُ الْمَوْتِ -

অর্থাৎ যদি তোমরা সফরে থাক এবং সেই সময় তোমাদের মৃত্যু নিকটবর্তী  
হয়, আর কোন মুসলমান সেখানে উপস্থিত না থাকে তবে সে যেন ইয়াহুদী,  
নাসারা যা মাজুসীদের মধ্যে হতে দু'জন লোককে ওসী নিযুক্ত করে এবং  
পরিত্যক্ত সম্পদ তাদের নিকট সমর্পণ করে। এখন যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসরা  
ঐ ওসীদ্বয়কে স্বীকার করে নেয় তবে তো ভালোই। নচেৎ বাদশাহৰ কাছে  
মোকাদ্দমা পেশ করতে হবে। এমতাৰঙ্গায় আল্লাহ তা'আলাৰ নির্দেশ হচ্ছে-

تَحِبُّسُ نَهْمًا مِنْ بَعْدِ الصَّلْوةِ فَيُقْسِمُ سَمَاءٌ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبَتْمُ

অর্থাৎ যদি তাদের সাক্ষ্যের সত্যতায় তোমাদের সন্দেহ হয় তবে নামাযের  
পর তাদেরকে শপথ করিয়ে নাও। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস (রাঃ)  
বলেনঃ মৃত ব্যক্তির আজীব-স্বজন স্বীকৃত সাক্ষীদ্বয়কে অস্বীকার করেছিল এবং  
তাদেরকে ভয় দেখিয়েছিল ও ধর্মকিয়ে ছিল। তখন আবু মুসা (রাঃ) ঐ  
স্বাক্ষীদ্বয়কে আসরের নামাযের পর শপথ করিয়েছিলেন। তখন আমি  
বলেছিলাম- তাদের কাছে আমাদের নামাযের মর্যাদা কি আছে? তাদেরকে তো  
তাদের নামাযের শপথ করানো উচিত। সুতরাং তারা দু'জন তাদের মাঝহাবের  
নিময় অনুযায়ী নামায পড়ার পর শপথ করে বললোঃ “আমরা সামান্য শপথের  
জন্য আমাদের কসমকে বিক্রি করবো না, নতুবা আমরা পাপী হয়ে যাবো।  
তোমাদের সঙ্গী এ অসিয়তই করেছিল এবং এটাই তার পরিত্যক্ত সম্পদ।”  
শপথ করার পূর্বে ইমাম তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন- “যদি তোমরা গোপন করে  
রাখো বা খিয়ানত কর তবে স্বীয় কওমের নিকট তোমরা অপদন্ত হবে এবং  
এরপর আর কখনও তোমাদের সাক্ষ্য কবৃল করা হবে না। আর তোমাদেরকে  
শাস্তি দেয়া হবে।”

أَرْتَبَتْمُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا  
অর্থাৎ এটাই এমন এক পক্ষ যে,  
এতে সাক্ষী ঘটনা অনুযায়ী তার সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং তার এ ভয় থাকবে যে,  
যদি সে ঘটনা অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান না করে তবে মুসলমানদের সাক্ষ্য প্রদানের  
মাধ্যমে তাদের শপথকে বাতিল করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَإِنْ عُشْرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحْقَانَا إِثْمًا فَأَخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا

অর্থাৎ যদি জানতে পারা যায় যে, তারা অবৈধ পন্থায় সত্যকে গোপন করেছে তবে তাদের স্থলে যাদের হক নষ্ট হয়েছে তাদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী দাঁড়িয়ে যাবে এবং তারা শপথ করে বলবে যে, কাফিরদের শপথ বাতিল এবং তারা বাড়াবাড়ি করছে না। এখন কাফিরদের সাক্ষ্য বাতিল করে দিয়ে মৃত ব্যক্তির অলীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। অধিকাংশ আইনায়ে তাবেস্তন, পূর্ববর্তী গুরুজন এবং ইমাম আহমাদ (রঃ) প্রমুখের এটাই মায়হাব।

أَوْ يَغْفِلُواٰ إِنْ تَرَدْ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ  
অর্থাৎ এতে বিশ্বয়ের কিছুই নেই যে, তারা আল্লাহর শপথের সম্মানার্থে এবং অপদন্ত হওয়ার ভয়ে (যে মৃতের ওয়ারিসরা তাদের কসমের মাধ্যমে তাদের কসমকে রদ করে দেবে এবং তাদেরকে শান্তিও প্রদান করা হবে) তারা সত্য কথাই বলবে।

أَتْهُوكَمْ لَهُمْ وَأَنْقُوا اللَّهُ أَرْثَارِهِمْ  
অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সমস্ত কাজে আল্লাহকে ভয় কর এবং আনুগত্য স্বীকার করে চল।

وَاللَّهُ لَا يَهِيءِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ -  
অর্থাৎ যারা আল্লাহর আনুগত্য ও শরীয়তের অনুসরণ হতে বেরিয়ে যায় তিনি তাদেরকে সুপথ লাভের তাওফীক দেন না।

১০৯। যেদিন আল্লাহ সমস্ত  
রাসূলকে সমবেত করবেন,  
অতঃপর বলবেন-তোমরা  
(উস্তদের নিকট থেকে) কি  
উক্তর পেয়েছিলে? তারা উক্তরে  
বলবে-(তাদের অন্তরের কথা)  
আমাদের কিছুই জানা নেই;  
নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত  
গোপনীয় বিষয় সম্পূর্ণ জ্ঞাত।

١٠٩- يَوْمَ يَجْمِعُ اللَّهُ الرَّسُولَ  
فَيَقُولُ مَا ذَا أَجِبْتُمْ قَالُوا  
لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَمٌ  
○ الْغَيْبِ

নবী রাসূলদেরকে যেসব কওমের নিকট পাঠানো হয়েছিল তারা তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিল কি দেয়নি সে সম্পর্কে আল্লাহ তাদেরকে কিয়ামতের দিন কিভাবে সম্বোধন করবেন তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেছেন-

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ -

ଅର୍ଥାତ୍ “ଯାଦେର କାହେ ରାସୁଲଦେର ପାଠାନୋ ହେବିଲୋ ତାଦେରକେ ଓ ଆମି ଜିଜେସ କରବୋ ଏବଂ ରାସୁଲଦେରକେ ଓ ଜିଜେସ କରବୋ ।” ଅନ୍ୟତ୍ର ବଲେନଃ

**فَوْرِيكَ لَنْسَئْلَنْهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ -**

অর্থাৎ “তোমার প্রভুর শপথ! আমি তাদের সকলকেই তাদের আমল সম্পর্কে  
অবশ্যই জিজ্ঞেস করবো।” (১৫: ৯২) রাসূলগণ উত্তরে বলেনঃ ﴿عَلَمْ لِّي أর্থাৎ  
“আমাদের কিছুই জানা নেই।” সেদিনের ভয়াবহ অবস্থা দেখেই তাঁদের এ  
উত্তর হবে। তাঁরা সেদিন ভীত-সন্ত্রস্ত হবেন বলেই তাঁদের মুখ দিয়ে কোন উত্তর  
বের হবে না। বরং বলে ফেলবেন- “আমাদের কিছুই জানা নেই।” অতঃপর  
যখন কিছুটা স্বত্ত্বির নিঃশ্঵াস ফেলবেন, তখন নিজের কওম সম্পর্কে সঠিক সাক্ষ্য  
প্রদান করবেন। কিন্তু তাদের প্রথম উক্তি এরূপই হবে- “হে আল্লাহ! আমরা তো  
এ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবো না। আপনি তো আলেমুল গায়েব। আপনার  
মোকাবিলায় আমাদের জ্ঞান থাকতে পারে?” এতে কোনই সন্দেহ নেই যে,  
অদ্বিতীয় হিসেবে এটা অতি উত্তম জবাবই বটে- ‘আপনার ব্যাপক জ্ঞানের কাছে  
আমাদের জ্ঞান অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। আমাদের’ জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে শুধুমাত্র  
বাহ্যিকের উপর। পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞান আভ্যন্তরীণ সংবাদও রাখে। কেননা,  
আপনি হচ্ছেন ‘আল্লামুল গুয়ুব’ বা অদ্বিতীয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। সুতরাং  
আমাদের উশ্মতর্বর্গ কি জবাব দিয়েছিল তা আপনি ভাল জানেন। কে যে  
কপটাতামূলক আমল করেছে এবং কে বিশ্বাসমূলক কাজ করেছে এই জ্ঞান তো  
আমাদের নেই, বরং আপনারই আছে।”

୧୧୦ । ସର୍ବ ଆନ୍ଦୋଳନ-ହେ

ଇସା ଇବନେ ମାରଇୟାମ! ଆମାର  
ଅନୁଗ୍ରହ ସ୍ଵରଣ କର ଯା ତୋମାର  
ଉପର ଓ ତୋମାର ମାୟେର ଉପର  
(ପ୍ରଦତ୍ତ) ହେଁଲେବେଳେ। ଯଥିନ ଆମି  
ତୋମାକେ ଝଞ୍ଜଲ କୁଦୁସ ଦାରା  
ସାହାଯ୍ୟ କରେଛି, (ଏବଂ) ତୁମି  
ମାନୁଷେର ସାଥେ କଥା ବଲେଛୋ  
(ମାୟେର) କୋଳେ ଏବଂ ପୌଡ଼  
ବସନ୍ତେ ଆର ଯଥିନ ଆମି  
ତୋମାକେ କିତାବସମୃଦ୍ଧ, ଜ୍ଞାନେର  
କଥା ଏବଂ ତାଓରାତ ଓ ଇଞ୍ଜୀଲ

١١- اِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرِيمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدِتَكَ اذَا يَدْتَكَ بِرُوحِ الْقَدِيسِ تَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْعَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتَكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّوْرَةَ

শিক্ষা দিয়েছি, আর যখন তুমি  
আমার আদেশে মাটি দ্বারা  
পাথির আকৃতি সদৃশ এক  
আকৃতি থস্তুত করেছিলে,  
অতঃপর তুমি ওতে ফুঁৎকার  
দিতে, যার ফলে ওটা আমার  
আদেশে পাখী হয়ে যেতো,  
আর তুমি আমার আদেশে  
জন্মান্ত্ব ও কুষ্ঠরোগী নিরাময়  
করে দিতে; আর যখন তুমি  
আমার আদেশে মৃতদেরকে  
বের করে দাঁড় করাতে, আর  
যখন আমি বানী ইসরাইলকে  
(তোমাকে হত্যা করা হতে)  
নিবৃত্ত রেখেছি, যখন তুমি  
তাদের কাছে (স্বীয়  
নবুওয়াতের) প্রমাণাদি নিয়ে  
হায়ির হয়েছিলে, অতঃপর  
তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল  
তারা বলেছিল-এটা  
(মুজিয়াসমূহ) স্পষ্ট যাদু ছাড়া  
আর কিছুই নয়।

১১১। আর যখন আমি  
হাওয়ারীদেরকে আদেশ  
করলাম-আমার প্রতি এবং  
আমার রাসূলের প্রতি ঈমান  
আন, তারা বললো, আমরা  
ঈমান আনলাম এবং আপনি  
সাক্ষী থাকুন যে, আমরা পূর্ণ  
অনুগত।

وَالْأَنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنْ  
الْطِينِ كَهِيَّةً الطِيرِ بِإِذْنِي  
فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طِيرًا  
بِإِذْنِي وَتُبَرِّئُ الْأَكْمَةَ  
وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجَ  
الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَتُ  
بِنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكِ إِذْ  
جَئْتُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ  
مِّنْ  
مِّينْ ○

۱۱۱- وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَيْ  
الْحَوَارِينَ أَنْ أَمِنُوا بِي  
وَبِرَسُولِي قَالُوا أَمْنَا وَاشْهَدُ  
بِانْسِنِ مُسْلِمِونَ ○

এখানে আল্লাহ তা'আলা এই সমুদয় মুজিয়াক্রপ নিয়ামতের বর্ণনা দিচ্ছেন, যেগুলো ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-এর উপর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন। তিনি হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে সম্মোধন করে বলেন, হে ঈসা (আঃ)! আমি যে তোমাকে নিয়ামতগুলো প্রদান করেছি সেগুলো তুমি স্মরণ কর। আমি তোমাকে পিতা ব্যতিরেকেই সৃষ্টি করেছি এবং তোমার সন্তাকে আমার ক্ষমতার পরিপূর্ণতার একটা নির্দশন করেছি। আর তোমার মায়ের উপরও ইহসান করেছি এইভাবে যে, তোমাকে তার পবিত্রতার দলীল বানিয়েছি এবং মূর্খ ও অত্যাচারী লোকেরা তার উপর যে নির্লজ্জতার অপবাদ দিয়েছিল তা থেকে তাকে রক্ষা করেছি। তোমাকে আমি কুহুল কুদুস অর্থাৎ জিবরাইল (আঃ)-এর মাধ্যমে সাহায্য করেছি। আমি তোমাকে তোমার শৈশবে ও যৌবনে এমনিভাবে নবী ও আল্লাহর পথে আহ্বানকারী বানিয়েছি যে, তুমি দোলনা থেকেই কথা বলতে শুরু করে দিয়েছো এবং তোমার মাতার পবিত্রতার সাঙ্গ্য প্রদান করেছো, আর নিজেকে আল্লাহর দাস বলে স্বীকার করে নিয়েছো। শৈশব ও যৌবনেও মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছিয়ে দিয়েছো। পৌঢ় বয়সে কথা বলা বিশ্বায়কর নয় বটে কিন্তু দোলনা থেকে কথা কতইনা বিশ্বায়কর ব্যাপার। আল্লাহ পাক তোমাকে কিতাবের তালীম দিয়েছেন এবং মূসা (আঃ)-এর উপর অবতারিত তাওরাতের লিখা ও পড়া শিক্ষা দিয়েছেন।

**أَرْثَاءِ تُّبَّعِيْنَ كَهْيَةَ الطَّيْرِ بِإِذْنِيْ** অর্থাৎ তুমি আমার আদেশে মাটি দ্বারা পাখীর আকৃতি সদৃশ একটি আকৃতি তৈরী করতে এবং ফুঁৎকার দিতে। তখন তা আমারই আদেশে জীবিত পাখী হয়ে উড়তে শুরু করতো।

**سُّرَّتِيْلَ وَتَبَرِّيْ إِلَكِمَهُ وَالْأَبْرَصَ** সূরায়ে আলে ইমরানে এর উপর আলোচনা হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

**وَأَذْتَرْجِيْعُ السُّوتِيْ بِإِذْنِيْ** অর্থাৎ তুমি মৃতদেরকে ডাকতে তখন তারা আল্লাহর হৃকুমে জীবিত হয়ে কবর হতে বেরিয়ে আসতো।

**وَأَذْكَفَتْ بَنِيِّ إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبِيْنِيْتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا .....**  
.....  
**إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مِّيْنَ**

অর্থাৎ হে ঈসা (আঃ)! আমার এই নিয়ামতের কথা স্মরণ কর যে, যখন তুমি বানী ইসরাইলের নিকট নবুওয়াতের দলীলসহ পৌছলে এবং তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, তোমার উপর অপবাদ দিলো, তোমাকে যাদুকর বললো এবং তোমাকে হত্যা করার ও শূলি দেয়ার চেষ্টা করলো, তখন আমি তোমাকে তাদের থেকে বাঁচিয়ে নিলাম, এরপর তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নিলাম। এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর উপর আল্লাহর এ অনুগ্রহ

তাঁকে তাঁর নিকট উঠিয়ে নেয়ার পরের ঘটনা, কিংবা এটা কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। কিন্তু ভবিষ্যতকালকে অতীত কালের রূপ দ্বারা তা'বীর করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার কাছে অতীত কালের ন্যায় ভবিষ্যত কালও নিশ্চিতরূপে অনুষ্ঠিতব্য। এসব হচ্ছে অদৃশ্যের ঘটনা, যেগুলো সম্পর্কে মহান আল্লাহ স্বীয় রাস্ল মুহাম্মাদ (সঃ)-কে অবহিত করেছেন।

‘وَإِذْ أُوحِيَ إِلَى الْحَوَارِيْبِ اَن امِنُوا بِي وَبِرَسُولِي’  
 (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের একটা অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর জন্যে সঙ্গী-সাথী  
 ও সাহায্যকারী ঠিক করে দিয়েছেন। এখানে অবীর অর্থ হচ্ছে অন্তরের মধ্যে কিছু  
 ভরে দেয়া। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন-

وأوحينا إلى أم موسى أن أرض عيده

অর্থাৎ ‘আমি মূসা (আঃ)-এর মায়ের কাছে অহী পাঠিয়েছিলাম-মূসা (আঃ)-কে দুধ পান করাও।’ (২৮৭) এরূপ ইলহামকে সর্বসম্মতভাবে অহী বলা হয়েছে। আর এক জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন-

وَأَوْحَى رِبُّكَ إِلَيْنَا نَحْنُ أَن تَخْرُذُ مِنَ الْجَبَالِ بِهِ وَتَأْ

অর্থাৎ ‘আমি মৌমাছির নিকট অহী পাঠিয়েছিলাম-পাহাড়সমূহে তোমাদের  
ঘর তৈরী কর।’ (১৬ঃ ৬৮) এভাবে হাওয়ারীদের উপর আল্লাহ ইলহাম  
করেছিলেন, তখন তারা ইলহামকৃত হৃকুম মান্য করেছিল। হ্যরত হাসান বসরী  
(রঃ) বলেন যে, মহা মহিমাবিত আল্লাহ তাদের উপর ইলহাম করেছিলেন। সুন্দী  
(রঃ) বলেন যে, তিনি তাদের অন্তরে ওটা নিষ্কেপ করেছিলেন। এর ভাবার্থ এও  
হতে পারে-আমি তোমার মাধ্যমে তাদের কাছে অহী করেছিলাম এবং তাদেরকে  
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান জানিয়েছিলাম। তখন তারা তা কবূল  
করে নিয়েছিল এবং বলেছিল-**وَإِشْهُدْ بِأَنَا مُسْلِمُونْ**-(হে ঈসা আঃ!) আপনি  
সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে গেলাম।

୧୧୨। (ଏ ସମୟଟୁକୁ ଆରଣୀୟ)

ଯଥନ ହାଓୟାରୀରା ବଲଲୋ- ହେ  
ଇସା ଇବନେ ମାବୁଇୟାମ!

আপনার প্রতিপালক কি এরূপ  
করতে পারেন যে, আমাদের  
জন্যে আকাশ হতে কিছু খাদ্য  
প্রেরণ করেন? ইসা বললো—  
আল্লাহকে ভয় কর, যদি  
তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

١١٢- إِذْقَالُ الْحَوَارِيْوْنَ يَعِيْسَى  
ابن مريم هل يستطيع ربك ان  
ينزل علينا مائدة من السماء  
قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين

১১৩। তারা বললো—আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তা থেকে আহার করি এবং আমাদের অন্তর সম্পূর্ণ প্রশান্ত হয়ে যায়, আর আমাদের এই বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয় যে, আপনি আমাদের নিকট সত্য বলেছেন এবং আমরা এর প্রতি সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

১১৪। ইসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) দু'আ করলো— হে আল্লাহ! হে আমাদের থভু, আমাদের প্রতি আকাশ হতে খাদ্য অবতীর্ণ করুন যেন ওটা আমাদের জন্যে অর্ধাং আমাদের মধ্যে যারা প্রথমে (বর্তমান আছে) এবং যারা পরে—সকলের জন্যে একটা আনন্দের বিষয় হয় এবং আপনার পক্ষ হতে এক নির্দর্শন হয়ে থাকে। আর আমাদেরকে খাদ্য থদান করুন, বস্তুতঃ আপনি তো সর্বোভ্যুম প্রদানকারী।

১১৫। আল্লাহ বললেন—আমি এই খাদ্য তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করবো, অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে এর অক্তজ্জ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেবো যে, বিশ্ববাসীদের মধ্যে ঐ শাস্তি আর কাউকেও দেবো না।

— ১১৩ —  
قَالُوا نُرِيدُ أَن نَاكِلَ مِنْهَا  
وَتَطْمِئِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَن  
قَدْ صَدَقْنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا  
مِن الشَّهِيدِينَ ○

— ১১৪ —  
قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  
لِهُدَةٍ رَّحْمَةً اللَّهُمَّ إِنَّا  
مَا إِيمَادُهُ مِن السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا  
عِيدًا لِأَوْلَانَا وَآخِرَنَا وَآيَةً  
مِنْكَ وَارْزَقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ  
الْبَرِزَقِينَ ○

— ১১৫ —  
قَالَ اللَّهُ إِنِّي مِنْ زِلْهَـا  
عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفَرُ بَعْدَ مِنْكُمْ  
فَإِنِّي أَعِذُّهُمْ عَذَابًا لَا أَعِذُّهُمْ  
أَحَدًا مِنَ الْعَلَمِينَ ○

এখানে ‘মায়দাহ’ বা খাবারের খাঞ্চার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এ জন্যই এ সূরার নাম ‘মায়দাহ’ রাখা হয়েছে। এখানেও আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর উপর তাঁর ইহসানের কথা প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ তিনি খাবারের খাঞ্চা অবতরণের জন্যে দু‘আ করেছিলেন, সেই দু‘আ মহান আল্লাহ কবূল করেছিলেন। এটা ছিল হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর একটা মুজিয়া এবং তাঁর নবুওয়াতের অকাট্য প্রমাণ। কোন কোন ইমাম বর্ণনা করেছেন যে, এ ঘটনা ইলে বর্ণিত হয়নি এবং একমাত্র মুসলমান ছাড়া স্বীষ্টানেরাও এ সম্পর্কে অবহিত ছিল না, মুসলমানদের মাধ্যমেই তারা অবগত হয়েছে। আল্লাহ পাকের উক্তি ১।

قَالَ الْحَوَارِبُونَ  
بَسْتَطِعُ  
بَسْتَطِعُ

অর্থাৎ যখন হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী হাওয়ারীরা বলেছিল- “হে ঈসা (আঃ)! আপনার প্রভু কি আমাদের উপর আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ করতে পারেন?” এখানে অধিকাংশ কারী  
পড়েছেন (অর্থাৎ আপনার প্রভু কি এতে সক্ষম?) অন্যান্য কারীরা  
পড়েছেন (অর্থাৎ আপনি কি এতে সক্ষম?) খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চাকে বলা হয়।  
কেউ কেউ বলেছেন যে, হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গীরা তাদের অভাব ও  
দারিদ্র্যের তাড়নায় এ কথা বলেছিল যে, আল্লাহ তা‘আলা যেন প্রত্যহ তাদের  
উপর আকাশ থেকে খানাভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ করেন, যা খেয়ে তারা ইবাদতের  
শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। তখন হ্যরত ঈসা (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন-  
তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং এরূপ প্রার্থনা  
করা থেকে বিরত হও। আহার্য চাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের উপর ভরসা  
কর। হতে পারে যে, এ জিনিসই তোমাদের জন্যে ফির্দা ফাসাদের কারণ হয়ে  
যাবে। তাঁর এ কথা শুনে হাওয়ারীরা বলেছিল- “আমরা মহান আল্লাহর  
মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছি। আমাদের খাওয়ার প্রয়োজন। আর আমরা যখন আকাশ  
হতে অবতারিত খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা দেখতে পাবো তখন আমাদের মনে পূর্ণ প্রশান্তি  
নেমে আসবে। ফলে আপনার প্রতি আমাদের ঈমান দৃঢ় হবে এবং আপনি যে  
আল্লাহর রাসূল এ ব্যাপারে আমাদের আর কোন সন্দেহই থাকবে না। আর  
আমরা নিজেরাই সাক্ষী হয়ে যাবো যে, এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে একটা  
বড় নির্দেশন এবং আপনার নবুওয়াত ও সত্যতার স্পষ্ট দলীল।” তখন হ্যরত ঈসা  
(আঃ) আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা জানালেন- “হে আল্লাহ! আমাদের উপর  
আকাশ হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন! যেন ওটা আমাদের জন্যে অর্থাৎ  
যারা বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে এবং যারা পরে আসবে, সকলের জন্যেই  
আনন্দের বিষয় হয়।” সুন্দী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে- ‘যেদিন ওটা  
অবতীর্ণ হবে সে দিনকে আমরা খুশীর দিন হিসাবে মর্যাদা দেবো এবং আমাদের  
পরবর্তী লোকেরাও ঐ দিনকে সম্মানিত দিন মনে করবে।’ হ্যরত সুফিয়ান

সাওরী (রঃ) বলেন যে, ‘تَكُونُ لَنَا عِيْدًا’-এর ভাবার্থ হচ্ছে- ‘আমরা এই দিনে নামায পড়বো।’ কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে- ‘আমাদের পরবর্তীদের জন্যে এ দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।’ হ্যরত সালমান ফারসী (রঃ) বলেন যে, এ কথা দ্বারা হ্যরত সুসা (আঃ) বুঝাতে চেয়েছিলেন- “যেন ওটা আমাদের সবারই জন্যে একটা শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে যায় এবং রিসালাতের সত্যতার জন্যে সুস্পষ্ট দলীল হতে পারে। আর হে আল্লাহ! যেন ওটা আপনার পূর্ণ ক্ষমতার এবং আমার প্রার্থনা কবূল হওয়ার দলীল হিসাবে প্রকাশ পায়, যাতে জনগণ আমার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করে নিতে পারে।”

“হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ হতে আমাদের নিকট আমাদের কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়াই উত্তম খাদ্য প্রেরণ করুন, যেহেতু আপনি হচ্ছেন সর্বোত্তম আহার্য প্রদানকারী।”

তখন আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ “ঠিক আছে, আমি তোমাদের কাছে খাদ্যপূর্ণ খাপ্তা প্রেরণ করছি। কিন্তু সাবধান!.. এর পরও যদি তোমার কওম কুফরী করে এবং অবাধ্যই থেকে যায় তবে আমি তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করবো, যে শাস্তির স্বাদ বিশ্ববাসীর কেউই কখনও গ্রহণ করেনি বা করবেও না।”

মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেছেন-

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِذْ خِلَوا الْفِرْعَانُونَ أَشَدُّ الْعَذَابِ

অর্থাৎ ‘কিয়ামতের দিন (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) ফিরআউনের দলবলকে কঠিনতম শাস্তির মধ্যে প্রবিষ্ট কর।’ (৪০: ৪৬) আর এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেছেন-

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرِكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ ‘নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে অবস্থান করবে।’ (৪: ১৪৫) ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেছেন- “কিয়ামতের দিন তিন প্রকারের লোককে কঠিনতম শাস্তি প্রদান করা হবে। (১) মুনাফিক, (২) খাদ্যপূর্ণ খাপ্তা অবতীর্ণ হওয়ার পরও যারা কুফরী করেছিল এবং (৩) ফিরআউনের দলবল।”

হাওয়ারীদের উপর খাপ্তা অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

আবু জা'ফর ইবনে জারীর (রঃ) হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হ্যরত সুসা (আঃ) বানী ইসরাইলকে বললেনঃ “তোমরা কি ত্রিশদিন রোয়া রাখতে পার? অতঃপর তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট খাপ্তার

জন্যে প্রার্থনা করবে এবং তিনি তোমাদেরকে তা প্রদান করবেন। কেননা, আমলকারীকে মহান আল্লাহ তার আমলের প্রতিদান দিয়ে থাকেন।” তারা তখন তাই করলো। অতঃপর তারা বললোঃ “হে মঙ্গলের শিক্ষাদানকারী ঈসা (আঃ)! আপনি বলে থাকেন যে, আমলকারীদেরকে আল্লাহ তা‘আলা তাদের আমলের প্রতিদান অবশ্যই প্রদান করে থাকেন। আপনি আমাদেরকে ত্রিশটি রোগ রাখতে বলেছিলেন, আমরা তা রেখেছি। ত্রিশদিন আমরা কারও চাকরী করলে সে আমাদেরকে খেতে দেয় বা বেতন দেয়। তাহলে এখন কি আপনার প্রভু আমাদের উপর খাদ্যপূর্ণ খাওয়া অবতীর্ণ করবেন?” তখন হ্যরত ঈসা (আঃ) বললেনঃ ‘তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক তবে আল্লাহকে ভয় কর।’ হাওয়ারীরা তখন বললোঃ ‘আমরা তো শুধু আমাদের মনের প্রশান্তি চাচ্ছি এবং নিজেরা বিশ্বাস করে অন্যদের সামনেও সাক্ষী হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছি।’ মোটকথা, শেষ পর্যন্ত আকাশ থেকে খাদ্যের খাওয়া অবতীর্ণ হলো, যাতে সাতটি মাছ ও সাতটি ঝুঁটি ছিল। খাওয়াটি তাদের সামনে এসে থেমে গেলো। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত লোকই তা খেলো। ইবনে জারীর (রঃ) “এরূপ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ বর্ণনা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। তিনি হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হাওয়ারীরা হ্যরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-কে বললোঃ আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের উপর আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাওয়া অবতীর্ণ করেন। হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন যে, তখন ফেরেশতাগণ মায়দাহ বা খাওয়া নিয়ে অবতীর্ণ হন। ঐ খাওয়ায় সাতটি মাছ ও সাতটি ঝুঁটি ছিল। খাওয়াটি তাঁরা তাদের সামনে রেখে দেন। তা থেকে তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত লোকই ভক্ষণ করে।

ইবনে আবি হাতিম (রঃ) হ্যরত আম্বার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন— “যে মায়দাহ বা খাওয়াটি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে ঝুঁটি ও গোশ্ত ছিল। তাদের উপর নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন খিয়ানত না করে এবং পরবর্তী দিনের জন্যে উঠিয়ে না রাখে। কিন্তু তারা খিয়ানত করেছিল এবং জমা করে রেখেছিল। ফলে তাদের আকৃতি বিকৃত করে দিয়ে তাদেরকে বানর ও শূকরে পরিণত করা হয়েছিল।” মায়দাহ সম্পর্কীয় যতগুলো হাদীস বর্ণিত রয়েছে, সবগুলো দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, উক্ত মায়দাহ বা খানাভূতি খাওয়া হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর যুগের বানী ইসরাইলের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং ওটা ছিল আল্লাহর নিকট তাঁর প্রার্থনার ফল। আর এটা আল্লাহ তা‘আলার <sup>عَلِيٌّ مِنْ لَهُ أَنِّي</sup> قَالَ اللَّهُ أَنِّي عَلَيْكُمْ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

কোন কোন উক্তিকারী এটা ও উক্তি করেছেন যে, খান্ধা অবতীর্ণ হয়নি। হ্যরত কাতাদা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত হাসান (রঃ) বলতেন— যখন তাদেরকে <sup>فَمَنْ يُكَفِّرُ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ أَعْذَبُهُ</sup>— এ কথা বলা হলো তখন তারা বললোঃ ‘আমাদের এর প্রয়োজন নেই।’ ফলে তা আর অবতীর্ণ হলো না। কিন্তু জমহুর উল্লামার মতে মায়দাহ অবতীর্ণ হয়েছিল। ইবনে জারীরও (রঃ) এই মত পোষণ করেছেন। কেননা, মহান আল্লাহর <sup>فَمَنْ يُكَفِّرُ</sup>— এ উক্তি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে। তাঁর ওয়াদা এবং ওয়াঙ্গদ সত্য। আর এটা সত্য বলে অনুমিতও হচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। পূর্ববর্তী গুরুজন থেকে যেসব ‘খবর’ ও ‘আসার’ বর্ণিত হয়েছে সেগুলো দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয়। ইমাম আহমাদ (রঃ) হ্যরত ইবনে আকবাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশরা নবী (সঃ)-কে বললোঃ আপনি আপনার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের জন্যে সাফা পর্বতকে সোনা বানিয়ে দেন, তাহলে আমরা আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবো। তিনি বললেনঃ ‘সত্য তোমরা ঈমান আনবে তো?’ তারা উত্তরে বললোঃ হ্যঁ। বর্ণনাকারী বলেন যে, নবী (সঃ) তখন আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা জানালেন। ইতিমধ্যে তাঁর নিকট হ্যরত জিবরাইল (আঃ) এসে পড়লেন— “তুমি যদি চাও তবে সকালেই সাফা পর্বত সোনায় পরিণত হয়ে যাবে। কিন্তু এর পরও তারা ঈমান না আনলে আমি তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করবো যে শাস্তি আমি বিশ্ববাসীর আর কাউকে প্রদান করবো না। আর যদি তুমি চাও যে, আমি তাদের তাওবা করুল করতঃ তাদের উপর করুণা বর্ষণ করি, তবে আমি তাই করবো।” তখন নবী (সঃ) বললেনঃ হে আমার প্রভু! আমি আপনার নিকট তাওবার করুলিয়ত ও করুণাই কামনা করি।

১১৬। আর যখন আল্লাহ  
বললেন— হে ইসা ইবনে  
মারাইয়াম! তুমি কি  
লোকদেরকে বলেছিলে—  
তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে  
ও আমার মাতাকে মা‘বুদ  
নির্ধারণ করে নাও? ইসা  
নিবেদন করলো—আমিও  
আপনাকে পবিত্র মনে করি;  
আমার পক্ষে কোনক্রমেই

১১৬- وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى  
ابنَ مَرِيمَ إِنَّمَا قُلْتَ لِلنَّاسِ  
أَتَخِذُونِي وَأَمِّي الْهَيْئَةِ مِنْ  
دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا  
يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ

শোভনীয় ছিল না যে, আমি  
এমন কথা বলি যা বলবার  
আমার কোনই অধিকার নেই;  
যদি আমি বলে থাকি, তবে  
অবশ্যই আপনার জানা  
থাকবে; আপনি তো আমার  
অন্তরঙ্গত কথাও জানেন,  
পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা  
কিছু রয়েছে আমি তা জানি  
না; সমস্ত গায়েবের বিষয়  
আপনিই জ্ঞাত।

১১৭। আমি তাদেরকে কিছুই  
বলিনি এটা ব্যতীত, যা  
আপনি আমাকে আদেশ  
করেছেন যে, তোমরা আল্লাহর  
ইবাদত কর, যিনি আমারও  
প্রতিপালক, তোমাদেরও  
প্রতিপালক, আমি তাদের  
সমস্ক্রমে জ্ঞাত ছিলাম যতক্ষণ  
তাদের মধ্যে ছিলাম, অনন্তর  
যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে  
নিয়েছেন, তখন আপনিই  
তাদের সমস্ক্রমে অবগত  
রয়েছেন; আর আপনি সর্ব  
বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।

১১৮। আপনি যদি তাদেরকে  
শাস্তি প্রদান করেন, তবে ওরা  
তো আপনার বান্দা, আর যদি  
তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে  
আপনি পরাক্রমশালী,  
প্রজ্ঞাময়।

لِي بِحِقٍّ أَنْ كُنْتَ قَلْتَهُ فَقَدْ  
عَلِمْتَهُ تَعْلُمُ مَا فِي نَفْسِي  
وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكِ إِنَّكَ  
أَنْتَ عَلَامُ الْغَيْبِ ○

۱۱۷- مَا قُلْتَ لَهُمْ إِلَّا  
مَا أَمْرَتْنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ  
رَبِّي وَرَبِّكُمْ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ  
شَهِيدًا مَا دَمْتَ فِيهِمْ فَلَمَّا  
تَوْفَيْتِنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ  
عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
شَهِيد○

۱۱۸- إِنْ تَعْذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ  
عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ  
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে এই কথাগুলো ঐসব লোকের সামনে সম্মোধন করে বলবেন যারা তাঁকে ও তাঁর মাতাকে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছিল। এ কথাগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহ খ্রীষ্টানদেরকে ধর্মক দিয়েছেন ও ভয় প্রদর্শন করেছেন। কাতাদা (রঃ) ও অন্যান্যগণ এরূপই বলেছেন। **هَذَا يَوْمٌ يُنْفَعُ الصَّادِقِينَ صُدُّقُهُمْ** (অর্থাৎ এটা এই দিন যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদীতার পুরক্ষার দেয়া হবে) এ উক্তিটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সুন্দী (রঃ) বলেন যে, এ সম্মোধন ও উভয় দুনিয়াতেই ছিল। ইবনে জারীর (রঃ) এ কথাকে সমর্থন করে বলেন যে, যখন হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল এটা এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) দু'প্রকারে-এর উপর দলীল গ্রহণ করেছেন।

প্রথম প্রকার এই যে, এ কথাটি **مَاضِي** বা অতীতকালের ক্রিয়া দ্বারা বলা হয়েছে, অর্থাৎ **قَالَ** বলা হয়েছে। **إِنْ تَعْذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ** এবং প্রকার এই যে, **إِنْ تَعْذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ** - এটা হচ্ছে শর্ত্যুক্ত উক্তি এবং এই উক্তি দুনিয়াতেই করা হয়েছিল। আর শাস্তি প্রদান ও ক্ষমা করণের শর্ত আখিরাতের জন্যে উঠিয়ে রাখা হয়েছে। এ দু'টি দলীলের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ আছে। কেননা, অতীতকালের ক্রিয়া আসলো তো কি হলো? কিয়ামতের অধিকাংশ ঘটনাকেই অতীতকালের ক্রিয়া দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ওটা সংঘটিত হওয়ার উপর যথেষ্ট দলীল হতে পারে। এখন বাকী থাকলো **وَإِنْ تَعْذِبْهُمْ فَإِنْ تَعْذِبْهُمْ** শব্দটির কালামে শরত্তিয়া হওয়ার কথা। এ সম্পর্কে বলা যাবে যে, এর দ্বারা পাপীদের প্রতি হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর অস্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েছে এবং তাদের পরিণাম আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আর শর্তের উপর কোন কিছু সম্পর্কিত হওয়া ওটা সংঘটিত হওয়ার দাবিদার হতে পারে না। কুরআন কারীমের আয়াতসমূহে এর বহু নথীর বিদ্যমান রয়েছে। এই ব্যাপারে হ্যরত কাতাদা (রঃ)-এর বর্ণনা রয়েছে তা খুবই স্পষ্ট। তা হচ্ছে এই যে, এটা হবে কিয়ামতের দিনের কথোপকথন, যাতে সেদিন সকলের সামনে খ্রীষ্টানদের সব কিছু খুলে যায় এবং তাদের মনে ভয় ও সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়। হ্যরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- কিয়ামতের দিন নবীগণ ও তাঁদের উম্মতদেরকে ডাক দেয়া হবে। অতঃপর হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে আহ্বান করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে স্বীয় নিয়ামতের কথা শ্঵রণ করিয়ে দেবেন। তিনি তা স্বীকার করে নেবেন। তারপর আল্লাহ পাক তাঁকে জিঞ্জেস করবেনঃ তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে- তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে

আমাকে ও আমার মাতাকে মা'বুদ বানিয়ে নাও? তখন তিনি তা অঙ্গীকার করবেন। অতঃপর নাসারাদেরকে আনয়ন করা হবে এবং তাদেরকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তারা তখন বলবেঃ ‘হ্যা, তিনি আমাদেরকে এ আদেশই করেছিলেন।’ এই কথা শুনে হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর মাথা ও দেহের লোম ভয়ে খাড়া হয়ে যাবে। ফেরেশতাগণ তখন তাঁর চুলগুলো ধরে রাখবেন। আর এই নাসারাদেরকে আল্লাহর সামনে এক হাজার বছর পর্যন্ত জোড় পায়ে বসিয়ে রাখা হবে। অবশেষে তাদের উপর হুজ্জত কায়েম হয়ে যাবে এবং সত্য তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর তাদের জন্যে ত্রুশ উঠানো হবে। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

سَبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ..... لِي بِحَقٍّ  
এ জবাবে হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে উত্তম ভদ্রতার কতইনা তাওফীক দান করা হয়েছিল এবং তাঁর অন্তরে কতইনা সুন্দর দলীল ভরে দেয়া হয়েছে! তিনি বলেন—হে আল্লাহ! যে কথা বলার আমার কোন অধিকার নেই সে কথা আমি কিরূপে বলতে পারি? যদি আমি এ কথা বলেও থাকি তবে অবশ্যই সেটা আপনি ভাল রূপেই জানেন। কেননা, আপনার কাছে তো কোন কিছুই গোপন থাকে না। আপনি আমার অন্তরের কথা অবগত আছেন, কিন্তু আমি আপনার ইচ্ছা সম্পর্কে মোটেই অবগত নই। আপনি আমাকে যা নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি তার একটি অক্ষরও বেশী করিনি। আমি তো শুধু এ কথাই বলেছিলাম— তোমরা আল্লাহরই ইবাদত করবে যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাদের কার্যাবলী তদারক করেছি। অতঃপর যখন থেকে আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের কার্যাবলী তদারক করেছেন। আর আপনি প্রত্যেক কাজ সম্বন্ধেই পূর্ণ অবগত।

হ্যরত ইবনে আবুস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের মধ্যে খুৎবা দিতে গিয়ে বলেনঃ হে লোক সকল! কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে উলঙ্গ মাথা, উলঙ্গ দেহ এবং উলঙ্গ পা অবস্থায় উঠানো হবে, যেমন তোমরা তোমাদের জন্মের দিন ছিলে। সর্বপ্রথম হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-কে পোশাক পরানো হবে। এরপর আমার উম্মতের মধ্য হতে কতক লোককে আনয়ন করা হবে যাদেরকে জাহান্নামের নির্দর্শন হিসেবে বাম দিকে রাখা হবে। তখন আমি বলবো— এরা তো আমারই উন্নত! সেই সময় বলা হবে— তুমি জান না যে, এরা তোমার (ইন্সেকালের) পরে তোমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করেছিল এবং

১. হাফিয ইবনে আসাকির এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে কাসীর একে গারীব ও আয়ীয বলেছেন।

বিদআত চালু করে দিয়েছিল। আমি একজন সৎ বান্দার মত ঐ কথাই বলবো যে কথা হ্যরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেন।<sup>১</sup> তাহলে ‘إِنْ تَعْذِبُهُمْ’ আল্লাহ পাকের এই কালাম তাঁরই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি যা চাইবেন তাই করবেন। তিনি সবারই কৈফিয়ত তলব করতে পারেন, কিন্তু তাঁর কাছে কেউই কোন কৈফিয়ত তলব করতে পারে না। তা ছাড়া এই কালাম নাসারাদের উপর তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশকারী, যারা হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে তাঁর শরীক ও পুত্র এবং মারহিয়াম (আঃ)-কে তাঁর স্ত্রী (নাউয়ুবিল্লাহি মিন যালিক) সাব্যস্ত করেছিল। এ আয়াতের বড়ই মাহাত্ম্য রয়েছে। হৃদীসে আছে যে, নবী (সঃ) এক রাত্রে সকাল পর্যন্ত নামাযে এ আয়াতটিই পড়তে থাকেন।

ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হ্যরত আবু যার (রাঃ) বলেন, একদা রাত্রে নবী (সঃ)-এ ‘إِنْ تَعْذِبُهُمْ’-এ আয়াতটি নামাযে পাঠ করতে থাকেন এবং এর মাধ্যমেই তিনি রুক্ক’ ও সিজদা করেন। আর এভাবেই সকাল হয়ে যায়। সকালে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! রাত্রে নামাযে আপনি এ আয়াতটিই পড়তে থাকলেন এবং এর মাধ্যমেই রুক্ক’ ও সিজদা করতে রইলেন, শেষ পর্যন্ত সকাল হয়ে গেল, এর কারণ কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ “আমি মহিমাবিত আল্লাহর কাছে আমার উশ্মতের জন্যে সুপারিশের প্রার্থনা করছিলাম। তখন তিনি তাঁর সাথে অংশী স্থাপন করেছে এরূপ লোক ছাড়া সকলকেই ক্ষমা করে দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন।” ইবনে আবি হাতিম (রঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর ‘إِنْ تَعْذِبُهُمْ’-এ উক্তিটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করেন এবং বলেনঃ ‘হে আল্লাহ! আমার উশ্মত (অর্থাৎ আমার উশ্মতকে ক্ষমা করুন)।’ এ বলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। আল্লাহ তা‘আলা তখন হ্যরত জিবরাইল (আঃ)-কে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেন। হ্যরত জিবরাইল (আঃ) এসে তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁকে যা উত্তর দেয়ার ছিল তাই দেন। তখন মহান আল্লাহ হ্যরত জিবরাইল (আঃ)-কে বলেনঃ ‘হে জিবরাইল (আঃ)! তুমি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বল যে, আল্লাহ তাঁকে তাঁর উশ্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করবেন, দুঃখিত করবেন না।’ ইমাম আহমাদ (রঃ) হ্যরত হৃষাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট অনুপস্থিত থাকলেন, বের হলেন না, এমনকি

১. এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি কখনই বের হবেন না। অতঃপর তিনি বের হলেন এবং এমনভাবে সিজদায় পড়ে গেলেন যে, তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেছে বলে আমাদের ধারণা হলো। তারপর তিনি মাথা উঠিয়ে বললেনঃ আমার প্রতিপালক আমার নিকট আমার উম্মতের ব্যাপারে কি করা যায় সেই পরামর্শ চেয়েছিলেন। আমি বললাম, হে আমার প্রভু! এরা তো আপনারই মাখলুক ও আপনারই বান্দা! দ্বিতীয় বার তিনি আমার নিকট পরামর্শ চাইলে আমি ঐ কথাই বললাম। তখন তিনি আমাকে বললেনঃ ‘হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তোমার উম্মতের ব্যাপারে আমি তোমাকে অপদস্থ করবো না।’ আর তিনি আমাকে এই সুসংবাদ দিলেন যে, আমার সঙ্গে আমার উম্মতের যে প্রথম দলটি জান্নাতে যাবে তাদের সংখ্যা হবে সত্ত্বর হাজার এবং এরূপ প্রত্যেক হাজারের সঙ্গে আরও সত্ত্বর হাজার করে থাকবে। এরা সবাই বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা জিবরাইল (আঃ)-এর মাধ্যমে আমাকে বললেনঃ ‘তুমি প্রার্থনা কর, তা করুল করা হবে এবং চাও, তা দেয়া হবে।’ আমি জিবরাইল (আঃ)-কে বললাম, আল্লাহ কি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করার ইচ্ছা করেছেন? জিবরাইল (আঃ) উত্তরে বললেনঃ ‘হ্যা, আল্লাহ আমাকে আপনার নিকট এই উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছেন।’ আল্লাহ আমাকে সব কিছুই প্রদান করেছেন। আমি এ জন্যে অহংকার করছি না। আর আমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে এবং আমি ভৃ-পৃষ্ঠে সুস্থ শরীরে বিচরণ করছি। আমাকে এই বিশেষত্ব দেয়া হয়েছে যে, আমার উম্মত দুর্ভিক্ষে মারা যাবে না এবং তারা পরাজিত হবে না। আল্লাহ আমাকে কাওসার দান করেছেন। এটা হচ্ছে জান্নাতের একটি নহরের নাম যা আমার হাওয়ে বয়ে আসবে। আর আমাকে মর্যাদা, সাহায্য এবং রুক্তি বা ভক্তি প্রযুক্ত ভীতি প্রদান করা হয়েছে, যা আমার উম্মতের সামনে জনগণের উপর এক মাসের পথের ব্যবধান হতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আমি সকল নবীর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবো। আমার উম্মতের জন্যে গনীমত বা যুদ্ধলুক মাল হালাল করা হয়েছে এবং আরও এমন কতক জিনিস আমার উম্মতের জন্যে হালাল করা হয়েছে যেগুলো আমার পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের উপর হালাল ছিল না। আর মাযহাব হিসেবে আমার ধর্মে কোন কাঠিন্য রাখা হয়নি।<sup>১</sup>

১. সনদের দিক দিয়ে এই হাদীসটি দুর্বল হলেও সাফাআতের হাদীসগুলো এর দুর্বলতা দ্রু করে দিয়েছে।

১১৯। আল্লাহ বলবেন-এটা  
সেইদিন যেদিন সত্যবাদীদের  
সত্যবাদিতা কাজে আসবে,  
তারা উদ্যান থাণ্ড হবে, যার  
তলদেশে নহরসমূহ বইতে  
থাকবে, আল্লাহ তাদের প্রতি  
সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা  
আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে;  
এটাই হচ্ছে মহা সফলতা।

১২০। আল্লাহরই জন্যে রয়েছে  
বাদশাহী নভোমগুলের ও  
ভূ-মগুলের এবং ঐ সমুদয়  
বস্তুর যা তাতে বিদ্যমান  
রয়েছে; আর তিনি সকল  
বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

ইসা (আঃ) যে বিপথগামী ও মিথ্যাবাদী শ্রীষ্টানদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ  
করেছিলেন সে কথারই জবাব দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, **هذا يوم ينفع**  
**الصادقين صدقهم لهم جنت** অর্থাৎ আজকের দিনে একত্ববাদীদের একত্ববাদ এবং  
সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা উপকার দেবে। তারা প্রবাহিত নহর বিশিষ্ট জান্মাতে  
প্রবেশ লাভ করবে। সেখান থেকে না তাদেরকে বের করা হবে, না তারা মৃহূর্তের  
জন্যে জান্মাত পরিত্যাগ করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারাও  
আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

**وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ**

অর্থাৎ 'আল্লাহর সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড় কথা।' (৯৪: ৭২) এ আয়াতের সঙ্গে  
যে হাদীস সম্পর্কযুক্ত রয়েছে তা সত্ত্বরই আসছে। ইবনে আবি হাতিম (রাঃ)  
হ্যরত আনাস (রাঃ) হতে মারফু'রূপে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, এ  
সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- সেই দিন মহা মহিমাবিত আল্লাহ উজ্জ্বল

১১৯- **قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ  
الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّةٌ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ  
لِلْخَلِيلِينَ فِيهَا أَبْدًا رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ**

○  
**الْعَظِيمُ**

১২০- **لِلَّهِ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**

১৪  
৫

গৌণিমান অবস্থায় প্রকশিত হবেন এবং বলবেনঃ ‘তোমরা চাও, আমি তোমাদেরকে প্রদান করবো।’ তিনি বলেন যে, তখন তারা তাঁর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করবে। তিনি তখন কলবেনঃ ‘আমার সন্তুষ্টিই তো তোমাদেরকে আমার ঘরে নিয়ে এসেছে।’ জনগণ পুনরায় তাঁর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করবে। তখন তিনি বলবেনঃ ‘তোমরা সাক্ষী থাক যে, মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন।’ আল্লাহ পাক বলেনঃ **ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ** অর্থাৎ এটাই হচ্ছে বড় সফলতা (১০: ৭২) (এক্ষেত্রে সফলতা আমি আর কাউকেও প্রদান করি না।) মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

**لِمِثْلِ هَذَا فَلِيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ -**

অর্থাৎ আমলকারীদের এক্ষেত্রে আমলই করা উচিত। (৩৭: ৬১) আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ

**وَفِي ذَلِكَ فَلِيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ -**

অর্থাৎ এ কাজেই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। (৮৩: ২৬)

**لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -**

অর্থাৎ তিনিই সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। সব কিছুরই উপর তাঁর পূর্ণ আধিপত্য রয়েছে। তাঁর সাথে কেউই তুলনীয় নয় এবং তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। তাঁর পিতাও নেই, পুত্রও নেই এবং স্ত্রীও নেই। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই।

**সূরাঃ ‘মায়দাহ’র  
তাফসীর সমাপ্ত**

# تَفْسِيرُ الْأَبْنَائِ

تأليف

الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله

الترجمة

الدكتور محمد مجتبى الرحمن  
الأستاذ للغة العربية والدراسات الإسلامية  
جامعة راجشاھي، بنغلاديش